জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

১৯৬৮

একবিংশতি বর্ষ ঃ জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

(ফেডারেশন হল)

কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৬৭

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন ১৯৬৮

চিত্র-সূচী

বিবিধ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

. ১৯৬৮

একবিংশতি বর্ষ ঃ জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

(ফেডারেশন হল)

কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—১৯৬৮

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর, ১৯৬৮

চিত্র-সূচী

বিবিধ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একবিংশ বর্ষ জানুয়ারী, ১৯৬৮ প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

নানা রকম প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আজ একবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। গত বিশ বৎসরে এই পত্রিকায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বহুসংখ্যক প্রবন্ধ, আলোচনা ও সংবাদ ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি যে বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহাতে অবশ্য বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার কারণ নাই। যেহেতু গত বিশ বৎসরে যে সকল প্রবন্ধাদি পরিবেশিত হইয়াছে, তাহার কয়েক ক্ষেত্রে ভাষার সুষ্ঠু ব্যবহার, গঠন প্রণালী এবং বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রচেষ্টা আশানুরূপ হয় নাই। ভাষার আড়ষ্টতা ও অস্পষ্টতা দূরীভূত না হইলে বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু জনসাধারণের নিকট সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় হইতে পারে না। পৃথিবীর সমৃদ্ধ ভাষাসমূহে যেমন গঠন-পারিপাট্য, ব্যাকরণ-সম্মত সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং মনোভাব প্রকাশের উপযোগী যথাযথ শব্দবিন্যাস প্রভৃতি সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বিত হয়, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রেরিত অনেক প্রবন্ধাদিতেই তাহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইয়া থাকে। তাবাই মনোভাব

প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম। সুষ্ঠু শব্দচয়ন এবং যথোপযুক্ত পদবিন্যাসে বক্তব্য বিষয় সরল ও সুখবোধ্য হইয়া থাকে। বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভাষা যতদূর সম্ভব সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আজকাল সাধু ভাষায় কিছু কিছু প্রবন্ধাদি লিখিত হইলেও চলিত ভাষার প্রবন্ধাদিরই আধিক্য লক্ষিত হয়। অনেক সময় তাহাতেও এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হয়, যাহা সম্পূর্ণ অপ্রচলিত। এতদ্ব্যতীত পদবিন্যাস প্রভৃতিতে বাংলা ভাষার রচনা-রীতি ও অনুসৃত হয় না—ইহা সর্বথা বর্জনীয়। যাহা হউক, যত দূর সম্ভব আড়ষ্টতা ও অস্পষ্টতা পরিহার এবং ত্রুটিহীন করিয়া সহজবোধ্য ভাষায় প্রবন্ধাদি পরিবেশিত হইলে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র উৎকর্ষ সাধন সহজসাধ্য হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

আজ নববর্ষের প্রারম্ভে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য আমাদের লেখক-লেখিকাদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। প্রবন্ধাদি নিছক তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যাহাতে সাধারণ মানুষের জীবনে কাজে লাগিতে পারে, ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিতে পারে—এরূপ প্রবন্ধাদি লিখিত হইলে জনসাধারণের নিকট পত্রিকাটি অধিকতর আকর্ষণীয় হইয়া উঠিবে বলিয়াই মনে হয়। এতদ্ব্যতীত নিজেদের ভ্রমণ-কাহিনী, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ, কলকারখানা-শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি পরিদর্শনলব্ধ বিবরণাদি প্রকাশে আমরা সততই আগ্রহশীল। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের সুমহান কর্তব্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সমর্থন অপরিহার্য। যাঁহাদের মূল্যবান উপদেশ ও পরিচালনায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' তাহার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, যাঁহাদের অনুগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা ইহার যাত্রাপথের পাথেয়, আজ এই নববর্ষের সূচনায় তাঁহাদিগকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি।

মৎস্য-সংরক্ষণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

সমীরকুমার রায়

মাছ বাঙালীর অতি প্রিয় খাদ্য। বাংলা দেশে বিভিন্ন রকমের মাছ পাওয়া যায়। যত রকমের মাছ আমাদের খাদ্য-তালিকায় স্থান পেয়েছে, ভারতের আর কোন প্রদেশে এরকম দেখা যায় না। শরীরের পুষ্টির জন্যে জান্তব প্রোটিন এবং ভিটামিনের প্রয়োজন। মাছ থেকে আমরা এই প্রোটিন সহজেই পাই। কোন্ মাছে শতকরা কত প্রোটিন আছে, তার সব এখানে দেওয়া সম্ভব নয়—তবুও কিছু নীচের তালিকায় দেওয়া হলো।

শিঙ্গী—২৪.৫৬%
কই—২৩.৩০%
ইলিশ—২০.৫০%
মাগুর—১৯.৫০%
মৃগেল—১৮.৭০%
কাৎলা—১৮.২৫%
রুই—১৭.৩০%
ট্যাংরা—১৭.৩০%

প্রোটিন ছাড়া মাছের তেলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। ভিটামিন-এ আমাদের শরীরের পরিবর্ধক। হ্যালিবাট মাছের লিভারের তেলের গুণ অমরা জানি। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ আছে। ইলিশ মাছও কিছু কম যায় না। ইলিশ মাছের তেলেও হ্যালিবাটের সমপরিমাণ ভিটামিন-এ আছে। ভিটামিন-এ ছাড়াও ভিটামিন-বি, সি এবং ভিটামিন-ডি আমরা মাছ থেকে পাই। এক কথায় বলতে গেলে, শরীরের পুষ্টি ও পরিবর্ধনের জন্যে মাছ একটি অতি প্রয়োজনীয়—এমন কি, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু। অল্প দামের (বর্তমানে অগ্নিমূল্য) এই মুখরোচক প্রাণীকে খাদ্য-তালিকাভুক্ত করে পৃথিবীর মৎস্যভোজী লোকেরা যে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

দেশ বিভাগের পূর্বে বাংলা দেশে মাছের সঙ্কট দেখা দেয় নি। তখন চাহিদা অনুসারে যোগানের অভাব হয় নি। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মাছের চাহিদা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যোগান সে হারে মোটেই বৃদ্ধি পায় নি। মূল্য-গতি ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী এবং সাধারণ স্বল্পবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। তাই শূন্য মাছের থলি হাতে বাজার সেরে ব্যাজার মুখে বাড়ী ফিরতে হয় বেশীর ভাগ লোককে। বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে আমরা যে সব যুক্তি পাই, নিম্নলিখিতগুলি তাদের অন্যতম।

১। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বৃদ্ধি এবং সেই পরিমাণে যোগানের স্বল্পতা,

২। অসাধু ব্যবসায়ীদের দ্বারা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি,

৩। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমদানী বন্ধ,

৪। মৎস্য-চাষের হ্রাসপ্রাপ্তি,

৫। সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থার অভাব এবং

৬। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সংরক্ষণ না হবার ফলে ক্ষতি।

উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে, যেগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্তমান মৎস্য-সমস্যাকে ত্বরান্বিত করেছে। মাছের চাহিদা অনুযায়ী যোগান বৃদ্ধির জন্যে অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধান করা গেলেও সংরক্ষণ-

সমস্যা পূর্বের মতই থেকে যাবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মৎস্য-সংরক্ষণের গুরুত্ব অনেকখানি।

সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মাছের স্বাদ-গন্ধ অপরিবর্তিত রেখে একাধিক দিন খাদ্যোপযোগী রাখা। আজকের প্রচুর মাছের যোগান আগামী দিনের ঘাটতি পূরণ করতে পারে—এই উদ্দেশ্যেই সংরক্ষণের একান্ত প্রয়োজন। মাছ যাতে পচে নষ্ট না হয়ে যায়, যাতে বেশী দিন টাট্‌কা রাখা যায়, সেটা আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই সম্বন্ধে গবেষণা করতে গেলে প্রথমেই দেখতে হবে, কি কি কারণে মাছ খাদ্যের অনুপযুক্ত হয়ে যায়। কারণ, খারাপ হবার কারণ জানা না গেলে ভাল রাখবার পন্থা উদ্ভাবন করা যায় না। সুতরাং দেখা যাক—কি কি উপায়ে মাছ খারাপ হতে পারে—

১। দহন-ক্রিয়ার ফলে (Oxidative process)

২। জৈব অনুঘটকের বিক্রিয়ায় (Enzymatic process) এবং

৩। জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হলে (Bacterial process)।

এই তিনটি কারণের সুপরিকল্পিত সমাধানের মধ্যেই মৎস্য-সংরক্ষণের উপায়গুলি নিহিত আছে।

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে দুটি পদ্ধতির প্রচলন আছে। প্রথমটি, রোদের তাপে মাছ শুকিয়ে রাখা। বাজারে যে শুঁট্‌কি মাছ দেখি, সেগুলি এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা। এই পদ্ধতির একটা অসুবিধা আছে। তৈলাক্ত মাছকে শুঁট্‌কি মাছে পরিণত করলে তার চর্বি ও তেল বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায় এবং ফলে খাবার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। শুঁট্‌কি মাছ বাজারে যা বিক্রয় হয়, তাও যদি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সংরক্ষিত হতো, তাহলে শুঁট্‌কি মাছের বাজারের পাশ দিয়ে যাবার সময় নাকে রুমাল চাপা দিতে হতো না। মোদ্দা কথা হলো, শুঁট্‌কি মাছ বিজ্ঞান-সম্মত এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত এবং বিক্রয় করা হলে আরও জনপ্রিয়তা লাভ করতো সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়টি হলো, নুন-দেওয়া মাছ। মাছে অধিক মাত্রায় নুন দিলে একাধিক দিন খাদ্যোপযোগী থাকে। প্রচুর পরিমাণে নুন থাকবার ফলে জীবাণুগুলি সহজে বংশবিস্তার করতে পারে না। এই হিসাবে নুনের জীবাণু-প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে অসুবিধা আছে। নুন-দেওয়া মাছের রং লাল্‌চে হয়ে যায়, এটা আমরা সকলেই দেখেছি। এর কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, লাল রঙের Halophilic bacteria এর জন্যে দায়ী। এই জীবাণুগুলি সমুদ্রজাত নুনের মধ্যে বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। এই জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত মাছ খাওয়া মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। Halophilic bacteria-র হাত থেকে কিছুটা নিস্তার পাওয়া যায় যদি সৈন্ধব লবণ বা Rock salt ব্যবহার করা যায়। অবশ্য এর খরচ অনেক বেশী। কি পরিমাণ নুন মাছে দেওয়া হবে, তারও একটা মাত্রা নির্দেশ করা হয়েছে। বড় মাছের বেলায় ১ : ৫ অথবা ১ : ৬ ভাগ এবং ছোট মাছের বেলায় ১ : ১৬ ভাগ নুন দেওয়া যেতে পারে।

আবার নুন এবং বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ করলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ভাল থাকে। বরফের মধ্যে নুন দিলে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে যায়। এই পদ্ধতির দুটি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ নুন থাকবার ফলে জীবাণু বংশবিস্তার করতে পারে না এবং দ্বিতীয়তঃ তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকবার ফলে জৈব অনুঘটকের (Enzyme) কাজ মন্থর গতিতে চলে—এমন কি, অনেক জৈব অনুঘটকের সক্রিয়তা স্তব্ধ হয়ে

যায়। আমরা জানি, রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর জৈব অনুঘটকের দান অপরিসীম। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় না পৌঁছালে জৈব অনুঘটক সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপ দেখা যাক—শ্বেতসার (Starch) কিভাবে জৈব অনুঘটকের মাধ্যমে গ্লুকোজে পরিণত হয়। ষ্টার্চ প্রথমে ম্যালটোজে পরিণত হয় ডায়াষ্টেজ জৈব অনুঘটকের মাধ্যমে। ডায়াষ্টেজ ৫০° সেঃ তাপমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং কার্য সম্পাদন করে। তারপর ম্যালটেজ জৈব অনুঘটক ১৫° সেঃ তাপমাত্রায় ম্যালটোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে। বিভিন্ন তালা খোলবার জন্যে যেমন বিভিন্ন প্রকার চাবির প্রয়োজন, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার সহায়ক ভিন্ন ভিন্ন জৈব অনুঘটক। বিশেষ বিশেষ তাপমাত্রায় সেগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। কাজেই জৈব অনু-ঘটকের কর্মচাঞ্চল্য তাপ কমিয়ে বিলম্বিত করলে মাছ নষ্ট হয়ে যেতে দীর্ঘ সময় লাগবে। কত দিনের সংরক্ষণ প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী তাপমাত্রা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন—দু-দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ দরকার হলে বরফ চাপা দিয়ে রাখলেই চলে, কিন্তু বেশী দিন রাখতে হলে হিমাঙ্কের নীচের তাপমাত্রায় রাখা দরকার।

জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হলে সবচেয়ে আর্থিক ও খাদ্যবস্তুর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই মাছকে জীবাণুমুক্ত রাখবার জন্যে স্বাদ-গন্ধ এবং অন্যান্য গুণ বজায় রেখে সংরক্ষণ করবার জন্যে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার নতুন আলোকপাত করেছে। যে সব দেশ ট্রলারে সমুদ্রে মাছ ধরে, তাদের উৎকৃষ্ট সংরক্ষণ-ব্যবস্থা না থাকলে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। সেই কারণেই তারা সংরক্ষণের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে ট্রলারের সাহায্যে সামুদ্রিক মাছ ধরবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু তা কার্যতঃ ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে উপযুক্ত সংরক্ষণ-ব্যবস্থার অভাব অন্যতম। বাংলা দেশের লোকেরা সামুদ্রিক মাছ খেতে অভ্যস্ত নয়—এই কারণেও ট্রলারে ধৃত মাছগুলির বিক্রয়ের বাজার ছিল না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করে বিদেশের বাজারে বিক্রয়ের চেষ্টা করলে সফলতা লাভ করতো না, একথা বলা যায় না।

মহীশূরে Central Food Technological Research Institute স্থাপিত হওয়ায় ওখানে স্বাদু এবং নোনা জলের মাছ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হচ্ছে। মৎস্য-সংরক্ষণের ব্যাপারে তাঁরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, বরফের মধ্যে Sodium benzoate, Sodium phenate অথবা Sodium hypochlorite ব্যবহার করলে মাছে জীবাণু বংশবিস্তার করতে পারে না সত্য, কিন্তু মাছের গুণাগুণের কিছু পরিবর্তন ঘটে। আবার দেখা গেছে, ১% Sodium nitrite ($NaNO_2$) এবং ১% Sodium chloride (NaCl) জলের দ্রবণ জমিয়ে বরফ করে সেই বরফে স্বাদু জলের মাছ রাখলে ৯৬ ঘণ্টা পর্যন্ত ভাল থাকে।

মানবদেহে জীবাণুর বংশবিস্তার রোধ এবং জীবাণু ধ্বংসে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রশংসনীয় কাজ সম্বন্ধে আমরা অবগত আছি, কিন্তু বর্তমানে অ্যান্টিবায়োটিকের কার্য-পরিধি বিস্তার লাভ করেছে। গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, খাদ্যবস্তু সংরক্ষণে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে দীর্ঘ দিনের জন্যে সংরক্ষণ করা যায়। অরিওমাইসিন, টেরামাইসিন এবং পেনিসিলিনের সাহায্যে মৎস্য-সংরক্ষণ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, Aureomycin বা Chlortetracycline (CTC) মৎস্য-সংরক্ষণে সবচেয়ে কার্যকরী

অ্যান্টিবায়োটিক। দেখা গেছে, অরিওমাইসিন-বরফ ব্যবহার করলে ৭-৮ দিনের (১৬৮-১৯২ ঘণ্টা) বেশী সময় পর্যন্ত মাছ টাট্‌কা রাখা যায়। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের সবচেয়ে সুবিধা হলো, অতি লঘু দ্রবণেও এর কার্যক্ষমতা প্রবল থাকে এবং বহু প্রকারের জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। যেটুকু CTC মাছের শরীরে প্রবেশ করে, তা সাধারণ রন্ধন-পদ্ধতিতে নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষের শরীরে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া হয় না। CTC ব্যবহারে মাছের স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ এবং খাদ্যমূল্য অপরিবর্তিত থাকে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই পদ্ধতিতে খরচ বেশী হয় না। CTC-এর ব্যবহার-প্রণালী তিন রকম ভাবে ভাগ করা হয়েছে ; যথা—

১। ১০০-২০০ ভাগ প্রতি মিলিয়ন কিউবিক সেন্টিমিটার জলে দ্রবীভূত করে মাছের স্তরে স্তরে স্প্রে করা যায়,

২। ১০-১০০ ভাগ প্রতি মিলিয়ন কিউবিক সেন্টিমিটার জলের দ্রবণের মধ্যে মাছ ডুবিয়ে রাখা যায়,

৩। ১-৫ ভাগ প্রতি মিলিয়ন কিউবিক সেন্টিমিটার জলের দ্রবণকে জমিয়ে বরফ করে তার মধ্যে রাখা যায়।

এই তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে শেষ দুটিই কার্যতঃ ব্যবহার করবার সুবিধা। ঠাণ্ডা ঘরে মাছ রাখবার সুযোগ-সুবিধা আমাদের দেশের অধিকাংশ জেলেই পায় না। তারা উপরে লিখিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে মাছ টাট্‌কা রাখতে সক্ষম হবে।

বায়ুশূন্য টিনে মৎস্য সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু প্রথমতঃ, এই প্রক্রিয়ায় খরচ বেশী এবং দ্বিতীয়তঃ, টাট্‌কা মাছ যেখানে পাওয়া যায়, সেখানকার বাজারে এর চাহিদা বেশী হবে না। তাছাড়া বাঙালীরা টিনজাত মাছ খেতে অভ্যস্ত নয়। তবে বাংলা দেশের বাইরে এবং বিদেশে টিনজাত মাছের চাহিদা আছে।

দেশ যে হারে শিল্পোন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে লোকবসতি বাড়ছে, কলকারখানা বাড়ছে, কিন্তু মাছের চাষোপযোগী জলাধারের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বাঙালীদের অন্যতম প্রধান খাদ্য যখন মাছ, তখন মাছের চাষ এবং সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা রাজ্যসরকারের কর্তব্য। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যদিও সরকারের এদিকে নজর ছিল, কিন্তু বংশপরম্পরায় যারা মৎস্য-চাষ বা মৎস্য-আহরণ থেকে জীবিকানির্বাহ করতো, তাদের সঙ্গে সরকারের সুষ্ঠু যোগাযোগ ছিল না। ফলে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। সরকারী মৎস্য বিভাগ যদি সমবায় প্রথায় মৎস্য-চাষে উৎসাহ প্রদান করে, অভিজ্ঞ মৎস্যজীবীদের সৎপরামর্শ গ্রহণ করে, মৎস্যজীবীদের মধ্যে দ্রুত মৎস্য সম্পর্কিত শিক্ষা বিস্তার করে এবং সুষ্ঠু মৎস্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে, তাহলে বাজারে মাছের আমদানী যে বাড়বে, তাতে সন্দেহ নেই। সংরক্ষণ-ব্যবস্থার একটা কুফল আছে। সংরক্ষণের ফলে করে অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে না পারে, সে দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। সংরক্ষিত মাছ খাওয়া যে স্বাস্থ্য-সম্মত এবং এই মাছের খাদ্যমূল্য যে কিছুমাত্র টাট্‌কা মাছের চেয়ে কম নয়, সে সম্বন্ধে জনসাধারণকে প্রচার-ব্যবস্থার মারফৎ বুঝিয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সমগ্র মৎস্য-পরিকল্পনাটি যদি পরিচালিত করা যায়, তাহলে আমাদের মৎস্য-সমস্যা যে দুরীভূত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমাদের নক্ষত্র-জগৎ

সুখেন্দু সোম

মেঘমুক্ত নির্মল কালো আকাশের গায়ে আবছা আলোর প্রশস্ত রেখার সে ঘোলাটে সাদা রঙের পথ এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে প্রায় বৃত্তাকার পথে বেষ্টনীর মত আমাদের ঘিরে আছে, তাকেই বলা হয় ছায়াপথ বা Milky way। মানুষ যেদিন প্রথম এই পৃথিবীর বুকে এলো, সেদিন থেকে সে ছায়াপথের অপরূপ সৌন্দর্যে ও নিগূঢ় রহস্যে যেমনি হয়েছে মুগ্ধ, তেমনি হয়েছে বিস্মিত এবং আজও সমভাবে হচ্ছে। প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে মিশরীয়েরা মনে করতো, এই ছায়াপথ আসলে একটা বিরাট নদী, যার এপারে পৃথিবী আর ওপারে স্বর্গ। মৃত্যুর পর এই নদী পেরিয়ে নাকি স্বর্গলোকে যেতে হয়। এর বহু শতাব্দী পরে গ্রীকেরা একে পৃথিবীর ছায়া বলে অনুমান করতো। রাত্রিবেলায় নাকি সূর্য পৃথিবীর অপর পারে ডুবে গিয়ে পৃথিবীর ছায়া আকাশে ফেলে। এরপর কত যুগ গড়িয়ে গেল। কিন্তু মানুষের খালি চোখে ছায়াপথ ধরা দিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনাতে ইটালীর আকাশ-বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪—১৬৪২) যেদিন প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন, সেদিন থেকেই আকাশের চেহারা বদ্‌লাতে সুরু করলো। দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে ছায়াপথের দিকে চেয়ে মর্ত্যের মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখলো যে, দূর-দূরান্তের লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি বিন্দু বিন্দু তারার সমবেত আলোর প্রতিফলনে এই ছায়াপথের সৃষ্টি। বহু দূরের শ্যামল বনানী—শুধু চোখে যাকে মনে হয় দিগন্তে সবুজের আলপনা, তাই বাইনোকুলারে ধরা দেয় বিরাট বিরাট বৃক্ষরূপে। ঠিক তেমনি করেই যে ছায়াপথকে এমনিতে মনে হয় সাদা ঘোলাটে রঙের মেঘ, সেখানে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ফুটে ওঠে অজস্র তারার দল। শুধু তাই-ই নয়, শক্তিশালী আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর গ্যাস, ধূলিকণাসহ বহু নীহারিকার সন্ধানও পাওয়া গেছে এই ছায়াপথে।

আমাদের এই ছায়াপথ উত্তর ক্রস অথবা হংসপুচ্ছ (Cygnus), সিফিয়ুস, ক্যাসিওপিয়া, পার্সিয়ুস, প্রজাপতি মণ্ডলের (Auriga) ভিতর দিয়ে বৃষ রাশির (Taurus) বৃষের শৃঙ্গে পৌঁছে সেখানে উত্তর অয়নান্তের (Summer solstice) নিকটে রবিমার্গের (Ecliptic) সঙ্গে ৬০° কোণ উৎপন্ন করে কালপুরুষ (Orion) ও মিথুন রাশির (Gemini) মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে ঘুরে গিয়ে মনোসিরস, আর্গো ও দক্ষিণ ক্রস অতিক্রম করে সেণ্টোরাস মণ্ডলের পাদদেশে এসে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। উজ্জ্বল শাখাটি আরা, বৃশ্চিক রাশি (Scorpio), ধনু রাশি (Sagittarius) ও ঈগল মণ্ডলের (Aquila) মধ্য দিয়ে, আর অপরটি অর্থাৎ অনুজ্জ্বল শাখাটি ওপিয়াকাস মণ্ডলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে উভয় শাখাই হংসপুচ্ছ মণ্ডলে এসে মিলিত হয়েছে। ছায়াপথ সিফিয়ুস মণ্ডলে উত্তর মেরুর এবং দক্ষিণ ক্রসে দক্ষিণ মেরুর সর্বাধিক নিকটে এই পথের ঔজ্জ্বল্য ও প্রশস্ততা সর্বত্র সমান নয়। কালপুরুস ও ছোট কুকুর মণ্ডলের (Canis Minor) মধ্যবর্তী স্থানে এর প্রশস্ততা ৪৫°; আবার কোন কোন অঞ্চলে এই প্রশস্ততা কমে গিয়ে মাত্র ৩° কিংবা ৪°-তে দাঁড়িয়েছে। ঊর্ধ্বে তাকালে যে আকাশ ভরা

নক্ষত্র দেখি, তাদের অধিকাংশ নিয়েই আমাদের গ্যালাক্সী অর্থাৎ নক্ষত্র-জগৎ। এই জগতের নিরক্ষবৃত্ত (Galactic Equator) হলো ছায়াপথের মাঝখানের বৃত্তাকার রেখাটি, যা স্বর্গীয় নিরক্ষবৃত্তের (Celestial Equator) সঙ্গে ৬২° কোণ উৎপন্ন করে একবার ঈগল মণ্ডলে আর একবার মনোসিরস মণ্ডলে তাকে (স্বর্গীয় নিরক্ষবৃত্তকে) ছেদ করেছে। ছায়াপথের, তথা আমাদের নক্ষত্র-জগতের উত্তর মেরু, চিত্রা নক্ষত্রের (Spica) উত্তর দিকে এবং স্বাতী নক্ষত্রের (Arcturus) পশ্চিমে কমা বেরোনিস (Coma Berenices) মণ্ডলে অবস্থিত। যেহেতু ছায়াপথ আমাদের চারদিক ঘিরে আছে, তাই আমাদের, তথা সৌরজগতের অবস্থান ছায়াপথে অর্থাৎ নক্ষত্র-জগতের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সমতলে। আমরা লক্ষ্য করেছি, আকাশের গায়ে সর্বত্র তারার সংখ্যা সমান নয়। ছায়াপথের দিকেই তাদের ভীড় বেশী। কাগজ-কলমে হিসাব করে দেখা গেছে, ছায়াপথের সমতলে অথবা তার অতি নিকটে প্রতি বর্গ ডিগ্রীতে তারার সংখ্যা ৯০০, কিন্তু এই সমতল থেকে ৩০°, ৬০°, ৯০° দূরে সরে এলে প্রতি বর্গ ডিগ্রীর এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে এসে যথাক্রমে ২১০, ১২০ ও ৮৫-তে দাঁড়ায়। ক্যালিফোর্ণিয়ার মাউন্ট প্যালোমারের বীক্ষণাগারে পৃথিবীর বৃহত্তম ২০০ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট দূরপাল্লার দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এযাবৎ ছায়াপথে ১০¹¹ অর্থাৎ দশ হাজার কোটি তারার সন্ধান পাওয়া গেছে। উজ্জ্বল তারা অপেক্ষা ক্ষীণপ্রভ তারার অবস্থান অনেক অনেক দূরে। ছায়াপথে কিন্তু দূরের ক্ষীণ আলোকের তারার সংখ্যাই বেশী। এই সব দেখে শুনে নানা গবেষণার পর জ্যোতির্বিদেরা স্থির করলেন যে, আমাদের জগৎ এই ছায়াপথের দিকেই বিস্তৃত ও প্রসারিত এবং একই পথের বরাবর বিস্তৃতি ও প্রসারণের ফলে এই জগৎ ক্রমাগত চ্যাপ্টা হতে হতে বিরাটকায় ডবল কনভেক্স লেন্সের আকার ধারণ করেছে, যার নিরক্ষীয় অঞ্চল হলো আমাদের ছায়াপথ, এক লক্ষ আলোক-বর্ষ ব্যাসবিশিষ্ট নিরক্ষবৃত্ত, যা ছায়াপথের ঠিক মধ্যরেখা—তাই আমাদের জগতের বৃহত্তম বৃত্ত। আর এর এক ষষ্ঠমাংশ হলো নিরক্ষবৃত্তের আড়াআড়ি (Perpendicular) অবস্থিত নক্ষত্র-জগতের হ্রানতম বৃত্তের অর্থাৎ মেরুবৃত্তের (Polar circle) * ব্যাস। নিরক্ষবৃত্ত ও মেরুবৃত্তের ব্যাসের ছেদবিন্দুই হলো ছায়াপথ, তথা নক্ষত্র-জগতের কেন্দ্র।

এই বিশাল তারকা-জগতের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ছায়াপথের সমতলে দাঁড়িয়ে আমরা একে লক্ষ্য করছি। এই পথ আমরা সর্বত্র সমান উজ্জ্বল দেখি না। কালপুরুষ, প্রজাপতি ও পার্সিয়ুস মণ্ডল অপেক্ষা হংসপুচ্ছ ও ঈগল মণ্ডলে এই পথ উজ্জ্বলতর হয়ে ধনু রাশিতে উজ্জ্বলতম। এতে প্রমাণিত হলো যে, ধনু রাশির দিকেই দূরদূরান্তের তারকাদের ভীড় সর্বাধিক এবং এই হেতু ছায়াপথের অর্থাৎ জগতের কেন্দ্র আমাদের, তথা সৌরজগৎ থেকে অনেক দূরে ধনু রাশির দিকে সরে গেছে। যদি ছায়াপথকে আকাশের সর্বত্র সমান উজ্জ্বল দেখতে পেতাম, তবে নিঃসন্দেহে বলা যেত, আমরা তার কেন্দ্রেই আছি। বস্তুতঃ এই কেন্দ্র থেকে আমাদের, তথা সৌরজগতের অবস্থান কিঞ্চিদধিক ২৬,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে।

নক্ষত্র-জগতের নিরক্ষবৃত্ত ও স্বর্গীয় নিরক্ষবৃত্তের ছেদবিন্দুর রাইট-অ্যাসেনসন ২৮০° এবং ডেক্লিনেশন O°। কোন নক্ষত্রের ভিতর দিয়ে অঙ্কিত জাগতিক নিরক্ষবৃত্তের সেকেণ্ডারীর যতটুকু অংশ নক্ষত্র ও নিরক্ষবৃত্তের ভিতর

---

* নক্ষত্র-জগতের উত্তর মেরু কমা বোরেনিস মণ্ডলে এবং দক্ষিণ মেরু ম্যাগেলঙ্কি মেঘের কাছাকাছি। এই উত্তর মেরুর ভিতর দিয়ে যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, তাই মেরুবৃত্ত।

কর্তিত হলো ততটুকু হলো উক্ত নক্ষত্রের জাগতিক অক্ষাংশ এবং তার দ্রাঘিমা হলো উপরিউক্ত ছেদবিন্দু ও সেকেণ্ডারীর পাদবিন্দুর অন্তর্বর্তী জাগতিক নিরক্ষবৃত্তের অংশটুকু, এই মাপণীর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জগতের কেন্দ্রের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা দাঁড়ালো যথাক্রমে ১½° ও ৩২৮°।

আমাদের তারকারাজির বর্ণালীর স্থান পরিবর্তনে ডপ্‌লার সূত্র * প্রয়োগ করে মেরু রেখার চতুর্দিকে জগতের আবর্তন প্রমাণিত হয়েছে এবং এই আবর্তনের ফলেই আমাদের পৃথিবীর মত নক্ষত্র-জগৎ মেরু অঞ্চলে চ্যাপ্টা হয়ে নিরক্ষীয় অঞ্চলে বেড়ে গেছে। আরও দেখা গেছে, পৃথিবীর ন্যায় এরও কেন্দ্রীয় অঞ্চলের গতিবেগ সবচেয়ে বেশী এবং মেরু প্রদেশের দিকে তা ক্রমশঃ কমে গেছে। সূর্য, যার অবস্থান হলো আমাদের জগতের বহিঃসীমা ও কেন্দ্রের প্রায় মাঝামাঝি, তা প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০ মাইল বেগে ২০০ কোটি বছরে একবার কেন্দ্র পরিক্রমা করে আসে। বর্তমানে সূর্যের গতি হচ্ছে হংসপুচ্ছ মণ্ডলের দিকে। আমাদের সৌরজগৎ ও নক্ষত্র-জগতের কেন্দ্রের মাঝামাঝি জায়গায় যে সব নক্ষত্র রয়েছে, তাদের গতি সূর্যের চেয়ে অনেক বেশী। তারা ১২০ কোটি বছরে একবার কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে।

এবার তারকাগুচ্ছের (Star cluster) কথায় আসা যাক। হাজার হাজার ক্ষীণ আলোর তারা স্বল্প পরিসর জায়গায় জটলা বেঁধে একটা গুচ্ছের সৃষ্টি করে। গুচ্ছের ভিতরকার সব তারাগুলির গতিবেগ একই রকম এবং একই দিকে, যার ফলে নিজেদের আপেক্ষিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না। তাবার গুচ্ছ আবার দুই প্রকার:—(১) মুক্ত গুচ্ছ (Open cluster) ও (২) গোলাকার গুচ্ছ (Globular cluster)। শেষোক্ত গুচ্ছের তারাগুলি দলে দলে কেন্দ্রের চারধারে ভীড় জমিয়ে অনেকটা গোলাকৃতি ধারণ করে। কিন্তু মুক্ত গুচ্ছের তারাগুলিকে কেন্দ্রের চতুর্দিকে একই রকম ভীড় করতে দেখা যায় না। এদের বেশীর ভাগই ছায়াপথের কাছাকাছি দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় ৪০০ মুক্ত গুচ্ছের খবর আমরা পেয়েছি। এদের ভিতরে সবচেয়ে উজ্জ্বল বৃষ রাশিতে অবস্থিত কৃত্তিকা বা সাতবোন (Pleiads)। এছাড়া পার্সিয়ুস মণ্ডলে যুগলগুচ্ছ, কর্কট রাশিতে প্রিসিপা পুঞ্জ—যদিও এই সব মুক্ত গুচ্ছের আলো খুবই ক্ষীণ, তবুও খালি চোখে এদের দেখা যায়। এরপর গোলাকৃতি গুচ্ছ। এযাবৎ এই জাতীয় প্রায় ১০০ গুচ্ছের সন্ধান পাওয়া গেছে। অধিকাংশ গুচ্ছে তারার সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। এই সব তারা সাধারণতঃ পপুলেশন-২ গোত্রীয়, যার অধিকাংশ তারাই বিরাট ও লাল রঙের। ছায়াপথের ভিতরে ও খুব কাছাকাছি এই ধরণের গুচ্ছের সমাবেশ অধিক। এদের ব্যাস সাধারণতঃ গড়ে ২০০ আলোক-বর্ষ। এদের ভিতরে সিফিয়ড তারার (অর্থাৎ যে সব তারার ঔজ্জ্বল্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাড়ে বা কমে) সন্ধান পাওয়া গেছে। এই জাতীয় কোন দূরত্ব জানা তারার সময়ের অন্তর ও ঔজ্জ্বল্যের লেখচিত্র অঙ্কন করা হয়। পরে এই ধরণের কোন তারার দূরত্ব বের করতে হলে তার ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সময় এই লেখচিত্র প্রয়োগ করে তার যথার্থ ঔজ্জ্বল্য নির্ণয় করা হয় এবং এই ঔজ্জ্বল্য থেকে আলোর 'বিপরীত বর্গ' (ইনভার্স স্কোয়ার) সূত্র অনুযায়ী তারার দূরত্ব সহজেই হিসাব করা যায়। মাউন্ট

* আবর্তন-পথে কোন নক্ষত্র যদি আমাদের দিকে ধাবিত হয়, তবে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে বর্ণালীর নীল রঙের দিকে তার বর্ণরেখা বা বর্ণরেখাগুলির স্থান পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু যদি উক্ত নক্ষত্র দূরে সরে যায়, তবে এই স্থান পরিবর্তন ঘটে উল্টা দিকে অর্থাৎ বর্ণালীর লাল রঙের দিকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই স্থান পরিবর্তনের মান নক্ষত্রের গতিবেগের সমানুপাতিক।

উইলসন বীক্ষণাগারে খ্যাতনামা তরুণ জ্যোতির্বিদ হার্লো শ্যাপ্‌লে এই ভাবে ২৫টি গোলাকৃতি তারকা-গুচ্ছের দূরত্ব নির্ণয় করেছেন। এই জাতীয় সর্বোৎকৃষ্ট গুচ্ছ হলো মেসিয়ার তালিকার এম-১৩, যা হারকিউলিস মণ্ডলে ৩০,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত। আমাদের নিকটতম গোলাকৃতি গুচ্ছদ্বয় হলো প্রায় ২২,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে সেণ্টোরাস ও টুউকনা মণ্ডলে। যদিও আমাদের তারকা-জগতের কেন্দ্রীয় সমতলের উভয় পার্শ্বে প্রায় সমসংখ্যক গোলাকৃতি গুচ্ছ সুসমঞ্জসভাবে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু আমরা এদের দেখতে পাই স্বর্গীয় গোলকের এক অর্ধাংশে। এর কারণ এই যে, আমাদের অবস্থান জগতের কেন্দ্রে নয়। শ্যাপ্‌লে আরও লক্ষ্য করলেন যে, এই সব গুচ্ছগুলি দল বেঁধে ধনু রাশির দিকে ভীড় করেছে, যা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, গোলাকৃতি তারকাগুচ্ছের কেন্দ্র ধনু রাশির দিকে। আরও পর্যবেক্ষণের পর প্রমাণিত হলো, এই সব গুচ্ছের অবস্থান একটা বিরাট গোলকের উপর, যার ব্যাস জাগতিক নিরক্ষবৃত্তের ব্যাস অপেক্ষাও বড় এবং যার কেন্দ্র হলো আমাদের জগতের কেন্দ্র।

যদিও নক্ষত্রের সংখ্যা প্রচুর, তবুও তারা আমাদের জগতের মাত্র সামান্য জায়গাই অধিকার করে আছে। অধিকাংশ ফাঁকা স্থানই পূরণ করে রয়েছে মহাজাগতিক গ্যাস ও ধূলিকণার দল। বহু দূরের তারার আলো ধূলিকণার অজস্র স্তর পেরিয়ে আসবার পথে এই সব কণার দ্বারা আলোক বিচ্ছুরণের ফলে ক্রমশঃ লালচে ও অস্পষ্ট হয়ে যায়। সূর্যকে দিগন্তে লাল দেখায় এজন্যেই। দূর-দূরান্তের তারাগুলির এই অস্ফুট লাল আভা মহাশূন্যে ধূলিকণার অস্তিত্বই প্রমাণ করে। গ্যাস সমূহ আলো শোষণ করে। মহাজাগতিক গ্যাসের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ও শোষিত হয়ে দূরের তারার আলোর যে অংশটুকু বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে এসে পৌঁছায়, তাতে দেখা যায় যে, এই গ্যাসে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন রয়েছে এবং তৎসঙ্গে আছে কিছু কিছু হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন ও অপেক্ষাকৃত ভারী গ্যাস, যেমন—অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। কিন্তু এই গ্যাসের সন্নিকটে যদি প্রচণ্ড তেজে জ্বলন্ত কোন তারা থাকে, তবে তার আলোর 'ফ্লোরেসেন্স' প্রথায় এই গ্যাস জ্বলে ওঠে এবং উজ্জ্বল সাদা মেঘের আকার ধারণ করে, যাকে আমরা বলি উজ্জ্বল নীহারিকা (Bright Nebula)। কালপুরুষের কটিবন্ধে ঝুলানো তরোবারিতে ১৬২৫ আলোক-বর্ষ দূরে এই জাতীয় বিরাটকায় ২৬ আলোক-বর্ষ ব্যাসবিশিষ্ট এক উজ্জ্বল ও মনোরম নীহারিকার সাক্ষাৎ মিলেছে। কিন্তু যদি কাছাকাছি এইরূপ কোন শক্তিশালী তারা না থাকে, তবে এই গ্যাস জ্বলতে পারে না, অধিকন্তু পিছনের বহু দূরের ক্ষীণ, দুর্বল তারাগুলির আলো গ্যাস কর্তৃক শোষিত ও ধূলিকণা কর্তৃক বিচ্ছুরিত হয়ে একেবারে অস্পষ্ট অন্ধকার হয়ে কালো নীহারিকার (Dark Nebula বা Coal Sack) সৃষ্টি করে। এই সব কালো নীহারিকার অবস্থিতির ফলে ছায়াপথের কোথাও কোথাও বেশ অন্ধকার লক্ষ্য করা যায়। ঠিক এই কারণেই ফটোগ্রাফের একই প্লেটের এক অংশে সাদা সাদা বিন্দুর মত প্রচুর তারার ছবি দেখা যায় অথচ অপর অংশ দেখায় সম্পূর্ণ অন্ধকার। মনে হয়, কে যেন এই অংশে আকাশের গায়ে কালো পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। এই পর্দা আর কিছুই নয়, ঐ কালো নীহারিকার কারসাজি। হংসপুচ্ছ থেকে বৃশ্চিক রাশির ভিতরে ছায়াপথকে দুটি সমান্তরাল অংশে ভাগ করে দিয়েছে এই কালো নীহারিকা। এছাড়া অন্যত্রও এদের সন্ধান পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে কালপুরুষের অশ্বমুণ্ড বা হর্সহেড ও হংসপুচ্ছ মণ্ডলে ডেনের নক্ষত্রের কাছের নীহারিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মহাজাগতিক গ্যাস এত সূক্ষ্ম ও পাত্‌লা অবস্থায় রয়েছে যে, তার ঘনত্ব বাতাসের ঘনত্বের কোটি ভাগের এক কোটি ভাগ এবং এই কারণেই যদিও তা আমাদের বিরাট নক্ষত্র-জগতের অধিকাংশ জায়গা দখল করে আছে, তবুও তার ভর (Mass) নিতান্তই কম। হিসাব করে দেখা গেছে, সূর্যের ভরের ৭০ বিলিয়ন গুণ বড়— আমাদের জগতের যে ভর, তার ৯৪% হলো নক্ষত্রের। আর বাকী ৬% ভর শুধু মাত্র গ্যাসের হতে পারে না—কেন না, তার ঘনত্ব অত্যন্ত কম। এই কারণে গ্যাসের সঙ্গে ধূলিকণার অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়েছে। তাছাড়াও এহেন অসম্ভব রকম পাত্‌লা গ্যাস নিজে আলোর পথে উল্লেখযোগ্য বাধার সৃষ্টি করতে অক্ষম, যদি ধূলিকণার সহযোগিতা না থাকে।

এছাড়াও আমাদের নক্ষত্র-জগতে আর এক শ্রেণীর গ্রহ-নীহারিকার (Planetary Nebula) সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের দেখতে অনেকটা ইউরেনাস কিংবা নেপচুনের মত। এদের কেন্দ্রে সাধারণতঃ খুব উত্তপ্ত ও জ্বলন্ত তারা থাকে, (৫০,০০০°—১০০,০০০° পরম উত্তাপ) যার আলোয় এই জাতীয় নীহারিকার গ্যাস ক্ষীণ সবুজ আভা বিকিরণ করে। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে এই সবুজ রং নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এই গ্যাস সাধারণতঃ অক্সিজেন-প্রধান। বীণা মণ্ডলে (Lyra) বলয় (Ring), সপ্তর্ষি মণ্ডলে (Ursa Major), পেঁচক (Owl) নীহারিকা প্রভৃতি এর দর্শনীয় দৃষ্টান্ত।

এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, আমাদের জগতের গড়ন কিরূপ? কিন্তু মুস্কিল এই যে, আমাদের জগতের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে নিরক্ষবৃত্তের সমতলে অর্থাৎ ছায়াপথে আমাদের বাস। তাই তার প্রকৃত স্বরূপ আমরা দেখতে পাই না—অনেকটা যেন মঞ্চে নাট্যানুষ্ঠানের মত। যাঁরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছেন, তাঁরা জানেন না, কোন্ দৃশ্যটি কেমন হলো, নাটকটি রসোত্তীর্ণ হলো কি না। এই সব বিষয়ে যদি খোঁজখবর করতে হয়, তবে তা নিতে হবে মঞ্চের বাইরে গ্যালারীতে বসা দর্শকদের কাছ থেকে। ঠিক তেমনি করেই আমাদের জগতের স্বরূপ জানতে হলে তাকাতে হবে বাইরে, বহির্নক্ষত্র-জগতের প্রতি। বাস্তবিকই বহির্জগতের পাঠ ও পঠনের দ্বারা আমাদের জগতের গড়নের কিছুটা আভাস ও ইঙ্গিত লাভ করা গেছে। খালি চোখে এই জাতীয় মাত্র তিনটি দেখতে পাই। সবচেয়ে কাছে হলো দক্ষিণ গোলার্ধের দুটি অনিয়মিত আকারের ম্যাগেলনিক মেঘ, যাদের অবস্থান ছায়াপথ থেকে বেশ দূরে দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি। এদের আবিষ্কারক হলেন একজন পর্তুগীজ নাবিক, ফার্ডিনাণ্ড ম্যাগেলেন। এদের বিশেষ কোন আকার নেই; দূর থেকে মনে হয় যেন সাদা সাদা ঘোলাটে ধূসর বর্ণের আলোর টুক্‌রা টুক্‌রা খণ্ড। এদের ভিতরে হাজার হাজার ক্ষীণ তারা, নীহারিকা, তারকাগুচ্ছ, হাইড্রোজেন গ্যাস ও ধূলিকণার সন্ধান পাওয়া গেছে। বৃহত্তম ম্যাগেলনিক মেঘ ১৪০,০০০আলোক-বর্ষ দূরে ডোরাডো মণ্ডলে অবস্থিত এবং এর ব্যাস হলো ৩০,০০০ আলোক-বর্ষ। আর অপরটি অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম ম্যাগলনিক মেঘের অবস্থান টিউকণা মণ্ডলে। এর দূরত্ব ও ব্যাস যথাক্রমে ১৭,৫০০ ও ২০,০০০ আলোক-বর্ষ। এই দুটি প্রচুর পপুলেশন—১ ও কিছু সংখ্যক পপুলেশন—২ গোত্রীয় তারার সমবায়ে গঠিত। এরা উপগ্রহের মত আমাদের নক্ষত্র-জগতের চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে, যদিও তাদের ঘূর্ণনের ভিতর সে রকম কোন সামঞ্জস্য (Symmetry) নেই। তা ছাড়া আরও বহু দূরে স্ক্রুর প্যাঁচের মত আকারের বেশ কুণ্ডলীর মত (Spiral) কিছু সংখ্যক জগতের সন্ধান পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে আমাদের নিকটতম হলো অ্যাণ্ড্রোমিডা মণ্ডলের

জগৎ এম-৩১, যার দূরত্ব হলো পনেরো লক্ষ আলোক-বর্ষ এবং আকারে যা আমাদের জগতের দ্বিগুণ। এর সঙ্গে আমাদের জগতের অনেক মিল আছে। নির্মল কালো আকাশের গায়ে এম-৩১-কে খালি চোখে অস্পষ্ট সাদা আলোর প্যাঁচের মত মনে হলেও বীক্ষণাগারে দূরপাল্লার দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ও শক্তিশালী বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গেছে, এই জগতের কেন্দ্রীয় অঞ্চল ধূলিকণা বিমুক্ত ও পপুলেশন-২ গোত্রীয় তারায় সমৃদ্ধ। এর তারার বিরাট সমাবেশ দেখা যায় কোন জগতের বাহুতে, তবে তা কুণ্ডলীর মত আকারের হবেই। সৌভাগ্যক্রমে বা যে কারণেই হোক, আমাদের জগতের বাহুতে, যেমন কালপুরুষ ও করিণা মণ্ডলে বিরাট বিরাট নীলাভ তারা (পপুলেশন-১) এবং প্রচুর পরিমাণে গ্যাস ও ধূলিকণার সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই আমাদের জগৎও অ্যাণ্ড্রো-মিডা জগতের মত যুগল প্যাঁচানো বাহুবিশিষ্ট। শুধু তাই নয়, অ্যাণ্ড্রোমিডা জগতের মত আমাদের
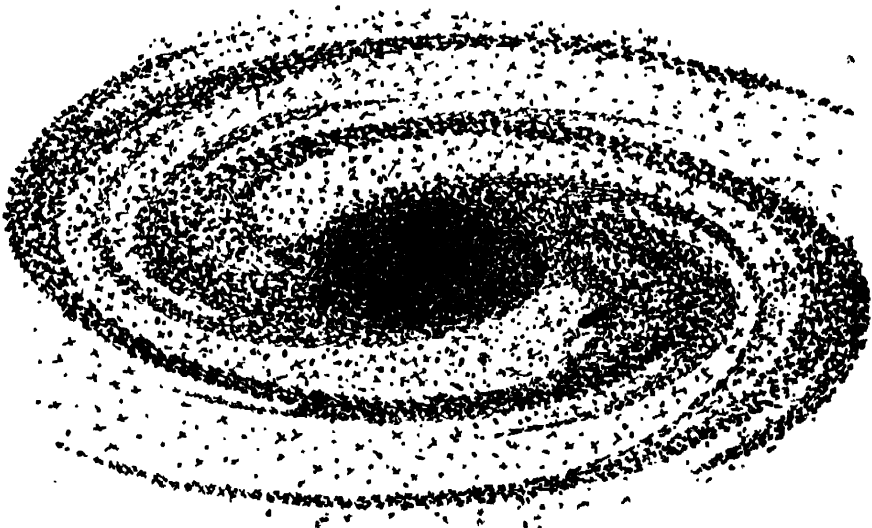
১নং চিত্র

× পপুলেশন-১ • পপুলেশন-২

গোলাকার কেন্দ্রের বিপরীত প্রান্ত থেকে দুটি দীর্ঘ প্যাঁচানো বাহু নির্গত হয়ে প্রায় চক্রাকার পথে ঘুরে গেছে। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এর প্যাঁচানো বাহুদ্বয়ে পপুলেশন-১ গোত্রীয় অজস্র নীলাভ তারা, সিফিয়ড তারা ও সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মহাজাগতিক গ্যাস ও ধূলিকণা রয়েছে। আরও অনেক কুণ্ডলীর মত নক্ষত্র-জগৎ নিয়ে নানা গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আকাশ-বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, প্রচুর পরিমাণে গ্যাস ও ধূলিকণাসহ যদি পপুলেশন-১ গোত্রীয় জগতেরও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে প্রচুর পপুলেশন-২ গোত্রীয় তারার ভীড় দেখা গেছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটু কথা বলা যেতে পারে—কেন্দ্রকের গড়ন দু-রকমের হতে পারে। স্বাভাবিক কুণ্ডলীর মত (Normal spiral) নক্ষত্র-জগতের কেন্দ্রক হবে প্রায় গোলাকার, যার ব্যাসের দুই প্রান্ত থেকে প্যাঁচানো বাহু নির্গত হয়; যেমন—এম-৩১ ও আমাদের জগৎ। আবার আর এক প্রকার আছে, যাদের বলা হয় শলাকা কুণ্ডলীর মত (Barred spiral) জগৎ। এদের শলাকাকৃতি কেন্দ্রকের

দুই প্রান্তদেশ থেকে প্যাঁচানো বাহু বেরিয়ে আসে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই শেষোক্ত শ্রেণীর জগৎ সমগ্র কুণ্ডলীর মত জগতের ৩০%। নিউ জেনারেল ক্যাটালগ অনুসারে এন. জি. সি.—১৩০০ এই জাতীয় জগতের দৃষ্টান্ত। অতি সাম্প্রতিক কালে আমাদের নক্ষত্র-জগতের আরও কিছু প্যাঁচানো বাহুর সন্ধান পাওয়া গেছে। সে কথা পরে বলছি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, নক্ষত্র-জগৎ তার এই প্যাঁচানো বাহুগুলি কোথা থেকে এবং কি ভাবে পেল? অবশ্য এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আজও মেলে নি। আমরা জানি, গ্যাসের কণায় কণায় একটা আঠালো বা লেগে থাকা ভাব (Viscosity) দেখা যায়, যা ধূলিকণায় সাধারণতঃ থাকে না। একটা বিশেষ ক্রিটিক্যাল গতির পরেই গ্যাসকণাসমূহ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে
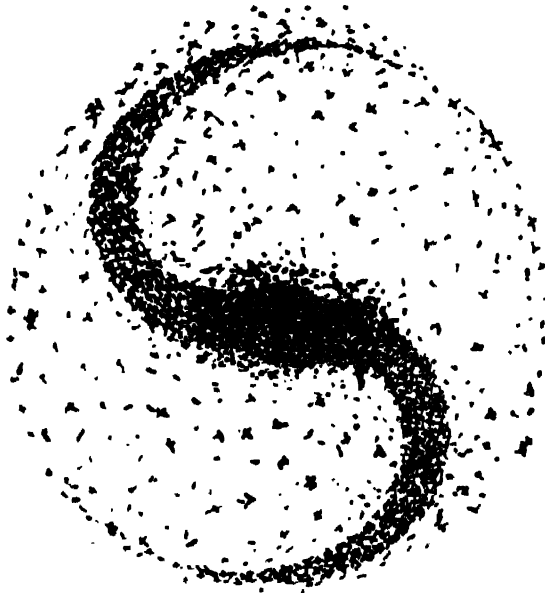
২নং চিত্র

বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে আমাদের জগতের প্যাঁচানো গড়নের সত্যতা আরও জোরদার হয়েছে। মহাজাগতিক গ্যাস যে হাইড্রোজেন-প্রধান এবং তা যে ২১ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ বিকিরণ করে, তা বেতার যন্ত্রে ধরা পড়েছে এবং এই হাইড্রোজেন তরঙ্গের বর্ণরেখার স্থানচ্যুতিতে ডপ্‌লার সূত্র প্রয়োগ করে দেখা গেছে, তারকা-জগতের প্যাঁচানো বাহুগুলি বিভিন্ন গতি নিয়ে বিভিন্ন চক্রাকার পথে সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রের চতুর্দিকে আবর্তিত হচ্ছে।

ওঠে এবং লেগে-থাকা ভাবের জন্যে এই উত্তেজনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে গ্যাসের ভিতর প্রচণ্ড ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। এই ঘূর্ণিতাড়িত মহাজাগতিক ধূলিকণা দলে দলে তার প্রবাহ-পথে জমা হতে হতে যে পথ চিহ্নিত করে দেয়, তাই হলো জগতের প্যাঁচানো বাহু। অতি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞেরা 'চৌম্বক জল-গতিবিদ্যা' (ম্যাগ্‌নেটো হাইড্রোডায়নামিক্স) তত্ত্ব পরিবেশন করে মহাশূন্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। তাঁরা অনুমান করেন যে, নক্ষত্র-জগৎ

হলো একটা বিরাটকায় বৈদ্যুতিক চুম্বক, যেখানে উত্তেজিত ঘূর্ণায়মান গ্যাসের ভিতর অবিরাম ধারায় ইলেকট্রন-প্রবাহ বইছে। এই বৈদ্যুতিক চৌম্বক শক্তি শুধু জগতের বাহু-ই সৃষ্টি করে নি, তারকা এবং তারকাগুচ্ছও সৃষ্টি করেছে। জগতের ঘূর্ণায়মান গতির ফলে তার বাহুসমূহে যে কেন্দ্রাতিগ বলের (Centrifugal force) উদ্ভব ঘটে, সাধারণতঃ তার সমতা রক্ষা করে চলে ভিতরকার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এই সব ভেবে নিউটনের সূত্র প্রয়োগ করে কাগজ-কলমে হিসাব করে আমাদের জগতের ভর নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। আমরা পূর্বেই বলেছি এর ভর সূর্যের ভর অপেক্ষা ১০ বিলিয়ন গুণ বেশী।

বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র আকাশের বুক চিরে দূর-দূরান্তের খবর আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। এই যন্ত্রে আমাদের জগৎ আরও বেশী করে ধরা দিয়েছে। আজ জানতে পেরেছি যে, এর গোলাকার কেন্দ্রকের ব্যাস ২০,০০০ আলোক-বর্ষ এবং সেখানে রয়েছে হাইড্রোজেন গ্যাস দারুণ উত্তেজিত অবস্থায়। এরপর কেন্দ্র থেকে ১৫,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে আমাদের জগতের প্রথম প্যাঁচানো বাহু; তারপরে ২১,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে দ্বিতীয় বাহু ধনু রাশিতে অবস্থিত এবং ২৭,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে তৃতীয় বাহু কালপুরুষ মণ্ডলে অবস্থিত, যার প্রায় অন্তঃসীমায় (Inner edge) আমাদের, তথা সৌরজগতের অবস্থান। এর পরেও পার্সিয়ুস মণ্ডলে ৩৫,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে গোলাকার প্রায় বিরাট প্যাঁচানো এক বাহুর সাক্ষাৎ মিলেছে এবং সব শেষে ৪০,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে অতিক্ষীণ কিন্তু একটু বেশী করে হেলানো (Highly inclined) এক বাহুর বেতার-সঙ্কেত পাওয়া গেছে বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে। খুব সম্ভব এই আমাদের জগতের শেষ সীমা।

আমরা এযাবৎ অনিয়মিত জগৎ, যথা—ম্যাগেলনিক মেঘ এবং কুণ্ডলীর মত জগৎ, যথা—এম-৩১-র কথা আলোচনা করেছি। এছাড়া আরও এক প্রকারের অর্থাৎ উপবৃত্তাকার (Elliptical) জগৎ আছে। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি কুণ্ডলীর মত জগৎ পপুলেশন-১ ও পপুলেশন-২। অতএব কুণ্ডলীর মত জগৎ থেকে যদি ১ নম্বরের তারাগুলি সরিয়ে নেওয়া যায়, তবে তা উপবৃত্তাকারে পরিণত হবে এবং যদি শুধু ২ নম্বরের তারাগুলিকে সরানো হয়, তবে তা অনিয়মিত আকার ধারণ করবে। যতগুলি নক্ষত্র-জগতের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের ২% হলো উপবৃত্তাকারের। ২%-৩% হলো অনিয়মিত আকারের এবং বাকী অংশের বেশীর ভাগই হলো কুণ্ডলীকৃতির। পপুলেশন-১ এর উজ্জ্বল নীলাভ সাদা তারা পপুলেশন-২-এর উজ্জ্বল তারার তুলনায় অধিকতর নব্য ও তরুণ। যেহেতু ঘূর্ণায়মান জগতের প্রচণ্ড গতিবেগ ১০০ কোটি বছরের কম সময়ে তার বাহুগুলি বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম, সেহেতু জগতের বয়স ১০০ কোটি বছরের বেশী হতে পারে না, অর্থাৎ প্রাচীন নয়। এই সব কারণে জ্যোতির্বিজ্ঞেরা অনুমান করেন যে, তরুণ অনিয়মিত আকৃতির জগৎ থেকে মাঝারি বয়স্ক কুণ্ডলীর মত জগৎ এবং এই কুণ্ডলীর মত জগৎ থেকে প্রৌঢ় অর্থাৎ উপবৃত্তাকার জগতের ক্রমপরিবর্তন (Evolution) যুগ যুগ ধরে চলেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে যে, পরিবর্তনের প্রথম ধাপে বৃহত্তর ম্যাগেলনিক মেঘে পপুলেশন-১ এবং সাম্প্রতিক কালে লাল আভাযুক্ত কিছু কিছু পপুলেশন-২ তারার ক্রমোৎপত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যার ফলে অনিয়মিত নক্ষত্র-জগতে কুণ্ডলীর মত জগতের সাড়া পড়ে গেছে।

আমাদের জগৎ একটা বিরাট বিশ্বের অন্তর্গত, যাকে বলতে পারি স্থানীয় ব্রহ্মাণ্ড (Local group)। এই ব্রহ্মাণ্ডে অন্যূন ১৭টি জগৎ উপবৃত্তাকারে সজ্জিত। এই উপবৃত্তের বৃহত্তম

ব্যাস হলো ২ কোটি আলোক-বর্ষ এবং এই ব্যাসের এক প্রান্তের কাছে আমাদের জগৎ আর অপর প্রান্তের কাছে অ্যাণ্ড্রোমিডা জগতের এম-৩১। স্থানীয় ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জগৎসমূহের নিজেদের ভিতর একটা যোগসূত্র রয়েছে এবং তারা সামগ্রিকভাবে আমাদের জগতের কেন্দ্রের চতুর্দিকে অবিরাম আবর্তিত হচ্ছে। নিম্নলিখিত জগৎ স্থানীয় ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত।

আকৃতি	নাম	দূরত্ব (আঃ বঃ)	ব্যাস (আঃ বঃ)
কুণ্ডলীর আকৃতি	ছায়াপথ (আমাদের জগৎ)	০	—
,,	অ্যাণ্ড্রোমিডা (এম-৩১)	১৫,০০০০০	৮৫,০০০
,,	ট্রাইয়্যানগুলাম (এম-৩৩)	১৫,৫০০০০	৩০,০০০
অনিয়মিত আকৃতি	বড় ম্যাগেলনিক মেঘ	১,৪০০০০	৩০,০০০
,,	ছোট ,, ,,	১,৭৫০০০	২০,০০০
,,	এন. জি. সি—৬ ৮২২	১০,০০০০০	৬,০০০
,,	ইণ্ডেক্স ক্যাটালগে আই. সি. ১৬১৩	১৪,০০০০০	৯,০০০
,,	উল্‌ফ্‌ লুণ্ডমার্ক	৫,০০০০০	৬,০০০
উপবৃত্তাকার	অ্যাণ্ড্রোমিডা মণ্ডলে, এম-৩২	১৫,০০০০০	৫০,০০০
,,	অ্যাণ্ড্রোমিডা মণ্ডলে এন. জি. সি-২০৫	১৫,০০০০০	৯,০০০
,,	এন. জি. সি.-১৮৫	১৩,০০০০০	৫,৫০০
,,	এন, জি. সি-১৪৭	১৩,০০০০০	৫,৫০০

তারকাগুচ্ছের মত জগৎগুচ্ছেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের ভিতরে আমাদের নিকটতম হলো, কন্যা রাশিতে (Virgo) অবস্থিত জগতের এক বিরাট গুচ্ছ, যার দূরত্ব ১৪ কোটি আলোক-বর্ষ।

এযাবৎ আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে এটুকু বলা যেতে পারে যে, আমাদের নক্ষত্র-জগৎসহ ১০০,০০০,০০০ সংখ্যক জগৎ নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গঠিত, যার ভিতরে আমাদের এই সৌরজগৎ শুধুমাত্র একটি বিন্দুর মত। এক একটা জগৎ যেন শূন্যে অবস্থিত অন্তঃবিহীন মহাসাগরের বক্ষে একটা ঝলমলে দ্বীপ (Island of star)। এইরূপ দুটি পর পর নক্ষত্র-জগতের ভিতরের দূরত্ব তাদের যে কোন একটির ব্যাসের ৮ থেকে ১০ গুণ। এরূপ ১০০,০০০,০০০ নক্ষত্র-জগৎ। সত্যই যতই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, ততই এর সীমা বেড়ে যায়। জ্ঞান আহরণের শেষ নেই এবং বোধ হয় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও শেষ নেই। যদিও জীন্‌সের (১৮৭৭-১৯৪৬) ভাষায়—আমরা কোটি কোটি ভাগের ক্ষুদ্র এক ভাগ বালুকণার উপর দাঁড়িয়ে অসীম আকাশকে জানতে দুঃসাহসী হয়েছি এবং হয়তো জেনেছিও অনেক, তবু এখনও এই নিষ্ঠুর ও উদাসীন ব্রহ্মাণ্ডের ৯৯%-এরও বেশী আমাদের কাছে অজানা। তাই মনে পড়ে সর্বদেশের সর্বযুগের পণ্ডিত সম্রাট গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের (৪৬৩-৩৯৯ খৃঃ পূঃ) কথা—"I know that I know nothing."

রেডিও-টেলিফোন

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

টেলিফোনে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে কথা বলতে হলে প্রয়োজন—দুটি টেলিফোন সেট, দুটি ব্যাটারী এবং কথা বলবার মাধ্যম হিসেবে একজোড়া তার। একই শহরের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক টেলিফোন হলে এরকম ব্যবস্থা চলতে পারে, কিন্তু এক শহর থেকে অন্য শহরে টেলিফোনে কথা বলতে হলে বেশ কয়েকটি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, দূরত্বের দরুণ তামার তারের মূল্য হয় অত্যধিক, মাঝে মাঝে বাড়িয়ে দিয়ে দূরত্ব কিছুটা বাড়ানো গেল, কিন্তু একসঙ্গে একজোড়া মানুষের বেশী একজোড়া তারের মধ্য দিয়ে কথা বলতে পারতো না। কাজেই ট্রাঙ্ক কল পেতে অনেক দেরী হতো। এরপর এলো ১+১ ক্যারিয়ার ব্যবস্থা।

এখন দেখা যাক বিষয়টা কি? আমরা যখন কথা বলি, তখন বাতাসে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়, যা টেলিফোনের প্রেরক-যন্ত্রের মধ্যস্থিত একটা পাত্‌লা চাক্‌তি বা ডায়া-
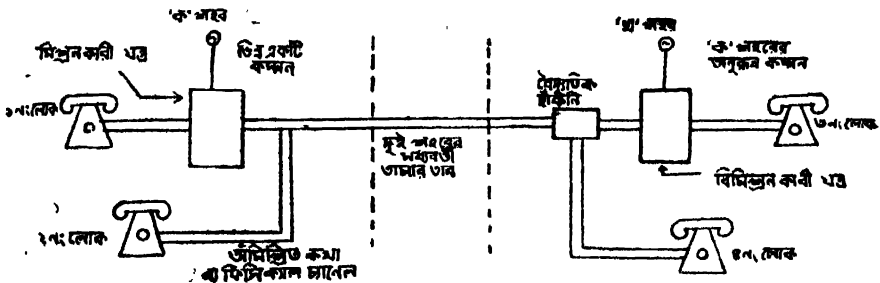
১নং চিত্র
১+১ ক্যারিয়ার যন্ত্রের প্রাথমিক চিত্র।

নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে একটা বিরাট খরচ বহন করতে হয়, একসঙ্গে দুই প্রান্তে কেবলমাত্র একই জোড়া লোক একজোড়া তারের মধ্য দিয়ে কথা বলতে পারে এবং দূরত্ব খুব বেশী হলে হয়তো শেষ অবধি কথা অপর প্রান্তে নাও শোনা যেতে পারে। আমরা এখানে কেবল দূরপাল্লার ট্রাঙ্ক টেলিফোন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

দূরপাল্লার টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নতির প্রথম পর্বে 'ভয়েস ফ্রিকোয়েন্সি রিপিটার' ব্যবহার করা হতো। এতে কমে যাওয়া কথার শক্তিকে ফ্রামে কম্পনের সৃষ্টি করে। এই কম্পন বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের মাধ্যমে তার বা অপর কোনও মাধ্যমের ভিতর দিয়ে অপর প্রান্তে পৌঁছে যায় এবং সেখানে আবার টেলিফোনের গ্রাহক-যন্ত্রে এক প্রকার কম্পনের সৃষ্টি করে, যা বাতাসে সঞ্চালিত হয়ে আমাদের কানে কথার রূপ নেয়। এই তরঙ্গের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে টেলিফোনের এই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক (ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাণ্ড) হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে

৩০০ সাইকল থেকে ৩৪০০ সাইক্‌ল্ বা ৩·৪ কিলোসাইকল। এই কম্পাঙ্ককে 'ভয়েস ফ্রিকোয়েন্সি' বলা হয়।

১+১ ক্যারিয়ার ব্যবস্থায় ভয়েস ফ্রিকোয়েন্সিকে সোজাসুজি তারের মধ্য দিয়ে পাঠানো যেতে পারে অর্থাৎ পুরনো ব্যবস্থার মতই একজোড়া তারের মাধ্যমে এক শহরের এক জন লোক দূরবর্তী শহরের আর এক জনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারে, উপরন্তু অপর দুজনের কথা অর্থাৎ আর একটি ভয়েস ফ্রিকোয়েন্সিকে অপর একটি ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে মিশ্রিত করে সেই একই তারের মধ্য দিয়ে একটি ভয়েস ফ্রিকোয়েন্সি ও একটি সাইড ব্যাণ্ড হিসেবে অপর প্রান্তে পাঠানো যায়। এই ব্যবস্থায় কমে-যাওয়া শব্দের শক্তিকে বিভিন্ন রিপিটারে বাড়ানো যায় এবং একটি ভয়েস ফ্রিকোয়েন্সিকে অপর ভয়েস ফ্রিকোয়েন্সি থেকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ছাঁকনি (ইলেকট্রিক্যাল ওয়েভ ফিল্টার) দিয়ে আলাদা করে নির্দিষ্ট মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। ১নং চিত্র থেকে এই বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

একজন মানুষের কথাকে অন্য একটি ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে মিশ্রিত করে এই যে সাইড ব্যাণ্ড পাওয়া গেল—যেহেতু একজোড়া তারের উপর এটা একটা অতিরিক্ত পথ, যাতে আরও দুজন মানুষ কথা বলতে পারে, সেহেতু এই অতিরিক্ত পথকে চ্যানেল বলা হয়। ক্যারিয়ার যন্ত্রের ক্রমবিকাশের ফলে আমরা পর্যায়ক্রমে ১+৩, ১+৮, ১+১২ ইত্যাদি বিভিন্ন যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হই। একটু বিশদভাবে বললে—একজোড়া তারের উপর সেই পূর্বতন একজোড়া মানুষ তো কথা বলতে পারেই, উপরন্তু বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি মিশিয়ে ওয়েভ-ফিল্টার দিয়ে আলাদা করে এবং তারপর বিমিশ্রিত করে একই সঙ্গে ষোল জোড়া মানুষকে দিয়ে কথা বলানো সম্ভব হয়েছে।

২নং চিত্র
কো-অ্যাক্সিয়াল কেব্‌ল।

এর পরের ধাপে ব্যবহৃত হয় কেব্‌ল। ট্র্যান্সমিশন কেব্‌ল বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি, একটি মাত্র আচ্ছাদনের মধ্যে অনেকগুলি সরু সরু তার, যারা একে অন্যের উপর পরস্পর পৃথক (Insulated) অবস্থায় থাকে। এই কেব্‌ল মাটির নীচে বিশেষভাবে প্রোথিত করে প্রায় ৪৮০ জোড়া মানুষ একসঙ্গে ট্রাঙ্ক কলে কথা বলতে পারে। তারপরে আধুনিক দূরভাষণ ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করা করা হয় কো-অ্যাক্সিয়াল কেব্‌ল ও মাইক্রো-ওয়েভ রেডিও যন্ত্রের উদ্ভাবনের দ্বারা। কো-অ্যাক্সিয়াল কেব্‌ল সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে

বলা যায় যে, এই বিশেষ ধরণের কেব্‌ল একটি আভ্যন্তরীণ তামার তড়িৎ-পরিবাহীকে ঘিরে অপর একটি তামার তড়িৎ-পরিবাহীর দ্বারা গঠিত। এই দুই তড়িৎ-পরিবাহীর মধ্যে ফাঁকা অংশ দিয়ে অতি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিযুক্ত সাইড ব্যাণ্ড পাঠানো যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে লম্বা নলের মত (২নং চিত্র) দুই তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের মধ্যেকার অংশ দিয়ে উচ্চ কম্পনযুক্ত বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রায় নয় শত ষাটটি চ্যানেল পাওয়া যায় বা নয় শত ষাট জোড়া লোক এক সঙ্গে কথা বলতে পারে।

বর্তমানে একটিমাত্র আচ্ছাদনের মধ্যে এই রকম দুই বা ততোধিক কো-অ্যাক্সিয়াল কেব্‌ল স্থাপন করা হয়ে থাকে এবং এর সাহায্যে একই সময়ে দুটি দূরবর্তী শহরের মধ্যে হাজার হাজার লোক কথা বলতে পারে ও ততোধিক টেলিপ্রিন্টার কাজ করতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একজন মানুষের কথা বলবার জন্যে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ককে ভেঙ্গে চব্বিশটি টেলিপ্রিন্টার যন্ত্রে একই সঙ্গে দুটি স্থানের মধ্যে খবরাখবর আদান-প্রদান করা যায়।

ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আধুনিকতম অবদান হিসেবে মাইক্রো-ওয়েভ যন্ত্রের নাম করা যেতে পারে।

ওয়্যারলেস বা বেতার ব্যবস্থার সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত, যেমন—রেডিও ব্রডকাষ্টিং ব্যবস্থা, বিমান, জাহাজ, পুলিশ বেতার ব্যবস্থা এবং সেনাবিভাগের বেতার ব্যবস্থা। এরা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্রা (Short wave band), মধ্য তরঙ্গ মাত্রা (Medium wave band), কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতি উচ্চ কম্পাঙ্ক মাত্রা (Very high frequency band) ব্যবহার করে থাকে। এদের প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্যে আলাদা কম্পাঙ্ক মাত্রা নির্দিষ্ট থাকে। তাছাড়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই এরা সমস্ত দিকে তরঙ্গ ক্ষেপণ করে থাকে। এতে প্রেরণ-শক্তি (আউটপুট পাওয়ার) যথেষ্ট পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। এখন দেখা যাক, মাইক্রো-ওয়েভ বা সূক্ষ্ম তরঙ্গ বলতে কি বোঝায়। যে তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (Wave length) ত্রিশ সেণ্টিমিটার বা তার চেয়ে কম, [তুলনীয়—শর্টওয়েভের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ১৩, ১১, ৩০ মিটার ইত্যাদি] তাকেই আমরা মাইক্রোওয়েভ বলতে পারি। মাইক্রো-ওয়েভের কম্পাঙ্ক মাত্রা প্রতি সেকেণ্ডে ১ হাজার মেগাসাইকল বা তদূর্ধ্ব। এই উচ্চ কম্পাঙ্ক মাত্রাবিশিষ্ট বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এই যে, এই তরঙ্গ অনেকটা আলোক-তরঙ্গের মত প্রতিফলন, প্রতিসরণ, এবং সরল রেখায় ভ্রমণ প্রভৃতি ধর্ম মেনে চলে।

দুটি স্থানের মধ্যে প্যারাবোলিক অ্যাণ্টেনার (প্যারাবোলার মত দেখতে যে এরিয়াল) সাহায্যে সরাসরি (লাইন অফ সাইট) তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয় বলে প্রেরণ-শক্তি (আউটপুট পাওয়ার) খুব কম হলেও চলে—প্রায় পাঁচ ওয়াট; [তুলনীয়: রেডিও ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশনে এই প্রেরণ-শক্তি প্রায় কয়েক লক্ষ ওয়াট]। কম্পাঙ্ক অত্যধিক উচ্চ বলে সাধারণ ব্রডকাষ্টিং ব্যবস্থা, পুলিশ, বিমান বা জাহাজের বেতার ব্যবস্থায় কোনও বিঘ্ন ঘটায় না। পাহাড়-পর্বত বা জঙ্গলাকীর্ণ পথে দিবারাত্র যোগাযোগ রক্ষা করায় এটি খুবই সহায়ক।

এই ব্যবস্থাকে 'ব্রডব্যাণ্ড সিষ্টেম' বলা হয় এবং প্রায় ১২০০ লোক দূরবর্তী শহরে একসঙ্গে কথা বলতে পারে। প্রয়োজন হলে আন্তঃ-শহর টেলিভিশন প্রচারের ব্যবস্থা করা সম্ভব। অর্ধপরিবাহী পদার্থের অধুনা আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির (যেমন—ট্র্যানজিস্টর, সিলিকন ডায়োড, ভ্যারে-

ষ্টর ডায়োড, জেনার ডায়োড ইত্যাদি) ব্যবহারের দ্বারা বিদ্যুতের জন্যে ব্যয় অত্যন্ত কম পড়ে। পৃথিবীপৃষ্ঠের বক্রতা, আকাশপথের অবাঞ্ছিত শব্দ ও তরঙ্গ ম্লান হবার দরুণ যে সব অসুবিধা আছে, অল্পবিস্তর ৫০ কিলোমিটার দূরে দূরে তরঙ্গের কমে-যাওয়া শক্তিকে পুনরায় বাড়িয়ে সেই অসুবিধাগুলি দূর করবার জন্যে 'রিপিটার ষ্টেশন' স্থাপন করা হয়ে থাকে। এই সমস্ত রিপিটারের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কোনও লোক রাখবার প্রয়োজন হয় না। সেই সব রিপিটারের কোন যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণকারী ষ্টেশনের (কন্টোলিং

পাওয়া যায়। সুপার-গ্রুপের কম্পন বিস্তার হয় ৩১২ কিলো সাইকল থেকে ৫৫২ কিলো সাইকল। ২০টি সুপার-গ্রুপকে নিয়ে যে কম্পন মাত্রা পাওয়া যায়, তার বিস্তার হলো ৬০ কিলোসাইকল থেকে ৫.৬ মেগাসাইকল। এই বিস্তারকে বেস ব্যাণ্ড বলা হয়। এই বেস ব্যাণ্ডকে নিয়ে ৭০ মেগাসাইকলের সঙ্গে কম্পণ মিশ্রণ (ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেশন) করা হয়ে থাকে এবং একে মাধ্যমিক কম্পন (ইণ্টারমিডিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি) বলা হয়। অতঃপর মাধ্যমিক কম্পন মাত্রাকে সূক্ষ্ম তরঙ্গ অসিলেটর নির্গত অত্যধিক কম্পনের সঙ্গে
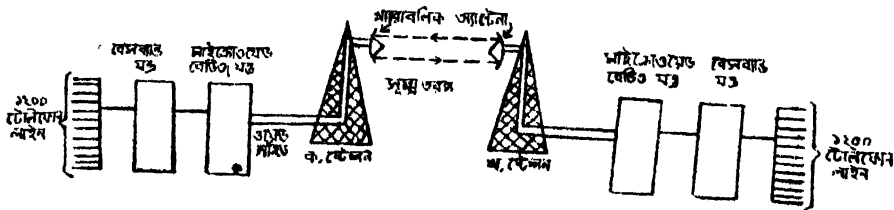
৩নং চিত্র

মাইক্রো-ওয়েভ রেডিও যন্ত্র ও অ্যান্টেনা সম্বন্ধীয় চিত্র

ষ্টেশন) স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে তা ধরা পড়ে এবং সেখান থেকে লোক গিয়ে তা সারাবার ব্যবস্থা করে।

এই যে আধুনিক মাইক্রো-ওয়েভ রেডিও-টেলিফোন, এর সম্বন্ধে আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ বারোটি করে চ্যানেল অর্থাৎ বারো জন মানুষের কথা প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা কম্পনের সঙ্গে বৈদ্যুতিক প্রথায় মিশ্রণের পর যে সাইড ব্যাণ্ড পাওয়া যায়, তার মাত্রা হলো ৬০ কিলোসাইকল থেকে ১০৮ কিলোসাইকল। একে গ্রুপ বলা হয়। এই রকম প্রতি পাঁচটি গ্রুপকে নিয়ে আবার বিভিন্ন কম্পনের সঙ্গে মিশিয়ে সুপার-গ্রুপ

মিশ্রিত করবার পর মাইক্রো-ওয়েভ তরঙ্গ পাওয়া যায়। মাইক্রো-ওয়েভ তরঙ্গ সাধারণ তারের মধ্য দিয়ে পরিচালন করা অসম্ভব। সুতরাং ওয়েভগাইড বা তরঙ্গ-পরিচালক নামে এক প্রকার ধাতব নলের সাহায্যে প্যারাবোলিক অ্যান্টেনায় (প্যারাবোলার আকৃতিবিশিষ্ট এরিয়ালে) পৌঁছে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ঐ তরঙ্গকে আকাশপথে পরবর্তী রিপিটার ষ্টেশনের দিকে নির্দেশ করে পরিচালিত করা হয়ে থাকে। রিসিভিং ষ্টেশন বা গ্রাহক-কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমে ঠিক এর বিপরীত ব্যবস্থা অবলম্বন করে প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠ তার উদ্দিষ্ট টেলিফোনে পৌঁছে দেওয়া হয় (৩নং চিত্র)। মাইক্রো-ওয়েভ ব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো ঃ

(ক) অল্প ব্যয়ে অধিক সংখ্যক লোকের এক সঙ্গে কথা বলতে পারবার সুবিধা,

(খ) আকাশ-পথকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার পার্বত্য ও দুর্গম পথে যোগাযোগ রক্ষায় বিশেষ সুবিধা,

(গ) তামার তার বা কেব্‌ল চুরির দরুণ সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধনের পথ বন্ধ,

(ঘ) একসঙ্গে দুটি রেডিও সিষ্টেম কাজ করাবার জন্যে ট্রাঙ্ক লাইনে বাধা (ইন্‌টারাপশন) না ঘটা,

(ঙ) এক শহর থেকে অন্য শহরে ডায়ালের সাহায্যে (লোকাল টেলিফোনের মত) সরাসরি লাইন পাওয়া (সাবস্ক্রাইবার্‌স্ ট্রাঙ্ক-ডায়ালিং),

(চ) প্রয়োজনবোধে আন্তঃশহর টেলিভিশন ব্যবস্থা প্রচারে সহায়তা করা।

আধুনিক টেলস্টার যোগাযোগ ব্যবস্থার ভারতও অন্যতম শরিক। অতএব সেই ব্যবস্থা চালু হবার পর এই মাইক্রো-ওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সাফল্যজনকভাবে কাজে লাগানো যাবে বলে আশা করা যায়।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সাধারণ বুদ্ধির অভাব

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

খাদ্যসঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আজ ২০ বৎসর ধরিয়া কর্তৃপক্ষ কত রকমের যে প্ল্যান, পরিকল্পনা, স্কীম ইত্যাদি প্রস্তুত করিলেন, তাহার হিসাব বা তালিকা দেওয়া কঠিন। সরকারী তহবিল হইতে কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় বা অপব্যয় করা হইল, তাহার হিসাবও সাধারণের জানিবার উপায় নাই, অথচ এই সরকারী তহবিলটি দেশের সাধারণ লোকই না খাইয়া, রোগের চিকিৎসা না করিয়া, ঔষধ-পথ্য না খাইয়া এবং আরও কত কিছু না করিয়া গড়িয়া তোলে। সর্বোপরি দেশের সাধারণ লোকদের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কত বক্তৃতা, কত বিবৃতি, কত ভাষণ, কত উপদেশ, কত মহৎ কথা শুনিতে হইয়াছে ও হইতেছে, তাহারও ধারাবাহিক হিসাব বা তালিকা দেওয়া দুরূহ। কেবল কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়—"অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা, নিশিদিন ধরে এ কী ছেলেখেলা।"

কলিকাতার কাশীমবাজার মহারাজার পলিটেকনিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ক্যাপ্টেন জে. ডব্লিউ. পেটাভ্যাল কোন বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই সরকারের সাধারণ বুদ্ধির অভাব দেখা যায়। তখন ইংরেজ সরকার ছিল। খুব সম্ভব তাঁহার উক্ত মন্তব্য অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমান দেশীয় সরকারের প্রতি অধিকতর পরিমাণে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

খাদ্য-সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার প্রধান সহায় হইতেছে কৃষক, কিন্তু এযাবৎ কৃষির উন্নতি বা খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে যত পরিকল্পনা, প্ল্যান, স্কীম প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তাহাদের মধ্যে কৃষকের স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহা যেন ঠিক গাড়ী চালাইবার জন্য ঘোড়ার সামনে গাড়ীকে রাখা। প্রথম কথা হইতেছে, সকল প্রকার খাদ্যশস্যের চাষের জন্য দেশের সকল স্থানের মাটি, জলবায়ু,

জল সেচনের সুবিধা ইত্যাদি সমান নহে; সুতরাং একই রকমের পরিকল্পনা সকল স্থানের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না, কিন্তু সাধারণতঃ বর্তমানে একই পরিকল্পনা সকল স্থানে চালু করিবার চেষ্টা হইতেছে। সেই জন্য প্রথমতঃ দেশকে মোটামুটি সমান মাটি, সমান জলবায়ু, সমান জল সেচনের সুবিধা ইত্যাদি অনুসারে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া লইতে হইবে। পরে বিভিন্ন ভাগের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ কৃষকদের সহিত পরামর্শ করিয়া বিভিন্ন ভাগের বিভিন্ন কৃষির উন্নতি এবং খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রত্যেক ভাগের কৃষকদের জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—তাহাদের কিসের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী অর্থাৎ তাহাদের বীজের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী, না সারের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী, জল সেচনের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী, না গরু-বলদের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী, কৃষি-যন্ত্রাদির প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী, না অর্থের অর্থাৎ ঋণের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী। তাহাদের প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দিতে হইবে এবং সেই প্রয়োজন উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে মিটাইতে হইবে। ঋতু শেষ হইয়া গেল—তখন সরবরাহ আসিল, যাহা বর্তমানে সাধারণতঃ হইয়া থাকে। ইহার আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ কথা এই যে, প্রত্যেক ভাগের পরিকল্পনা এইরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে, তাহা যেন স্থানীয় কৃষকদের আয়ত্তের মধ্যে কার্যকরী করা যায়। এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের অর্থনৈতিক অবস্থাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইবে। বীজই কৃষির ভিত্তি। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে কৃষি বিভাগের তদানীন্তন আধিকারিক মিষ্টার রবার্ট এস. ফিনলো বলিতেন, স্থানীয় কৃষি কার্যের কোন রকম পদ্ধতির পরিবর্তন না করিয়া এবং অতিরিক্ত বিশেষ কিছু খরচ না করিয়া কৃষকেরা যদি দেখেন যে, কেবলমাত্র স্থানীয় বীজের পরিবর্তে দেশের মধ্যেই উন্নত উপায়ে উদ্ভাবিত বীজ ব্যবহার করিয়া তাঁহারা বিঘা প্রতি এক মণ অর্থাৎ একর প্রতি তিন মণ শস্য অধিক উৎপাদন করিতে পারিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা উক্ত উন্নত উপায়ে উদ্ভাবিত বীজ গ্রহণ করিতে বা ব্যবহার করিতে আর ইতস্ততঃ করিবেন না। তাঁহার এই নীতির ফলে ধান, পাট, আক প্রভৃতি অনেক রকমের শস্যের উন্নত বীজ উদ্ভাবিত হইয়াছিল এবং কৃষকগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়াছিল; উদাহরণস্বরূপ ইন্দ্রশাইল আমন ধান, কটকতারা ও সূর্যমুখী আদিম ধান, কোয়েম্বাটুর আক্, কাকিয়া বোম্বাই পাটের নাম করিতে পারি। আরও অনেক শস্যের উন্নত শ্রেণীর বীজের নাম উল্লেখ করিয়া তালিকা বৃদ্ধি করিলাম না। মিষ্টার ফিনলোর এই ধারণা ছিল যে, প্রথমে বীজের উৎকর্ষ হাতে-কলমে কৃষকদের দেখাইতে পারিলে তাঁহারা কৃষি বিভাগের উপর আস্থা স্থাপন করিবেন এবং ক্রমে ক্রমে কৃষি বিভাগের অন্যান্য উন্নত সুপারিস বা পদ্ধতি, যদি তাঁহাদের অর্থনৈতিক সঙ্গতির মধ্যে সম্ভব হয়, তবে অতি সহজেই গ্রহণ করিবেন। বর্তমানে এমন সব নীতি গ্রহণ করা হইতেছে, যাহার সহিত আমাদের কৃষক সম্প্রদায় সম্পূর্ণ অপরিচিত; এমন কি, উহা তাঁহাদের নিকটে বিদেশীয় বলিয়া গণ্য হয়। ইহা ছাড়া এই সকল নীতি বা পরিকল্পনা গ্রহণ কালে আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের রক্ষণশীলতা, নিরক্ষরতা, অর্থনৈতিক সঙ্গতি এবং অন্যান্য বাধা আদৌ বিবেচনা করা হয় না। স্থূল কথা, পরিকল্পনা এইরূপ হইবে, যাহা বর্তমানে কৃষক সম্প্রদায় অতি সহজে গ্রহণ করিতে পারিবেন। অন্য প্রসঙ্গে বলিলেও রবীন্দ্রনাথের উক্তি—"সকল খেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।" কৃষি বিশেষজ্ঞগণ বিশেষতঃ কৃষি

বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ, যাঁহাদের উপর কৃষির উন্নতি ও খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনাসমূহ প্রস্তুতের ভার প্রধানতঃ ন্যস্ত আছে, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি মনে রাখিলে নিজেরা তো প্রাজ্ঞ হইবেনই অধিকন্তু তদ্দ্বারা দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিবেন।

আর একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেছি। কোন কোন অঞ্চল খাদ্য সম্বন্ধে ঘাট্‌তি কি বাড়্‌তি, 'তাহা নির্ণয় করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশকে উপযুক্তভাবে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা দরকার। প্রত্যেক ভাগের অধিবাসীদের পক্ষে উক্ত ভাগের বর্তমান খাদ্য-উৎপাদন ঘাট্‌তি না বাড়্‌তি, তাহা সযত্নে নির্ণয় করিতে হইবে। প্রত্যেক ভাগের আবাদযোগ্য অথচ বর্তমানে অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করিয়া উহাতে উপযুক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উন্নত শ্রেণীর বীজ, সার, জল প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া বর্তমান উৎ-পাদনও বাড়াইতে হইবে এবং অনাবাদী আবাদযোগ্য জমির সংস্কার করিয়া উহাতে উন্নত প্রণালীতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে—সকল পরিকল্পনাই কৃষক সম্প্রদায়ের আয়ত্তের মধ্যে হওয়া চাই। মাছকেও খাদ্যের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। সেই জন্য প্রত্যেক ভাগে যে সকল পরিত্যক্ত হাজা-মজা পুকুর, ডোবা প্রভৃতি আছে, তাহাদের সংস্কার করিয়া মাছের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। ইহার জন্য সহজ সরল আইন প্রণয়ন দরকার। বর্তমান আইন অতি জটিল। বর্তমানে ঘাট্‌তি ও বাড়্‌তি অঞ্চল সম্বন্ধে নির্ভরশীল পরিসংখ্যান আছে কি না, জানি না। উপরিউক্ত ভাবে যত্নপূর্বক সার্ভে বা অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া পরিসংখ্যান প্রস্তুত করিয়াই খাদ্যে ঘাট্‌তি অঞ্চল বা বাড়্‌তি অঞ্চল নির্ণয় করিতে হইবে। উপযুক্ত অভিজ্ঞ কর্মচারীদের উপর এই কার্যের ভার দিতে হইবে। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া হইতেছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে হইবে। সাধারণের ধারণা, দেশে চাউল আছে, তাহা না হইলে কালো বাজারে ৪।৫ টাকা কিলোতে চাউল পাওয়া যায় কেমন করিয়া? নির্ভরশীল পরিসংখ্যানের অভাবে সরকারও ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না; অথচ সরকারের নিজস্ব পরিসংখ্যান বিভাগ আছে এবং ইহা ছাড়া কৃষি বিভাগের পরিসংখ্যান শাখাও রহিয়াছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে উভয় পরিসংখ্যানের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। ইহা একটি বিচিত্র ব্যাপার নয় কি? উভয়ের মধ্যে গরমিলই দেখা যায়।

মন্ত্রী মহোদয়গণের প্রতি কিছুমাত্র অসম্মান প্রকাশ না করিয়া হয়তো একটি অবান্তর কথা বলিতেছি। বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়গণ স্ব স্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞ নহেন, হইতে পারে না, হওয়া সম্ভবও নহে। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের বা পরামর্শদাতাদের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। তাঁহাদের পরামর্শের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাদের স্ব স্ব বিভাগের পলিসি বা কার্যক্রম ঠিক করিতে হইবে। সুতরাং বিভাগীয় বিশেষজ্ঞগণ বা পরামর্শ-দাতাগণ কিরূপ ক্যালিবারের অর্থাৎ কিরূপ কর্মশক্তিসম্পন্ন ও চারিত্রিক বলসম্পন্ন হইবেন, তাহাই প্রধান কথা। এই প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনা বলিতেছি। কোনও জেলার কালেক্টার অ্যাংলোইণ্ডিয়ান ছিলেন, তিনি এই দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছিলেন। প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারের করণিকের কাজে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। তাঁহার কার্যদক্ষতার জন্য তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন এবং বাংলাদেশে প্রেরিত হন। পরে জেলার কালেক্টরের পদে উন্নীত হন; ইহার পরে তিনি বিভাগীয় কমি-

শনারও হইয়াছিলেন। যখন তিনি জেলার কালেক্টর, তখন তাঁহার অফিসের একজন করণিক কোন বিষয়ে তাঁহাকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'মনে রেখো আমিও একজন তোমার মত করণিক ছিলাম, করণিকের চালাকি (ট্রিক্স) আমি জানি।" কয়জন মন্ত্রী তাঁহাদের অধস্তন কর্মচারীগণকে এইরূপ কথা বলিতে পারেন? কয়জন মন্ত্রী তাঁহাদের স্ব স্ব বিভাগ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব কাজের সহিত পরিচিত আছেন?

সঞ্চয়ন

ভারতীয় ম্যাকারেল মাছ

বাণিজ্যের দিক দিয়ে সর্বপ্রধান দুটি মাছের মধ্যে ভারতীয় ম্যাকারেল হচ্ছে একটি, অন্যটি হচ্ছে তেলুক-সার্ডিন মাছ। ম্যাকারেল পশ্চিম ভারতীয় উপকূলের সামুদ্রিক মাছ। গড়পড়তায় গত ১৯৫৮-'৬৫ সালে বছরে ৬৫,৩৪২ টন ম্যাকারেল ধরা পড়ে এবং ১৯৫৮-৬০ সালের মধ্যে মোট ধরা মাছের পরিমাণ ১ লক্ষ টনেরও বেশী দাঁড়ায়। ম্যাকারেল মাছ ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের উত্তরে, ডারবানের উত্তরে আফ্রিকার উপকূল থেকে পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই কারণে ম্যাকারেল মাছ ধরবার সমস্যাগুলি আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর মৎস্য পরিষদের অনুমোদন অনুযায়ী।

শীঘ্রই ম্যাকারেল মাছ এবং তেলুক-সার্ডিন, যেগুলি ভারতের সামুদ্রিক মাছের শতকরা ৩০ ভাগ অধিকার করে আছে, তাদের মৃত্যু, স্থানান্তর গমনের প্রকৃতি এবং প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এই জাতীয় তথ্য সংগ্রহ এই অঞ্চলেই প্রথম। ভারতের উপকূলে ম্যাকারেলের অঞ্চল 'রাষ্টরেলিগার কানাগুরতা' নামক একটি প্রজাতির দ্বারা গঠিত। আরেকটি প্রজাতির (রা. ব্রাকিসোমা) শরীর বেশ চওড়া। এগুলিকে আন্দামানের সমুদ্র অঞ্চলে পাওয়া যায়। ভারতীয় ম্যাকারেল মাছ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশ্চিম উপকূলে ধরা হয় এবং এই অঞ্চল রতনগিরি থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু এই মৎস্য অঞ্চলের বেশীর ভাগ রতনগিরি থেকে কুইলনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। পূর্ব উপকূলের কোন কোন অঞ্চলে—যেমন মাদ্রাজ, কাকিনাড়া, বিশাখাপত্তন এবং উড়িষ্যার নিকটবর্তী কোন কোন অঞ্চলে এগুলিকে অনিয়মিতভাবে পাওয়া যায়। মণ্ডপম অঞ্চলের মাছ ধরবার মরসুম অগ্রহায়ণ-পৌষ থেকে ফাল্গুন-চৈত্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মাঘ মাসেই সবচেয়ে ভাল মাছ ধরা পড়ে।

সবচেয়ে বেশী মাছ ধরবার খবর রতনগিরি বোম্বাই থেকে পোন্নানী (কেরালা) অঞ্চলের মধ্যেই পাওয়া গেছে, কিন্তু পোন্নানী থেকে অন্তরীপ পর্যন্ত মাঝারী থেকে ছোট অতি সামান্য মাছই পাওয়া যায়। মোটামুটি মাছ ধরবার মরসুম শ্রাবণ-ভাদ্র থেকে ফাল্গুন-চৈত্র পর্যন্ত চালু থাকে। কিন্তু ম্যাঙ্গালোর পোন্নীর অঞ্চলে মরসুম আগেই সুরু হয় (ভাদ্র) এবং অনেক দিন পর্যন্ত চলে (শেষ হয় চৈত্রে)। ম্যাঙ্গালোর, রতনগিরি অঞ্চলে এই মরসুম আরও অল্প সময় থাকে। কাড়োয়ার এবং দক্ষিণ কানাড়া উপকূলে দুটি প্রধান উঠ্‌তি মরসুম লক্ষ্য করা যায়—সেটা হচ্ছে মাছ ধরার সুরুতে এবং শেষে।

দক্ষিণ বোম্বাই এবং মহীশূর উপকূলে ম্যাকারেল মাছ ধরবার জন্যে সাধারণ যে জাল ব্যবহার করা হয়, তাকে রামপানি বলাহয়। এটা হচ্ছে উপকূল অঞ্চলের খাড়া জাল, যার মধ্যে ৪০০-৬০০টি টুক্‌রা থাকে এবং শন অথবা তুলার সুতা দিয়ে তৈরি করে জোড়া দিয়ে নেওয়া হয় এবং প্রায় ৮০ জন লোকের সাহায্যে ৫টি ডোঙায় করে ফেলা হয়। পৃথিবীর সমুদ্র-উপকূলের খুব কম খাড়া জালেই এই রকম প্রচুর পরিমাণ মাছ ধরা হয়। রামপানি জালে ভাল মাছ ধরবার মরসুমে একবারে ২০ লক্ষ মাছ ধরাও খুব অসম্ভব নয়। এই জাল ফেলবার একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে, বাড়্‌তি ম্যাকারেল মাছগুলিকে জালে ঘিরে প্রায় ১ সপ্তাহ জিইয়ে রাখা যায়, যাতে পরে সুবিধামত দামে বিক্রয় করা যায়। কান-জাল, যাকে দক্ষিণ ভারতে পোট্টাবালি বলা হয়, তাও ব্যবহার করা হয়। উত্তর কেরালায় মালাবার উপকূলে যে সব জাল সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়, সেগুলি খাড়া জাল, যাদের বলা হয় পাট্টেনকললি, আইলাকললি, পায়থুভালা, কান-জাল এবং আয়েলাচাহালাভালা। এই সবই ডোঙায় করে ফেলা হয়। আরও দক্ষিণে নৌকার খাড়া জাল ডোঙা থেকে ব্যবহার করা হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীর পরবর্তী মাসগুলিতে অধিকাংশ চালানী মাছ ধরা হয়। এগুলির মধ্যে ১৮-২২ সে. মি. লম্বা অল্পবয়সী ম্যাকারেল মাছের সংখ্যাই বেশী থাকে। কিন্তু বর্ষার মাসগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে ৭-৪ সে.মি. দৈর্ঘ্যের অল্পবয়সী থেকে খাড়ী ম্যাকারেল পর্যন্ত নানা রকমের মাছই থাকে। মৌসুমীর শেষের দিকে মাছের ঝাঁক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ২১-২২ সে.মি. দৈর্ঘ্যের বড় মাছের দ্বারা গঠিত হয়।

ম্যাকারেল মাছ সাধারণতঃ জলের উপরিভাগ থেকে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে এবং সেগুলি উদ্ভিদ এবং প্রাণীজ প্ল্যাঙ্কটনের দ্বারা গঠিত। ম্যাকারেল মাছের পরিবেশে পাওয়া প্ল্যাঙ্কটন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, বর্ষার পরের মাসগুলিতে খাড়ির জলের ম্যাকারেল মাছের বিরাট ঝাঁক প্রবেশের কারণ হচ্ছে এই যে, এই সময়ে এই অঞ্চলে প্ল্যাঙ্কটনের প্রাচুর্য থাকে।

পশ্চিম উপকূলে ম্যাকারেল মাছের ডিম ছাড়বার ঋতু দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং চৈত্র-বৈশাখ থেকে ভাদ্র-আশ্বিন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মাছের ডিম ছাড়বার সম্বন্ধে ত্রিবান্দ্রমের নিকটবর্তী ভিজিন গ্রামে পরীক্ষার পর দেখা গেছে যে, এরা দুই বার ডিম ছাড়ে—একবার অগ্রহায়ণ-ফাল্গুনে আর একবার জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণে। মাদ্রাজ উপকূলে উত্তর-পূর্ব মৌসুমীর সময় অথবা পরে এই মাছ ডিম ছাড়ে, চৈত্র মাসে বাচ্চা ম্যাকারেল মাছ পাওয়া গেলেই এটা বোঝা যায়। খুব সম্ভব এই একই সময়ে বিশাখাপত্তম উপকূলে এরা ডিম ছাড়ে এবং লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে, ডিম ছাড়বার মরসুমে এরা দুই বার ডিম ছাড়ে।

যখন এই মাছ প্রায় ১২ সে. মি. লম্বা হয়, তখন এদের স্ত্রী-পুরুষ পার্থক্য বোঝা যায় এবং ২১-২২ সে. মি. লম্বা হলে এরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এরা এক এক ঝাঁকে ডিম ছাড়ে এবং ডিম রাত্রে ছাড়ে বলেই মনে হয়। সম্ভবতঃ ম্যাকরেল মাছ কিছুটা গভীর জলে ডিম ছাড়ে, কিন্তু উপকূল থেকে খুব বেশী দূরে নয়।

ম্যাকরেল মাছের বয়সের বিচারে দেখা গেছে যে, এক বছরের ম্যাকারেলের সাধারণ দৈর্ঘ্য হয় ১২-১৫ সে. মি. এবং দ্বিতীয় বছরে ২১-২৩ সে. মি. পর্যন্ত লম্বা হয়।

ম্যাকারেল মাছ ঝাঁক বেঁধে চলাফেরা করে এবং প্রত্যেকটি ঝাঁকে একই আয়তনের মাছ থাকে। জলের লবণতা এবং উষ্ণতা সবচেয়ে নীচে নামবার পর যখন উপরে উঠতে সুরু করে,

তখন এরা উপকূলের জলের কাছাকাছি আসে। পশ্চিম উপকূলে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, বড় আকারের মাছগুলি ছোটগুলির তুলনায় উচ্চ তাপ এবং লবণতা সহ্য করতে পারে।

ম্যাকারেল মাছের অঞ্চলে তাদের উঠতি-পড়তি অস্থির অবস্থা নীচের তালিকা থেকেই বোঝা যাবে—যেখানে ১৯৫৮-৬৫ সালের মোট বার্ষিক ম্যাকারেল ধরবার পরিমাণ দেওয়া হয়েছে।

১৯৫৮-৬৫ সালে ম্যাকারেল ধরবার পরিমাণ (মেট্রিক টনে)

বছর	ম্যাকারেল	মোট ধরা মাছের তুলনায় ম্যাকারেলের শতকরা পরিমাণ
১৯৫৮	১,২৩,২৮২	১৬·৩১
১৯৫৯	৬২,১১৮	১০·৬৫
১৯৬০	১,৩১,৬৫৫	১৫·২২
১৯৬১	৩৪,৪৮৫	৫·০৪
১৯৬২	২৯,১০৩	৪·৫২
১৯৬৩	৭৬,৯৮০	১১·৭৪
১৯৬৪	২৩,৮৬৩	২·৭৪
১৯৬৫	৩৯,১৬৯	৪·৮০
গড়	৬৫,৩৪২	৮·৯০

এই সময়ের মোট সামুদ্রিক মাছের মধ্যে ম্যাকারেলের পরিমাণ ছিল গড়পড়তা শতকরা ৮·৯০ ভাগ। সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল ১৯৬০ সালে এবং সর্বনিম্ন ১৯৬৪ সালে।

যখন প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা পড়ে, তখন পরিবহন এবং হিমঘরের সুবিধা না থাকায় সামান্য পরিমাণ ম্যাকারেলই টাট্‌কা খাওয়া যায় এবং বাকীটা শুঁট্‌কি করা হয়। অবিক্রীত ম্যাকারেলা উপকূলেই শুকানো হয় এবং নারকেল, কফি এবং চা-বাগিচায় ব্যবহারের জন্যে সার তৈরি করা হয়। শুঁট্‌কি বানাবার সময় মাছের যে সব অংশ ফেলে দেওয়া হয়, সেগুলি শুকিয়ে মাছের গুঁড়া তৈরি করে পশু-পক্ষীর খাদ্যে প্রোটিনের জন্যে ব্যবহার করা হয়।

ম্যাকারেল বড় মাছ না হলেও আকারে এবং স্বাদে প্রায় ইলিশ মাছের মত এবং এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এই যে, এতে ইলিশ মাছের মত মোটেই কাঁটা নেই। অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের মতই এরা এক-কাঁটার মাছ এবং অত্যন্ত নরম। পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ এই মাছকে সাদরে গ্রহণ করবেন, যদি ধারাবাহিক সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়।

হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌

গত ছ-বছর ধরে সামরিক প্রয়োজনে ও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ চলাচল করছে। এই সময়কার অভিজ্ঞতায় মনে হয়, যেখানে মোটর গাড়ী বা উড়োজাহাজ সহজে যেতে পারে না, সেই সব দুর্গম অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের কাছে হোভারক্র্যাফটের মূল্য সর্বাধিক।

এয়ার কুশনের উপর ভর করে চলে বলে হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে চলতে পারে। চলবার জন্যে রাস্তার দরকার নেই। নৌকা চলতে পারে না, এমন অগভীর জলের উপর দিয়েও সে চলতে পারে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে বৃটিশ হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ সার্ভিস চালু রয়েছে, তা ইংলিশ চ্যানেলের অগভীর অঞ্চল গুডউইন স্যাণ্ডস-এর উপর দিয়ে চলাচল করে থাকে। অতীতে এই অঞ্চলে অনেকগুলি জাহাজ ডুবি হয়েছে।

হোভারক্র্যাফটের আরও একটি সুবিধা হলো, তা জাহাজের চেয়ে অনেক সহজে ও কম সময়ে মোড় নিতে পারে। বন্দরের মুখে ও নদীর মোহানায় দুর্ঘটনা এড়াবার পক্ষে এটা একটা বড় সুবিধা। হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ বড় জাহাজ বা ছোট জেলে নৌকাকে অনায়াসে পাশ কাটাতে পারে।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ সার্ভিস পরিচালকেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে মনে করেন, হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ খুবই নির্ভরযোগ্য। ইঞ্জিনগুলি দিনে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা চালিয়ে দেখা গেছে, বিশেষ ক্ষতি হয় না। ইঞ্জিনে যাতে ধুলাবালি ঢুকে কোন ক্ষতি না করতে পারে, সে জন্যে বিশেষ ধরণের ফিল্টারের ব্যবস্থা রয়েছে। হোভারক্র্যাফটের মেরামতের প্রায় প্রয়োজনই হয় না। দুর্গম অঞ্চলের পক্ষে এটা আর এক সুবিধা।

হোভারক্র্যাফটের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো—এয়ার কুশনের জন্যে ব্যবহৃত চাদরের (Skirt) কিনারাগুলি ক্ষয়ে যায়। এজন্যে নতুন উপাদানের চাদর তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে। এই সমস্যা এড়াবার আর এক উপায় হলো স্কার্ট বা চাদরের কিনারায় সরু ফালি দিয়ে 'ফ্রিন্‌জ্‌' তৈরি করা এবং সেগুলি ক্ষয়ে গেলে নতুন ফালি পরিয়ে নেওয়া।

যে সব হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ বর্তমানে চলাচল করছে, তা হলো বৃটিশ হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ কর্পোরেশনের এস-আর-এন-৫ (২০ জন যাত্রী বহন করতে পারে) ও এস-আর-এন-৬ (৩৮ জন যাত্রী বহন করতে পারে)।

খুব খারাপ আবহাওয়াতেও হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ সমুদ্রে চলাচলের উপযোগী। ইংলিশ চ্যানেলে ঢেউয়ের উচ্চতা যখন পাঁচ ফুট, তখনও হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ সেখানে নিয়মিত চলাচল করে।

দক্ষিণ ইংল্যাণ্ড ও আইল অব ওয়াইট-এর মধ্যবর্তী চার মাইল বিস্তৃত জলভাগ সোলেন্ট-এ হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ সার্ভিসের খুব নাম হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে হোভারট্র্যাভেল কোম্পানীর ওয়েষ্টল্যাণ্ড এস-আর-এন-৬ দশ লক্ষ যাত্রী বহন করে। হোভারট্রাভেল একটি স্বাধীন বৃটিশ কোম্পানী, এরা ১৯৬৫ সালের জুলাই থেকে সোলেন্ট-এ হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ চালাচ্ছেন।

হোভারট্রাভেল দাবী করেছেন যে, এঁরা পৃথিবীর অন্যান্য হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ কোম্পানীগুলির সম্মিলিত যাত্রী সংখ্যার চেয়ে বেশী যাত্রী বহন করেছেন।

বোর্ণিও, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডায় পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ খুব বেশী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অনায়াসে ঘরে ফিরে আসতে পারে।

হোলোগ্রাফি বা পূর্ণলেখন

বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

মূল বক্তব্য

হোলোগ্রাফি লেসার রশ্মি দিয়ে তোলা এক অভিনব ফটোগ্রাফি, যাতে কোন ক্যামেরা লাগে না বা লেন্স ব্যবহার করা হয় না। এই পদ্ধতির সাহায্যে কোন বস্তু বা দৃশ্যের চেহারাকে সম্পূর্ণভাবেই পুনরুৎপন্ন করা যায়; অর্থাৎ মূল বস্তু এবং এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন তার প্রতিকৃতির মধ্যে চোখে দেখে কোন তফাৎ বোঝা যায় না। বস্তু এবং তার পাশে রাখা একটি সমতল আয়নার উপর একই লেসার উৎস থেকে যুগপৎ রশ্মি পাত করা হয়। বস্তু এবং আয়না এমন কৌণিক ব্যবধানে থাকে যে, তাদের উভয়ের দেহ থেকে প্রতিফলিত আলো পরস্পরের উপর অধ্যারোপিত (Superposed) হয় এবং তারই ফলে সৃষ্টি করে এক জটিল ব্যতিকরণ আকৃতি (Interference pattern)। একটি ফটোগ্রাফিক ফিল্মের উপর এই আকৃতির ছাপ গ্রহণ করে ডেভেলপ করে নিলে যে প্লেটটি পাওয়া যায়, তারই নাম হোলোগ্রাম। হোলোগ্রামের মধ্য দিয়ে পরে উপযুক্ত দিক থেকে লেসার রশ্মি প্রক্ষেপ করলে একই সঙ্গে মূল বস্তুর দুটি ত্রৈমাত্রিক প্রতিকৃতি উৎপন্ন হয়। এদের একটি বাস্তব (Real), অপরটি আভাসী (Virtual)। এই উভয় প্রতিকৃতিই সম্পূর্ণ বাস্তবোপম।

আমরা দেখি কি ভাবে?

আমরা চোখ মেলে জগৎকে দেখছি—দেখছি তার নানা বস্তু, নানা ব্যক্তি বা দৃশ্য। কি ভাবে এই দেখা সম্ভব হচ্ছে? বৈজ্ঞানিক বলছেন, দেখবার মূলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন—আলো, চোখ আর মস্তিষ্ক। যে বস্তু বা দৃশ্যকে আমরা দেখি—হয় সে নিজেই আলোর উৎস, যেমন—সূর্য, তারা, বিদ্যুৎ-বাতি বা আগুন, অথবা তার বাইরের কোন উৎস থেকে আলো এসে তাকে উদ্ভাসিত করছে, যেমন—চাঁদ, সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহ বা পৃথিবীর নানা বস্তু। বস্তুর দেহ থেকে নির্গত বা প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলি আমাদের চোখে প্রবেশ করে। চোখের গঠন ক্যামেরার মত। ক্যামেরার মতই চোখের সামনের দিকে আছে একটা লেন্স। আর পিছন দিকে আছে একটি আলোক-সংবেদক পর্দা, যার নাম রেটিনা। বস্তুর দেহ থেকে নির্গত বা প্রতিফলিত আলোকরশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে ভিতরে যাওয়ার ফলে বস্তুটির একটি বাস্তব প্রতিবিম্ব রেটিনার উপর পড়ে। প্রতিবিম্বটি আলো-ছায়া দিয়ে গড়া; কাজেই রেটিনার উপর অবস্থিত আলোক-সংবেদক কণিকাগুলি (Rods and Cones) তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রতিবিম্বের বেশী আলোকিত অংশগুলি যেসব কণিকায় পড়ে, তারা বেশী প্রভাবিত হয়, আর তার ছায়াচ্ছন্ন অংশ যে সব কণিকায় পড়ে, তারা হয় কম প্রভাবিত এবং প্রতিবিম্বের অন্যান্য স্বল্প বা মাঝারি রকম আলোকিত অংশগুলি যে সব কণিকায় পড়ে, তারা সেই অনুপাতে প্রভাবিত হয়। বস্তুর চেহারা ও রং অনুযায়ী রেটিনার স্থানে স্থানে কম-বেশী ও রকম-বেরকম প্রভাবের খবর স্নায়ুতন্ত্রের সহায়তায় মস্তিষ্কে চলে যায়। মস্তিষ্ক তখন বস্তুটিকে দেখছে বলে অনুভব করে।

যা নেই তাকে দেখা

দেখবার রহস্য মোটামুটি বোঝা গেল। প্রশ্ন হতে পারে—কোন বস্তুকে দেখবার জন্যে সেই বস্তুর বাস্তব উপস্থিতি কি একান্ত প্রয়োজন? অর্থাৎ এমন কি হতে পারে না যে, আমার সামনে আমি এখন যে বস্তুকে দেখছি, আসলে তা সেখানে নেই? উত্তরে জোর দিয়েই বলা যায়, হাঁ, তা সম্ভব। দেখবার জন্যে মাত্র তিনটি জিনিষের যোগাযোগ অপরিহার্যরূপে দরকার—সেগুলি হলো—(১) যে বস্তুকে দেখতে চাই, তার দেহ থেকে নির্গত বা প্রতিফলিত আলো; মূল বস্তু উপস্থিত না থেকেও কোন কৌশলে যদি তার দেহ থেকে নির্গত বা প্রতিফলিত এই আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করে তাহলেও হবে। অতএব বলা যায়, মূল বস্তুর উপস্থিতি অপরিহার্য নয়—অপরিহার্য হলো তার দেহ থেকে নির্গত বা প্রতিফলিত আলো, (২) আমাদের চোখ এবং (৩) আমাদের মস্তিষ্ক।

যে বস্তু নেই, তাকে দেখবার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। অন্ধকার রাতের আকাশে যে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক আমরা দেখতে পাই, তারা সকলেই কি এখন সেখানে আছে? ধরা যাক, পঁচিশ আলোক-বর্ষ দূরের কোন নক্ষত্রকে আমরা দেখছি। আলোর গতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। এই গতি নিয়ে এক বছর ধরে চলে আলো যত পথ যেতে পারে, তাকে বলা হয় আলোক-বর্ষ। পঁচিশ আলোক-বর্ষ দূরে যে নক্ষত্রটি আছে, তার দেহ থেকে আলো আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছুতে সময় লাগে পঁচিশ বছর। কাজেই আজ এখন আমরা ঐ নক্ষত্রের যে আলো দেখছি, তা আজ থেকে ২৫ বছর আগে সেখান থেকে যাত্রা সুরু করেছিল এবং পঁচিশ বছর যাবৎ প্রচণ্ড বেগে ছুটে মহাকাশের সুবিশাল দূরত্ব অতিক্রম করে আজ এখন আমাদের চোখে এসে পড়ছে; অর্থাৎ এখন আমরা নক্ষত্রটির যে চেহারা দেখছি, তা হলো ২৫ বছর আগে ওর যে চেহারা ছিল, সেইটি। কিন্তু বিগত ২৫ বছরের মধ্যে সেই নক্ষত্রটির ভাগ্যে কি ঘটেছে, কে বলতে পারে? ধরা যাক, আজ থেকে দশ বছর আগে কোন একদিন প্রবল বিস্ফোরণে ফেটে গিয়ে নক্ষত্রটির মৃত্যু ঘটেছে অর্থাৎ এখন সেখানে কোন নক্ষত্র নেই এবং সেখান থেকে আর কোন আলো বিকিরিত হচ্ছে না। কিন্তু আকাশের ঐদিকে তাকালে বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে আমরা এখন প্রতি রাত্রে ঐস্থানেই ঐ নক্ষত্রটিকে দেখবো। এমনি ভাবে আগামী ১৫ বছর ধরে প্রতি রাত্রেই আমরা ঐ একই ব্যাপার দেখতে থাকবো। কিন্তু পনেরো বছরের মাথায় একদিন দেখবো যে, নক্ষত্রটির আলো হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠে সেটা ফেটে চৌচির হয়ে নিবে গেল। আসলে কিন্তু নক্ষত্রের মৃত্যুর এই ঘটনাটা ঘটেছে ঐ দিন থেকে ২৫ বছর আগে, অর্থাৎ আজ থেকে দশ বছর আগে। কিন্তু ২৫ বছরের মধ্যে আমরা পৃথিবীর মানুষেরা তা জানতে পারি নি, জানবার কোন উপায়ও ছিল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে যে বিন্দুটাকে একটা নক্ষত্র বলে মনে করেছি, সেখানে আসলে কিছুই ছিল না, সেই দিক বরাবর আমাদের দিকে ধাবমান কতকগুলি আলোকরশ্মি ছিল মাত্র; অর্থাৎ প্রমাণিত হলো, নক্ষত্রটি আকাশে না থাকলেও তাকে দেখা সম্ভব।

অবশ্য মহাকাশের বিপুল দূরত্বের জন্যেই এরকম একটা ব্যাপার ঘটা সম্ভব। কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপর তো তেমন কোন সম্ভাবনা নেই—কেন না, আলোর গতিবেগের তুলনায় পৃথিবীটা এতই ছোট যে, এক সেকেণ্ডেরও অনেক কম সময়ের মধ্যে আলো পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যেতে পারে।

এখন একটা জিনিব কল্পনা করা যাক। মনে করুন, আপনি বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন এবং কোন সুদৃশ্য এলাকার মধ্য দিয়ে ট্রেনে করে যাচ্ছেন। একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে ট্রেন হঠাৎ থেমে গেল। আপনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে। তখন স্বভাবতঃই পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেদের সেই দৃশ্যটি দেখাতে আপনার ইচ্ছা করবে। কিন্তু তাঁরা কেউই আপনার সঙ্গে আসেন নি বা সকলকে সেখানে আনা সম্ভবও নয়। তাহলে কিভাবে আপনি আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন? এর কয়েকটা উপায় হতে পারে, কিন্তু কোনটাই আপনার ঠিক মনোমত হবে না। কোন ভাল ক্যামেরায় আপনি এখানকার দৃশ্যের ফটোগ্রাফ তুলে নিয়ে আসতে পারেন অথবা স্টিরিয়ো-স্লাইড বা ত্রৈমাত্রিক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আপনি খুবই স্পষ্টভাবে এই দৃশ্যকে আপনার প্রিয়জনদের সামনে উপস্থিত করতে পারেন। কিন্তু যেমনই করুন, আপনি চোখ মেলে যেমনটি দেখেছিলেন, ঠিক তেমন স্পষ্ট করে এবং জীবন্তভাবে সেই দৃশ্যকে এর কোন পদ্ধতিতেই দেখানো যাবে না, কিছু না কিছু গলদ থেকে যাবেই।

আপনি যদি বৈজ্ঞানিক চিন্তাসম্পন্ন হন, তাহলে একটা কৌশলের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আপনার মনে প্রশ্ন উঁকি দিতে পারে। ট্রেনের জানালার মধ্য দিয়ে আপনি বাইরের দৃশ্য দেখেছেন, অর্থাৎ ঐ দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত নানা বস্তুর দেহ থেকে প্রতিফলিত (সূর্যের) আলো আপনার চোখে প্রবেশ করেছে বলেই তা দেখেছেন। আপনার জানালার কাচ এতক্ষণ ওঠানো ছিল। মনে করুন, ওটাকে আপনি নামিয়ে দিয়েছেন এবং কাচের মধ্য দিয়ে তখনো বাইরের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন। বাইরের দৃশ্য থেকে প্রতিফলিত আলোক-তরঙ্গ এসে প্রথমে আপনার জানালার কাচে পড়ছে এবং পরে কাচ ভেদ করে সেগুলি আপনার চোখে এসে পড়ছে। আচ্ছা, যে প্রতি-ফলিত রশ্মিগুলি জানালার কাচের উপর পড়ছে, কোন কৌশলে সেগুলিকে যদি ঐ কাচের মধ্যেই আপনি জমিয়ে রেখে দিতে পারেন এবং পরে কাচটাকে খুলে বাড়ীতে এনে ঠিক ঐভাবে খাড়া করে সেটাকে বসিয়ে যদি সেই জমানো রশ্মিগুলিকে গলিয়ে ঠিক সেইভাবে পরপর আবার মুক্ত করে দিতে পারেন, তাহলে কাচের দিকে তাকালে ঐ মুক্ত রশ্মিগুলি আপনার চোখের মধ্যে প্রবেশ করবে। যদি তা সম্ভব হয়, তবে কাচের দিকে তাকিয়ে সেই মূল দৃশ্যকে আপনি সম্পূর্ণ সত্য দৃশ্যরূপে আবার দেখতে পাবেন—যদিও সত্য দৃশ্যটি তখন সেখানে উপস্থিত নেই। মনে করুন, ঐ প্রান্তরে ট্রেন দু-ঘন্টা দাঁড়িয়ে ছিল, দু-ঘন্টা যাবৎ সেই মূল দৃশ্যকে সম্পূর্ণ সত্য দৃশ্যের মতই আপনি দেখতে পারেন।

এ গেল কল্পনার কথা—কিন্তু বাস্তবে কি তা সম্ভব? আলোক-তরঙ্গকে এইভাবে দৃশ্য অনুযায়ী যথাযথভাবে জমিয়ে রাখা বা মুক্ত করবার কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি আজ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়েছে? না, তা হয় নি। কিন্তু তার বদলে অন্য এমন একটি কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে, যা উপরে যেমন বলা হয়েছে অর্থাৎ আলোক রশ্মিকে জমিয়ে রেখে পরে দরকার মত মুক্ত করতে পারলে যেমনটি হতো, কার্যতঃ ঠিক তেমনটিই করতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কোন আলোকরশ্মিকে সত্য সত্যই জমানো হয় না। পদ্ধতিটির নাম হোলোগ্রাফি।

হোলোগ্রাফি এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ফটোগ্রাফি, যাতে যে বস্তুর চেহারার ছাপ নেওয়া হয়, তাকে সম্পূর্ণ বাস্তব বস্তুর মতই আবার দেখতে পাওয়া যায়। হোলোগ্রাফ শব্দের Holo এসেছে গ্রীক শব্দ Holos থেকে।

Holos অর্থ Whole বা সমগ্র। তাহলে হোলোগ্রাফি অর্থ—সমগ্র লেখন বা পূর্ণ-লেখন—অবশ্য আলোর দ্বারাই এই লেখন হয়। কোন বস্তু বা দৃশ্যকে চোখে দেখলে যা দেখা যায়, ফটোগ্রাফির সাহায্যে তার মাত্র আংশিক প্রতিকৃতি উৎপন্ন করাই সম্ভব। কিন্তু হোলো-গ্রাফিতে সেই চোখে দেখা বাস্তব চেহারাকেই আবার পূর্ণভাবে উৎপন্ন করা যায়। এই জন্যেই চলিত ফটোগ্রাফির সঙ্গে তফাৎ দেখাবার জন্যে এই পদ্ধতির এই নতুন নাম দেওয়া হয়েছে।

আবার একটু কল্পনা করা যাক। মনে করুন, আপনি কোন একটি বস্তু দেখছেন। ধরা যাক, বস্তুটি একটি চীনামাটির পাত্র। পাত্রটির বিভিন্ন অংশকে আপনি আলাদাভাবে এবং যথাযথ বৈশিষ্ট্যসহ দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে? এর কারণ পাত্রের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিফলিত আলোক-তরঙ্গগুলি সেই সেই অংশের চেহারা, অবস্থান, রং প্রভৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিশিষ্টতায় মণ্ডিত হয়ে আপনার চোখে এসে পড়ছে। যে কোন দৃশ্য সম্বন্ধেও একথা সত্য অর্থাৎ যে দৃশ্য দেখছি, তাথেকে প্রতিফলিত আলোক-তরঙ্গশ্রেণীর প্রতিটি বিন্দুতে সেই দৃশ্য অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো—কোন আলোক-সংবেদক পর্দার উপর কি আলোক-তরঙ্গ-সমূহের এই বৈশিষ্ট্যগুলির ছাপ অঙ্কিত করে নেওয়া যায় না? এখানে লক্ষণীয় যে, আলোক-তরঙ্গগুলির বৈশিষ্টের ছাপ নেবার কথা বলা হচ্ছে, সাধারণ ফটোগ্রাফিতে বস্তু বা দৃশ্যের প্রতিবিম্বের যে ছাপ নেওয়া হয়, তার কথা এখানে মোটেই বলা হয় নি। তরঙ্গ-বৈশিষ্ট্যের ছাপ যদি সত্যিই নেওয়া যায়, তাহলে সেই পর্দাকে ডেভেলপ করলে অর্থাৎ ছাপগুলিকে পর্দার উপর পাকা করে নিলে একটি প্লেট পাওয়া যাবে। এই প্লেটের মধ্য দিয়ে যথাযথ পার্শ্ব থেকে আবার আলো প্রক্ষেপ করলে যে প্রতিসরিত তরঙ্গগুলি বেরিয়ে আসবে, তাতে কি মূল তরঙ্গশ্রেণীর প্রতিটি বিন্দুর সেই বৈশিষ্ট্য আবার ফুটে উঠবে না? যদি তা ওঠে, তাহলে এই প্রতিসরিত তরঙ্গগুলি যখন আমাদের চোখে প্রবেশ করবে অর্থাৎ ঐ আলোকিত প্লেটের যথাযথ পার্শ্ব থেকে প্লেটটির দিকে যখন আমরা তাকাবো, তখন সেই মূল বস্তুকে ঠিক বাস্তব বস্তুর মতই কি আমরা দেখতে পাব না, যদিও বাস্তব বস্তুটি তখন সেখানে উপস্থিত নেই? হোলোগ্রাফির মূল ক্রিয়াকৌশল এই ধরণেরই।

হোলোগ্রাফির মূলে বিজ্ঞান

এবার আলোক-বিজ্ঞানের দিক থেকে কথাগুলিকে পরপর একটু গুছিয়ে বলা যাক। আলো তরঙ্গধর্মী। ডাচ বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স আলোর এই তরঙ্গ ধর্মের প্রবক্তা। ঘরের মাঝখানে একটি প্রদীপ জ্বালালে সারা ঘর আলোকিত হয় কেন? আলো উৎপন্ন হয়েছে প্রদীপে, প্রদীপ থেকে কোন্ কৌশলে আলো ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে? অর্থাৎ আলো এক স্থান থেকে আরেক স্থানে এগিয়ে চলে কি ভাবে? এটা বোঝবার জন্যে জল-তরঙ্গের উদাহরণ নেওয়া যাক। একটা পুকুরে ঢিল ফেলা হলো, ফলে ঢিলের পতন-স্থলে জলে বিক্ষোভ উৎপন্ন হলো। এই বিক্ষোভ তরঙ্গের আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত তরঙ্গ পুকুরের কূল পর্যন্ত গিয়ে তটভূমিকে আঘাত করতে লাগলো; অর্থাৎ ঢিলের পতন-স্থলে উৎপন্ন বিক্ষোভ তরঙ্গরূপ ধারণ করে গতিশীল হয়ে তটভূমি পর্যন্ত পৌঁছে গেল। হাইগেন্স বললেন, আলোর ক্ষেত্রেও এই রকম ব্যাপার ঘটে। কোন স্থানে আলো জ্বললে সেখানে মুহুর্মুহুঃ অসংখ্য আলোক-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে সব দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং প্রবল বেগে সব দিকে এগিয়ে চলে। জলের তরঙ্গ যেভাবে এগোয়,

আলোর তরঙ্গও অনেকটা সেই ভাবে এগোয়। জল-তরঙ্গ এগোয় কি ভাবে? পুকুরে যদি কতকগুলি পাতা বা সোলার টুক্‌রা ছড়ানো থাকে এবং সেই পুকুরের মাঝে যদি একটি ঢিল ফেলা যায়, তবে দেখা যায় ঢিল-পতনের কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন হয়ে তরঙ্গগুলি বৃত্তাকারে পুকুরের কিনারার দিকে এগিয়ে যাবার সময় সোলার টুক্‌রাগুলি একই স্থানে দাঁড়িয়ে ওঠা-নামা করছে মাত্র, তরঙ্গের সঙ্গে তাড়িত হয়ে তারা কিনারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না। সোলার টুক্‌রা যেখানে ভাসছে, সেখানকার জলকণাগুলি যখন ওঠা-নামা করে, তখন সেই সঙ্গে সোলার চলে। জলের তরঙ্গের ক্ষেত্রে বিক্ষোভ-বিন্দু থেকে একটি ছোট বৃত্ত উৎপন্ন হয়ে সেই বিন্দুকেই কেন্দ্র করে যেমন ওঠা-নামা করতে করতে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, আলোক-তরঙ্গের ক্ষেত্রেও তেমনি উৎস-বিন্দু থেকে প্রথমে একটি ছোট বর্তুল উৎপন্ন হয়ে সেই বিন্দুকেই কেন্দ্র করে যেন নৃত্যরত অবস্থায় ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। জল-তরঙ্গ বা আলোক-তরঙ্গ উভয়ের ক্ষেত্রেই উৎস-কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে এই যে গতি, এটাই হলো তরঙ্গের গতি। যাহোক, কাগজের পৃষ্ঠায় একটি তরঙ্গকে এইভাবে দেখানো যেতে পারে।

তরঙ্গের ক্ষেত্রে একটা খুব দরকারী জ্ঞাতব্য বিষয়
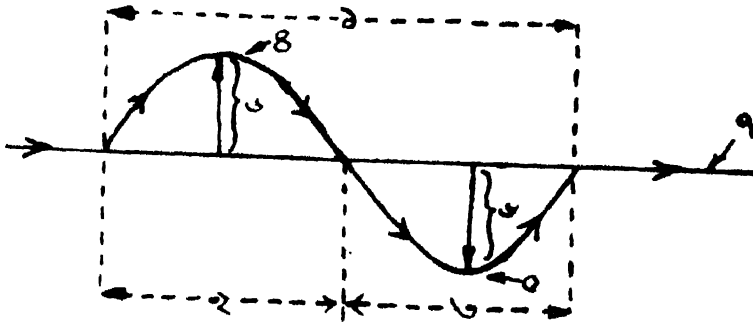
১নং চিত্র

একটি সম্পূর্ণ তরঙ্গ : ১—পূর্ণ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, ২—অর্ধ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, উত্থানার্ধ, ৩—অর্ধ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, পতনার্ধ, ৪—বৃহত্তম উত্থান, ৫—বৃহত্তম পতন, ৬—তরঙ্গের বিস্তার, এর দ্বারাই তরঙ্গের জোর নির্ধারিত হয়। উজ্জ্বল আলোর তরঙ্গের বিস্তার বেশী হয়। ৭—অক্ষরেখা, এই রেখা বরাবর তরঙ্গ এগিয়ে চলে।

টুক্‌রাও ওঠা-নামা করে। তাহলে বোঝা গেল, পুকুরের জলকণাগুলির পর্যায়ক্রমে উত্থান-পতনই তরঙ্গের মূলে। উত্থান আর পতন পরপর সাজানো থাকে। একজোড়া উত্থান-পতন একত্রে নিলে তবেই হয় একটি পুরা তরঙ্গ। জল-তরঙ্গ জলের সমতলে উৎপন্ন হয় এবং বৃত্তাকারে বেড়ে চলে। কিন্তু আলোর তরঙ্গ ফাঁকা জায়গায় উৎপন্ন হয় এবং সেগুলি বর্তুলাকারে অর্থাৎ গোল বলের মত সব দিক থেকে ভরাট অবস্থায় বেড়ে হলো, তার দশা অর্থাৎ Phase। এর দ্বারা কোন বিশেষ ক্ষণে তরঙ্গের অবস্থা অর্থাৎ তার উত্থানাবস্থা বা পতনাবস্থা বোঝা যায়। দুটি তরঙ্গের যদি একই সঙ্গে উত্থান এবং একই সঙ্গে পতন ঘটে, তবে বলা হয় যে, তারা একই দশায় আছে।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী টমাস ইয়ং বললেন যে, দুটি আলোক-তরঙ্গকে পরস্পরের উপর অধ্যারোপণ করলে অর্থাৎ একের ঘাড়ে অন্যটিকে চাপিয়ে দিলে তারা পরস্পরের উপর

ক্রিয়া করে উৎপন্ন করবে একটি লব্ধ তরঙ্গ। এই লব্ধ তরঙ্গের চেহারা ও দশা মূল তরঙ্গ দুটির চেহারা ও দশার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। একই বা প্রায় একই দশাভুক্ত দুটি তরঙ্গ অধ্যারোপিত হলে উৎপন্ন লব্ধের বিস্তার মূল তরঙ্গ দুটির যে কোনটির বিস্তার অপেক্ষা বেশী হবে এবং সে ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতর আলো উৎপন্ন হবে। একে বলা হয় সংপোষী ব্যতিকরণ (Constructive interference) (চিত্র ৪ দ্রষ্টব্য)। অপর পক্ষে দুটি তরঙ্গ প্রায় বিপরীত দশায় (Almost 180° out of phase) থেকে পরস্পরের উপর অধ্যারোপিত হলে উৎপন্ন লব্ধের বিস্তার মূল তরঙ্গ দুটির মধ্যেকার উজ্জ্বলতরটির বিস্তার অপেক্ষা সর্বদাই কম হবে এবং সময়াবশেষে মূল কম উজ্জ্বল তরঙ্গ অপেক্ষাও কম হবে। এক্ষেত্রে অধ্যারোপণের ফলে কম উজ্জ্বল আলো বা অন্ধকার উৎপন্ন হবে। একে বলা হয় বিনাশী ব্যতিকরণ (Destructive interference) (চিত্র ৫ দ্রষ্টব্য)।

আলোক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইয়ং একটি যুগান্তকারী পরীক্ষা করেন ১৮০২ খৃষ্টাব্দে। বোলোনার বিজ্ঞানী গ্রীমল্‌ডি আলোর বিসরণ ধর্ম (Diffraction) আবিষ্কার করেছিলেন ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে। কোন বিন্দু-উৎস থেকে আপতিত আলো কোন সরু ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাবার সময় বাইরের দিকে বেঁকে যায় অর্থাৎ ছিদ্র থেকে আলো প্রসারিত হয়ে বেরোয়। কোন ধারালো বাধার ধার ঘেঁষে যাবার সময়ও আলো বেঁকে যায়। ছিদ্রপথে বা বাধামুখে আলোর এই ভাবে বেঁকে যাওয়াকেই বলা হয় বিসরণ। ইয়ং দেখালেন (১৮০২ খৃঃ) (চিত্র ৬ ও ৭ দ্রষ্টব্য), কোন বিন্দু-উৎস অর্থাৎ একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থেকে বেরিয়ে আসা আলো অপর দুটি অতি সন্নিকটে
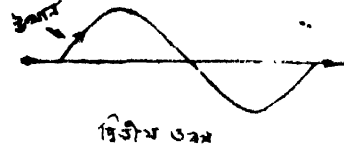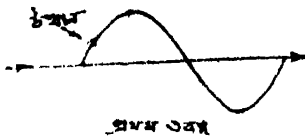
২নং চিত্র

একই দশায় অবস্থিত দুটি তরঙ্গ। এখানে উভয় তরঙ্গের একই সঙ্গে উত্থান ও পতন ঘটছে। প্রথম তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কম, দ্বিতীয়টির বেশী। উভয় তরঙ্গের বিস্তার সমান।
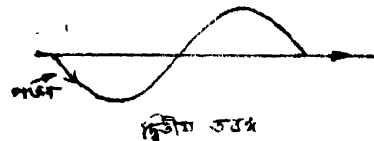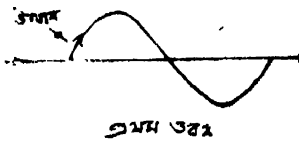
৩নং চিত্র

বিপরীত দশায় অবস্থিত দুটি তরঙ্গ। এখানে ১ম তরঙ্গ যখন উঠছে, দ্বিতীয়টি তখন পড়ছে। প্রথম তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কম, দ্বিতীয়টির বেশী। উভয় তরঙ্গের বিস্তার সমান।

অবস্থিত সূক্ষ্ম ছিদ্রে পতিত হলে উক্ত উভয় ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় আলোর বিসরণ ঘটবে এবং ছিদ্র দুটি অতি সন্নিকটে থাকবার ফলে

৪নং চিত্র

সংপোষী ব্যতিকরণ: একই দশাস্থ দুটি তরঙ্গের অধ্যারোপণের ফলে উজ্জ্বলতর আলোর সৃষ্টি। ১—প্রথম তরঙ্গ—সরু টানা রেখা, ২—দ্বিতীয় তরঙ্গ—ভগ্ন রেখা, এরা উভয়ে একই দশায় আছে। ৩—লব্ধ তরঙ্গ মোটা টানা রেখা। ক—১ম তরঙ্গের বিস্তার, খ—২য় তরঙ্গের বিস্তার, ১ম-এর দ্বিগুণ, গ—লব্ধ তরঙ্গের বিস্তার, ১ম-এর তিন (১+২=৩) গুণ।

উক্ত বিসৃত রশ্মিদ্বয় পরস্পরের উপর অধ্যারোপিত হয়ে উৎপন্ন করবে এক ব্যতিকরণ আকৃতি (Interference pattern)। দেখা গেছে, সূক্ষ্ম

৫নং চিত্র

বিনাশী ব্যতিকরণ: বিপরীত দশাস্থ দুটি তরঙ্গের অধ্যারোপণের ফলে অনুজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি। ১—প্রথম তরঙ্গ—সরু টানা রেখা, ২—দ্বিতীয় তরঙ্গ—ভগ্ন রেখা, এই তরঙ্গ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত দশায় অবস্থিত। ৩—লব্ধ তরঙ্গ—মোটা টানা রেখা। ক—১ম তরঙ্গের বিস্তার, ১ গুণ, খ—২য় তরঙ্গের বিস্তার ১½ গুণ। গ—লব্ধ তরঙ্গের বিস্তার ½ গুণ (১½-১=½)।

ছিদ্রের বদলে ক্ষুদ্র দীর্ঘ ছিদ্র নিলে অনেক স্পষ্ট আকৃতি পাওয়া যায়। বিসৃত ও অধ্যারোপিত আলোকরশ্মিদ্বয়ের উপর উপযুক্ত দূরত্বে পর্দা বা ফটোগ্রাফ ফিল্ম ধরলে তার উপর ব্যতিকরণ আকৃতিটি ফুটে ওঠে। একরঙা আলো ব্যবহৃত হয়ে থাকলে এই আকৃতি হয় আলো এবং অন্ধকারের একান্তর ডোরা (চিত্র ৮ দ্রষ্টব্য)।

ইয়ং-এর এই পরীক্ষার দ্বারা হাইগেন্স প্রবর্তিত আলোর তরঙ্গধর্মের প্রকল্পই সমর্থিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকমহলে এই মতবাদ বেশী স্বীকৃতি লাভ করে নি। এরপর এলেন ফরাসী বিজ্ঞানী অগাষ্টিন ফ্রেনেল। ১৮১৪-১৫

নাগাদ তিনি পরীক্ষা ও গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে আলোর তরঙ্গধর্মের প্রকল্পকে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করেন।

দুটি সমতল আয়নাকে সামান্য কৌণিক ব্যবধানে বসিয়ে একটি বিন্দু-উৎস থেকে তাদের উপর একই সঙ্গে আলো প্রতিফলিত করে ফ্রেনেল হয়েছে, সেখানে উৎপন্ন হয়েছে আলোর ডোরা, আর যেখানে তারা বিপরীত দশায় মিলিত হয়েছে, সেখানে উৎপন্ন হয়েছে অন্ধকার ডোরা। ডোরাগুলির মধ্যেকার ব্যবধান তরঙ্গ দুটির মধ্যেকার কৌণিক ব্যবধানের উপর নির্ভর করে। এখানে দুটি আলোক-তরঙ্গই সমতল—কেন না, দুটি
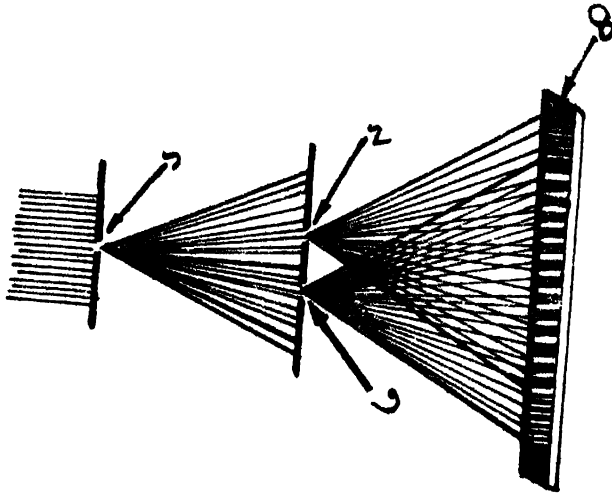
৯নং চিত্র

ইয়ং-এর ব্যতিকরণ পরীক্ষা—(আলো দিয়ে বোঝানো হচ্ছে)। ১—আলোর বিন্দু উৎস, সূক্ষ্ম ছিদ্র। ২-৩—অতি সন্নিকটে অবস্থিত দুটি সূক্ষ্ম ছিদ্র। ৪—পর্দা, এর উপরই ব্যতিকরণ আকৃতি উৎপন্ন হয়। এই আকৃতি আলো-আঁধারের একান্তর ডোরা দিয়ে গঠিত।

আলোর ব্যতিকরণ ঘটাতে সক্ষম হন (চিত্র—৯ দ্রষ্টব্য)। এখানেও ব্যতিকরণ আকৃতিটি হয় আলো ও অন্ধকারের একান্তর ও সমান্তরাল ডোরা।

দুটি সমতল আয়না থেকে প্রতিফলিত আলোক-তরঙ্গের অধ্যারোপণ ও তাথেকে এই রকম ব্যতিকরণ আকৃতি কিভাবে উৎপন্ন হয়, তা অঙ্কিত চিত্রের সাহায্যে (চিত্র—১০) বোঝানো যেতে পারে।

এই চিত্রে (চিত্র—১০) পর্দার উপরে যে যে স্থানে উভয় তরঙ্গ একই দশাভুক্তরূপে মিলিত আয়নাই সমতল। কাজেই এদের থেকে উৎপন্ন ব্যতিকরণ আকৃতিটিও খুব সরল। কিন্তু দুটি তরঙ্গের একটিকে সমতল রেখে অন্যটিকে বদ্‌লে দিলে তাথেকে উৎপন্ন ব্যতিকরণ আকৃতি বদ্‌লে যায়।

১০ নং চিত্রে প্রদর্শিত ব্যতিকরণ আকৃতির ছাপযুক্ত প্লেটকে ডেভেলপ করে তার মধ্য দিয়ে আলো প্রক্ষেপ করলে কি ভাবে পূর্বোক্ত তরঙ্গ দুটি উৎপন্ন হয়, তা অঙ্কিত চিত্রে (চিত্র—১১) দেখা যাচ্ছে।

বোঝা গেল, একটি তরঙ্গকে সর্বদাই সমতল

রেখে এবং দ্বিতীয় তরঙ্গকে বিভিন্ন আকৃতির মত নিয়ে যে সব বিভিন্ন রকম ব্যতিকরণ আকৃতি পাওয়া যাবে, তাদের বৈশিষ্ট্য ঐসব দ্বিতীয় তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে।

এখন মনে করা যাক, ফ্রেনেলের ঐ দুই আয়না পরীক্ষার দুটি আয়নার দ্বিতীয়টিকে যেমন ঐ পাত্র ও আয়নার উপর একই সঙ্গে আলোকপাত করলে আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে বেরিয়ে আসবে সমতল তরঙ্গশ্রেণী, আর ঐ পাত্রের দেহ থেকে প্রতিফলিত হয়ে নির্গত হবে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিচিত্র তরঙ্গশ্রেণী। পাত্র এবং আয়না পরস্পরের খুব কাছে এবং উপযুক্ত
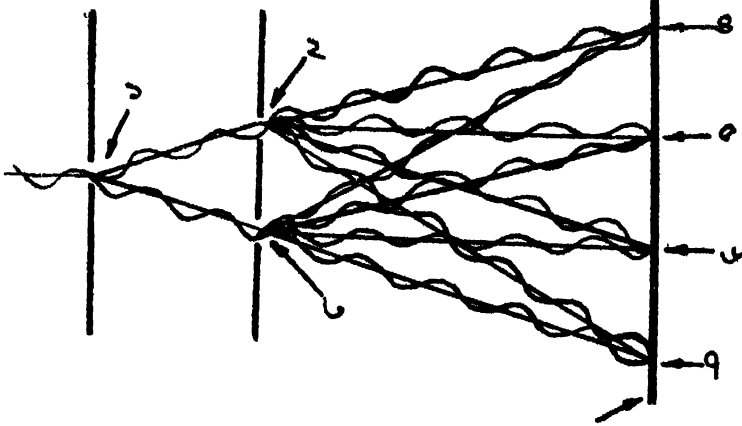
১নং চিত্র

ইয়ং-এর ব্যতিকরণ পরীক্ষা—(তরঙ্গ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে)। ১—সূক্ষ্ম ছিদ্র, আলোর বিন্দু-উৎস, ২ ও ৩—দুটি সনিকটস্থ সূক্ষ্ম ছিদ্র, ৪ ও ৬—একই দশার দুটি তরঙ্গের অধ্যারোপণজনিত সংপোষী ব্যতিকরণ থেকে উজ্জ্বলতর আলো। ৫ ও ৭ বিপরীত দশার দুটি তরঙ্গের অধ্যারোপণজনিত বিনাশী ব্যতিকরণ থেকে অনুজ্জ্বল আলো বা অন্ধকার। ৪, ৫, ৬, ৭—পর্দার উপর এই অবস্থানগুলিতে আলো ও অন্ধকারের একান্তর ডোরা দেখা যায়। এরই নাম ব্যতিকরণ আকৃতি। ৮—পর্দা।

আছে তেমনি রেখে প্রথমটির বদলে সেই স্থানে কোন বস্তু—ধরা যাক, একটি চীনামাটির পাত্র রাখা হলো। চীনামাটির পাত্রের দেহ থেকে প্রায় আয়নার মতই সহজে আলো প্রতিফলিত হবে। পাত্রটির দেহের বিভিন্ন বিন্দু একটি অসমতল আয়নার মত ব্যবহার করবে অর্থাৎ পাত্রটির উপর আলোকপাত করলে তার দেহের প্রতিটি বিন্দু থেকে সেই বিন্দুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশিষ্ট আলোক-তরঙ্গ নির্গত হবে। কাজেই ফ্রেনেলের মূল পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেমন হয়, তেমনিভাবে একই বিন্দু-উৎস থেকে কৌণিক ব্যবধানে আছে বলে এক্ষেত্রেও এই উভয় শ্রেণীর-তরঙ্গ পরস্পরের উপর অধ্যারোপিত হয়ে এক অভিনব ও জটিল ব্যতিকরণ আকৃতির সৃষ্টি করবে। এই আকৃতি উৎপাদনের ব্যাপারে সমতল তরঙ্গশ্রেণী শুধু ভূমি-তরঙ্গ (Reference waves) রূপে উপস্থিত থেকে ব্যতিকরণ ঘটিয়েছে। অন্য পক্ষে, উৎপন্ন ব্যতিকরণ আকৃতির প্রতিটি বিন্দুতে যে সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলি সৃষ্টির জন্যে দায়ী ঐ পাত্রের দেহতলের বিন্দুসমূহ থেকে প্রতিফলিত বিচিত্র তরঙ্গশ্রেণী। কাজেই

একটি ফটোগ্রাফের পর্দার উপর এই আকৃতির ছাপ গ্রহণ করে পাকা করে নিলে যে প্লেটটি পাওয়া যাবে, বলা যায় সেই প্লেটের মধ্যে ঐ পাত্রটির দেহের বিভিন্ন বিন্দু থেকে প্রতিফলিত আকৃতিরূপে ঐ আলোক-তরঙ্গগুলির বৈশিষ্ট্যের ছাপ গ্রহণ করা যায়।

এতক্ষণে আমরা হোলোগ্রাফি বা পূর্ণলেখন পদ্ধতির মূল রহস্য প্রায় স্পর্শ করেছি। উপরিউক্ত

৮নং চিত্র
আলো-আঁধারের একান্তর ডোরা। এরই নাম ব্যতিকরণ আকৃতি।

বিভিন্ন তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যের ছাপ অঙ্কিত আছে। ঠিক এই জিনিষটাই করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আমরা কিছু পূর্বে প্রশ্ন তুলেছিলাম। দেখা গেল, বস্তুর দেহ থেকে প্রতিফলিত আলোক- পদ্ধতিতে ব্যতিকরণ আকৃতির ছাপযুক্ত যে প্লেটটি পাওয়া যায়, তারই নাম হোলোগ্রাম। অবশ্য এতক্ষণ আমরা একটি কথা সম্পূর্ণ উহ্য রেখেই আলোচনা করেছি। কথাটি এই যে,
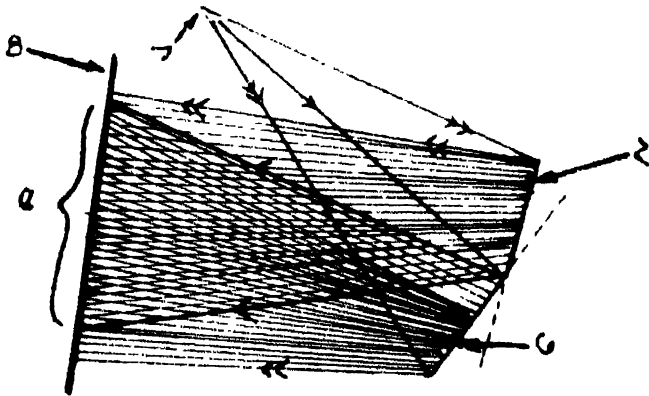
৯নং চিত্র
ফ্রেনেলের দুই আয়না পরীক্ষা। ১—আলোর বিন্দু-উৎস, ২—১ম আয়না, ৩—২য় আয়না, ৪—পর্দা, ৫—ব্যতিকরণ এলাকা

তরঙ্গগুলির বৈশিষ্ট্যের ছাপ সোজাসুজি নেওয়া যায় না বটে, কিন্তু অন্য একটি সমতল তরঙ্গ-শ্রেণীকে ভূমি (Reference) রূপে ব্যবহার করে তার সঙ্গে ব্যতিকরণ ঘটিয়ে সেই ব্যতিকরণ সাধারণ আলো দিয়ে হোলোগ্রাম তোলা খুবই অসুবিধাজনক—এমন কি, সম্পূর্ণ অসম্ভব। সাধারণ আলোর বদলে লেসার নামক আলোক-রশ্মির সাহায্যে হোলোগ্রাম তোলা হয় এবং পরে

ঐ লেসার রশ্মিকেই হোলোগ্রাম প্লেটের মধ্য দিয়ে প্রক্ষেপ করলে তবেই বস্তুটির বাস্তবোপম ছবি প্রতিকৃতি ফুটে ওঠে।

লেসার রশ্মি সম্পর্কে কিছু ধারণা

লেসার হলো একরকম অতি শক্তিশালী আলোকরশ্মি। দৃশ্য-অদৃশ্য নানা আলো থেকেই এই রশ্মি তৈরি করা যায়। আলো মাত্রেই অসংখ্য তরঙ্গের সমষ্টি। সাধারণ আলোর এই তরঙ্গসমূহ এক রঙের আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক এক রকম। লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশী, বেগুনীর কম। সূর্যের আলোতে সাত রঙের আলো থাকে অর্থাৎ সেখানে সাত রকম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ একত্রে মিশে থাকে। এটা সাধারণভাবে বলা হলো। যে কোন একটি রঙের আলো বেছে নিলে তার মধ্যেকার তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য মোটামুটি সমান হয়; অর্থাৎ একরঙা আলো ব্যবহার করলে আকারগত অমিল দূর হয়।
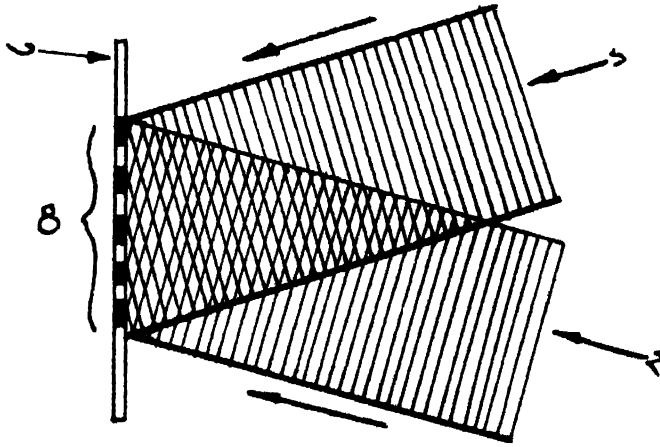
১০নং চিত্র

ফ্রেনেলের দুই আয়না পরীক্ষায় সমান্তরাল ও সমদূরবর্তী ব্যতিকরণ আকৃতি বা আলো-আঁধারির একান্তর ডোরা উৎপাদনের চিত্র। ১—১ম আয়না থেকে প্রতিফলিত একটি আলোক-তরঙ্গ। ২—২য় আয়না থেকে প্রতিফলিত একটি আলোক-তরঙ্গ। ৩—পর্দা। ৪—ব্যতিকরণ আকৃতি।

অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে থাকে। তাদের পরস্পরের মধ্যে গরমিলের ফলে পরস্পরের শক্তি কাটাকাটি হয়ে খুবই সাধারণ স্বল্পশক্তির অবস্থায় তারা অবস্থান করে। আলোক-তরঙ্গের ক্ষেত্রে দুই রকম গরমিল দেখা যায়। একটি আকারগত (Temporal) আর অন্যটি দশাগত (Spatial)। সাধারণ আলোর মধ্যে বিভিন্ন আকারের তরঙ্গ মিশে থাকে। তরঙ্গের আকার অর্থাৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর আলোর রং নির্ভর করে। এক

দ্বিতীয় অমিল হলো তরঙ্গসমূহের দশাগত। একে বলা যায় তরঙ্গসমূহের উত্থান-পতনগত অমিল। বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা এই অমিল দূর করে এমন করা যায় যে, সব তরঙ্গগুলি একই সঙ্গে ওঠে এবং একই সঙ্গে পড়ে—একদল সৈন্য সারিবদ্ধভাবে মার্চ করে গেলে যেমন হয় তেমনি। এই উপমায় উপরিউক্ত আকারগত অমিল দূর করবার ব্যাপার যুক্ত করে বলা যায়, সৈন্যদলের প্রত্যেকটি সৈন্যের আকার (অর্থাৎ উচ্চতা)

সমান। কাজেই সমান উচ্চতাবিশিষ্ট একদল সৈন্য সারিবদ্ধভাবে তালে তালে মার্চ করে গেলে যেমন হয়, আলোক-তরঙ্গগুলিকেও যদি তেমনি করানো যায়, তবেই তৈরি হয় লেসার রশ্মি। এর অর্থ—লেসার রশ্মি উৎপাদনের জন্যে সাধারণ আলোর মধ্যেকার তরঙ্গসমূহের উক্ত উভয় প্রকার গরমিল দূর করা দরকার। এই রশ্মি সূর্যের চেয়েও বেশী উজ্জ্বল, প্রচণ্ড তাপ উৎপাদনে করবার দরকার কি? একে একে তার আলোচনা করা যাক।

১। আকারগত অমিল দূর করবার কারণ:—হোলোগ্রাফির মূলে রয়েছে আলোক-তরঙ্গসমূহের দ্বারা উৎপন্ন ব্যতিকরণ আকৃতি (Interference pattern)। স্পষ্টতঃই আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে এই আকৃতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কম-বেশী হলে উৎপন্ন
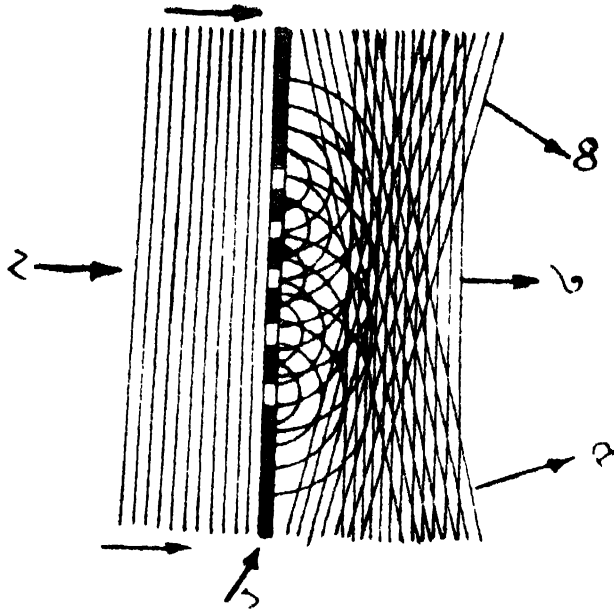
১১নং চিত্র

ব্যতিকরণ আকৃতির ছাপযুক্ত প্লেট থেকে মূল আলোক তরঙ্গের পুনরুৎপাদন। ১—প্লেট, ২—সমতল আলোক তরঙ্গশ্রেণীর প্রক্ষেপ, ৩—শূন্য বর্গীয় (Zero order) তরঙ্গ, ৪ ও ৫—দুটি প্রথম বর্গীয় (First order) তরঙ্গ। এই দুটিই আমাদের উদ্দিষ্ট পুনরুৎপন্ন তরঙ্গ।

সক্ষম ও অন্যান্য আশ্চর্য গুণসম্পন্ন। হোলোগ্রাফিতে এই রশ্মিই ব্যবহার করা হয়।

আলোক-তরঙ্গসমূহের মধ্যেকার অসঙ্গতি দূর করবার প্রয়োজন কি?

এখন প্রশ্ন, হোলোগ্রাম উৎপাদনের জন্যে আলোর মধ্যেকার এই উভয় প্রকার অমিল দূর আকৃতির মূল ধাঁচ বজায় থাকলেও তার প্রতিটি অঙ্গে চেহারার হেরফের হয়। কাজেই বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ যদি মিশে থাকে তবে প্রত্যেক দৈর্ঘ্যের তরঙ্গশ্রেণী তাদের নিজস্ব বিশেষ ব্যতিকরণ আকৃতি উৎপন্ন করবে। এই সব বিভিন্ন আকৃতি পরস্পরের উপর আরোপিত

হয়ে পরস্পরের তীক্ষ্ণতা নষ্ট করবে এবং তার ফলে লব্ধ রূপে পাওয়া যাবে আকৃতিবিহীন একাকার খানিকটা আলো-আঁধারী মাত্র। বলা বাহুল্য এরকম জিনিষ দিয়ে হোলোগ্রাম উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। তাই তরঙ্গসমূহের আকারগত অমিল দূর করে একই দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ একই রঙের আলো ব্যবহার করা প্রয়োজন।

২। দশাগত অমিল দূর করবার কারণ:—ইয়ং-এর ব্যতিকরণ পরীক্ষা (চিত্র—৬ ও ৭) এবং ফ্রেনেলের দুই আয়না পরীক্ষার (চিত্র—৯) ক্ষেত্রে বিন্দু-উৎস থেকে উৎপন্ন আলোক-তরঙ্গ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। বিন্দু-উৎস অর্থে কোন সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসা আলো। দেখা গেছে, বিন্দু-উৎসের বদলে প্রসারিত উৎস নিলে ব্যতিকরণ আকৃতি পাওয়া যায় না। এর কারণ কি? এর উত্তর জানতে হলে আগে জানতে হবে, আলোক-তরঙ্গ কিভাবে উৎপন্ন হয়। আলোক-তরঙ্গের মূলে রয়েছে ইলেকট্রনের স্পন্দন যে উৎস থেকে আলোক-তরঙ্গ বেরিয়ে আসছে, তার দেহ অসংখ্য পরমাণু দিয়ে গঠিত (যে কোন বস্তুর দেহই ঐভাবে গঠিত)। এই সব পরমাণুর কক্ষপথে অবস্থিত ইলেকট্রনসমূহের স্পন্দনের ফলেই আলোক-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইলেকট্রনের স্পন্দন সর্বদা একই ভাবে হয় না। যে কোন একটি ইলেকট্রনের স্পন্দনের দশা সেকেণ্ডে কয়েক কোটি বার হারে বদ্‌লে যেতে থাকে। ইলেকট্রনের স্পন্দনের দশা বদ্‌লে গেলে তাথেকে উৎপন্ন আলোক-তরঙ্গের দশাও বদ্‌লে যায়। এখন ধরা যেতে পারে, বিন্দু-উৎসে একটি মাত্র ইলেকট্রন স্পন্দিত হচ্ছে, আর প্রসারিত উৎসে অসংখ্য ইলেকট্রন পাশাপাশি স্পন্দিত হচ্ছে। বিন্দু-উৎসের ইলেকট্রনটি একাকী সেকেণ্ডে কয়েক কোটি বার হারে দশা পরিবর্তন করছে। কাজেই বিন্দু-উৎস থেকে নির্গত আলোক-তরঙ্গের দশাও প্রতি সেকেণ্ডে ঐ হারে বদ্‌লে-বদ্‌লে যাচ্ছে আর ওদিকে প্রসারিত উৎসের অসংখ্য ইলেকট্রনের প্রত্যেকে তাদের খুসীমত সেকেণ্ডে কয়েক কোটি বার হারে দশা পরিবর্তন করছে। কাজেই প্রসারিত উৎস থেকে নির্গত অসংখ্য তরঙ্গের প্রত্যেকের দশাও প্রতি সেকেণ্ডে ঐ হারে বদ্‌লে-বদ্‌লে যাচ্ছে এবং এই বদলের ব্যাপারে কারোর সঙ্গে কারোর মিল নেই। ইয়ং-এর ব্যতিকরণ পরীক্ষায় (চিত্র—৬ ও ৭) দেখানো হয়েছে, বিন্দু-উৎস থেকে উৎপন্ন আলোর একটি তরঙ্গ অগ্রসর হয়ে অতি নিকটে অবস্থিত দুটি সূক্ষ্ম ছিদ্র-পথে পার হয়ে ওপারে গেল এবং সেখানে পরস্পরের উপর অধ্যারোপণের ফলে ঘটলো ব্যতিকরণ। দেখা যাচ্ছে, একই বিন্দু-উৎস থেকে একটি মাত্র তরঙ্গ বেরিয়ে আসবার পর দুটি সূক্ষ্ম ছিদ্রে যুগপৎ প্রবেশ করে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে এবং এই উভয় ভাগ পরস্পরের উপর অধ্যারোপিত হয়ে ব্যতিকরণ ঘটিয়েছে। মূল তরঙ্গের যা দশা (Phase), এই উভয় ভাগের দশাও তাই। কিন্তু সন্নিকটস্থ ছিদ্র দুটির মধ্যে কিছুটা তফাৎ থাকবার ফলে এই উভয় ভাগকে সামান্য পরিমাণে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পথ অতিক্রম করে ব্যতিকরণ ক্ষেত্রে পৌঁছুতে হয়। সমগ্র পথের দৈর্ঘ্যের এই বিভিন্নতার জন্যে উভয় ভাগ তরঙ্গ বিভিন্ন দশাভুক্ত অবস্থায় ব্যতিকরণ ক্ষেত্রের বিভিন্ন এলাকায় পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তারই ফলে ঐসব এলাকায় বিভিন্ন রকম ব্যতিকরণ ঘটায়—কোথাও বা সংপোষী (Constructive) ব্যতিকরণ আর কোথাও বা বিনাশী (Destructive) ব্যতিকরণ। এরই ফলে উৎপন্ন হয় আলো আর অন্ধকারের একান্তর ডোরা, যার নাম ব্যতিকরণ আকৃতি। দেখা গেল, ব্যতিকরণ আকৃতি উৎপাদনের জন্যে ব্যতিকরণ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকামী উভয় ভাগ তরঙ্গের মধ্যে স্থানে স্থানে সমদশায় এবং স্থানে স্থানে

বিপরীত দশায় সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। মূলে একটি মাত্র তরঙ্গ ব্যবহার করে পূর্বোক্ত ছুটি নিকটস্থ সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে কিছুটা তফাৎ রাখলেই এটা ঘটে। মূল তরঙ্গের দশা বদলে গেলেও এই অবস্থার কোন ব্যত্যয় হয় না; কারণ মূল তরঙ্গে যতটুকু বদল ঘটে, এই উভয় ভাগ তরঙ্গের প্রত্যেকের মধ্যেও ঠিক ততটুকুই বদল ঘটে; অর্থাৎ এর ফলে তাদের উভয়ের মধ্যে কোন আপেক্ষিক তফাৎ দেখা দেয় না। কাজেই ছিদ্রে প্রবেশ করবে এবং প্রত্যেকে তার একটি নিজস্ব ব্যতিকরণ আকৃতি উৎপন্ন করবে। কাজেই অসংখ্য বিন্দু-উৎসের জন্যে ব্যতিকরণ ক্ষেত্রে অসংখ্য ব্যতিকরণ আকৃতি দেখা দেবে। এই সব আকৃতি এবং তাদের অবস্থান বিভিন্ন। ফলে তারা পরস্পরের উপর আরোপিত হয়ে সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, অর্থাৎ এই অবস্থায় কোন ব্যতিকরণ আকৃতি পাওয়া যাবে না।

কিন্তু প্রসারিত উৎস থেকে নির্গত প্রত্যেকটি
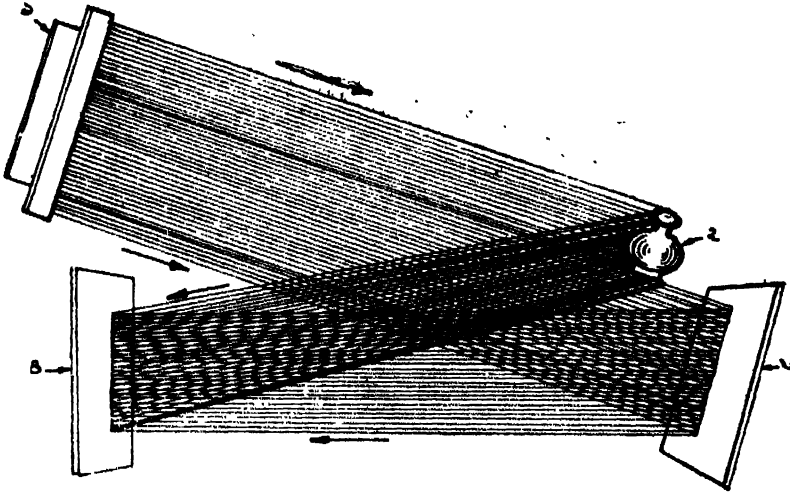
১২নং চিত্র

হোলোগ্রাফ বা পূর্ণলেখ গ্রহণের পদ্ধতি। ১—লেসার উৎস, ২—বস্তু, একটি চীনা মাটির পাত্র। ৩—সমতল আয়না, ৪—হোলোগ্রাম বা পূর্ণলেখ প্লেট।

বিন্দু-উৎসের ইলেকট্রনটি সেকেণ্ডে যতবার খুসী দশা পরিবর্তন করলেও ব্যতিকরণ আকৃতিটি সর্বদা একই রকম থেকে যায়। কিন্তু প্রসারিত উৎসের ক্ষেত্রে ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ অন্য রকম। মনে করা যেতে পারে, প্রসারিত উৎসটি অসংখ্য বিন্দু-উৎসের সমষ্টি, অতএব এই অসংখ্য বিন্দু-উৎসের প্রত্যেকটি থেকে উৎপন্ন আলোক-তরঙ্গ উক্ত ছুটি সন্নিকটস্থ সূক্ষ্ম তরঙ্গ যদি সমদশাভুক্ত হয়, তবে তাদের প্রত্যেকের দ্বারা উৎপন্ন ব্যতিকরণ আকৃতি একই হবে এবং তাদের অবস্থানও হবে এক অর্থাৎ সমগ্র প্লেটের প্রতিটি বিন্দুতে একই রকম আকৃতির ছাপ পড়বে। ফলে সব আকৃতিগুলি একত্রে একটি খুব স্পষ্ট আকৃতি উৎপন্ন করবে। লেসার রশ্মির ব্যবহারে ঠিক এটাই সম্ভব করে তোলা হয়।

আশা করা যেতে পারে, এতক্ষণে হোলোগ্রাফি

এবং তার পিছনের বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা গড়ে উঠেছে। এবার সেটাই সোজাসুজি দু-চার কথায় বলা যাক।

হোলোগ্রাফি লেসার রশ্মি দিয়ে তোলা এক সম্পূর্ণ অভিনব ফটোগ্রাফি, যাতে কোন বস্তু বা দৃশ্যের চেহারাকে ঠিক বাস্তব বস্তুর চেহারার মতই পুনরুৎপন্ন করা যায়। যে বস্তুর হোলোগ্রাম তোলা হবে, তার পাশে উপযুক্ত কৌণিক ব্যবধানে একটা সমতল আয়না রাখা হয়। একটি উপযুক্ত কোণে রক্ষিত একটি লেসার-উৎস থেকে ঐ বস্তু ও আয়নার উপর যুগপৎ রশ্মিপাত করা হয় (চিত্র—১২ দ্রষ্টব্য)। রশ্মি বস্তু এবং আয়না উভয় বস্তু থেকেই প্রতিফলিত হয়ে পরস্পরের উপর অধ্যারোপিত হয় ও একটি জটিল ব্যতিকরণ আকৃতি উৎপন্ন করে। একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর এই আকৃতির ছাপ গ্রহণ করা হয় এবং পরে প্লেটকে ডেভেলপ করে আকৃতিটিকে প্লেটের উপর পাকা করে নেওয়া হয়। এই ভাবে যে প্লেট পাওয়া যায়, তারই নাম হোলোগ্রাম—ঐ বস্তুর হোলোগ্রাম। এবার উপযুক্ত পার্শ্ব ও কৌণিক ব্যবধান থেকে এই প্লেটের মধ্য দিয়ে লেসার রশ্মি প্রক্ষেপ করলে (চিত্র—১৩ দ্রষ্টব্য) প্লেটের উভয় পার্শ্বে মূল বস্তুর দুটি বাস্তবোপম ত্রৈমাত্রিক প্রতিকৃতি উৎপন্ন হয়। এদের একটি বাস্তব (Real) এবং অপরটি আভাসী (Virtual)। প্লেটের উপর যে দিক থেকে রশ্মি প্রক্ষেপ করা হয়, তার উল্টো পার্শ্বে দিয়ে উপযুক্ত কৌণিক অবস্থান থেকে প্লেটের উপর দৃষ্টিপাত করলে প্লেটের অপর পার্শ্বে (অর্থাৎ যে পার্শ্বে লেসার-উৎস রয়েছে, সেই
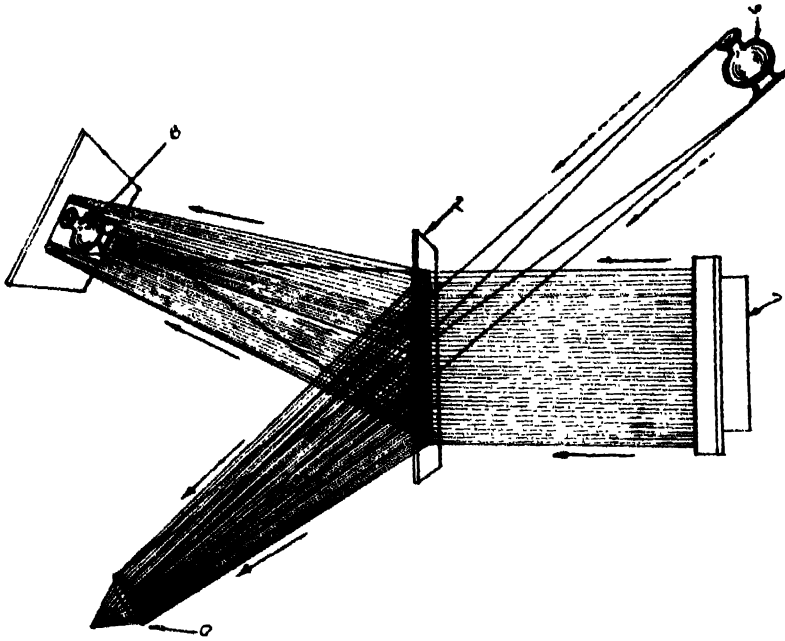
১৩নং চিত্র

হোলোগ্রাফি বা পূর্ণলেখন পদ্ধতিতে বস্তুর প্রতিকৃতি পুনরুৎপাদন পদ্ধতি। ১—লেসার-উৎস, ২—হোলোগ্রাম প্লেট, ৩—আভাসী প্রতিকৃতি, ৪—বাস্তব প্রতিকৃতি, ৫—লেন্স।

পার্শ্বে) ত্রৈমাত্রিক আভাসী প্রতিবিম্বটি দেখা যায়—জানালার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে যেভাবে আমরা বাইরের কোন কিছু দেখি, সেভাবে। ঐ একই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দর্শক নিজের ও প্লেটের মধ্যেকার ফাঁকা জায়গায় বস্তুটির একটি ত্রৈমাত্রিক বাস্তব প্রতিকৃতিকে অবলম্বনহীন ভাবে যেন বাতাসে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান। এই বাস্তব প্রতিকৃতিকে কোন পর্দা বা প্লেটের উপর গ্রহণ করা যেতে পারে বা তার ফটোগ্রাফ নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য পর্দা ছাড়াও এই বাস্তব প্রতিকৃতি দেখা সম্ভব।

ফটোগ্রাফি বনাম হোলোগ্রাফি

ফটোগ্রাফির সঙ্গে তুলনায় হোলোগ্রাফির বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝা সহজ। কাজেই সেভাবে কিছুটা আলোচনা করা যাক। (১) ফটোগ্রাফি তোলা হয় সাধারণ আলোয়, কিন্তু হোলোগ্রাফ তোলা হয় লেসার রশ্মির সাহায্যে। (২) ফটো-গ্রাফ তোলবার সময় ক্যামেরার লেন্স বা সূক্ষ্ম ছিদ্রের সাহায্যে ফটোগ্রাফের পর্দার উপর বস্তুর একটি স্পষ্ট প্রতিবিম্ব ফেলা হয় এবং সেই প্রতিবিম্বের চেহারা পর্দার উপর অঙ্কিত হয়ে যায়। ঐ চেহারা মূল বস্তুর চেহারার ঠিক উল্টো অর্থাৎ মূল চেহারার আলোকিত অংশ এতে অন্ধকার দেখায় এবং অন্ধকার অংশ আলোকিত দেখায়। ঐ পর্দার নাম নেগেটিভ প্লেট। নেগেটিভকে আলোর সামনে ধরলে ঐ উল্টো চেহারা স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং প্লেটে কোন্ বস্তু বা দৃশ্যের ছাপ আছে, তা বেশ বোঝা যায়। এই নেগেটিভ থেকে পরে অন্য বিশেষ কাগজে পজিটিভ প্রিন্ট করা হয়। এই প্রিন্টগুলিকেই আমরা আলোকচিত্র বলি। কিন্তু হোলোগ্রাফির ক্ষেত্রে কোন ক্যামেরা বা লেন্স বা পিন হোল লাগে না। ফলে হোলোগ্রাফের প্লেটের উপর বস্তুর কোন প্রতিবিম্ব পড়ে না বা অঙ্কিত হয় না। বস্তুর দেহ থেকে প্রতিফলিত আলোক-তরঙ্গের যে ব্যূহগুলি (Wave fronts) বেরিয়ে আসে, তাদের বিশিষ্ট আকৃতির ছাপ হোলোগ্রাফের প্লেটের উপর ধরে রাখা হয়। অবশ্য তরঙ্গগুলির বিশিষ্ট আকৃতির এই ছাপ সোজাসুজি নেওয়া যায় না, অন্য একটা সমতল ভূমি-তরঙ্গশ্রেণীর সঙ্গে তাদের অধ্যারোপণ ঘটিয়ে যে ব্যতিকরণ আকৃতি পাওয়া যায়, তারই ছাপ ধরে রাখা হয়। এই ছাপের মধ্য দিয়ে পরে লেসার রশ্মি প্রক্ষেপ করলে তবেই মূল বস্তুর দুটি বাস্তবোপম প্রতিকৃতি উৎপন্ন হয়। এদের একটি বাস্তব (Real) এবং অন্যটি আভাসী (Virtual)। কাজেই দেখা গেল, হোলোগ্রাফির ক্ষেত্রে কোন নেগেটিভ পাওয়া যায় না বা কোন উল্টো চেহারার ছাপ অঙ্কিত হয় না। হোলোগ্রাম প্লেটকে আলোর সামনে ধরলে তার মধ্যে মূল বস্তুর চেহারার কিছুই দেখা যায় না এবং ঐ প্লেটে যে কোন বস্তুর চেহারার ছাপ অঙ্কিত আছে, তার কিছুই বোঝা যায় না। হোলোগ্রাম প্লেটের চেহারা হয় ঘষা কাচের মত অস্বচ্ছ। অবশ্য প্লেটের মাঝে মাঝে রেখা, বৃত্ত বা অন্য কোন রকম আকৃতি দেখা যেতে পারে, কিন্তু সেগুলির সঙ্গে উৎপাদ্য প্রতিকৃতির কোন সম্পর্ক নেই। হোলোগ্রাম নেবার সময় বস্তুর পাশে যে সমতল প্রতিফলক আয়না বসানো হয়, তার উপর ধূলিকণা প্রভৃতি পড়বার ফলে এই সব আকৃতির উৎপত্তি হয়। হোলোগ্রাম প্লেটকে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ধরলে তার মধ্যে নানারকম হিজিবিজি আকৃতি দেখা যায় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে মূল বস্তুর চেহারার কোন সাদৃশ্য একেবারেই পাওয়া যায় না। হোলো-গ্রাফিতে বস্তুর পাশে রাখা হয় সমতল আয়না। বস্তুর দেহ অসমতল, কাজেই তার দেহ থেকে জটিল তরঙ্গশ্রেণী বেরিয়ে গিয়ে এক জটিল অর্থাৎ হিজিবিজি ব্যতিকরণ আকৃতি উৎপন্ন করে।

কিন্তু বস্তুকে সরিয়ে সেখানে যদি আর একটি সমতল আয়না বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এই নতুন সমতল আয়নাটি এখন হলো আমাদের বস্তু। অতএব এক্ষেত্রেও উভয় আয়না থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গগুলি ব্যতিকরণ আকৃতি সৃষ্টি করবে এবং তার ছাপ গ্রহণ করে হোলোগ্রাম তোলা যাবে। একে বলা যায় সমতল আয়নার (যে আয়নাটি নতুন বসানো হলো তার) হোলোগ্রাম। এরকম হোলোগ্রাম অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাতে আলো এবং আঁধারের সূক্ষ্ম ও সমান্তরাল একান্তর ডোরা আছে (ফ্রেনেলের দুই আয়না পরীক্ষার কথা স্মর্তব্য ; চিত্র—৯)। নতুন এই আয়নাটি যদি একটু অসমতল হয়, তবে ডোরাগুলি একটু আঁকাবাঁকা হয়ে যায়, কিন্তু তাদের ডোরা বলে চেনা যায়। কিন্তু আয়নার বদলে যে কোন জটিল গঠনের বস্তু বসিয়ে যে হোলোগ্রাম প্লেট পাওয়া যায়, তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে সর্বদাই হিজিবিজি আকৃতি দেখা যায়। (৩) একটি বাস্তব বস্তু তিন মাত্রায় অবস্থান করে. অর্থাৎ তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধ থাকে। কিন্তু যখনই এই বস্তুর ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়, তখনই তিন মাত্রা কমে গিয়ে হয়ে যায় দুই মাত্রা—কেন না, ফটোগ্রাফ কাগজের পৃষ্ঠায় তোলা হয়, আর কাগজের পৃষ্ঠা সমতল অর্থাৎ তাতে মাত্র দুটি মাত্রা আছে—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ। বেধ বা গভীরতা নেই। কাজেই কাগজের সমতলে কোন সত্যিকারের গভীরতা দেখানো সম্ভব নয়, যদিও আলো-ছায়া দিয়ে গভীরতার আভাস ফোটানো যায়। ভাল ফটোগ্রাফে এই আভাস খুব নিপুণতার সঙ্গে ফোটানো হয়। ত্রৈমাত্রিক চলচ্চিত্র (3-D Movie) বা ষ্টিরিয়ো-স্লাইডের সাহায্যে প্রক্ষেপণ পদ্ধতিতে প্রায় বাস্তব বস্তুর চেহারার মতই গভীরতার আভাস উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু তখনো একটা গলদ থেকে যায়। বাস্তব বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা মাথা ঘুরিয়ে বা বিভিন্ন কৌণিক অবস্থানে সরে গিয়ে বস্তুর পিছনটা দেখতে পারি এবং সেখানে আড়াল পড়া অন্য বস্তুকে দেখতে পারি। তাছাড়া বিভিন্ন কৌণিক অবস্থান থেকে একই বস্তুর বিভিন্ন পার্শ্বের চেহারা দেখতে পারি। ফটোগ্রাফ, ত্রৈমাত্রিক চলচ্চিত্র বা ষ্টিরিয়ো-স্লাইড—কোনটার ক্ষেত্রেই এটা সম্ভব হয় না। কিন্তু হোলোগ্রাফিতে এটা সম্ভব হয় এবং এটা তার একটা বড় বৈশিষ্ট্য। (৪) একটি ফটোগ্রাফকে যদি ছিঁড়ে টুক্‌রা করা যায় তবে তা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু একটা হোলোগ্রাম প্লেটকে টুক্‌রা টুক্‌রা করলে যতই ছোট টুক্‌রা হোক, প্রত্যেক টুক্‌রা থেকেই পূর্ণ আকারের সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি উৎপন্ন করা যায়। অবশ্য টুক্‌রা যত ছোট হয়, উৎপন্ন প্রতিকৃতির স্পষ্টতা ততই কমে যায়। বস্তু বা দৃশ্যের দেহের প্রতিটি বিন্দু থেকে প্রতিফলিত আলো হোলোগ্রাম প্লেটের প্রতিটি বিন্দুতে গিয়ে পড়ে এবং ব্যতিকরণ আকৃতিরূপে প্লেটের উপর ছাপ রেখে যায় বলেই এই 'বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন' সম্ভব। (৫) ফটোগ্রাফি এবং হোলোগ্রাফি উভয় ক্ষেত্রেই আলোক-সংবেদক পর্দারূপে ফটোগ্রাফির ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। একটা পর্দায় মাত্র একটাই ফটোগ্রাফ তোলা যায়, কিন্তু একই পর্দায় বেশ কয়েকটা বিভিন্ন বস্তুর হোলোগ্রাম গ্রহণ করা যায় এবং তাদের যে কোনটিকে অন্যগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অবস্থায় অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিকৃতির মধ্যে কোন মিশ্রণ না ঘটিয়ে পুনরুৎপন্ন করা যায়। লেসার রশ্মি পাতের কৌণিক অবস্থান একটু করে বদলে দিয়ে একই প্লেটে এই ভাবে বিভিন্ন বস্তুর প্রতিকৃতি গ্রহণ ও পুনরুৎপাদন করা সম্ভব হয়। আর একটু বেশী পুরু আলোক-সংবেদক পর্দা ব্যবহার করলে একই পর্দায় আরো বেশী সংখ্যক প্রতিকৃতি গ্রহণ ও পুনরুৎপাদন করা যায়।

হোলোগ্রাফির উদ্ভাবন ও উন্নয়নের ইতিহাস

হোলোগ্রাফির উদ্ভাবক বৃটিশ পদার্থবিদ্ ডেনিস গ্যাবর। ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের কথা প্রথম তাঁর মনে আসে। তখন তিনি ইংল্যাণ্ডের রাগবীতে বৃটিশ টমসন হাউস্টন কোম্পানীর গবেষণাগারের কর্মী ছিলেন। এখন এই প্রতিষ্ঠানের নাম হয়েছে এ. ই. আই. সেন্ট্রাল রিসার্চ লেবরেটরী, রাগ্বী। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে তিনি ওখানে এই বিষয়ে প্রথম গবেষণা সুরু করেন। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপীতে বড় রকমের স্পষ্টতা আনবার উপায় হিসাবেই তিনি প্রথম এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীতে তিনি তাঁর গবেষণার প্রথম সাফল্য লাভ করেন। ঐ সময়ে তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে লব্ধ একটি বস্তুর প্রতিবিম্বকে হোলোগ্রাফিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করতে সক্ষম হন। এরপর লণ্ডনের বিখ্যাত বিজ্ঞান সাপ্তাহিক 'নেচার' পত্রিকার ঐ বছরের ১৫ই মে সংখ্যায় তাঁর এই নব-উদ্ভাবিত পদ্ধতির সাফল্যের সংবাদ সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে ডাঃ গ্যাবর লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্নোলজীতে অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন। সেখানকার গবেষণাগারেও তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং এই পদ্ধতিকে আরও উন্নত করে তুলতে চেষ্টা করেন।

এদিকে পদ্ধতিটিকে কার্যকরীভাবে রূপদানের জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবেষণাগারে কাজ সুরু হয়। এদের মধ্যে ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্ কার্কপ্যাট্রিক, হাজিন ও এল-সাম, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেট লেথ ও জুরিস ইউপাটনিক্স এবং বৃটেনের অ্যাল্ডারমাসটনে এ. ই. আই. রিসার্চ লেবরেটরীর হাইনে ও তাঁর সহকর্মীদের নাম উল্লেখযোগ্য। এসব ১৯৬০ সালের আগের কথা। তখনও লেসার রশ্মি আবিষ্কৃত হয় নি। ফলে যথেষ্ট জোরালো সুসঙ্গত (Coherent) আলোর অভাবে এদের কারো গবেষণাই সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি উৎপাদনে সক্ষম হতে পারে নি। এই সময়ে মার্কারী আর্ক ল্যাম্প থেকে নির্গত আলোকে পর পর 'কালার ফিল্টার' এবং 'পিন-হোলে'র মধ্য দিয়ে চালিত করে আলোর সঙ্গতি বিধান করে নিয়ে ব্যবহার করা হতো। স্বভাবতঃই এই আলোর জোর খুব বেশী নয়, কাজেই এর সাহায্যে সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি উৎপন্ন করা যেত না। অতঃপর ১৯৬০ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী মাইম্যান যখন সর্বপ্রথম হাতে-কলমে লেসার রশ্মি উৎপাদন করতে সক্ষম হলেন, তখন হোলোগ্রাফির আলোর উৎস হিসাবে ঐ রশ্মি ব্যবহৃত হতে লাগলো এবং তাতে হোলোগ্রাফির উন্নয়নমূলক গবেষণা দ্রুত এগিয়ে চললো। রুবি নামক কঠিন খনিজ পদার্থের অনুকরণে তৈরি কৃত্রিম রুবি ব্যবহার করে পাওয়া যেত লেসার রশ্মির চকিত চমক। কিন্তু পরে আর্গন ও হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করে একটানা লেসার রশ্মি উৎপাদন সম্ভব হয়। এই একটানা রশ্মি ব্যবহার করা সুবিধাজনক। কাজেই এবার হোলোগ্রাফির উন্নয়নমূলক গবেষণা দ্রুততর হয়ে উঠলো। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারেই এই গবেষণা সর্বাধিক সাফল্য লাভ করে। ১৯৬৪ সালের বসন্তকালে মিশিগানের এমেট লেথ এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মী ওয়াশিংটনে আমেরিকার অপটিক্যাল সোসাইটির এক সভায় তাঁদের তৈরি কয়েকটি হোলোগ্রাম থেকে প্রতিকৃতি পুনরুৎপাদন করে দেখান। উপস্থিত সকলে এই নতুন পদ্ধতিটি দেখে খুবই বিস্মিত হন। এর পর থেকে হোলোগ্রাফি সম্পর্কে সর্বত্র আগ্রহ সঞ্চারিত হয় এবং বহু গবেষণাগারে ব্যাপকভাবে কাজ সুরু হয়।

রঙীন হোলোগ্রাফি

লেসার রশ্মি মূলতঃ একরঙা। এই একরঙা আলো দিয়ে হোলোগ্রাম গ্রহণ ও পুনর্গঠন করলে যে প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, তাও হয় একরঙা। কিন্তু স্বাভাবিক বস্তুর দেহে বিভিন্ন রঙের সমাবেশ থাকে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও একটি রঙের লেসার রশ্মি ব্যবহার করে সেই এক রঙের প্রতিকৃতিই পাওয়া যেত। ১৯৬৫ সালে বেল টেলিফোন লেবরেটরীর দু-জন গবেষক পেনিংটন ও লিন দুই রঙের দুটি লেসার রশ্মি যুগপৎ ব্যবহার করে হোলোগ্রাম উৎপন্ন করেন। রং দুটি ছিল লাল ও নীল। এই দুটি প্রাথমিক রং আপনা থেকে মিশ্রিত হয়ে বহু রঙের প্রতিকৃতি উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রঙের হোলোগ্রাম-প্রতিকৃতি উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডেনিস্যুক। অধ্যাপক লিপম্যান ১৯০৮ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তাঁর রঙীন ফটোগ্রাফির পদ্ধতি, তথা ব্যতিকরণ পদ্ধতিতে রং পুনরুৎপাদনের কৌশল আবিষ্কারের জন্যে। অধ্যাপক ডেনিস্যুকের পদ্ধতিটিও লিপম্যানের পদ্ধতির অনুরূপ। একই সাদা-কালো ফিল্মের উপর বিভিন্ন রঙের লেসার রশ্মি উপযুক্ত কৌণিক অবস্থান থেকে যুগবৎ সম্পাত করে প্রতিটি রঙের নিজস্ব ব্যতিকরণ আকৃতির ছাপ গ্রহণ করা হয়। ফিল্ম যদি পুরু হয়, তবে সে ক্ষেত্রে ঐ আকৃতির উপর পরে সাধারণ সাদা আলো সম্পাত করলে সাদা আলোর বিভিন্ন উপাদান-রঙে আপনা থেকে ভেঙে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ রঙীন অর্থাৎ স্বাভাবিক রঙের প্রতিকৃতি উৎপন্ন করে। পুরু ফিল্ম এক্ষেত্রে সাদা আলোর স্পেকট্রাল ফিল্টাররূপে কাজ করে।

দেখা যাচ্ছে, এই কৌশলে প্রতিকৃতি পুনর্গঠনের সময় কোন লেসার আলো লাগে না। কিন্তু সাধারণ পদ্ধতিতে হোলোগ্রাম গ্রহণ ও প্রতিকৃতি পুনর্গঠন—এই উভয় পর্যায়েই লেসার রশ্মি লাগে। নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী দুটি পর্যায়ের একটিতে লেসার আলো বাদ দেওয়া যায় বলে হোলোগ্রাফির সমগ্র ব্যয় অনেক কমে যায়—কেন না, লেসার-উৎস খুবই মূল্যবান - এক-একটির মূল্য অন্ততঃ কয়েক হাজার ডলার।

হোলোগ্রাফিক পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র

এই বিষয়ে গবেষণা খানিক দূর অগ্রসর হয়েছে। একই হোলোগ্রাম পর্দার উপর অনেকগুলি বস্তু বা দৃশ্যের ব্যতিকরণ আকৃতি পর পর সামান্য কৌণিক ব্যবধানে গ্রহণ করা হয়। এর জন্যে হোলোগ্রাম প্লেটটি যথেষ্ট পুরু থাকা চাই। এরপর এই সব বিভিন্ন কৌণিক ব্যবধান থেকে অল্প সময়ের তফাতে পর পর আলোকপাত করলে সিনেম্যাটোগ্রাফির মতই পর পর প্রতিকৃতিগুলি একই অবস্থানে ফুটে উঠবে। এর জন্যে আলো এবং প্লেট—এই দুটির যে কোনটিকে স্থির রেখে অন্যটিকে দ্রুত সরানো বা ঘোরানো যেতে পারে। মিশিগান ইউনিভার্সিটির এমেট লেথ, জুরিস ইউপাটনিক্স ও জর্জ স্ট্রোক একত্রে এই পদ্ধতিটি গড়ে তুলেছেন। অবশ্য তাঁদের এই গবেষণার মূলে অন্য দু-জন বৈজ্ঞানিকের দান রয়েছে। এঁরা হলেন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডেনিস্যুক এবং আমেরিকার পোলারয়েড কর্পোরেশনের গবেষক ডাঃ হীরডেন। এঁরা উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন যে, পুরু ফিল্মের মধ্যে বহুসংখ্যক বিভিন্ন ব্যতিকরণ আকৃতি গ্রহণ করা যায়। বস্তুতঃ লেথ প্রভৃতির হোলোগ্রাফি চলচ্চিত্র উৎপাদনের গবেষণা এই তত্ত্বেরই সম্প্রসারণ।

হোলোগ্রাফির ব্যবহার

(১) চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে হোলোগ্রাফির ব্যবহারের কথা আগেই বলা হয়েছে।

(২) টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও হোলোগ্রাফির ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে, তবে এখনো বিশেষ সাফল্য আসে নি।

(৩) মাইক্রোস্কোপিতে হোলোগ্রাফির ব্যবহার: ক্যামেরা বা মাইক্রোস্কোপে বস্তুর যে প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়, তার জন্যে লেন্স লাগে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ বা এক্স-রে মাইক্রোসকোপের ক্ষেত্রে যে সব লেন্স লাগে, সেগুলি তৈরি করা খুবই শ্রমসাধ্য। তাই লেন্স বাদ দিয়ে নতুন কৌশলে প্রতিবিম্ব উৎপাদনের উপায় হিসাবেই ডেনিস গ্যাবর হোলোগ্রাফির উদ্ভাবন করেছিলেন। সম্প্রসারিত লেসার রশ্মি ব্যবহারে প্রতিবিম্ব পুনর্গঠন করে যে বেশ বড় রকমের বিবর্ধন পাওয়া সম্ভব, গ্যাবর তা নিজে এবং এল-সাম ও বেজ দেখিয়েছেন। শেষোক্ত দু-জন স্ট্যানফোর্ডের গবেষক। এই বিষয়ে আরেকটা খুব বড় কৌশল এঁরা আবিষ্কার করেছেন, যাতে এক রকম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি দিয়ে হোলোগ্রাম তুলে অন্য রকম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মির সাহায্যে তাকে পুনর্গঠন করা যায়। অতি ক্ষুদ্র কোন বস্তু, যার আয়তন দৃশ্য আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষাও ছোট, দৃশ্য আলো দিয়ে তার প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করা যায় না। ইলেট্রন রশ্মি বা এক্স-রে দিয়ে এই সব বস্তুর হোলোগ্রাম তুলে পরে দৃশ্য আলো দিয়ে তাথেকে বিবর্ধিত প্রতিকৃতি পুনর্গঠিত করে খালি চোখে তাকে দেখা যেতে পারে। এই পথে গবেষণা আরও সফল হলে কোন দিন হয়তো পরমাণুর রাজ্যের ক্রিয়াকাণ্ডও খালি চোখেই দেখা সম্ভব হবে।

(৪) ক্লাশ রুমে মডেলের সাহায্যে ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু মডেলের বদলে হোলোগ্রাফির সাহায্যে আসল বস্তুর বাস্তববোপম প্রতিকৃতি উৎপন্ন করে আরো ভালভাবে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।

(৫) মিশিগানের দু-জন গবেষক—পাওয়েল ও স্টেটন হোলোগ্রাফির সাহায্যে কোন কম্পনশীল বস্তুর কম্পনের ধরণ ও সেই কম্পনের জোর বা প্রসার নির্ণয়ের কৌশল বের করেছেন। কারখানার কোন যন্ত্রাংশ হয়তো অযথা সামান্য কাঁপতে সুরু করেছে। এই কম্পনের কারণ নির্ণয় করা দরকার, তা না হলে এথেকে ভবিষ্যতে কোন বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কম্পনের কারণ নির্ণয় করতে হলে তার চারিত্রিক অবস্থা আগে জানা দরকার অর্থাৎ জানা দরকার, কম্পনের ধরণ কি এবং তার জোরই বা কতটা। কল চালু হলেই বস্তুটি কাঁপতে সুরু করে। বস্তুটিকে সেখান থেকে না সরিয়ে হোলোগ্রাফিক পদ্ধতিতে তার কম্পনের চরিত্র নির্ণয় করা যায়। কম্পিত বস্তুর উপর লেসার রশ্মি সম্পাত করলে কম্পনের ধরণ ও প্রসার অনুযায়ী প্রতিফলিত রশ্মির সঙ্গতি (Coherence) নষ্ট হয়। কাজেই এই অবস্থায় বস্তুটির হোলোগ্রাম গ্রহণ করে প্রতিকৃতি পুনর্গঠিত করলে মূল বস্তুর কিছুটা বিকৃত চেহারা উৎপন্ন হয়। মূল বস্তুকে স্থির অবস্থায় রেখে তার সঙ্গে এই উৎপন্ন চেহারার বিকারের ধরণ ও পরিমাণের তুলনা করলে কম্পনের চরিত্রও জানা যায়। তখন তার কম্পনের কারণটিও সহজেই খুঁজে বের করা সম্ভব।

(৬) ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর বার্লিংটনে অবস্থিত "টেক্‌নিক্যাল অপারেশন ইন্‌ক্‌"-এর কর্মীগণ ডিসড্রোমিটার নামক এক প্রকার যন্ত্র তৈরি করেছেন, যাতে গতিশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার আকার ও অবস্থান রুবি-লেসারের চকিত চমক দিয়ে হোলোগ্রাফিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়। এই পদ্ধতিতে আকাশে ভাসমান কুয়াশা-কণিকার আকার, অবস্থান ও পরিমাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক খবর জানা সম্ভব হয়েছে। বিমান চালনা এবং কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটাবার ব্যাপারে এই পদ্ধতি খুবই সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

(৭) ভ্যাণ্ডার লাগ্‌ট নামক এক জন গবেষক হোলোগ্রাফির সাহায্যে এমন এক পদ্ধতি বের করেছেন, যাতে পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া কোন বিশিষ্ট চেহারার বস্তুকে অন্যান্য চেহারার বস্তুর মধ্য থেকে খুঁজে বের করা সম্ভব। রক্তের মধ্যে নানা চেহারার কণিকা থাকে। শরীর অসুস্থ হলে এই সব কণিকার কোনটার সংখ্যা কমে যায়, কোনটার বা বেড়ে যায়। তাছাড়া নতুন চেহারার কোন রোগ-বীজাণুও দেখা দিতে পারে। রক্ত পরীক্ষার সময় এই সব বিভিন্ন চেহারার কণিকার অস্তিত্ব ও সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। পার্কিন এলমার নামক জনৈক গবেষকও দেখিয়েছেন যে, হোলোগ্রাফিক পদ্ধতির সহায়তায় এই কাজ খুব দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে করা সম্ভব। জেনারেল ইলেকট্রিকের কর্মীরা দেখিয়েছেন যে, কম্পিউটার যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি খুবই সহায়ক হবে।

(৮) গোপন দলিল পাচারে হোলোগ্রাফির ব্যবহার: কোন বস্তু বা দৃশ্যের হোলোগ্রাম গ্রহণ করলে যে প্লেটটি পাওয়া যায়, তার মধ্যে মূল বস্তুর কোন চেহারা এমনিতে দেখা যায় না। প্লেটকে জোরালো আলোর সামনে ধরে বা মাইক্রোস-কোপের সাহায্যেও তা দেখা সম্ভব নয়। উপযুক্ত কৌণিক অবস্থান থেকে প্লেটের উপর লেসার রশ্মি সম্পাত করে প্রতিকৃতি পুনর্গঠন না করা পর্যন্ত মূল বস্তুর চেহারা উৎপন্ন হবে না। লেসারের কৌণিক অবস্থানটি ঠিকমত জানা না থাকলে সহজে প্রতিকৃতি পুনর্গঠন করা যায় না। কাজেই কোন গোপন বস্তুর প্রতিকৃতি বা চিত্র এই পদ্ধতিতে শত্রুর চোখে ধুলা দিয়ে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে পাচার করা যায়। এছাড়া আরও একটু কৌশল করলে গোপনীয়তা রক্ষা সম্বন্ধে আরও বেশী নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বস্তুটির হোলোগ্রাম গ্রহণ করবার সময় ব্যবহার্য লেসার রশ্মিকে যদি একটা ঘষা কাচের প্লেটের মধ্য দিয়ে পার করিয়ে বস্তু ও আয়নায় সম্পাতিত করা হয়, তবে প্রতিকৃতি পুনর্গঠনের সময় লেসার-উৎসের সামনে উপযুক্ত কৌণিক অবস্থানে ঐ ঘষা কাচখানিকে না ধরা পর্যন্ত কিছুতেই বস্তুটিকে চিনতে পারবার মত কোন প্রতিকৃতি উৎপন্ন হবে না।

(৯) হোলোগ্রাফি ব্যবহারের ইতিহাসে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়েছেন ডাঃ লোম্যান নামক আই. বি. এম-এর একজন গবেষক। কম্পিউ-টারের সহায়তায় নিয়ন্ত্রিত আলোক সম্পাতের দ্বারা তিনি এমন সব বস্তুর হোলোগ্রাম তুলেছেন, যেগুলি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও নেই। কোন বস্তুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে যদি কম্পিউটারে ব্যবহারযোগ্য গাণিতিক পরিভাষায় রূপান্তরিত করা যায়, তবে বস্তুটি উপস্থিত না থাকলেও এই পদ্ধতিতে তার হোলোগ্রাম উৎপন্ন করা যায়। তেমনি যে কোন প্রকল্পিত বস্তুকে এই পদ্ধতিতে রূপদান করে দেখে নেওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে কোন দিন হয়তো এই ভাবে গণিতের বুদ্ধিগ্রাহ্য অথচ অতীন্দ্রিয় দুরূহ তত্ত্বগুলিকেও রূপদান করা সম্ভব হবে। প্রশ্ন করা যেতে পারে, এই ভাবে মনের কোন গূঢ় ভাবকেও কি কোন দিন রূপদান করে দৃষ্টিগোচরে আনা যাবে? যদি তা যায়, তাহলে এমন একদিন আসতে পারে, যখন মডার্ণ আর্টের শিল্পীরা রং-তুলি ছেড়ে হোলো-গ্রাফির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলবেন নিত্য নবরূপের পশরা। আরও এক ধাপ এগিয়ে প্রশ্ন করা যায়—শেষে এক দিন সেই চরম অধরা এবং পরম প্রকল্পিত (অর্থাৎ মনগড়া) ঈশ্বরকেও কি

তাঁরা হোলোগ্রাফির মাধ্যমে কারগ্রহণ করিয়ে বস্তুবিশ্বের আলোর হাটে নামিয়ে আনতে পারবেন ?

যাহোক, কল্পনা রেখে সোজা কথায় বলা যায়, হোলোগ্রাফির আরও নানারকম ব্যবহার ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এরকম আরও অনেক হবে। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগবিদ্দের কাছে হোলোগ্রাফি এক অভিনব ও শক্তিশালী হাতিয়ার বলে ইতি-মধ্যেই গণ্য হতে সুরু করেছে।

কাচ

মঞ্জুরা বিশ্বাস

প্রাত্যহিক জীবনে কাচের তৈরি বহু জিনিষ আমরা ব্যবহার করি ও দেখতে পাই। এই কাচ জিনিষটা কি এবং কি ভাবেই বা বিভিন্ন রঙের এবং নানা রকমের কাচ তৈরি হয়, তা নিয়ে কিছু আলোচনা করবো।

বালি আর সোডা একসঙ্গে পুড়িয়ে অতি প্রাচীন কালেই মিশর দেশে কাচ তৈরি হয়েছিল। মিশরের এই আবিষ্কার ভেনিসের মাধ্যমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচার লাভ করে। তবে কোন্ দেশে কাচ সর্বপ্রথম তৈরি হয়েছে, সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা সঠিক কিছু বলতে পারেন না। ভারতবর্ষে সিন্ধুনদের তীরে যে দুটি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাথেকে বোঝা যায়, তখন কাচের প্রচলন ছিল। তবে এমন কতকগুলি দৃষ্টান্ত আছে, যা থেকে মনে হয়, মিশর দেশেই প্রথম কাচ তৈরি হয়েছিল। এই কাচ তৈরি করতে গেলে কতকগুলি খনিজ ও রাসায়নিক পদার্থের দরকার হয়। সাধারণতঃ বালি, সোডা, সোডিয়াম সালফেট, পটাশ, লেড অক্সাইড, চুন বা চুনাপাথর ইত্যাদি এই কাজে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কাচের প্রকৃতি নির্ভর করে কোন্ উপাদান বালির সঙ্গে কি পরিমাণে মেশানো হচ্ছে—তার উপর। রঙীন কাচ তৈরির জন্যে কতকগুলি বিশেষ ধাতব অক্সাইডের দরকার হয়ে থাকে। যেমন—নীল কাচ প্রস্তুতির জন্যে কোবাল্ট ও কপার অক্সাইড, লাল কাচের জন্যে সোনা, সেলেনিয়াম ও কপার অক্সাইড, সবুজ কাচের জন্যে ক্রোমিয়াম ও ফেরিক অক্সাইডের প্রয়োজন হয়। আবার সাদা কাচ তৈরি করতে গেলে কতকগুলি সাদা রঙের রাসায়নিক পদার্থ, যথা—ক্রাইওলাইট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ষ্ট্যানিক অক্সাইড ইত্যাদি মেশানো হয়। স্বচ্ছ কাচ তৈরি করবার জন্যে কোন সাদা বা রঙীন রাসায়নিক পদার্থ মেশাতে হয় না। সে ক্ষেত্রে কাচ তৈরির উপাদানগুলিকে বিশুদ্ধ করে নেওয়া খুবই প্রয়োজন। সচরাচর আমরা যে সব কাচ দেখতে পাই (শিশি, বোতল ইত্যাদির কাচ) সেগুলি খুব স্বচ্ছ নয়। সেগুলি দেখতে সামান্য সবুজ বা হলদে। এর কারণ, বিশুদ্ধ করবার পরেও কাচের উপাদানের মধ্যে সামান্য লোহা ময়লা হিসাবে থেকে যায়। বালি অর্থাৎ সিলিকনের অক্সাইডের সঙ্গে এই লোহার বিক্রিয়ায় ফেরাস সিলিকেট তৈরি হয়। এই ফেরাস সিলিকেটের জন্যে কাচের তৈরি জিনিষের গায়ে হাল্কা সবুজ বা হলদে রং দেখা যায়। ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড জাতীয়

রঞ্জক পদার্থ যোগ করলে ফেরাস সিলিকেট রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ফেরিক সিলিকেটে পরিণত হয়। এর সামান্য হল্‌দে রং ম্যাঙ্গানিজের ঈষৎ বেগুনী রঙের দ্বারা নষ্ট হয়ে যায় আর কাচ স্বচ্ছ দেখায়। তবে লোহার পরিমাণ খুব সামান্য (শতকরা '০২ ভাগ অপেক্ষাও কম) থাকলে জারিত অবস্থায় গলাবার পর লোহার রং প্রকাশ পায় না।

তাপ দিলে কাচ তরল অবস্থায় পরিণত হয়। বিভিন্ন কাচ বিভিন্ন উপাদানে তৈরি বলে কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গলে না। তাই কাচকে কঠিনীভূত প্রবাহী (Solid fluid) বলে। সাধারণ তাপমাত্রা কাচের গলনাঙ্কের তুলনায় অনেক কম বলে এই তাপমাত্রায় কাচ কঠিন অবস্থায় থাকে। এই কারণে কাচকে বলা হয় গলনাঙ্কের নীচে শীতলীকৃত ঘন তরল পদার্থ। কাচ যে সব ধাতব সিলিকেটের মিশ্রণ, তাদের মধ্যে অবশ্যই একটা ক্ষারীয় ধাতুর সিলিকেট থাকে। কাচের সঙ্কেত (Formula) মোটামুটিভাবে ধরা হয়—nR_2O, mBO, $6SiO_2$, যেখানে R একটি ক্ষারীয় ধাতু অর্থাৎ সোডিয়াম, পটাশিয়াম জাতীয় ধাতুর পরমাণু বুঝায় ও B একটা দ্বিযোজী ধাতুর পরমাণু এবং n ও m যে কোন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা বুঝায়।

কাচ তৈরির খনিজ উপাদানগুলি প্রথমে যন্ত্রের সাহায্যে পেশাই করে নেওয়া হয়। তারপর রাসায়নিক উপাদানগুলি বিশুদ্ধ করে এর সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণটিকে অগ্নিসহ নক্ষম মৃত্তিকায় তৈরি কুম্ভ ভাঁটি (Pot furnace) অথবা কুণ্ড ভাঁটিতে (Tank furnace) গলানো হয়। মিশ্রণ তাড়াতাড়ি গলাবার জন্যে এর সঙ্গে ভাঙ্গা কাচ (Cullet) উপযুক্ত পরিমাণে মেশানো দরকার। প্রডিউসার গ্যাসের দহনের সাহায্যে উপরিউক্ত চুল্লীতে প্রায় ১৪০০° সেঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা থাকে। প্রডিউসার গ্যাস প্রধানতঃ কার্বন মনোক্সাইড ও নাইট্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ। উচ্চতাপে কাচ গলে গিয়ে ফেনার আকারে চুল্লীর ভিতরে রক্ষিত পাত্র থেকে উপ্‌চে পড়ে। তখন এই গলিত কাচ বাইরে এনে বিভিন্ন ছাঁচে ফেলে ঠাণ্ডা করে আমাদের ব্যবহারের উপযোগী জিনিষপত্র তৈরি করা হয়।

উপাদানের তারতম্য অনুযায়ী কাচও বিভিন্ন রকমের; যেমন—

(১) নরম কাচ—(Na_2O, CaO, $6SiO_2$) সাধারণতঃ বালি, সোডা ও চুনের মিশ্রণ একসঙ্গে গলিয়ে এই কাচ তৈরি হয়। চুনের বদলে বেরিয়াম অক্সাইড দিলে কাচ আরও সহজে গলে এবং ঔজ্জ্বল্যও অনেক বাড়ে। এই কাচ দিয়ে জানলার কাচ, রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈরি হয়।

(২) শক্ত কাচ—(K_2O, CaO, $6SiO_2$) এই কাচ পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়ামের সিলিকেটের মিশ্র যৌগ। উচ্চতাপ সহ নক্ষম এই কাচ দিয়ে পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি তৈরি হয়।

(৩) ফ্লিণ্ট কাচ (K_2O, PbO $6SiO_2$)—বালি, পটাশ ও লেড অক্সাইড মিশিয়ে তৈরি এই কাচ দিয়ে লেন্স, প্রিজম, বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্‌ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এই কাচ গলাবার সময় বিজারক শিখার সংস্পর্শে আসতে দেওয়া হয় না। কারণ, লেড সিলিকেট বিজারিত হয়ে যে কালো লেড উৎপন্ন করে, তা কাচের স্বচ্ছতা নষ্ট করে দেয়।

(৪) বোতলের কাচ—সোডা, চুন ও লোহার অক্সাইড মিশিয়ে এই কাচ তৈরি হয়। এই কাচ সাধারণতঃ শিশি-বোতল তৈরির কাজে ব্যবহার করা যায়।

(৫) জেনা ও পাইরেক্স—জেনা প্রধানত বালি, জিঙ্ক ও বোরন অক্সাইড এবং পাইরেক্স কাচ বালি, সোডা, অ্যালুমিনা ও বোরনের অক্সাইড দ্বারা গঠিত। এই কাচগুলি উচ্চ তাপ ও

রাসায়নিক পদার্থের তীব্র ক্ষয়-ক্ষমতা (Corrosive power) সহ্য করতে পারে।

এই সব কাচ ছাড়াও বরো সিলিকেট, ফসফো সিলিকেট, গলিত সিলিকা, কঠিন কাচ (মোটর গাড়ীতে যেগুলি ব্যবহার করা হয়), বুলেট-প্রুফ কাচ ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের কাচ আছে। এগুলির মধ্যে বোরো সিলিকেট কাচে সোডা বা পটাশ ব্যবহার না করলে তার মধ্য দিয়ে সহজে অতিবেগুনী রশ্মি প্রবেশ করতে পারে। এই ক্ষারহীন কাচ দিয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও ফটোগ্রাফীর লেন্স তৈরি হয়—যা দিয়ে অনেক দূরের আকাশে অবস্থিত নক্ষত্র ইত্যাদির ছবি তোলা যায়।

আজকাল কাচ নানা দিক দিয়ে মানুষের বিলাস-সামগ্রীর উপকরণ জোগাচ্ছে। যার বেশ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় মেয়েদের চুড়ি, নকল মণি, পুঁতি ইত্যাদির ব্যবহারে। মূল কাচের উপাদানের সঙ্গে পটাশ, লেড ইত্যাদির ব্যবহারে কাচের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ মিশিয়ে নকল মণি তৈরি করা হয়।

চশমার লেন্স, প্রিজম ইত্যাদি তৈরি করবার জন্যে ব্যবহৃত কাচের প্রতিসরণ (Refraction), বিচ্ছুরণ (Dispersion), অতি-বেগুনী রশ্মির বিশোষণ ইত্যাদির হার সম্পর্কীত বিশেষ গুণ থাকা দরকার।

নানা প্রকার স্থায়ী রঞ্জক পদার্থ দিয়ে কাচের উপর ছবি এঁকে সেগুলিকে মাফ্‌ল ফার্নেসে পোড়ানো হয়। এর ফলে রঞ্জক পদার্থ গলে গিয়ে কাচের গায়ে এঁটে যায় ও সহজে নষ্ট হয় না। এছাড়া কাচপাত্রের উপর ধাতুর সূক্ষ্ম প্রলেপ দিয়ে এক সহজ পদ্ধতিতে (চমক দান প্রথা) কাচের শোভা বাড়ানো হয়। যে আয়না ছাড়া আমাদের দিন চলে না, সেটা আর কিছুই নয়—কাচের একপৃষ্ঠে বিশুদ্ধ রূপার প্রলেপ দিয়ে তৈরি। কাচের গায়ে রং ছাড়া ছবি অনেক সময় আমাদের চোখে পড়ে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে দরকারমত কাচকে ক্ষয় করে এগুলি তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতির নাম অম্ললেখন (Etching)।

কাচ-শিল্প দিনের পর দিন বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাবে প্রসার লাভ করছে। আজকাল কাচের তৈরি উল, ইট, টালি ও পাতের ব্যবহার খুবই প্রচলিত। কাচের এই বহুল ব্যবহারের দিনে মনে হয়, কাচ আবিষ্কার না হলে কি অবস্থা হতো। বর্তমানে প্লাষ্টিক আবিষ্কারের ফলে কাচের সাধারণ চাহিদা একটু কমেছে। কিন্তু তবুও বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে ও মানুষের নিত্যপ্রয়োজনে কাচ অত্যাবশ্যকীয় বস্তু, সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞান-সংবাদ

দক্ষিণ মেরুর ভূতাত্ত্বিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা

আমেরিকার ন্যাশন্যাল ফাউণ্ডেশন গত ২১শে সেপ্টেম্বর একটি ঘোষণায় জানিয়েছেন যে, ১৯৬৭-৬৮ সালে দক্ষিণ মেরুতে বরফ-স্তূপের মধ্যে দেড় মাইল গভীর একটি গর্ত খননের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এইরূপ গভীর গর্ত এই অঞ্চলে আর খনন করা হয় নি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে এই বরফাচ্ছাদিত বিশাল ভূখণ্ডের আবহাওয়া এবং গত ৩০ হাজার বছর ধরে এখানে যে ভূতাত্ত্বিক অবস্থা গড়ে উঠেছে, সে বিষয়ে অনেক কিছু জানা যাবে। এই সকল তথ্যাদি এই অঞ্চলের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের উপরও আলোকপাত করবে।

বার্ড কেন্দ্রের বরফের স্তূপেই এই খনন-কার্য চালানো হবে। বরফের স্তূপ থেকে খনন যন্ত্রপাতির উচ্চতা হবে ১০ ফুটেরও বেশী। বরফের নীচে সুড়ঙ্গ খনন করেই ঐ সকল যন্ত্রপাতি রাখা হবে এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে ১১ লক্ষ ডলার ব্যয়ে ৬০টি বিষয়ে পরীক্ষা চালানো হবে। এই সকল পরীক্ষার মধ্যে এটিই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই সকল পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যয়ভার ফাউণ্ডেশনই বহন করবে।

গত বছর পরীক্ষামূলকভাবে এই বার্ড কেন্দ্রেই গর্ত খননের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১১১ ফুট নীচ পর্যন্ত খনন করা হয়েছিল, কিন্তু দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে শীত ঋতু সুরু হওয়ায় এই কাজে আর এগোনো যায় নি।

ফাউণ্ডেশন জানিয়েছে যে, এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্যাদি সংগৃহীত হবে: মেরু অঞ্চলে কি হারে বরফ জমা হয় ও গলে যায়, তা জানা যাবে। তাছাড়া বিভিন্ন ঋতুতে ঐ অঞ্চলে তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে। এই বিষয়ে এবং গত ত্রিশ হাজার বছরে দক্ষিণ মেরু এলাকায় বার্ষিক গড় তাপমাত্রা কি পরিমাণ ছিল, তাও জানা যাবে। উল্কাকণা মহাকাশ থেকে এই অঞ্চলে সঞ্চিত হচ্ছে। এই সকল কণার প্রকৃতি কি রকম, কি হারে সঞ্চিত হচ্ছে—ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদি সংগৃহীত হবে। গ্রহান্তর-যাত্রী মহাকাশচারীদের পক্ষে এই সকল তথ্য খুবই কাজে লাগবে। বরফের প্রাকৃতিক গুণাবলী এবং বরফের নীচে যে প্রস্তর রয়েছে, তাদের সম্পর্কেও এই পরিকল্পনা অনুসারে তথ্য সংগৃহীত হবে। এর ফলে প্রাচীন যুগের হিমবাহ এবং যে বিরাট বরফ খণ্ডগুলি ভেসে বেড়ায়, তাদের সম্পর্কে এবং ঐ বরফের মধ্যে যে বাতাস আট্‌কে পড়ে আছে, তা বিশ্লেষণ করে পৃথিবীর আদিম কালের আবহাওয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যেতে পারে।

একটি নতুন শক্তিশালী কম্পিউটার

বৃটেনে কম্পিউটারের এমন একটি মডেল তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যা প্রতি সেকেণ্ডে ১,০০০,০০০ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। এটির উৎপাদন-কার্য এখনও সম্ভব হয় নি। তবে এটি যে সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

যন্ত্রটির নাম '১৯০৬-এ'—এটি ইন্টারন্যাশন্যাল কম্পিউটার অ্যাণ্ড ট্যাবুলেটর্স-এর ১০০০ সিরিজের সর্বাধুনিক সংযোজন। যন্ত্রটি আই-সি-টির 'অ্যাটলাস' কম্পিউটারের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিশালী এ...

'১৯০৬-এ' যন্ত্রটি বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশৈল্পিক উভয় রকমের কাজের উপযোগী হয়েছে। তাছাড়া অনেক নতুন রকমের বৈশিষ্ট্য এতে লক্ষ্য করা যাবে। অতিমাত্রায় কম্পিউটিং ক্ষমতা দেবার জন্যে এতে ব্যবহৃত হয়েছে নতুন সার্কিট টেক্‌নোলজি। ১৯০০ সিরিজের ৯০০-এর বেশী কম্পিউটার ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থা, গবেষণা সংগঠন ও গভর্ণমেন্টের কাছে বিক্রয় করা হয়েছে। কোম্পানী তাঁদের উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ বাইরে রপ্তানী করে থাকেন। তাঁরা আশা করছেন, '১৯০৬-এ' বিশ্বের সর্বত্র সাড়া জাগাতে পারবে। যন্ত্রটির সরবরাহ সুরু হবে ১৯৬৯ সালের শেষাশেষি।

ক্ষয়-নিরোধক পেণ্ট

পাঁচ বছরেরও বেশী সময় ধরে গবেষণার পর একটি বৃটিশ ফার্ম কয়েক রকমের ক্ষয়-নিরোধক রং উদ্ভাবন করেছেন, যাদের স্থায়িত্ব খুব বেশী এবং সব রকম ক্ষয় নিরোধের ক্ষমতা আছে।

প্রকাশ, দুই কোটিং রং লাগালে যে কোন জিনিষকে পাঁচ বছরের জন্যে বা তারও বেশী সময়ের জন্যে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। অল্প সময়ের জন্যে হলে একটা কোটিংই যথেষ্ট হবে।

রঙের রকম চার—ক্ষয়-নিরোধক, তাপ-নিরোধক, অ্যাসিড-নিরোধক এবং অবিষাক্ত ক্ষয়-নিরোধক (Non-toxic anti-corrosive)।

নতুন ধরণের কুকার

একটি বৃটিশ ফার্ম একটি চার-স্তরের ষ্টীম কুকার উদ্ভাবন করেছেন, যার সাহায্যে এক সঙ্গে চার পদের প্রায় ৫০টি 'মিল' তৈরি করা চলবে।

এই কুকারের ধারণ-ক্ষমতা ৩½ ঘনফুটের মত এবং এটি স্থাপন করতে খুব কম জায়গা লাগে। কাষ্ট-আয়রনের তৈরি ভিত্তির উপর তিন স্তরে বাটি বসাবার ব্যবস্থা আছে। চতুর্থ স্তরটি নড়ানো যায় না।

জ্বালানী হিসাবে গ্যাস বা বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহার করা চলে। গ্যাস খরচ ঘণ্টায় ৬০ ঘনফুট। বিদ্যুৎ খরচ ঘণ্টায় চার কিলোওয়াট।

প্যানগুলিতে এক সঙ্গে ১২ রকমের খাদ্য প্রস্তুত করা চলে। ঠিক কি পরিমাণ খাদ্য প্রস্তুত করা চলে, তা নির্ভর করে খাদ্যের প্রকৃতির উপর। তবে প্রায় ৯০ পাউণ্ডের মত আলু ও অন্যান্য মূল জাতীয় খাদ্য, অথবা ৭৭ পাউণ্ডের মত মাংস ধরানো যায়।

একই ক্ষমতাসম্পন্ন সাধারণ স্টোভের চেয়ে এতে চলতি খরচ যথেষ্ট কম হবে বলে দাবী করা হয়েছে। নির্মাতাদের মতে, এটি ৬ ফুট স্টোভের সমতুল্য।

কম্পিউটারের সঙ্গে কথাবার্তা

একটি বৃটিশ ফার্ম এমন এক ইলেকট্রনিক স্কেচ-প্যাড উদ্ভাবন করেছেন, যার সাহায্যে কম্পিউটারের সঙ্গে সহজে ও সোজাসুজি কথা বলা যাবে। ঐ ফার্ম থেকে বলা হয়েছে, এর ফলে কম্পিউটারের সঙ্গে কোন সমস্যা নিয়ে নিজের ভাষায় সোজাসুজি আলোচনা করা যাবে। এজন্যে কম্পিউটারের ভাষার সাহায্য নিতে হবে না।

এই পদ্ধতির মূলে রয়েছে একটি হাই প্রিসিশন ক্যাথোড-রে টিউব, আর স্কেচ করবার জন্যে রয়েছে 'আলোর-কলম'। সাধারণ পেন বা পেন্সিলের মতই টিউবের উপর লেখা হয়। এভাবে কম্পিউটারকে তথ্য সরবরাহ করলে ঐ একই সরঞ্জামে 'ডিসপ্লে' পর্দায় উত্তর আসে। কম্পিউটার নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে সম্ভাব্য উত্তরগুলি দেয়।

সমুদ্রে-পড়া তেল পরিষ্কারের জন্যে ব্যাক্টিরিয়া

লণ্ডনের চেল্‌সি কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজিতে কোন রকম ডিটারজেণ্ট বা পরিশোধক পদার্থ ব্যবহার না করে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সমুদ্রে-পড়া তেল পরিষ্কারের সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণার জন্যে তিন বছরের একটি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ হবে।

বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের আনুকুল্যে এই গবেষণা পরিচালনা করবেন চেল্‌সি কলেজের ডাঃ এন. পিলপেল। তিনি জানিয়েছেন—তেলের উপর ব্যাক্টিরিয়ার আক্রমণ চালিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে এই কাজ তিনি করতে পারবেন। তাঁর আশা, কি ধরনের ব্যাক্টিরিয়া এবং এনজাইম তেল পরিষ্কারে ব্যবহার করা যাবে, তা তিনি বের করতে পারবেন।

একথা জানা গেছে যে, বিশেষ ধরণের ব্যাক্টিরিয়া সমুদ্রে-পড়া তেল নষ্ট করে দিতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের কাছে 'টরে ক্যানিয়ন' নামে তৈলবাহী জাহাজটি ধ্বংস হবার পর ডিটারজেণ্ট ব্যবহারের ফলাফলের কথা উল্লেখ করে ডাঃ পিলপেল বলেন, ডিটারজেণ্ট কতকগুলি সামুদ্রিক প্রাণীর পক্ষে ক্ষতিকর।

প্লাস্টিকের ইট

প্লাস্টিকের ইটের সাহায্যে চারজন লোক এক দিনে একটি তিন ঘরের বাংলো বাড়ী তৈরি করেছেন। এই ইট উদ্ভাবন করেছেন একটি বৃটিশ ফার্ম। তিন রকমের মাপে এটি পাওয়া যায় এবং ৬৫টি দেশে ইতিমধ্যে এর পেটেণ্ট নেওয়া হয়ে গেছে।

এই ইট উদ্ভাবিত হবার ফলে ঢালাই, লিণ্টেল, বালির কাজ, চুনকাম ইত্যাদি কিছুরই প্রয়োজন হবে না বলে দাবী করা হয়েছে। প্রথম সারির ইট নিখুঁতভাবে সাজানো হয়ে যাবার পর যে কোন অশিক্ষিত শ্রমিক ঘণ্টায় ১,০০০ ইট সাজাতে পারে।

এই রকম দ্রুতগতিতে এই ইট যে সাজানো যায়—তার কারণ, এগুলি খুব হাল্কা ও পরস্পর খুব খাপে খাপে মিলে যায় এবং এজন্যে কোন মশলার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ ইটের চেয়ে এর ভারবহন ক্ষমতা কম নয়, বরং বেশী। আরও একটি সুবিধা হলো, এগুলি ফাঁপা বলে বৈদ্যুতিক তার এগুলির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ।

চাঁদ কি কি উপাদানে গঠিত ?

মার্কিন মহাকাশযান সার্ভেয়ার-৫ চাঁদের প্রশান্ত মহাসাগর বা সী অব ট্রাঙ্কুইলিটিতে দাঁড়িয়েছে। সেখানেই তার স্বয়ংক্রিয় সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে চাঁদের উপরিভাগ যে সব উপাদানে গঠিত, তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ চালাচ্ছে। এই প্রচেষ্টা ও পর্যালোচনা সাফল্যমণ্ডিত হলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচিত হবে।

অবতরণের পরেই যে সব ছবি উপগ্রহটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে, তাতে পরিষ্কার বুঝা গেছে যে, ঐ ঐতিহাসিক গবেষণা চালাবার জন্যে উপগ্রহটি সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি নিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তখনই পৃথিবীস্থিত যে সব বিজ্ঞানী এই গবেষণা নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁরা বেতারে নাইলনের সুতা দিয়ে বাঁধা একটি বাক্স চাঁদের উপর নামাবার নির্দেশ দিলেন। বাক্সটি ধাতু দিয়ে তৈরি, প্রস্থে ও লম্বায় ৬ ইঞ্চি। এতে একটি আলোক বিচ্ছুরণকারী যন্ত্র আছে। যন্ত্রটির নাম 'আল্‌ফা পার্টিকল স্ক্যাটারার'। আল্‌ফা কণাসমূহ চন্দ্রপৃষ্ঠের ১ মিলিমিটার নীচ পর্যন্ত যেতে পারে।

এই বাক্সের মধ্যে আছে এক টুকরা কুরিয়াম-২৪২। কুরিয়ামই ঐ তেজস্ক্রিয় শক্তির উৎস। 'আল্‌ফা পার্টিকল স্ক্যাটারার' থেকে নির্গত রশ্মি চন্দ্রপৃষ্ঠের একটি স্থানের পরমাণুর উপর পড়ছে এবং ঐ সব পরমাণু থেকে প্রতিফলিত রশ্মি সংক্রান্ত তথ্যাদি সার্ভেয়ার-৫-এর অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে সংগৃহীত হচ্ছে।

প্রতিফলিত রশ্মির স্বরূপ বা প্রকৃতির সন্ধান নেবার জন্যে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা রয়েছে। আর এক প্রস্থ ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা আছে সার্ভেয়ার-৫-এর মূল পাখায়। এটিই সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে পৃথিবীতে রিলে করছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর উপর আল্‌ফা রশ্মি প্রয়োগ করে যে সব তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে, তাদের সঙ্গে চন্দ্রলোক থেকে প্রেরিত প্রতিফলিত এই সব রশ্মির প্রকৃতি মিলিয়ে চাঁদ যে সব রাসায়নিক উপাদানে তৈরি, তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হবে। তবে চাঁদের পরমাণু থেকে প্রতিফলিত রশ্মি সম্পর্কে তথ্যাদি পৃথিবীতে ধীরে ধীরে আসছে। জেট প্রপালশন লেবরেটরীর বিজ্ঞানীরা এই সব তথ্যাদির উপর আলোকপাত করবেন। তাঁরা বলছেন, সবই ঠিকমত চলছে, এই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

আধুনিক গবেষণাগারসমূহে আল্‌ফা স্ক্যাটারিং সিষ্টেম বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও লিথিয়াম ছাড়া সব মৌলিক উপাদানের সন্ধানই এই প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায়।

এই আল্‌ফা সিষ্টেমের সঙ্গে দুটি 'প্রোটন পার্টিকল ডিটেক্টর' যন্ত্রও যুক্ত করা হয়েছে। প্রোটন বিশ্লেষণের পক্ষে এই যন্ত্রটি খুবই সহায়ক হবে এবং এদের সাহায্যে নাইট্রোজেন, অ্যালুমিনিয়াম, সোডিয়াম, বোরন প্রভৃতি বহু মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিসহ 'আল্‌ফা পার্টিকল স্ক্যাটারারে'র ওজন ২৮ পাউণ্ড। এই পদ্ধতিতে চাঁদের রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত হলে—চাঁদ পৃথিবী থেকে সৃষ্টি হয়েছে, না অন্যান্য গ্রহের মতই সূর্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে—এই বিতর্কমূলক প্রশ্নেরও সঠিক উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী—১৯৬৮

২১শ বর্ষ, ঃ ১ম সংখ্যা
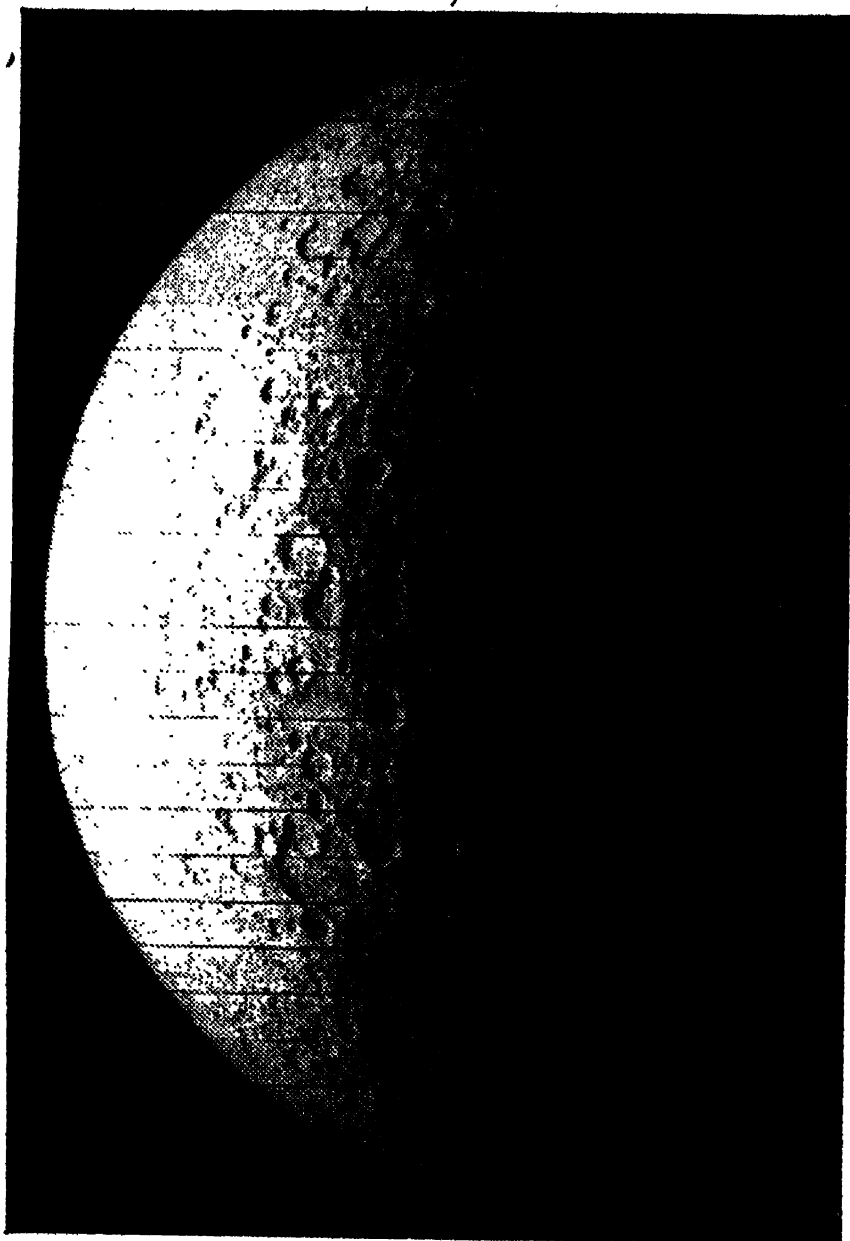
চাঁদের অদৃশ্য দিক—চাঁদের যে অংশ পৃথিবী থেকে বরাবর অদৃশ্য রয়েছে, আমেরিকার লুনার অরবিটার-৫ নামক স্পেসক্র্যাফট চাঁদের সেই অংশের এই আলোকচিত্রটি তুলে পাঠিয়েছে। আলোকিত অংশ চাঁদের অদৃশ্য অঞ্চলের এক-চতুর্থাংশের বেশী নয়। কেপ কেনেডি (ফ্লোরিডা) থেকে ১লা অগাষ্ট অরবিটার-৫ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। ইউ. এস-এর অ্যাপোলো মহাকাশ-চারীদের চাঁদে অবতরণ করবার মত উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে যে সব ফটোগ্রাফ তোলা হয়েছে, এটি হলো সেই পর্যায়ের সর্বশেষ আলোকচিত্র।

করে দেখ

দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরির সহজ উপায়

আজ তোমাদের এক ধরণের দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Telescope) তৈরির কথা বলবো। এর গঠন-কৌশল অতি সহজ এবং ঠিকভাবে প্রস্তুত করতে পারলে বেশ ভাল কাজ দেবে। যন্ত্রটি তৈরি করতে যে সব জিনিষের দরকার হবে, তাও বাজারে সব সময়েই কিনতে পাওয়া যাবে।

প্রথমে তিনটি জিনিষ যোগাড় করতে হবে—

১। ডবল কনভেক্স লেন্স, ফোক্যাল লেংথ—৩০ থেকে ৪০ সে. মি., ব্যাস—৫০ মি. মি.

২। ডবল কনকেভ লেন্স, ফোক্যাল লেংথ—৫ থেকে ৭ সে. মি., ব্যাস—৫০ মি. মি.

৩। একটা টিন, প্লাষ্টিক বা কাগজের চোঙা—যার ভিতরের ব্যাস হবে ৫০ মি. মি.।

প্রথম দুটি জিনিষ যে কোন রাসায়নিক যন্ত্রপাতির দোকানে কিনতে পাবে। যা যা মাপ বলে দিয়েছি, ঐ মাপের নিতে পারলে খুব ভাল হয়। ঠিক ঐ মাপ না হলেও তেমন একটা ক্ষতি নেই। তবে কনকেভ লেন্সের ফোক্যাল লেংথ যত কম এবং
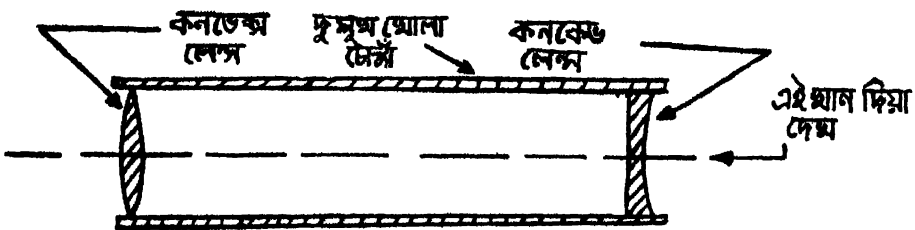
কনভেক্স লেন্সের ফোক্যাল লেংথ যত বেশী হবে, কাজ ততই ভাল হবে। চোঙাটির দৈর্ঘ্য এই দুই লেন্সের ফোক্যাল দূরত্বের উপর নির্ভর করবে, সেটি বুঝে চোঙা তৈরি করবে। চোঙাটির দু-মুখ খোলা রাখবে।

মনে কর, তুমি ৩৫ সে. মি. কনভেক্স ও ৫ সে. মি. কনকেভ লেন্স কিনেছ।

তাহলে দুটি লেন্সের মাঝে ব্যবধান হবে ৩৫ – ৫ = ৩০ সে. মি.। তবে এটি মোটামুটি হিসেব, কাজের সময়ে এর কিছু হেরফের হতে পারে।

প্রথমে গোল চোঙাটির একমুখে কনভেক্স লেন্সটি ভালভাবে বসিয়ে দাও। দুটির মাপই ৫০ মি. মি. হবার ফলে ওটি আঁটভাবেই বসবে। তা না হলে বাড়্তি কাগজ দিয়ে ওটিকে শক্ত করে বসাতে হবে। এরপরে কাচ জোড়বার আঠা দিয়ে (বাজারে কিনতে পাওয়া যায়) যদি শক্ত করে লাগিয়ে নিতে পার, তবে আরও ভাল হবে।

এবার চোঙার অপর খোলা মুখটিতে কনকেভ লেন্সটি ঢুকিয়ে দাও। এখন দুই লেন্সের মাঝের দূরত্ব, লেন্স দুটির ফোক্যাল দূরত্বের বিয়োগ ফলের চেয়ে কিছু বড় হবে। চোঙাটির মাপ (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য) এমন করবে, যাতে তা তোমার লেন্স দুটির ফোক্যাল দূরত্বের বিয়োগ ফলের চেয়ে বড় হয়। এবারে কনকেভ লেন্সটি তোমার চোখের সামনে রেখে দূরের কিছু জিনিষ (কমপক্ষে ২০০ গজ) চোঙাটির ভিতর দিয়ে দেখ। যদি স্পষ্ট না হয়, তবে কনকেভ লেন্সটি আরও সামান্য ভিতরে ঢুকিয়ে দাও। এবারে আবার চোঙার ভিতর দিয়ে দেখ। সর্বদা কনকেভ লেন্সটি তোমার চোখের সামনে রাখবে; অর্থাৎ দূরের দৃশ্য ও কনকেভ লেন্সের মধ্যে কনভেক্স লেন্সটি থাকবে। এভাবে বার বার দেখ ও দুটি লেন্সের মধ্যে দূরত্ব কমাও। একটু পরেই দেখবে, দূরের দৃশ্য অনেক বেশী উজ্জ্বল ও বড় হয়ে তোমার চোখের সামনে ভাসছে। এবার তোমার দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি হয়ে গেল। এবারে কনকেভ লেন্সটিও আঠা দিয়ে শক্তভাবে জুড়ে নেবে। চোঙাটির বাইরের দিকটায় ইচ্ছামত রং করে নিতে পার।

আমি যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি তৈরি করেছিলাম, তাতে ৩০ সে. মি. ও ৭ সে. মি. দুটি লেন্স ব্যবহার করেছিলাম।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও এই ধরণের যন্ত্র প্রথম তৈরি করেন, তাই একে গ্যালিলিওর দূরবীন বলা হয়ে থাকে।

বাণীকুমার মিত্র

ওপোসাম

ওপোসাম নামক প্রাণীটা তোমাদের অনেকের কাছেই অচেনা। কারণ ওপোসাম আমাদের দেশের প্রাণী নয়। ওপোসাম হলো অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী—আদিবাসীও অবশ্য বলতে পার, তবে বর্তমানে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলেও ওদের দেখতে পাওয়া যায়।

সকলেই তোমরা ক্যাঙ্গারুর নাম শুনেছ, দেখেছও অনেকে। ওপোসাম হলো এই ক্যাঙারুজাতীয় প্রাণী। কিন্তু ক্যাঙারুর জাতি হলে কি হবে, ওদের না আছে ক্যাঙারুর মত শারীরিক দক্ষতা, না আছে দৈহিক ক্ষিপ্রতা।

আকারে এরা বেশ ছোট, অনেকটা বিড়ালের মত। অধিকাংশই থাকে গাছে গাছে। লেজটা হয় বেশ বড়, যাতে ওরা সহজেই গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতে পারে। খাদ্যের ব্যাপারে অধিকাংশই নির্ভরশীল পোকা-মাকড়ের উপর; অর্থাৎ এক কথায় এরা কীট-পতঙ্গভুক। অবশ্য কোন কোন ওপোসাম জলার ধার থেকে মাছ শিকারও করে থাকে। এই সব মৎস্যভুক ওপোসামদের সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকায় জলার ধারে।

প্রায় সব স্ত্রী ওপোসামেরই পেটের নীচে একটা থলি থাকে, যাকে বলা হয় মারসুপিয়াম বা Brood Pouch। ওই থলির মধ্যে ওপোসাম-শিশু নিশ্চিন্তে লালিত-পালিত হয়।

স্ত্রী ওপোসাম সময়কালে এক সঙ্গে চার থেকে কুড়িটি পর্যন্ত সন্তান প্রসব করে। জন্মলগ্নে ওপোসাম-শিশু আকারে থাকে খুবই ছোট—অনেকটা মৌমাছির মত। চোখ, কান—এমন কি, লোমের চিহ্ন পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। তবুও কিন্তু এই বয়সেই এরা বেশ চটপটে হয়ে থাকে। তীব্র ঘ্রাণশক্তি আর শক্ত সামনের পা দুটির সাহায্যে ওরা অনায়াসে মায়ের গায়ের লম্বা লোম বেয়ে ব্রুড-পাউচে ঢুকে যেতে পারে।

পাউচে পৌঁছাবার পরেই ওদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায় খাদ্যের জন্যে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মায়ের সমস্ত সন্তানকে দুধ যোগাবার সামর্থ্য না থাকায় অধিকাংশ শিশুই খাদ্যাভাবে বিনষ্ট হয়।

প্রায় সত্তর দিন এই ভাবে মাতৃদেহে অবস্থানের পর ওরা একটু শক্ত হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে মায়ের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ এক-আধটু লাফালাফিও করে—অবশ্য মায়ের পিঠের উপরেই মায়ের লোম আঁকড়ে ধরে। কখনো কখনো মায়ের কুণ্ডলী পাকানো লেজের গায়ে নিজেদের লেজ জড়িয়ে মাথা নীচের দিকে করে ঝুলে থাকতেও দেখা যায়। বেশ কিছুদিন মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকবার পর সাবালক হলে

ওপোসাম অত্যন্ত নিরীহ প্রাণী। অন্যান্য প্রাণীদের মত এদের আত্মরক্ষার কোন বিশেষ অঙ্গ বা অস্ত্র নেই। এখন প্রশ্ন হলো—ওপোসাম আক্রান্ত হলে কি করে? প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়, আক্রান্ত ওপোসাম পালাবার কোন চেষ্টাই করে না। বিপদ বুঝতে পারলে ওরা চোখ বন্ধ করে জিভ বের করে মড়ার মত পড়ে থাকে। অনেক সময় এই অবস্থায় ওদের শ্বাস-প্রশ্বাসেরও কোন হদিস পাওয়া যায় না। বিপদ কেটে গেলে খানিকক্ষণ পরে ওরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কেউ কেউ বলেন, ওরা মৃতের ভান করে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ওরা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। যাই হোক না কেন, যে সব প্রাণী মৃত জন্তু ভক্ষণ করে না, তাদের হাত থেকে ওপোসাম এই ভাবে আত্মরক্ষা করে। আর যাদের মৃত বা জ্যান্ত ভেদাভেদ নেই, তাদের হাতে অসহায়ভাবে মারা পড়ে।

প্রকৃতির এই বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্যে আর লোভী শিকারীদের হৃদয়হীনতার জন্যে ওপোসাম পৃথিবী থেকে ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এর ফলে হয়তো এমন দিন আসবে, যখন ওপোসাম শুধু কাহিনী হয়েই থাকবে—চাক্ষুস আর তাদের দেখা যাবে না।

শ্রীসমর চক্রবর্তী

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। (ক) আলো চাপ দেয় বলতে কি বুঝি?
(খ) আলোর চাপের গাণিতিক প্রমাণ কি?

শেখ শাহ্‌জাহান, নদীয়া।

প্রঃ ২। কি করিয়া একটা বাক্সের ভিতরের অংশকে মহাকর্ষহীন করা যায়?

রফিক-উল হাসান, নদীয়া।

উঃ ১। অতি প্রাচীন কাল থেকেই দার্শনিকেরা মনে করতেন যে, আলো চাপ দেয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপ্‌লার দেখেন যে, ধূমকেতু যখন সূর্যের দিকে আসতে থাকে, তখন ধূমকেতুর লেজ প্রায় সর্বদাই বিপরীত দিকে থাকে। এথেকে তিনি অনুমান করেছিলেন যে, আলো কোন বস্তুর উপর আপতিত হলে তার উপর চাপ দেয়। এই ধারণাটাই বহুদিন থেকে চলে আসছিল। ১৮৭০ সালে ম্যাক্সওয়েল তাঁর 'আলোর বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বে' দেখান যে, আলো চাপ দেয় এবং এই চাপ আলোর

ঘনত্বের সমান এবং পরে বিভিন্ন তথ্য ও পরীক্ষায় আলোর চাপের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এখন কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে আলোর চাপের গাণিতিক প্রমাণ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী জানা যায় যে, আলোর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা আছে। এদের বলা হয় কোয়ান্টাম বা ফোটন। ফোটনগুলিতে আছে শক্তিগুচ্ছ (Packets of energy)। ফোটনের মধ্যে মোট শক্তি হলো $E=h\nu$। h হলো প্লাঙ্কের ধ্রুবক আর ν হচ্ছে আলোর বিকিরণ কম্পনাঙ্ক।

ধরা যাক, এরকম একটা ফোটন কণা আলোর গতিতে যাচ্ছে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব থেকে আমরা জানি যে, ভর ও শক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক $E=mc^2$; m হলো বস্তুর ভর ও c হলো আলোর গতিবেগ। তাহলে একটা c বেগে ধাবমান এবং $h\nu$ শক্তিসম্পন্ন ফোটনের ভর আছে বলে ধরা যেতে পারে, যার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে $m=\frac{h\nu}{c^2}$

এর ফলে ফোটনটির ভরবেগ দাঁড়ায় $mc=\frac{h\nu}{c}$

এখন এ যদি কোন কালো বস্তুর উপর পতিত হয় এবং ঐ বস্তুর দ্বারা শোষিত হয়, তাহলে তা বস্তুকে $\frac{h\nu}{c}$ পরিমাণ ধাক্কা দেবে।

তাহলে এরকম বিভিন্ন কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট আপতিত সমস্ত ফোটনগুলির একক সময়ে বস্তুর উপর মোট চাপ $p=\Sigma\frac{h\nu}{c}$

Σ, সমস্ত কম্পনাঙ্কের ফোটনের প্রভাব বোঝাচ্ছে। $\Sigma h\nu=I$ অর্থাৎ আপতিত আলোর তীব্রতা।

$\therefore$ আলোর চাপ $=\frac{I}{c}$

পূর্ণ প্রতিফলনের বেলায় ভরবেগের পরিবর্তন হয় দ্বিগুণ। তখন

আলোর চাপ $p=\frac{\Sigma 2h\nu}{c}=\frac{2I}{c}$

গ্যাসের বেলায় যেখানে এক প্রকার গ্যাসের অন্য প্রকার গ্যাসের মধ্যে অনুপ্রবেশের প্রবণতা আছে, সে ক্ষেত্রে দেখানো যায়,

আলোর চাপ $=\frac{1}{3}\ \frac{I}{c}$

উঃ ২। আমরা জানি যে কোন বস্তুকে উঁচু থেকে ছেড়ে দিলে প্রথম সেকেণ্ডের

শেষে বস্তুর গতিবেগ হয় সেকেণ্ডে ৩২ ফুট। দ্বিতীয় সেকেণ্ডের শেষে হবে সেকেণ্ডে ৬৪ ফুট; অর্থাৎ ঐ বস্তুকে g-ত্বরণে পৃথিবী ত্বরান্বিত করবে। এখন ধরা যাক, একটা বড় বাক্সকে মহাকর্ষ ক্ষেত্রে বেশ কিছু উঁচু থেকে ফেলে দেওয়া হলো। বাক্সটার ভিতরে কয়েকজন আরোহী আছে ধরা হলো। এটাও ধরে নেওয়া হলো যে, ভিতরের আরোহীরা বাইরের ঘটনা কিছুই জানে না। এই অবস্থায় কোন আরোহী যদি কোন জিনিষ হাত থেকে শূন্যে ফেলে দেয়, তাহলে সে দেখবে যে, জিনিষটা শূন্যেই আটকে আছে। কেন না আরোহী, জিনিষ ও বাক্স—তিনটি একই গতিতে নীচে নামছে। এবার যদি আরোহী হাতের জিনিষটা দেয়ালের দিকে সোজা ছুঁড়ে দেয়, জিনিষটা সোজা গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা দেবে, মনে হবে যেন নিউটনের গতিসূত্রের প্রথম নিয়ম মেনে চলছে। এবার যদি আরোহী শূন্যে লাফ দেয়, তবে শূন্যেই আটকে থাকবে—বাক্সের মেঝেতে আসতে পারবে না। অবশ্য এর মধ্যে যদি বাক্সটা মাটিতে পৌঁছে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়, তাহলে অন্য কথা। এই অবস্থায় আরোহী ধারণা করবে যে, সে এমন এক জায়গায় আছে, যেখানে পৃথিবীর মহাকর্ষ কাজ করছে না।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর মহাকর্ষ ক্ষেত্রে কোন বাক্সকে যদি উঁচু থেকে g-ত্বরণে নামানো যায়, তাহলে বাক্সটার ভিতরের অংশ মহাকর্ষহীন বলে মনে হবে।

বলা বাহুল্য, যে সমস্ত পরীক্ষার চিন্তা আইনষ্টাইনকে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রেরণা জুগিয়েছিল—উপরের পরীক্ষাটি তার মধ্যে অন্যতম।

শ্রীশ্যামসুন্দর দে

বিবিধ

মাদাম কুরীর জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

মাদাম কুরীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১৬ই ডিসেম্বর '৬৭ তারিখে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক 'মাদাম কুরী ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি' বিষয়ক একটি আলোচনা-সভা আয়োজিত হয়। ঐ সভার উদ্বোধন করে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাদাম কুরীর রেডিয়াম আবিষ্কারের ইতিহাস ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, ঐ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারগত প্রয়োগের দ্বার উন্মোচিত হয়। ক্যান্সার গবেষণা সংস্থার অধ্যক্ষ ডক্টর বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয়তার প্রয়োগ প্রসঙ্গে ভারতের ট্রম্বেতে তৈরি যে সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এখন রোগ প্রশমনে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ঐ তেজস্ক্রিয়তা প্রয়োগের ফলে ক্যান্সার রোগে অবধারিত মৃত্যু ৮-১০ বছর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডক্টর বীরেন্দ্রবিজয় বিশ্বাস

উদ্ভিদ ও জীববিভার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বহুল ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় বলেন যে, বিজ্ঞানের প্রতি মাদাম কুরীর অপরিসীম নিষ্ঠা প্রত্যেক বিজ্ঞানীর আদর্শ হওয়া উচিত।

ঐ সভায় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর জয়ন্ত বসু জানান যে, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্তে মাদাম কুরী সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা পরিষদ কর্তৃক শীঘ্রই আয়োজিত হবে। ঐ প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবে, তাদের প্রবন্ধ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশ করবার ব্যবস্থা থাকবে।

শোক-সংবাদ

ডক্টর বরদানন্দ চট্টোপাধ্যায়

গত ৯ই ডিসেম্বর শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের উপাধ্যক্ষ বিশিষ্ট রসায়ন-বিজ্ঞানী ডক্টর বরদানন্দ চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

ডক্টর বরদানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান জেলার গুসকরায় ১৯১২ সালে বরদানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা কলিকাতায়। কলিকাতার সিটি কলেজ থেকে তিনি রসায়ন শাস্ত্রে অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রী এবং ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে এম. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। এর অব্যবহিত পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রসায়ন শাস্ত্রের খয়রা অধ্যাপক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অধীনে তিনি গবেষণা সুরু করেন। অল্পকালের মধ্যেই গবেষক হিসাবে তাঁর অনন্তসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কোলয়েড সিলিসিক অ্যাসিডের তড়িৎ-রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে তিনি ব্যাপক গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফলে কোলয়েড রসায়ন-বিজ্ঞানীদের পুরোভাগে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং নতুন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি গবেষকরূপে কাজ করেন। তারপর শিবপুরের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন। পরবর্তী কালে তিনি এই কলেজের উপাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন।

১৯৪২ সালে বরদানন্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৬০ সালে ন্তাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সেস-এর ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে ভারত

সরকারের ফেলোশিপ লাভ করে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ সয়েল সায়েন্স, ইণ্টারন্যাশন্যাল সোসাইটি অফ সয়েল সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স ইত্যাদি বহু বিদ্বৎ সমাজের তিনি সদস্য ছিলেন। তিনি কয়েক বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক অধ্যাপকও ছিলেন।

ডক্টর চট্টোপাধ্যায় শুধু একজন প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানী ছিলেন না, বৈজ্ঞানিক গবেষণার একজন যোগ্য সংগঠকরূপেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর শতাধিক গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সরল, অমায়িক, নিরহঙ্কার। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তিনি তাঁর মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁকে অজাতশত্রু বললে অত্যুক্তি হয় না।

তিনি তাঁর পত্নী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের খয়রা অধ্যাপিকা ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায় এবং একমাত্র কন্যা, দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং অগণিত বন্ধু, সহকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রী রেখে গেছেন।

আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

ডক্টর যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী

গত ২০শে ডিসেম্বর বুধবার রাত্রিশেষে (ইং ২১ তারিখ সকাল ২-৩৫ মিঃ) প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বৈজ্ঞানিক ডক্টর যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার ৫০-ইউ গরচা রোডের বাসভবনে পরলোক গমন করেন।

নোয়াখালি জেলার লামচর গ্রামে ইং১৮৯০ সালে যোগেন্দ্রকুমারের জন্ম হয়। কুমিল্লা জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যয়ন করেন। সেখান হইতে ১৯১৩ সালে রসায়নে অনার্স সহ স্নাতক এবং ১৯১৫ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং সব পরীক্ষাতেই বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র এবং অধ্যাপক সত্যেন বোস,

ডক্টর যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী

ডক্টর মেঘনাদ সাহা, ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের সহপাঠী ছিলেন। ১৯২১-২৪ সাল পর্যন্ত তিনি বার্লিনে কাইজার উইলহেলম ইনষ্টিটিউটে প্রোফেসর আর. ও. হারজগের অধীনে মৌলিক গবেষণা করিয়া ডি. ফিল. ডিগ্রী লাভ করেন।

তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ হয় আসাম তৈল কোম্পানীর প্রধান রাসায়নিক হিসাবে। ১৯১৬ হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অর্থকরী উপযোগিতার দিক হইতে অনেক মূল্যবান আবিষ্কার করা সত্ত্বেও উচ্চতর গবেষণার আকাঙ্খায় তিনি সেই উচ্চপদ ত্যাগ

করিয়া বিদেশে যাত্রা করেন। জার্মেনী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯২৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের রীডার এবং পরে ১৯৩৯ সালে ঐ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪২-৪৭ সালে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন-এর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। দীর্ঘ ২২ বৎসর অধ্যাপনার পর ১৯৪৭ সালে তিনি সেখান হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরে রসায়ন বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন এবং প্রায় ৭ বৎসর ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ডক্টর চৌধুরী ফলিত রসায়নের বহু মূল্যবান গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, বিশেষ করিয়া পাট সম্বন্ধে গবেষণায় তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী। কয়লা, খনিজদ্রব্য ও ভেষজ তৈল সম্বন্ধেও তিনি অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

বহু বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৪৮-৪৯ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সচিব এবং পরবর্তী বৎসরে ঐ প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষও ছিলেন। অন্যান্য যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের তিনি সভ্য ছিলেন তাহাদের কয়েকটি হইতেছে—(ক) কারীগরী উপসমিতি, ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটি; (খ) পাট সমিতি, কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ; (গ) সেলুলোজ সমিতি, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ; (ঘ) কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি বোর্ড (পঃ বঙ্গ সরকার); (ঙ) সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ কমিটি, বাঙ্গলা (বঙ্গ বিভাগের পূর্বে); (চ) কার্যনির্বাহক সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি, ঢাকা উকিল স্কুলের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি এবং কলিকাতার নারী শিক্ষা মন্দির নামক স্কুলেরও সভাপতি ছিলেন। বাঙ্গলা বিভাগের পর শেষোক্ত স্কুলটিকে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি সর্বপ্রকার সহায়তা করেন।

অধ্যাপনা অথবা ব্যক্তিগত জীবনে যে কেহ ডক্টর চৌধুরীর সংস্রবে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার ধৈর্য, স্থিরতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, অমায়িক ও অনাড়ম্বর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার একটি মধুর সম্পর্ক ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহু গুণমুগ্ধ ছাত্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সত্যনিষ্ঠ যশোলোভহীন এই নীরব বিজ্ঞান-সাধকের মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সারস্বত সংঘের বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা, আলোচনা, প্রদর্শনী প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কার্য পরিচালনার জন্যে বর্তমান বছরের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নির্বাচিত কার্যকরী সমিতির সদস্যদের নিয়ে যে সারস্বত সংঘ গঠিত হয়েছে, তার ৯-১২-৬৭ তারিখের প্রথম অধিবেশনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সর্বসম্মতিক্রমে ঐ সংঘের সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

১। শ্রীশান্তিময় বসু
২। ,, সূর্যেন্দুবিকাশ কর
৩। ,, তপেন রায়
৪। ,, রমাতোষ সরকার
৫। ,, অমর ভাদুড়ী
৬। ,, সঞ্জীব সরকার
৭। শ্রীসৌম্যেন মিত্র
৮। ,, সত্যনারায়ণ নন্দী
৯। ,, রঞ্জন রায়
১০। ,, দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়
১১। ,, ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত
১২। ,, ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা
১৩। ,, হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়
১৪। ,, চন্দ্রশেখর পাই
১৫। ,, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬। ,, নলিনী চৌধুরী
১৭। ,, ঝুমুর রায়
১৮। ,, পাপিয়া তালাপাত্র
১৯। ,, জ্যোতিকণা দে

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। সমীরকুমার রায়
১০৮/৬ নগেন্দ্রনাথ রোড
কলিকাতা-২৮

২। সুখেন্দু সোম
কলেজ রোড, বরিশাল
পূর্ব পাকিস্থান

৩। কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
সেন্ট্রাল পার্ক (ইষ্ট)
কলিকাতা-৩২

৪। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র
১১৫/এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

৫। বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী
বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড
টেক্‌নোলজিক্যাল মিউজিয়াম
১৯/এ, গুরুসদয় রোড
কলিকাতা-১৯

৬। মহুয়া বিশ্বাস
১৫/বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট (দোতলা)
কলিকাতা-৯

৭। বাণীকুমার মিত্র
১৪, বাদুড় বাগান লেন
কলিকাতা-৯

৮। শ্রীসমর চক্রবর্তী
১২, মুন্সীবাজার রোড
কলিকাতা-১৫

৯। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স। বিজ্ঞান কলেজ,
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একবিংশ বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ | দ্বিতীয় সংখ্যা

ক্যান্সার প্রতিরোধের গবেষণায় উদ্ভিদের ভূমিকা

প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়

ক্যান্সার বা কর্কট রোগ যেন আজও বিংশ শতকীয় বিজ্ঞানের সামনে দুঃসহ এক চ্যালেঞ্জ। শল্য-চিকিৎসা, বিকিরণ-চিকিৎসা এবং রাসায়নিক চিকিৎসার সম্মিলিত আক্রমণেও অপরাজিত এই রোগের নিরাময় সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবেষণাগারে চলেছে অক্লান্ত অনুসন্ধান। ক্যান্সারকে বলা হয়ে থাকে আণবিক রোগ (Molecular disease)। অণু-পরমাণুর অচিন স্তরে লুকিয়ে-থাকা ক্যান্সারের মূল কারণটি যে দিন সম্পূর্ণভাবে জেনে ফেলবো, সেই দিনটি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। কারণ সে দিন আমরা যে শুধু ক্যান্সারই সারাতে পারবো তা নয়, জীবন-রহস্যের অজানা দিগন্তও এক নতুনরূপে ধরা দেবে আমাদের কাছে।

ক্যান্সারাক্রান্ত জীবকোষের বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ, যেমন—(১) ক্যান্সার-কোষগুলির বিচিত্র ও অসম আকৃতি; (২) সুস্থ কোষের তুলনায় এই কোষগুলিতে জল এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের পরিমাণগত হ্রাস-বৃদ্ধি; (৩) সুস্থ কোষের নিউ-ক্লিয়াস : সাইটোপ্লাজম সম্পর্কের ব্যতিক্রম; (৪) ক্রোমোসোমের অস্বাভাবিকত্ব এবং (৫) সুনির্দিষ্ট ক্রোমোসোম সংখ্যার হের-ফের (১নং আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য)। সাধারণভাবে একটি ক্যান্সার-কোষকে সনাক্ত করতে সাহায্য করলেও সুস্থ স্বাভাবিক

একটি কোষের তুলনায় এমন কোন বিশেষ গুণগত পরিবর্তন ক্যান্সার-কোষে দেখতে পাওয়া যায় নি, যার উপর নির্ভর করে ক্যান্সারের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে কোন একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

বিদ্রোহী ক্যান্সার-কোষগুলির অবাধ বিভাজনের ক্ষমতা দেখা যায়। জীবদেহের স্বাভাবিক প্রাণরসায়নগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এরা সংগ্রাম ঘোষণা করে। ফলে বাধে সংঘাত, বিপাকতন্ত্রে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা, জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ হয় ব্যাহত। বার্নেটের ভাষায় বলতে গেলে, * * Change in the character of the cells rendering them in one way or other insuceptible to the normal control * *. কিন্তু কেন এমন হয়—কিসের প্রভাবে, কিভাবে সুস্থ একটি কোষ রূপান্তরিত হয় একটি বিদ্রোহী ক্যান্সার-কোষে ?

কোন একটিমাত্র কারণে নয়, পাঁচটি উল্লেখযোগ্য কারণ জানা গেছে: (১) জীবদেহের বিচিত্র প্রকৃতি—জিনঘটিত প্রবণতা; (২) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় বহিঃপরিবেশ এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব; (৩) সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব—শিল্পোন্নয়ন এবং সভ্যতার প্রচণ্ড অগ্রগতির ফলে সমাজ-জীবনে জন্ম নিচ্ছে কৃত্রিমতা-জনিত নানা ধরণের অস্বাভাবিক উত্তেজনা। সম্প্রতি জানা গেছে যে, যে কোন ধরণের শারীরিক বা মানসিক উত্তেজনা[১] ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে; (৪) ক্যান্সার উৎপাদক রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের প্রভাব—৩, ৪-বেঞ্জোপাইরিন জাতীয় কিছু কিছু পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন এবং অন্যান্য কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে ক্যান্সার সৃচিত করা গেছে। এই সব পদার্থের রাসায়নিক সংগঠন এবং ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ক্ষমতার মধ্যে কোন্ স্তরে যোগাযোগ
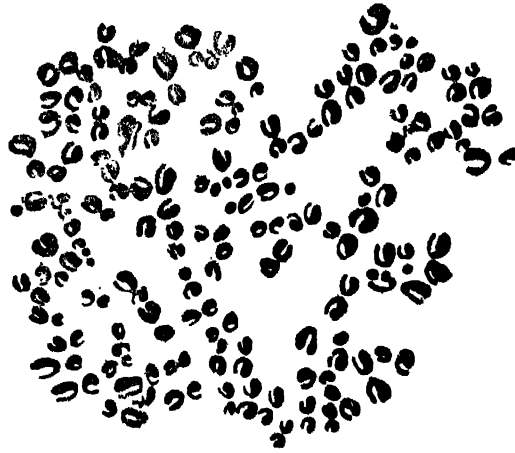
১নং চিত্র
মানুষের কার্সিনোমার একটি কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে।

১। পরিব্যক্তির (Mutation) ফলে ক্যান্সার হয়ে থাকে। অতি আধুনিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, মনের প্রবল ইচ্ছা, অনিচ্ছা, উত্তেজনাও পরিব্যক্তিজনক (Mutagenic) হতে পারে (?)।

রয়েছে, তা নিয়ে গবেষণা চলছে ; (৫) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে কঠিন লিউকেমিয়ার রক্ত-কোষে এবং পাকস্থলী ও অন্যান্য কয়েক ধরণের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কয়েক প্রকারের ভাইরাসকে সংশ্লিষ্ট থাকতে দেখা গেছে। এই জাতীয় ভাইরাসের রাসায়নিক সংযুতি এবং ক্যান্সার-কোষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা চালানো হচ্ছে। উল্লিখিত কারণগুলি ছাড়াও হর্মোন নিঃসরণের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গেও ক্যান্সারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে বলে মনে হয়।

ক্যান্সার সূচিত করবার পিছনে বহু কারণ কাজ করায় সমস্যা যে জটিলতর হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই ; তবে একটা কথা আজ পরিষ্কার-ভাবে বোঝা গেছে যে, ক্যান্সার উৎপাদক সমস্ত কারণগুলিরই প্রভাব পড়ছে কোষের এমন একটি পদার্থের উপর, যা সামগ্রিকভাবে জীবনের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এ না হলে বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সারের মধ্যে প্রকাশ-ভঙ্গীর একটা মিল আমরা দেখতে পেতাম না।

জীবনের প্রকাশের মূলে অভিনব, অসাধারণ সেই পদার্থটি যেন একটি জীবন্ত অণু, নাম তার ডি-এন-এ। এই ডি-এন-এ. অণু তিন রকমের আর-এন-এ-র সহায়তায় রাইবোসোমের উপর প্রোটিন সংশ্লেষণ[২] করে থাকে। প্রোটিনের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ গভীর, কারণ এনজাইম, হর্মোন ও নিউক্লিওপ্রোটিন—যেগুলি ছাড়া জীবনের প্রবাহ অচল, সেগুলি সবই প্রোটিনধর্মী।

মনে হয়, ক্যান্সারের মূল কারণ নিহিত রয়েছে এই ডি-এন-এ অণুর মধ্যেই। কারণ, (১) পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ক্যান্সার উৎপাদক কারণগুলি ডি-এন-এ অণুর উপর প্রভাব বিস্তার করবার ক্ষমতা রাখে এবং (২) হয়তো এই কারণেই প্রোটিন অণুতে বিশেষ কিছু পরিবর্তনের অনিবার্য ফলস্বরূপ দেখা দেয় ক্যান্সারের লক্ষণ।

যদিও গুণগতভাবে একটি সুস্থ ও একটি ক্যান্সার-কোষের নিউক্লিক অ্যাসিড-চক্রে উল্লেখযোগ্য কোন প্রভেদ চোখে পড়ে না, তবু পরিমাণের দিক থেকে সুস্থ কোষের তুলনায় একটি ক্যান্সার-কোষে অধিকতর দ্রুতহারে নিউক্লিক অ্যাসিডের বিপাক হয়ে থাকে (টাইনার et al)। পোলি মনে করেন যে, ক্যান্সার-কোষের ডি-এন-এ. অণুর গঠন সুস্থ কোষের ডি-এন-এ. অণুর গঠন থেকে কিছুটা আলাদা। এহেন যে ক্যান্সার, তার প্রতিরোধের জন্যে তাহলে কি করা যেতে পারে ?

মনে হয়, ক্যান্সার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কার্যক্রম অনুসরণ করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে—(১) ক্যান্সার রোগ সনাক্ত হলেই ছড়িয়ে পড়বার আগে তাদের (ক) সরাসরি নষ্ট করে দেওয়া অথবা (খ) দেহের মধ্যে প্রতিকূল পরিবেশ রচনা করে তাদের অকেজো করে দেওয়া ; (২) ক্যান্সার-কোষের অস্বাভাবিক দ্রুত বিভাজন বন্ধ করে দেওয়া ; (৩) ক্যান্সার-কোষের বিকৃত ডি-এন-এ-র উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে পরিবর্তিত করবার চেষ্টা করা ; সম্ভব না হলে (৪) বিকৃত ডি-এন-এ-টির অনুলিপি সংশ্লেষণে (Replication) (ক) প্রত্যক্ষভাবে বা (খ) পরোক্ষভাবে বাধা দেওয়া।

২। শুধুমাত্র প্রোটিন সংশ্লেষণই নয়, এখন জানা গেছে যে, (১) প্রোটিন সংশ্লেষণের হার, এমন কি (২) তার কার্যাবলীকেও রেগুলেটর এবং অপারেটর জিন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। জ্যাকব ও মনড (১৯৬০) তাই মনে করেন। * * Malignancy is adequetly described as a breakdown of one or several growth controlling systems, and the genetic origin of this breakdown can hardly be doubted. * * *.

নাইট্রোজেন মাস্টার্ড, সাইক্লোফস্‌ফোমাইড, প্রেড্‌নিসোন, টেস্টোস্টেরোন প্রোপ্রায়োনেট, ৬-মারক্যাপ্‌টোপিউরিন অথবা ফ্লুরোইউরাসিল জাতীয় রাসায়নিক ওষুধগুলি এখন ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ক্যান্সারে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত রাসায়নিক পদার্থ-গুলি ছাড়াও উদ্ভিদদেহ-সঞ্জাত কিছু কিছু ক্যান্সারনাশক পদার্থ এই ব্যাপারে ভাল ফল দিয়েছে। উদ্ভিদ-জাত এই সব পদার্থের দুটি বড় গুণ হলো—(১) কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত অন্যান্য রাসায়নিক ওষুধের ক্ষতিকর দিকটা উদ্ভিদ-জাত ওষুধে খুব বেশী দেখা যায় না, আর (২) এই জাতীয় ওষুধের সুদীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে বিশেষ কোন রকম তীব্র ওষুধ-প্রতিরোধক উপসর্গ (Drug-resistance symptoms) দেখা দেয় না।

প্রাচীন হিন্দু মেটেরিয়া মেডিকায় এবং আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অনেক গাছগাছড়ার ক্যান্সারনাশক গুণাগুণের কথা বলা হয়েছে। যেহেতু কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত ওষুধ উৎপাদন অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ এবং অন্য দিকে ভারতবর্ষ উদ্ভিদসম্পদে সুসমৃদ্ধ, সেহেতু মনে হয়, আমাদের দেশে উদ্ভিদ-জাত বিভিন্ন পদার্থের ক্যান্সারনাশক গুণাগুণ নিয়ে আরো বেশী করে গবেষণা করবার প্রয়োজন আছে। আমেরিকান ন্যাশন্যাল ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটে কম করে ১,৫০০ উদ্ভিজ্জ পদার্থ নিয়ে গবেষণা করে ৫০টি এই জাতীয় ভেষজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্যান্সারনাশক গুণ দেখা গেছে।

১নং তালিকা

	উদ্ভিদের নাম	ক্যান্সারের স্থান	প্রয়োগ বিধি
এপিফোগাস	Epifogus virginiana	মুখে	গাছটি চিবোলে কিছু উপশম হতে দেখা গেছে।
প্যান্সি	Viola tricolar	ত্বকে	পাতার প্রলেপ।
গাজর	Dancus carota	লিউকেমিয়ায়	রস পান।
পেঁয়াজ	Allium cepa	বুকে	রস ইঞ্জেকশন।
রশুন	Allium sativum	ফুস্‌ফুসে	রস পান।
আফিম	Papaver somniferum	মলাশয়ে ও সাধারণ ক্যান্সারে	পটাসিয়াম আয়োডাইড ও আফিমের কাথ-এর প্রলেপ।
লোবেলিয়া	Lobelia inflata.	বুকে	পুলটিস।
টোম্যাটো	Lycopersicon esculentum	লিভারে	১৫% অ্যালকোহলে অথবা ৫% আয়োডিন-এ কাণ্ডের রস পান।

এই ১নং তালিকায় আমাদের প্রত্যেকেরই সুপরিচিত কয়েকটি গাছের নাম (যাদের মধ্যে সামান্য হলেও অন্ততঃ কিছু ক্যান্সারনাশক গুণ দেখা গেছে) উল্লেখ করেছি। এছাড়া আরো অনেক গাছ, যেমন—স্মাইল্যাক্স, রেনানকিউলাস (Ranuculus bulbosus), পাইনাস্‌, ড্যাণ্ডেলিয়ন (Taraxacum officinale), বেলেডোনা (Atropa belladona) প্রভৃতির মধ্যেও কম-বেশী ক্যান্সারনাশক গুণ দেখা গেছে।

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে এই

ধরণের অজস্র গাছ জন্মায় এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো—এই সব গাছ জন্মাবার জন্যে বিশেষ কোন পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না।

বছরের প্রায় সব সময়েই ফুল থাকে বলে অ্যাপোসায়ানেসি পরিবারের নয়নতারা (Vinca rosea L.) গাছটি বাংলা দেশের অধিকাংশ বাগানেই চোখে পড়ে। এই গাছ থেকে তিরিশটিরও বেশী উপক্ষার (Alkaloids) নিষ্কাশিত হয়েছে। যার মধ্যে চারটি: (১) ভিনকালিউকোব্লাস্টিন বা ভিনব্লাস্টিন (Vinca-leucoblastine / Vinblastine / VLB,—$C_{46}H_{58}N_4O_9$), (২) ভিনক্রিস্টিন (Vincristine—$C_{46}H_{54}N_4O_{10}$), (৩) ভিনলিউরোসিন (Vinleurosine) এবং (৪) ভিনরোসিডিন (Vinrosidine) ক্যান্সার-নিরোধক গুণে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ বলে মনে হয়। এই চারটি উপক্ষারের মধ্যে আবার ভিনব্লাস্টিনের অর্বুদের কোষ-বিভাজনের বা মাইটোসিসের তৎপরতা নাশক ক্ষমতার কথা উল্লেখযোগ্য (জনসন et al. ১৯৬০-'৬১; কাটস্ et al, ১৯৬০; ওয়্যারউইক et al, ১৯৬০; হাটজ্ et al, ১৯৬০)। মাইটোসিসের মেটাফেজে ভিনব্লাষ্টিন কিভাবে কাজ করে থাকে, তা এখনো খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় নি (পামার et al, ১৯৬০; কাটস্ et al ১৯৬১)। বুকের এবং ব্রঙ্কাসের কার্সিনোমায় VLB ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। শৈশবের লিউকেমিয়ায় ভিনক্রিষ্টিন (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য) ব্যবহার করে কেরন et al বেশ ভাল ফল পেয়েছেন। আমেরিকায় ইলি লিলি কোম্পানীর গবেষণাগারে P-1534 লিউকেমিয়ায় ভিনব্লাষ্টিন এবং ভিনক্রিষ্টিনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। জানা গেছে যে, পাতা থেকে নিষ্কাশিত উপক্ষারগুলি কাণ্ডের উপক্ষারগুলির চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী।

সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় বোঝা গেছে যে, ভিনব্লাষ্টিন এবং ভিনক্রিষ্টিন সম্ভবতঃ কোষে নিউক্লিক অ্যাসিড অণুর সংশ্লেষণে বাধা দিয়ে থাকে।
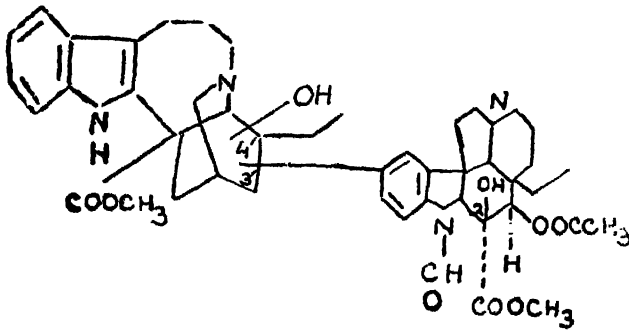
২নং চিত্র
ভিন্‌ক্রিষ্টিন অণুর গঠন।

বার্বেরীডেসি পরিবারের গাছ পডোফাইলাম (Podophyllum emodi Wall; P. hexandrium Royle) হিমালয় সন্নিহিত সিকিম থেকে হাজারা অবধি (৯,০০০ থেকে ১৪,০০০ ফুট উচ্চতায়) বিস্তৃত অঞ্চলে এবং কাশ্মীরেও (৬,০০০ ফুটে) জন্মাতে দেখা যায়। পডোফাইলাম গাছ থেকে নিষ্কাশিত পডোফাইলিনও ক্যান্সার-কোষের অস্বাভাবিক দ্রুত বিভাজন বন্ধ করে থাকে

(রিজলে, ১৯৫৮)। পডোফাইলিনের রাসায়নিক উপাদান, ভেষজ গুণ (কেলী এবং হার্টওয়েল, ১৯৫৪) এবং আণবিক গঠন (প্যাড্ওয়ের ১৯৬১) সম্বন্ধে অনেক জানা গেলেও পডোফাইলিনের কোষের বিভাজন-নিরোধক ক্রিয়া সম্বন্ধে আরো গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

কিউপ্রেসাসি পরিবারের গাছ জুনিপেরাস (Juniperus virginiana L) পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে (১২,৫০০ ফুট থেকে ১৪,০০০ ফুট উচ্চতায়) জন্মাতে দেখা যায়। এই গাছ থেকে নিষ্কাশিত পডোফাইলোটক্সিনের (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

OH
CH_2
O
O
O
O
CH_3O — — OCH_3
OCH_3

৩নং চিত্র
পডোফাইলোটক্সিন অণুর গঠন।

অ্যালকোহল দ্রবণ ইঁদুরের সারকোমা-১৮০-তে এবং মানুষের ক্ষেত্রে কার্সিনোমায় (Human carcinoma of the nasopharynx carried in cell culture) কিছু সুফল দিয়েছে বলে জানা গেছে।

লক্ষ্ণৌর সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এ-পর্যন্ত ৪৬৪টি গাছের ক্যান্সারনাশক গুণাগুণের বিষয় নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছে। ১৯৬৬ সালে ২২০টি গাছের নির্যাস ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব হেলথ, বেথেসডায় পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে পাঠানো হয়েছে। পাঁচটি গাছের ক্ষেত্রে গবেষণাগারে কিছু ক্যান্সারনাশক গুণ ধরা পড়েছে—(১) সেমেকার্পাস অ্যানাকার্ডিয়াম, (২) কোয়েরকাস সেমিকার্পিফোলিয়া, (৩) মেলিয়া আজেডারাক, (৪) পলিগোনাম রিকাৰেন্স এবং ল্যায়োনিয়া ওভ্যালিফোলিয়া।

৪নং চিত্র
(ক) অ্যাসপারজিলাস নাইজারের কলোনী।

উচ্চশ্রেণীর এই সব উদ্ভিদ ছাড়াও ছত্রাক জাতীয় নিম্নশ্রেণীর অনেক উদ্ভিদ থেকে ক্যান্সার-নাশক প্রতিজীবক (Antibiotics) তৈরির কাজ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে, বিশেষতঃ জাপান, আমেরিকা এবং রাশিয়ায় সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। Actinomycin D., কিংবা Azaserine জাতীয় প্রতিজীবক এখন ব্যবহার করা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। অ্যাসপারজিলাস নাইজার জাতীয় ছত্রাকের একটি বিশেষ প্রজাতি (৪নং আলোকচিত্র ক এবং খ দ্রষ্টব্য) থেকে অর্বুদনাশক প্রতিজীবক 'জহরীন' তৈরি করা হয়েছে। ইঁদুরের লিউকেমিয়াজনিত অর্বুদের ক্ষেত্রে, ফাইব্রোসারকোমা এবং ইয়োসিদা সারকোমাতে জহরীন ইঞ্জেকশন দিয়ে (২০০ থেকে ৫০০ মিলিগ্রাম) সুফল পাওয়া

গেছে। এছাড়া মানুষের এসোফেগাসের ক্যান্সার, জিভের ক্যান্সার, মাড়ির ক্যান্সার ও প্যারোটিড গ্রন্থির ক্যান্সারে জহরীন প্রয়োগ করে রোগ-যন্ত্রণার কিছুটা উপশম এবং ক্যান্সারের দ্রুত অগ্রগতির হার কিছুটা বিলম্বিত হতে দেখা গেছে।

এর উপর প্রয়োগ করে বোঝা গেছে যে, এই প্রতিজীবকটি ডি-এন-এ. অণুর পিউরিন, পিরিমি-ডিনের উপর ক্রিয়া করে থাকে এবং সাধারণতঃ ডি-এন-এ. অণুর পুনরুৎপাদনে বাধা দিয়ে থাকে।

ক্যান্সার প্রতিরোধের গবেষণায় উদ্ভিদ এক

৪নং চিত্র

(খ) অ্যাসপারজিলাস নাইজারের স্পোর হেড।

মস্কো থেকে সম্প্রতি এক খবরে জানা গেছে যে, অ্যাক্টিনোমাইসেস ক্যোরুলিওরুবিডাস ছত্রাকটির একটি বিশেষ প্রজাতি থেকে তৈরি 'রুবোমাইসিন' এসোফেগাসের ক্যান্সারে মানুষের ক্ষেত্রে ভাল ফল দিয়েছে। স্ট্যাফাইলোককাই-

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যদিও উদ্ভিদের নির্যাস পরীক্ষা করে অনেক ক্ষেত্রেই ক্যান্সারনাশক গুণাগুণ দেখা গেছে, তবুও দুটি বিষয় সম্বন্ধে এখনো আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ: (১) উদ্ভিদ-জাত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ

ক্যান্সার-কোষের কোন্ কোন্ পদার্থের উপর ক্রিয়া করে থাকে এবং (২) জৈবরসায়নগত এই সব বিক্রিয়া অণু-পরমাণুর স্তরে ঠিক কিভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন ভেষজ এখন যুক্তভাবে প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই সব ভেষজ ব্যবহার করবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সার-তন্তুতে উচ্চহারে অক্সিজেন চালিয়ে কৃত্রিম উপায়ে উচ্চ তাপ প্রয়োগ করে কিংবা নিউট্রন রশ্মি দিয়ে রাসায়নিক চিকিৎসার গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব কিনা, তাও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। লেসার-রশ্মি দিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে। নিউক্লিক অ্যাসিড অণু এবং প্রোটিন অণুর গঠন-রহস্য ও তার সঙ্গে কোষের বৃদ্ধি এবং বিচিত্র পরিণতির সম্পর্ক সম্বন্ধে গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সার-নাশক উদ্ভিদ-নির্যাসগুলির বিশুদ্ধিকরণ এবং প্রয়োগের সময় ও সুনির্দিষ্ট মাত্রা নির্ধারণের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

প্রবন্ধ রচনায় সাহায্য দানের জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের সাইটোজেনেটিক্স বিভাগের প্রধান ডাঃ অরুণকুমার শর্মা এবং ডাঃ অর্চনা শর্মাকে লেখক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। চিত্তরঞ্জন ন্যাশন্যাল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারের ডাঃ প্রদ্যোৎ-কুমার দে-র সঙ্গে এই বিষয়ে কিছু আলোচনার জন্যে লেখক কৃতজ্ঞ।

১নং এবং ৪নং আলোকচিত্র দুটি (ক এবং খ) এই প্রবন্ধে প্রকাশের জন্যে দেওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের সাইটোজেনেটিক্স বিভাগের ডাঃ গীতা এবং ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিনের ডাঃ দুর্লভকুমার রায়কে লেখক আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

সৌরশক্তি

শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস

সূর্যই সকল শক্তির উৎস—একথা আজ প্রায় সবারই জানা আছে। আমরা কর্মের শক্তি পাচ্ছি, প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটছে, পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে অথবা ধ্বংস হচ্ছে—এসবের পিছনে কাজ করছে প্রচণ্ড শক্তি। এসব শক্তির একমাত্র উৎস সূর্য। ভাবতে বেশ আশ্চর্য লাগে যে, কিভাবে এত প্রচণ্ড শক্তি আমরা সূর্য থেকে পাচ্ছি। সূর্যের শক্তির পরিমাণ কত, কি করে সূর্যের মধ্যে এত শক্তি সৃষ্টি হচ্ছে—এসব প্রশ্ন অনেকের নিকট বেশ অদ্ভুত মনে হবে। আজকাল বিজ্ঞানীরা এসব প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাও বের করে ফেলেছেন। বিশেষ করে পদার্থ-বিজ্ঞানের সাহায্য সবাইকে এবিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণাও দেওয়া যেতে পারে।

তাপ বিকিরণের ফলে সূর্য যেমন শক্তি হারিয়ে ফেলছে, ঠিক তেমনি সে ফিরে পাচ্ছে হারিয়ে-যাওয়া তাপ। সুতরাং কিছু একটা সূর্যের অভ্যন্তরে ঘটছে, এই সিদ্ধান্তে আমরা অনায়াসেই আসতে পারি অর্থাৎ বিকিরণের ফলে সূর্য যে শক্তি হারিয়ে ফেলছে, সূর্যের অভ্যন্তরেই সেই ঘাট্‌তি পূরণ হচ্ছে। আর তা যদি না হতো, তবে সূর্য তাপ বিকিরণ করতে করতে ম্লান হয়ে যেত এবং অবশেষে মৃত হয়ে পড়তো। সূর্যের অভ্যন্তরে যাই ঘটুক না কেন, এই সমস্যার সমাধানে আসবার আগে আমরা আলোচ্য প্রসঙ্গের জন্যে দুই-একটি বিষয় একটু জেনে নেব।

প্রথমে আমাদের থার্মোনিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। থার্মো কথার আক্ষি-

থানিক অর্থ তাপীয় বা তাপসম্বন্ধীয়; আর নিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন বলতে মোটামুটি নিউট্রন, প্রোটন বা আলফা কণা প্রভৃতির দ্বারা কেন্দ্রিনকে আঘাত করে নতুন কেন্দ্রিন সৃষ্টি করা—এটাই বোঝায়; অর্থাৎ প্রচণ্ড তাপের ফলে যে সকল কেন্দ্রিন রূপান্তরিত হচ্ছে, সেই সব রিয়্যাকশন-গুলিকে আমরা মোটামুটিভাবে থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশনের শ্রেণীতে ফেলতে পারি। সাধারণতঃ দুটি হাল্কা কেন্দ্রিনের Fusion বা সংযোজন প্রক্রিয়ার দ্বারা থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন হয়ে থাকে। বিক্রিয়ার পূর্বে কেন্দ্রিন দুটির ভর, বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট কেন্দ্রিনের ভর অপেক্ষা অবশ্যই বেশী হবে। যেমন দুটি ডয়টেরন কেন্দ্রিন রূপান্তরিত হয়ে একটি হিলিয়াম কেন্দ্রিন সৃষ্টি করবার কথা মনে করা যাক:

$$_1H^1 + _1H^2 \rightarrow _2He^4 + Q.$$
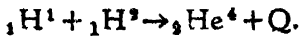
হিসাব করলে দেখা যাবে যে, এখানে দুটি ডয়টের-নের ভরের সমষ্টি একটি হিলিয়ামের ভর অপেক্ষা বেশী। এই বিক্রিয়া হতে গেলে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা এসে দাঁড়ায়। কারণ কেন্দ্রিন ধনাত্মক তড়িতাধানযুক্ত। স্থির-তড়িৎবিস্থার নিয়মানুযায়ী দুটি একই আধানযুক্ত বস্তু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। সুতরাং দুটি কেন্দ্রিন পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে। কিন্তু যদি প্রচণ্ড তাপ সংযোগে এই দুই ধনাত্মক তড়িতাধানযুক্ত কেন্দ্রিনকে কাছাকাছি আনা যায়, তবে ঐ দুটি কেন্দ্রিন সংযুক্ত হয়ে নতুন কেন্দ্রিনে রূপান্তরিত হবে। এটিই সংযোজন বা Fusion প্রক্রিয়া এবং এতে যে তাপের দরকার হয়, তার পরিমাণ ১০^{8}0c-এর কাছাকাছি। সাধারণভাবে এত তাপ সৃষ্টি করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবে আজকাল গ্যাসের ভিতর বৈদ্যুতিক ডিস্‌চার্জ পাঠিয়ে বেশ উচ্চ শক্তি-সম্পন্ন তাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাই থার্মোনিউ-ক্লিয়ার রিয়্যাকশন সেখানেই সম্ভব, যেখানে এত প্রচণ্ড তাপ সহজেই পাওয়া যায়। সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০°c-এর মত। Stefan-এর সূত্র প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা সূর্যের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ২০×১০^{6}O°c-এর কাছাকাছি হবে বলে মনে করেন। এই তাপে থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সুতরাং সূর্যের অভ্যন্তরে থার্মো-নিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন হচ্ছে, এটা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম Atkinson এবং Houtermans নামে দু-জন বিজ্ঞানী সূর্যের অভ্যন্তরে থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন অথবা অনুরূপ কিছু একটা হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু সূর্যের মধ্যে সত্য সত্যই যে থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন হচ্ছে, এটা ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আমাদের অজানা ছিল। ১৯৩৯ সালে Bethe এবং Weizsacker নামে দু-জন পদার্থ-বিজ্ঞানী সূর্যের অভ্যন্তরে থার্মো-নিউক্লিয়ার রিয়্যাকশনের ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝিয়ে দেন। কার্বন-নাইট্রোজেন চক্রের (Carbon-Nitrogen Cycle) সাহায্যে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেনের ভাঙা-গড়াটাই তাঁদের ব্যাখ্যার মূল কথা। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সূর্যের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই রূপান্তরের জন্যে কার্বন ও নাইট্রোজেন অনুঘটকের (Catalyst) ন্যায় কাজ করে থাকে। কার্বন-নাইট্রোজেন চক্রকে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিক্রিয়ার দ্বারা ভালভাবে বোঝানো যেতে পারে:—

$_6C^{12} + _1H^1 \rightarrow _7N^{*13} + h\nu$ ...... (১)

$_7N^{*13} \rightarrow _6C^{13} + e^+ (T = 9.9 \text{ min})$ (২)

$_6C^{13} + _1H^1 \rightarrow _7N^{14} + h\nu$ ... ... (৩)

$_7N^{14} + _1H^1 \rightarrow _8O^{*15} + h\nu'$ ... ... (৪)

$_8O^{*15} \rightarrow _7N^{15} + e^+ (T = 2.1 \text{ min})$ (৫)

$_7N^{15} + _1H^1 \rightarrow _6C^{12} + _2He^4$ ... ... (৬)
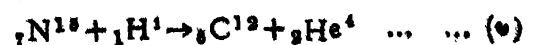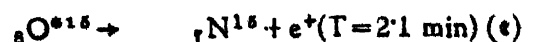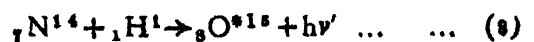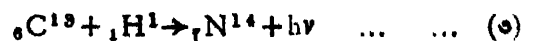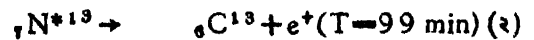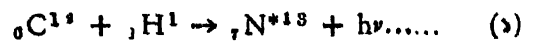
উপরের বিক্রিয়াগুলিকে ছয়টি বিশেষ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ১নং বিক্রিয়ায় কার্বনকে প্রোটন দ্বারা আঘাত করা হয়েছে এবং ৬ নম্বর বিক্রিয়ার শেষে যে দুটি মৌল পাওয়া যাচ্ছে, তার একটি মৌল কার্বন; অর্থাৎ সহজেই বলতে পারা যায় যে, কার্বন থেকে সুরু করে পুনরায় কার্বনেই ফিরে আসছে—যদিও মধ্যস্থলে কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষণীয়। ভালভাবে লক্ষ্য করলে আরও দেখা যাবে যে, পর্যায়ক্রমে ৪টি প্রোটনের দ্বারা বিভিন্ন অবস্থায় কার্বন ও নাইট্রোজেন কেন্দ্রিনকে আঘাত করা হয়েছে। ১ নং বিক্রিয়ায় $_6C^{12}$ এবং $_1H^1$ মিলে তৈরি করেছে অস্থিত (Unstable) N^{*13} এবং পাওয়া যায় কিছু শক্তি। N^{*13} অস্থিত হবার ফলে কিছু সময়ের মধ্যেই পজিট্রন ত্যাগ করে C^{13} (কার্বন 13)-এ পরিবর্তিত হয়। [পজিট্রন e^+, ইলেকট্রনের মতই; তবে এর তড়িৎ-আধান ধনাত্মক। ভর এবং অন্যান্য সব ধর্ম অবিকল ইলেকট্রনের মত। এক কথায় পজিট্রন ইলেকট্রনের কাউন্টার পার্ট। ইলেকট্রন ও পজিট্রন মিলে সৃষ্টি করে ফোটন] তৃতীয় বিক্রিয়ায় C^{13}-কে দ্বিতীয় প্রোটনের দ্বারা আঘাত করবার ফলে N^{14} মৌল সৃষ্টি হচ্ছে। এই N^{14}-কে আবার তৃতীয় প্রোটনের দ্বারা আঘাত করা হচ্ছে। ৪নং বিক্রিয়ায় এই আঘাতের ফলে অস্থিত O^{*15} সৃষ্টি হচ্ছে। এই O^{*15}-এর জীবনকাল খুব কম; সুতরাং এটি পুনরায় N^{15} এবং পজিট্রনে ভেঙে যায়। ৬ নং বিক্রিয়ায় N^{15}-কে চতুর্থ প্রোটনের দ্বারা আঘাত করবার ফলে C^{12} এবং $_2He^4$ পাওয়া যায়। এইভাবে কার্বন-নাইট্রোজেন চক্রকে মোটামুটি বোঝা যেতে পারে। প্রতি ষষ্ঠ ধাপ পরে পুনরায় গোড়া থেকে নতুন চক্র সুরু হয়; অর্থাৎ চক্রাবর্তের মত চলছে এই প্রক্রিয়া। Bethe এবং Weizsacker-এর মতে, সূর্যের অভ্যন্তরে চক্রবৎ চলছে এই ভাঙা-গড়া। এই চক্র সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে প্রায় ৫ মিলিয়ন বছর অর্থাৎ ৫০০০০০০ বছর।

কার্বন-নাইট্রোজেন চক্র থেকে সহজ ভাষায় আমরা প্রোটন থেকে সংশ্লেষণ (Synthesis) প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম সৃষ্টির কথা ভাবতে পারি। প্রত্যেক প্রোটনের ভর যদি ১·০০৮১৩ m. u. হয় [১ m. u. = $১·৬৬ \times ১০^{-২৪}$ gm-গ্রাম], তবে ৪টি প্রোটনের ভর হবে $৪ \times ১·০০৮১৩$ m. u. = ৪·০৩২৫২ m. u.। হিলিয়াম কেন্দ্রিনের ভর = ৪·০০৩৮৬ m. u.; [ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের ভরকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না; কারণ এর ভর খুবই কম] অর্থাৎ প্রোটনগুলি থেকে $_2He^4$ পাবার পর কিছু পরিমাণ ভর হ্রাস প্রাপ্ত হচ্ছে। এই হ্রাসপ্রাপ্ত ভরের পরিমাণ ০·০২৮৬৬ m. u. যেহেতু ১ m. u = ৯৩১ Mev-শক্তি, সুতরাং অবলুপ্ত ভর থেকে অনায়াসেই $০·০২৮৬৬ \times ৯৩১ \simeq ২৭$ Mev. শক্তি পাওয়া যায়। [প্রসঙ্গক্রমে আইনষ্টাইনের mass-energy relation ধরে নিয়ে হিসাব করা হয়েছে এবং শক্তিকে আর্গে প্রকাশ না করে Mev. এককে প্রকাশ করা হয়েছে। 1 Mev = $১·৬ \times ১০^{-৬}$ আর্গ]

বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই। পৃথিবীতে বসে তাঁরা সূর্যের আভ্যন্তরীণ হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদির পরিমাণও হিসাব করে ফেলেছেন। তাঁদের হিসাব অনুযায়ী যে পরিমাণ হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন সূর্যের মধ্যে আছে বলে ধরা হচ্ছে, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সূর্যের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা এখন থেকে আরও ৩০×১০^{১০} বছর পর্যন্ত বর্তমান অবস্থার মতই চলতে থাকবে। এটা যদি সত্য হয়, তবে সহজেই আমরা সূর্যের একটা আনুমানিক বয়স হিসাব করে

বলতে পারি। বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্য অবশ্য পৃথিবী সৃষ্টির অনেক আগেই সৃষ্টি হয়েছে। কমপক্ষে যদি পৃথিবী সৃষ্টির ঠিক পূর্বেই সূর্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে বর্তমানে সূর্যের বয়স ৩ থেকে ৪ বিলিয়ন [১ বিলিয়ন = ১×১০১২] বছর, অর্থাৎ সূর্য এখনও খুব শিশু এবং ভবিষ্যতে বহুদিন যাবৎ তাকে বর্তমানের মতই শক্তি সরবরাহ করে যেতে হবে। অনেকের মনে প্রশ্ন থেকে যেতে পারে যে, ৩০ বিলিয়ন বছর পরে সূর্য যখন থাকবে না, তখন কোত্থেকে শক্তি পাওয়া যাবে? সেটা এখানে বলা বেশ কঠিন ব্যাপার এবং আলোচনা করবার সুযোগও এখানে নেই।

আজকাল বিজ্ঞানীরা থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন ছাড়াও প্রোটন-প্রোটন প্রতিক্রিয়ার (Proton-Proton Interaction) কথা ভেবে দেখছেন। বিভিন্ন তারকার শক্তির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন অপেক্ষা প্রোটন-প্রোটন ইন্টারয়্যাকশনকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে তারকাগুলির আভ্যন্তরীণ তাপ প্রায় ২×১০৭°C-এর কাছাকাছি। এই তাপে দুটি প্রোটন একটি ডয়টেরন কেন্দ্রিন সৃষ্টি করতে পারে

$$_1H^1 + {}_1H^1 \rightarrow {}_1H^2 + e^+ + \nu$$
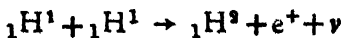
[e^+ পজিট্রন এবং ν-এর অর্থ নয়ট্রিনো বস্তু। নয়ট্রিনোর ভর খুব কম, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শূন্য ধরা হয়]

এই ডয়টেরন কেন্দ্রিন পুনরায় দুটি প্রোটনের সঙ্গে ক্রিয়ার ফলে হিলিয়াম $_2He^4$ (α-particle) সৃষ্টি করে।

$$_1H^2 + {}_1H^1 \rightarrow {}_2He^3 + \gamma$$

$$_2He^3 + {}_1H^1 \rightarrow {}_2He^4 + e^+$$
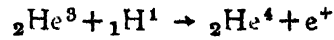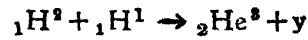
তারকার শক্তির ব্যাখ্যায় এই বিক্রিয়াগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সূর্যের চেয়ে কম তাপমাত্রা যেখানে, সেখানে এটাই কার্বন-নাইট্রোজেন চক্র ছাড়া দ্বিতীয় অনুরূপ ব্যাখ্যা। সূর্যের অভ্যন্তরে প্রোটন-প্রোটন ইন্টারয়্যাকশন ঘটছে কিনা, এসম্বন্ধে এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। কোন কোন পদার্থ-বিজ্ঞানীর মতে, কার্বন-নাইট্রোজেন চক্র এবং প্রোটন-প্রোটন ইন্টারয়্যাকশন দুটাই ঘটে চলেছে সূর্যের অভ্যন্তরে। খুব আধুনিকেরা বলেছেন যে, সূর্যের অভ্যন্তরে কার্বন-নাইট্রোজেন চক্র অপেক্ষা প্রোটন-প্রোটন ইন্টারয়্যাকশনই বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং Bethe-এর মতবাদ সূর্য অপেক্ষা আরও উচ্চ তাপবিশিষ্ট তারকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন অথবা প্রোটন-প্রোটন ইন্টারয়্যাকশন-এর মধ্যে যেটিই ঠিক হোক না কেন, সৌরশক্তির মূলে যে আভ্যন্তরীণ ভাঙা-গড়া চলছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মানব কল্যাণে প্রজনন-বিজ্ঞান

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

পঞ্চাশ বছর পূর্বে বংশগত রোগগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিরা অতি অল্প বয়সেই মারা যেতেন, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির ফলে বর্তমানে তাঁরা দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে বংশবিস্তার করে থাকেন। পরিবেশের পরিবর্তনে বংশগত বৈশিষ্ট্য বা রোগের আবির্ভাবকে রোধ করা সম্ভব হলেও রোগের মূল বা জিনকে চিরতরে উৎপাটন করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। ইনসুলিন ইঞ্জেকশন গ্রহণে ডায়াবেটিস রোগীরা সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং চশমা পরিধানে ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান, কিন্তু ইনসুলিন প্রয়োগ বন্ধ করলেই ডায়াবেটিস রোগের পুনরাবির্ভাব ঘটে এবং চশমা খুললেই ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের দৃষ্টি পুনরায় ক্ষীণ হয়ে পড়ে। আধুনিক চিকিৎসায় ডায়াবেটিস, ফেনিলকেটোন্থুরিয়া, গ্যালাকটোসেমিয়া প্রভৃতি রোগের অনিষ্টকর জিনের বহিঃপ্রকাশকে ধামাচাপা দেওয়া হয়, কিন্তু তাদের কুফল ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বংশগত রোগের প্রতিকার করে ব্যক্তিবিশেষের অশেষ উপকার সাধন করা হয় সত্য, কিন্তু পরিণামে উত্তর পুরুষের মধ্যে অনিষ্টকর জিনের বোঝার ভার বৃদ্ধি করা হয়। বংশগত ব্যাধিগ্রস্তদের আধুনিক চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ করলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলা হয়। আবার ভবিষ্যতে ব্যধিগ্রস্ত সন্তানের উৎপত্তি রোধ করতে হলে বর্তমান ব্যাধিগ্রস্তদের কোন রকম চিকিৎসা না করে প্রাকৃতিক নির্বাচনের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। একদিকে জাতীয় স্বাস্থ্যের অবনতি হবার আশঙ্কা, অন্যদিকে মানবতাকে অস্বীকার করা—এই দুটি পথের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করা শ্রেয়, সেটাই প্রজনন-বিজ্ঞানীদের মনে আজ বড় প্রশ্ন।

পারমাণবিক বোমা পরীক্ষায় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক্স-রে, রেডিয়াম, আইসোটোপ প্রভৃতির প্রয়োগে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়ে থাকে, তাতে মানুষের জিন পরিব্যক্তির হার (Mutation rate) বেড়ে যায়। জিন পরিব্যক্তিতে সাধারণতঃ অনিষ্টকর জিনের উৎপত্তি হয় এবং তা ক্রমশঃ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। প্রজনন-বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করে থাকেন যে, বর্তমান পর্যায়ের তুলনায় ভবিষ্যৎ পর্যায়ের নারী-পুরুষের বিবাহে বিকলাঙ্গ ও বংশগত রোগদুষ্ট সন্তান-সন্ততির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

মানুষ মরলেও জিনের মরণ নেই। মানুষের ভাল-মন্দ জিন পুত্র-কন্যার মধ্যে বেঁচে থাকে এবং তাদের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে থাকে। জিনের মরণ হয় তখনই, যখন সে সঞ্চারিত হতে পারে না। কোন মানুষ পুত্র-কন্যা সৃষ্টি না করে মারা গেলে তার দৈহিক মৃত্যুর সঙ্গে জিনের বিলুপ্তি ঘটে। কোন জিনের বিলুপ্তির হার যদি পরিব্যক্তির হার অপেক্ষা বেশী হয়, তাহলে কালক্রমে জনসাধারণের মধ্যে ঐ জিনের অস্তিত্ব লোপ পায় এবং তার কুফল ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে পরিস্ফুট হবার সম্ভাবনা থাকে না।

কৃত্রিম প্রজননের সাহায্যে গরু, ঘোড়া প্রভৃতির যেমন উন্নতি সাধন করা হয়, মানুষের ক্ষেত্রে তেমন সম্ভব কি না, সে বিষয়ে প্রজনন-বিজ্ঞানীরা চিন্তা করে থাকেন। মনুষ্য জাতিকে

উন্নত করবার অভিনব পরিকল্পনার কথা বর্তমানে শোনা যায়। ব্লাড ব্যাঙ্ক, আই ব্যাঙ্কের ন্যায় প্রোফেসার মূলার স্পার্ম ব্যাঙ্ক স্থাপন করবার এক প্রস্তাব করেছেন। শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক দিক দিয়ে যে সব ব্যক্তি উপযুক্ত, তাদের নিকট থেকে স্পার্ম সংগ্রহ করে ব্যাঙ্কে রক্ষা করা হবে এবং নারীদেহে সেই স্পার্ম অনুপ্রবেশ করিয়ে প্রয়োজনীয় গুণসম্পন্ন অপত্যের সৃষ্টি করা হবে। এই পরিকল্পনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে—যে সব প্রতিভাবান পুরুষের স্পার্ম সংগ্রহ করা হবে, তাদের বাদ দিয়ে বাকী পুরুষের প্রজনন-ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেওয়া হবে। যাঁরা প্রোফেসার মূলারের স্পার্ম ব্যাঙ্ক স্থাপন করবার পরিকল্পনাকে অনুমোদন করেন, তাঁরা বলেন যে, অনিষ্টকর ও অপ্রয়োজনীয় জিনের সঞ্চার রোধ করা অপেক্ষা সুস্থ ও প্রয়োজনীয় জিনের প্রসার বৃদ্ধি করলে উন্নত জাতের মানুষ সৃষ্টি করবার কাজ দ্রুততর হবে।

পরিকল্পনা করা সহজ হলেও তাকে কার্যকরী করা তত সহজ নয়। প্রোফেসার মূলারের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে যে বহু সমাজ, ধর্ম ও আইনগত বাধার সম্মুখীন হতে হবে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী গুটিকতক মানুষের প্রজনন-ক্ষমতাকে এক বিশেষ দিকে নিয়ন্ত্রিত করা অপেক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার বঞ্চিত না করে এবং সামাজিক সংস্কারের কোন রকম পরিবর্তন না করে মনুষ্য জাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা হলে অনেকের বিশেষ কিছু আপত্তির কারণ থাকবে না। বর্তমান সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় মানুষকে প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শ (Genetic counseling) গ্রহণে আগ্রহী করে তোলাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলে অনেক প্রজনন-বিজ্ঞানী মনে করেন।

বিবাহের পূর্বে স্ত্রী-পুরুষকে জীবনসঙ্গী নির্বাচনে সাহায্য করবার জন্যে এবং বিবাহের পরে তাদের ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে বংশগত রোগের আবির্ভাবকে রোধ করবার জন্যে আমেরিকায় অনেক প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শ সংস্থা গড়ে উঠেছে। মানুষের যে সব অনিষ্টকর বৈশিষ্ট্য ও রোগের আবির্ভাবের কারণ ও উত্তরাধিকার সূত্র আজ পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শ বা উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। কোন দম্পতির অ্যালবিনো বা গলাকাটা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদের পরবর্তী সন্তানের মধ্যে অনুরূপ অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্যের পুনরায় আবির্ভাব হবার সম্ভাবনা আছে কি না অথবা কোন পরিবারে Huntington's Chorea-র মত মারাত্মক মানসিক রোগের লক্ষণ দেখা গেলে ঐ পরিবারে তাদের পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়া যায় কিনা, তা জানতে স্বভাবতঃই তাঁরা ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা আছে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, পরিবারে বিকলাঙ্গ, বিকৃত মস্তিষ্ক প্রভৃতি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরস্পরের বংশের উপর দোষারূপ করে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করে থাকেন অথবা পূর্বজন্মের কর্মফল ভেবে তাঁরা মনে মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন। প্রজনন-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞেরা যদি তাঁদের অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত সন্তানের উৎপত্তির কারণ ভালভাবে বুঝিয়ে দেন, তাহলে তাঁরা অনেক পরিবারের মানসিক অশান্তিকে কিছুটা লাঘব করতে পারেন। প্রতিটি মানুষ অল্প সংখ্যক অনিষ্টকর বৈশিষ্ট্যের জিন অলক্ষ্যে বহন করে থাকেন। কেউ একটি প্রচ্ছন্ন জিন বহন করলে জিনের বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায় না, কিন্তু সমগোত্রীয় দুটি প্রচ্ছন্ন জিনের একত্র সমন্বয় ঘটলে জিনের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কোন এক অনিষ্টকর বৈশিষ্ট্যের জিন প্রচ্ছন্নভাবে বহন করলে তাদের

কোন সন্তানের মধ্যে ছুটি জিনের সমন্বয় ঘটাবার সম্ভাবনা থাকে। যে কোন পরিবারে এই রকম অঘটন ঘটতে পারে।

যে সব অনিষ্টকর বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাদের বহিঃপ্রকাশ জনসাধারণের মধ্যে খুব অল্পই দেখা যায় এবং স্বভাবতঃই ধারণা জন্মে যে, ঐ জিনের বাহকের সংখ্যাও অল্প। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। জনসাধারণের মধ্যে রোগগ্রস্তের সংখ্যা অপেক্ষা অনিষ্টকর প্রচ্ছন্ন জিনের বাহকের সংখ্যা অনেক বেশী। প্রতি কুড়ি হাজার লোকের মধ্যে একজনকে যদি অ্যালবিনো (Albino) দেখা যায়, তাহলে প্রতি সত্তর জনের মধ্যে একজন ঐ বৈশিষ্ট্যের জিন প্রচ্ছন্নভাবে বহন করে থাকে। আবার প্রতি দশ লক্ষ লোকের মধ্যে একজনের অ্যালকাপটোমুরিয়া রোগ দেখা গেলে প্রতি পাঁচ-শ' লোকের মধ্যে একজন ঐ রোগের একটি প্রচ্ছন্ন জিন বহন করে থাকে। প্রচ্ছন্ন জিনের বাহককে সন্তান উৎপাদন করবার পূর্বে সনাক্ত করতে পারলে প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শে অনেক সুবিধা হয়।

আজকাল রক্ত পরীক্ষায় প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন-জনিত রক্ত-শূন্যতা ও বিপাক বিশৃঙ্খলা-জনিত বংশগত ব্যাধির বাহককে সনাক্ত করা সম্ভব। স্বামী-স্ত্রীর ABO ও Rh রক্তশ্রেণীর অসামঞ্জস্য থাকলে সন্তানের মধ্যে হিমোলিটিক ও জনডিস রোগের আবির্ভাব হবার সম্ভাবনা যে দেখা যায়, তা রক্তশ্রেণী পরীক্ষায় ধরা পড়ে। স্বামী-স্ত্রীর একজন সুস্থ ও অপরজন রোগগ্রস্ত হলে তাদের প্রতিটি সন্তান প্রচ্ছন্ন জিনের বাহক হয়ে জন্মগ্রহণ করে। আবার রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দুই-তৃতীয়াংশ ভাই-বোনেরও রোগের বাহক হবার সম্ভাবনা থাকে। লিঙ্গ অনুগামী প্রচ্ছন্ন জিনের বাহককে অনেক ক্ষেত্রে নির্ণয় করা সম্ভব। যদি কোন স্ত্রীলোকের পিতা হিমোফিলিয়া রোগ-গ্রস্ত হয়ে থাকে, অথবা তার কোন একটি পুত্রের মধ্যে হিমোফিলিয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহলে তাহাকে ঐ রোগের বাহক হিসাবে সহজেই গণ্য করা যায়। আবার রোগগ্রস্ত পুরুষের অর্ধেক সংখ্যক বোনও হিমোফিলিয়া রোগের জিন প্রচ্ছন্নভাবে বহন করে থাকে। রক্ত পরীক্ষা করে বা পরিবারের ইতিহাস থেকে যদি কোন দম্পতির রোগগ্রস্ত সন্তান হবার সম্ভাবনা প্রবল দেখা যায়, তবে তাদের সন্তান উৎপাদন করবার পূর্বে সতর্ক করে দেওয়া যেতে পারে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কোন প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বংশগত রোগের বাহক হলে তাদের এক চতুর্থাংশ সন্তান-সন্ততির মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ হবার সম্ভাবনা থাকে। লক্ষ পরিবারে সম্ভাবনার সূত্র অবিসংবাদী, কিন্তু কোন একটি পরিবারে তার ব্যতিক্রম হতে পারে। সম্ভাবনার সূত্র অনুযায়ী একটি পয়সাকে লক্ষ বার 'টস্' করলে 'হেড-টেলের' অনুপাত ১ : ১ হয়ে থাকে, কিন্তু পয়সাকে দুবার টস্ করলে একবার হেড ও একবার টেল যে নিশ্চিত হবে, তা জোর করে বলা যায় না, দুবার হেড অথবা দুবার টেলও হতে পারে। এই রকম কোন পরিবারে সব সন্তান সুস্থ, অথবা সব সন্তানের মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা গেলে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। সুস্থ সন্তান হবার সম্ভাবনা যেখানে প্রবল, সেখানে স্বামী-স্ত্রীকে সন্তানোৎ-পাদনে নিবৃত্ত থাকবার পরামর্শ দেওয়া সমীচীন নয়। বংশগত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ও তার নিকট আত্মীয়-স্বজনদিগকে যদি পরিবার নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহিত করা হয়, তাহলে অনিষ্টকর জিনের অনুপাত পরবর্তী পর্যায়ে হ্রাস পায়।

অনেক সময় বংশগত রোগের আবির্ভাব অল্প বয়সে দেখা যায় না, বেশী বয়সে প্রকাশ পায়।

উদাহরণস্বরূপ Huntington's Chorea'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মারাত্মক মানসিক রোগ একটি জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যারা এই রোগের একটি জিন বহন করে তাদের মধ্যে জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয়। রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁর অর্ধেক সংখ্যক পুত্র-কন্যার মধ্যে রোগের জিন সঞ্চারিত করে থাকে এবং পরবর্তী কালে তারা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রত্যেক সন্তান অবিবাহিত থাকে অথবা বিবাহ করে সন্তানোৎপাদনে বিরত থাকে, তাহলে এই রোগের মূল এক পর্যায়ে উৎপাটন করা সম্ভব। কিন্তু যে ক্ষেত্রে সুস্থ সন্তান হবার সম্ভাবনা ৫০%, সে ক্ষেত্রে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিঃসন্তান থাকবার উপদেশ না দিয়ে অল্পসংখ্যক সন্তানোৎপাদনে সন্তুষ্ট থাকবার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব থেকে দেখা গেছে যে, মাতার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে যমজ, মঙ্গোলীয় নির্বুদ্ধিতা-সম্পন্ন ও হিমোলিটিক রোগগ্রস্ত সন্তান হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই সব তথ্য প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শের কাজে লাগিয়ে অবাঞ্ছিত সন্তানের আবির্ভাব কমানো যেতে পারে।

আমেরিকার ডাইট ইনষ্টিটিউট অব হিউম্যান জেনেটিক্সের ডিরেক্টর ডক্টর এস. সি. রীড তাঁর পুস্তক Parenthood and Heredity-তে উল্লেখ করেছেন যে, প্রজনন সম্পর্কিত কারণে শতকরা দুটি সন্তানের মধ্যে মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়। ভারতবর্ষে প্রতি বছর এককোটির বেশী সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ডক্টর রীডের হিসেব অনুযায়ী প্রায় দু'লক্ষ সন্তানের মধ্যে অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শে তার দশ ভাগের এক ভাগকে যদি পৃথিবীতে আসতে না দেওয়া হয়, তাহলে বছরে কুড়ি হাজার পরিবারে মানসিক অশান্তির কারণ ঘটবে না। জনসংখ্যা হ্রাস এবং সুস্থ সন্তানোৎপাদন যদি পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য হয়, তবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে প্রজনন-বিজ্ঞানের প্রয়োগকে অবহেলা করা যায় না। পরিবার পরিকল্পনার মুখ্য কেন্দ্রগুলিতে যদি প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে একই সঙ্গে জনসংখ্যা হ্রাস করা এবং বিকলাঙ্গ, বিকৃত মস্তিষ্ক, বংশগত রোগগ্রস্ত সন্তানের আবির্ভাবকে কিছু পরিমাণে রোধ করা সম্ভব হতে পারে।

গুণ-নিয়ন্ত্রণ কি এবং কেন ?

শ্রীবিশ্বনাথ দাস

আজকাল দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিষপত্র কেনবার সময় মোড়কের উপর একটা কথা প্রায়ই চোখে পড়ে—'গুণগত উৎকর্ষ রাশি-বিজ্ঞান-সম্মতভাবে নিয়ন্ত্রিত' (Quality Statistically Controlled)। কথাটা পড়ে ক্রীত বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে মনে একটা নিশ্চিন্তভাব জাগে ঠিকই, কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, 'রাশি-বিজ্ঞানসম্মত গুণনিয়ন্ত্রণ' (Statistical Quality Control) বা S. Q. C. সম্বন্ধে সম্যক ধারণা আমাদের অনেকেরই নেই। অথচ বিংশ শতাব্দীর এই দ্রুত শিল্পায়ণের যুগে ছোট-বড় সব শিল্পের S. Q. C. আজ একটি অপরিহার্য নাম। আমরা যারা সাধারণ মানুষ এই সব শিল্পজাত দ্রব্য নিত্য-প্রয়োজনে ব্যবহার করি—উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে এমন জিনিষ কেউই চাই না, যা আমাদের প্রয়োজন যথাযথভাবে মেটাতে অক্ষম। তাই S. Q. C. সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আমাদের প্রত্যেকেরই থাকা উচিত।

S Q. C. সম্বন্ধে একটা যথাযথ ধারণা পেতে হলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে, কোন জিনিষের গুণগত উৎকর্ষ বলতে নির্দিষ্ট-ভাবে আমরা কি বুঝি। প্রত্যেকটি উৎপন্ন দ্রব্যেরই কিছু না কিছু ভৌতিক পরিমাপ সম্ভব; যেমন—দৈর্ঘ্য, ব্যসার্ধ, সহনশীলতা ইত্যাদি। এগুলিকে বলে বস্তুর গুণগত লক্ষণ। এখন মানুষ সব কিছু জিনিষই উৎপন্ন করে নিজের প্রয়োজনের তাগিদে। সুতরাং সে আশা করে, উৎপন্ন দ্রব্য ক্রেতার কোন না কোন প্রয়োজন যথাযথভাবে মেটাতে সক্ষম হবে। সুষ্ঠুভাবে মানুষের প্রয়োজনে আসতে হলে উৎপন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন গুণগত লক্ষণকে কতকগুলি নির্দিষ্ট সর্ত পালন করতে হবে; যেমন—বাটখারাকে একটি নির্দিষ্ট ওজন-বিশিষ্ট হতে হবে, বিজলী বাতির থাকতে হবে একটি নির্দিষ্ট সময় পরিমাণ আলো দেবার ক্ষমতা। কোন বস্তুর গুণগত উৎকর্ষ বলতে আমরা বুঝি, বস্তুটিতে তার জন্যে নির্দিষ্ট সর্ত কতখানি রক্ষিত হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোন বস্তুর উৎপাদন সুরু হবার প্রথম ধাপ হলো তার বিভিন্ন গুণগত লক্ষণের মান নির্দেশ করে দেওয়া—ঠিক করে দেওয়া, ক্রেতাদের যথাযথ প্রয়োজনে আসতে হলে বস্তুটির বিভিন্ন গুণগত লক্ষণকে কি কি ভৌতিক সর্ত পালন করতে হবে। উৎপাদনের এই ধাপটিকে বলা হয় মান নির্দেশীকরণ (Specifica ticn of Standards)।

এখন মজা হলো, আমরা যন্ত্রের সাহায্যে যখন কোন জিনিষ অনবরত উৎপাদন করি, তখন উৎপন্ন দ্রব্যগুলি কোন সময়েই একে অন্যের ঠিক অনুরূপ হয় না। একই ধরণের দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে যত কমই হোক না কেন, কিছু না কিছু পার্থক্য থাকবেই। এটা যন্ত্রের, তথা প্রকৃতির ধর্ম। একটু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, পরস্পরের মধ্যে এই পার্থক্য মোটামুটি দু-রকমের। এক ধরণের পার্থক্য আসে উৎপাদন-ব্যবস্থায় নিযুক্ত বিভিন্ন কর্মীর দক্ষতার তারতম্য থেকে বা বিভিন্ন যন্ত্রের উৎপাদন-প্রণালী, নয়তো ব্যবহৃত কাঁচামালের ইতরবিশেষ থেকে। চেষ্টা করলে এই ধরণের পার্থক্যের উৎস খুঁজে বের করা যায়, আর তা সংশোধন করাও সম্ভব হয়। তাই এদের বলা

হয় সংশোধনযোগ্য ত্রুটি। আবার একই কর্মী একই উৎপাদন-প্রণালীতে একই যন্ত্রের সাহায্যে একই কাঁচামাল দিয়ে একই ধরণের কয়েকটি জিনিষ উৎপাদন করলেও উৎপন্ন জিনিষগুলির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থেকেই যায়। এই ধরণের পার্থক্যের পরিমাণ সাধারণতঃ কমই হয়; কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে এদের কখনই দূর করা যায় না। তাই এদের বলা হয় সহনযোগ্য ত্রুটি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ এই দুই ধরণের ত্রুটির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। রাশি-বিজ্ঞানসম্মত গুণনিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ S. Q C. হলো রাশি-বিজ্ঞানের সেই সব তত্ত্ব, যা আমরা একটি অবিরাম উৎপাদন-প্রবাহে উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ রক্ষা করতে—অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে সংশোধনযোগ্য ত্রুটি দূর করতে প্রয়োগ করে থাকি। আর কোন উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে যদি এই সব সংশোধনযোগ্য ত্রুটি দূর করা সম্ভব হয়, তাহলে সেই ব্যবস্থার উৎপন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে বলা হয়, এদের গুণগত উৎকর্ষ রাশি-বিজ্ঞান-সম্মতভাবে নিয়ন্ত্রিত; অর্থাৎ এই ব্যবস্থার উৎপন্ন দ্রব্যগুলি উৎপাদন সুরু হবার আগে নির্দিষ্ট করে দেওয়া মান রক্ষায় সক্ষম হয়েছে।

রাশি-বিজ্ঞানের নানান তত্ত্ব প্রয়োগ করে উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত মান কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, এবার সেই প্রশ্নে আসা যাক। নিয়ামক-চিত্র নামক এক ধরণের লেখচিত্র পদ্ধতিটির মূল কথা। এই নিয়ামক-চিত্র বর্ণনা করবার আগে কিছু প্রাথমিক আলোচনার প্রয়োজন।

রাশি-বিজ্ঞানের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, কিছু নমুনা ভালভাবে পরীক্ষা করে তাথেকে সমগ্রটির সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করে নেওয়া। রাশি-বিজ্ঞানের এই বৈশিষ্ট্যটি নিয়ামক-চিত্রের ক্ষেত্রেও কাজে লাগানো হয়েছে। প্রথমে অবিরাম উৎপাদন-প্রবাহ থেকে মোটামুটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাধারণতঃ সমান মাপের কতকগুলি নমুনা নেওয়া হয়। এইবার উৎপন্ন দ্রব্যের বিশেষ গুণগত লক্ষণকে আমরা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা অংশাঙ্ক (Statistic) ঠিক করা হয়, যেমন—গাণিতিক গড়, সমক পার্থক্য (Standard deviation), প্রসার (Range) ইত্যাদি। এবার আমাদের নেওয়া প্রতিটি নমুনার জন্যে এই অংশাঙ্কের মান নির্ণয় করি। আলোচনার সুবিধার জন্যে ধরা যাক, আমরা প্রতিটি নমুনার জন্যে গাণিতিক গড়ের ($\bar{X}$) মান নির্ণয় করলাম। $\bar{X}$ হচ্ছে নমুনার অন্তর্গত দ্রব্যগুলির বিশেষ গুণগত পরিমাপের (যেমন দৈর্ঘ্য, ব্যাস, বেধ ইত্যাদি) গড় মান। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বিভিন্ন নমুনার জন্য $\bar{X}$-এর মান সাধারণতঃ হবে বিভিন্ন। তবে রাশি-বিজ্ঞানের নানান তত্ত্ব প্রয়োগ করে দেখা গেছে (যার বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ বর্তমান প্রবন্ধে নেই)—এই মানগুলি পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও একটি বিশেষ নিয়মের অধীন। যেমন—মানগুলির একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক গড়, ধরা যাক μ থাকবে। যদি উৎপাদন-ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত হয়, μ সুরুতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া মানের সমান হবে। তেমনি নির্দিষ্ট একটা সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব, যাতে বিভিন্ন নমুনার জন্যে $\bar{X}$-এর মান $\mu+d$ এবং $\mu-d$-এর মধ্যে থাকবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই সম্ভাবনার মান ৯৯৭৩—অর্থাৎ গড়ে প্রতি হাজারটির মধ্যে ৯৯৭৩টি ক্ষেত্রেই $\bar{X}$-এর মান $\mu+d$ এবং $\mu-d$-এর মধ্যে পড়বে, যদি উৎপাদন-ব্যবস্থা হয় ত্রুটিমুক্ত। সুতরাং কোন $\bar{X}$-এর মান $\mu+d$ এবং $\mu-d$-এর বাইরে পড়লে বুঝতে হবে, সেই সময়ের

উৎপাদন-ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী

এবার নিয়ামক-চিত্রের বর্ণনায় ফিরে আসা যাক। নিয়ামক-চিত্র তৈরি করতে পরস্পর লম্বভাবে ছেদ করেছে, এমন দুটি অক্ষরেখা নেওয়া হয়। অনুভূমিক অক্ষরেখাটিতে নমুনাগুলির ক্রমিক সংখ্যা সাজানো হয় আর উল্লম্ব অক্ষরেখায় চিহ্নিত করা হয় $\bar{X}$ এর সম্ভাব্য সকল মান। উল্লম্ব অক্ষরেখার $\bar{X}=\mu$, $\bar{X}=\mu+d$ এবং $\bar{X}=\mu-d$—এই তিনটি বিন্দু থেকে তিনটি অনুভূমিক সরল রেখা টানা হয়। এদের মধ্যে প্রথমটিকে বলা হয় নিয়ামক-চিত্রের মধ্যম রেখা আর দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিকে বলা হয় যথাক্রমে উচ্চতর নিয়ামক সীমা এবং নিম্নতর নিয়ামক সীমা। এবার গাণিতিক গড়ের নিয়ামক-চিত্রের কাঠামোটি তৈরি সম্পূর্ণ হলো। একই ভাবে অন্য যে কোন অংশাঙ্কের জন্যে নিয়ামক-চিত্র অঙ্কন করা যেতে পারে।

গাণিতিক গড়ের নিয়ামক-চিত্রের সাহায্যে কিভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, এবার সেই আলোচনায় আসা যাক। মধ্যম রেখা এবং উচ্চতর ও নিম্নতর সীমারেখা এঁকে নেবার পর ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন নমুনার জন্যে $\bar{X}$ এর মান নিয়ামক-চিত্রে সংস্থাপন করা হলো। এখন যদি কোন $\bar{X}$ এর জন্যে অঙ্কিত বিন্দু উচ্চতর এবং নিম্নতর সীমা-রেখার মধ্যে অবস্থান করে, তাহলে বুঝতে হবে, যে সময় ঐ বিশেষ নমুনাটি নেওয়া হয়েছিল, সেই সময় উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোন সংশোধনযোগ্য ত্রুটি ছিল না; অর্থাৎ তখন উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ রাশি-বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিয়ন্ত্রিত। আর যদি কোন $\bar{X}$ ঐ দুই সীমারেখার বাইরে অবস্থান করে তাহলে বুঝতে হবে, ঐ সময়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন সংশোধনযোগ্য ত্রুটির আবির্ভাব হয়েছে, যার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ হয়েছে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ। তৎক্ষণাৎ উৎপাদন বন্ধ রেখে যন্ত্র, কাঁচামাল, কর্মীর দক্ষতা, উৎপাদন-প্রণালী প্রভৃতি পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত অপকর্ষের জন্যে কে দায়ী। তার অনুসন্ধান এবং যথাযথ সংশোধনের পর আবার উৎপাদন চালু করতে হবে। আবার হয়তো সবগুলি বিন্দুই নিয়ামক সীমারেখা দুটির ভিতরে পড়লো, কিন্তু দেখা গেল, বিন্দুগুলির পারস্পরিক অবস্থানের মধ্যে একটি বিশেষ ধাঁচ রয়েছে—যেমন, পর পর অনেকগুলি বিন্দু উচ্চতর বা নিম্নতর সীমারেখার খুব কাছে পড়েছে বা মধ্যম রেখার একদিকে পড়েছে বা একটা নির্দিষ্ট গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিন্দুগুলির মধ্যে। সে ক্ষেত্রে কোন বিন্দু যদিও কোনও সীমারেখার বাইরে পড়ে নি, তবুও বুঝতে হবে উৎপাদন ব্যবস্থায় এমন একটি ত্রুটির আবির্ভাব হয়েছে, যা শীঘ্রই উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাবে। সুতরাং প্রয়োজনমত ব্যবস্থা অবলম্বন করবার পরই পুনরায় উৎপাদন চালু করা যাবে।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক, ১০ মি. মি. মাপের আলপিন তৈরি করতে হবে। গাণিতিক গড়ের নিয়ামক-চিত্রের সাহায্যে আমরা আলপিনের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। প্রতি বারে ৫টি হিসাবে উৎপন্ন আলপিনের থোক (Lot) থেকে আমরা ১ ঘণ্টা অন্তর অন্তর নমুনা সংগ্রহ করলাম। বিভিন্ন নমুনার অন্তর্গত আলপিনের মাপ এখানে দেওয়া গেল।

নমুনার ক্রমিক সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (মি. মি.)	গড় দৈর্ঘ্য (মি. মি.) $=\bar{X}$
১	১০·২, ৯·৮, ৯·২, ১০·০, ১০·৩	৯·৯০
২	৯·৯, ১০·৪, ১০·২, ১০·৪, ১০·২	১০·২২
৩	৮·৭, ৯·০, ৮·৫, ৮·৫, ৮·৮	৮·৭৬

৪	১০·৪, ১০·৪ ৯·৮, ১০·১, ৯·৯	১০·১২
৫	৯·৮, ১০·৩, ৯·৬, ১০·০, ১০·২	৯·৯৮
৬	১০·১, ১০·০, ৯·৮, ১০·৫, ৯·৭	১০·০২
৭	১০·৫, ১১·২, ১০·৮, ১০·৫, ১০·৬	১০·৭২
৮	৯·০, ৯·৫, ৯·৯, ৯·৩, ৯ ৬	৯·৬

রাশি-বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী বিশেষজ্ঞেরা এরপর এর মান ঠিক করলেন—ধরা যাক—০·৯। তাহলে মধ্যম রেখা =১০·০, উচ্চতর নিয়ামক সীমা
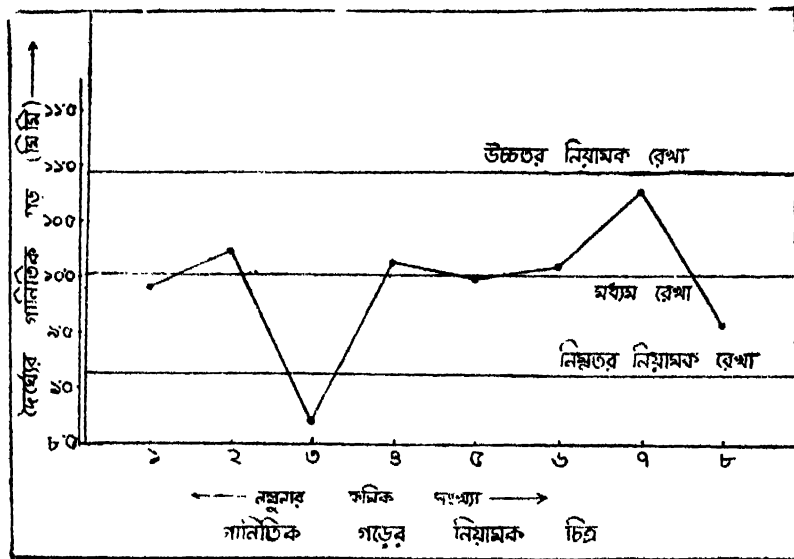
১নং চিত্র

=১০·০+০·৯=১০·৯ এবং নিম্নতর নিয়ামক সীমা =১০·০—০·৯=৯·১ ধরে আমরা নিয়ামকচিত্র অঙ্কন করলাম এবং তাতে সংস্থাপন করলাম বিভিন্ন নমুনার জন্যে পাওয়া $\bar{X}$-এর মানগুলি (১নং চিত্র)।

দেখা যাচ্ছে, কেবলমাত্র তৃতীয় নমুনাটির জন্যে বিন্দুটি সীমারেখার বাইরে পড়েছে। সুতরাং তৃতীয় ঘণ্টার পরেই উৎপাদন বন্ধ রেখে সম্ভাব্য ত্রুটির সন্ধান করা হয়েছে এবং সেই ত্রুটি সংশোধন করে পুনরায় উৎপাদন চালু করা হয়েছে।

আশা করি এবার আমাদের কাছে মোটামুটি পরিষ্কার হয়েছে, কিভাবে নিয়ামক-চিত্রের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন সময়ে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সংশোধন করে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র উৎপন্ন হয়, যাদের গুণগত উৎকর্ষ রাশি-বিজ্ঞান-সম্মতভাবে নিয়ন্ত্রিত।

এই গেল S. Q. C.-এর একটি দিক। S. Q. C.-এর একটি কাজ হচ্ছে, বিক্রয়ের জন্যে ক্রেতাদের কাছে পাঠাবার আগে উৎপন্ন দ্রব্যের থেকে ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্যের—অর্থাৎ যে সব দ্রব্যে পূর্বনির্দিষ্ট মান ঠিকমত রক্ষিত হয় নি, তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা। এক্ষেত্রে 'অংশকী পরিদর্শন পদ্ধতির' সাহায্য নেওয়া হয়।

দেহের অন্তঃস্রাবী গ্ল্যাণ্ডসমূহের অভিনব ক্রিয়াকলাপ

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

শারীরবিদ্যার বিভিন্ন অধ্যায়গুলির মধ্যে অন্তঃস্রাবী গ্ল্যাণ্ডগুলির ক্রিয়াকলাপের মত এত চিত্তাকর্ষক এবং কৌতূহলোদ্দীপক আর কোন অধ্যায়ই নয়। এই অধ্যায়ের আগাগোড়াই একটি রোমান্টিক গল্পের মত। একে অন্যের প্রতি প্রীতি ও প্রভাব, আবার অন্যদিকে কোন কোনটির অপরের প্রতি দ্বেষ, ঈর্ষা বা বিরূপতা এবং সময়ে সময়ে আপাতঃদৃষ্ট বৈরিতা সত্ত্বেও দেহের বিশেষ ক্রিয়া সাধনের প্রয়াস সত্য সত্যই বিস্ময়কর।

বাংলা ভাষায় "রোমান্স" শব্দের যথাযথ কোন প্রতি শব্দ নেই। অক্সফোর্ড অভিধানের সংজ্ঞা অনুসারে এর মানে, কোন চিত্তাকর্ষক গল্প বা প্রেমের উপাখ্যান, পরিস্থিতি, তার উপর প্রভাবকারী মনোবৃত্তি, সহানুভূতিপূর্ণ কল্পনা ইত্যাদি ইত্যাদি (An episode or love affair suggesting it, atmosphere characterising it, tendency to be influenced by it, sympathetic imagination etc. etc.) প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা বিশেষ সময়ে এরূপ একটি বিশেষ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী এবং অবস্থাভেদে তা ক্ষণস্থায়ী কিংবা বহুকাল স্থায়ীও হতে পারে। এই অবস্থায় শরীরে ও মনে ঘটে নানা বিস্ময়কর পরিবর্তন, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, ভাবাবেগ, অনুরাগ কিংবা বিরাগ, সাহস কিংবা কাপুরুষতা, কমনীয়তা কিংবা নিষ্ঠুরতা সব কিছুরই মূলে অন্তঃস্রাবী গ্ল্যাণ্ড কিংবা একইভাবে ক্ষরণকারী কোন নার্ভ-সেলপুঞ্জের ক্রিয়া।

অন্তঃস্রাবী গ্ল্যাণ্ডগুলি সাধারণতঃ করোটির মধ্যে, যেমন পিটুইটারি ও পিনিয়েল, গলদেশে, যেমন থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড ও থাইমাস (শেষোক্তটি কিছুটা বক্ষোদেশের উপরিভাগেও), উদরাভ্যন্তরে, যেমন প্যানক্রিয়াস, অ্যাড্রিনেল, ওভ্যারী, পাকস্থলী ও গ্রহণীর (Duodenum) অভ্যন্তরে, এমনি নানাস্থানে এবং নিম্নোদরের নীচে দেহের বাইরে, যেমন অণ্ডকোষ (Testis) থাকে। তাছাড়া হাইপোথ্যালামাসের নার্ভ-সেলপুঞ্জও উক্ত গ্ল্যাণ্ডসেলগুলির অনুরূপ অন্তঃক্ষরণ (Internal secretion)-ক্ষমতাসম্পন্ন। এদের মধ্যে দুটি, যেমন প্যানক্রিয়াস ও অণ্ডকোষের অন্তঃক্ষরণ ছাড়াও বহিঃক্ষরণ (External secretion) থাকাতে তাদের সঙ্গে যুক্ত ক্ষরণবাহী নলের (Duct) দ্বারা শেষোক্ত রস অন্যত্র বাহিত হলেও এদের এবং অপর সকল অন্তঃস্রাবী সেলের ক্ষরণ কোন নলের দ্বারা বাহিত না হয়ে একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের নিকট বা দূরবর্তী অপর কোন অংশে গিয়ে সেখানকার সেলগুলির উত্তেজনা বা অবতেজনা ঘটিয়ে তাদের যথাক্রমে অধিকতর সক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয় অবস্থা ঘটায়। তার জন্যেই ঐরূপ ক্ষরিত ও রক্তে বাহিত রাসায়নিক উপাদানগুলির নাম হর্মোন (শব্দটি গ্রীক ভাষার হরমোনাস শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার মানে উত্তেজনাকারী)।

অন্তঃস্রাবী সেল, গ্ল্যাণ্ড বা নার্ভ-সেল যাই হোক না কেন, হয় শোণিতে বর্তমান কোন রাসায়নিক উপাদানের প্রভাবে, নয় তো সংশ্লিষ্ট নার্ভ কিংবা কোন কোন স্থলে দু-এরই প্রভাবে নিজেদের বিশিষ্ট ক্ষরণে উদ্বুদ্ধ হয়, কিন্তু অভিব্যক্তির নিয়ন্তরীর যে সকল প্রাণীর

দেহে নার্ভতন্ত্র নেই, তাদের বেলায় ঐরূপ ক্ষরণের জন্যে একমাত্র শোণিত প্রবাহই দায়ী।

যতদিন পর্যন্ত অন্তঃস্রাবী দেহাংশগুলি নিজ নিজ স্বাভাবিক ক্রিয়াসম্পন্ন থাকে, ততদিন তারা তাদের 'ব্যাণ্ডমাষ্টার' পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের পুরোভাগের নিয়ন্ত্রণে স্বাভাবিক ঐক্যতানের সৃষ্টি করে। অন্যথায় যে যার ইচ্ছামত অধিক কিংবা কম ক্রিয়ারত হলে দেহ ও মনের মধ্যে দৃশ্য এবং অদৃশ্য বিপর্যয় ঘটতে পারে। ঐরূপ স্বাভাবিক সুষম ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি, যথাসময়ে স্বাভাবিক যৌনাবস্থা, স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সাম্যাবস্থা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই বিশিষ্ট অধ্যায়টি কিন্তু শারীরবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত একটি নতুন অংশ। যদিও বাল্মিকীর রামায়ণে, অ্যারিস্টোটোলের Historia Animalium-এ (খৃষ্টপূর্ব ৩০০) এবং সুশ্রুতে (খৃষ্টাব্দ ৫০০) কোন কোন স্থলে এরূপ বিশিষ্ট ক্রিয়ার আভাসের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, তবুও সতেরো শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগের মাঝামাঝি কালেই বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ফলে এবং অবশেষে ব্রাউন সেকার্ডের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা (১৮৬৯-১৮৯৯) এই বিষয়টির বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়।

রামায়ণে আছে, গুরুপত্নী অহল্যার সঙ্গে পাপাচরণের জন্যে মহর্ষি গৌতমের শাপে ইন্দ্রের পুরুষত্বহানি ঘটে এবং তাঁর দেহে পাঁঠার অণ্ডকোষের কলম করা হয় অস্ত্রোপচারের দ্বারা, যাতে তার রোগ নিরাময় হয়। একইভাবে অ্যারিস্টোটলের বিখ্যাত পুস্তকেও উল্লেখ আছে যে, পরিণত দেহ পুং-কুক্কুটের অণ্ডকোষকে কেটে ফেললে তার মাথার ঝুঁটির স্বাভাবিক রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তার গলার স্বাভাবিক স্বরও আর থাকে না এবং তার যৌন আবেগও হ্রাস পায়। আবার অল্প বয়স্ক পুং-কুক্কুটের দেহে ঐরূপ অস্ত্রোপচারের ফলে তাদের ঝুঁটি ও দেহের অন্যান্য পুরুষত্বের লক্ষণগুলি যেমন দেখা যায় না, আবার তেমনি পুরুষালি মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটে। সুশ্রুত পুরুষত্বহীনতার জন্যে অণ্ডকোষকে খাদ্যরূপে গ্রহণের বিধান দিতেন এবং সে সময়ে অণ্ডকোষের উপাদান পুরুষের পক্ষে যৌন উত্তেজক বলে পরিচিত এবং সে ভাবেই বহু ব্যবহৃত ওষুধরূপে প্রচলিত ছিল।

সুশ্রুতের যুগেরও প্রায় এক হাজার বছর পরে (১৫৪৩) ইউষ্টেকিয়াস (Eustachius) উদরাভ্যন্তরে অ্যাড্রিনেল গ্ল্যাণ্ডের সন্ধান পান। ১৬৭৪ সালে উইলিস (Willis)-এর ধারণা হয় যে, স্পার্মেটিক ধমনীর রক্ত-প্রবাহে যৌনাঙ্গগুলিতে কোন উপাদান বাহিত হয় এবং তার বিনিময়ে তা ঐগুলি থেকে এমন একটি কিণ্ব (Ferment) পদার্থ লাভ করে, যার কণিকাগুলি বীর্যরসের সঙ্গে মিশে গিয়ে আবার রক্তের সঙ্গে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে তাদের অধিকতর সক্রিয় ও পুনরায় পরিপূর্ণ জীবনীশক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলে। ১৬৯০ ইংরেজীতে রুইশ (Ruysch) মনে করেন যে, গলদেশে অবস্থিত থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের মধ্যে প্রস্তুত কোন একটি বিশেষ কার্যকর উপাদান রক্তস্রোতে মিশে যায়।

অষ্টাদশ শতকে (১৭৬৬) হেলারের (Haller) ধারণা হয় যে, থাইরয়েড, প্লীহা ও থাইমাসের দ্বারা ক্ষরিত কোন কোন উপাদান রক্তস্রোতে মিলিত হয়। ১৭৭৫ সালে বোর্ডার (Border) বলেন যে, ওভারী ও অণ্ডকোষের মধ্যস্থ কারখানায় এমন কোন কোন বিশেষ উপাদান তৈরি হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, যার ফলে যথাক্রমে একটা নির্দিষ্ট বয়সে স্ত্রী বা পুরুষের দেহে যৌবনের লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে—কেন না, ঐগুলি কেটে ফেলে দিলে আর সেরূপ বিশিষ্ট পরিবর্তনগুলি দেখতে পাওয়া যায় না। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে

কয়েকজন চিকিৎসকের ধারণা হয় যে, কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের অস্বাভাবিক দৈত্যাকার দেহবৃদ্ধির (Gigantism) জন্তে পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডই দায়ী। এরই দু-বছর পরে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অতি সক্রিয়তাজনিত 'ছানাবড়া চোখ' (Exophthalmos) ও অন্যান্য লক্ষণগুলি জানা যায়।

পরবর্তী শতকেই এই সম্পর্কে পথপ্রদর্শক বিজ্ঞানীদের আবির্ভাব ঘটে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কিং (King) থাইরয়েড সম্বন্ধীয় আলোচনায় বলেন—আমরা হয়তো বা ভবিষ্যতে কোন একদিন দেখাতে পারবো যে, থাইরয়েডের ভিতরে কোন একটি বিশেষ উপাদান অতি ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকে; তা খুব সম্ভবতঃ রক্ত-সংবহনে অতি প্রয়োজনীয় সহায়ক এবং সে কারণেই শরীরের কোন কোন অংশের উপযুক্ত পুষ্টির জন্তেও তা আবশ্যক। আর খুব সম্ভবতঃ সংবহমান রক্তস্রোতের উপর এরকম প্রভাবহেতু এই উপাদানটি সমস্ত জীবদেহের স্বাভাবিকতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্তে অতীব প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ১৮৪০ সালে অ্যাষ্টলি কুপার (Astley Cooper) এবং ১৮৫৬ সালে শিফ্ট (Schift) দেখতে পান যে, থাইরয়েডকে কেটে বাদ দিলে (থাই-রয়েডের মধ্যে অবস্থিত প্যারাথাইরয়েডের অবস্থিতি তখনো অজ্ঞাত) তা প্রাণহানিকর হয়। ঐ বছরই মোর (Morh) একটি রোগীর বিবরণ প্রকাশ করেন। তার ছিল মেদবহুল বপু, স্মৃতিলুপ্তি, নিদ্রালুতা এবং আংশিক দৃষ্টিহীনতা এবং মরণোত্তর দেহব্যবচ্ছেদের ফলে দেখা গিয়েছিল তার পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের ক্ষয়বিকৃতি।

১৮৪৯ সালে বার্থোল্ড (Berthold) লক্ষ্য করেন যে, একটি মুরগীর দেহে অণ্ডকোষের কলম লাগাবার ফলে তার মাথায় মোরগের মত ঝুঁটি দেখা দিয়েছে। তিনি গবেষণার ফলে আরও দেখতে পান যে, অণ্ডকোষ-বিচ্ছিন্ন মোরগের দেহে অণ্ডকোষ-কলা ঢুকিয়ে দিলে বিচ্ছেদজনিত লক্ষণগুলি আর প্রকাশিত হয় না। সে জন্তে তিনি মনে করেন যে, অণ্ডকোষ বা পুং-গ্ল্যাণ্ডের দ্বারাই পুং-যৌন লক্ষণগুলি রক্ষিত হয় এবং তার মধ্যেই কোন বিশেষ উপাদান তৈরি হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের সর্বাংশে বাহিত হয়।

পরের বছর (১৮৫০) কার্লিং (Curling) দেখতে পান যে, প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দেহে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অক্ষমতার জন্তে বর্তমানে মিক্সিডিমা নামক রোগের পরিচিত সকল লক্ষণগুলিই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ১৮৫৫ সালে প্রখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ক্লড বার্ণার্ড (Claude Bernard)-এর ধারণা হয় যে, যকৃতের অন্তঃক্ষরণ গ্লুকোজ (?) রূপে রক্তের সঙ্গে মিশে। ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে অতিনিম্ন রক্তের চাপ, শ্লথ নাড়ীর গতি, পেশীর অক্ষমতা ও ত্বকের নানাস্থানে কাল্‌চে দাগ প্রভৃতি লক্ষণ-যুক্ত একটি রোগ যে অ্যাড্রিনেল গ্ল্যাণ্ডের অক্ষমতার জন্তেই হয়, দু'জন বিজ্ঞানী টমাস ও অ্যাডিসনের (Thomas and Addison) তা প্রমাণ করেন এবং তার জন্তেই ঐ রোগের নামকরণ হয় 'অ্যাডিসন-রোগ'। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্যাণ্ড স্টোর্ক (Sand Stork) প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডগুলিকে আবিষ্কার করেন—এরূপ প্রচলিত ধারণা সত্ত্বেও তার জন্তে আসল কৃতিত্ব কিন্তু বিজ্ঞানী রিমার্ক্ (Remark)-এর (১৮৫৫)।

এপর্যন্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি লক্ষ্যবস্তু ও আবছা কার্য-কারণ সম্ভাবনা ছাড়া অন্তঃক্ষরণ সম্বন্ধে যথাযথ কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না বললেও হয়। ১৮৮৯ সালে ব্রাউন সেকার্ড (Brown Sequard) প্রকাশ করেন যে, অণ্ডকোষের নিষ্কাশন (Testicular extract) গ্রহণের ফলে তাঁর নিজের দেহের বার্ধক্যজনিত দৌর্বল্য আশাতিরিক্তভাবে দূর হওয়াতে তাঁর কর্মশক্তি বেড়েছে, মুখের চেহারা বদ্‌লে গিয়ে তাকে

তারুণ্যের ভাব ফুটে উঠেছে, ক্ষীয়মাণ স্মৃতিশক্তির উন্নতি হয়েছে এবং এবং বৃহদন্ত্র ও মূত্রাশয়ের ক্রিয়ার স্বাভাবিকতা ফিরে আসায় তাঁর কোষ্ঠবদ্ধতা দূর এবং মূত্রস্রোতের চাপও বর্ধিত হয়েছে। এরূপে তাঁর নিজের দেহের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই দেহের বিভিন্ন অংশের অন্তঃক্ষরণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা রূপ নিতে আরম্ভ করেছিল। তাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো বেলি ও স্টার্লিং (Bayliss and Starling) নামক দু-জন বিজ্ঞানীর দ্বারা. যখন তাঁরা দেখিয়ে দিলেন যে, গ্রহণীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর অ্যাসিডের প্রভাবে যে উপাদানের ক্ষরণ হয়, তাই রক্তের সঙ্গে প্যান্ক্রিয়াসে বাহিত হয়ে তার গ্ল্যাণ্ড-সেলগুলিকে ক্ষরণের জন্যে উদ্বোধিত করে (১৮৬৯-১৮৯৯)।

ইতিমধ্যে অর্ড (Ord), রেভার্ডিন (Reverdin), কোকার (Kocher) এবং হর্স্‌লি (Horsley) যথাক্রমে ১৮৭৭, ১৮৮২, ১৮৮৩ ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দেখতে পান যে, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের বিচ্ছেদের ফলে এক প্রকারের বিশিষ্ট অস্থিচর্মসার কাহিল অবস্থা (Cachexia Strumipriva) দেখা দেয়। শেষোক্ত বছরেই শিফ্‌ট (Schift) প্রমাণ করেন যে, অপর জন্তুর দেহ থেকে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড নিয়ে ঐ গ্ল্যাণ্ড-বিচ্ছিন্ন জন্তুর দেহে কলম করলে বিচ্ছেদজনিত রোগলক্ষণগুলি দূরীভূত হয় এবং তাকেই ভিত্তি করে ১৮৯১ সালে মারে (Murray) এবং ১৮৯২ সালে ফক্স (Fox) ঐরূপ লক্ষণযুক্ত রোগীদিগকে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড মুখে খেতে দিয়ে তাদের রোগ নিরাময় চিকিৎসার প্রবর্তন করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সেমন (Semon) কতকটা ধারণা করলেও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে হর্স্‌লিই (Horsley) প্রমাণ করেন যে মিক্সিডিমা ও ক্রেটিন-বামনত্ব (Myxoedema and Cretinism) রোগ হয় থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অক্ষমতার জন্যে এবং থাইরয়েড-নিষ্কাশন খেতে দিলে যে, ঐ রোগের উপশম হয়, ১৮৯১ সালে মারে (Murray) তাও প্রতিপন্ন করেন। ১৮৯৩ সালে গ্রীনফিল্ড (Greenfield) দেখান যে, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অতি সক্রিয়তার জন্যে গ্রেভ্‌স্ রোগ (Graves' disease) জন্মায়। ১৮৯৫ সালে বৌম্যান ও রস (Baumann and Ross) দেখতে পান যে, থাইরয়েডের মধ্যে জৈব যৌগিক রূপে আয়োডিন থাকে। ১৮৮৬ সালে মেরীই (Marie) প্রথমে বলেন যে, অ্যাক্রোমেগালি নামক রোগটি পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৮৯৪ সালে তাম্বুরিনি (Tamburini) এবং ১৯০০ সালে বেন্দাও (Benda) ঐ মতকে সমর্থন করেন।

১৮৯৪ সালই এ-সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, কেন না ঐ বছরেই শেফার ও অলিভার (Schafer and Oliver) পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের পশ্চাদ্‌ভাগের মধ্যস্থ চাপবর্ধক উপাদান নিয়ে যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গবেষণা আরম্ভ করেন, তারই ফলে অন্তঃস্রাবী আন্তর যন্ত্রের উপস্থিতি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে হাওয়েল (Howell) এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ডেল (Dale) ঐ যুগান্তকারী সিদ্ধান্তকে শুধু নির্ভুল বলেই প্রতিপন্ন করেন নি, অধিকন্তু তাতে বর্তমান জরায়ু সংকোচক আর একটি উপাদানের সন্ধানও পান। শেষোক্ত বিজ্ঞানীরা আরও প্রমাণ করেন যে, অ্যাড্রিনেল গ্ল্যাণ্ড-নিষ্কাশনও অনুরূপভাবে হৃদয়, ধমনী ও রক্তের চাপের উপর প্রভাব-সম্পন্ন। ঐ একই উল্লেখযোগ্য বছরে অ্যাবেল এবং ক্রফোর্ড (Abel and Crawford) অ্যাড্রিনেল গ্ল্যাণ্ড থেকে এপিনেফ্রিন এবং ১৯০০ টাকামাইনও (Takamine) একইভাবে কেলাসের আকারে সক্রিয় অ্যাড্রিনেলিন তৈরি করেন। ১৯০৭ সালে ষ্টোল (Stole) তাই আবার গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করেন। ১৯০১ সালে ল্যাংলে (Langley) প্রমাণ করেন যে, অ্যাড্রিনেলিন বা এপিনেফ্রিনের ক্রিয়া সমব্যথী নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়ার মতই।

বিংশ শতকের প্রথম থেকে এই ইতিহাস এত শাখা-প্রশাখা ও নিত্য নতুন পল্লবে বিস্তারিত যে, তার বিশদ বিবরণ দিতে গেলে এই প্রবন্ধের আকারও বিশালকায় হয়ে পড়বে। তাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গবেষণার উল্লেখ করেই সুদীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া গেল। ব্যান্টিং, বেষ্ট ও ম্যাকলিয়োড (Banting, Best and McLeod) প্যানক্রিয়াসের দ্বৈপিক অংশ থেকে ইনসুলিন নামক মধুমেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ আবিষ্কার করেন। একইভাবে জণ্ডেক (Zondek), কলিপ (Collip) ও হাউসে (Houssay) যথাক্রমে পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের মধ্যাংশ থেকে ইন্টারমেডিন, প্যারাথাইরয়েড থেকে প্যারাথর্মোন এবং পিটুইটারির সম্মুখ অংশে বর্তমান মধুমেহ সংঘটক উপাদান (Diabetogenic factor)-এর সন্ধান পান। অ্যাড্রিনেল গ্ল্যাণ্ডের সামগ্রিক বিচ্ছেদজনিত রোগলক্ষণগুলি ও পরিণামে মৃত্যুকেও ঐ গ্ল্যাণ্ডের বহিস্থকের নিষ্কাশ-সাহায্যে যে ঠেকিয়ে রাখা যায়, তাই প্রমাণ করেন সুইন্‌গল্‌ ও ফিফনার (Swingle and Pfiffner) এবং পরবর্তী কালে কেণ্ডাল ও তৎসহযোগীগণ (Kendall and Coworkers) দেখান যে, ঐ গ্ল্যাণ্ডের বহিস্থকের নিষ্কাশনে বহু ষ্টেরোয়ড জাতীয় সক্রিয় উপাদান বর্তমান। এমনি আরও কত নিত্য নতুন জ্ঞান আমরা প্রতিদিন লাভ করছি, হাজার হাজার খ্যাত-অখ্যাত গবেষকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে।

উল্লিখিত ইতিহাসকে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, দেহের বহির্ভাগীয় অন্তঃস্রাবী দেহাংশগুলিই—যেমন অণ্ডকোষ ও থাইরয়েড, সর্বপ্রথমে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার পর দেহের বিভিন্ন অংশে লুকিয়ে থাকে যে সকল সমধর্মী অংশ, তাদের সম্বন্ধেও গবেষণা ও অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। অভিজ্ঞতার ফলে আমরা জানি যে, সকল রোমান্সেরই একটি উপযুক্ত পটভূমিকা থাকা চাই। তার জন্যে চাই দেহ ও মনের সুষ্ঠু বিকাশ, তার জন্যে চাই দেহের নার্ভতন্ত্র ও অন্তঃস্রাবী করণতন্ত্রের একে অন্যের সহযোগ। বাইরের সঙ্গে জীবদেহের যোগাযোগ ঘটে সজাগ প্রহরীর মত পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। তারও আগে দেহের অভ্যন্তরে সাড়া দেবার মত উপযুক্ত ক্ষেত্রের প্রস্তুতি চলে, বিশেষভাবে কৈশোরাবস্থায় এবং যৌবনকালে। সকলের উপরে বসে আছে নার্ভতন্ত্রের যে সকল স্থান, যেমন গুরুমস্তিষ্ক, থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস প্রভৃতি; সমগ্র নার্ভতন্ত্র যেমন তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন, ঠিক তেমনি অন্তঃস্রাবী গ্ল্যাণ্ডগুলির মধ্যে সকলের উপরে যার স্থান অর্থাৎ পিটুইটারি, তাই নিয়ন্ত্রণ করে অপর সকল সমশ্রেণীর দেহাংশের ক্রিয়া। পিটুইটারির সক্রিয় মুখ্য অংশ হলো তার পুরোভাগ (Anterior pituitary), তা একদিকে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে যেমন দায়ী, তেমনি তা আবার স্ত্রী এবং পুরুষ ভেদে যৌন গ্ল্যাণ্ডের ক্রিয়াকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তদনুরূপ মানসিকতা ও ভাবালুতাকেও উদ্বোধিত করে যথাসময়ে। সে কারণে যৌবনকালে সিংহের যেমন দেখা যায় কেশর, ময়ূরের পুচ্ছ, মোরগের ঝুঁটি এবং মানুষের পুরুষোচিত গোঁফ-দাড়ি এবং সিংহী, ময়ূরী, মুরগী বা নারীদেহে ফুটে উঠে নারীসুলভ দৈহিক পরিবর্তনগুলি ও মনে কমনীয় ভাব। এই বৈপরীত্যের ফলেই পুরুষ এবং স্ত্রী, সকল প্রাণীরই মানসিক আকর্ষণ থাকে অপরের প্রতি। পিটুইটারি ও যৌন গ্ল্যাণ্ডগুলি ছাড়া অন্যান্য, যেমন থাইরয়েড, অ্যাড্রিনেল প্রভৃতিও পিটুইটারির নিয়ন্ত্রণাধীন নিজ নিজ কাজ করে যায় ঘড়ির কাঁটার মত। কিন্তু যখনই কোন কারণে তাদের কোন কোনটির অস্বাভাবিকতা ঘটে এবং সময়ে সময়ে একই সঙ্গে কয়েকটিরও তা ঘটতে পারে, তখনই শরীর

ও মনের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। পরিবর্তন বলতে সামান্য এদিক-সেদিক নয়, অনেক সময়ে সম্পূর্ণ বিপরীত বা অস্বাভাবিক চেহারা বা মানসিকতাও দেখা দিতে পারে। দৃষ্টান্তস্থলে, পিটুইটারি এবং থাইরয়েডের অক্ষমতার জন্যে যথাক্রমে যে পিটুইটারি বামনত্ব ও ক্রেটিন বামনত্ব দেখা যায়, তাতে যৌন অঙ্গগুলিও অপরিণত থাকে। আবার পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের বিভিন্ন হর্মোনের বিষম সক্রিয়তার জন্যে যে ফ্রলিক্‌স্ রোগ (Frolich's) জন্মে বা শুধু যৌন গ্ল্যাণ্ডের অক্ষমতার জন্যেও দেহের উচ্চতাসহ বৃদ্ধি কতকটা স্বাভাবিক থাকলেও যৌন অঙ্গগুলি অপুষ্ট থাকে এবং মনের ভাবও সে কারণে কতকটা পুরুষের বেলায়ও মেয়েদের অনুরূপ হয়। আবার পরিণত বয়সে থাইরয়েডের নিষ্ক্রিয়তার জন্যে মিক্সিডিমা কিংবা প্যানক্রিয়াসের মধ্যে ইনসুলিনের অভাবে যে ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগ জন্মায়, তাতে পুষ্ট যৌন অঙ্গগুলিরও অক্ষমতা দেখা দিতে পারে। ঠিক বিপরীতভাবে পিটুইটারির দেহবর্ধক হর্মোনের অধিক ক্ষরণে প্রাপ্তবয়স্ক লোকের এক্রোমেগালি নামে বিকৃত মুখাবয়বযুক্ত রোগে কিংবা অ্যাড্রিনেল গ্রন্থির অর্বুদজনিত রোগেও অত্যধিক যৌন সক্রিয়তা ও কামুকতা দেখা দিতে পারে। আবার মেয়েদের ঐরূপ অ্যাড্রিনেল গ্ল্যাণ্ডের অর্বুদজনিত অত্যধিক সক্রিয়তার ফলে মুখে শুধু দাড়ি-গোঁফই নয়, সমস্ত দেহেও পুরুষোচিত লোমশভাব দেখা দিতে পারে এবং পরিণামে নারীদেহের পুরুষ দেহে বিবর্তনও (Virilism) ঘটতে পারে। ইংল্যাণ্ডে জনৈকা নার্স দেহের এরূপ পরিবর্তনের পর আর একজন সখী নার্সকে বিয়ে করেছে, এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। আবার ঠিক বিপরীতভাবে ফ্রলিক্‌স্ রোগে কিংবা থাইরয়েড বা টেস্টিসের অক্ষমতার ফলে পুরুষদেহেও গোঁফ-দাড়ি বা শরীরের সর্বত্র লোমের অভাব লক্ষিত হয়। মনের দিক থেকেও ঐ সঙ্গে পুরুষজনোচিত আবেগ ও যৌনবোধও খুবই কম থাকে। আবার পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের পুরোভাগের বিভিন্ন হর্মোনের ক্রিয়ার অসামঞ্জস্য হেতু ফ্রলিক্‌স্ রোগের ঠিক উল্টো যে বিশেষ প্রকারের বামনত্ব দেখা যায়, তাতে শুধু হাত-পায়ের দৈর্ঘ্য কম হলেও মুখ বা ধড়ের চেহারা বয়সে নারী বা পুরুষোচিত থাকে এবং যৌনাঙ্গগুলি শুধু আকারেই বড় হয় না, অধিক সক্রিয়তাসম্পন্নও হয়। এরূপ বামন পুরুষ বা নারী বহু সন্তানের জনক বা জননী হয়েছে, এমনি সাধারণতঃ দেখা যায়। কোন কোন গ্ল্যাণ্ডের নিষ্ক্রিয়তার জন্যে দেহ মেদবহুল হয়, যেমন—থাইরয়েডঘটিত মিক্সিডিমা নামক রোগ, পিটুইটারি ও অ্যাড্রিনেলের যুক্ত বৈষম্য হেতু কুশিং-রোগ এবং ওভারী বা টেস্টিসের অক্ষমতা বা অভাবজনিত মেদবাহুল্য (যেমন প্রৌঢ়াবস্থায় সাধারণতঃ মেয়েদের এবং জন্তুদের মধ্যে খাসীর দেহে দেখা যায়)। মাসিক বন্ধ হয়ে যাবার পর ওভারীর নিষ্ক্রিয়তার জন্যে সময়ে সময়ে মেয়েদের মুখে দাড়ি-গোঁফ গজাতেও দেখা যায়। আবার বিপরীতভাবে থাইরয়েডের অত্যধিক সক্রিয়তার ফলে যেমন কেশবাহুল্য দেখা যায়, তেমনি ঐ সঙ্গে অতিকৃশতাও ঘটে। পিটুইটারিঘটিত সাইমণ্ড রোগ (Symmond's disease) এবং ইনসুলিনের অভাবহেতু ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগেও একইভাবে অতিকৃশতা, অস্থিচর্মসার অবস্থা ঘটতে পারে। পিটুইটারির অস্বাভাবিকতাঘটিত প্রোজেরিয়া নামক রোগে অতি অল্প বয়সেই অকাল-বার্ধক্য দেখা যায়।

অ্যাড্রিনেল গ্ল্যাণ্ডের অক্ষমতার ফলে অ্যাড্রিসন্‌স রোগের লক্ষণগুলির কথা আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়াও ঐ কারণে শরীরের অভ্যন্তরে রোগ, শারীরিক বা মানসিক অভিঘাত (Shock), পুড়ে যাওয়া, হাড় ভেঙে যাওয়া প্রভৃতি

আভ্যন্তরীণ এবং অতিতপ্ততা, অতিশৈত্য, অতি-বেদনাকর আঘাত প্রভৃতি বাহ্য ক্ষতিকর পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতাও আর থাকে না। সুতরাং লোকের যে কোন বিষয়ে লড়াই করবার ক্ষমতা কমে যায়, সহজে মনে ভয় বাসা বাঁধে এবং সকল সময়েই পলায়নপর হীনমন্যতার ভাব ফুটে ওঠে।

প্যারাথাইরয়েডের অক্ষমতার ফলে রক্তে ক্যালসিয়াম-উপাদান হ্রাস পায় এবং ফলে ক্যালসিয়ামের অভাবে নার্ভসমূহের অত্যুত্তেজনার জন্যে দেহের নানা অংশে পেশীগুলির সংকোচন হতে থাকে। ঠিক উল্টোভাবে এই গ্ল্যাণ্ডের অত্যধিক সক্রিয়তা ঘটলে রক্ত হাড়গুলি থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম উপাদানকে টেনে আনে বলে তাদের ভঙ্গুরতা দেখা দেয় এবং বহু ভগ্নাস্থির জন্যে দেহের গড়ন একেবারে বিকৃত হয়ে পড়ে। রামায়ণে অষ্টাবক্র মুনির উল্লেখ আছে—প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অর্বুদ বা অতি সক্রিয়তার ফলেই ঐরূপ দেহবিকৃতি সম্ভবপর।

একই গ্ল্যাণ্ডের মধ্যে ক্ষরিত বিভিন্ন হর্মোনের ক্রিয়ার বৈরূপ্যও কখনো কখনো দেখা যায়। পিটুইটারির পুরোভাগীয় দেহবর্ধক এবং যৌন গ্ল্যাণ্ড-নিয়ন্ত্রক হর্মোনগুলি একে অন্যের ক্রিয়াকে প্রতিহত করে। যতক্ষণ শেষোক্তগুলির ক্রিয়া চাপা থাকে, ততদিন দেহবৃদ্ধি হয়। সে জন্যেই যৌন-গ্ল্যাণ্ডগুলির সক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে দেহবৃদ্ধিও থমকে দাঁড়ায়। আবার প্রথমটির সক্রিয়তা অব্যাহত থাকলে দ্বিতীয়টির কতকটা নিষ্ক্রিয়তাও অবশ্যম্ভাবী। অতিকায়ত্ব ও ক্লিনিক্স্ রোগে সে কারণেই দৈহিক বৃদ্ধির অনুপাতে যৌনাঙ্গগুলি অপুষ্ট ও অপরিণত অবস্থায় থাকে, আবার বিপরীত-ভাবে একদিকে যৌন গ্ল্যাণ্ড-নিয়ন্ত্রক হর্মোন-গুলির হঠাৎ অত্যধিক সক্রিয়তার ফলে যৌনাঙ্গ-গুলির সক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে দেহ-বৃদ্ধিও থেমে যায় বলে যে একপ্রকার বামনত্ব দেখা দেয়, তার কথা আগেই বলা হয়েছে। একইভাবে প্যানক্রিয়াসের দ্বৈপিক অংশের মধ্যে বিটা-সেলগুলিতে ক্ষরিত ইনসুলিন যেমন রক্তের গ্লুকোজকে দেহের কাজে নিয়োগের ফলে হ্রাস করে, আল্‌ফা-সেল-ক্ষরিত গ্লুকাগোন আবার বিপরীতভাবে শর্করেতর উপাদান থেকে অধিক পরিমাণে গ্লুকোজের উৎপাদন বৃদ্ধির (Neogluco-genesis) দ্বারা ঐ পরিমাণকে রক্তে বাড়িয়ে তোলে। যৌবনোদ্গমে পিটুইটারীর মধ্যে ক্ষরিত যৌন গ্ল্যাণ্ড-নিয়ন্ত্রক দুটি হর্মোন F. S. H এবং L. H.-এর প্রভাবে নারীদেহে ওভারীর মধ্যে যথাক্রমে ঈষ্ট্রাডিয়োল ও প্রজেস্টেরোন নামক পর পর যে দুটি হর্মোন ক্ষরিত হয়, তারাই স্বাভাবিক মাসিক ঋতু, যথাসময়ে ওভামের বহিষ্কার, গর্ভাধান ও গর্ভাবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্যে দায়ী। কিন্তু ওভারীর উক্ত দুটি হর্মোন আপাতঃ দৃষ্টিতে কতকটা পরস্পরের বিরোধী হলেও তাদের দুয়েরই একমাত্র উদ্দেশ্য, একে অন্যের সক্রিয়তাকে কতকটা প্রতিরোধ করে প্রজনন শক্তিকে স্বাভাবিক পথে চালিত করা। পুং এবং স্ত্রীদেহে F. S. H-এর প্রভাবে যথাক্রমে শুক্রকীট ও ডিম্বাণু (Ovum) উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার তেমনি L. H.-এর প্রভাবে পুং-দেহের অণ্ডকোষের অন্তঃক্ষরণ টেস্টোস্টেরোনের ক্ষরণও নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন স্ত্রী-দেহে হয় প্রজেস্টেরোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় টেস্টিসে ক্ষরিত টেস্টোস্টেরোন ও ওভারীর কর্পাস্ লুটিয়ামে ক্ষরিত প্রজেস্টেরোনের রাসায়নিক গঠন ও ক্রিয়াও প্রায় একইরূপ অনেক স্থলেই।

গর্ভাবস্থায় শুধু ওভারীতেই নয়, তৎকালে বর্তমান গর্ভফুলে এবং অ্যাড্রিনেল গ্ল্যাণ্ডের ত্বকাংশেও গর্ভস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক পরিণতির জন্যে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পরিমাণে প্রজেস্টে-রোনের ক্ষরণ হতে থাকে। যৌবন সমাগমে স্তনের

স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে ওভারীর দুটি হর্মোনই দায়ী, কিন্তু গর্ভাবস্থায় তা আরো বৃদ্ধি পায় এবং বিশেষতঃ বোঁটাটি উঁচু হয়ে ওঠে প্রজেস্টেরোনের প্রভাবেই। পিটুইটারির পশ্চাদভাগের অক্সিটোসিন নামক হর্মোনের প্রভাবেই পরিণত গর্ভাবস্থায় জরায়ুর সংকোচনের ফলে সুপ্রসব সম্ভবপর হয়। সদ্যোজাত সন্তানের মাতৃস্তন্য পানের প্রয়াস পিটুইটারি গ্রন্থির পুরোভাগে ক্ষরিত প্রল্যাক্টিন নামক একটি বিশেষ হর্মোনের ক্ষরণের দ্বারা স্তনের মধ্যে দুগ্ধক্ষরণ বাড়ায় এবং ঐ গ্ল্যাণ্ডের পশ্চাৎ-ভাগস্থ হর্মোনের দ্বারা স্তনের আভ্যন্তরীণ সরল পেশীর সংকোচনে সন্তানের মুখে দুধের ছিঙ্কারের সাহায্য করে।

অন্তঃস্রাবী গ্ল্যাণ্ডগুলির সঙ্গে নার্ভতন্ত্রের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। থাইরয়েডের থাইরোক্সিন ও অ্যাড্রিনেল গ্ল্যাণ্ড-এর অ্যাড্রিনেলিনের ক্রিয়া ঠিক সমব্যথী নার্ভের সক্রিয়তার মত। আবার ইন-সুলিনের বিপরীতধর্মী ক্রিয়া পরাসমব্যথী নার্ভের ক্রিয়ার মতই। হাইপোথ্যালামাসের মাঝামাঝি অবস্থিত নিউক্লিয়াসগুলি পরাসমব্যথী নার্ভের এবং পশ্চাৎ নিউক্লিয়াসগুলি সমব্যথী নার্ভের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্যে দায়ী। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অক্ষমতার জন্যে আবার হয় বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিতই হয় না, যেমন ক্রেটিন বামনত্বে দেখা যায় কিংবা আগের বুদ্ধিও ভোঁতা হয়ে যায়, যেমন মিক্সিডিমা রোগে। পিনিয়েল গ্ল্যাণ্ডের অর্বুদের ফলে অতি মণীষা ঘটেছে বলে কয়েকটি দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ আছে।

অন্তঃস্রাবী গ্ল্যাণ্ডগুলির সুষ্ঠু ক্রিয়া যেমন নিয়ন্ত্রিত হয় পিটুইটারির পুরোভাগের দ্বারা, আবার তেমনি তারও ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় হাইহোথ্যালামাসের দ্বারা। এই নিয়ন্ত্রণের মুখ্য স্থানগুলি হলো হাইপোথ্যালামাসের আভ্যন্তরীণ নিউক্লিয়াসপুঞ্জ। তাদের মধ্যে সর্বদাই দেহের বিভিন্ন অংশ আর বিশেষতঃ অন্যান্য অন্তঃ-স্রাবী গ্ল্যাণ্ডসমূহ থেকে রক্তের মাধ্যমে এবং সময়ে সময়ে নার্ভের মাধ্যমেও এসে পৌঁছায় উত্তেজনা, যার ফলে তাদের নার্ভ-সেলগুলির মধ্যে হতে থাকে এক প্রকারের বিশিষ্ট ক্ষরণ (Neurosecretion)। তাই রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের পুরঃ ও মধ্যভাগে পৌঁছায় এবং বিভিন্ন সেলকে বিশেষ বিশেষ হর্মোন ক্ষরণে উদ্বোধিত করে। আবার কোন কোন নার্ভের মাধ্যমেও তা পিটুইটারীর পশ্চাদ্ভাগে গিয়ে সেখানেও ভেসোপ্রেসিন ও অক্সিটোসিন-রূপে জমা হয় এবং প্রয়োজনমত রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। সে কারণেই সুপ্রাঅপ্টিকো হাইপোফাইসিয়েল ট্র্যাক্ট (Supra optico hypophyseal tract) নামক নার্ভগুচ্ছের যেখানে অপ্টিক নার্ভ দুটি একে অন্যকে অতিক্রম করে অপর দিকে চলে যায় (Optic chiasma), তার সন্নিহিত অঞ্চলে কোন বিচ্ছেদ ঘটলে কোন কোন স্থলে বহুমূত্র (Diabetis insipidus) এবং কোন কোন স্থলে স্থানবিভেদে ফ্রলিক্স্ রোগ দেখা দেয়। এরূপ ব্যাঘাতের ফলেই হাইপোথ্যালামস থেকে উৎপন্ন ভেসোপ্রেসিনের (অন্য নাম মূত্রপ্রতিরোধক বা অ্যান্টিডাইউরেটিক হর্মোন) রক্তে অভাব ঘটাতেই ঐরূপ হয় এবং অনুরূপভাবে অন্যথা ঐ ক্ষরণ পিটুইটারির পুরোভাগে না পৌঁছাবার ফলে সেখানে ক্ষরিত হর্মোনগুলির ক্রিয়ার বৈষম্যহেতু (Dyspituitarism) ফ্রলিক্স্ রোগ হয়।

সুতরাং শুধু দেহের বিভিন্নাংশে নলিকা-বিহীন (কোন কোনটি নলিকাযুক্তও বটে) গ্ল্যাণ্ডই নয়, হাইপোথ্যালামাস, পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের পশ্চাদ্ভাগ, এমন কি কোন কোন প্রাণীর (যেমন মাছ) সুষুম্নাকাণ্ডের (Spinal cord) শেষ প্রান্তের নার্ভ সেলগুলিও কোন না কোন হর্মোন ক্ষরণ করতে পারে।

এক কথায় বলতে গেলে প্রাণিদেহের এই সব অভিনব ক্রিয়াকলাপ সত্যই বিস্ময়কর, চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক।

সঞ্চয়ন

নিদ্রা ও নিদ্রাহীনতা

মানুষ ঘুমায় কেন? সহজ মনে হলেও প্রশ্নটির জবাব দেওয়া সোজা নয়। নিউরো-ফিজিওলজিষ্টদের সাম্প্রতিক আবিষ্কার নিদ্রা-প্রহেলিকার কিছু রহস্য উদ্ঘাটন করেছে। দেখা গেছে, মস্তিষ্কের একটি বিশেষ কেন্দ্র নিদ্রা নিয়ন্ত্রণ করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় জন্তুদের মস্তিষ্কের এই অংশ অপসারিত করায় তারা তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ে। কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা গেলে দীর্ঘকাল এই জন্তুরা নিদ্রিত অবস্থায় থাকতে পারে।

কখন ও কেন নিদ্রা আসে, তার ব্যাখ্যা অবশ্য এতে পাওয়া যায় না। আপাতঃ দৃষ্টিতে হাজার হাজার বছর ধরে বিকশিত এক চক্র এই নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তা প্রকৃতি-চক্রের সঙ্গে যুক্ত। সূর্যগ্রহণ, ঋতু-বদল, চান্দ্রচক্র, দিন-রাত, জোয়ার-ভাটা—এগুলির সবই জীবরাজ্যের প্রক্রিয়াসমূহকে প্রভাবিত করছে।

সম্প্রতি সোভিয়েট শারীরতত্ত্ববিদেরা ২৪ ঘন্টার চক্রকে বদ্‌লাবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। এসব পরীক্ষায় ৪৮ ঘন্টা সময়ের মধ্যে নিদ্রার সময়কে কমিয়ে বারো ঘন্টা করা হয়েছে। সকল মানুষের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করে সামাজিক প্রয়োজনীয় কাজ ও অবসর যাপনের অতিরিক্ত সময় জোগাতে পারে।

কোন ব্যক্তি একেবারে না ঘুমিয়ে পারে না—বাতাস বা খাদ্যের মতই ঘুম সমান প্রয়োজনীয়; তবে সব মানুষই যে স্বাভাবিক নিদ্রা যায়, তা নয়। চিকিৎসকেরা এমন বহু ঘটনার কথা জানেন, যেখানে কোন কোন ব্যক্তি বাসে, সিনেমায়—এমন কি, হাঁটতে হাঁটতে বা সাইকেল চড়ে যেতে যেতে ঘুমিয়ে পড়ে। জনৈক চিকিৎসক রোগী পরীক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তেন। কখনো কখনো মাংসপেশী শিথিল হলে নিদ্রা আসে। জনৈক শিকারী বন্দুকের ঘোড়া টিপতে উদ্যত হলেই দুর্বলতা তাকে গ্রাস করতো। এই ব্যাধির কোন কোন বহিঃপ্রকাশকে বলা হয় নার্কোলেপিস।

কেস হিষ্ট্রি থেকে বহু দিন—মাসের পর মাস ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, এরূপ রোগীর দীর্ঘ রেকর্ড পাওয়া যায়। এদের অনেকেই তরুণ-তরুণী—সাধারণতঃ মহিলা। এরা হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে এবং দু-তিন দিন কিংবা দুই থেকে পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত নিদ্রিত থাকে। সাধারণতঃ কোন কিছুই তাদের জাগাতে পারে না—সূচের খোঁচা, ঘুষি, কোন কিছুতেই তাদের ঘুম ভাঙ্গে না।

এক বিশেষ ধরণের শীতঘুমে (হাইবার-নেসন) তন্দ্রাচ্ছন্নতার সঙ্গে যুক্ত হয় ক্ষুধা। এই ধরণের সাময়িক শীতঘুম প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, তবে এর স্থায়িত্ব এক মাসের বেশী হয় না। ২০ বছরের অধিক কাল ধরে নিদ্রিত ব্যক্তিদের দুটি কেস রেকর্ড করা হয়েছে। রাশিয়ায় একটি বড় জমিদারীর ম্যানেজার জনৈক কোচালকিন উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং তার ঘুম ভাঙ্গে অক্টোবর বিপ্লবের পর। বিখ্যাত সোভিয়েট শারীরতত্ত্ববিদ ইভান পাভ্‌লোভ এই ব্যক্তিকে পরীক্ষা করেছিলেন।

মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকায় এরূপ লোকের সংবাদ বেরোয়, যারা নাকি একেবারেই নিদ্রা যায় না। এসব সংবাদ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। একটা কথা আছে যে, এসব ব্যক্তিদের চোখে অকস্মাৎ ঘুম নেমে আসে এবং তা অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। অন্যেরা এবং সে নিজেও এই ঘুমের ব্যাপার লক্ষ্য করতে পারে না।

অবসাদের সম্পূর্ণ বিপরীত হলো অনিদ্রা—এটি বর্তমান শতকের এক ব্যাপক ব্যাধি। এর কারণ স্নায়ুতন্ত্রের একটা নির্দিষ্ট বিশৃঙ্খলা—নিউরেস্থেনিয়া। ঘুম পাড়িয়ে এখন এই রোগের চিকিৎসা করা হয়।

কয়েক বছর আগে কোন কোন বিদেশী পত্রিকা চাঞ্চল্যকর এক সংবাদ পরিবেশন করেছিল। এতে বলা হয়েছিল যে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা নাকি স্বাভাবিক নিদ্রার স্থলে বৈদ্যুতিক উপায়ে নিদ্রাবেশ ঘটাবার প্রক্রিয়া প্রবর্তনের চেষ্টা করছেন। বলা হয়েছিল, হাজার হাজার লোকের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে।

এসব সংবাদের উৎস কি ছিল?

মানসিক ব্যাধির বিশিষ্ট সোভিয়েট চিকিৎসক ভাসিলি গিলিয়ারোভস্কির নির্দেশে এল. লিভেন্তসেফ, ওয়াই সেগাল ও জেড কিরিলোভা ব্লকিং জেনারেটার নামে একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এতে একটি অ্যাম্প্লিফায়ার, নরম সীসার একটি তড়িৎ-প্রেরক ও প্লাষ্টিক কাপ রয়েছে। এই কাপে আছে প্রায় দেড়-শ ক্ষুদে ইলেকট্রোড। এই ইলেকট্রোডগুলি রোগীর নাকের চারপাশে চামড়ার উপর ও কানের পিছনে ফুটিয়ে দেওয়া হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোগী ঘুমিয়ে পড়ে। একেই বলা হয় 'বৈদ্যুতিক নিদ্রা' এবং কখনো কখনো বা 'বৈদ্যুতিক ঘুম পাড়ানো গান'। রুশ শারীরতত্ত্ববিদ আই. পাভলোফ ও এন. ভেদেনস্কি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, তার ভিত্তিতেই এই নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছে।

প্রতিবারে বৈদ্যুতিক ঘুম পাড়ানো ৩০-৪০ মিনিট থেকে দেড় ঘণ্টা-দুই ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বস্তুতঃ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বন্ধ করে দেবার পরেও কিছুক্ষণ রোগী ঘুমাতে থাকে। ১৫ থেকে ২০ দিন চিকিৎসার পর নিউরেস্থেনিয়া রোগের পুরা আরোগ্য সম্ভব হয়।

এই নতুন পদ্ধতির সমর্থক প্রধানতঃ মানসিক ব্যাধি চিকিৎসকদের মধ্যে মিলে গেল। তাঁরা কোন কোন ধরণের খণ্ড ব্যক্তিত্ব, ভাইরাসজাত মস্তিষ্কপ্রদাহ, মানসিক অবসাদের চিকিৎসার জন্যে বৈদ্যুতিক ঘুমপাড়ানো পদ্ধতি ব্যবহার করলেন। অন্যান্য ব্যাধিতেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। স্ত্রীরোগে চিকিৎসকেরা এর প্রয়োগ করেন গর্ভাবস্থায় রক্তদুষ্টি, আলসার এবং শল্য-চিকিৎসকেরা আর্টারিও স্লিরোরিস ও অস্ত্রোপচারের পরবর্তী চিকিৎসায়। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতঘটিত ব্যাধি, নিউরোসিস, নিউরেস্থেনিয়া ও হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসায়ও এই পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে।

বৈদ্যুতিক নিদ্রা স্বাভাবিক নিদ্রার বিকল্প হতে পারে না। কোন কোন ব্যাধির ফলে স্বাভাবিক নিদ্রা ব্যাহত হলেই কেবল এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই যন্ত্রের প্রথম মডেলটি বহনযোগ্য ছিল না। বর্তমানে মস্কোর একটি কারখানায় বহনযোগ্য এরূপ যন্ত্র তৈরি হচ্ছে এবং এর দামও খুব বেশী নয়। বহু দেশে এই যন্ত্র পাঠানো হচ্ছে।

সোভিয়েট জনস্বাস্থ্য দপ্তরের এক্সপেরিমেন্টাল সার্জিক্যাল ইকুইপমেন্ট সম্পর্কিত ইনষ্টিটিউট বৈদ্যুতিক নিদ্রার একটি নতুন প্রক্রিয়া বের করেছে। এর দুটি ডিজাইন করা হয়েছে—বহনযোগ্য ও অন্যটি স্থাণু। মস্কোর কয়েকটি হাসপাতালে পরীক্ষার ফল খুব আশাপ্রদ।

সমুদ্রের জল থেকে পানীয় জল উৎপাদন

মানুষের আবির্ভাবের আগে থেকেই সমুদ্রের জল লবণহীন হচ্ছে। তাকে নিয়ত লবণহীন করছে সূর্য। সমুদ্রের জল সূর্যোত্তাপে আকাশে উঠে বৃষ্টিধারার সঙ্গে মিঠা জল হয়ে নেমে আসছে চিরকাল।

এই প্রাকৃতিক পদ্ধতির উন্নততর রূপ দেবার চেষ্টা কিন্তু বেশী দিন সুরু হয় নি। সমুদ্রের জলকে গরম করে জলীয় বাষ্পে পরিণত করে আবার সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে মিঠা জলে রূপান্তরিত করবার কাজ অবশ্য প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু এই পদ্ধতিকে উন্নত বলা যায় না। তাছাড়া এই পদ্ধতি বেশ ব্যয়সাধ্যও বটে।

পৃথিবীতে যদিও মিঠা জলের পরিমাণ প্রচুরই বলা যায়, তবু জায়গায় জায়গায় এর বেশ অভাব রয়েছে। এই সব অর্ধ-উষর অঞ্চলের ভবিষ্যৎ অনেকটা মানুষের হাতে। এসব অঞ্চলের প্রয়োজন মেটাতে সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করবার কাজ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মাত্র ৯ বছর আগে দু-জন ইংরেজ গবেষক জল পরিশ্রুত করবার পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন। তারপর থেকে উন্নত শ্রেণীর লবণমুক্ত জলের প্ল্যাণ্ট উদ্ভাবিত হয়েছে।

১৯৬৫ সালের অক্টোবরে ওয়াশিংটনে জল লবণমুক্তকরণের বিষয়ে যে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বৃটিশ প্রতিনিধিরা এমন একটি দ্বিমুখী প্রস্তাব দেন, যাতে একই সঙ্গে জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে ও জল লবণমুক্ত হবে।

জল লবণমুক্তকরণের প্ল্যাণ্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে বৃটেনের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। গ্লাসগোর স্কটিশ ফার্ম উইআর ওয়েষ্টগার্থ পৃথিবীর স্থলভিত্তিক লবণমুক্তকরণের প্ল্যাণ্টগুলির অর্ধেকের বেশী নক্সা প্রস্তুত করেছেন ও সেগুলি নির্মাণ করেছেন। উইআর গ্রুপ অব ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানির এই ফার্মটি সম্প্রতি সমুদ্রজল লবণ মুক্তকরণের দুটি প্ল্যাণ্টের অর্ডার পেয়েছেন। এই দুটি প্ল্যাণ্ট স্থাপন করা হবে আরব উপসাগরের নিকটে কাটারে।

পৃথিবীর লবণমুক্তকরণের সরঞ্জামের ৭৫ শতাংশ সরবরাহ করেছে বৃটিশ ফার্মগুলি। এক্ষেত্রে উইআর ওয়েষ্টগার্থ ফার্মই বৃহত্তর।

উইআর ওয়েষ্টগার্থ ৩০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করে স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম তীরে আই আর শায়ারের ট্রুন-এ একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন, যার কাজ হবে সমুদ্রজল থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করবার নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা।

ইতিমধ্যেই মিঠা জলের কারখানাগুলি বহু উষর অঞ্চলকে বাসযোগ্য করে তুলেছে। বর্তমানে লক্ষ্য হলো খরচ কমানো। পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রগুলির উদ্বৃত্ত জলীয় বাষ্প থেকে মিঠা জল সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্য পারমাণবিক শক্তি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ট্রুনের গবেষণা কেন্দ্র কাজ করছে। সেখানে দৈনিক ৬০,০০০,০০০ গ্যালন থেকে ১০০,০০০,০০০ গ্যালন মিঠা জলের একটি প্ল্যাণ্টের নক্সা প্রস্তুত করা হয়েছে।

শল্য-চিকিৎসকের সাহায্যে ইন্‌ফ্রারেড মাইক্রস্‌কোপ

সম্প্রতি উদ্ভাবিত একটি নতুন ধরণের মাইক্রস্‌কোপ শল্য-চিকিৎসকদের বিশেষ কাজে আসবে বলে জানা গেছে। এটি ট্র্যানজিষ্টর ও মাইক্রোসার্কিটের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে দেবে।

বৃটেনের মুলার্ড নামে একটি প্রতিষ্ঠান এই যন্ত্রটি নির্মাণ করেছে। যন্ত্রটি ইন্‌ফ্রারেড রেডিয়েশন ব্যবহার করছে পরীক্ষাধীন একটি নমুনার 'হিট ম্যাপ' তৈরি করবার জন্যে।

কিন্তু এই ব্যবস্থা জীববিদ্যা সংক্রান্ত কাজ-কর্মেও ব্যবহার করা যাবে—বিশেষভাবে মেডিসিনে। লণ্ডনের রয়েল মার্সডেন হস্পিটাল এই বছর একটি ইন্‌ফ্রারেড মাইক্রস্‌কোপ নিয়ে কাজ আরম্ভ করবে, বিশেষভাবে ব্রেন সার্জারিতে এটির প্রয়োগ সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষায়।

ইলেকট্রনিক কমপোনেন্ট পরীক্ষার ব্যাপারে যখন মাইক্রস্‌কোপটি ব্যবহৃত হয়, তখন কম্পো-নেন্ট চালু থাকতে থাকতে কুণ্ডলী অথবা সার্কিটের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ নিয়ে যাওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় কতকগুলি হট স্পট বা উত্তপ্ত স্থান দেখা দেয় এবং তা ইন্‌ফ্রারেড রেডিয়েশন বিচ্ছুরিত করে।

রেডিয়েশন প্রতিফলিত হয় একটি অ্যাম্প্লি-ফায়ারের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম সোনার স্তরে ঢাকা একটি আয়নার সাহায্যে এবং তা ব্যবহৃত হয় একটি মিটারে তাপমাত্রা বুঝিয়ে দেবার কাজে। অবশ্য নমুনা থেকে যে সাধারণ আলো আয়নার মধ্য দিয়ে যায়, তা ব্যবহৃত হয় একমাত্র মাই-ক্রস্‌কোপের মধ্য দিয়ে চোখে যা দেখা যেতে পারে, তারই ছবি পর্দায় ফেলবার জন্যে।

এই ছবিটির উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় একটি ছোট্ট মার্কার, যাতে সমগ্র ছবিটি সার্ভে করা যায়। হিট ম্যাপ তৈরি করে নেওয়াই এর উদ্দেশ্য। এর ফলাফল থেকে দোষ-ত্রুটি বের করে নেওয়া যায় এবং বস্তুবিশেষের কার্যকারিতা সম্বন্ধে একটা পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়।

কিন্তু ক্যান্সারদুষ্ট কোষ সুস্থ কোষের তুলনায় অনেক বেশী তাপ নিঃসরণ করে, যার ফলে একজন শল্য-চিকিৎসক এই ধরণের একটি ইন্‌ফ্রারেড মাইক্রস্‌কোপ নিয়ে মস্তিষ্কের ঠিক কোন্ অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সে সম্পর্কে এখনকার তুলনায় অনেক বেশী খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারেন।

অন্য সব কোমল ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এই ভাবে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব বলে জানা গেছে।

হোভারক্র্যাফ্‌টের নতুন ভূমিকা

যাত্রী পরিবহনের উদ্দেশ্য নিয়ে হোভার-ক্র্যাফট নীতির উদ্ভব হয়। এখন অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে এই কৌশলের প্রয়োগ সম্ভব হতে চলেছে।

বৃটেনে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সাধারণ ট্রাক্টরবাহিত স্প্রে-যন্ত্রের (জীবাণুনাশক দ্রব্য ছড়াবার যন্ত্র) চেয়ে হোভারক্র্যাফ্‌টবাহিত স্প্রে-যন্ত্র ১০ গুণ দ্রুতগতিতে কাজ করতে সক্ষম।

এই বিশেষ ধরণের হোভারক্র্যাফ্‌ট নিয়ে এখন পূর্ব ইংল্যাণ্ডে শেষ পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এই বছরের গোড়ার দিকে এটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নির্মিত হবে। হোভার-ওয়ার লিমিটেডের সার্থক হোভারক্র্যাফ্‌ট প্রমোদ-যানেরই এটি আর এক পরিণতি।

তরল জীবাণুনাশক পদার্থ ছড়াবার যন্ত্রটি (স্প্রেইং বুম) থাকে ড্রাইভারের ককপিটের সামনে এবং ১০০ গ্যালনের ট্যাঙ্কগুলি থাকে হোভার-স্প্রেয়ারের পিছনের দিকে। প্রথম সংস্করণটি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই যন্ত্র ২০ মাইল বেগে কাজ করতে পারে। স্প্রে কৌশলের

উন্নতি হলে এটি আরও দ্রুত কাজ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

ব্যাপক হারে নির্মাণের সময় এর সঙ্গে চারটি চাকাও যুক্ত করা হবে। তাতে মাটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবার সুবিধা হবে এবং প্রয়োজন হলে এটি রাস্তার উপর দিয়েও চালানো যাবে।

নির্মাতা কোম্পানি বলেছেন, নতুন ধরণের এই হোভারক্র্যাফ্টের যখন স্প্রে করবার কাজ থাকবে না, তখন তাকে দিয়ে পরিবহনের কাজ চলবে।

হোভারক্র্যাফ্টের সাহায্যে সমুদ্র-সমীক্ষার কাজও সুরু হবে। দুটি বৃটিশ ফার্ম বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছেন।

সাদামপটনের হোভারমেরিন নির্মিত এইচ. এম-২ এই কাজের পক্ষে উপযোগী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে এই নতুন ধারায় সমুদ্র-সমীক্ষার কাজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হবে।

যাত্রী পরিবহনের মাধ্যম হিসাবে হোভারক্র্যাফ্টের জনপ্রিয়তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বৃটিশ হোভারক্র্যাফ্ট করপোরেশনের (বি. এইচ. সি) প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়—বি. এইচ.সি'র হোভারক্র্যাফ্ট এপর্যন্ত ১,৫০০,০০০ মাইলেরও বেশী পথ পরিভ্রমণ করেছে। এই পথ ৬০ বার পৃথিবী পরিক্রমার সমান।

বি. এইচ. সি. হোভারক্র্যাফ্ট এডেন, বোর্নিও, ক্যানাডা, ডেনমার্ক, ফেডারেল জার্মেনী, জাপান, নরওয়ে, সুইডেন, থাইল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভিয়েৎনামে ব্যবসায়িক ও সামরিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বরফ ও তুষারের উপর এবং দ্রুত প্রবহমান নদীর উপর এগুলি অনায়াসে যাতায়াত করছে।

π-এর মান নির্ণয়ের ইতিহাস

প্রভাতকুমার দত্ত

যে কোন বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাত ধ্রুবক এবং π চিহ্নের সাহায্যে আমরা এই অনুপাতটিকেই বুঝিয়ে থাকি। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম জোন্সই সম্ভবতঃ প্রথম এই অনুপাতটি বোঝাবার জন্যে π চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। কয়েক বছর পরে বারনৌলি এই অনুপাতটিকে c অক্ষরের দ্বারা চিহ্নিত করেছিলেন। এরও পরে অয়লার এই অনুপাতটি বোঝাবার জন্যে প্রথমে p এবং পরে c অক্ষর ব্যবহার করেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টিয়ান গোল্ডব্যাক জোন্সের অনুকরণ করে আবার π-এর ব্যবহার চালু করেন। অতঃপর অয়লারের অ্যানালিসিস নামক রচনাটি প্রকাশিত হবার পর এই অনুপাতটি বোঝাবার জন্যে সাধারণভাবে π-এর ব্যবহার প্রচলিত হয়।

বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাত হিসেবে π-এর যে সংজ্ঞা প্রচলিত আছে, অনেক গণিতবিদের মতে তা অসম্পূর্ণ। তাঁদের মতে, π-কে কেবল একটি অনুপাত হিসেবে ধরলেই চলবে না, π-এর অর্থ এবং প্রভাব অনেক ব্যাপকতর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকের এক নির্দিষ্ট অংশের জীবিত থাকবার সম্ভাবনা যে ফরমুলার সাহায্যে বোঝানো হয়, সেই ফরমুলায় π-এরও স্থান

আছে। আমরা এও জানি যে, কোন নিয়ম-নীতি অনুসরণ না করে যদি (যে কোন) ছুটি সংখ্যা মনোনীত করা হয়, তবে সংখ্যা ছুটির পরস্পরের প্রতি মৌলিক হবার সম্ভাবনা $\frac{6}{\pi^2}$। একথা বলাই বাহুল্য যে, π-এর প্রচলিত সংজ্ঞার সঙ্গে এই সূত্রের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং একথা স্বীকার করতেই হয় যে, π-এর সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা আমরা এখনও খুঁজে পাই নি।

π-এর সংজ্ঞা যে ভাবেই দেওয়া হোক না কেন, π-এর মান যে ধ্রুবক, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। π-এর যথার্থ মান নির্ণয়ের জন্যে গণিত-বিদেরা সুদীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করে আসছেন। সাধারণতঃ ছুটি উপায়ে π-এর সূক্ষ্ম এবং যথার্থ মান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম উপায় হলো এই যে, বৃত্তের অন্তর্লিখিত এবং বহির্লিখিত বহুভুজের পরিসীমা ছুটি নির্ণয় করা এবং বৃত্তের পরিধির দৈর্ঘ্য এই পরিসীমা ছুটির মাঝামাঝি ধরে নেওয়া। পরিসীমার বদলে ক্ষেত্রফল নিয়ে হিসেব করলে সূক্ষ্মতর ফল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপায়ে π-এর মান নির্ণয়ের জন্যে অসীম শ্রেণীর সাহায্য নেওয়া হয়। যাঁরা প্রথম প্রণালীটি ব্যবহার করেছেন, তাঁরা π-কে একটি জ্যামিতিক অনুপাত ছাড়া আর কিছুই ভাবেন নি। যে সকল গণিতজ্ঞেরা দ্বিতীয় প্রণালীটি ব্যবহার করেছেন, তাঁরা π-কে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার প্রতীক হিসেবে ধরেছেন এবং এও দেখেছেন যে, এই নির্দিষ্ট সংখ্যাটি বিভিন্ন গাণিতিক হিসাব-নিকাশের মধ্যে স্বতঃই চলে আসে।

ইজিপ্টের গণিতজ্ঞেরা π-এর মান হিসেবে ২৫৬/৮১ বা ৩.১৬০৫ সংখ্যাটি ব্যবহার করতেন। ইহুদী এবং ব্যাবিলনের গণিতবিদেরা π-এর মোটামুটি মান হিসেবে ৩ সংখ্যাটি ধরে নিয়েছিলেন।

ইউক্লিডের রেখা-জ্যামিতির কয়েকটি প্রতিজ্ঞার সাহায্যে π-এর মোটামুটি একটি মান নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। সম্ভবতঃ ইউক্লিডের এই তথ্য জানা ছিল যে, π-এর মান ৩ এবং ৪-এর অন্তর্বর্তী।

প্রতিষ্ঠিত গাণিতিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করে π-এর সূক্ষ্ম মান নির্ণয়ের চেষ্টা সর্বপ্রথম আর্কিমিডিসই করেছিলেন। π-এর মান নির্ণয়ের যে ছুটি সাধারণ কথা উপরে বলা হয়েছে, আর্কিমিডিস তাদের প্রথমটির সাহায্য নিয়েছিলেন। একটি বৃত্তে ৯৬-বাহুবিশিষ্ট বহুভুজ অন্তর্লিখিত এবং বহির্লিখিত করে তিনি জ্যামিতির সাহায্যে এই দুই বহুভুজের পরিসীমা নির্ণয় করেন। তিনি একথাও বলেন যে, বৃত্তের পরিধি এই দুই পরিসীমার মধ্যবর্তী হবে। এভাবেই আর্কিমিডিস প্রমাণ করেছিলেন যে, π-এর মান ৩ ১/৭ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, কিন্তু ৩ ১০/৭১ অপেক্ষা বৃহত্তর; অর্থাৎ তাঁর মতে, π-এর মান ৩.১৪২৮ এবং ৩.১৪০৮-এর মধ্যবর্তী। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, ৪৯৭০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট কোন বৃত্তের পরিধি ১৫৬১০ ফুট এবং ১৫৬২০ ফুটের মধ্যবর্তী। প্রকৃতপক্ষে এই পরিধির মাপ ১৫৬১৩ ফুট ৯ ইঞ্চি।

জ্যামিতির মত ত্রিকোণমিতির সাহায্যেও π-এর মান নির্ণয়ের চেষ্টা আর্কিমিডিস করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে তিনি যে সূত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন, তা হলো এই যে,

θ-এর মান $\frac{\pi}{৯৬}$ হলে, $\sin < \theta < \tan\theta$.

প্রখ্যাত গণিতবিদ অ্যাপলোনিয়াস আর্কিমিডিসের উপরিউক্ত গাণিতিক হিসাব-নিকাশের উপর চমৎকার আলোচনা করেছিলেন বলে জানা যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর আলোচনাগুলি খুঁজে পাওয়া যায় নি।

আলেকজান্দ্রিয়ার গণিতজ্ঞ হিরোই সম্ভবতঃ

সর্বপ্রথম π-এর মান হিসেবে $\frac{২২}{৭}$ সংখ্যাটি উল্লেখ করেন। মোটামুটি কাজ চালাবার জন্যে π এর মান ৩ ধরলেই চলবে—একথাও তিনি বলেছিলেন।

π-এর মান হিসেবে টলেমি যা জানিয়েছিলেন, তাও বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, π = ৩°৮′৩০″

সহজ করে বলতে পারি, π = ৩°৮′৩০″ = $৩+\frac{৮}{৬০}+\frac{৩০}{৩৬০০}=৩\frac{১৭}{১২০}$ = ৩·১৪১৬

ইউক্লিড থেকে সুরু করে টলেমি পর্যন্ত প্রখ্যাত গ্রীক গণিতজ্ঞদের π-এর মান নির্ণয়ের জন্যে প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়। π-এর মান নির্ণয়ের ব্যাপারে গ্রীক গণিতবিদ্‌দের মাথা ঘামাবার একটি কারণও আছে। আমরা ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতিতেই অভ্যস্ত এবং যে কোন জ্যামিতিক সমস্যা সমাধানের জন্যে আমরা এই জ্যামিতিরই সাহায্য গ্রহণ করে থাকি। যে তিনটি জ্যামিতিক সমস্যা একদা গণিতের রথী-মহারথীদের রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছিল এবং যেগুলি আজ 'ক্ল্যাসিকাল প্রব্লেম' নামে পরিচিত, সেই তিনটির তৃতীয় বা শেষ সমস্যাটি উপরিউক্ত কারণ হিসাবে ধরা চলে। এই সমস্যাটি হলো—কোন নির্দিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন।

আর্কিমিডিস দেখিয়েছিলেন যে, এই সমস্যাটির সমাধান করতে হলে এমন একটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করতে হবে, যার অতিভুজ ছাড়া অন্য দুটি বাহুর একটির দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট বৃত্তের পরিধির সমান হয় এবং অন্যটির দৈর্ঘ্য বৃত্তটির ব্যাসার্ধের সমান হয়। বলা বাহুল্য, এই বাহু দুটির দৈর্ঘ্যের অনুপাতের অর্ধেকই আমাদের অতি পরিচিত π। উপরিউক্ত জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করতে গেলে π-এর মান জানা প্রয়োজন। গ্রীক গণিতজ্ঞেরা মনে করতেন যে, জ্যামিতিক সমস্যা সমাধানের জন্যে অন্যান্যেরা তাঁদেরই মুখাপেক্ষী এবং এই বিষয়ে তাঁদেরই অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। এই কারণেই π-এর মান নির্ণয়ের জন্যে গ্রীক-গণিতবিদেরা অনেক পরিশ্রম করেছেন।

কিন্তু গণিত সংক্রান্ত গবেষণা কোন একটি বিশেষ জাতির মধ্যে কখনই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। π-এর মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

রোমান জরিপবিদেরা π-এর মান কখনও ৩ বা কখনও ৪ ধরতেন। সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে তাঁরা $৩\frac{১}{৭}$-এর বদলে $৩\frac{১}{৮}$ ব্যবহারেরই পক্ষপাতী ছিলেন। এঁদের মধ্যে গণিতবিদ গারবার্ট π-এর মান হিসেবে $\frac{২২}{৭}$ ব্যবহার করবারই পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ভারতীয় গণিতবিদেরাও এই ব্যাপারে মোটেই পিছিয়ে ছিলেন না। জি, থিবাউটের কোন একটি প্রবন্ধে জানানো হয়েছে যে, π-এর স্থূল মান হিসেবে বৌধায়ন $\frac{৪৯}{১৬}$ ব্যবহার করেছিলেন।

প্রখ্যাত ভারতীয় গণিতবিদ আর্যভট্টের মতানুযায়ী π-এর মান $\frac{৬২৮৩২}{২০০০০}$ বা ৩·১৪১৬। তিনি পুরাপুরি গাণিতিক উপায়ে এই মান নির্ণয় করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, একক ব্যাসবিশিষ্ট কোন বৃত্তে যদি n এবং 2n বাহু-বিশিষ্ট দুটি সুষম বহুভুজ অঙ্কন করা যায় এবং এই দুই বহুভুজের বাহুগুলির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে a এবং b হয়, তবে প্রমাণ করা যায় যে,

$$b^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-a^2)^{\frac{1}{2}}$$

এই সূত্রের সাহায্যে এবং ঐ বৃত্তে অন্তর্লিখিত ষড়্‌ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে তিনি ক্রমান্বয়ে ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬, ১৯২ এবং ৩৮৪ বাহুবিশিষ্ট সুষম বহুভুজগুলির বাহুর দৈর্ঘ্য নিরূপণ করেন। শেষ বহুভুজটির পরিসীমা হিসাবে তিনি $\sqrt{৯\cdot৮৬৯৪}$ পান এবং এর সাহায্যেই তিনি π-এর

মান নির্ণয় করেন। এই কঠিন সমস্যাটির একটি অভূতপূর্ব সমাধান করবার জন্যে আর্যভট্ট গণিত-জগতে বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছেন।

আর্যভট্টের মত ব্রহ্মগুপ্তও π-এর মান নির্ণয়ের জন্যে একক ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তে ১২, ২৪, ৪৮ এবং ৯৬ বাহুবিশিষ্ট অন্তর্লিখিত সুষম বহুভুজের পরিসীমার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেন। তিনি এই দৈর্ঘ্যগুলি যথাক্রমে $\sqrt{৯\cdot৬৫}$, $\sqrt{৯\cdot৮১}$, $\sqrt{৯\cdot৮৬}$ এবং $\sqrt{৯\cdot৮৭}$ পান। তিনি মনে করেছিলেন যে, বহুভুজের বাহুসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চললে পরিসীমার দৈর্ঘ্য $\sqrt{১০}$-এর দিকে চলতে থাকবে। এই যুক্তিতে তিনি π-এর মান হিসেবে $\sqrt{১০}$-এরই উল্লেখ করেছিলেন। ১০-এর বর্গমূল করে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তা হলো ৩·১৬২২ এবং এই সংখ্যাটি π-এর যথার্থ মান অপেক্ষা বৃহত্তর। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মগুপ্তের অনুমানের মধ্যে কিছু গলদ ছিল।

প্রখ্যাত গণিতবিদ ভাস্করও π-এর মান নির্ণয়ের জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। আর্কিমিডিসের প্রণালী অনুসরণ করে একক ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তে অন্তর্লিখিত ৩৮৪ বাহুবিশিষ্ট সুষম বহুভুজের পরিসীমার দৈর্ঘ্য হিসেবে তিনি $\frac{৩৯২৭}{১২৫০}$ সংখ্যাটি পেয়েছিলেন। এই সংখ্যাটির মান ৩·১৪১৬। তিনি π-এর মান হিসেবে আরেকটি সংখ্যারও উল্লেখ করেছিলেন। সেই সংখ্যাটিও (অর্থাৎ $\frac{৭৫৪}{২৪০}$ = ৩·১৪১৬) π-এর যথার্থ মানের খুবই কাছাকাছি।

ভারতীয় গণিতবিদ্‌দের লব্ধ ফলগুলি জেনে নিয়ে আরবীয় গণিতবিদ আলকারিজম π-এর মান হিসেবে $\frac{২২}{৭}$, $\sqrt{১০}$ এবং $\frac{৬২৮৩২}{২০০০০}$ সংখ্যা তিনটির উল্লেখ করেন। তিনি এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, π-এর এই তিনটি মানের মধ্যে প্রথমটি একটি স্থূল মান, দ্বিতীয়টি জ্যামিতিবিদেরাই ব্যবহার করে থাকেন এবং তৃতীয়টি জ্যোতির্বিদ্‌দের ব্যবহারের জন্যে। এই মতের যাথার্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করা চলে।

প্রখ্যাত চীনা জ্যোতির্বিদ সু চুং চি প্রমাণ করেছিলেন যে, π-এর মান ৩·১৪১৫৯২৬ এবং ৩·১৪১৫৯২৭-এর মধ্যবর্তী। তাঁর মতে, π-এর যথার্থ মান হলো $\frac{৩৫৫}{১১৩}$।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পিসা সহরের গণিতবিদ লিওনার্ডো π-এর মান হিসাবে $\frac{১৪৪০}{৪৫৮\frac{১}{৩}}$ সংখ্যাটির উল্লেখ করেছিলেন। আরো সহজ করে ধরলে এটির মান দাঁড়ায় ৩·১৪১৮। কুশা বিশ্বাস করতেন যে, π-এর প্রকৃত মান $\frac{৪}{৫}$ ($\sqrt{৩}+\sqrt{৬}$) বা ৩·১৪২৩। ভিয়েতা নামক গণিতবিদের মতে, π-এর মান ৩১৪১৫৯২৬৫৩৫/$১০^{১০}$ অপেক্ষা বৃহত্তর, কিন্তু ৩১৪১৫৯২৬৫৩৭/$১০^{১০}$ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। তিনি ৬×২^{১৬} বাহুবিশিষ্ট অন্তর্লিখিত এবং বহির্লিখিত বহুভুজের পরিসীমার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। এই দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের ব্যাপারে তিনি ত্রিকোণমিতির একটি সূত্রের ব্যবহার করেছিলেন। সূত্রটি হলো—

$$2\sin^2\tfrac{1}{2}\theta = 1-\cos\theta.$$

এই সূত্র ব্যবহার করে তিনি যে গাণিতিক অভেদে পৌঁচেছিলেন, সেটা হলো—

$$\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{(2+\sqrt{2})}}{2}\cdot\frac{\sqrt{\{2+\sqrt{(2+\sqrt{2})}\}}}{2}\cdots$$

লিডেনের অ্যাড্রিয়ান মিটিয়াস রচিত একটি বই পড়ে জানা যায় যে, তাঁর পিতা ১৫৮৫ সালে π-এর মান হিসাবে $\frac{৩৫৫}{১১৩}$ সংখ্যাটির উল্লেখ করেছিলেন। এই ভগ্নাংশটির মান ৩·১৪১৫৯২৯২ এবং π-এর মান হিসাবে এই ভগ্নাংশটি ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ। গাণিতিক উপায়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, π-এর মান $\frac{৩৩৩}{১০৬}$ এবং

$\frac{৩৩৩}{১০৬}$-এর মধ্যবর্তী। এরপর তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, π-এর যথার্থ মান হবে এমন একটি ভগ্নাংশ, যার লব ও হর যথাক্রমে এই ভগ্নাংশটির লব এবং হরগুলির গড়। এভাবেই তিনি $\frac{৩৫৫}{১১৩}$ সংখ্যাটির খোঁজ পেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর এই অনুমানের কোন গাণিতিক ভিত্তি নেই।

১৫৯৩ সালে অ্যাড্রিয়ান রোমানাস ২৩০ বাহুবিশিষ্ট অন্তর্লিখিত সুষম বহুভুজের পরিসীমার দৈর্ঘ্যের সাহায্যে পনেরো দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ π-এর মান নির্ণয় করেন।

সিউলেন তাঁর জীবনের অনেকখানি অংশ π-এর মান নির্ণয়ের জন্যে ব্যয় করেন বলে জানা যায়। তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর সমাধি-স্তম্ভের গায়ে পঁয়ত্রিশ দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মান ক্ষোদিত করা হয়। π-র এই মানটি তিনিই নির্ণয় করেন।

উইলিব্রর্ড স্নেল ২৩০ সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের সাহায্যে ৩৪ দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মান নির্ণয় করেন। π-এর মান নির্ণয়ের ব্যাপারে স্নেলের চিন্তাধারা এবং গণনা-কৌশল অন্যান্য গণিতবিদ্‌দের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত মানের। একথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য যে, রোমানাস যে ক্ষেত্রে ২৩০ সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের সাহায্যে মাত্র পনেরো দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মান নির্ণয় করেছিলেন, স্নেল সে ক্ষেত্রে ৩৪ দশমিক স্থানে পৌঁছুতে পেরেছিলেন। আর্কিমিডিস ৯৬ বাহুবিশিষ্ট বহুভুজ থেকে যে ফলে উপনীত হয়েছিলেন, স্নেল মাত্র ষড়্‌ভুজ থেকেই সেই ফলে উপনীত হয়েছিলেন। বৃত্তের পরিধিকে শুধুমাত্র অন্তর্লিখিত সুষম বহুভুজের পরিসীমাদ্বয়ের মধ্যবর্তী না ধরে স্নেল আরো কিছু জ্যামিতিক অঙ্কনের সাহায্য নিয়েছিলেন। এভাবে তিনি দৈর্ঘ্য দুটির ব্যবধান অনেকখানি কমিয়ে ফেলেছিলেন এবং ফলে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের সাহায্যেই তিনি অপেক্ষাকৃত বেশী দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মান নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যে সূত্রের সাহায্যে π-এর মান নির্ণয় করেছিলেন, সেটি হলো—

$$\frac{3\sin\theta}{2+\cos\theta} < \theta < (2\sin\tfrac{1}{3}\theta + \tan\tfrac{1}{3}\theta)$$

১৬৩০ সালে গ্রীয়েনবার্জার স্নেলের সূত্রের সাহায্যে ৩৯ দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মান নির্ণয় করেন। এরপর হাইজেন্‌স্‌ তাঁর একটি পুস্তকে স্নেল এবং অন্যান্য গণিতবিদ্‌দের সূত্রগুলির যথাযথ প্রমাণসহ π-এর মান নির্ণয়ের একটি ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবার পর দুই বহুভুজের পরিসীমার দৈর্ঘ্যের সাহায্যে π-এর মান নির্ণয় করবার চেষ্টা আর কেউই করেন নি। এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে π-এর মান নির্ণয়ের জন্যে যে দুটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে, তাদের প্রথমটির সাহায্যে এর পরে আর কেউই π-এর মান নির্ণয় করবার চেষ্টা করেন নি। ১৬৬৫ সালে ওয়ালিস নীচের সূত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন :—

$$\frac{\pi}{২} = \frac{২}{১} \cdot \frac{২}{৩} \cdot \frac{৪}{৩} \cdot \frac{৪}{৫} \cdot \frac{৬}{৫} \cdot \frac{৬}{৭} \cdot \frac{৮}{৭} \cdots\cdots$$

কিন্তু এই সূত্রের সাহায্যে π-এর সূক্ষ্ম মান নির্ণয়ের চেষ্টা বিশেষ করা হয় নি। π-এর মান নির্ণয়ের জন্যে পরবর্তী গণিতবিদেরা অভিসারী অসীম শ্রেণীর উপর নির্ভর করেছিলেন। ক্যালকুলাস আবিষ্কৃত হবার আগে এই উপায়ে π-এর মান নির্ণয়ের প্রয়াস বিশেষ কষ্টসাধ্য, একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ডেসকার্টে π-এর মান নির্ণয়ের জন্যে একটি জ্যামিতিক পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই পদ্ধতির সঙ্গে অসীম শ্রেণীর পদ্ধতির যথেষ্ট মিল আছে।

অসীম শ্রেণীর ব্যবহার সম্পর্কে জেম্‌স্‌ গ্রেগরী প্রথম অন্যান্য গণিতবিদ্‌দের সচেতন করেছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত সূত্রটি আবিষ্কার করেন—

$$\theta = \tan\theta - \tfrac{1}{3}\tan^3\theta + \tfrac{1}{5}\tan^5\theta - \cdots$$

হ্যালির নির্দেশ অনুযায়ী আব্রাহাম শার্প গ্রেগরীর উপরিউক্ত অসীম শ্রেণীতে $\theta = \frac{1}{6}\pi$ বসিয়ে ১৬৯৯ সালে ৭১ দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মান নির্ণয় করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মাসিন ১০০ দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ π-এর মান নির্ণয় করেন। তিনি নিম্নলিখিত সূত্রটির সাহায্য নিয়েছিলেন—

$$\frac{\pi}{4} = 4\tan^{-1}\frac{1}{5} - \tan^{-1}\frac{1}{239}$$

১৭১৯ সালে গ্রেগরীর অসীম শ্রেণীর সাহায্যে ডি ল্যাগনি ১১২ দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ π-এর মান নির্ণয় করেন।

১৭৭৬ সালে হাটন এবং ১৭৭৯ সালে অয়লার π-এর মান নির্ণয়ের জন্যে নিম্নলিখিত সূত্র দুটির সাহায্য গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন—

(১) $\frac{\pi}{4} = \tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3}$

(২) $\frac{\pi}{4} = 5\tan^{-1}\frac{1}{7} + 2\tan^{-1}\frac{3}{79}$

১৭৯৪ সালে ভেগা ১৩৬ দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ মান নির্ণয় করতে সক্ষম হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে অক্সফোর্ডের র‍্যাডক্লিফ লাইব্রেরীতে এক অজ্ঞাতনামা গণিতবিদের পাণ্ডুলিপি থেকে ১৫২ দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ π-এর মানের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৮৪১ সালে রাদারফোর্ড একটি সূত্রের সাহায্যে ২০৮ দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মান নির্ণয় করেন। কিন্তু এই মান মাত্র ১৫২ দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ হয়েছিল। তিনি যে সূত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন সেটি হলো—

$$\frac{\pi}{4} = 4\tan^{-1}\frac{1}{5} - \tan^{-1}\frac{1}{70} + \tan^{-1}\frac{1}{99}$$

১৮৪৪ সালে দাসে ২০০ দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ π-এর মান নির্ণয় করেন। তিনি নীচের সূত্রটির সাহায্য নেন—

$$\frac{\pi}{4} = \tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{5} + \tan^{-1}\frac{1}{8}$$

১৮৪৭ সালে নিম্নোক্ত দুটি সূত্রের সাহায্যে ক্লসেন ২৪৮ দশমিকাংশ পর্যন্ত শুদ্ধ π-এর মান জানান। সূত্র দুটি যথাক্রমে—

(১) $\frac{\pi}{4} = 2\tan^{-1}\frac{1}{3} + \tan^{-1}\frac{1}{7}$

(২) $\frac{\pi}{4} = 4\tan^{-1}\frac{1}{5} - \tan^{-1}\frac{1}{239}$

১৮৫৩ সালে রাদারফোর্ড আগের সূত্র ব্যবহার করে ৪৪০ দশমিকাংশ পর্যন্ত শুদ্ধ π-এর মান নির্ণয় করেন। রাদারফোর্ডের অনুকরণ করে উইলিয়াম শ্যাঙ্কস্ ৫২৭ দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ π-এর মান জানাতে সক্ষম হন। এর পরবর্তী বিশ বছর ধরে শ্যাঙ্কস্ π-এর অধিকতর সূক্ষ্ম মান নির্ণয়ে রত ছিলেন বটে, কিন্তু ৫২৮তম দশমিক স্থানে একটি ভুল থেকে যাবার জন্যে তাঁর প্রদত্ত π-এর মান গ্রাহ্য হয় নি।

১৮৫৩ সালে রিখটার ৩৩০ দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ π-এর মান জানান। ১৮৫৪ সালে তিনি ৪০০ এবং ১৮৫৫ সালে ৫০০ দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ মান জানান।

উপরিউক্ত অভিসারী অসীম শ্রেণীগুলি ছাড়া আরো দুটি শ্রেণীর সাহায্যে π-এর মান নির্ণয় করা হয়েছে। শ্রেণী দুটি যথাক্রমে—

(১) $\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3.2^3} + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{5.2^5} + \cdots\ \cdots$

(২) $\frac{\pi}{4} = 22\tan^{-1}\frac{1}{28} + 2\tan^{-1}\frac{1}{443} - 5\tan^{-1}\frac{1}{1393} - 10\tan^{-1}\frac{1}{11018}$

অন্যান্য উপায়েও π-এর মান নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিষয়ে সম্ভাবনাবাদের (Theory of Probability) সাহায্য নেওয়া হয়েছে। একটি বিশেষ ধরণের পরীক্ষায় কোন সমতলের উপর কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর কয়েকটি সমান্তরাল সরলরেখা টানা হয়। ধরা যাক এই নির্দিষ্ট দূরত্ব হলো a। এরপর l দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি দণ্ড এই সমতলের উপর বহুবার ফেলতে হবে। l দৈর্ঘ্য a দূরত্ব অপেক্ষা কম হওয়া প্রয়োজন। বহুবার এই দণ্ডটি সমতলের উপর ফেললে দণ্ডটির সমান্তরাল সরলরেখাগুলির উপর পড়বার সম্ভাবনা $\frac{2l}{\pi a}$ দ্বারা সূচিত করা যায়। ধরা যাক, দণ্ডটি x বার ফেলা হলো এবং সেটি y বার সমান্তরাল সরলরেখার উপর পড়লো। সে ক্ষেত্রে সমান্তরাল সরলরেখার উপর দণ্ডটির পড়বার সম্ভাবনা $\frac{y}{x}$ দ্বারা সূচিত করা যায়। সম্ভাবনা তত্ত্ব অনুযায়ী,

$$\frac{2l}{\pi a} = \frac{y}{x}$$

এই সূত্রের সাহায্যে π-এর মান নির্ণয় করা সম্ভব। ১৮৫৫ সালে স্মিথ ৩২০৪ বার পরীক্ষা চালিয়ে π-এর মান পান ৩'১৫৫৩। দ্য মরগানের জনৈক ছাত্র ৬০০টি পরীক্ষার সাহায্যে π-এর মান ৩'১৩৭ পান। ১৮৬৪ সালে ক্যাপ্টেম ফক্স ১১২০টি পরীক্ষা চালিয়ে π-এর মান পান ৩'১৪১৯। বলা বাহুল্য, এভাবে π-মান নির্ণয়ের প্রয়াস শুদ্ধ মান নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে না।

এই প্রবন্ধের প্রথম দিকেই বলা হয়েছে যে, বহুবার একজোড়া সংখ্যা মনোনীত করলে সংখ্যা দুটির পরস্পরেরর প্রতি মৌলিক হবার সম্ভাবনা $\frac{6}{\pi^2}$ দ্বারা বোঝানো যায়। এই ফলের সাহায্যেও π-এর মান নির্ণয় করবার চেষ্টা হয়েছে। কোন একটি ক্ষেত্রে ৫০ জন ছাত্রের প্রত্যেক পাঁচ জোড়া সংখ্যা মনোনীত করেছিল। মোট ২৫০টি জোড়ার মধ্যে ১৫৪টি জোড়ার সংখ্যাগুলি পরস্পরের প্রতি মৌলিক ছিল। উপরের সূত্র অনুযায়ী,

$$\frac{6}{\pi^2} = \frac{154}{250}$$

$$\text{বা} \quad \pi = 3{\cdot}12$$

π-এর মান নির্ণয়ের অনেক ইতিহাস হারিয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে। সেগুলি আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গেল। কিন্তু যে ইতিহাসটুকু রয়ে গেছে, তার মূল্যও কম নয়। দশ দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ π-এর মান জানিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করছি;

$$\pi = ৩'১৪১৫৯২৬৫৩৬$$

বারাণসীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৫তম অধিবেশন

মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ডাঃ আত্মারাম

মূল সভাপতি

ডাঃ আত্মারাম ১৯০৮ সালের ১২ই অক্টোবর উত্তর প্রদেশের বিজনোর জেলার পিলানাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্রজীবন অতি কৃতিত্বপূর্ণ। ১৯৩১ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফটোকেমিক্যাল বিক্রিয়ার ভৌত রসায়ন, ফরম্যালডিহাইডের উপস্থিতি এবং ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের গঠন-কৌশল সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা করে ডি. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৩৬ সালে ডাঃ আত্মারাম ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যুরোতে যোগ দেন। এটি পরে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ-এ পরিণত হয়। এখানে তিনি পেট্রোলের আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্যে এয়ার-ফোম সলিউশনের উৎপাদন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। সে সময়ে পেট্রোলের আগুন যুদ্ধের বড় একটা সমস্যা ছিল। ১৯৪৫ সালে সি. এস. আই. আর-এর গভর্নিং বডি তাঁকে কলিকাতাস্থিত সেণ্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিক ইনষ্টিটিউট গড়ে তোলবার কাজের জন্যে নির্বাচিত করেন। গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিক ইনষ্টিটিউট কমিটির কর্মসচিব হিসাবে তিনি কাজ সুরু করেন এবং ইনষ্টিটিউটের জন্যে বিস্তৃত পরিকল্পনা পেশ করেন। পর পর কয়েক বছর অফিসার ইন চার্জ (১৯৪৫) এবং জয়েণ্ট ডিরেক্টর (১৯৪৯) হিসাবে কাজ করবার পর ১৯৫২ সালে ডাঃ আত্মারাম ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় কয়েক বছরের মধ্যেই ইনষ্টিটিউট ভারত ও বিদেশে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করে। ১৯৬৬ সালের ২২শে অগাষ্ট তিনি ভারতের সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের ডিরেক্টর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। সেই সঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের (বিজ্ঞান বিভাগ) সেক্রেটারী হিসাবেও কাজ করেন।

তত্ত্বীয় ও ফলিত বিজ্ঞান এবং উৎপাদনের যান্ত্রিক কৌশল সম্পর্কে তাঁর দান যথেষ্ট। তাঁর গবেষণা-কাজের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো—অপ্‌টিক্যাল গ্লাসের উৎপাদন ও উন্নয়ন। তাঁর গবেষণার ফলে এদেশে নতুন শিল্পের পত্তন হয়েছে ; যেমন – গৃহাদি নির্মাণের জন্যে অভ্র থেকে তাপ-প্রতিরোধক পদার্থ এবং ঠাণ্ডা ঘর ও হিমায়ন শিল্পে ব্যবহারের জন্যে ফেনা কাচ বা ফোম গ্লাস উৎপাদন। তাঁর গবেষণামূলক কাজের ফলেই এদেশে রাসায়নিক পোর্সিলেন, pH-মিটারের জন্যে গ্লাস ইলেকট্রোড, রঙীন কাচ, সানগ্লেয়ার গ্লাস, সিরামিক, কাচের এনামেল রং এবং বিশেষ রিফ্র্যাক্টরি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। সিলিকেট বিজ্ঞানে তাঁর গবেষণার মধ্যে কপার-রেড গ্লাসের রঙের উৎস সম্পর্কে গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর গবেষণায় দেখা গেছে যে, পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞানীরা এতদিন বিশ্বাস করতেন যে, কপার কলয়েড, কাচে কপার-রেড রং উৎপন্ন করে—তা ঠিক নয়, কিউপ্রাস অক্সাইড কলয়েডই এই রং উৎপত্তির জন্যে দায়ী। এই আবিষ্কারের ফলেই লাল চুড়ি তৈরির জন্যে আমদানীকৃত সেলিনিয়ামের পরিবর্তে এই

জিনিষের ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। এই কাচের চুড়ি নির্মাণ শিল্প ভারতের বৃহৎ কুটির শিল্পগুলির অন্যতম।

ডাঃ আত্মারাম স্বদেশের উন্নতির জন্যে স্বদেশেই শিল্প উৎপাদনে বিশ্বাসী। সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপনা থেকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল, দেশকে কাচ এবং সিরামিক শিল্পের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল করা। ১৯৫৯ সালে ডাঃ আত্মারাম পদ্মশ্রী উপাধি লাভ করেন।

ডাঃ আত্মারাম দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস (ইণ্ডিয়া), ইনষ্টিটিউশন অব কেমিষ্টস্ (ইণ্ডিয়া), সোসাইটি অব গ্লাস টেক্‌নোলজী, শেফিল্ড (ইউ. কে.) প্রভৃতির ফেলো। কাচ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিশনের তিনি নির্বাচিত সদস্য এবং ইণ্টারন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সিরামিক্স-এর অবৈতনিক সদস্য। Commission on the Chemistry of the High Temperature of the International Union of Pure and Applied Chemistry-তে ভারতের সদস্য, ন্যাশন্যাল কমিশন ফর কো-অপারেশন উইথ ইউনেস্কোর তিনি সদস্য এবং এর বিজ্ঞান উপসমিতির ভাইস চেয়ারম্যান। তিনি সোসাইটি অব গ্লাস টেকনোলজির (শেফিল্ড, ইউ-কে) অবৈতনিক ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার লেনিন টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট থেকে তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টর অব টেকনোলজি উপাধি প্রদান করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালে তিনিই প্রথম ভাটনগর পদক লাভ করেন। তাছাড়া উত্তর প্রদেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সমিতি থেকে তিনিই প্রথম স্বর্ণপদক এবং নগদ অর্থ পুরস্কার পান এবং বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কে. জি. নায়ক স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৬২-১৯৬৬ পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতির তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৫ সাল থেকে তিনি ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার সহঃ সভাপতি।

ডাঃ আত্মারাম ৭০টিরও বেশী গবেষণা-পত্র এবং তাছাড়া সমালোচনা এবং টেকনিক্যাল নোট প্রকাশ করেছেন। তিনি হিন্দীতে 'রসায়ন বিদ্যার ইতিহাস' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তিনি ২৫টি পেটেণ্ট নিয়েছেন।

প্রোফেঃ পি. নন্দী

সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

প্রোফেঃ প্রমথনাথ নন্দী ১৯১১ সালে বাঁকুড়া জেলার পাহাড়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় এম. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর স্পেশাল পেপার ছিল মাইকোলজি ও প্ল্যাণ্ট-প্যাথোলজি।

প্রোঃ নন্দী ডাঃ পি. এন. ঘটকের অধীনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা গবেষণাগারে গবেষণা সুরু করেন এবং তারপরে (১৯৩৮-৪০) তদানীন্তন কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে প্রোঃ এস. আর. বসুর তত্ত্বাবধানে গবেষণা সুরু করেন। তারপর তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার লেক্‌চারার হিসাবে যোগদান করেন। এরপর তিনি স্কটিশচার্চ কলেজে জীববিদ্যার লেকচারার নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি সাত বছর ছিলেন।

১৯৪০-৪৬ সালে তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা ডাঃ ডি. এম. বসুর প্রভাবে

আসেন। তিনি প্রোঃ নন্দীকে অবৈতনিক রিসার্চ ওয়ার্কার হিসাবে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণার সুযোগ দিতে স্বীকৃত হন। ডাঃ ডি. এম বসু কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে প্রোঃ নন্দী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মাটি থেকে অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদক ছত্রাক ও ব্যাক্টিরিয়া সম্পর্কে সমীক্ষা চালাবার জন্যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এর অল্পকাল পরেই ছত্রাক ও ব্যাক্টিরিয়ার ষ্ট্রেন (Strain) পৃথকীকরণের পরীক্ষা সম্ভবপর হলো।

ছয় বছর গবেষণার পর প্রোঃ নন্দী ভারতবর্ষের মাটিতে অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদক জীবের (Organism) অবস্থিতি প্রমাণ করেন। এই ভাবে আণুবীক্ষণিক জীববিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং তাঁর গবেষণাগার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের আণুবীক্ষণিক জীববিদ্যা বিভাগে পরিণত হয়।

প্রোঃ নন্দী ১৯৪৬ সালে যুক্তরাজ্যে যান এবং পি-এইচ. ডি-এর ছাত্র হিসাবে ইম্পিরিয়্যাল কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজিতে যোগদান করেন। এখানে তিনি সুপরিচিত প্ল্যান্ট-প্যাথোলজিষ্ট প্রোঃ উইলিয়াম ব্রাউন এবং ব্যাক্টিরিওলজির অ্যাসোসিয়েট প্রোঃ. এস. ই. জেকবস্-এর সংস্পর্শে আসেন। সয়েল ব্যাক্টিরিওলজি সম্পর্কে তাঁর পি-এইচ. ডি থিসিস ১৯৪৮ সালে সম্পূর্ণ হয় এবং ঐ সালেই তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইকোলজির লেকচারার হিসাবে কাজ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করেন রিসার্চ ফেলো হিসাবে। ১৯৫৩ সাল থেকে সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাগুলি থেকে তিনি তাঁর গবেষণার জন্যে সাহায্য পাচ্ছেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৪টি রিসার্চ স্কীম-এর গবেষণা হয়েছে। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর ৫৮টি মৌলিক গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৫৬ সালে প্রোঃ নন্দী ক্যানাডায় যান। সেখানে ক্যানাডার অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের বায়োলজি ডিভিশনে নয় মাস অতিবাহিত করেন। এখানে তিনি রেডিয়েশন বায়োলজি সম্পর্কে কার্যরত একদল ক্যানাডীয় বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে আসেন। ১৯৫৭ সালে তিনি ক্যানাডা, ইউ এস. এ, ইউ. কে., ফ্রান্স ও ইটালীর বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশন পরিদর্শন করেন।

ইউ. এস এ. অবস্থানকালে তিনি অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের গবেষণায় রাটগার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব মাইক্রোবায়োলজির প্রোঃ সেলম্যান এ ওয়াক্সম্যান এবং ওকরিজ ন্যাশান্যাল লেবরেটরীর বায়োলজি ডিভিশনের প্রধান ডাঃ আলেকজাণ্ডার রোলেণ্ডারের কাজে সহযোগিতা করেন। তিনি নিউইয়র্কের রকফেলার ফাউণ্ডেশনস মেডিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডাঃ নর্টন জিণ্ডার, ডাঃ ডি. এল ট্যাটাম, ডাঃ রেনে ড্যুবস এবং ইউ এস. এ-র কোল্ড স্প্রিং হার্বার রিসার্চ লেবরেটরীর, লং আইল্যাণ্ড-এর ডাঃ এম. ডিমারেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের সঙ্গে 'মলিকিউলার জেনেটিক্স'-এর সমস্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

প্রোঃ নন্দী পরে ইউ. কে পরিদর্শন করেন এবং গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোঃ জি. পন্টিকর্ভো এবং তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে তাঁর গবেষণার ব্যাপারে নতুন ধারণা লাভ করেন। ফ্রান্সে তিনি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে Institute du Radium-ও পরিদর্শন করেন এবং UV ডোজিমেট্রি সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে ডাঃ ল্যাটারজেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইটালীতে Instituto Superiore de Sanita, International Research Center for Chemical Microbiology প্রতিষ্ঠানে তিনি কিছুকাল অতিবাহিত

করেন এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণাগারে অ্যান্টিবায়োটিক ফার্মেন্টেশন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রস্তুতের বিষয়ে তিনি ডাঃ ই. বি. চেন-এর সঙ্গে আলোচনা করেন।

শ্রী কে. এল. ভোলা

সভাপতি—ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখা

শ্রীকুন্দনলাল ভোলা ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিয়ানওয়ালিতে এবং পরে লাহোরের গভর্ণমেন্ট কলেজে কেমিষ্ট্রিতে অনার্স স্কুল পর্যন্ত পড়েন এবং ধানবাদের ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস্-এ টেকনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং এ. আই. এস. এম-এর জন্যে তাঁর থিসিস উচ্চ প্রশংসিত হয়।

১৯৩০-৩১ সালে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডাঃ ডি. এন. ওয়াডিয়া এবং ডাঃ জে. বি. আউডেনের অধীনে ট্রেনিং লাভ করে তিনি একটি খ্যাতনামা খনি প্রতিষ্ঠানে ভূতত্ত্ববিদ ও মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে কাজ করেন। পরে তিনি পূর্বেকার যোধপুর রাজ্যের (রাজস্থান) সরকারী ভূতত্ত্ববিদ্ হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি বার্মা-অয়েল কোম্পানীতে ভূতত্ত্ববিদ্ হিসাবে কাজ করেন। তিনি আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম প্রাপ্তি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান। সে অঞ্চলের বেশীর ভাগই এখন পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত। বি. ও. সি. এবং জি. এস. আই. কর্তৃক অনুমোদিত যে ভূতাত্ত্বিক দল উত্তর-পশ্চিম ভারতের Tertiary correlation সম্পর্কে পুনরনুসন্ধানের জন্যে প্রেরিত হয়েছিল, তিনি তার পরিচালক ছিলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে যোগদান করেন। সেখানে তিনি ড্রিলিং বিভাগ এবং পরে মাইনিং বিভাগ গঠন করেন। তিনি ইউরেনিয়াম প্রাপ্তির সম্ভাবনায় জাদুগুদা অঞ্চলে ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা পরিচালনা করেন।

পরবর্তী কালে তিনি সমগ্র সিংভূম থ্রাষ্ট বেল্ট-এ ইউরেনিয়াম প্রাপ্তি সম্ভব কিনা, তার জন্যে ব্যাপকভাবে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান শুরু করেন। সেখানকার নারওয়াপাহাড় অঞ্চলে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ইউরেনিয়াম সঞ্চিত আছে। আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক কংগ্রেস সহ অনেক বিদ্যোৎসাহী প্রতিষ্ঠানের তিনি সদস্য। তিনি ২০টির বেশী গবেষণা-পত্র বিভিন্ন বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। ১৯৫৮ ও ১৯৬৪ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত 'পরমাণুর শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্মেলনের' (ইউ. এন.) কার্য বিবরণীতে এবং ইউ-এস-এ-র অর্থনৈতিক ভূতত্ত্বে তাঁর লেখা আছে। সি. এস. আই. আর. কর্তৃক প্রকাশিত ভারতের সম্পদ-এ (Wealth of India—অর্থকরী উৎপন্ন দ্রব্য ও ভারতের শিল্পসম্পদ বিষয়ক অভিধান) তিনি লিখেছেন।

ডাঃ এ. আর. ভার্মা

সভাপতি—পদার্থ-বিজ্ঞান শাখা

ডাঃ অজিতরাম ভার্মার শিক্ষাজীবন খুব কৃতিত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে সলিড ষ্টেট ফিজিক্স এবং বিশেষ করে 'ইমপারফেকসন্স ও ক্রিষ্ট্যাল গ্রোথ' সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা খুবই কৃতিত্বপূর্ণ।

ডাঃ ভার্মা ১৯২১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে ডিস্টিংশন সহ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোঃ কৃষ্ণান এফ. আর. এস এর অধীনে সলিড ষ্টেট ফিজিক্স-এর গবেষণায় নিযুক্ত হন। কয়েক বছর সেখানে গবেষণা করবার পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোঃ এস. টোলানস্কির অধীনে মালটিপ্‌ল্ বীম ইন্টারফিয়ারেন্স ব্যবহার করে সিলিকন

কার্বাইড সম্পর্কে গবেষণা করবার জন্যে বৃটিশ কাউন্সিলের ফেলোসিপ পান। তিনি লণ্ডনের বার্কবেক কলেজে প্রোঃ জে. ডি বার্ণাল এফ. আর. এস-এর অধীনেও কাজ করেন।

তখন কৃষ্টাল গ্রোথ-এর বিষয়টি পৃথিবীর খ্যাতনামা পদার্থ-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তত্ত্বীয় গবেষণায় দেখা গেল, যদি কৃষ্টাল স্তরে স্তরে জন্মাতে দেওয়া হয়, তাহলে শতকরা ২০ ভাগেরও কম সুপারস্যাচুরেশনে যে হারে কৃষ্ট্যাল বাড়ে—সে হারে কৃষ্ট্যাল বাড়ে না। প্রোঃ এফ. সি. ফ্রাঙ্ক এফ. আর. এস. কৃষ্টাল গ্রোথ-এর বিভিন্ন অবস্থা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলেন এবং এমন কৌশলের ইঙ্গিত দিলেন, যাতে নিম্ন সুপারস্যচুরেশনেও কৃষ্ট্যাল জন্মাবে। ডাঃ ভার্মাই কৃষ্টাল গ্রোথ-এর স্পাইর‍্যাল মেকানিজমের বিশেষ কার্যকরী পন্থা উদ্ভাবন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকায় এবং 'Crystal growth and imperfections' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। তাঁর গবেষণার স্বীকৃতিতে লণ্ডনের রয়্যাল হলোওয়ে কলেজে তিনি আই. সি. আই. রিসার্চ ফেলোসিপ লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার নিযুক্ত হন এবং কৃষ্টাল গ্রোথ-এর বিষয়ে গবেষণা সুরু করেন। কয়েক বছর পরে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রোফেসর এবং এবং প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁর তত্ত্বাবধানে একদল গবেষক-কর্মী ইমপারফেকসন ইন কৃষ্টাল, পলিমরফিজম, পলিটিপিজিম এবং পাত্‌লা ফিল্মের গঠন ও ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেন। এই সব গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে 'Polymorphism and Polytypism in Crystals' নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী কালে তিনি ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবরেটরীর ডিরেক্টরের পদে যোগদান করেন।

ডাঃ ভার্মা নানাদেশ পরিভ্রমণ করেছেন এবং নানা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে বোষ্টনে অনুষ্ঠিত কৃষ্ট্যাল-গ্রোথ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের একটি অধিবেশনে সভাপতিত্বের জন্যে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাছাড়া ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে মস্কোয় অনুষ্ঠিত কৃষ্ট্যালোগ্রাফি সম্পর্কিত সপ্তম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে এবং কৃষ্ট্যাল-গ্রোথ সম্পর্কিত আলোচনা-চক্রেও তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সলিড ষ্টেট ফিজিক্স সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্যে ডাঃ ভার্মা ১৯৬২ সালে ন্যাশান্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের ফেলো নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৪ সালে স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পান।

প্রোঃ জে. এন. কাপুর

সভাপতি—গণিত শাখা

প্রোঃ জে. এন. কাপুর বর্তমানে কানপুরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির গণিত বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান। তাঁর শিক্ষাজীবন বরাবরই কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ডাঃ কাপুর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস এবং ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের ফেলো। এছাড়া যুক্তরাজ্যের ইনষ্টিটিউট অব ম্যাথেমেটিক্স ও তার U. K-র অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ক ফেলো।

প্রোঃ কাপুর এবং তাঁর ৩০ জন গবেষক ছাত্র ৩০০-এরও বেশী গবেষণা-পত্র ইউ. কে., ইউ. এস. এ, জাপান, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ক্যানাডা, জার্মেনী, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, তুরস্ক ও পোলাণ্ডের বিভিন্ন জার্ণালে প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাথমেটিক্স, এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং, স্পেশ

ইঞ্জিনীয়ারিং, লুব্রিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি বিষয়ে এই সব গবেষণামূলক প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও গণিতের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ৩৬টিরও বেশী প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রোঃ কাপুর ম্যাথেমেটিক্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্স, ভেক্টর কালকুলাস, এ টেক্সট বুক অব ডিনামিক্স, এসেস অন ম্যাথেমেটিক্স এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া, সাম অ্যাসপেক্টস অব স্কুল ম্যাথেমেটিক্স, সাজেষ্টেড এক্সপেরিমেন্টস ইন স্কুল ম্যাথেমেটিক্স, দি স্পিরিট অব ম্যাথেমেটিক্স, নিউ ম্যাথেমেটিক্স ফর স্কুল টিচার্স, এ কোর্স অব লজিক, ম্যাথেমেটিক্যাল মডেলস্ ফর স্কুল সায়েন্সেস প্রভৃতির লেখক বা যুগ্ম লেখক। তিনি স্কুল ম্যাথেমেটিক্স টেক্সট বুক-এর মুখ্য সম্পাদক। তিনি কানপুর ষ্টাডি গ্রুপের ডিরেক্টর এবং আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার উন্নয়নের জন্যে NCERT কর্তৃক গঠিত সমস্ত ম্যাথেমেটিক্স ষ্টাডি গ্রুপের আহ্বায়ক।

তিনি নয়টি সামার স্কুল চালিয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছেন। সরকারী ভাবে অনুমোদিত গণিতের সামার স্কুল আরম্ভ হবার অনেক আগেই ১৯৫৮ সালে সামার স্কুল শুরু হয়েছিল।

প্রোঃ কাপুর ভারত গণিত পরিষদের সহকারী সভাপতি, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব থিয়োরেটিক্যাল অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড মিকানিক্স-এর পূর্বতন সহকারী সভাপতি। কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ান মেথেমেটিক্যাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান অপারেশন রিসার্চ সোসাইটি এবং অ্যাসোসিয়েসন অব ম্যাথেমেটিক্স রিসার্চ-এর তিনি সদস্য। ম্যাথেমেটিক্যাল রিভিউ, অ্যাপ্লায়েড মিকানিক্স রিভিউস এবং Zentralblatt für mathematik পত্রিকায় প্রেরিত গবেষণামূলক প্রবন্ধের তিনি সমালোচক। তিনি ত্রৈমাসিক 'দি ম্যাথেমেটিক্স সেমিনার'-এর সম্পাদক এবং বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

শ্রী এইচ. কে.

সভাপতি—পরিসংখ্যান শাখা

১৯৪৩ সালে শ্রীএইচ. কে. নন্দী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে এম. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। তারপরে তিনি কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে যোগদান করেন। পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানের লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন এবং পরে তিনি ঐ বিভাগের রীডার নিযুক্ত হন। Statistical inference and design of experiments সম্বন্ধে তিনি বিশেষ উৎসাহী এবং এই বিষয়ে তাঁর গবেষণাও মূল্যবান। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল স্যাম্পল সার্ভে, ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অর্গানিজেশনস্ অব ইণ্ডিয়া এবং পরিসংখ্যানের অন্যান্য চলতি সমস্যা সম্পর্কে তিনি অনেক সমালোচনামূলক লেখা প্রকাশ করেছেন।

প্রোফেসর এস. কে. ভট্টাচার্য

সভাপতি—রসায়ন শাখা

প্রোঃ এস. কে. ভট্টাচার্য ডি. এস-সি, এফ. এন. আই. ১৯০৮ সালের ১লা মার্চ অধুনা পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্গত ঢাকা জেলার মুলপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর শিক্ষা-জীবন বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। ১৯৩২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে রসায়নশাস্ত্রে এম. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি স্বর্গীয় সার জে. সি. ঘোষের তত্ত্বাবধানে প্রথমে রিসার্চ স্কলার এবং পরে সহকারী লেকচারার হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি সার পি. সি. রায় পুরস্কার লাভ করেন। ফটোকেমিষ্ট্রি সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে ১৯৩৯ তিনি ভৌত রসায়নে ডি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে

তিনি ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স-এ যোগদান করেন। সেখানে তিনি ১২ বছর বিভিন্ন পদে কাজ করেন এবং পরে অ্যাসিষ্টাণ্ট প্রোফেসর এবং ভৌত ও অজৈব রসায়ন বিভাগের প্রধান হন। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ব্যাঙ্গালোর ত্যাগ করেন এবং খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির রসায়ন বিভাগে যোগদান করেন। আণ্ডার গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষণ ও গবেষণার জন্যে তিনি এই রসায়ন বিভাগকে অতি আধুনিক ও উন্নত ধরণের গবেষণাগার হিসাবে গড়ে তোলেন।

১৯৪৭ সালে প্রো. ভট্টাচার্য ক্যাটালিসিস এবং হাই প্রেসার কেমিষ্ট্রির পরীক্ষণ ও কৌশল সংক্রান্ত উন্নত ধরণের ট্রেনিং নেবার জন্যে ইউরোপে যান এবং ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি, লণ্ডন; কেমিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরী টেডিংটন, ইংল্যাণ্ড; ভ্যান ডার ওয়ালস লেবরেটরী -আমষ্টারডাম, হল্যাণ্ড; হাইপ্রেসার লেবরেটরী ক্রসেলস্ এবং আণ্ট্রা হাইপ্রেসার লেবরেটরী, প্যারিস প্রভৃতি সংস্থায় কাজ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে ইউরোপ এবং ইউ. এস. এ-র বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

প্রো. ভট্টাচার্য ১৯৫৬ সালে ইউ. এস. এ-র ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত ক্যাটালিসিস সম্পর্কে প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস, ১৯৬০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ক্যাটালিসিস সম্পর্কিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস, ১৯৬৪ সালে হল্যাণ্ডের আমষ্টারডামে অনুষ্ঠিত ক্যাটালিসিস সম্পর্কিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস, ১৯৬২ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত উচ্চ চাপের রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র, ১৯৬৫ সালে ফ্রান্সের le Creusot-এ অনুষ্ঠিত উচ্চ চাপের গবেষণা সম্পর্কিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং ১৯৬৫ সালে স্কটল্যাণ্ডের অ্যাবারডিনে অনুষ্ঠিত থার্মাল অ্যানালিসিস সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রভৃতিতে যোগদান করেছিলেন।

তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে অনেক ছাত্র ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন। তিনি এবং তাঁর সহযোগীগণ ১৫০টিরও বেশী মৌলিক গবেষণা-পত্র দেশী-বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন।

১৯৫৪ সাল থেকে তিনি ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো। ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ, ডিপার্টমেণ্ট অব অ্যাটমিক এনার্জি, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রভৃতি বিভিন্ন কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন বা আছেন। দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও পেশাদারী সংস্থারও তিনি সদস্য। ১৯৬৫ সাল থেকে প্রো: ভট্টাচার্য ক্যাটালিসিস সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ভারতের পক্ষে করেস্‌পণ্ডিং সদস্য। তিনি ১৯৬৮ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিতব্য ক্যাটালিসিস সম্পর্কিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের কাউন্সিলের সদস্য। ১৯৬৮ সালে ইউ. এস. এ-র ম্যাসাচুসেটস্-এর ওরসেসটার-এ অনুষ্ঠিতব্য থার্মাল অ্যানালিসিস সম্পর্কিত দ্বিতীয় কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির তিনি সদস্য। ডাঃ জে. সি. ঘোষ ও ডাঃ এম. ভি. সি শাস্ত্রীর সহযোগিতায় 'Some Catalytic Gas Reactions of Industrial Importance' নামক একখানা পুস্তক তিনি লিখেছেন।

তিনি বর্তমানে খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির রসায়নশাস্ত্রের সিনিয়র প্রোফেসর এবং ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রধান।

ডাঃ এল. পি. বিদ্যার্থী

সভাপতি—নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখা

ডাঃ এল. পি. বিদ্যার্থী পি-এইচ. ডি. রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রোফেসর ও প্রধান। বিভিন্ন গবেষণা-কার্য তত্ত্বাবধান করা ছাড়াও তিনি (১) রাঁচীর পৌর নমুনা এবং (২) সহজতর মিতব্যয়িতা থেকে শিল্পায়ন: হাতিয়ার যন্ত্র ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের তাৎপর্য—এই দুটি রিসার্চ স্কীম-এর পরিচালক ছিলেন।

রিসার্চ প্রোগ্রামস্ কমিটি, প্ল্যানিং কমিশন, ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত ভারতের আদিবাসীদের নেতৃত্বের ধাঁচের পরিবর্তন সম্পর্কিত গবেষণা তিনি বর্তমানে পরিচালনা করছেন। ভারতের আদিবাসীদের সংস্কৃতি সম্পর্কিত ভারত-জাপান-এর যৌথ রিসার্চ প্রোজেক্টের তিনি কো-ডিরেক্টর। তিনি গত দশ বছর যাবৎ সামাজিক গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক। তিনি গত কয়েক বছর যাবৎ রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্ণাল, সোসিওলজিক্যাল বুলেটিন (গাজিয়াবাদ) এবং ফোক লোর (কলিকাতা) পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য।

বিহার সরকার থেকে নৃতত্ত্বে স্কলারশিপ (১৯৫৩), লক্ষ্ণৌর ইন্দ্রজিৎ সিং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক (১৯৫৮), ফোর্ড ফাউণ্ডেশন গ্র্যান্ট (১৯৫৫), Fulbright & Smidthmundt স্কলারশিপ (১৯৫৬), শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোসিপ (১৯৫৭) প্রোঃ বিদ্যার্থী লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে ফিলাডেলফিয়ায়, ১৯৬৪ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নৃতাত্ত্বিক কংগ্রেসে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৬ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত প্যাসিফিক সায়েন্স কংগ্রেসে এবং ১৯৬২ সালে মুসৌরীতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার গ্রাম্য নেতৃত্ব সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

ডাঃ বিদ্যার্থী দেশ-বিদেশের নানা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখেছেন। তাঁর রচিত পুস্তকও আছে। ডাঃ বিদ্যার্থীর গবেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে, ভারতের উপজাতিদের সংস্কৃতি, গয়া ও শিল্পনগরী রাচী সম্বন্ধে অনুসন্ধান, লোকগীতি ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ও অ্যাকশন অ্যান্থ্রোপলজি।

ডাঃ বিদ্যার্থী বিভিন্ন সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি আমেরিকার সিগমা xi রিসার্চ সোসাইটিসমূহের সদস্য এবং আমেরিকার নৃতাত্ত্বিক সমিতির বৈদেশিক ফেলো। ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সমিতি ও ভারতীয় লোকগীতি সমিতির তিনি সহঃসভাপতি। টোকিওতে অনুষ্ঠিত নবম প্যাসিফিক সায়েন্স কংগ্রেসের প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের লুপ্ত সংস্কৃতি ও পরিবর্তনশীল সমিতি সংক্রান্ত অধিবেশনের তিনি সভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি লোক-সংস্কৃতি ও লোকগীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

ডাঃ এম. ডি. এল শ্রীবাস্তব

সভাপতি—প্রাণিবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখা

ডাঃ এম. ডি. এল. শ্রীবাস্তবের শিক্ষাজীবন কৃতিত্বপূর্ণ। এম. এস-সি পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় তিনি প্রথম ডিভিশনের নম্বর পান। তিনি জার্মান, ফরাসী ও ইটালিয়ান ভাষায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রফিসিয়েন্সি সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কাজ চালাবার মত স্পেনীয় ভাষা জানেন। ১৯৩৭ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন এবং ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার প্রোফেসর ছিলেন।

১৯৪৮ সালে ভারতের Proc. Nat. Acad. Sci-এ প্রকাশিত তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট গবেষণা-পত্রের

জন্তে তিনি উত্তর প্রদেশ সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রীর স্বর্ণপদক পুরস্কার পান।

ভারত সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫০-৫১ সালে তিনি এডিনবরায় ইনষ্টিটিউট অব অ্যানিম্যাল জেনিটিক্স-এ প্রোঃ ওয়াডিংটনের গবেষণাগারে কাজ করেন এবং কলাম্বিয়ার (নিউইয়র্ক) স্বর্গতঃ প্রোঃ Schrader এবং প্রোঃ পলিষ্টার-এর গবেষণাগারে ১৯৫৪-৫৫ সালে ফুলব্রাইট এবং Schimdt-Mundt ভিজিটিং স্কলার হিসাবে কাজ করেন।

তিনি কয়েকটি পুস্তক এবং অনেক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। অনেক ছাত্রই তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

১৯৬৭ সালের ১লা জুলাই তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ডাঃ এস. আর. রাও

সভাপতি—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা বিজ্ঞান

ডাঃ সুশরলা রামমোহন রাও এম. এস-সি, ডি. এস-সি. ১৯০৯ সালের ৩রা মে অন্ধ্র প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। অন্ধ্র এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি ডি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল—'Drosichiella quadricaudatus Green'।

তিনি আই. এ. আর, আই-তে আই. সি. এ. আর-এর স্কীমে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ও আই. ভি. আর. আই. মুক্তেশ্বরে গবেষণা করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি বোম্বেতে অসামরিক পশু-চিকিৎসা বিভাগে পরজীবীবিদ হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল গৃহপালিত পশুর পরজীবী সংক্রান্ত গবেষণা। বোম্বে পশু-চিকিৎসা কলেজের ছাত্রদের পরজীবীবিদ্যা শেখানোও তাঁর অন্যতম একটি প্রধান কাজ ছিল। ১৯৫৪ সালে তিনি বোম্বে পশু-চিকিৎসা কলেজের প্যারাসাইটোলজি বা পরজীবী-বিদ্যার প্রোফেসর এবং প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন এবং তদবধি সেই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি Smith-Mundtt ফেলোসিপ এবং ফুলব্রাইট ট্রাভেল গ্রাণ্ট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন এবং প্যাথো-বায়োলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ডাঃ এফ. ক্রাঙ্কের অধীনে বাল্টিমোরের (মেরীল্যাণ্ড) স্কুল অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাব্লিক হেলথ-এ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ব্লাড ফ্লুক সম্বন্ধে গবেষণার সুযোগ পান। জনহপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো হিসাবে ডাঃ রাও নিযুক্ত হন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করেছেন। তাছাড়া তিনি জাপান, হাওয়াই, ব্যাঙ্কক ও সিংহল পরিদর্শন করেন।

গত ২৬ বছর যাবৎ ডাঃ রাও পশু-চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত আছেন। তিনি ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরজীবী-বিদ্যার পরীক্ষক। তিনি বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বোর্ড অব ট্রাষ্টির চেয়ারম্যান এবং ফ্যাকাল্টি অব টেকনোলজির ডীন হিসাবেও কাজ করেছেন।

গত ৩০ বছর যাবৎ তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতির সদস্য। পরজীবী-বিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে তিনি নানা মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

ডাঃ কে. কে. মজুমদার

সভাপতি—ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা শাখা

ডাঃ মজুমদার ১৯১৩ সালে শিলং-এ জন্মগ্রহণ করেন। জোড়হাট, শিলং, ঢাকা, গৌহাটি ও কলিকাতায় তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত রসায়নে এম. এস-সি. ডিগ্রি (১৯৩৬) এবং ডি. ফিল ডিগ্রি (১৯৪৯) লাভ করেন। ১৯৫০ সালে T. I G. B. (London) থেকে তিনি কেমিক্যাল

ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা পান। কলাম্বিয়ার (নিউইয়র্ক) মিনারেল ড্রেসিং লেবরেটরিজ, মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং A. M. D. L., Adelaide-এ কাজ করেন।

২৫ বছরেরও বেশী ডাঃ মজুমদার কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ক্ষেত্রে গবেষণায় যুক্ত আছেন। ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স, ধানবাদের ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস্ এবং বোম্বের ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের ওর ড্রেসিং বিষয়ের জন্যে নতুন প্রতিষ্ঠিত বিভাগ তিনি সংগঠন করেছেন। এখন তিনি ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ কেন্দ্রের এই বিভাগের প্রধান।

অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের নানা গবেষণা কেন্দ্র ও খনিসমূহ ডাঃ মজুমদার পরিদর্শন করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ পদক ও পুরস্কার (১৯৩৬), ভারতীয় বিজ্ঞান সংবাদ সংস্থার পুরস্কার (১৯৫৪-৫৫), উইলিয়াম ক্যাম্পবেল ফেলোশিপ (কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়) ('৯৫০-৫১), ফুলব্রাইট ট্রাভেল গ্রাণ্ট (১৯৫০-৫১), কলম্বো প্ল্যান ফেলোসিপ (অষ্ট্রেলিয়া) ১৯৬২—লাভ করেন।

১৯৫৮ সালে বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি শিলং-এর সেন্ট অ্যান্টনীস কলেজে লেক্চারার (১৯৩৭-৪০), ব্যাঙ্গালোরের ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স-এর রিসার্চ অ্যাসিষ্ট্যান্ট (১৯৪০-৪৪) এবং লেকচারার (১৯৪৭-৪৮), কলম্বোর আই. সি. পি-এর ম্যানেজার (১৯৪৪-৪৭) এবং ধানবাদের আই. এস. এম-এর সিনিয়র লেক্চারার ছিলেন।

গত কয়েক বছর যাবৎ ডাঃ মজুমদার তাঁর সহকর্মীদের সহযোগিতায় ট্রম্বের সুসজ্জিত গবেষণাগারে পরমাণবিক ও ষ্ট্র্যাটেজিক খনিজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গবেষণা করছেন।

তাঁর অনেক সহকর্মী তাঁর তত্ত্বাবধানে কাজ করে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

মিনারেল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ তাঁর উল্লেখযোগ্য দান হচ্ছে—ইলেকট্রিক্যাল কনসেনট্রেশন, ফ্লোটেশন, নিউমেটিক সেপারেশন এবং কমিউনিশন। যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য ও ভারতের খ্যাতনামা পত্রিকায় তাঁর ১০০টিরও বেশী গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি তিনি মিনারেল ড্রেসিং সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানের জন্যে UNESCO কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

ডাঃ মজুমদার ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনারেল ডেসিং-এর পরীক্ষক এবং এই বিষয় সম্পর্কিত গবেষণাগার স্থাপনে তাদের পরামর্শও দিয়েছেন। ষ্ট্র্যাটেজিক মিনারেল সম্পর্ক অনেক বৈজ্ঞানিক সমিতির তিনি সদস্য। সমুদ্র-তীরের বালুকা শিল্প পুনর্গঠনে ডাঃ মজুমদারের দান উল্লেখযোগ্য।

প্রোফেসর ভি. কে. কোথারকর

সভাপতি—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখা

বাসুদেও কৃষ্ণ কোথারকর ১৯১২ সালের ২রা মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজি বিভাগের প্রধান এবং প্রোফেসর। তাঁর ছাত্রজীবন বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৮ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে যান। সেখানে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর স্যার ফ্রেডারিক চার্লস বার্টলেট, এফ. আর. এস-এর তত্ত্বাবধানে এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজি সম্পর্কে অনুশীলন সুরু করেন। সেখানে তিনি Moral Sciences' Tripos : C : Experimental Psychology সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এছাড়া তিনি ১৯৩৯-৪০ সালে সাইকোলজিক্যাল লেবরেটরীতে যুদ্ধ গবেষণায়ও সাহায্য করেন। ভারতে ফিরে এসে তিনি পুনায় তিলক কলেজ অব এডুকেশন, বোম্বের এলফিনষ্টোন কলেজ ও কর্ণাটক কলেজে (ধারওয়ার) মনস্তত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষকতা করেন।

১৯৫০ সাল থেকে প্রোঃ কোথারকর পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজি বিভাগের প্রধান। এই বিভাগটি তিনিই স্থাপন করেন এবং ভারতবর্ষ, দূর ও মধ্য প্রাচ্যে এটিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারে পরিণত করেন। মৌখিক শিক্ষা, মৌখিক আচরণে এবং মৌলিক গবেষণার জন্যে তিনি একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। স্মৃতি সঞ্চয় এবং পুনরুদ্ধারের পদ্ধতি সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে গবেষণায় তিনি সাফল্য অর্জন করেন। প্রোঃ কোথারকর প্রায় ছয়টি পুস্তকের রচয়িতা। তিনি দেশ-বিদেশের বিখ্যাত পত্রিকায় ৫০টিরও বেশী গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন।

তিনি গোষ্ঠীগত কুসংস্কার, হিন্দু-হরিজন সম্পর্ক, মুসলমান ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করছেন। সাধারণ মানসিক যোগ্যতার মনস্তাত্ত্বিক গ্রুপ টেষ্ট তিনি প্রবর্তন করেছেন

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৮ সালে প্রেরিত ভারত সরকারের কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন। ১৯৫৯ সালে বিভিন্ন বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্যে তিনি বৃটিশ কাউন্সিল কর্তৃক আমন্ত্রিত হন।

ডাঃ এম. এল. চাটার্জী

সভাপতি—শারীরবিদ্যা বিভাগ

ডাঃ মাধবলাল চাটার্জী ১৯০৯ সালের মে মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিভিন্ন হাসপাতালে কয়েক বছর রিসার্চ ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করবার পর ১৯৩৮ সালে তিনি প্রাদেশিক ওষুধ নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারে (বাংলা) ফার্মাকোলজিষ্ট হিসেবে কাজে যোগ দেন। এছাড়া তিনি স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে (কলিকাতা) ফার্মাকোলজির অ্যাসিষ্টান্ট প্রোফেসর হিসাবেও কাজ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং কয়েকজন খ্যাতনামা ফার্মাকোলজিষ্টের সঙ্গে কাজ করেন। ১৯৫৪ সালে প্রোঃ জি. এইচ. বার্ণ, এফ. আর. এস-এর তত্ত্বাবধানে কাজ করে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল. ডিগ্রি অর্জন করেন।

ডাঃ চাটার্জী স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর ফার্মাকোলজির প্রোফেসর এবং ১৯৫৫ সাল থেকে কারমাইকেল (আর. জি. কর) হাসপাতালের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ব্যাধির ভিজিটিং ফিজিসিয়ান। ডাঃ চাটার্জী স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের গভর্নিং বডির সদস্য এবং ডেপুটি সেক্রেটারী (এক্স-অফিসিও)। কলিকাতাস্থিত পশ্চিমবঙ্গ পশু-চিকিৎসা কলেজের গভর্নিং বডিরও তিনি সদস্য।

এক্সপেরিমেন্টাল এবং ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি হচ্ছে ডাঃ চাটার্জীর গবেষণার বিশেষ বিষয়। ডাঃ চাটার্জী ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ভারত সরকারের ড্রাগস্ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড এবং ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ড্রাগ এনকোয়ারি কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৬২ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোলিয়াম এবং রাসায়নিক মন্ত্রণালয়ের অধীন ড্রাগস্ ও ফার্মাসিউটিক্যালস ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সদস্য। সম্প্রতি তিনি ভারত সরকার কর্তৃক হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিক লিমিটেডের (পিম্প্রি) অন্যতম ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন। ১৯৪৭ সালে বিজ্ঞান-কর্মী সমিতির কলিকাতা শাখার স্থাপন-কাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি এর সম্পাদক এবং পরে সহ-সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। ডাঃ চাটার্জী এদেশের বহু বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের তিনি সদস্য। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক।

এছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ফার্মাকোলজির শিক্ষক। ১৯৪০ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতির শারীরবিদ্যা বিভাগের রেকর্ডার নিযুক্ত হন।

ডাঃ এম. এস. স্বামীনাথন

সভাপতি—কৃষি-বিজ্ঞান শাখা

মনকম্বু সম্বাশিভন স্বামীনাথন ১৯২৫ সালের ৭ই অগাষ্ট মাদ্রাজ রাজ্যের কুম্বাকোনামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোয়েম্বাটুরস্থিত মাদ্রাজ কৃষি কলেজ (বি. এস. সি-এজি.), নয়াদিল্লীস্থিত ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (Assoc. IARI), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াজেনিংগেন, নেদারল্যাণ্ডস, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ. কে. (পি-এইচ. ডি) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৫২-৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি জেনেটিকসে প্রোজেক্ট অ্যাসোসিয়েট হিসাবে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর।

প্রজননবিদ্যার গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে ডাঃ স্বামীনাথন আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। স্বামীনাথন ও তাঁর শিষ্যবর্গ বিকিরণের পরোক্ষ প্রভাব ও শস্যের উন্নতি বিধানে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্যে বিদেশে সুপরিচিত।

ডাঃ স্বামীনাথনের মতে, ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানে বিজ্ঞান খুবই প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, বিজ্ঞানীদের সমাজের উন্নতি বিধানে আত্মনিয়োগ করা উচিত। ডাঃ স্বামীনাথন নানা উন্নতিমূলক কর্মসূচী রূপায়ণে অগ্রণী হয়েছেন।

তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৯৬১ সালে তিনি শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পান। প্রজননবিদ্যাসংক্রান্ত গবেষণার জন্যে ডাঃ স্বামীনাথন ১৯৬৫ চেকোস্লাভাক অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর মেণ্ডেল স্মৃতিপদক পুরস্কার পান। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র তিনি ঐ পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়া তিনি তিমিরাজেভ অ্যাকাডেমি পদক, ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অব জেনেটিক্স মেডাল ও ভারতীয় উদ্ভিদবিদ্যা সমিতির বীরবল সাহনি পদক পুরস্কার পান। আন্তর্জাতিক প্রজননবিদ্যা কংগ্রেসে তিনিই প্রথম ভারতীয় সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৩ সালে হেগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রজননবিদ্যা কংগ্রেসেও তিনি সহ-সভাপতি হিসাবে যোগদান করেছিলেন। ১৯৬৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী ডাঃ স্বামীনাথন পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হন। ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর তিনি ফেলো। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রায় ৩০ জন ছাত্র পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন এবং ৫০ জন ছাত্র এম. এস-সি. ডিগ্রি অথবা Assoc IARI ডিপ্লোমা লাভ করেছেন।

তিনি নানা বৈজ্ঞানিক মনোগ্রাফ এবং ১৬০টিরও বেশী মৌলিক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী—১৯৬৮

২১শ বর্ষ, ঃ ২য় সংখ্যা
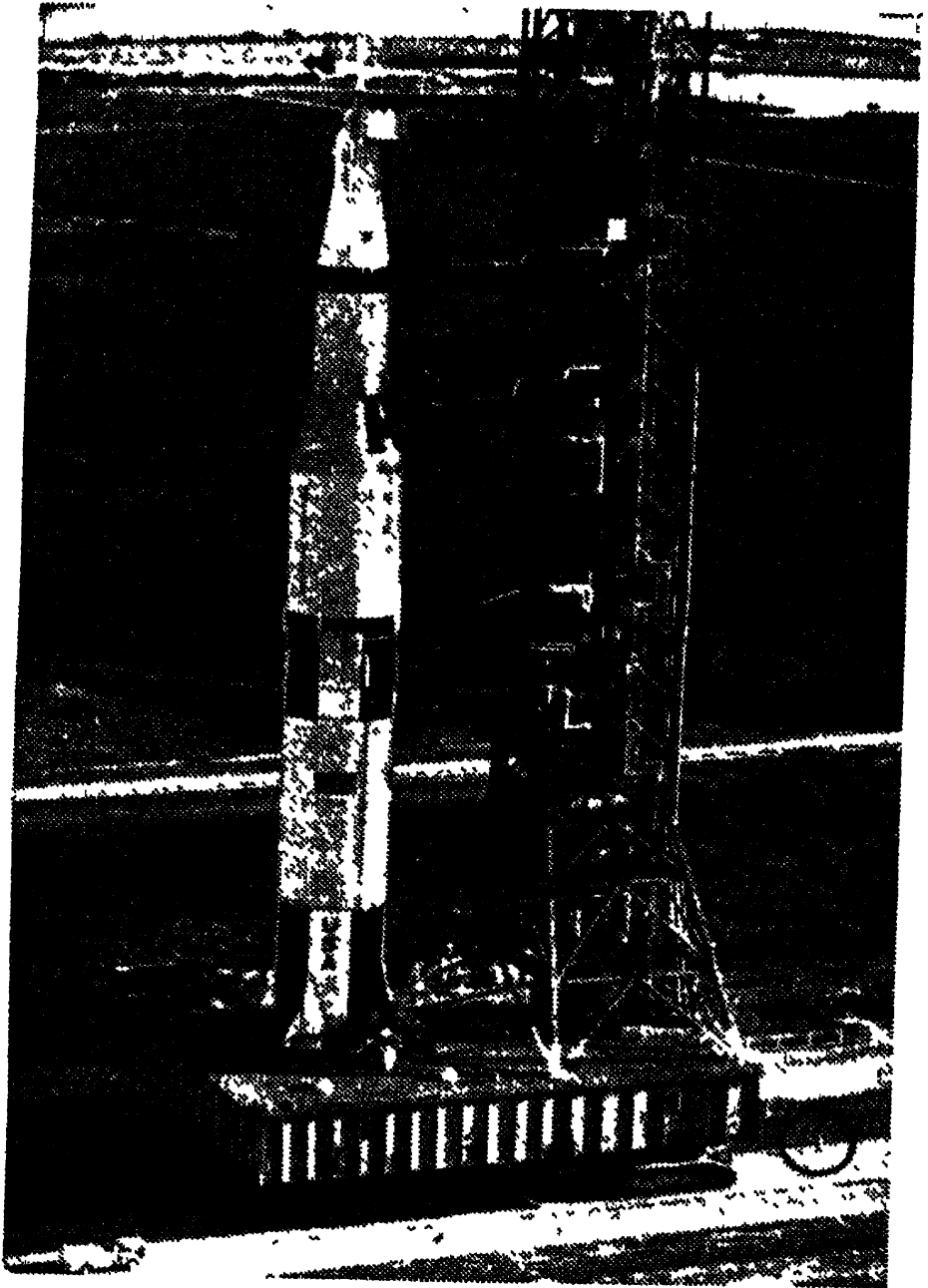
'চন্দ্র-রকেট' স্যাটার্ণ-৫

১১১ মিটার লম্বা এই বিরাট রকেটটির উপরের দিকে রয়েছে অ্যাপোলো-৪ স্পেসক্র্যাফট্। চাঁদে মানুষ পাঠিয়ে আবার তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থার প্রস্তুতি হিসেবেই পরীক্ষামূলকভাবে এই রকেটটি ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি থেকে চন্দ্রাভিমুখে উৎক্ষিপ্ত হবে।

করে দেখ

বিদ্যুতের খেলা

খুব সহজ উপায়ে বিদ্যুতের একটি খেলা দেখিয়ে তোমার বন্ধুদের অবাক করে দিতে পার। খাবার টেবিলের উপরেই খেলাটা দেখাতে পারবে। কিছু নুন নিয়ে টেবিলের উপর রাখ এবং আঙুল দিয়ে পাতলা করে বেশ কিছুটা ছড়িয়ে দাও। সেই নুনের উপর কিছুটা গোলমরিচের গুঁড়া ছড়িয়ে দিতে হবে। এবার বন্ধুদের বল—তাদের মধ্যে কেউ কোন সহজ উপায়ে নুন থেকে মরিচের গুঁড়াগুলি পৃথক করে দিতে পারে কিনা। হাতে করে নুন থেকে মরিচের গুঁড়া পৃথক করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু একটা সহজ উপায়ে অনায়াসেই এই কাজটা করা

যেতে পারে। আজকাল তোমাদের অনেকের পকেটেই চুল আঁচড়াবার ছোট্ট চিরুণী থাকে। এই রকমের একটা চিরুণী দিয়ে বেশ কয়েকবার চুল আঁচড়ে নাও; তাহলেই চিরুণীটার মধ্যে স্থৈতিক বিদ্যুতের সঞ্চার হবে। চিরুণীটাকে এবার নুন ও মরিচের গুঁড়ার মিশ্রণের কিছুটা উপরে ধরলেই দেখবে—হাল্কা মরিচের গুঁড়াগুলি লাফিয়ে উঠে চিরুণীর গায়ে লেগে যাচ্ছে। এই খেলাটা শীতকালেই খুব সুন্দরভাবে দেখানো যায়।

—গ—

উইপোকার কথা

ছোটবেলায় আমরা পড়েছি, "উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার, যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার।" উইপোকা মানুষ্য-সমাজে এমনই নিন্দিত প্রাণী! কিন্তু তারও যে আবার একটা আলাদা জগৎ আছে, যেখানকার নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি, যা আইনমাফিক চলছে, ক'জন মানুষই বা তার খবর রাখে?

উইপোকা পৃথিবীর আদিমতম প্রাণীদের অন্যতম। ২০০ মিলিয়ন বছর পূর্বের ফসিলে উইপোকার অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়। পিঁপড়ে, মৌমাছি, বোলতা—এরা সবাই উইয়ের তুলনায় আধুনিকতর। মাটির নীচে এক-একটি বিরাট কলোনীতে বহু আত্মীয়-পরিজন নিয়ে এদের বসবাস। এরা আশ্চর্যভাবে নিয়মানুগ—ঘড়ির কাঁটার মত এদের জীবনযাত্রা সময়ের সঙ্গে বাঁধা, কোন অলিখিত আইনের অনুশাসনে এদের পৃথিবী চলছে।

এক-একটি কলোনী বা উইঢিবি উচ্চতায় ১১-১২ ফুট বা তারও বেশী হতে পারে। পাড়াগাঁয়ের মাঠে-ঘাটে এমন উইঢিবি দেখা যায়, যা খুবই শক্ত—প্রায় সিমেন্টের গাঁথুনির মত হতে পারে। আমাদের দেশের পুরাকাহিনীতে আছে—রত্নাকর দস্যু যখন পাপকর্ম ত্যাগ করে তপস্যায় বসেছিলেন, তখন তাঁর চতুর্দিক ঘিরে উইপোকা বাসা বানিয়েছিল। রত্নাকর এই বল্মীকস্তূপের নীচে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তাই তাঁর নাম হয় বাল্মিকী।

সাধারণতঃ আমরা যেগুলিকে উইয়ের বাসা বলি, তা হলো দেয়ালের গায়ে বা কাঠের উপর মাটি-ঢাকা লম্বা লাইন। এগুলি কিন্তু উইয়ের বাসা নয়, তাদের চলাচলের পথ। এরা একবার মাটির নীচে প্রবেশ করলে আর সহজে বের হয় না। তাই খাবার খুঁজতে পথে বেরোবার দরকার হলে ওরা এই রকম মাটি-ঢাকা পথ তৈরি করে ও পর্দানশীন হয়ে বাইরে বেরোয়। ওদের বাসা সেকালের সাত-মহলা প্রাসাদের সঙ্গে তুলনীয়। কত শত প্রকোষ্ঠ, অলিন্দ ও সুড়ঙ্গপথ যে এক-একটি বাসায় আছে, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। অথচ সমস্ত বাসাটি সুব্যবস্থিত, মনে হয় যেন সুচিন্তিত পরিকল্পনায় তৈরি। যাতায়াতের জন্যে প্রধান রাস্তা বা রাজপথ একটি হলেও গলিপথ অনেক এবং সেগুলি বিশেষভাবে সুরক্ষিত। ঘরগুলি নানা ভাগে বিভক্ত—নার্সারি থেকে আরম্ভ করে স্টোর পর্যন্ত যাবতীয় ব্যবস্থা এতে বর্তমান। পরিচ্ছন্নতা রক্ষাও এদের অলিখিত আইনের একটি ধারা।

উইপোকা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাজা, রাণী ও কর্মী। কর্মীদলে আবার একটি উপদল থাকে। তাদের সৈনিক নামে অভিহিত করা হয়। উই-রাজার শুধু

জন্মদাতার ভূমিকা এবং রাণীর কাজ বংশবৃদ্ধি করা। অপর যা কিছু কাজ সবই কর্মীদের। খাদ্যসংগ্রহ, রাজা ও রাণীর খাদ্য সরবরাহ, দুর্দিনের জন্যে রসদ জমা করা, শিশুপালন, শত্রু-নিপাত ইত্যাদি সাংসারিক, সামাজিক বা দেশরক্ষার সব কাজ কর্মীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রাজতন্ত্র থাকলেও উইয়ের রাজ্যে রাজার কোনও ক্ষমতা নেই, কর্মীরাই সেখানে একমাত্র কর্মকর্তা।

মাটির নীচে উইয়ের ভাঁড়ার ঘরে অপর্যাপ্ত খাবার জমা থাকে। পচা, পোকা-ধরা কাঠ, মরা গাছের টুক্‌রা, ঘাসপাতা বাসায় নিয়ে এসে চিবোতে সুরু করে। চিবিয়ে চিবিয়ে পিণ্ডের মত হলে কিছু দিন ফেলে রাখে। ক্রমশঃ এগুলিতে ছাতা ধরে, তখন আবার সুরু হয় চিবোনো এবং ওগ্‌রানো—গরুর জাবর কাটার মত। এমনি করে ছত্রাকে ছত্রাকে ভরে যায় ঘরগুলি। এই হলো এদের প্রধান খাদ্য।

রাজা ও রাণীর নিজেদের খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা নেই। কর্মীরা কিন্তু এদের অতি যত্নে রাখে। বিশেষ করে, রাণীর ডিম পাড়বার ক্ষমতা যতদিন থাকে, উৎকৃষ্ট খাবারটি তার ভাগেই পড়ে। উই-রাণীর ডিম পাড়বার ক্ষমতাটাকেও কর্মীরা নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে রাখে—খাদ্যবস্তুর পরিমাণের তারতম্যের দ্বারা। ভালমন্দ খেয়ে এবং অতি যত্নে থেকে রাণীর দেহটি হয় উদরসর্বস্ব। উদরদেশ হয় সাধারণ উইপোকার তুলনায় অসম্ভব লম্বা আর মোটা। কিন্তু যেদিন রাণী ডিম পাড়া বন্ধ করে বা রোগে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, কর্মীরা তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করে নিজেদের ভোগে লাগায়; এমন মজুত খাদ্য তো আর বৃথা ফেলে রাখা যায় না!

কর্মী-উইদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই দেখা যায়, কিন্তু এদের সন্তানোৎ-পাদনের শক্তি নেই। উইপোকার ছয়টি পা, মাথার দুই দিকে শুঁড় আছে। রাজা ও রাণী ছাড়া আর কারো চোখ বা ডানা নেই। কিন্তু রাজা ও রাণীর চোখ এবং ডানা ওদের জীবনে একবার মাত্রই গজায়। বর্ষার প্রথম বৃষ্টির পর উই-প্রাসাদের রাজকুমার ও রাজকুমারীর বহির্গমনের জন্যে কর্মীরা প্রাসাদের সিংহ-দরজা খুলে দেয়। বছরে এই একবার মাত্রই ওরা দলে দলে বেরিয়ে পড়ে। কলোনীতে তখন রাজা ও রাণীর পুত্র-কন্যার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব—সকলকার জায়গা হয় না। তাছাড়া নতুন বাসা পত্তনেরও দরকার, তাই এদের বহির্যাত্রা। এই ব্যবস্থাও কিন্তু কর্মীদের কর্তৃত্বাধীনে। তারা ঠিক জানে কতজনকে বাইরে যেতে দিতে হবে। তারপরেই সিংহ-দরজায় চাবি পড়ে যাবে। রাজপরিবারের বংশধরদের এই সময়েই দুটি চোখের সঙ্গে সঙ্গে দুটি ডানাও গজায়। উড়তে উড়তে এরা বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু এদের এই যাত্রা বস্তুতঃ মরণ-যাত্রা। অন্ধকারের বাসিন্দারা দলে দলে গিয়ে আলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে' পুড়ে মরে, তাছাড়া পাখীতে খায়, অন্য পোকায় তাড়া করে—সাপ, ব্যাং, ইঁদুরের পেটে যায়। শেষ পর্যন্ত দু-চার জোড়া যা বেঁচে

থাকে, তারা নতুন বাসার পত্তন করে। আবার চলে সেই জীবনযাত্রার পুনরাবৃত্তি, মাটির নীচে গজিয়ে ওঠে সাতমহলা প্রাসাদ। আরও আশ্চর্য এই যে, যারা একদা নায়ক-নায়িকারূপে এই অভিযান সফল করে তুললো, তারাই পরিণত হয় ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীতে।

উইপোকার আর একটি শ্রেণীভেদ—সৈনিকদল। তাদের কাজ পাহারা দেওয়া ও প্রয়োজন হলে লড়াই করা। উইঢিবির অসংখ্য অলিগলির প্রবেশপথগুলি এরা সর্বদা রক্ষা করে। পিঁপড়ে উইপোকার পরম শত্রু। সারি সারি পিঁপড়ের দল আসে বাসা আক্রমণ করতে, কর্মীরা তখন ভিতরের দিকে সরে যায়। বেরিয়ে আসে এই সৈনিকদল, মরণপণ লড়াই করে। কর্মীরা ভিতর থেকে দেয়াল তুলে প্রবেশ-পথগুলি চটপট বন্ধ করে দেয়, আক্রমণ ব্যর্থ করবার উদ্দেশ্যে। সৈনিকদল বাইরেই পড়ে থাকে, পশ্চাদপসরণের প্রশ্ন ওঠে না, আদর্শ শহীদ তারা। দেহের গঠন এদের অদ্ভুত, মাথাটা অন্য উইদের তুলনায় অনেক বড়, চোয়ালের গঠন বীভৎস। একবার কামড়ে ধরলে আর ছাড়ান নেই, শরীরটা ছিঁড়ে দু-ভাগ হয়ে যাবে, তবু কামড় ছাড়ানো যাবে না। মাথার উপর একটা গ্ল্যাণ্ড আছে, দরকারমত তাথেকে ওরা বিষাক্ত গ্যাস ছাড়তে পারে। শত্রুকে ঘায়েল করবার জন্যে চোয়ালের মধ্য দিয়ে এই গ্যাস ওরা শত্রুর শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেও ছাড়ে না। কিন্তু এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এরা সম্পূর্ণভাবে কর্মীদের করতলগত। চোয়ালের এই অদ্ভুত গঠনের জন্যে কোন খাদ্যবস্তুই এদের মুখে নেবার উপায় নেই, প্রাণধারণের জন্যে এদের নির্ভর করতে হয় কর্মীদের উপর। কর্মীরা পরিপাক করা খাদ্য বের করে এদের সরবরাহ করে। তবেই এরা বেঁচে থাকে। এই সঙ্গে কর্মীরা সৈনিকদের সংখ্যাও নিয়ন্ত্রিত করে রাখে। একটি সাধারণ উইঢিবিতে পুরা উই-সংখ্যার দশ-শতাংশের বেশী কর্মী থাকে না, সংখ্যা বাড়লেই কর্মীরা খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। তাই বিদ্রোহের কোন আশঙ্কা নেই উইয়ের রাজ্যে।

উই-রাজত্বের জীবনধারার সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতা দেখলে মানুষের রাজ্যের অসংখ্য বিশৃঙ্খলার কথা মনে পড়ে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও ভোলা যায় না যে, মানুষ বুদ্ধিজীবী; কিন্তু পোকা যে, সে পোকাই—তার বুদ্ধির বালাই নেই।

পুষ্প মুখোপাধ্যায়

উদ্ভিদের যাদুকর

মানুষ নতুন জাতের প্রাণী সৃষ্টি করতে পারে নি বটে, কিন্তু এমন গাছপালা সে সৃষ্টি করেছে, আগে পৃথিবীতে যার কোন অস্তিত্বই ছিল না। আশ্চর্য মনে হলেও কথাটা সত্য। যুগান্তকারী এই কৃতিত্বের মূলে যে বিজ্ঞানীর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে, তিনি হচ্ছেন লুথার বার্বাঙ্ক। বিভিন্ন জাতের ফুলের সংমিশ্রণে এবং নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় বিচিত্র ধরণের নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে বার্বাঙ্ক বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়েছেন।

জীবনে বড় হবার প্রবল ইচ্ছা থাকলে কোন বাধাই যে মানুষের পথ রোধ করতে পারে না, বার্বাঙ্কের জীবন তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ১৮৪৯ সালের ৭ই মার্চ আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্স্ সহরে লুথার বার্বাঙ্ক জন্মগ্রহণ করেন। অদ্ভুত উদ্ভিদ-প্রীতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন ভবিষ্যতের এই উদ্ভিদের যাদুকর। তাঁর দিদিরা বলেছেন—কান্নাকাটির সময় ফুল হাতে পেলেই শিশু লুথারের কান্না থেমে যেত। একটু বড় বয়সে তাঁর খেলার একমাত্র সঙ্গী ছিল টবে বসানো একটি মনসা গাছ—যেখানেই যেতেন টবটি তাঁর সঙ্গ ছাড়া হতো না। গাছপালার প্রতি এত আকর্ষণ দেখে অভিভাবকেরা লুথারকে ভর্তি করে দিলেন ডাক্তারী পড়বার জন্যে। কলেজে জীববিদ্যা ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। কলেজে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে গাছপালা নিয়ে পরীক্ষাও তাঁর চলছিল পুরোদমে। লুথারের কাকার একটি মাঝারি রকমের কৃষিক্ষেত্র ছিল। যুবক লুথার অবসর সময় সেই খামার বাড়ীতেই কাটাতেন, গাছ নিয়ে। সকলের চোখের আড়ালে তাঁর এই প্রচেষ্টায় তিনি যে কতদূর সাফল্য লাভ করেছিলেন, তার প্রমাণ পেতে দেরী হলো না। কয়েক শ্রেণীর আলুর মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি এক প্রকার নতুন ধরণের গোলআলু সৃষ্টি করেন। এই জাতীয় সঙ্কর আলু আজও বার্বাঙ্ক পটেটো নামে পরিচিত। স্থানীয় এক ধনবান ব্যক্তির কাছে এই আলু উৎপাদনের পদ্ধতির স্বত্ব বিক্রয় করে লুথার বেশ কিছু অর্থলাভ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর।

এই সময়ে লুথারের দুই ভাই ব্যক্তিগত কারণে ক্যালিফোর্ণিয়ায় চলে যেতে বাধ্য হন। লুথার, দেখলেন গাছপালা নিয়ে শান্তিতে গবেষণা চালাতে হলে তাঁর পক্ষেও সেখানেই চলে যাওয়া সবদিক থেকে সুবিধা, কারণ তাঁর পরীক্ষা চালাবার জন্যে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, ক্যালিফোর্ণিয়ার উদ্ভিদবিলাসী ধনী ব্যক্তিদের সহায়তায় তার কিছুটা পাওয়া হয়তো বা সহজ হতে পারে। সুতরাং তিনি সেখানে চলে যাবার সঙ্কল্প করেন। অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে এই দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে তিনি যখন ক্যালি-ফোর্ণিয়ায় উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর হাতে সম্বল বলতে ছিল কয়েকটি বই, গোটা তিনেক জামা এবং মাত্র দশটি বার্বাঙ্ক পটেটো। সেখানে পৌঁছে কিন্তু তাঁর আর্থিক

অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠলো। উদ্ভিদ নিয়ে শান্তিতে গবেষণা চালানো তো দূরের কথা, দু-বেলা পেট চালানোই লুথারের কাছে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। সুতরাং তখনকার মত গবেষণা তুলে রেখে তাঁকে বেরোতে হলো খাদ্যের সন্ধানে। এই সময়ে পেটের দায়ে ছুতোরের কাজও তিনি করেছেন। তারপর একটা ছোট খামারে কাজ জুটলো বটে, কিন্তু সেখানেও একই সমস্যা—অর্থাভাব। এভাবে দীর্ঘ পাঁচ বছর শুধু মাত্র বেঁচে থাকবার জন্যে তাঁকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে, কিন্তু বিপদে ভেঙ্গে পড়বার মত লোক লুথার ছিলেন না। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও অটুট অধ্যবসায়কে সহায় করে মুখ বুজে সেই অসুবিধাগুলির বিরুদ্ধে তিনি অবিশ্রাম লড়াই করে গেছেন। এই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে একটা সুযোগ জুটে গেল। ১৮৮১ সালের মে মাসে সানফ্রান্‌সিস্‌কোর জনৈক ব্যবসায়ী মোটা অর্থের বিনিময়ে লুথারের খামার বাড়ীতে সে বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ২০ হাজার কুল গাছের চারা সরবরাহের অর্ডার দিয়ে গেলেন। হাতে সময় মাত্র ৭ মাস—প্রথমে কাজটা অসম্ভব মনে হলেও ভাগ্য পরিবর্তনের এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া করতে লুথার রাজী ছিলেন না। তাই পুরাদমে তিনি নানা পরীক্ষা সুরু করে দিলেন। তিনি দেখলেন, কুল গাছের চেয়ে অনেক দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায় বাদাম গাছ। সুতরাং বাদামের ডালে কুল গাছের কলম বাঁধলে নিশ্চয় তারও এমনি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি হবে। আর দেরী না করে লুথার বালির উপর বাদামের বীজ পুঁতে দিলেন এবং জুন মাসের মধ্যেই চারা পাওয়া গেল, যেগুলিতে নিজের আবিষ্কৃত এক নতুন পদ্ধতিতে তিনি কুল গাছের কলম বেঁধে দিলেন। তাতে অভাবনীয় সুফল পাওয়া গেল এবং নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই লুথার প্রয়োজনীয় সংখ্যক চারা সরবরাহ করলেন তাঁর ক্রেতাকে। এর ফলে অর্থের দিক দিয়েও যেমন লুথারের কিছু লাভ হলো, সেই সঙ্গে তাঁর নতুন ধরণের আবিষ্কারের কথাও ছড়িয়ে পড়লো আশেপাশের বড় সহরগুলিতে। এরপর ক্যালিফোর্ণিয়ার কাছে সান্টারোজায় বেশ কিছু জমি কিনে তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ইতিমধ্যেই এক ঘটনায় লুথার যেন রাতারাতি পৃথিবী-বিখ্যাত হয়ে ওঠলেন। ১৮৯৯ সালে আমেরিকার কৃষি কলেজ সম্মেলনের অধিবেশন বসেছিল সানফ্র্যান্‌-সিস্‌কোতে। সম্মেলনে আগত প্রতিনিধি ও কৃষি-বিশেষজ্ঞেরা বার্বাঙ্কের কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শনে আসেন। সেখানে তাঁর আবিষ্কৃত নতুন ধরণের ফুল, ফল এবং গাছ দেখে তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। দেশে ফিরে এই সব বিশেষজ্ঞেরা সেখানকার পত্র-পত্রিকায় বার্বাঙ্কের গবেষণার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ছবিসমেত শত শত প্রবন্ধ লেখেন। প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বেশী দেরী হলো না—কয়েক দিনের মধ্যেই অসংখ্য কৌতূহলী ব্যক্তি আসতে আরম্ভ করলেন বার্বাঙ্কের কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শনের জন্যে। সে সময় এমন

দিনও গেছে, যেদিন পাঁচ থেকে ছয় শত প্রশংসামুখর দর্শকের ভিড়ে জম-জমাট হয়ে উঠেছে তাঁর গবেষণা ক্ষেত্র।

এরপরের ইতিহাস বার্বাঙ্কের ক্রমাগত সাফল্যের গৌরবময় কাহিনী। তিনি যাতে নিরুদ্বেগে গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেন, সে জন্যে ওয়াশিংটনের কার্ণেগী ইনষ্টিটিউশন বার্ষিক দশ হাজার ডলার হিসেবে দশ বছরের জন্যে বার্বাঙ্ককে এক বৃত্তি দান করে। তাঁর অতি প্রিয় সাণ্টা রোজার কৃষিক্ষেত্রেই ১৯২৬ সালে ৭৭ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই কথা বললে বোধ হয় খুব ভুল হবে না যে, উদ্ভিদের যাদুকর বার্বাঙ্ক উদ্ভিদ-জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। এর আগে মানুষ যা কল্পনাও করতে পারে নি, বার্বাঙ্ক তাই পরিণত করেছেন বাস্তবে। কাঁটামুক্ত ক্যাকটাস, বীজহীন আঙ্গুর, দু-রঙা ডেইজী, আঁঠিশূন্য কুল, সুগন্ধী রঙীন বহু ডালিয়া, ঝাঁঝবিহীন পেঁয়াজ প্রভৃতি নতুন নতুন কত জিনিষ যে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার তালিকা দেওয়াও বেশ শক্ত। যে পদ্ধতিকে ভিত্তি করে বার্বাঙ্ক তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণা চালিয়েছেন, সেটিকে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে ডারুইনের বিবর্তনবাদেরই একটি উন্নতরূপ বলা যেতে পারে। বিবর্তনবাদের মতে, নানা প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে প্রাণীর দেহের আকারের পরিবর্তন ঘটে থাকে, অনুকূল পরিবেশে প্রাণিদেহের ক্রমোন্নতি দেখা যায়, আবার প্রতিকূল অবস্থায় তার আকৃতিতে এমন পরিবর্তনও আসতে পারে, যার ফলে একটা নতুন বিচিত্র প্রাণীর জন্ম হওয়াও অসম্ভব নয়। মধ্যবর্তী এক বা একাধিক স্তর লুপ্ত হয়ে যাবার ফলেই এমন ব্যাপার ঘটে থাকে। পরিবর্তনজনিত এই দৈহিক বৈশিষ্ট্য কি করে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, ডারুইনের মতবাদে তার তেমন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে দেখা গেছে, প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে এই আকস্মিক পরিবর্তন দু-রকমের—স্থায়ী ও অস্থায়ী। হঠাৎ বিচিত্র আকৃতি প্রাপ্ত গাছের বীজ থেকে যদি ঠিক সেই রকম বিচিত্র আকারেরই চারা পাওয়া যায়, তবে তাকে বলা হয় স্থায়ী পরিবর্তন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, সমজাতীয় গাছ থেকে কলম প্রথায় উৎপন্ন চারার আকৃতি বজায় রাখা শক্ত, বরং পরাগ-সংযোগ পদ্ধতিতে দুটি অসম উদ্ভিদের মিলন ঘটালে তাদের মধ্যে যে বিচিত্র পরিবর্তন আসে, সেটাই হয় স্থায়ী ও দৃঢ়। এই প্রক্রিয়ায় এক শ্রেণীর উদ্ভিদের পরাগ ভিন্ন আর এক শ্রেণীর উদ্ভিদের পরাগ কেশরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তবে ব্যাপারটা খুব সহজ নয়, কারণ কোন্ জাতীয় উদ্ভিদের দেহে কোন্ উদ্ভিদের সংযোগ ঘটালে এই স্থায়ী পরিবর্তন লাভ করা সম্ভব, তা অনেক হিসাব, অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির অপেক্ষা রাখে। বার্বাঙ্কের এই সবকয়টি গুণই ছিল, তাই নানা পদ্ধতিতে পরীক্ষা চালিয়ে তিনি বিচিত্র সঙ্কর উদ্ভিদ সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

মিনতি সেন

ইলেকট্রন টিউব

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কি—এ নিয়ে আমাদের নিশ্চয়ই মতানৈক্য থাকতে পারে, কিন্তু ইলেকট্রন টিউবের আবিষ্কার যে সবচেয়ে কার্যকরী, এই বিষয়ে আমরা সবাই একমত। এটির আবিষ্কার না হলে বেতার অনুষ্ঠান শোনা বা সবাক চলচ্চিত্র দেখা সম্ভব হতো না। এরকম কার্যকরী জিনিষটি কি করে আবিষ্কৃত হলো, এবার সে কথায় আসা যাক। ইলেকট্রন টিউব আবিষ্কারের মূলে আছেন ইংল্যাণ্ডের জন এমব্রোজ ফ্লেমিং এবং আমেরিকার লী ডু ফরেষ্ট।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বেতার-তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। এই সময় জার্মান বৈজ্ঞানিক হার্ৎস বেতার-তরঙ্গের মৌলিক গুণাবলী আবিষ্কার করেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফরেষ্ট তখন হার্ৎস বেতার-তরঙ্গের উপর পরীক্ষা করছিলেন। তাঁর কাজ ছিল এমন একটি যন্ত্র তৈরি করা, যা দিয়ে বেতার-তরঙ্গের উপস্থিতি ধরতে পারা যায়। এই সম্পর্কে এর আগেও কাজ হয়েছিল। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মার্কোনী কাচের টিউবে আলগা করে লোহার গুঁড়া ভরে এরকম একটি যন্ত্র বানিয়েছিলেন। কিন্তু এটি মোটেই স্পর্শকাতর ছিল না। এরপর ফ্লেমিং ১৯০৪ সালে ইলেকট্রন টিউব আবিষ্কার করেন। এটি একটি বায়ুশূন্য টিউব, যাতে দুটি পদার্থ—ফিলামেণ্ট ও প্লেট ছিল। ফিলামেণ্ট থেকে ইলেকট্রন প্লেটে প্রবাহিত হতো।

এখানে জানতে চাওয়া স্বাভাবিক যে, ইলেকট্রন টিউবে কি করে ইলেকট্রন-স্রোত প্রবাহিত হয়? আমরা জানি, পরমাণু তিনটি প্রধান কণিকার দ্বারা গঠিত। তা হলো ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। বস্তু থেকে বিভিন্ন উপায়ে ইলেকট্রন বিচ্যুত করা যেতে পারে। ইলেকট্রন বা ভ্যাকুয়াম টিউবে যেটি ব্যবহৃত হয়, তার নাম থারমিয়নিক বিচ্যুতি। যথেষ্ট পরিমাণ তাপ পেলে ইলেকট্রন বস্তুর উপরিভাগ থেকে বিচ্যুত হয়ে বাইরে চলে আসে। ইলেকট্রন নির্গমনের ক্ষমতা বিভিন্ন বস্তুর গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ টাংষ্টেন, থোরিয়েটেড টাংষ্টেন ও অক্সাইড আবৃত পদার্থ ফিলামেণ্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ফ্লেমিং-এর তৈরি টিউবে একটি মস্ত অসুবিধা ছিল। এর সাহায্যে সঙ্কেতকে জোরদার করা যেত না। ফরেষ্ট ফ্লেমিং-এর তৈরি টিউবটির গুণাগুণ পরীক্ষা করছিলেন। তিনি স্থির করলেন, এই টিউবটির কিছু পরিবর্তন করে এটিকে জোরদার করে তুলবেন। তাই ফিলামেণ্ট ও প্লেট ছাড়া অপর একটি পদার্থ তিনি এতে জুড়ে দিলেন। এই নব সংযোজিত পদার্থের নাম গ্রিড। এটি একটি জালের

ঢাক্‌নি, যার অবস্থান ফিলামেণ্ট ও প্লেটের মাঝখানে। গ্রিড-এর কাজ ইলেকট্রন-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা। ইলেকট্রন টিউবে একটি বিশেষ দিকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় বলে এর নাম ভাল্‌ভ। ফরেষ্ট-এর তৈরি টিউবে তিনটি মৌলপদার্থ আছে, তাই এর নাম ট্রায়োড ভাল্‌ভ্। অনুরূপভাবে ফ্লেমিং-এর তৈরি টিউবটি ডায়োড ভাল্‌ভ। ফ্লেমিং-এর তৈরি ট্রায়োড ভাল্‌ভকে প্রেরিত সঙ্কেত জোরদার করবার কাজে লাগিয়ে সুফল পাওয়া গেল। বর্তমানে আমরা যে রেডিও সেট ব্যবহার করি, তাতে সঙ্কেতকে ধরবার জন্যে ডায়োড এবং একে শক্তিশালী করবার জন্য ট্রায়োড টিউব ব্যবহার করা হয়।

ফ্লেমিং ও ফরেষ্টের তৈরি এই দু-রকম টিউব আবিষ্কারের ফলে গান বা যন্ত্র-সঙ্গীতকে বেতারে অনেক দূর পর্যন্ত প্রচারিত করা সম্ভব হলো। ১৯০৮ সালে প্যারিসে আইফেল টাওয়ারের উপর একটি বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। বেতারের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটিকে মার্সাই পর্যন্ত পাঠানো সম্ভব হয়েছিল।

ট্রায়োড টিউব আবিষ্কার ছাড়া অপর একটি বিষয়ে লী গু ফরেষ্টের অবদান উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে আমরা যে সবাক চলচ্চিত্র দেখি, এটি তাঁরই দান। শব্দ-তরঙ্গকে ছবির ফিল্মের মধ্যে ফটোর আকারে তিনিই সর্বপ্রথম ফুটিয়ে তোলেন।

জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রে আমরা যে শত শত ইলেকট্রন টিউব ব্যবহার করে থাকি, এই ইলেকট্রন টিউবের সবগুলিই ট্রায়োড নয়। এদের মধ্যে টেট্রোড ও পেন্‌টোড টিউবও আছে। এগুলিতে যথাক্রমে চারটি ও পাঁচটি মৌলপদার্থ থাকে। সঙ্কেতকে জোরদার করবার বেলায় ট্রায়োডের চেয়ে এদের ক্ষমতা বেশী। কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে প্রচুর টিউবের প্রয়োজন, তাই স্থানাভাববশতঃ এগুলির আয়তন দিন দিন ছোট করা হচ্ছে। ইলেকট্রন টিউব আবিষ্কারের বেশ কিছুদিন বাদে ট্র্যানজিস্টর আবিষ্কৃত হয় এবং এটি অনেক ক্ষেত্রে ইলেকট্রন টিউবের স্থান দখল করে নেয়।

শ্রীজয়ন্তকুমার মৈত্র

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। বসু-সংখ্যায়ন কি?

মনন বসু, কলিকাতা-৪

উঃ ১। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু কণিকার সমষ্টিগত আচরণ সম্বন্ধে যে বিধি উদ্ভাবন করেন, তাই বসু-সংখ্যায়ন নামে পরিচিত।

গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের দ্বারা আবিষ্কৃত গণিতের সাহায্যে বস্তুর বিভিন্ন ধর্ম ও আচরণ ব্যাখ্যা করবার সময় বস্তুর প্রতিটি কণার নিজস্ব পরিচিতি মেনে নেওয়া হয়। এই ব্যষ্টি গণিত দিয়ে গ্যাসের বিভিন্ন আচরণ ও বিকিরণ-ক্রিয়া ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক বিজ্ঞানীদের কাছে ব্যষ্টি গণিত প্রয়োগের অসুবিধা প্রকট হয়ে উঠলো। বিজ্ঞানীরা তখন সমষ্টি গণিতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ম্যাক্সওয়েল এবং ক্লসিয়াস গ্যাসের অণুর সমষ্টিগত আচরণবিধি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমষ্টির অঙ্ক প্রয়োগ করে বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্কও এক বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। গ্যাসের অণুর চেয়ে আরও অনেক ক্ষুদ্র হচ্ছে ইলেকট্রন, প্রোটন, আলফা, ফোটন, মেসন প্রভৃতি কণা। এদের আচরণ ব্যষ্টি গণিত দিয়ে ঠিকমত জানা যায় না। প্রত্যেকটির কিছু না কিছু ভিন্নতর ধর্ম থাকবেই। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ফোটন কণার সমষ্টিগত আচরণের তথ্য উদ্ভাবন করেন। এই সমষ্টি গণিতকেই বসু-সংখ্যায়ন বলা হয়। বসু-সংখ্যায়নের বিধি, ব্যষ্টি গণিতের বিধি থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। এই সংখ্যায়নে বিশেষ কোনও কণিকাকে চিহ্নিত না করে সমস্ত কণিকার সামগ্রিক আচরণকে চিহ্নিত করা হয়। সমষ্টিগত ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য উদাহরণের সাহায্যে ভালভাবে বোঝা যেতে পারে। যেমন, কোনও মেলার মধ্যে অত্যধিক ভীড়ে অনেক সময় বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয়। ভীড় না থাকলে বন্ধুরা পরস্পর একত্র হয়ে ঘুরেফিরে দেখে। কাজেই প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের অস্তিত্ব থাকে না। যেখানে বহুর সমাবেশ, সেখানে ব্যষ্টির আচরণের প্রাধান্য থাকে না—থাকে সমষ্টিগত বিধি।

টেবিলের উপর একটা বই রেখে বইটার কতগুলি ইলেকট্রন ও প্রোটন টেবিলের কাঠের কতগুলি ইলেকট্রন ও প্রোটনকে স্পর্শ করছে, তা বলা যায় না। এই অবস্থায় সমষ্টিগত বিধির প্রয়োজন। গরম হাওয়া বইছে বললে সমস্ত বাতাসের সমষ্টিগত আচরণের প্রাধান্যই বোঝায়, বাতাসের কিছু সংখ্যক অণুর তাপমাত্রা বেশী, তা বোঝায় না।

আইনষ্টাইন বসু-সংখ্যায়ন বিধি ব্যাখ্যা করে দেখান যে, কেবলমাত্র আলোক কণা

বা ফোটন কণার ক্ষেত্রেই নয়, বস্তু কণার সমষ্টিতেও বসু-সংখ্যায়ন বিধি কার্যকরী। বসু-সংখ্যায়নের সাহায্যে আইনষ্টাইন একক পরমাণুসম্পন্ন গ্যাসের কোয়াণ্টামবাদ উদ্ভাবন করেন। বস্তু সমাবেশের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বসু-সংখ্যায়ন প্রয়োগ করবার জন্যে আইনষ্টাইন এই বিধির সম্প্রসারণ করেন। এই সম্প্রসারিত সংখ্যায়নকে বসু-আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন বলা হয়। আচার্য বসু ১৯২৪ সালে তাঁর সংখ্যায়ন উদ্ভাবন করেন।

১৯২৬ সালে বিজ্ঞানী ফের্মি এবং ডিরাক অন্য এক ধরণের সংখ্যায়ন উদ্ভাবন করেন। যাকে ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন বলা হয়। দেখা গেছে যে, ফোটন, আলফা কণা, পাই অন, কে মেসন প্রভৃতি মৌলিক কণা বসু-সংখ্যায়ন বিধি মেনে চলে। এই জন্যে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামানুসারে এই সব কণাকে বোসন বলা হয়। ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি মৌলিক কণা ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন বিধি মেনে চলে। এদের তাই বলা হয় ফের্মিয়ন। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রত্যেকটি মৌলিক কণাই হয় বসু-সংখ্যায়ন নতুবা ফের্মি-সংখ্যায়ন মেনে চলবে।

আধুনিক বিজ্ঞানে বসু-সংখ্যায়নের বহুল প্রয়োগ সুবিদিত। তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। পাউলি উপপাদ্য এবং 'আদর্শ বসু গ্যাস' সম্পর্কে আইনষ্টাইনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা মিলে গড়ে উঠেছে নিম্ন-তাপমানসম্পন্ন পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্র।

শ্যামসুন্দর দে

বিবিধ

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী

১৫ই জানুয়ারী বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী অ্যাকাডেমিশিয়ান এ. আই. ওপারিন। এই উপলক্ষে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন অধিকর্তা ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসুর লিখিত ভাষণ পাঠ করা হয় এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বর্তমান অধিকর্তা প্রোফেসর এস. এম. সরকারও ভাষণ দেন। ১৫ই জানুয়ারী সকালে আলোচনা সভার চেয়ারম্যান ছিলেন প্রোফেসর পি. কে বসু। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল অর্গানিক মলিকিউল। বক্তৃতা দেন ডাঃ নিত্যানন্দ ও ডাঃ পি. ভট্টাচার্য এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডাঃ এস. সি. পাকড়াশি ও ডাঃ ডি. পি. চক্রবর্তী। ঐ দিন মধ্যাহ্নে আলোচনা সভার চেয়ারম্যান ছিলেন প্রোফেসর এ. আই. ওপারিন। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ম্যাক্রোমলিকিউল। বক্তৃতা দেন প্রোফেসর এস আর. পালিত এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ডাঃ ডি. চাটার্জী।

১৬ই জানুয়ারী সকাল নয়টায় আলোচনা সভার চেয়ারম্যান ছিলেন প্রোফেসর এস. কে. মুখার্জী। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ম্যাক্রো-মলিকিউল। বক্তৃতা দেন ডাঃ পি. জে, ভিথ্যাথিল ও প্রোফেসর জি. পি. তালওয়ার এবং আলোচনা করেন ডাঃ এ. ভাদুড়ী। ঐ দিন সকাল ১১টায় আলোচনা সভার চেয়ারম্যান ছিলেন প্রোফেঃ

এন. এন. দাশগুপ্ত। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ভাইরাস। বক্তৃতা দেন ডাঃ এস. মিত্র। আলোচনা করেন প্রোফেঃ ডি. পি. বার্মা। ঐ দিন মধ্যাহ্নে আলোচনা সভার চেয়ারম্যান ছিলেন প্রোফেঃ পি. এন. ভাদুড়ী। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সেল। বক্তৃতা দেন ডাঃ এ. কে. শর্মা, ডাঃ পি. এম. ভার্গব। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডাঃ এস. চাটার্জী ও ডাঃ ডি. এন. দে। ঐ দিন অপরাহ্নে আলোচনা সভার চেয়ারম্যান ছিলেন ডাঃ বি. মুখার্জী। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল Cell organelles। বক্তৃতা দেন প্রোফেঃ জে. জে. ঘোষ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডাঃ পি. কে. সরকার ও ডাঃ জে. রায়চৌধুরী।

১৭ই জানুয়ারী সকাল সাড়ে নয়টায় আলোচনা সভার চেয়ারম্যান ছিলেন প্রোঃ এস. সি রায়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল—সেল অর্গানেলস। বক্তৃতা দেন ডাঃ পি. মৈত্র ও প্রোঃ আর. কে. মিশ্র এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডাঃ এইচ. কে. দাস ও ডাঃ এস. ঘোষ। ঐ দিন সকাল সাড়ে দশটায় আলোচনা সভার চেয়ারম্যান ছিলেন ডাঃ ডি. এম. বসু। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল Coding & Information। বক্তৃতা দেন ডাঃ ও সিদ্দিকী এবং ডাঃ এইচ. পি. ঘোষ। ঐদিন মধ্যাহ্নে আলোচনা সভার চেয়ারম্যান ছিলেন প্রোঃ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল Development & Differentiation of the cell। বক্তৃতা দেন শ্রীআর. এল. ব্রহ্মচারী, ডাঃ এস. পি. সেন আর আলোচনা করেন প্রোঃ কানাই মুখার্জী।

শোক সংবাদ

বিজয়রতন মিত্র

চৌবেড়িয়া (বনগ্রামের) নীলদর্পণ-খ্যাত মিত্র পরিবারের বিজয়রতন মিত্র কয়েকদিন অসুস্থতার পর গত ২১শে জানুয়ারী রবিবার বেলা ১টায় কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৪ বৎসর। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগে আচার্য রায়ের সময় হইতে তিনি দীর্ঘকাল কর্মরত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি আচার্য রায় ও শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আসেন। তিনি নিজগ্রাম চৌবেড়িয়ায় সমস্ত রকম উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় উৎসাহী ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় হাসপাতাল, রাস্তা, সেতু, বিদ্যালয় ও ভিলেজ হল ইত্যাদি স্থাপনে উহা একটি আদর্শগ্রামে রূপান্তরিত হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের বিভিন্ন কাজে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া হোমিওপ্যাথি শিক্ষার প্রসারেও তিনি উদ্যোগী ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপক ও রেজিষ্ট্রারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

বিজয়রতন মিত্র

মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, বিধবা স্ত্রী ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের ৮নং ফরম
অনুযায়ী বিবৃতি :—

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২৯৪/২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

২। প্রকাশনের কাল—মাসিক

৩। মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, ২৯৪/২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৪। প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, ২৯৪/২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৫। সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতীয়, ২৯৪/২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, (বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান), ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৯

আমি, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

প্রকাশক—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা

তারিখ—৭-২-৬৮

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়
১৬, কুণ্ডু লেন, ফ্ল্যাট নং-৪
কলিকাতা-২৫

২। শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস
৩২/৮, চণ্ডীঘোষ রোড,
কলিকাতা-৪০

৩। শ্রীবিশ্বনাথ দাস
রাশিবিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড,
কলিকাতা-১৯

৪। অরুণকুমার রায়
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

৫। রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৫/৪, বালিগঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা-১৯

৬। প্রভাতকুমার দত্ত
৩৬বি, বকুলবাগান রোড,
কলিকাতা-২৫

পুষ্প মুখোপাধ্যায়
৩৯/৬, ব্রড স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৯

৮। মিনতি সেন
অবধায়ক/শ্রীপরেশনাথ সেন
মণ্ডলপাড়া, ব্যারাকপুর,
২৪ পরগণা

৯। শ্রীজয়ন্তকুমার মৈত্র
পি-১৮, গাঙ্গুলীবাগান রোড,
কলিকাতা-৪৭

৯। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স। বিজ্ঞান কলেজ,
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একবিংশ বর্ষ	মার্চ, ১৯৬৮	তৃতীয় সংখ্যা

কয়নানগর ভূমিকম্প—ডিসেম্বর, ১৯৬৭

সন্তোষকুমার রায়

এই সেদিন কয়নানগরকে ঘিরিয়া যে ভূমিকম্প ঘটিয়া গেল, তাহা একান্তই আকস্মিক।

ভূমিকম্প এক আকস্মিক বিপর্যয়। ভূমিকম্পে পীড়িত জনগণের দুঃখ ও আতঙ্কের পরিসীমা নাই। আমরা তাহাদের প্রতি সমবেদনা জানাই।

কিন্তু এই ভূমিকম্প কি সত্যই আকস্মিক?

এই ভূমিকম্পের রূপ

কয়নার ভূমিকম্পের স্বরূপ এখনও উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই সম্বন্ধে তথ্যাদি এখনও সংগৃহীত হইতে বাকী রহিয়াছে। বর্তমানে কিছু অপূর্ণ তথ্য হইতে ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নয়, তাহা সত্ত্বেও যে তথ্য-সম্ভার এখনই আমাদের কাছে আছে, তাহাকে পরীক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, আমরা জানিয়াছি যে, কয়না ভূমিকম্পের শক্তির মান ৭.৫। এই আপাতঃ নিরীহ সংখ্যাটির অর্থ এই যে, এই ভূমিকম্পে ১০২১ আর্গ পরিমাণ কর্মশক্তি ব্যয় হইয়াছে। ১,০০০, ০০০,০০০ ... ২১টি শূন্য পর্যন্ত যে সংখ্যা, তাহাতে এক বিরাট শক্তির কথা আমাদের মনে আসে—এত বিরাট যে, প্রায় অকল্পনীয়। ইহা বহু অ্যাটম বোমার শক্তির সমতুল্য।

দ্বিতীয়তঃ, সংবাদ-পত্রের সংবাদ অনুসারে

এই ভূমিকম্পের ব্যাপ্তি সামান্ত তো নয়ই, বরং অতি দূরপ্রসারী। সুরাট, উজ্জয়িনী, হায়দরাবাদ, বেলারী, গোয়া, বোম্বাই এই ভূমিকম্প পীড়িত ভূভাগের সীমা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এমন কি, এই ভূমিকম্প ৩৬০০ মাইল দূরে সুইডেনের ভূপৃষ্ঠের কোন বিপর্যয়সাধ্য নয়। ইহার ফোকাস (Focus) বা উৎস নিঃসন্দেহে গভীরে।
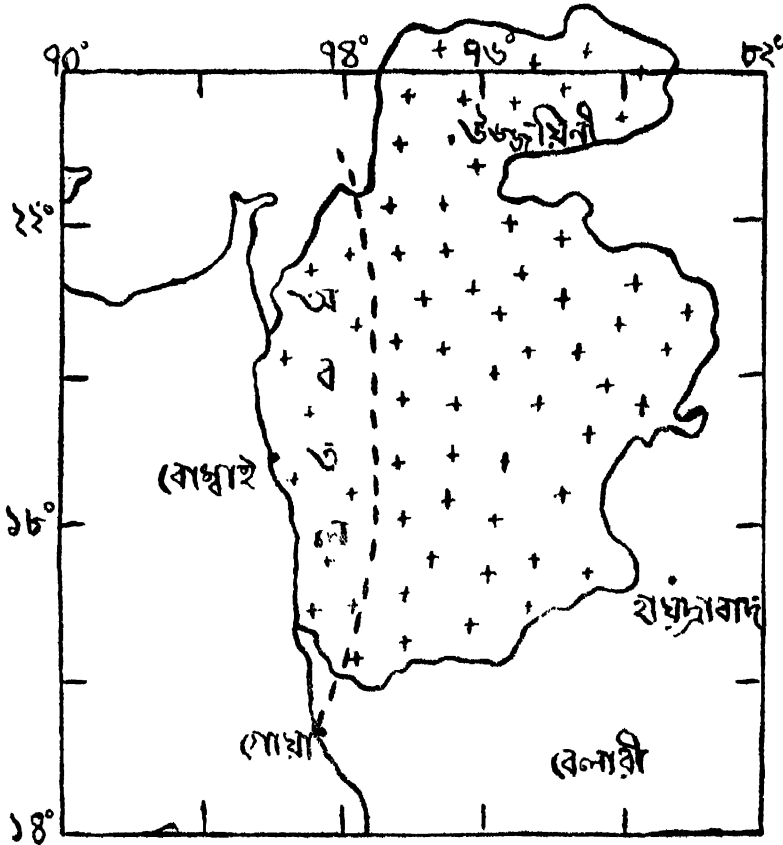
কয়না ভূমিকম্প-ক্ষেত্রের ভূবিদ্যা

ভারতীয় জিওলজিক্যাল সার্ভের দ্বারা প্রকাশিত ভারতবর্ষের ভূবিদ্যা ও টেক্টনিক (Tectonic)

১নং চিত্র

উপসালায় ধরা পড়িয়াছে—ভারতবর্ষ হইতে আগত প্রচণ্ড ভূকম্পন রূপে।

কয়নার ভূকম্পনকে আমরা তাই প্রধান ভূমিকম্পের একটি বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য। ইহার বিস্তৃতি ও ইহার প্রচণ্ডতা ভূত্বকের বা

ম্যাপ এবং ১৯৬৬ সালের নিখিল আপার ম্যান্টল প্রোজেক্টের তৃতীয় রিপোর্ট (Rep. 3. International Upper Mantle Project 1966) ও ভারতীয় আপার ম্যান্টল প্রোজেক্টের ১৯৬৭ সালের হায়দরাবাদ আলোচনা চক্রের

কার্য বিবরণী (Symposium on Upper Mantle Project of India 1967, Hyderabad) হইতে আমরা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পাই।

(১) কয়না ভূমিকম্পের পরিধির ঠিক উত্তরে কাম্বে অঞ্চলে উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিমবাহী প্রায় অসংখ্য বলিলেই হয়, ফাট ও ফল্ট (Fractures and Faults)* আছে। তাহার মধ্যে অনেকগুলি ভূমধ্যে ম্যান্টলের ভিতরে বহুদূর প্রসারিত এবং কতকগুলি বহু ভূবিদ্যা-যুগ ধরিয়া ঐখানে বর্তমান এবং মায়ো-প্লায়োসিন (Mio-pliocene) যুগের ভূ-সংক্ষোভে (Earth movements) পুরাতন ফাট ও ফল্টগুলি আবার উজ্জীবিত হইয়াছিল।

কঠিন ভূত্বকের (Crust) নীচে ম্যান্টল। প্রায় ১২৫ কিলোমিটার (৯০ মাইল) নীচে ম্যান্টলের অবস্থা তরলাবস্থার কাছাকাছি, কঠিন নয় এবং কাম্বের এলাকায় ম্যান্টল ভূপৃষ্ঠ হইতে মাত্র ১২-১৩ কিলোমিটার (প্রায় ৮ মাইল মাত্র) নীচে।

২নং চিত্র

(২) ভূমিকম্পের পরিধির মধ্যের ভূমি মুখ্যতঃ ডেকান ট্র্যাপ (Deccan trap) ব্যাসাল্ট প্রস্তরে গঠিত (চিত্র-১)। এই প্রস্তর কাম্বে উপসাগরের কাছে ১০,০০০ ফুট (প্রায় ৩ কিলো মিঃ) অপেক্ষা বেশী পুরু; মধ্যপ্রদেশে ইহা ১০০/১৫০ ফুটে পরিণত হইয়াছে (চিত্র-১)।

এই ডেকান ট্র্যাপ ব্যাসাল্ট অসংখ্য ফাট ও ফল্টে পূর্ণ। ফাট ও ফল্ট পশ্চিম উপকূলের সমান্তরাল, বোম্বাই শহরের দক্ষিণেও বহু দূর পর্যন্ত অবস্থিত।

(৩) কাম্বে অঞ্চলে বহু হোর্স্ট (Horst—ফল্টের দ্বারা বেষ্টিত উত্থিত ভূমি) আছে। সম্পূর্ণ কাম্বে অঞ্চল একটি গ্রাবেন (Graben—ফল্ট বেষ্টিত চ্যুত ভূমি) মাত্র। এই গ্রাবেনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার নীচে ম্যান্টেলের ভিতরের শক্তি হইতে। টেনশন এবং টরশন জাতীয়

---

*ফাট ফাটলমাত্র, ফল্ট-এ ফাটল ধরিয়া
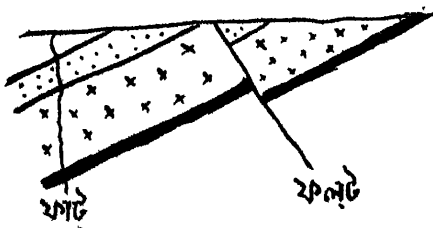
শিলাস্তর উপরে বা নীচে বা পাশে চ্যুত হয়। ফল্টকে তাই চ্যুতিও বলা হয়।

টান এবং মোচড়ের ফলেই এই প্রাবেনের জন্ম এবং যে শক্তি ভারতবর্ষের মালভূমি অংশকে ভূবিদ্যার জুরাশীয় (Jurassic) যুগ হইতে আজ পর্যন্ত ৩২ ডিগ্রী ঘুরাইয়া দিয়াছে, তাহারই সহিত কাম্বের বিবর্তন যুক্ত।

(৪) বোম্বাই হইতে হায়দরাবাদ প্রায় ৬০০ কিলোমিটার এবং উজ্জয়িনী হইতে বেলারী পর্যন্ত বিস্তৃত ডেকান ট্র্যাপ ব্যাসাল্ট যেন একটি বিরাট সুকঠিন ব্যাসাল্ট-পাথরের পাটাতন; উপর্যুপরি অন্ততঃ ১০০-১৫০ বার লাভা-স্রাব ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। মুখ্যতঃ উত্তর-দক্ষিণ

(৬) কয়নানগরের কাছে ব্যাসাল্টের নীচে কাড্ডাপা-বিন্ধ্য যুগের শিলাস্তর এবং তাহার নীচে আর্কিয়ান-শিস্ট স্তর (চিত্র-৪)।

আর্কিয়ান শিস্টভূমি মধ্যভারতের মালভূমি হইতে পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে আসিয়া উপকূলের সমান্তরালভাবে হঠাৎ নামিয়া গিয়াছে প্রান্তিক এক অবতলভূমি রূপে। বোম্বাই, কয়নানগর ও গোয়া এই প্রান্তিক ঢালের উপর অবস্থিত।

কয়নানগর অবস্থিত এই প্রান্তিক ঢাল (Marginal depression), কাড্ডাপা ভূমি ও ডেকানট্র্যাপ পাটাতনের সংযোগ-স্থলের
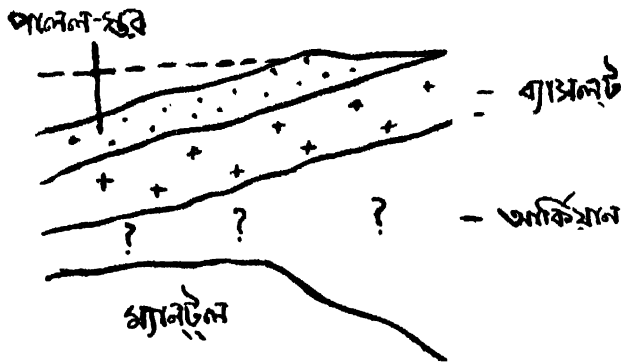
৩নং চিত্র

ও পূর্ব-পশ্চিমবাহী বহু লাভা-স্রাব একের উপর অপরটি পড়িয়া এই ডেকান ট্র্যাপ বাসল্ট পাটাতন গড়িয়া তুলিয়াছে (চিত্র-২)।

(৫) কাম্বে সুরাটের কাছে প্রায় ৪।৫ কিলোমিটার পুরু ব্যাসাল্টের উপর প্রায় ৩ কিলোমিটার পুরু পলল-শিলাস্তরে কাম্বে পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রের পেট্রোলিয়াম সঞ্চিত।

ডেকান ট্র্যাপের নীচে আর ৪ কিলোমিটার পর্যন্ত জানা নাই। সম্ভবতঃ সেখানে আর্কিয়ান যুগের রূপান্তরিত শিলাস্তর (Metamorphic schist rocks) এবং এই ১২।১৩ কিলোমিটারের নীচে ম্যাণ্টল (চিত্র-৩)।

উপরেই। নীচের আর্কিয়ান শিস্টগুলি প্রায় উপলম্ব বা খাড়া।

আলোচনা ও মীমাংসা

(ক) সুরাট, উজ্জয়িনী, হায়দরাবাদ, বেলারী, গোয়া, বোম্বাই রেখা কয়না ভূমিকম্পের পরিধির সঙ্গে প্রায় এক।

(খ) ডেকান ট্র্যাপ পাটাতন এক অনমনীয় কঠিন স্তর—ম্যাণ্টলের প্রায় অব্যবহিত উপরে অবস্থিত।

(গ) ভূমিকম্প-ক্ষেত্রের পশ্চিমাংশ আর্কিয়ান প্রান্তিক অবতলভূমির ঢালু প্রান্তের উপর অবস্থিত; সুতরাং অভিকর্ষের টানে চ্যুতিপ্রবণ।

সুতরাং এই মীমাংসা একান্ত যুক্তিসহ যে,

(১) সমস্ত কাম্বে অঞ্চল এবং তাহার দক্ষিণে গোয়া পর্যন্ত ম্যান্টলের একান্ত নিকটে, হয়তো মাত্র ২০।২৫ কিলোমিটার (১০।১৫ মাইল) উপরে। ম্যান্টলের বিরাট ঘূর্ণি (Vortices) সঞ্চরণ করিতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় এবং ম্যান্টলের ভিতর পদার্থ সঞ্চরণ (Convection current) তাই অতি স্বাভাবিক। প্রায় ১২৫ কিলোমিটার নীচে ম্যান্টল প্রায় তরল অবস্থায় আছে।

পেট্রোলিয়ামের জন্য আধুনিক কালে যে সমস্ত ছিদ্র (৮,০০০-১০,০০০ ফুট গভীর) করা হইয়াছে, তাহার দুই-একটি হইতে উচ্চ তাপ-বিশিষ্ট গ্যাস উৎসারিত হইয়াছিল। ক্রমাগত এই ছিদ্র করিবার ফলে অন্ততঃ সাময়িকভাবে নীচের চাপ কমিয়া গেলে এই অঞ্চলের শিলার মধ্যে ভারসাম্য ও তাহার নীচে ম্যান্টলের ভিতর ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়া একান্ত স্বাভাবিক মনে হয়।

ইহার ফলে ডেকান ট্র্যাপ পাটাতনটিতে
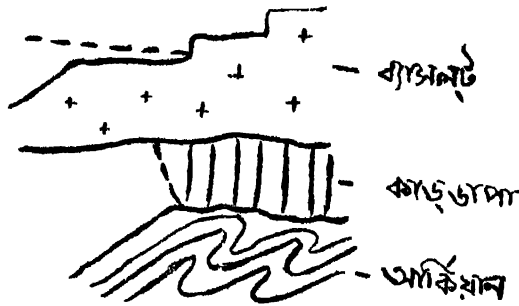
৪নং চিত্র

কাম্বে অঞ্চলে সুগভীর ম্যান্টল পর্যন্ত প্রসারিত ফাট ও ফল্ট, ঐ অঞ্চলের গ্রাবেনের ম্যান্টলের সহিত যোগ, দাক্ষিণাত্যের ৩২ ডিগ্রী ঘূর্ণনের সহিত যোগ, মায়ো-প্লায়োসিন যুগে ফাট-ফল্টের পুনরুজ্জীবন, ঢালের উপর অবস্থান—এই সমস্তই এই অঞ্চলকে অস্থিত অবস্থায় রাখিয়াছে।

১৯৬৩ সালে কয়নানগরে ঈষৎ ভূকম্পনের ইতিহাস আমরা জানিতেছি।

এতদিন ভূমিকম্প হয় নাই কেন, তাহার উত্তর বোধ হয় ডেকান ট্র্যাপ পাটাতন। এই বিশাল সুদৃঢ় পাটাতন নীচের সমস্ত অস্থিরতাকে এতদিন চাপিয়া আসিয়াছে, তাই ভূমিকম্প হয় নাই।

কম্পন উৎপন্ন হয় এবং তাহা দুলিতে থাকে। তাই ইহার প্রান্তভাগ জুড়িয়া ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়।

কয়নানগরের দুর্ভাগ্য এই যে,

(১) ইহা উপলম্ব বা খাড়া আর্কিয়ান শিস্টে গঠিত আর্কিয়ান অঞ্চলের ঢালের উপর অবস্থিত।

(২) ইহা ডেকান ট্র্যাপ, কাড্ডাপা-বিন্ধ্য ও আর্কিয়ান টেক্টনিক সংযুতির সন্ধিস্থলের ঠিক উপরেই অবস্থিত।

(৩) ইহা একটি আগ্নেয় অবতলের (Volcanic depression) কাছেই অবস্থিত। এই অবতলগুলি স্বভাবতঃই ধীরে ধীরে অবনমিত হইয়া থাকে।

(৪) সম্ভবতঃ ইহা ডেকান ট্র্যাপের অসংখ্য ফাট-ফল্টের সন্ধিতেও অবস্থিত।

তাই কল্পনাগর এতদূর বিধ্বস্ত।

আমার এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই সাময়িক, বর্তমানে লব্ধ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে গবেষণার কাজ হইতেছে, যে সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমি তাহার একাংশ মাত্র এখানে দিতে পারিয়াছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এখনও এই সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব প্রচারের কোনও ব্যবস্থাই ভারতে করি নাই। আমাদের জ্ঞান-সম্পদ থাকিয়াও নাই।

সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে আমার যুক্তি-গ্রন্থিগুলি আরও হয়তো সুদৃঢ় (বা হয়তো শিথিল) হইত।*

---

*এই বৎসর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনে ভূকম্প-আলোচনায় পঠিত।

মকরধ্বজের রহস্য

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাধারা সহজ সরল-ভাবে আয়ুর্বেদ নামে প্রচলিত। এক কালে তার প্রভা-প্রতিপত্তির অন্ত ছিল না। ইতিহাস পাঠকদের নিকট তার নজির অজানা নেই। দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারও ভারত আক্রমণকালে অতি শ্রদ্ধাভরে ভারতীয় চিকিৎসকের স্মরণ নিয়েছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আয়ুর্বেদের সে গৌরব-শিখা বুঝি আজ নির্বাণোন্মুখ। বহু যুগের পরীক্ষিত ও প্রশস্ত বলে প্রমাণিত যে কয়েকটি আয়ুর্বেদীয় ঔষধ এখনও জনসাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তাদের মধ্যে মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ, মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এরূপ কয়েকটি ঔষধের মধ্যে আয়ুর্বেদের লুপ্তপ্রায় শক্তিমত্তার পরিচয় আজও যেন কিছুটা প্রকট।

মুমূর্ষু রোগীকে শেষ সাহায্য দিতে এক চটি মকরধ্বজ মধু সহযোগে লেহনের ব্যবস্থা ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত। অনেক ক্ষেত্রে তার ফলে মুমূর্ষু নবজীবন লাভ করেছে, এমন কিছু কিছু ঘটনা এখনও ঘটতে দেখা যায়। ভারতবাসীর মনে মকরধ্বজের প্রতি বিশ্বাস এত প্রবল যে, পাশ্চাত্য মতে চিকিৎসা করেন, ভারতে এমন ডাক্তারকেও অনেক ক্ষেত্রে মকরধ্বজের ব্যবস্থা দিতে হয়। কি তেজের প্রভাবে মকরধ্বজ এমন অসাধ্য সাধন করে, সে জিজ্ঞাসা মনে জাগা স্বাভাবিক।

ইতিবৃত্ত

কে কখন মকরধ্বজের প্রবর্তন করেন, তা সঠিকভাবে জানা নেই। প্রাকৃতিক বিষয়ে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অজর ও অমর হবার সাধনা সুরু করে। তার অঙ্গরূপে প্রাচীন কাল থেকেই সর্বরোগহর ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা চলে এবং এরূপ চেষ্টার ফলেই বোধ হয়, প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকগণ মকরধ্বজ প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে রচিত বরাহমিহির তাঁর 'বৃহৎ সংহিতা' গ্রন্থে লৌহ ও পারদকে বলকারক পদার্থ হিসাবে ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। অনেকের ধারণা, সম্ভবতঃ অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে

নাগার্জুনই সর্বপ্রথম পারদ ও গন্ধক সম্মিলিত ভাবে ব্যবহারের প্রণালী প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রণীত রস রত্নাকর পুস্তকে পারদসহ দ্বিগুণ গন্ধকচূর্ণ রসামৃত চূর্ণ নামে একটি ভেষজের উল্লেখ দেখা যায়। দশম শতাব্দীতে বৃন্দ তাঁর পুস্তক সিদ্ধযোগে নাগার্জুন প্রবর্তিত এই ভেষজটির উল্লেখ করেন।

হিষ্ট্রি অব হিন্দু কেমিষ্ট্রি নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন যে, মকরধ্বজ চরক ও সুশ্রুতের আমলে জানা ছিল না; তন্ত্রযুগে রসেন্দ্র সার সংগ্রহ, রসেন্দ্র চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে রসসিন্দুর ও মকরধ্বজ নামে একটি ভেষজের সন্ধান পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা, মকরধ্বজের মধ্যে স্বর্ণকণিকা অনুপ্রবিষ্ট থাকে, সে জন্যে তা স্বর্ণসিন্দুর নামে পরিচিত। সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় চিকিৎসক ভাবমিশ্রের কাল ষোড়শ শতাব্দী থেকে মকরধ্বজের ব্যাপক ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রস্তুতি-কার্য

বিভিন্ন রসগ্রন্থে বিভিন্ন প্রণালীতে মকরধ্বজ প্রস্তুতের নির্দেশ পাওয়া যায়। আবার গ্রন্থবিশেষে বিভিন্ন অবস্থায় প্রস্তুত বিশেষ বিশেষ গুণবিশিষ্ট মকরধ্বজের উল্লেখ আছে। যেমন, অরহর মকরধ্বজ শোধিত তাম্র, সমগুণ মকরধ্বজ শোধিত রৌপ্য, স্বর্ণসিন্দুর মকরধ্বজ স্বর্ণ, দ্বিগুণ মকরধ্বজ দ্বিগুণ গন্ধক এবং ষড়্গুণবলি জারিত মকরধ্বজ ষড়্গুণ বলিজারিত পারদ সংযোগে প্রস্তুত হয়।

রসেন্দ্র চিন্তামণি গ্রন্থে উল্লেখ আছে, সমপরিমাণ গন্ধক দ্বারা মাড়িত (Killed) পারদ শতগুণ ক্ষমতা লাভ করে; দ্বিগুণ পরিমাণ গন্ধকে মাড়িত পারদ কুষ্ঠ নিবারণ করে; তিনগুণ পরিমাণ গন্ধকে মাড়িত পারদ মানসিক দৌর্বল্য দূর করে; চারগুণ পরিমাণ গন্ধকে মাড়িত পারদ পক্ককেশ ও আকুঞ্চন রেখা (Wrinkles) অপসারিত করে; পাঁচগুণ পরিমাণ গন্ধকে মাড়িত পারদ যক্ষ্মা নিরাময় করে এবং ছয়গুণ পরিমাণ গন্ধকে মাড়িত পারদ (ষড়্গুণবলি জারিত মকরধ্বজ নামে প্রচলিত) মানুষের যাবতীয় রোগের অব্যর্থ মহৌষধরূপে কাজ করে।

মোটামুটিভাবে মকরধ্বজ এভাবে প্রস্তুত করা হয়—স্বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম পাতের সঙ্গে পারদ মিশ্রিত করে একটি খলের মধ্যে মেড়ে পারদ-বন্ধন বা অ্যামালগাম (Amalgam) তৈরি করা হয়। পরে গন্ধকচূর্ণ দিয়ে অ্যামালগামটিকে ভালভাবে মাড়া হয়। প্রাপ্ত পদার্থটি এবার ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ায় পাতিত করলে মকরধ্বজ পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা, স্বর্ণের সংস্পর্শে পারদের মধ্যে অত্যধিক মাত্রায় রোগ-নিরাময় ক্ষমতা অনুপ্রবিষ্ট হয়। আবার অনেকের মতে, যেমন—রসপ্রদীপ গ্রন্থে দেখা যায় যে, স্বর্ণের প্রভাব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে এবং স্বর্ণের ব্যবহার বর্জন করতে বলা হয়েছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই বিষয়ে যে সব তথ্য আহরণ করেন, সেগুলির মধ্যে এগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ঠিক কত ভাগ পারদ কত ভাগ গন্ধকের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে সম্মিলিত হয়, সম্ভবতঃ তন্ত্রযুগে তা সঠিকভাবে জানা ছিল না। সে জন্যে বিভিন্ন মাত্রায় পারদ ও গন্ধক মিশ্রিত করবার রীতি লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে রাসায়নিক গণনায় জানা গেছে যে, কেবলমাত্র পঁচিশ ভাগ পারদই চার ভাগ গন্ধক সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ তার সঙ্গে রাসায়নিকভাবে সম্মিলিত হতে পারে। যদি কোন প্রণালীতে অতিরিক্ত পরিমাণ পারদ কি গন্ধক থেকে যায়, সেটুকু ঊর্ধ্বপাতনের সময় উবে যায় এবং অতি সূক্ষ্ম স্বর্ণকণিকা পাত্রের তলদেশে পড়ে থাকে। ঊর্ধ্বপাতিত হলে উজ্জ্বল

লোহিতাভ বাদামী রঙের যে দানাদার অংশ পাওয়া যায়, তাই হচ্ছে মকরধ্বজ। বিজ্ঞানীদের মতে, তার রাসায়নিক সঙ্কেত HgS ও তার রাসায়নিক নাম মারকিউরিক সালফাইড। আচার্যদেবের মতে, এইরূপ মকরধ্বজের মধ্যে লেশমাত্রও স্বর্ণও খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে অনেকের মত তাঁরও ধারণা, পারদ ও গন্ধকের মধ্যে রাসায়নিক মিলনের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম স্বর্ণকণিকা ক্যাটালিষ্ট বা অনুঘটক হিসাবে কাজ করে থাকে।

আয়ুর্বেদজ্ঞ অনেকের মতেও স্বর্ণ মকরধ্বজের সঙ্গে মিশ্রিত হয় না। কিন্তু যাঁদের ধারণা এর বিপরীত, তাঁদের মতে, স্বর্ণের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁদের অভিমত, কার্পাস পাতার রস বা সেঁকো বিষ সহযোগে পারদকে বুভুক্ষিত করলে ঐ পারদ স্বর্ণ গ্রাস করে অর্থাৎ স্বর্ণের সঙ্গে সম্মিলিত হয়।

প্রস্তুতের প্রণালীভেদে মকরধ্বজ সাধারণতঃ এই কয়টি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত :—স্বর্ণের সংস্পর্শ ছাড়া প্রস্তুত মকরধ্বজ সচরাচর রসসিন্দুর এবং স্বর্ণের সংস্পর্শে ছয় ভাগ গন্ধকে মাড়িত পারদ থেকে প্রস্তুত মকরধ্বজ আখ্যা পায়। স্বর্ণের সংস্পর্শে ছয় ভাগ গন্ধকে মাড়িত পারদ থেকে প্রস্তুত মকরধ্বজ যে ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ নামে পরিচিত, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। গন্ধক অর্থে এখানে বলি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। পর পর শত পাকের মকরধ্বজ থেকে উদ্ধৃত পারদ ও গন্ধকের সংমিশ্রণে একাধিক যন্ত্রে পাকের দ্বারা প্রস্তুত মকরধ্বজ সিদ্ধ মকরধ্বজ নামে পরিচিত। বার বার পাতনের ফলে সর্বপ্রকার মল পরিত্যক্ত হয়ে অতি বিশুদ্ধ মকরধ্বজ পাওয়া যায় বলে তা সকল প্রকার রোগে সহজে সিদ্ধি দান করে। এজন্যেই হয়তো এর নাম সিদ্ধ মকরধ্বজ হয়ে থাকবে।

প্রয়োগ

বয়স অনুসারে নির্দিষ্ট মাত্রায় (সচরাচর ½ রতি থেকে ½ রতি পরিমাণ; ১ রতি ২ গ্রেণের সমতুল্য) সকল রোগেই অনুপানভেদে চিকিৎসকদের উপদেশ মত মকরধ্বজ প্রয়োগ করা যায়। রোগীর হিমাঙ্গ অবস্থায় সাধারণ নির্দিষ্ট মাত্রার দ্বিগুণ পরিমাণ সেবনীয়। সে ক্ষেত্রে আশু ফল লাভের জন্যে উৎকৃষ্ট মৃগনাভির (কস্তুরি) সঙ্গে মিশ্রিত করে প্রযোজ্য। সাধারণতঃ যে সকল (বিভিন্ন) অনুপান সহযোগে মকরধ্বজ ব্যবহারের ব্যবস্থা দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা হলো।

বায়ুরোগ ও বাতিকজ্বরে—ধনে ভিজানো জল অথবা শতাবরী, আমলকী, গাম্ভারী ফল, আঙ্গুর, বেদানা, নিসিন্দা পত্র, গুলঞ্চ প্রভৃতির মধ্যে কোন দ্রব্যের রস ও মধু।

পিত্তরোগ ও পৈত্তিক জ্বরে—পলতা বা ক্ষেত পাপড়ার রস বা চিরেতা ভিজানো জল, রক্তচন্দন ঘষা ও মধু।

কফরোগ ও কফজ জ্বরে—আদার রস বা তুলসী পাতার রস বা কণ্টিকারীর রস বা শুঁঠ ও পিপুল চূর্ণ কিংবা পানের রস ও মধু।

অম্লপিত্ত ও অম্লশূল রোগে—ডাবের জল ও মধু।

কৃমি রোগে কচি আনারসের পাতার রস বা পলিধার রস ও মধু অথবা বিড়ঙ্গ চূর্ণ ও মধু।

মধুমেহ বা ডায়াবেটিস রোগে—ডুমুরের রস কিংবা তেলাকুচা পাতার রস ও মধু।

অনিদ্রা ও চিত্তচাঞ্চল্যে—জটামাংসী ভিজানো জল কিংবা শুশুনি শাকের রস ও মধু।

হৃদ্‌রোগে—অর্জুন ছালের রস, গব্যঘৃত ও মধু কিংবা শ্বেত বেড়েলার রস ও মধু।

যক্ষ্মায়—মুক্তাভস্ম বা প্রবালভস্ম, বাসক পাতার রস ও মধু।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, অনুপানের মধ্যে সর্বক্ষেত্রেই মধু অবশ্য সংযোজনীয়। প্রচলিত মাত্রার অল্পতার বিশেষত্বও লক্ষণীয়। পারদ-ঘটিত অন্যান্য সকল ঔষধের মত মকরধ্বজ অল্প মাত্রায় প্রয়োগেই অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা দ্রুত ও অধিক ফলপ্রদ। আয়ুর্বেদজ্ঞগণ সাধ্যরোগেই (Curable discases) অপরাপর ঔষধের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন ; কিন্তু অসাধ্য রোগেও মকরধ্বজের ব্যবহার লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সে জন্যে মকরধ্বজ সর্বপ্রকার ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে কথিত।

সক্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান

পারদঘটিত ঔষধ শরীরে শোষিত হয়ে কার্য করে। তার প্রমাণ, উক্ত ঔষধ সেবনের পর লালা, ঘর্ম, পিত্ত ও প্রস্রাবাদি শরীরস্থ রসের রাসায়নিক পরীক্ষায় তা প্রকাশ পায়। তাছাড়া সেবন-কালে শরীরে কোন স্বর্ণালঙ্কার থাকলে পারদ সহযোগে অনেক সময়ে তা শ্বেতবর্ণ হয়ে যায় বলে শোনা গেছে।

ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস একবার এক আয়ুর্বেদ সভায় এইরূপ এক ঘটনা বিবৃত করেন। ডাক্তার নীলরতন সরকারের জনৈক আত্মীয়ের কলেরা হয়। ডাক্তারী ঔষধে কোন ফল পাওয়া যাচ্ছিল না বরং রোগী মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হন। তখন ডাক্তার সরকার রোগীর উত্তেজনা বিধানের জন্যে মকরধ্বজ প্রদান করেন। রোগীটিও ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করেন। মকরধ্বজ সেবনের পর তদানীন্তন কৃতবিদ্য ইংরেজ ডাক্তার লিউকিচ রোগীকে দেখতে আসেন। ডাক্তার সরকার তাঁকে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র পর্যবেক্ষণ করতে দেন। ডাক্তার লিউকিচ নিরীক্ষণ করে বলেন, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে একটি কোষ (Cell) এবং কোষের মধ্যে নীলরঙের কতকগুলি বিন্দু দেখা যাচ্ছে। ডাক্তার সরকার ডাক্তার লিউকিচকে জানান যে, রোগীকে মকরধ্বজ সেবন করানো হয়েছিল ও পরে মলের ভিতর থেকে আহরণ করে কোষটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রাখা হয়েছে। এথেকে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, মকরধ্বজের আয়নিক (Ionic) ক্রিয়া আছে। সে জন্যে মকরধ্বজ প্রদান মাত্র তৎক্ষণাৎ তা শরীরের কোষগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট হয় ও কাজ করতে থাকে।

সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ তথ্যাদি থেকে প্রকাশিত হয়েছে যে, অতি ক্ষীণ মাত্রায় প্রাণী-তন্তুর (Animal tissues) উপর পারদের আয়নের (তড়িদাহিত পরমাণু, Mercury ion) সুনির্দিষ্ট উত্তেজক প্রভাব আছে। একথা ডাক্তার চোপরা তাঁর সুবিখ্যাত ইণ্ডিজেনাস ড্রাগস অব ইণ্ডিয়া নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি আরও জানান যে, খরগোস, কুকুর ও মানুষের শরীরে অল্পমাত্রায় পারদ প্রয়োগ করলে রক্তের লোহিত কণিকার সংখ্যা, দেহের ওজন ও সাধারণ পুষ্টি বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। অপরপক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করলে বিপরীত ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়—রক্তের লোহিত কণিকার সংখ্যা ও দেহের ওজন হ্রাস পেতে থাকে। বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ায় উল্লিখিত আছে যে, পারদঘটিত ঔষধগুলি অতি দ্রুত শরীরে শোষিত হবার ফলে দেহতন্তুর পক্ষে হিতকর মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে। এটা হয়তো খুবই সম্ভব যে, মকরধ্বজ অদ্রবণীয় পদার্থ; সে জন্যে পাকাশয়ের রসের প্রভাবে কেবলমাত্র সেটুকু পরিমাণে তা শোষিত হয়, যেটুকু পরিমাণে পারদের আয়ন দেহতন্তুর উত্তেজনার পক্ষে যথেষ্ট। তদপেক্ষা অধিকমাত্রায় শোষিত হয় না এবং এভাবেই মকরধ্বজ সক্রিয় হয়। তবুও ডাক্তার চোপরা কোনরূপ সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে

আরও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন বোধ করেন।

ভাবী আভাস

স্বভাবজাত হিঙ্গুল (Cinnabar) ও মকরধ্বজ রাসায়নিক বিচারে মারকিউরিক সালফাইড হিসাবে অভিন্ন। তথাপি মকরধ্বজ প্রয়োগে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, হিঙ্গুলে সাধারণতঃ সেরূপ ফল হয় না বলে শোনা গেছে। তাছাড়া প্রস্তুতের প্রণালীভেদে মকরধ্বজের ফলের তারতম্য হতে দেখা গেছে। স্বর্ণ সংস্পর্শবিহীন রসসিন্দুর ও স্বর্ণ সন্নিধানে পাক করা স্বর্ণসিন্দুরের ফল এক প্রকার হয় না। এরূপ তারতম্যের হেতু কি? প্রকৃতিতে অনেক সময় দেখা গেছে যে, একই যৌগিক পদার্থ বিভিন্ন স্ফটিকাকারে বিরাজ করছে। এমন ব্যাপারকে বহুরূপিতা বা Polymorphism এবং পদার্থটিকে বহুরূপী বা Polymorphous বলা হয়। পারদঘটিত মারকিউরিক আয়োডাইড দুই রূপে বর্তমান; একটি হরিদ্রাভ ও অপরটি লোহিতাভ। সিলিকন ডাইঅক্সাইড, কোয়ার্টজ, বালুকা প্রভৃতি রূপে প্রকৃতিতে বিরাজ করে। বিবিধ রূপের জন্যে এক্ষেত্রে সাধারণতঃ বর্ণের ভেদ পরিলক্ষিত হয় না। হিঙ্গুল, রসসিন্দুর ও স্বর্ণসিন্দুরের মধ্যে এরূপ বহুরূপিতা গোপনে কাজ করছে কি? পারদ ও গন্ধক মিশ্রিত করলে প্রথমে কৃষ্ণাভ ও পরে বেশীক্ষণ মেড়ে কিছু উত্তপ্ত করলে লোহিত বর্ণ ধারণ করে। পারদঘটিত দ্রবীভূত কোন লবণের মধ্যে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস পরিচালিত করলে মারকিউরিক সালফাইড উৎপন্ন হয়। প্রথম দিকে অধঃক্ষেপ (Precipitate) সাদা, পরে ক্রমে ক্রমে হল্‌দে, বাদামী, লোহিত এবং পরিশেষে কালো অবস্থায় পাওয়া যায়। কালো অধঃক্ষেপটি ছেঁকে ঊর্ধ্বপাতিত করলে লোহিত মারকিউরিক সালফাইড পাওয়া যায়। ফস্‌ফরাস শ্বেত ও লোহিত এই দুইরূপে বর্তমান। আবদ্ধ পাত্রে নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের মধ্যে শ্বেত ফস্‌ফরাস সামান্য পরিমাণে আয়োডিনের সংস্পর্শে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে লোহিত ফস্‌ফরাসে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে আয়োডিন অনুঘটকের কাজ করে। স্বর্ণের সান্নিধ্যে প্রস্তুত স্বর্ণসিন্দুরের বিশেষ তেজ এবং গুণাবলীও কি এইভাবে প্রভাবিত হয়? শ্বেত ও লোহিত ফস্‌ফরাসের অনেক ধর্ম ও আচরণ বিভিন্ন। অক্সিজেন এবং ওজোন মূলতঃ অক্সিজেনের দুটি পৃথক রূপ সত্য, কিন্তু ওজোন অক্সিজেন অপেক্ষা অনেক বেশী তেজসমন্বিত। সুতরাং রসসিন্দুর ও স্বর্ণসিন্দুরের আচরণে তারতম্য ঘটলে বিস্মিত হবার কি কারণ থাকতে পারে?

দেহের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত ভাঙ্গা-গড়ার কাজ চলছে। ভুক্ত আহার্য দ্রব্য পরিপাকে নানাবিধ রাসায়নিক রূপান্তর ঘটে। প্রধানতঃ আহার্য দ্রব্যের বৃহৎ ও জটিল অণুগুলি যেমন একদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুতে বিশ্লিষ্ট হয়, অপর পক্ষে বিশ্লিষ্ট অণুসমূহ থেকে দেহের চাহিদামত পদার্থের অণু রচিত হতে থাকে। শর্করা জাতীয় যে কোন পদার্থ পরিপাকের ফলে সাধারণতঃ গ্লুকোজ অণুতে বিশ্লিষ্ট হয়। প্রোটিন পদার্থের পরিপাকে যে সকল অ্যামিনো অ্যাসিড বিশ্লিষ্ট হয়, সেগুলির পুনর্বিন্যাসে দেহের উপযোগী নতুন প্রোটিন রচিত হয়। ফ্যাটজাতীয় খাদ্যের গতিও অনেকটা এরূপ। এই সকল রাসায়নিক রূপান্তরের সময়ে শক্তি নিঃসৃত বা শোষিত হয় এবং মোটামুটি শক্তি বিনিময় ঘটে। এই সকল ব্যাপারকে বিজ্ঞানীরা বিপাক বা মেটাবলিজম বলেন। খাদ্যবস্তুর প্রকার-ভেদে শর্করা, ফ্যাট ও প্রোটিন জড়িত বিপাক যথাক্রমে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন বিপাক বা মেটাবলিজম নামে পরিচিত। দেহের অভ্যন্তরস্থ প্রোটিন পদার্থে গঠিত

জৈব অনুঘটক বা এনজাইম এই সব রাসায়নিক রূপান্তর সম্ভব করে এবং ফলে যথাবিহিত শক্তি বিনিময় ঘটতে পারে ও দেহের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকে মনে হয়। সালফহাইড্রিল এনজাইম (Sulphhydryl enzyme) নামে পরিচিত জৈব অনুঘটক কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন মেটাবলিজমের সঙ্গে অতি নিবিড়ভাবে জড়িত। পরীক্ষায় প্রকাশ যে, মারকিউরিক আয়ন এই এনজাইমের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং অতি ক্ষীণমাত্রায় ($১০^{-৫}$ এম মারকিউরিক ক্লোরাইড—যা আয়ুর্বেদে রসকর্পূর নামে পরিচিত, অর্থাৎ ১ লিটার পরিমাণ তরল পদার্থে দ্রবীভূত মারকিউরিক ক্লোরাইডের ২৭১ গ্র্যামের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্রায়) মারকিউরিক আয়ন সালফহাইড্রিল এনজাইমের কার্যকারিতা শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ হারে ব্যাহত করে। সালফহাইড্রিল এনজাইমের আর্দ্রবিশ্লেষণ (Hydrolysis) ও জারণ ক্রিয়া (Oxidation) সম্পাদনের ক্ষমতা বর্তমান। এই প্রশ্ন জাগে যে, সালফহাইড্রিল এনজাইমের আর্দ্রবিশ্লেষণ ও জারণ ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষমতা মকরধ্বজ অণুর সান্নিধ্যে বা সংস্পর্শে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কি না এবং দেহে দ্রুতগতিতে শক্তি সঞ্চার এই ভাবেই হয়তো ঘটে।

জনপ্রিয়তার খাতিরে বেঙ্গল কেমিক্যাল অণুমকরধ্বজ নামে অতি সূক্ষ্মভাবে চূর্ণীকৃত মকরধ্বজ ট্যাবলেট আকারে প্রবর্তন করেছে। এরূপ ট্যাবলেট কয়েকটি সেবনে যে ফল হয়, তদপেক্ষা অল্পমাত্রায় মকরধ্বজ খলে মেড়ে মধু সহযোগে সেবন করলে বেশী ফল হয়। এরূপ কথা অভিজ্ঞ ও পারদর্শী কবিরাজগণের নিকট থেকে শোনা গেছে। সম্ভবতঃ মধুর প্রয়োগে এই তারতম্য ঘটে থাকে। আয়ুর্বেদের মতে, মধু যোগবাহী পদার্থ। মধু সে জন্যে মকরধ্বজের গুণসমূহ সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করতে পারে। মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করে খলে মাড়বার ফলে মকরধ্বজ ও মধুর মধ্যে এমন একটা সংযোগ ঘটে, যার ফলে মকরধ্বজের সক্রিয়তা হয়তো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দুধ থেকে ঘি খেলে যে ফল, তদপেক্ষা বেশী ফল দুধ সেবন করলে, তা অনেকেরই জানা। দুধে ফ্যাট বিন্দু বিন্দু আকারে তরল জলের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ অবস্থায় থাকে, যাকে বলা হয় ইমালসন। আর ঘি হচ্ছে ঘনীভূত ফ্যাটের ব্যাপার। ভুক্ত হলে পাকাশয়ে পরিপাকের পূর্বে ঘিয়ের ভিতরকার অণুকে আবার ইমালসনরূপে পরিণত হতে হয়। ফলে নানা প্রক্রিয়ার প্রয়োজন ও কিছু সময় অতিরিক্ত নষ্ট হয়ে যায়। সম্ভবতঃ মধুর মাধ্যমে মকরধ্বজের অণু ইমালসন রূপে পরিণত হয় বলে মধুসহ মকরধ্বজের গুণ ও ক্ষমতা বেশী। যদি এনজাইমের ক্রিয়াকলাপকে সমুচিত মাত্রায় উত্তেজিত করাতেই মকরধ্বজের ক্ষমতা ও তেজের পরিচয়, তবে ইমালসন রূপে বর্তমান থাকলেই তা বেশী ভাবে সম্ভব হয়। প্রোটিন হিসাবে এনজাইমও কোষের তরল মাধ্যমে কলয়ড রূপে বিরাজমান। ইমালসন এক বিশেষ ধরণের কলয়ড মাত্র। সুতরাং সমশ্রেণীতে রূপান্তরিত হবার দরুণ মধুসহ মকরধ্বজের বিশেষ তৎপরতা ঘটা স্বাভাবিক মনে হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণে মধুতে ফরমিক অ্যাসিড নামে একটি জৈব অ্যাসিড থাকে বলে জানা গেছে। এই অ্যাসিডের একটি অদ্ভুত ধর্ম হচ্ছে, অণুমধ্যস্থ দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মাধ্যমে অ্যাসিডের দুটি অণু পরস্পর আবদ্ধ বা সংলগ্ন অবস্থায় বিরাজ করতে পারে। এই ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক নাম হাইড্রোজেন বন্ধন (Hydrogen bonding বা Chelation)। হয়তো বা মধুর মধ্যে অবস্থিত এরূপ ভাবে আবদ্ধ বা সংলগ্ন ফরমিক অ্যাসিডের বিশেষ গুণে মকরধ্বজ কলয়ড রূপে পরিণত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, স্বনামধন্য কবিরাজ ডাঃ গণনাথ সেন

পূর্ব থেকে মধুর সঙ্গে চূর্ণিত মকরধ্বজ ভালভাবে মিশ্রিত করে মধু মকরধ্বজ নামে এক ধরণের মকরধ্বজের ব্যবস্থা দিতেন বলে শোনা যায়। এখন আরও লক্ষণীয় যে, আয়ুর্বেদ মতে কেন মধু ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই মকরধ্বজের সেবন বিধি নেই।

রোগবিশেষে ফলপ্রদ ভেষজ সাধারণতঃ অনুপানের আকারে মকরধ্বজ সংযোগে সেবন করলে রোগ নিরাময়ের কাজ বোধ হয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মকরধ্বজ অণুর প্রভাবে সম্ভ জায়মান (Nascent) তেজ কোষের পরিপুষ্টির হেতু হয় এবং সম্ভ জায়মান তেজে পুষ্ট কোষ অনুপানের আকারে আনীত ভেষজ-ক্ষমতার সদ্ব্যবহার সুচারুরূপে করে কি না, তা ভাববার বিষয়।

দেহের প্রত্যেক কোষের চতুর্দিক ঘিরে একটি আবরণ আছে। সেটি কোষের ভিতর ও বাইরে অভ্যন্তরস্থ বস্তুসমূহের চলাচল বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। চারপাশের তরল পদার্থ ও আবরণের মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালক বল (Electro motive force—Membrane potential) নামে একপ্রকার বৈদ্যুতিক বলের উদ্ভব হয়, বিজ্ঞানী স্টাউব সে কথা ১৯০৭ সালে প্রকাশ করেন। আরও প্রকাশ যে, এই বলের তারতম্যানুসারে কোষের উত্তেজনা বা অবসাদ পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানীদের আরও জানা আছে. পারদ ও পারদ আয়নের সান্নিধ্যে নির্মিত ক্যালোমেল সেলে উৎপন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালক বল মোটামুটি সুনির্দিষ্ট মাত্রায় থাকে। আয়ুর্বেদের বিচারে, ভুক্ত আহার্য বস্তু পরিপাকে জীর্ণ হলে খাদ্যরস থেকে যথাক্রমে রস (Chyle), রক্ত (Blood), মাংস (Flesh), মেদ (Fat), অস্থি (Bone), মজ্জা (Marrow) এবং শুক্র (Reproductive component) নামে সপ্তধাতু বা উপকরণগুলি উৎপন্ন হয়। লিঙ্গ নির্বিশেষে শুক্র শব্দের দ্বারা প্রজনন সংক্রান্ত উপকরণের ইঙ্গিত লক্ষণীয়। সপ্তধাতু পরিপুষ্টি বিধান করে দেহের অখণ্ডতা ও সবলতা সম্পাদন করে। উৎপন্ন হবার কালে ধাতুসমূহ কোষের ভিতরে-বাইরে যথারীতি চলাচল করে এবং চলাচলের পথে কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত হলে যথোচিত পরিপুষ্টি ব্যাহত হতে পারে না কি? রসাদি ধাতুসমূহের যথোচিত অয়ন বা চলাচলে সাহায্য করে যে সব বস্তু নিয়মিত সেবনে দেহকে জরাব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষার মাধ্যমে প্রধানতঃ দেহের পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি করে, সেই সমস্ত বস্তু রসায়ন নামে আয়ুর্বেদে পরিচিত। পারদঘটিত মকরধ্বজ সেইরূপ রসায়ন হিসাবে কেন ব্যবহার করা হয়, আধুনিক বিজ্ঞানের উপরিউক্ত আলোকে পরীক্ষার অপেক্ষা রাখে বৈ কি।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে, দেহের প্রধান প্রধান মৌলিক উপাদানের তালিকায় পারদের নাম দেখা যায় না সত্য; কিন্তু পারদ যে অতি স্বল্প মাত্রায়ও দেহে থাকে না, সেকথাও নয়। ভূয়োদর্শনের ফলে যে ক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্ডিতেরা প্রাচীনকালে মকরধ্বজের মত এত তেজশালী ভেষজ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেখানে যদি উন্নততর বিশ্লেষণাত্মক কৌশলে পারদের উপস্থিতি শরীরের মধ্যে খুঁজে পাবার চেষ্টা হয়, তবে দেহযন্ত্রে পারদের প্রকৃত ভূমিকা নির্ণয়ের পথে নতুন আলোকসম্পাত হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে।

মানুষের অজর ও অমর হবার আদিম বাসনা পূরণের নাগার্জুনের এই অভিলাষ ছিল, "সিদ্ধে রসে করিষ্যামি নির্দারিদ্র্যমিদং জগৎ"—পারদের ক্রিয়াকলাপ চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করে আমি পৃথিবীকে দারিদ্র্য মুক্ত করবো। আজ পর্যন্ত তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হলো কোথায়? আধুনিক বিজ্ঞানের দৌলতে ভেষজ ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে নানাবিধ কৌশল ও তথ্য আহরণ করা গেছে। হয়তো এই সব কৌশলের সাহায্যে একদিন মকরধ্বজের কার্যকারিতা সম্বন্ধে অজ্ঞাত রহস্যজাল ভেদ করবার পন্থা উদ্ঘাটিত হবে।

গণিতের আদি ইতিহাস

অপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বর্তমানে গণিতশাস্ত্রের পরিধি বিশাল। সামান্যতম সূত্র থেকে সুরু করে উচ্চ পর্যায়ের নানা স্তর পর্যন্ত এর বিচরণ-ক্ষেত্র। গণিতের যে ব্যাপক প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে পরিব্যাপ্ত, তার আদিম রূপটি কি ছিল তা জানা দরকার। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার গণিত-চর্চা বর্তমান গণিতকে যেভাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে, তার আলোচনা করা উচিত। কয়েকটি দেশের প্রাচীন কালের গণিত-চর্চার একটি ধারাবাহিক বিবরণী নীচে দেওয়া হলো।

ব্যাবিলন

এই দেশের লোকেরা চাকৃতি বা সিলিণ্ডারের উপর কাঠির সরু অগ্রভাগের সাহায্যে কীলকের আকৃতির মত একরকম লিপির সাহায্যে হিসাবপত্র লিখে রাখতো। পরে এই চাকৃতিকে পুড়িয়ে লিপি স্থায়ী করতো। এই রকম প্রায় ২২০০০ লিপি পাওয়া গেছে। এর অস্তিত্বকাল প্রায় ২০০০ বছর। এই লিপির সাহায্যে অঙ্ক-পাতন পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। এক, দশ, এক-শ' লেখা হতো যথাক্রমে V, < ও V < লিপির দ্বারা। এর দ্বারা বড় সংখ্যাও লেখা যেত। যোগ এবং গুণের ধারণা অনুযায়ী যে কোন সংখ্যা লেখা হতো ; যেমন—

V V V = ৩

এটিতে যোগের ধারণা করা হয়েছে। আবার

< V > = ১000

এটিতে গুণের ধারণা করা হয়েছে।

ষষ্ঠিক পদ্ধতি—উপরের পদ্ধতি দশমিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু দশমিক পদ্ধতি আদর্শ-স্থানীয় নয়। কারণ ১০ বিভাজ্য কেবল ২ এবং ৫-এর দ্বারা। কিন্তু দ্বাদশিক পদ্ধতি অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ, কারণ ১২ সংখ্যাটি ২, ৩, ৪, ৬-এর দ্বারা বিভাজ্য। কিন্তু এও সন্তোষজনক নয়, কারণ ১২ সংখ্যাটি ৫-এর দ্বারা অবিভাজ্য। এই সমস্ত বিবেচনা করে এই দেশ ষষ্ঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। এই পদ্ধতির ভিত্তি হলো ৬০, যার উৎপাদক সংখ্যা ১০টি, যথা ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৫, ২০, ৩০। এই পদ্ধতি ২০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ থেকে প্রচলিত এবং আজও ত্রিকোণমিতিতে এর প্রয়োগ রয়েছে।

এই পদ্ধতির নমুনা—

$১২৩ = ১ \times (১০)^২ + ২ \times (১০) + ৩$ দশমিক পদ্ধতি

$১২৩ = ১ \times (৬০)^২ + ২ \times (৬০) + ৩$ ষষ্ঠিক পদ্ধতি

প্রথমে এর তাৎপর্য বোঝা যেত না। কারণ আমরা ১২৩ বলতে যা বুঝি এরা তা বুঝতো না, বুঝতো ৩৭২৩। কয়েকটি বর্গরাশির দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে—

যেমন $১'৪ = ৮^২$

ষষ্ঠিক পদ্ধতি ছাড়া এর অর্থ বোঝা যায় না, কারণ $১'৪ = ১ \times ৬০ + ৪ = ৮^২$

শূন্যের ব্যবহার—হিন্দুরাই শূন্যের আবিষ্কারক বলে খ্যাত। ব্যাবিলনীয়েরা শূন্য সম্পর্কে কিছু জানতো কিনা, তা গবেষণার বিষয়। তবে তারা শূন্যের তাৎপর্য বুঝতো এটা প্রমাণিত, কিন্তু ব্যবহার

করতো না। সংখ্যার অনস্তিত্বে এরা $<$ $<$ চিহ্ন ব্যবহার করতো।

বীজগণিত—এরা একঘাত, দ্বিঘাত এবং ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধান করতে পারতো। অবশ্য সমাধানের জন্যে নির্দিষ্ট সূত্র তারা জানতো না। গুণ-ভাগ তালিকার সাহায্যে উত্তর বের করতো। সমাধানে যে তারা দক্ষ ছিল, তার বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় এই সমীকরণের মধ্যে—

$$xy = 600 \quad (ax+by)^2 + cx + dy = e$$

a, b, c, d, e-এর ৫৫টি বিভিন্ন সংখ্যা প্রয়োগ করে সমীকরণটি সমাধান করবার চেষ্টা তারা করেছিল। তাদের জানা ছিল যে, দ্বিঘাত সমীকরণের মূল হয় একটি।

তারা π (পাই)-এর মান বের করেছিল। জ্যামিতিতে তারা বিশেষ পারদর্শী ছিল না।

মিশর

মিশরীয়েরা গণিতের জন্মদাতা, একথা গ্রীক লেখকেরা বলে গেছেন। তাদের গাণিতিক উৎকর্ষের পরিচয় দেওয়া হলো।

পাটীগণিত—এরা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিল। গুণনের ব্যাপারে তাদের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। আমাদের প্রণালীতে তারা গুণ করতো না। তাদের নিয়মে গুণকের ঘরে ১ এবং গুণ্যের সারিতে প্রদত্ত রাশি লিখতে হয়। তারপর দুই সারির সংখ্যা ক্রমশঃ দ্বিগুণ বাড়িয়ে যেতে হয়, যতক্ষণ না গুণকের সারির দুই বা ততোধিক সংখ্যা মিলে গুণকের সমান হয়। গুণকের সারির যে যে সংখ্যাগুলিকে যোগ করলে প্রদত্ত গুণক পাওয়া যায়, গুণ্যের সারিতে তার বিপরীত সংখ্যাগুলিকে যোগ করলে গুণফল পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ৪০কে ১৫ দিয়ে গুণ দেখানো হলো।

গুণক	গুণ্য
১	৪০
২	৮০
৪	১৬০
৮	৩২০

৬০০ এটাই উত্তর।

এদের ভগ্নাংশকে একাধিক ভগ্নাংশে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা দেখা যায়। বেশীর ভাগ জায়গায় লব ২ এবং এমনভাবে বিশ্লেষণ করা যায় যে, প্রতিটি ভগ্নাংশের লব হয় ১। যেমন—

$$\frac{২}{৯৭} = \frac{১}{৫৬} + \frac{১}{৬৭৯} + \frac{১}{৭৭৬}$$

জ্যামিতি—এদের জ্যামিতি ব্যাবিলনীয় জ্যামিতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{১}{২} \times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা সূত্রটি—তারা জানতো। এরা π (পাই)-এর মান সঠিক মানের কাছাকাছি বের করেছিল। এই মান ব্যাবিলনীয় মান অপেক্ষা বেশী নির্ভুল। বৃত্তের ব্যাস a হলে এবং ক্ষেত্রফল S হলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল $S = \left(a - \frac{a}{9}\right)^2$ নিয়মটি তারা বের করেছিল।

সুতরাং $\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2 = \left(a - \frac{a}{9}\right)^2$

$\therefore \ \pi = ৩\cdot১৬$

সঠিক মান ৩·১৪১৬। এদিক দিয়ে তাদের কৃতিত্ব অসীম।

এরা পিরামিডাকৃতির শস্যাধারে শস্য ভরে রাখতো। এর জন্যে আধারের আয়তন জানা দরকার হতো। উপরের দিক কাটা পিরামিডের আয়তন তারা বার করতো এইভাবে—

$$V = h\left[\frac{(a+b)^2}{2} + \frac{(a-b)^2}{2}\right]$$

যদি v আয়তন, h উচ্চতা, a এবং b উপর ও নীচের ভূমির দৈর্ঘ্য। কিন্তু এই সূত্র নির্ভুল নয়। মিশরীয়েরা নির্ভুলভাবে এটি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিল। তাদের নিয়ম—

$$V = \frac{h}{3}\left[a^2 + ab + b^2\right]$$

এই সূত্র তারা কিভাবে আবিষ্কার করেছিল, তা জানা নেই—জানা সম্ভবও নয়—ক্যালকুলাসের সাহায্যে এই সূত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে আবিষ্কৃত হয়েছিল। তারা আন্দাজে সূত্রটি বের করেছিল—এ ধরা যায়।

ভারতবর্ষ

বৈদিক যুগে ভারতীয় গণনাপদ্ধতির উন্নতি—বৈদিক ঋষিরা গণিতবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যার আসন দিয়েছিলেন। তাদের গাণিতিক জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হলো।

পাটীগণিত—হিন্দুরা পাটিগণিতে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তার প্রমাণ সমান্তর এবং গুণোত্তর প্রগতির মধ্যে। কয়েকটি প্রগতির উল্লেখ পাওয়া গেছে—

১, ৩, ৫, ……………১৯

২৯, ৩৯ …………… ৯৯

প্রগতির যোগফল নির্ণয়ের পদ্ধতিও হিন্দুরা জানতো। একটি দৃষ্টান্ত—

৩×(২৪+২৮+৩২+……৭টি রাশি পর্যন্ত) =৭৫৬

ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতির সঙ্গে হিন্দুরা পরিচিত ছিল। তারা যে বর্গমূল সম্পর্কে অবহিত ছিল, তা একটি উদাহরণ থেকে জানা যায়; যথা-

$$\sqrt{৭\tfrac{১}{২}} = ২\tfrac{৩}{৪}$$

জ্যামিতিক পদ্ধতিতে বর্গক্ষেত্রকে নানাভাবে ভাগ করে তারা √২ এবং √৩ এর মান বের করবার চেষ্টা করেছিল। স্থূলমান—

$$\sqrt{২} = ১ + \frac{১}{৪} + \frac{১}{৩\cdot৪} \cdot \frac{১}{৩\cdot৪ \times ৩\cdot৪} = ১\cdot৪১৪২১$$

$$\sqrt{৩} = ১ + \frac{২}{৩} \quad \frac{১}{৩\cdot৫} - \frac{১}{৩\cdot৫ \times ৫} = ১\cdot৭৩৪৬২$$

বীজগণিত—বেদী নির্মাণ হিন্দুদের যজ্ঞানুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। বেদী নির্মাণ তাদের বীজগণিত এবং জ্যামিতি উভয় বিষয়ের জ্ঞানই বাড়িয়েছিল। একঘাত, দ্বিঘাত এবং সহ-সমীকরণ সমাধানের কাজে তারা দক্ষ ছিল।

তাদের যজ্ঞানুষ্ঠানে মহাবেদীর উল্লেখ আছে—আসলে তা হলো একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়াম, যার সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য ২৪ ও ৩০ এবং উচ্চতা ৩৬। বাহুদ্বয় এবং উচ্চতাকে যদি সমান অনুপাতে বাড়ানো যায় অর্থাৎ যদি x গুণে বাড়ানো হয় এবং ক্ষেত্রফল m বাড়লে x এবং m-এর মধ্যে সম্পর্ক কি হবে?

অর্থাৎ দেখাতে হবে যে,

$$36x \times \frac{24x+:}{2}$$

সরল করলে দাঁড়ায় $972x^2 - 972x + m$। m-এর বিভিন্ন মান ধরে এর সমাধান করা হয়েছে।

জ্যামিতি—এই আলোচনা থেকে তাদের জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল জানা না থাকলে এরকম

সমাধান সম্ভব নয়। পিথাগোরীয় উপপাদ্যের সম্বন্ধেও তারা পরিচিত ছিল।

* * *

প্রাচীন গণিতের বিভিন্ন স্থানে বিকাশ সম্পর্কে স্বল্প আভাস দিতে চেষ্টা করা হলো। আধুনিক গণিতের ভিত্তি—এই সব প্রাচীন দেশের গণিত-চর্চা। বর্তমান গণিত যে কতখানি স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় চিন্তার দ্বারা পরিপুষ্ট, তা এই আলোচনা থেকেই জানা যায়।

পরমাণুর শক্তি

শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী

কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে মানুষ আগুন আবিষ্কার করেছিল, তা এখন নির্ণয় করা অসম্ভব। তার আগে মানুষ এক রকম পশুত্বের অন্ধকারেই জীবন কাটাতো। অগ্নিলাভ করেই মানুষ পশুত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এগুতে আরম্ভ করেছে, আর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অধিকাংশ সময় ধীরে ধীরে আবার কখনো বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অতিক্রত উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে বর্তমান কালের গোড়ায় এসে পৌঁচেছে। এই দীর্ঘকাল ধরে মানুষের একমাত্র শক্তির উৎস ছিল কাঠ বা কাঠকয়লা। আর বর্তমান কালে মানুষের শক্তির উৎস প্রধানতঃ খনিজ কয়লা, খনিজ তৈল আর জলশক্তি। এই দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ প্রস্তুত করে অতিক্রত অগ্রসর হচ্ছি। গতির এই বেগ পূর্বে কল্পনাতীত ছিল। কিন্তু এই শক্তির উৎস কি অফুরন্ত? আপাতঃ দৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে অনুসন্ধান করে ভূতত্ত্ববিদেরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন—এই উৎস অফুরন্ত নয়। যে রকম দ্রুত বেগে আমাদের অগ্রগতি হচ্ছে, আর সে বেগ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে—কারণ পৃথিবীর বহু অনুন্নত দেশ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করে শিল্পপ্রধান দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, তাতে এই উৎস আর মাত্র কয়েক । বছর থাকবে কিনা সন্দেহ। ততঃ কিং? তখনো কি সীমাবদ্ধ জলশক্তি ও কাঠকয়লা পুড়িয়ে এই গতিবেগ বজায় রাখা যাবে? বিশেষজ্ঞদের অভিমত—নিশ্চয়ই নয়। তাহলে কি উপায়?

এই অভাব পূরণ করবার জন্যে পরমাণুর শক্তি মানুষের গঠনকার্যে ব্যাপকভাবে নিযুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পরমাণুর কি শক্তি, আর তা মুক্ত করা কি সম্ভব?

বিগত পাঁচ-শ' বছর ধরে মানুষ ভেবে এসেছে, পরমাণুর ভিতর কোন শক্তি থাকলে তা শুধু অন্য পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হবার কাজে লাগে, তা আবার মানুষের কাজে লাগবে কি করে? পরমাণু তো অবিভাজ্য ও অবিনাশী।

১৯০৫ সালে নিউটনের সমকক্ষ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের দিক থেকে গবেষণা করে জানালেন—পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটাতে পারলে নিম্নলিখিত ফর্মুলা অনুযায়ী শক্তি পাওয়া যাবে:

$$E = mc^2$$

যার E হচ্ছে শক্তি বা Energy, m হচ্ছে পারমাণবিক পদার্থের একটা অতি ক্ষুদ্র টুকরার mass আর c হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে আলোর গতি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন

এক গ্র্যাম ইউরেনিয়ামের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ অর্থাৎ Millionth অংশ ধ্বংস করা যায়, তাহলে যে শক্তির উদ্ভব হবে, তা ৯ বিলিয়ন টন বিশুদ্ধ কয়লা পোড়ালে যে শক্তি পাওয়া যায়, তার সমান।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—তা কি কোন দিন সম্ভব হবে, না আইনষ্টাইনের থিওরী শুধু মাত্র থিয়োরীই থেকে যাবে?

বিগত মহাযুদ্ধে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিক্ষেপ করে লক্ষ লক্ষ জাপানীর জীবন নাশ করে ও বহু লক্ষ লোককে বিকলাঙ্গ করে আমেরিকা ভীষণভাবে প্রমাণ করে দিল যে, আইনষ্টাইনের ফর্মুলা অতি বাস্তব।

কি করে বিজ্ঞানীরা এই অপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেন, এখন তারই অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেব।

প্রায় একশত বছর পূর্বে Klaproth প্রথম সর্বাপেক্ষা ভারী ধাতু ইউরেনিয়াম নামক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। এই ধাতুর বিশেষত্ব এই যে, এর লবণ দ্রবণ (Salt solution) আশ্চর্য সবুজাভ হলদে প্রভা দেখায়। এই গুণের জন্যে শিল্পে এর ব্যবহার হতে লাগলো।

১৮৯৫ সালে ডাঃ রন্টজেন ইউরেনিয়ামের লবণবিশেষ দিয়ে প্রথম তাঁর এক্স-রে টিউব প্রস্তুত করলেন। এই টিউবেও এক আশ্চর্য সুন্দর সবুজাভ হলদে প্রভা পাওয়া যায়, আর এর রশ্মি কালো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফের প্লেটকে কালো করে দেয়। এ যে কত বড় আবিষ্কার, তা আমরা সবাই জানি। আজও এই টিউবের আলো দিয়ে এক্স-রে প্লেট করা হয়, আর তা বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে কতদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে, তার বিবরণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ডাঃ রন্টজেন ভাবতেন, এই এক্স-রে ইউরেনিয়াম লবণের ঐ অপূর্ব প্রভার সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি ডাক্তার, এর অধিক আর অনুসন্ধান করেন নি।

এর এক বছর পরে ১৮৯৬ সালে ফরাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী আঁরি বেকেরেল আবিষ্কার করেন যে, ইউরেনিয়ামের সকল লবণই এই এক্স-রে দেয়। এই এক্স-রে শুধু কালো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফের প্লেটকে কালো করে দেয় না, তার চারপাশের বায়ুকেও বিদ্যুৎ-সঞ্চারী (Conductive of electricity) করে দেয়। আর ইউরেনিয়াম লবণের এই গুণের সঙ্গে তার সবুজাভ হলদে প্রভার কোন সম্পর্ক নেই। তিনিই প্রথম প্রস্তাব করলেন, ইউরেনিয়াম লবণ তেজস্ক্রিয়, তাই এই ঘটনার সৃষ্টি হয়। তাহলে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে আঁরি বেকেরেলই প্রথম তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারক।

এর দুই বছর পরে অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে প্যারিসে ম্যসিও ও মাডাম কুরি এক অপূর্ব আবিষ্কার করেন। তাঁরা পোল্যাণ্ডের খনিজ আকরিক পিচব্লেণ্ড থেকে দুটি মৌলিক ধাতু রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম পৃথক করেন। রেডিয়ামের আবিষ্কার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করলো। যে জলে রেডিয়াম লবণ মিশ্রিত হয়েছে, তা চিরকাল তার পার্শ্ববর্তী বায়ু থেকে অধিক উত্তপ্ত। তাথেকে ক্রমাগত তিনটি রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, যথা—আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি এবং গামা রশ্মি। এটা প্রমাণিত হলো যে, আলফা রশ্মি নিজেই একটা মৌলিক পদার্থ, বিটা রশ্মি হলো আলফা রশ্মির চেয়ে অনেক অধিক তেজস্ক্রিয় এবং তা হলো নেগেটিভ ইলেকট্রন; আর গামা রশ্মি হলো অতি সূক্ষ্ম, অতি তীব্র অনুপ্রবেশকারী বস্তুস্রোত। রেডিয়াম অদ্ভুত রকম স্বয়ংজ্যোতিঃ। মনে হয়, এটি অনন্ত কাল ধরে দীপ্তি বিকিরণ করে আর রেডিয়াম লবণের

তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়াম লবণের তেজস্ক্রিয়তা অপেক্ষা দশ লক্ষ গুণ অধিক। এই ক্ষেত্রে আর একজন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড প্রমাণ করলেন, রেডিয়াম থেকে নিঃসৃত আলফা রশ্মি হলো এক প্রকারের বিরল গ্যাস হিলিয়াম। এই তো দেখা যাচ্ছে এক পারমাণবিক পদার্থ থেকে ভিন্ন পারমাণবিক পদার্থ সৃষ্টি হলো! কে বলে পরমাণু অপরিবর্তনীয় (Immutable)? পরমাণুর যখন পরিব্যক্তি (Mutation) সম্ভব, তখন তার বিনাশও সম্ভব। এরই ভিত্তিতে রাদারফোর্ড পরমাণু সম্বন্ধে এক প্রস্তাব আনলেন। তখন সকলেই সেটা মেনে নিলেন। রেডিয়ামের চারপাশের বায়ু অতি মাত্রায় তড়িৎ-পরিচালনক্ষম, আর সেই কারণে নানা রকম অতি সূক্ষ্ম, অতি স্পর্শকাতর যন্ত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হলো, যা তেজস্ক্রিয়তা নির্ণয় করতে পারে; যথা—Electroscope, Electrometer, Wilson's cloud chamber, Geiger-muller counter প্রভৃতি।

১৯০৫ সালে ভিন্ন রকম গবেষণা থেকে আইনষ্টাইন তাঁর সুবিখ্যাত ফর্মূলা

$$E = mc^2$$

সৃষ্টি করলেন। এখন বিজ্ঞানীদের সাধনা আরম্ভ হলো এই ফর্মূলাকে বাস্তবে পরিণত করা।

রেডিয়াম আবিষ্কারের পর থেকে হিড়িক পড়ে গেল, নতুন নতুন তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক পদার্থ আবিষ্কার করা। শীঘ্রই আবিষ্কৃত হলো আইসোটোপ। শুধু তেজস্ক্রিয় পদার্থের আইসোটোপ নয়, তেজস্ক্রিয়তাবিহীন (Non-radioactive) পারমাণবিক পদার্থেরও আইসোটোপ আবিষ্কৃত হতে আরম্ভ করলো।

১৯২০ সাল নাগাদ কাজ এতদূর এগুলো যে, একটা পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে প্রস্তাব করা সম্ভব হলো। এই প্রস্তাব প্রায় একই সময়ে করলেন দু-জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, এক জন কোপেনহাগেনের নিল বোর অপর জন ভারতবর্ষের যুবক বিজ্ঞানী ডাঃ সত্যেন বোস। এই প্রস্তাব অনুযায়ী পরমাণু হলো একটি ক্ষুদ্রতম সৌরজগৎ। এর ধন তড়িৎবিভবসম্পন্ন প্রোটনটি হলো এর সমস্ত গুণের ধারক, আর এর আসল ওজন বাহক এই ভারী অংশটি হলো সৌরজগতের সূর্য। আর তার চতুর্দিকে অতি দ্রুত বেগে যে গ্রহগুলি ঘুরছে, তারা হলো ঋণ বিদ্যুতাবিষ্ট ইলেকট্রন। বিজ্ঞানীরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

এই সময়ে রাদারফোর্ডের প্রতিভা এক আশ্চর্য ব্যাপার আবিষ্কার করলো। তিনি নাইট্রোজেন গ্যাসে আলফা কণা বা হিলিয়ামের অতি বেগে সংঘাত ঘটিয়ে নাইট্রোজেনকে অক্সিজেনে পরিণত করলেন। এটিই পূর্বোল্লিখিত পরমাণু সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করলো। প্রায় পাঁচ শত বছর যে বৃথা চেষ্টা করা হয়েছিল এক পরমাণুকে ভিন্ন মৌলিক পদার্থে পরিণত করার, যেমন—সীসাকে সোনায়, তা এখন সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা হলো। এই কাজ এগিয়ে চললো। আবিষ্কৃত হলো পজিট্রন অর্থাৎ ধন তড়িৎ-যুক্ত ইলেকট্রন এবং আর একজন প্রতিভাবান যুবক ইংল্যাণ্ডের স্যাডউইক নিউট্রন আবিষ্কার করেন। এখন পরিষ্কার বোঝা গেল, একটা পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে নিউট্রন সমেত বৃহৎ প্রোটনটি, আর একটু ব্যবধানে তার চারপাশে ইলেকট্রন ও পজিট্রন অতি দ্রুতবেগে ঘুরে এক দুর্ভেদ্য আবরণ সৃষ্টি করে। তা যে কত দুর্ভেদ্য, পরমাণুর স্থায়িত্ব থেকেই তা বোঝা যায়।

এখন সোজা চলে আসবো পরমাণু ভাঙার কথায়। যদি নিউট্রন দিয়ে একটা পরমাণুর সঙ্গে ধীরে সংঘাত ঘটানো যায়, তাহলে সে পরমাণু তৎক্ষণাৎ বিস্ফোরিত হয়, আর তার ফলে তিনটি নিউট্রনও মুক্ত হয়ে যায়। এই তিনটি নতুন নিউট্রনকে

তৎক্ষণাৎ ধীরে চালিত হয়ে আরও তিনটি পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটায় ও নয়টি নিউট্রন নির্গত হয়। এই রকমে শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়ার (Chain reaction) দ্বারা সমস্ত ইউরেনিয়াম মাস্‌টাই বিস্ফোরিত করে ফেলা যায়, অর্থাৎ পরমাণু বোমা ফেটে যায়।

প্রথমে ১৯৩৭ সালে প্যারিসে জোলিও কুরী কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করেন ও পরে এই চেন রিয়্যাকশন যে সম্ভব, তা তিনি দেখান। ১৯৩৮ সালে বার্লিনের কাছে ডালেম ইনষ্টিটিউটে (Dalem Institute) অটো হান ও মাডাম লিসে মাইট্‌নার এই চেন রিয়্যাকশনের সম্ভাবনা দেখান। মাদাম লিসে মাইটনার এক ধাপ এগিয়ে যান, তিনি ইউরেনিয়ামে এই চেন রিয়্যাকশন সৃষ্টি করে প্রচণ্ড শক্তি উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখান। মাদাম ছিলেন জুইস মহিলা—তাঁকে হিটলার জার্মেনী থেকে বহিস্কৃত করলেন, তা না হলে হয়তো হিটলারের হাতেই প্রথম অ্যাটম বোমা পড়তো। পরে আমেরিকা এই কার্য সুসম্পন্ন করে প্রথম অ্যাটম বোমা প্রস্তুত করে ও তা হিরোসীমা ও নাগাসাকিতে বিস্ফোরিত করে।

এখন হাইড্রোজেন বোমার কথা বলবো। হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজন ১·০০৮ আর হিলিয়ামের ৪·০০২। ৪ অ্যাটম Hydrogen condense করে মিলিত করলে এক অ্যাটম হিলিয়াম হবে। তাহলে তো হিলিয়ামের পারমাণবিক ওজন হওয়া উচিত ৪·০৩২, কিন্তু হচ্ছে ৪·০০২। তাহলে ০·০৩ মাস্‌ গেল কোথায়? সেটা অবশ্যই বিনষ্ট হয়ে যায়, আর তার ফলে কি প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হবে, তা অনুমেয়। সূর্যে হাইড্রোজেন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, হিলিয়ামও পাওয়া যায়। তাই বিজ্ঞানীরা ভাবেন, সূর্যের প্রচণ্ড তাপে হাইড্রোজেন ক্রমাগত হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে ও তার ফলে ঐ প্রচণ্ড উত্তাপ অনন্তকাল ধরে উৎপন্ন হয়।

এখন সূর্যের এই বিস্ফোরণ পৃথিবীতে করা যায় কি না, মানুষ ভাবতে আরম্ভ করলো, পারলোও। খানিকটা হাইড্রোজেনের মধ্যে যদি অ্যাটম বোমা ফাটানো যায়, তাহলেই সূর্যের উত্তাপ সৃষ্টি করা যায় ও হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে পরিণত করা যায় আর ০·০৩ পরিমাণ মাস্‌ (Mass) বিনষ্ট হয়। সে যে কত ভীষণ, তার একটু নমুনা দেওয়া যাক—যদি ১০ গ্র্যাম হাইড্রোজেনকে অ্যাটম বোমার ট্রিগার করে হিলিয়ামে পরিণত করা হয়, তাহলে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, তার পরিমাপ হচ্ছে ৯০ বিলিয়ন বিলিয়ন মিলিয়ন টন কয়লা পোড়াবার সমান। আর অতি দারুণ ব্যাপার হচ্ছে, অ্যাটম বোমার প্রস্তুতিতে একটা সীমিত পরিমাণ ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা যায়, কিন্তু হাইড্রোজেন বোমা প্রস্তুত করা যায় যত খুসী হাইড্রোজেন নিয়ে।

নিম্নলিখিত দেশগুলির হাইড্রোজেন বোমা আছে—সর্বাধিক অ্যামেরিকার, প্রায় ততগুলি সোভিয়েট রাশিয়ার, তারপর আসে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, এমন কি চীন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলে এরা সবাই হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। যেমন অ্যাটম বিস্ফোরণ করে মানুষ অফুরন্ত শক্তির অধিকারী হয়েছে, কিন্তু তেমনি বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করতে না পারলে ধ্বংসেরও সম্মুখীন হবে।

পারমাণবিক শক্তি কি মানুষের গঠন-কার্যে ব্যবহার করা যায়? যায়, হচ্ছেও। এর দ্বারা বহু দেশের, এমন কি ভারতবর্ষেও বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করা হয়। তার খরচ পড়ে বর্তমান কালে কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ প্রস্তুত করবার দ্বিগুণ। কিন্তু ক্রমশঃই এই খরচ কমে আসছে, শেষে কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবার সমান হয়ে যাবে,

হয়তো আরও কমে যাবে। তখন কয়লা ব্যবহৃত হবে শুধু Metallurgy-তে। অঙ্গার ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নেই, যার দ্বারা আকরিক লৌহ বা অন্ত আকরিক ধাতুকে বিশুদ্ধ ধাতুতে পরিণত করা যেতে পারে। পারমাণবিক শক্তি দিয়ে রেল, ষ্টীমার, মোটর গাড়ী, মালবাহী মোটর ট্রাক—এমন কি, বিমান-যানও চালানো সম্ভব হবে। সে স্বর্ণযুগ কবে আসবে, কে জানে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ না বাধলে আর জাতিতে জাতিতে হিংসা-দ্বেষ ত্যাগ করলে, সকলের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ হলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে। আশা করা যাক, তাই হবে। তখন অ্যাটমিক রিসার্চের প্রধান ব্যক্তিগণ, যথা—অঁারি বেকেরেল, ম্যসিও এবং মাদাম কুরি, আইনষ্টাইন, রাদারফোর্ড, সডি, নীল বর, সত্যেন বোস, স্যাডউইক, জোলিও কুরি, অটো হান, মাদাম লিসে মাইটনার প্রমুখ এবং তাঁদের বহু সংখ্যক সহকর্মী মনুষ্যজাতির চির প্রণম্য হয়ে থাকবেন।

[শান্তিনিকেতনের 'আলাপ' সংস্থায় পঠিত]

কোয়াসার ও সম্ভাব্য আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী

অত্রি মুখোপাধ্যায়

১। শিরোনামেই আলোচ্য বিষয় প্রস্তাবিত। ইতিপূর্বে কোয়াসারের সাধারণ ধর্মাধর্মগুলি বিবৃত হয়েছে। ডাঃ বার্ণধির আশঙ্কাকে আপাততঃ সরিয়ে রেখে এইবার সেগুলির যথাসম্ভব তাৎপর্য অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

তাৎপর্য অনুসন্ধানের রাস্তা নির্বাচন করতে গিয়ে যা অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলে মনে হয়, তা সম্ভবতঃ এই যে, আমাদের হাতে এসব জ্যোতিষ্কের সরাসরি দূরত্ব মাপবার কোন পন্থাই জানা নেই। দূরত্ব সম্পর্কে আমরা এযাবৎ লাল অপসরণের ডপ্‌লার-সূত্র ভিত্তিক ব্যাখ্যা এবং হাব্‌ল সমীকরণের শরণাপন্ন হয়েছি, কিন্তু কোয়াসারগুলির ক্ষেত্রে সে সব নিয়মের প্রয়োগও সন্দেহে বিপর্যস্ত। পথ দ্বিধাবিভক্ত এবং পরীক্ষার দ্বারা এই দুয়ের মধ্যে সঠিক নির্বাচনের গতানুগ পন্থাতেই আমাদের প্রত্যাবর্তন অবশ্যম্ভাবী। একটি অনুযায়ী আমাদের লাল অপসরণের ডপ্‌লার ও হাব্‌ল নিয়মে প্রয়োগ স্বীকার করে প্রাপ্ত তারতম্যকে অন্ত উপায়ে নিরসন করবার চেষ্টা করতে হবে। অন্ত দিকে হাব্‌ল নীতিকে ব্যবহার না করে চেষ্টা করতে হবে দৃষ্ট লাল অপসরণের যথোপযুক্ত এবং সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা প্রদান করে তাত্ত্বিক মডেল গঠন করবার। অনিবার্য অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে মতবাদগুলি মূলতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। একটির মতে কোয়াসারগুলি আমাদের কাছাকাছি প্রতিবেশী মাত্র, অন্যটি অনুযায়ী কোয়াসারগুলি বিশ্ব জগতের উপান্ত-প্রাদেশিক, বিশ্ব বিস্ফারণের অংশভাগী, সংক্ষিপ্তাকার, প্রবল তেজী, দ্রুত অপসৃয়মান জ্যোতিষ্ক। যে মনস্তত্ত্ব কোয়াসারকে স্থানীয় কিংবা দূরের জ্যোতিষ্ক বলে আলাদা করে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছে, তা সম্ভবতঃ ডপ্‌লার ও হাব্‌ল নিয়ম অনুযায়ী কোয়াসারের মোট শক্তির অকল্পনীয় বহর। কোয়াসারগুলি দূরের অধিবাসী হলে বর্ণালীর অতিবেগুনী অঞ্চল থেকে সেন্টিমিটার তরঙ্গাঞ্চল অবধি বিস্তৃত সীমানা জুড়ে এদের নির্গত তেজ সেকেণ্ডে ১০⁴⁶ আর্গের কম নয় এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের চলতি কাঠামোর

তা ব্যাখ্যা করবার মত কোন প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব নেই। স্থানীয় হলে, অথচ এদের তেজপুঞ্জ ১০[৪৬] আর্গ/সে মত দাঁড়ায় এবং তখন সম্ভব মোটামুটি এই শক্তিপুঞ্জের একটা গ্রহণযোগ্য উৎস নির্দেশ করা। তথাপি একথাও মানবার যোগ্য যে, এই দুয়ের প্রত্যেকটি মতবাদেই তেজ এবং লাল অপসরণ দুটি মূল সমস্যা হিসেবে সর্বদা বিদ্যমান এবং এদের রূপগত সম্পর্ক সর্বথা পরিপূরণের।

বিস্ময় বাড়ে না, যখন দেখি আজো পর্যন্ত এদের আবিষ্কারের দীর্ঘ সাত বছর অতিবাহিত হবার পরেও এই শক্তি ব্যাখ্যার বিভিন্ন মতবাদের ভিতর সাম্যস্থিতি এবং সুনির্বাচন সম্পন্ন হয় নি। অধিকন্তু বিজ্ঞানীর বিহ্বলতা গেছে বেড়ে, সমস্যা আপনাকে বিস্তৃত করেছে মাত্র, ফলে নিয়ত নতুন চমকপ্রদ ধারণার প্রস্তাব নিত্য-নৈমিত্তিক মূল্যহীনতার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং সেই সব মতবাদের নিয়ত পরিবর্তন গলিঘুঁজির মধ্যে আমাদের বিচরণ নিরর্থক এবং নিন্দার্থে অনর্থকও বটে। এই অবস্থায় যখন কোয়াসারগুলির দেশ-কাল-সন্ততিতে অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা উত্থাপিত হবার সময় নয়, আমাদের যা করা সম্ভব তা বোধ করি, যে মৌলিক ও প্রাকৃত ঘটনাবলী, ক্রিয়া-বিক্রিয়া কোয়াসার ঘটনাবলীতে কার্যকরী হতে পারে বলে মনে হয়েছে, সেগুলি নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করা। অবশ্য আগেই সতর্কতা বিজ্ঞাপিত করা ভাল যে, এই প্রসঙ্গে যদিও মডেলগুলির বিস্তৃত বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রস্তাবে আস্থা রাখা মূর্খতার পরাকাষ্ঠা, আমরা যদি মূল কাঠামোগুলি মাঝেমধ্যে উল্লেখ করি, বোধ হয় উল্লেখের প্রয়োজনও, তবে তা করা রীতিসিদ্ধ হবে।

কোয়াসার সম্পর্কে যা জেনেছি, তাতে বর্ণালীর অবদানই বেশী, একথা অন্যত্রও বলেছি। এদের গঠন এবং অবস্থান অনুসন্ধান কালে প্রধান কাজই হবে এথেকে পাওয়া ফলাফলগুলিকে ব্যাখ্যা করা।

২। (ক) বর্ণালী সম্পর্কে বিশেষত্বগুলি মোটামুটি সম্পূর্ণভাবে একত্র করছি: ১। বর্ণালীকে দুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে: অবিচ্ছিন্ন পটভূমি এবং রেখাবলী। ২। বর্ণালী পটভূমিতে বিকিরণ তীব্রতা এবং কম্পাঙ্ক অর্থাৎ বিভিন্ন কম্পাঙ্কে তীব্রতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই $S(\nu) \propto \nu^{-\alpha}$ এই সরল সম্পর্কের* দ্বারা নির্দিষ্ট। ৩। কোন কোন প্রভবে একটি বিশেষ কম্পাঙ্কে শিখর বিদ্যমান। ৪। বর্ণালী অবিচ্ছিন্নতার ধরণ ব্ল্যাক-বডি বিকিরণের মত নয়। ৫। বর্ণালী নিরুত্তাপীয়। ৬। উপর্যুক্ত সরল নিয়ম না মানা কিছু প্রভবের ক্ষেত্রে ফ্লাক্স-ঘনত্ব নিম্ন ও উচ্চ কম্পাঙ্কে যথাক্রমে কম ও বেশী। ৭। বর্ণালী সূচক α-র মান ০'২ থেকে —১'৩ এর মধ্যে সঞ্চরণশীল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই —০'৭৫ থেকে —০'৮০-র মধ্যে থাকে। এই বিচরণ গভীর ধরণের। বেতার কম্পাঙ্ক অঞ্চলে ৩ সি ২৭৩ প্রভবে α-র মান —০'২৫, ৩'৬-৯'১ × ১০[১৪] সা/সে কম্পাঙ্কের দীর্ঘ অঞ্চলে α= ০'২৮। ৮। বর্ণালী রেখাগুলিকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়: বিকিরণ রেখা ও বিশোষণ বা কৃষ্ণ রেখা। ৩ সি ২৭৩ প্রভবটিতে কিছুটা নীল অবিচ্ছিন্ন অংশে কতক-গুলি (৬টি) চওড়া রেখাগুলিতে ০'১৫৮ লাল অপসরণ (Z) অনুপ্রবিষ্ট করলে বামার রেখাগুলি বলে এদের সনাক্ত করা যায়। O III-র জন্যে কতকগুলি কৃষ্ণ রেখাও দেখা গেছে। ৯। রেখা-গুলি চওড়া, এদের প্রস্থ গড়ে ৫০ আংস্ট্রমের মত, ১২০ আংস্ট্রম চওড়াও কিছু বিদ্যমান। ১০। বর্ণালী কয়েক সেন্টিমিটার অঞ্চল থেকে অতি-বেগুনী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। অতিবেগুনী অবিচ্ছিন্ন অংশেও কয়েকটি রেখার আভাস আছে,

---

* $S(\nu)$ = (ν) কম্পাঙ্কে ফ্লাক্স ঘনত্ব।

প্রথমে স্মিথের কাজে এর উল্লেখ না পেলেও ওকের নিবন্ধে এর উল্লেখ দেখি।

(খ) কোয়াসারগুলি প্রত্যেকে শক্তিশালী বেতার বিকিরণকারী জ্যোতিষ্ক—এই সত্যের সন্নিহিত সিদ্ধান্ত এই যে, প্রভবে শক্তিশালী মুক্ত বিদ্যুতিন এবং চৌম্বক ক্ষেত্র বিদ্যমান। তাছাড়া, এদের অলন্ত শিখাগুলির অদ্বিতীয় আকার প্রভবে চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহ করে তোলে। এগুলির সঙ্গে বর্ণালীর ২ এবং ৭নং বিশেষত্ব অদ্বৈত করে এই ইঙ্গিত পাই যে, বেতার বিকিরণের উৎপত্তি দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্রে অপেক্ষবাদানুগ বিদ্যুতিনগুলির বলরেখা ঘিরে শঙ্খিল ঘূর্ণনে। কোন কোন প্রভব, যেমন ৩ সি ৪৮-এ দার্শ অঞ্চলেও বর্ণালী সূচকের মান যথোপযুক্ত হওয়ায় সিনক্রোট্রন পদ্ধতিতে দার্শ বিকিরণের উৎপত্তি নির্দিষ্ট হয়েছে। আবার লাল উজানি অঞ্চলের বিকিরণও যে এই পন্থাতে ঘটছে, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

২নং বৈশিষ্ট্যে ব্যক্ত সরল সম্পর্ক থেকে এই প্রক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল বিদ্যুতিনগুলির মধ্যে শক্তি বিভাজনটি কি রূপের, তাও নির্দিষ্ট হচ্ছে: এই সম্পর্কও সরল। এই সম্পর্ক অনুযায়ী N (E) যদি E এবং E+dE-র মধ্যে শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুতিনের সংখ্যা হয়, তাহলে $N(E)\ dE \propto E^{-\gamma}\ dE$, γ একটি ধ্রুবক, $\gamma = 2\alpha + 1$ এই সম্পর্কের দ্বারা α-র সঙ্গে যুক্ত।

বিকিরণ সিনক্রোট্রন পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয়ে থাকলে দৃষ্ট বিকিরণে সমবর্তনের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। অধিকাংশ কোয়াসার বিকিরণই আংশিক সমবর্তিত বলে ধরা পড়েছে। ৩ সি ৪৮ প্রভবটির ক্ষেত্রে হিল্‌ট্‌নার অনুযায়ী শতকরা দুই ভাগের কম সমবর্তন মাত্রা উপস্থিত। ৩ সি ২৭৩ বি প্রভবটিতে, স্মিথ অনুযায়ী, ৭'৫×১০^{১০} সা/সে কম্পাঙ্কে সমবর্তন না থাকলেও ৯×১০^{১০} সা/সে কম্পাঙ্কে সমবর্তন লক্ষিত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বিকীর্ণ তড়িৎ ভেক্টর চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর লম্বমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৃষ্ট তড়িৎ ভেক্টরের অবস্থান-কোণ (পজিশনাল অ্যাঙ্গল) তরঙ্গদৈর্ঘ্য-বর্গের সমানুপাতে পরিবর্ত বলে অনুমান করা যায় যে, এই ঘূর্ণন ফ্যারাডে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন। অর্থাৎ প্রভবে মুক্ত বিদ্যুতিন এবং লন্‌জিচুডিনাল চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব এখানেও নির্দিষ্ট হচ্ছে। তবে এই ঘূর্ণনের খানিকটা আমাদের নীহারিকার অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এরূপ ভাববার কারণ আছে।

সাধারণতঃ সমবর্তন বেতার অঞ্চলের বিকিরণেই উপস্থিত, সবার ক্ষেত্রে দার্শ বিকিরণ সমবর্তিত হবার নজীর নেই। সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রে দার্শ বিকিরণ যদিও সিনক্রোট্রন পদ্ধতিতে অনুমান করা অসঙ্গত, একথা মানবার যোগ্য যে, বেতার বিকিরণের উৎপত্তি এই পন্থাতেই ঘটেছে। অবশ্য ৩ সি ২'৩বি প্রভবটির অবলোহিত অঞ্চলের বিকিরণকেও এই পন্থায় সৃষ্ট হয়েছে বলে অনুমান করতে হবে। কারণ ওক ১৬০০০° কার্যকরী তাপমাত্রা অনুমান করে বর্ণালীতে দৃষ্ট বামার বিচ্ছিন্নতা ব্যাখ্যা করলেও প্যাশেন অবিচ্ছিন্নতাকে অন্য প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বলে অনুমান করতে হবে। ওকের নিজের ধারণা, এই পন্থা সিনক্রোট্রন জাতের। সেই অনুযায়ী অবলোহিত অঞ্চলে এই পন্থার প্রভুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া উচিত এবং উপর্যুক্ত স্মিথের বিবৃতি নীচু কম্পাঙ্কে সিনক্রোট্রন বিকিরণ অংশের ধীর বৃদ্ধিরই ইঙ্গিত করছে। ১৬×১০^{৩০} তাপমানবিশিষ্ট গ্রীনস্টাইন ও স্মিথের মডেলে বামার ও প্যাশেন বিচ্ছিন্নতা দৃষ্ট অপেক্ষা অনেক বেশী হয়ে পড়ে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিম্নোক্ত পুনঃ সংযোজনী

বর্ণালীর সঙ্গে যে বাড়তি অংশ প্রযুক্ত হবার যোগ্য তাদের সংনমন ক্র্যাব (Crab) ও ৩ সি ৪৮ প্রভব দুটির মতই। সুতরাং ৩ সি ২৭৩ বি প্রভবটির অবলোহিত অঞ্চলের কাছাকাছি অংশে যে সিনক্রোট্রন পদ্ধতিই ক্রিয়াশীল, তার পক্ষে এই নির্দেশ নগণ্য নয়।

বর্ণালী থেকে প্রভবের তাপমাত্রা সম্পর্কে যে নির্দেশ পাওয়া গেছে তদনুযায়ী ~৩×১০^৪ কেলভিন তাপমানে প্রভবের যাবতীয় পদার্থ প্লাজ্মা অবস্থায় রয়েছে বলে অনুমেয়। সুতরাং বেতার বিকিরণ ছাড়া অন্যান্য বর্ণাংশে তাপীয় বিকিরণের অবদান সম্পর্কে ভেবে দেখা যেতে পারতো। এই ধরণের প্লাজ্মা বিকিরণের জন্যে কিছুটা দায়ী বলে মনে করা যেতে পারে. বিকিরণের রেখাবলীর উৎপত্তিও নিশ্চিত এই ভাবে। কিন্তু বর্ণালী অবিচ্ছিন্নতার সবটুকু তাপীয় বিকিরণের জন্যে কখনোই নয় এবং নির্গত সমগ্র শক্তিপুঞ্জের ব্যাখ্যা এই প্রক্রিয়ায় অসম্ভব। তৃতীয় আরো একটি প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা আছে। ওই আয়নিত পদার্থের মধ্যে কখনো কখনো বিকিরণ-মূলক পুনঃসংযোজন (রেডিয়েটিভ রিকমবিনেশন) ঘটছে। এরূপ সংযোজনে বর্ণালীর কিছু অংশের উৎপত্তিও সম্ভব। গ্রীনস্টাইন, স্মিথ ও ওক তাঁদের নিবন্ধ দুটিতে এই প্রক্রিয়াভিত্তিক একটি ব্যাখ্যা প্রস্তাব করেছেন ৩সি ২৭৩ প্রভবটির দার্শ বিকিরণের জন্যে। এই প্রভবটিতে বামার বিকিরণ রেখার সঙ্গে অল্প কিছুটা বামার বিচ্ছিন্নতার অস্তিত্ব দেখাচ্ছে হাইড্রোজেন গ্যাসের ভিতর λ ৪০০০০-র নীচে প্রভুত্বশালী পুনঃসংযোজন-মূলক বর্ণালী বিদ্যমান।

চতুর্থতঃ: কোয়াসারগুলির বিকিরণ সম্পর্কে আরও একটি প্রক্রিয়ার গুরুত্ব খুব সম্প্রতি উপলব্ধি করা যাচ্ছে। ৩ সি ২৭৩ প্রভবটির কার্যকরী তাপমাত্রা যা, তাতে গিনৎসবর্গ, ওৎস্যারনোয়া ও সীরোভ্যাটস্কী-প্রোক্ত ব্রেমষ্ট্রালুং অর্থাৎ বিদ্যুতিন-ক্রতি-হ্রাস জাত তড়িৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণের সম্ভাবনা আদৌ অগ্রাহ্য নয়। এর গুরুত্ব খানিকটা উপেক্ষিত, যদিও গোল্ড এবং মোফাট এই প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অনেকটা পুনরুদ্ধার করেছেন।

এই প্রক্রিয়ায় যখন একটি বিদ্যুতিনের গতি পারমাণবিক কেন্দ্রীনের কুলম্ব্ ক্ষেত্রে রুদ্ধ হয়, সনাতনী তড়িৎ-চৌম্বকীয় মতবাদ অনুযায়ী তখন কিছু বিকিরণ নির্গত হয়ে থাকে। এর বিপরীত ঘটনা অর্থাৎ বিপ্রতীপ ব্রেমষ্ট্রালুং প্রক্রিয়াতে বিদ্যুতিনগুলির শক্তিবৃদ্ধিও ঘটে। এই শেষোক্ত ঘটনার দ্বারা বিকিরণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না বরং প্রভবের অস্বচ্ছতা এতে বেড়ে যায়। এই বিপ্রতীপ ব্রেমষ্ট্রালুং প্রক্রিয়া ফ্রী-ফ্রী বা ফ্রী-বাউণ্ড ট্র্যানজিশন-এর দুটিতেই ঘটতে পারে। উচ্চ মানের আয়নিত পরমাণু কেন্দ্রীনের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যুতিনের ফটোইলেকট্রিক আয়নন (ফ্রী-ফ্রী) এবং মুক্ত বিদ্যুতিনের প্রতি অগ্রসর কোন উচ্চগতিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক কণা পথভ্রষ্ট হবার কালে বিদ্যুতিনকে কিছুটা শক্তি দান (ফ্রী-বাউণ্ড)। এর যেটিই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, বিকিরণ বিশোষণই এতে ঘটতে বাধ্য। শেষোক্ত বিক্রিয়াটিতে সামান্য কৌণিক ভরবেগ প্রাপ্তিতে ও বিদ্যুতিনের ভর কম হওয়ায় তৎকর্তৃক বিশোষিত বিকিরণ হবে অনেকখানি।

এই সরল এবং বিপ্রতীপ ব্রেমষ্ট্রালুং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে কোয়াসারগুলির বেতার বিকিরণের অপেক্ষাকৃত উচ্চমান ও ৩ সি ২৭৩ প্রভবটির এ এবং বি অংশের বর্ণালী বিকিরণ ব্যাখ্যা করেছেন। গোল্ডের প্রস্তাবানুযায়ী, কোন প্রভবের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট আয়তনে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক আয়ন কণার সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে বিকিরণ-শক্তি প্রথমতঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে, কারণ তখন আরো বেশী ফ্রী-ট্র্যানজিশন ঘটবে, কিন্তু ব্ল্যাক-বডি সীমা সমীপবর্তী হলে বিপ্রতীপ ব্রেমষ্ট্রালুং প্রক্রিয়া প্লাজ্মা অর্থাৎ প্রভবের বহির্ভাগে আর কোন

বিকিরণ যেতে দেবে না (অস্বচ্ছতা)। এথেকে বোঝা যায়: কোন একটি মধ্যবর্তী প্লাজ্‌মা ঘনত্বে সর্বোচ্চ পরিমাণ ব্রেমস্ট্রালুং নির্গত হবে। ৩ সি ২৭৩ প্রভবের বি অংশে সামান্য দার্শ গভীরতা (অপটিক্যাল থিকনেশ) সহ ১০ ঘন/সে. মি. প্লাজ্‌মা ঘনত্ব এবং 'এ' অংশে ১০⁹ ঘন/সে. মি. প্লাজ্‌মা ঘনত্ব বেশী দার্শ গভীরতা অনুমিত হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দার্শ গভীরতার উচ্চমানই বর্ণালীর উচ্চ কম্পাঙ্কে বেতার ফ্লাক্স হ্রাস (বর্ণালীর ৬নং বিশেষত্ব)-এর জন্যে দায়ী। দার্শ গভীরতা সে ক্ষেত্রে বেশী হবার দরুণ স্ব-বিশোষণ (সেল্‌ফ্‌-অ্যাবসর্পশন) ক্রিয়া করেছে। আরো উচ্চ প্লাজ্‌মা ঘনত্ববিশিষ্ট বেতার নীহারিকা এই অপটিমাম অঞ্চল থেকে সুদূরবর্তী এবং তখন এরা উচ্চ কম্পাঙ্কে শক্তি হ্রাসের পরিবর্ত-মাত্রা (ভ্যারিইং ডিগ্রী) দ্বারা চিহ্নিত। কোয়াসারগুলি যে স্বল্পতাপ বিশিষ্ট (১০⁶°র তুলনায়), এই তথ্যের সঙ্গে এই ঘটনা অন্বিত করে বেতার বিকিরণের অপেক্ষাকৃত আধিক্য ব্যাখ্যা করা যায়; কম অস্বচ্ছতা-বিশিষ্ট প্লাজ্‌মা ও উত্তেজিত বিকিরণ, বিশেষ করে বর্ণালীর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গাঞ্চলে অস্বাভাবিক রকমের বেশী বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণ উৎপন্ন করতে পারে। অতি ঘন উষ্ণ প্লাজ্‌মা কখনোই স্থির বেতার-বিকিরণ নির্গত করতে পারে না।

আরো একটি প্রক্রিয়া বিশ্ব জাগতিক মডেল-গুলিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বেই বলা হয়েছে: প্রভবে মুক্ত এবং অপেক্ষবাদানুগ বিদ্যুতিনগুলির অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। এই অপেক্ষবাদানুগ বিদ্যুতিনগুলির সিনক্রোট্রন বিকিরণ বা ব্রেমস্ট্রালুং পন্থায় শক্তিক্ষয় হচ্ছে। এসব বিকীর্ণ আলোক-কণাগুলির (ফোটোন) সঙ্গে অপেক্ষবাদানুগ বিদ্যুতিনগুলির বিক্রিয়া ঘটা খুবই সম্ভব। সরল এবং বিপ্রতীপ কম্পটন (ইনভার্স কম্পটন এফেক্ট) বিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনাই এখানে বেশী।

প্রভবে কম্পটন বিক্রিয়ার সম্ভাবনা সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন খুব সম্ভবতঃ গ্রীনষ্টাইন এবং স্মিথ ও গিনৎসবর্গ, ওৎসারনোয়া এবং সীরোভ্যাটস্কী। সরল কম্পটন বিক্রিয়ায় আমরা দেখেছি, উচ্চশক্তি-সম্পন্ন আলো-কণা এসে মুক্ত বিদ্যুতিনকে আঘাত করলে কণার শক্তি ক্ষয় হয় এবং তা বিদ্যুতিনটির প্রাপ্তব্য হয়। পক্ষান্তরে বিপ্রতীপ কম্পটন বিক্রিয়ায় একটি অপেক্ষবাদানুগ বিদ্যুতিন ফোটনের সঙ্গে সংঘর্ষে নিজের শক্তির বিনিময়ে আলো-কণার শক্তিবৃদ্ধি করে। সুতরাং বিকিরণ ওই বিপ্রতীপ কম্পটন বিক্রিয়ার দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং সরল কম্পটন বিক্রিয়ার দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবগুলির অবস্থা এমনই, যাতে কম্পটন বিক্রিয়া ও সিনক্রোট্রন বিক্রিয়ার তুলনামূলক কার্যকারিতা হিসেব করলে প্রথম পন্থার প্রভুত্ব সহজেই নজরে আসে। কিন্তু কম্পটন বিক্রিয়া কোয়াসারের বিশ্বজাগতিক মডেলগুলিতে একটি প্রচণ্ড সমস্যা উপস্থিত করেছে, কারণ এদের কার্যকারিতা স্বীকার করলে মডেলের জটিলতা ও কৃত্রিমতা অস্বস্তিকর ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পায়। এই কম্পটন বিক্রিয়ার ভিত্তিতে দেশ-কাল-সন্ততিতে কোয়াসারগুলির অবস্থান খুব আকর্ষণীয় বিতর্কের বিষয় হতে পারে।

(গ) উপরিউক্ত পন্থাগুলিতে নির্গত বিকিরণ প্রভবের অস্বচ্ছতাহেতু বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এর সম্পূর্ণ অংশ বিকীর্ণ হয় না। প্রভবের অস্বচ্ছতার জন্যে সাধারণভাবে আয়নন, বিশোষণ এবং বিক্ষেপণ (স্ক্যাটারিং)—এই তিনটি ঘটনাকে দায়ী করা যেতে পারে। এদের মধ্যে কম্পটন বিক্ষেপণ ও বিপ্রতীপ ব্রেমস্ট্রালুং পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আরো দুটি বিশোষণ প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্য। এই দুটি হলো সিনক্রোট্রন স্ববিশোষণ

এবং তাপীয় বিশোষণ। অবশ্য দ্বিতীয় জাতের বিশোষণের পরিমাত্রা প্রভবে কতখানি, তা বিতর্কযোগ্য। কিন্তু মূল বিকিরণকারী অংশ এবং দ্রষ্টার মাঝখানে যথোপযুক্ত গভীরতাসহ আয়নিত হাইড্রোজেনের মেঘ বিদ্যমান থাকলে এই ধরণের প্রক্রিয়া অবশ্য ধর্তব্য এবং এও সম্ভব যে, ওই মেঘ মূল বিকিরণকারী কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৬ নম্বর বর্ণালী বিশেষত্ববিশিষ্ট কয়েকটি প্রভবের একটি—৩সি ১৪৭-তে, ৮৯'৫ থেকে ৩৮ মেগাসা/সে. কম্পাঙ্ক অঞ্চলে ফ্লাক্স ঘনত্ব এত দ্রুত কমে গেছে যে, সেখানে বিদ্যুতিনগুলির শক্তি-বর্ণালীতে যত খাড়া 'কাট-অফ'ই অনুপ্রবিষ্ট করা হোক না কেন, এই কমতিকে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। সে সব প্রভবের ক্ষেত্রে সিনক্রোট্রন স্ববিশোষণের কার্যকারিতা বাধ্য হয়ে অনুমান করতে হবে। অবশ্য এই কাট-অফের জন্যে তাপীয় বিশোষণও দায়ী হতে পারে।

একথা অন্যত্র উল্লেখ করেছি যে, বিদ্যুতিন-নির্গত বিকিরণের ঔজ্জ্বল্য তাপাঙ্ক যদি বিদ্যুতিন-গুলির গড় গতিতাপমানের সমতুল্য হয়, তাহলে বিদ্যুতিনগুলি শক্তি ব্যয় করবার পরিবর্তে সিনক্রোট্রনজাত বিকিরণ গ্রহণ করবে। সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে, সিনক্রোট্রন স্ববিশোষণ কেবলমাত্র অত্যুচ্চ ঔজ্জ্বল্য তাপাঙ্কবিশিষ্ট প্রভব-গুলির ক্ষেত্রেই সংঘটিত হবে।

টুইস, রাঁজা, লি রুও প্রভৃতির বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রভবে সিনক্রোট্রন স্ববিশোষণ ঘটবে সেই বিশেষ কম্পাঙ্কের নীচে সমস্ত কম্পাঙ্কেই, যেখানে চূড়ান্ত পরিমাণ ফ্লাক্স ঘনত্ব বিদ্যমান। অপেক্ষবাদানুগ বিদ্যুতিন ঘনত্ব, চৌম্বক ক্ষেত্রের লম্বাংশ (নর্মাল কম্পোনেন্ট), বেতার বর্ণালীর সূচক (α), বেতার বিকিরণকারী অঞ্চলের সামগ্রিক আকার ইত্যাদির উপর ওই বিশেষ কম্পাঙ্ক নির্ভর করে। এই সমস্ত পরিমাণ এবং বিশেষ-কম্পাঙ্কোর্ধ্ব ও স্ববিশোষণ অনধ্যুষিত ফ্লাক্স ঘনত্ব সম্বলিত একটি রাশি-সমীকরণের দ্বারা এই বিশেষ কম্পাঙ্কটি নির্দিষ্ট। বর্ণালী সূচকের মান যখন ১ মত এবং লাল অপসরণ ১০ অপেক্ষা কম, তখন এই সমীকরণ যথাক্রমে চৌম্বক ক্ষেত্র ও লাল অপসরণ নিরপেক্ষ। তবে এরূপ সম্পর্ক বেতার প্রভবের গাত্র-জ্যোতি তাপাঙ্কের সঙ্গে স্ববিশোষণের আত্মীয়তা নির্দেশ করে। এথেকেও বোঝা যায় যে, অত্যুচ্চ জ্যোতি তাপাঙ্কবিশিষ্ট বেতার প্রভবগুলি স্ববিশোষণের জন্যে বর্ণালীর ডেকামিটার তরঙ্গাঞ্চলে একটি আকস্মিক ছেদ প্রকাশ করবে। এর বেশীর ভাগ দায়ই আয়নিত হাইড্রোজেন কর্তৃক বিশোষণ। এম ৩১, সিগ্‌নাস এ, এবং বেতার নক্ষত্রে এই বিশেষ কম্পাঙ্ক যথাক্রমে ০'১, ১০ ও ২০ মেগা/সে। এই বিভিন্নতা প্রভবগুলির কৌণিক আকার বিভিন্নতার প্রতিফলন মাত্র।

উপর্যুক্ত সম্পর্ক থেকে চরম ফ্লাক্স ঘনত্ব ও লাল অপসরণ সংশোধন সম্বলিত বিশেষ কম্পাঙ্ক নির্দিষ্ট প্রভবের আপাতঃ কৌণিক আকারের একটি হিসাব পাওয়া যায়। এর কথাও আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সেই অনুযায়ী ৩সি ৪৮ প্রভব-টির [বর্ণালীতে ৭০ মেগা/সে কম্পাঙ্কে শিখরের অস্তিত্ব থেকে] ০'১৮" ও ৩০০ মেগা/সে কম্পাঙ্কে শিখরের অস্তিত্ব অনুমান করে সি টি এ ২১ প্রভবটির ০'০১" কৌণিক ব্যাস তত্ত্বতঃ প্রস্তাবিত হয়েছে। এইগুলিকে পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করবার কালে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, এই তুলনা একটিমাত্র ব্যতিকরণী-দূরবীক্ষণ যন্ত্র-পরিমিত কৌণিক ব্যাসের সঙ্গে করা ঠিক হবে না। কেন না অধিকাংশ প্রভবই জ্যোতির গঠনীয় বিভাজনবিশিষ্ট একক জ্যোতিষ্ক নয়, কারো কারো গঠন যুগ্ম। সে সব ক্ষেত্রে

প্রস্তাবিত ব্যাস স্বতন্ত্র উপাংশগুলির, অথচ দৃষ্ট ব্যাস সমগ্র জ্যোতিষ্কটির।

উইলিয়ামস্ যে ছয়টি প্রভব তৎকালীন তথ্য থেকে সংগ্রহ করেছেন, যারা ৩৮ মেসা/সে কম্পাঙ্কে অস্বাভাবিক রকমের কম ক্লান্ত ঘনত্ব দেখিয়েছে, তারা প্রত্যেকেই ৫"-এরও কম চাপের কৌণিক আকারবিশিষ্ট, অস্বাভাবিক উচ্চ গাত্র-জ্যোতিসম্পন্ন প্রভব-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। উচ্চ জ্যোতি থেকে সিনক্রোট্রন-স্ববিশোষণের কার্যকারিতা নিশ্চিত। আবার এও হতে পারে যে, ওই সব প্রভব ছোট এবং কোন নীহারিকার সম্পূর্ণ অন্তর্গত এবং সে জন্যে তাপীয় বিশোষণও ক্রিয়া করছে। তাপীয় বিশোষণ বা সিনক্রোট্রন স্ববিশোষণ, যাই হোক না কেন, যুক্তিযুক্ত প্রাকৃত অবস্থা প্রতিফলনকারী গাণিতিক বর্ণালীর দ্বারা দৃষ্ট বর্ণালীকে খাপ খাওয়ানো চলে। বর্ণালী পরিমাপের পন্থার উন্নতি সাধনের দ্বারা এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে নিশ্চিত কোন নির্বাচন অসম্ভব, কেন না প্রস্তাবিত বর্ণালী সব সময়েই অবাস্তব রকমের সরল।

বর্ণালীর ৩ নম্বর বিশেষত্ব এবং কেলারম্যান, লং, অ্যালেন ও মোনান-ব্যক্ত বর্ণালী-বক্রতা ও অত্যুচ্চ জ্যোতি তাপাঙ্কের সম্পর্কটি এই সিনক্রোট্রন বিশোষণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করা যাবে বলে মনে হয়। কোয়াসারগুলির মডেল গড়ে তুলতে হলে অবস্থানুযায়ী খ ও গ অংশে বিবৃত মৌলিক ঘটনাবলীর সম্ভাবনা সেখানে কতটুকু, তা বিবেচ্য।

৩। (ক) সিনক্রোট্রন পদ্ধতি প্রস্তাবিত হবার পর বেতার শক্তির পরিমাণ ও বর্ণালীর ধরণ থেকে প্রভবে অপেক্ষবাদানুগ বিদ্যুতিন এবং চৌম্বক ক্ষেত্র হিসেবে অবম শক্তির পরিমাণ কতখানি প্রয়োজন, তা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। অবশ্য এই ধরণের হিসেব বিদ্যুতিনগুলির সৃষ্টি সংক্রান্ত অনুমান নির্ভর। তাছাড়া প্রভবে সমবিভাজন নীতি খাটছে কিনা এবং ম্যাগ্‌নেটোটার্‌বুলেন্ট গতির উদ্ভব হচ্ছে কিনা, তার উপরেও এই শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে। এগুলি বাদ দিলে এবং প্রভবে $১০^{-৪}$ গসের বেশী চৌম্বক তীব্রতা অনুমান করে নিলে এই শক্তির পরিমাণ মোটামুটি $১০^{৫৯}$-$১০^{৬১}$ আর্গ/সেকেণ্ডের মধ্যেই থাকে। এদের ধরলে $১০^{৬২}$ আর্গ/সেকেণ্ডের মত দাঁড়ায়।

এখন এই পরিমাণ শক্তির আবির্ভাব সম্পর্কে যে মতবাদই প্রস্তাব করা হোক না কেন, প্রস্তাবিত বিবর্তন এরূপ হওয়া উচিত, যাতে এই পরিমাণ শক্তি প্রয়োজনানুভূত চৌম্বক ক্ষেত্রও অপেক্ষবাদানুগ বিদ্যুতিন হিসেবে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর বিবেচ্য, গৃহীত কাঠামোর ২ বিভাগে ব্যক্ত ঘটনাগুলির সক্রিয়তার সম্ভাবনা কতটুকু এবং সম্ভাবনা থেকে থাকলে সেগুলির কার্যকারিতা কি পরিমাণ?

(খ) শক্তি সৃষ্টির জন্যে প্রস্তাবিত উৎসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো হয়েল ও ফাউলার-কৃত অভিকর্ষজ অন্তর্ধাবনের মতবাদটি। বিভিন্ন দিক থেকে কোয়াসারের আদি পর্যায়ের মোট ভর $১০^{৮}$ সৌরভরের মত অনুমিত হয়েছে। এই বিরাট জড়মানের লুমিনাস শক্তি তাপকেন্দ্রীন পন্থায় উৎপন্ন হয়েছে। $১০^{৬}$ বছরকালের মত এই অবস্থায় থাকবার পর জ্যোতিষ্কটির আকস্মিক অন্তর্ধাবন ঘটে। এই অন্তর্ধাবনের ফলে প্রচুর পরিমাণ অভিকর্ষজ তরঙ্গ নির্গত হয়। এই শক্তির বিনিময়ে কোন প্রকারে অপেক্ষবাদানুগ বিদ্যুতিন এবং উপযুক্ত পরিমাণ চৌম্বক ক্ষেত্রের আবির্ভাব ঘটে। এরপর সিনক্রোট্রন প্রক্রিয়া কাজ করে থাকবে।

এই ছবি প্রস্তাবিত হলে ১৯৬৫ সালে অভিকর্ষজ অন্তর্ধাবনের উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তার পর থেকে এই মতবাদের যথেষ্ট সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন সাধিত হয়েছে। চন্দ্রশেখর, রাইল, স্যাণ্ডেজ, হয়েল ও ফাউলার এবং বিশেষ করে হুইলারের কাজগুলি

উল্লেখযোগ্য। সামগ্রিকভাবে এই ছবির সন্নিহিত সমস্যাগুলি হলো :

(১) যে তাপকেন্দ্রীন প্রক্রিয়ার দ্বারা মৌলিক শক্তির সন্ধান করা হয়েছে, এখানে তার জন্যে ১০^{৮} সৌরভরের হাইড্রোজেনকে ০·১% থেকে ১% রূপান্তরক্ষম পুরাপুরি কেল্ভিন রূপান্তর প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণভাবে লোহার পরিণত করতে হবে এবং অন্ততঃপক্ষে ১০^{৬} বছরকাল যদি এই ধরণের প্রক্রিয়া বজায় থাকে, তাহলে প্রশ্ন উঠছে, এই বিরাট জড়মান বিবর্তিত হবার পক্ষে যথেষ্ট স্থায়িত্ব কোথায়? হয়েল ও ফাউলার ছাড়া আর অন্যান্যেরা যে সব পারমাণবিক উৎস নির্দেশ করেছেন, তাও একইভাবে বাতিলযোগ্য। কোন কোয়াসারের সমগ্র জীবনভর এই প্রক্রিয়া ঘটলেও এথেকে প্রাপ্তব্য শক্তির পরিমাণ মাত্র ~৮ × ১০$^{-৩}$ mc^2, অতএব যথেষ্ট নয়, বরং অভিকর্ষজ প্রক্রিয়ায় মোটামুটি সম্পূর্ণ mc^2 শক্তিই পাওয়া যাবে। সুতরাং ১০^{৩} বৎসরান্তে অভিকর্ষজ অন্তর্ধাবনের ধারণা এদিক থেকে সুবিধাজনক।

(২) ১০^{৮} সৌরভরের জড়মান কিভাবে পুঞ্জীভূত হয়েছে, বোঝা মুস্কিল।

(৩) পুঞ্জীভবনের সময় এমন কোন শীতলীভবনের পন্থা বিবৃত হয় নি, যাতে সামগ্রিকভাবে গ্যাসপিণ্ডটির আকস্মিক অন্তর্ধাবন ঘটা সম্ভব। হয়েল ও ফাউলার একপ্রকার ঘূর্ণনমূলক অসংরক্ষণের প্রস্তাব করেছেন, যাতে গ্যাস-অঞ্চলটি তিনটি ভাগে ভেঙে পড়েছে, বাইরের অংশ দুটি বিপরীত দিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে, ফেলে রেখে গেছে একটা মাধ্যমিক অঞ্চল। এই মাধ্যমিক অঞ্চলটির কৌণিক ভরবেগ অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাওয়ায় সোয়ারৎসাইল্ড্ ব্যাসার্ধ [যে ব্যাসার্ধবিশিষ্ট গোলকের উপরিভাগ থেকে জড়মানের উৎক্ষেপণ ঘটে আলোর বেগে]-বিশিষ্ট গোলক অপেক্ষা অনুমানে দুটি সম্ভাবনা স্ফুট হচ্ছে। এক—উৎক্ষিপ্ত অংশ দুটির বেগ অপেক্ষবাদী হলে এই ধরণের গতির দ্বারা প্রাগোক্ত সিনক্রোট্রন বিকিরণের পক্ষে উপযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্ট হতে পারে। দুই—মাধ্যমিক অঞ্চলের অন্তর্ধাবনমূলক অভিকর্ষজ বিকিরণ নির্গত হতে পারে।

(৪) কিন্তু ৩-এ সম্ভাবিত মাধ্যাকর্ষণের চাপে অন্তর্ধাবিত যে কোন বস্তুপিণ্ড অপেক্ষবাদতঃ অস্থায়ী। ৪·৪ × ১০^{৪} গুণ সোয়ারৎসাইল্ড্ ব্যাসার্ধের সমীপবর্তী হলেই পিণ্ডে এই প্রকার অস্থায়িত্ব সুরু হয়ে যাবে। এই অস্থায়িত্ব পিণ্ডের সঙ্কোচন রুদ্ধ করবে, পিণ্ডটিকে কখনই সোয়ারৎসাইল্ড্ সীমানায় আসতে দেবে না বরং একটি ব্যাসানুগ দোলনের সূত্রপাত করবে।

(৫) অভিকর্ষজ তরঙ্গ সৃষ্টির পন্থাটিতে একটি খেয়াল-খুসী ভাব উপস্থিত। হুইলার সংশোধিত অভিকর্ষজ অন্তর্ধাবনের কাঠামোয় হফ্ম্যান প্রস্তাবিত পন্থাটি অভিনব এবং ব্যবহৃত অনুমানগুলির যাথার্থ্য বিচারসাপেক্ষ। এদের মূল অনুমান হলো—১। অন্তর্ধাবনশীল পিণ্ডের একটি বিশেষ অবস্থায় ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক উভয় জাতেরই জড়মান উপস্থিত এবং ২। ওই অবস্থায় অভিকর্ষজ ক্ষেত্র এত শক্তিশালী যে, ধনাত্মক ভরের ঋণাত্মকে রূপান্তর নিবৃত্তিমূলক শাশ্বত নিয়ম ভেঙে পড়ে। ফলে এই রূপান্তরে প্রাপ্তব্য প্রচণ্ড শক্তি অভিকর্ষজ তরঙ্গ হিসাবে নির্গত হচ্ছে। প্রথমতঃ ওই অবস্থায় ঋণাত্মক ভরের অস্তিত্ব বিচারসাপেক্ষ এবং দ্বিতীয়টি স্পষ্টতঃই অনুমান হিসেবে অত্যন্ত তীব্র। এই দুটি অভিযোগ উপেক্ষা করলে পন্থাটির কয়েকটি সুবিধাজনক অনুসিদ্ধান্ত রয়েছে। ১। কেন না, অনভিকর্ষজ শক্তির দ্বারা কোন ভর-কণা ত্বরিত হলে অভিকর্ষজ তরঙ্গ নির্গত হবে এবং এটি ঘটবে অন্তর্ধাবিত পিণ্ডের কেন্দ্রকে, যেখানে

ভরের সৃষ্টি ওই কেন্দ্রক অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকছে। ২। বিকীর্ণ অভিকর্ষজ তরঙ্গ কেবলমাত্র ধনাত্মক ভরকেই স্থানান্তরিত করবে অর্থাৎ ঋণাত্মক ভর যখন ত্বরণের ফলে অভিকর্ষজ তরঙ্গ বিকীর্ণ করবে, তখন তা আরো বেশী ঋণাত্মক হয়ে পড়বে। ৩। ঋণাত্মক ও ধনাত্মক জড়মানের ধর্মাধর্ম অনুযায়ী যখন ধনাত্মক ভর পিণ্ডের উপরিভাগে চলে আসবে, ঋণাত্মক ভর তখন কেন্দ্রক অঞ্চলের দিকে ছুটে যাবে এবং সেখানে ধনাত্মক ভরের সঙ্গে ক্রিয়া করে পুনরায় শূন্য গড়-ভরসম্পন্ন একটি বর্ধমান কেন্দ্রক সৃষ্টি করাকালীন কিছু বাড়্তি তেজ উৎপন্ন করবে। এভাবে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক জড়মানের পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অভিকষজ তরঙ্গ এবং শক্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি প্রস্তাবিত।

(৬) এই প্রক্রিয়া যদিও বোধ্য, অন্তর্ধাবনী কাঠামোয় এদের সামগ্রিক নির্গমন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অত্যন্ত মারাত্মক। পিণ্ডটির অন্তর্ধাবনের সঙ্গে সঙ্গে যখন গোলকের মাধ্যাকর্ষণী ক্ষেত্র বলীয়ান হয়ে পড়ছে, তখন সনাতনী অপেক্ষবাদানুযায়ী নির্গমনযোগ্য শক্তি এই ক্ষেত্রের মধ্যেই সমাধিস্থ হয়ে পড়বে। হয়েল ও ফাউলার এই সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত, সেই জন্যে অন্তর্ধাবনী পিণ্ডকে নিখুঁত গোলক না ধরে প্রায় গোলক অনুমান এবং ক্ষেত্র সমীকরণগুলিতে আনুষঙ্গিক পরিবর্তন সাধন করেছেন। হফ্‌ম্যানের দ্বিতীয় অনুমানটির ন্যায় এই ধরণের পরিবর্তনও যথেষ্ট কৃত্রিম।

(৭) নোভিকভ, ৎসেলডোভিক এবং ওয়াই নীম্যানও অভিকর্ষজ অন্তর্ধাবনের মতবাদটি পর্যালোচনা করেছেন। কিন্তু সংকোচনজাত গতিশক্তি কি ভাবে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে? তাছাড়া প্রথমের দু'জন প্রায় গোলক বস্তুপিণ্ডের সংকোচন অধীক্ষণ করে দেখাচ্ছেন, সেল্ফ-ক্রোজিং বিক্রিয়ার জন্যে নির্গত শক্তিও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অভিকর্ষজ তরঙ্গের সঙ্গে বস্তুর বিক্রিয়া যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন অভিকর্ষজ বিকিরণের পদ্ধতি প্রস্তাবিত তত্ত্ব থেকে শক্তি নির্গমনের একটি রাস্তা মাত্র। অন্যান্য রাস্তা হিসেবে চৌম্বক ও ম্যাগ্‌নেটোহাইড্রোডায়নামিক প্রক্রিয়াগুলি অবশ্য বিবেচ্য।

অভিকর্ষজ অন্তর্ধাবনের ৪নং অসুবিধা একটি সুবিধাজনক পরিস্থিতি সম্ভাবিত করে। অতি সঙ্কুচিত পিণ্ডের সামগ্রিক ব্যাসার্ধানুগ (র‍্যাডিয়াল) [যদি আকার ১ আলোকবছরের মত হয়] দোলন দার্শদ্যুতি পরিবর্তনকারী কোয়াসার ব্যাখ্যা করতে পারে। অধিকন্তু এই অবস্থায় হয়েল, নার্লিকার ও হুইলার প্রস্তাবিত পন্থায় তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গও উৎপন্ন হতে পারে।

বস্তুতঃ অন্তর্ধাবনী ও ঘূর্ণ্যমান প্লাজ্‌মা মেঘে চৌম্বক ক্ষেত্রের বিবর্তনগুলি একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়। অন্তর্ধাবনী মতবাদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্ত সম্ভাবনাগুলি বিচার্য: মেঘের ভিতর বিভিন্ন আপেক্ষিক গতি থাকায় সঙ্কোচনের সঙ্গে চৌম্বক বলরেখাগুলি জট পাকিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রকে কতখানি বলীয়ান করবে, সে অবস্থায় প্রধান জড়মানের সঙ্কোচন-গতি রুদ্ধ হবে কি না ও বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের অন্তর্ধান ঘটবে কি না, ঔদচৌম্বকীয় ঘটনাবলীর ঔদতাড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ ও জ্যোতির পর্যায়ানুসারী পরিবর্তন ও সিনক্রোট্রন বিকিরণ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব কি না।

(৮) অভিকর্ষজ অন্তর্ধাবনে বিশেষ করে অভিকর্ষজ তরঙ্গের দ্বারা শক্তি নির্গমনের মতবাদ যে মারাত্মক দুর্বলতার জন্যে স্বয়ং প্রণেতার দ্বারা বর্তমানে বর্জিত হয়েছে তা এই যে, এর কোথাও সিনক্রোট্রন বিকিরণের জন্যে প্রয়োজনানুভূত অপেক্ষবাদানুগ বিদ্যুতিনের আবির্ভাব নির্দিষ্ট করা হয় নি। সুতরাং অভিকর্ষজ অন্তর্ধাবনের মতবাদ ছেড়ে হয়েল এবং ফাউলার সম্প্রতি যে প্রস্তাব

চিন্তা করছেন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন, অপিচ কম অভিনব নয়।

হয়েল ও ফাউলারের সাম্প্রতিক তত্ত্বে কোয়াসারগুলি নীহারিকার অত্যুষ্ণ এবং অতি ঘন অঞ্চল থেকে নিক্ষিপ্ত গ্যাসপিণ্ড। এরই ভিতরে কোয়ার্ক ও অ্যান্টিকোয়ার্কের বিক্রিয়ায় অপেক্ষবাদানুগ বিদ্যুতিন ও শক্তি নির্গত হচ্ছে।

কোয়ার্ক নামে একটি সম্ভাব্য কেন্দ্রীন কণা বিশ্বজগতের মৌলিক উপাদান হবার পক্ষে সন্নিহিত অতীতে মতবাদ প্রস্তাবিত হয়েছে। প্যারিস অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ডাঃ ফ্রাঁকো প্যাসিনি লণ্ডনের এক আলোচনা সভায় বলেছেন, নাক্ষত্র জীবনের শেষ অবস্থা অর্থাৎ সাদা বামন পর্যায়ের ঘনত্বে তথায়স্থিত অ্যান্টি-কোয়ার্কের সঙ্গে বিক্রিয়ার মাধ্যমে কোয়ার্কগুলি পারমাণবিক জ্বালানী হিসেবে কাজ করতে পারে। আদৌ যদি কোয়ার্কের কোন অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে এর বিদ্যুতাধান হবে বিদ্যুতিনগুলির এক অথবা দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র। এযাবৎ যদিও এরূপ কোন কণা পরীক্ষাগারে ধরা পড়ে নি, এর তাত্ত্বিক গুরুত্ব যে কতখানি সুদূরপ্রসারী, তা হয়েল ও ফাউলারের ব্যবহারেই চিহ্নিত। হয়েলের হাতে এই ধারণার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে। এঁর মতে, তিনটি কোয়ার্ক মিলে একটি ব্যারিয়ন (Baryon) এবং একটি কোয়ার্ক-অ্যান্টি-কোয়ার্ক মিলনে একটি মেসন তৈরি হয়। এই ধরণের মিলনে বিভিন্ন কেন্দ্রীন কণা, (নিউট্রিনো ও বিভিন্ন ধরণের মেসন) ও আলোক-কণারূপে কি নিদারুণ তেজ নির্গত হবে, তা সহজেই অনুমেয়। এই উচ্চ গতিশক্তিসম্পন্ন মেসনগুলি বিয়োজিত (ডিস্‌ইন্‌টিগ্রেটেড) হয়ে অপেক্ষবাদানুগ বিদ্যু-তিনগুলির জন্ম দিতে পারে। তাছাড়া সিনক্রো-ট্রন-বিকিরণ ও বেতার-বর্ণালী থেকে নির্দিষ্ট বিদ্যু-তিনগুলির শক্তি পৃথিবীতে আগত বিশ্বজাগতিক প্রোটোন রশ্মির শক্তির তুল্য হওয়ায় এসব বিদ্যু-তিন নির্গত কেন্দ্রীন কণাগুলির সঙ্গে মহাজাগতিক প্রোটোনের বিক্রিয়ায় সৃষ্ট হওয়াও অসম্ভব নয়।

৪। (ক) বেতার নীহারিকা বা কোয়াসার-গুলির অবম জীবনকাল নির্ণীত হয় দার্শ অংশ থেকে বেতার বিকিরণকারী অঞ্চলের বহুর মাত্রার দূরত্বের দ্বারা (অর্থাৎ দূরত্বকে (সে. মি) আলোর গতিবেগ দিয়ে ভাগ করলে বছরে প্রকাশিত ভাগফল)। খুব সম্ভব এই কাল $১০^{৫}$ থেকে $১০^{৬}$ বছরের মত হবে। প্রথমটি বলা হচ্ছে তার কারণ, কোয়াসারগুলি আলোর বেগে উৎক্ষিপ্ত নাও হতে পারে। হলে শেষের মানটিই গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

সিনক্রোট্রন মতবাদের ভিত্তিতে $১০^{-৪}$ গস চৌম্বক তীব্রতাবিশিষ্ট ক্ষেত্রে অপেক্ষবাদানুগ বিদ্যু-তিনগুলির অর্ধ জীবনকাল (হাফ-লাইফ) $১০^{৮}$ বছর। অতএব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যুতিনকে একঘেয়েভাবে শক্তি বিকীর্ণ করতে হবে। কিন্তু জোরালো দার্শ সিনক্রোট্রন বিকিরণকারী কোয়া-সারগুলির বেলায় এই অর্ধ জীবনকাল $১০^{২}$-$১০^{৩}$, কি আরো কম বছর মাত্র। সে সব ক্ষেত্রে বিদ্যুতিনগুলির নিরন্তর—হয় জোগান দিতে হবে, না হয় ত্বরিত করতে হবে।

সাধারণ, যেমন—নিম্নোক্ত তথ্যগুলির বিশ্লেষণে প্রভবের কেন্দ্রস্থিত ভারী বস্তুপিণ্ডের পর্যায়ক্রমিক বিস্ফোরণের ফলে প্রভবের চৌম্বক ক্ষেত্রে বিদ্যু-তিনগুলির অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত প্রবল হয়ে উঠছে। এর পক্ষে যা বলবার তা হচ্ছে, প্রভবগুলির যুগ্মতা বা আরো গঠনিক জটিলতার জন্যে এই ধরণের বিস্ফোরণ প্রয়োজনানুভূত এবং এম ৮২ প্রভবটিতে এই ধরণের বিস্ফোরণের নজীর বর্তমান। তথ্যগুলি এই :

(১) বর্ণালীর ৭ নম্বর বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হয় $N(E) \propto E^{-১.৫ \pm ০.৪}$। এই মৌলিক শক্তি বিভাজন-সম্পন্ন বিদ্যুতিনগুলি ক্ষেপে ক্ষেপে চৌম্বক ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে কেলারম্যান-প্রোক্ত বর্ণালী-সূচকের কম্পাঙ্কানুযায়ী মান বিভিন্নতার ব্যাখ্যাটি এই: নিম্ন কম্পাঙ্কে সিনক্রোট্রন ও বিপ্রতীপ কম্পটন বিক্রিয়া ততখানি ক্রিয়া না করায় ∝=০'২৫। মাধ্যমিক কম্পাঙ্কে কিন্তু বিদ্যুতিনগুলির শক্তিক্ষয়ের কাল কেন্দ্রক বিস্ফোরণের পর্যায়কাল অপেক্ষা বেশী এবং সে ক্ষেত্রে বিদ্যুতিন অনুপ্রবেশ ঘটছে প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় (কোয়াসি-কনটিনিউয়াসলি)। সে ক্ষেত্রে ∝=০'৭৫। কিন্তু উচ্চ কম্পাঙ্কে সিনক্রোট্রন ও বিপ্রতীপ কম্পটন বিক্রিয়ায় বিদ্যুতিনগুলির শক্তিক্ষয় বর্ণালীকে খাড়া করে তোলে এবং ∝-কে ১'৩৩ মানে নিয়ে আসে। বর্ণালী-সূচকের মান-পরিবর্তনের ধরণে ∝= -১'৩এ একটি হঠাৎ কাট-অফের অস্তিত্ব এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে।

(২) বর্ণালীর সেন্টিমিটার তরঙ্গাঞ্চলে বেশ বড় রকমের ধনাত্মক বক্রতার অস্তিত্ব এবং দার্শ ও বেতার বিকিরণের দ্রুত পরিবর্তন থেকে মনে হয়, খুব সম্প্রতি বিদ্যুতিনগুলির এক ক্ষেপ অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

(৩) সার্লে, রোজার্স, সার্জেন্ট এবং ওক সম্প্রতি পাঁচটি বিক্ষুব্ধ (সেক্সাট নীহারিকা এন জি সি ৪১৫১, ইটাক্যারিনা, ক্র্যাব নীহারিকা কোয়াসার ৩ সি ৪৮ ও অবলোহিত অঞ্চলের ৩ সি ২৭৩ বি) প্রভবের দার্শ বিকিরণের জন্যে দায়ী বিদ্যুতিনগুলির মৌলিক শক্তিবিভাজন নির্ধারণকারী একটি সাধারণ প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন। প্রভবগুলির বিক্ষুব্ধ ধরণটি বিশেষ লক্ষণীয়।

(খ) অথবা কোয়াসার কেন্দ্রকটি কি বিস্ফারণশীল কিংবা অন্তর্ধাবনোন্মুখ? এই প্রক্রিয়া দুটি কি কেন্দ্রকের বিস্ফোরণের সঙ্গে সংযুক্ত? অথবা কেন্দ্রক হয়তো বিস্ফোরণীই নয়, পর্যায় অনুসারী বিস্ফারণ এবং অন্তর্ধাবনশীল দোলক মাত্র।

কোয়াসার-কেন্দ্রক অন্তর্ধাবনী বা বিস্ফারণী যাই হোক, একে জ্যামিতিক স্থিতিশীল পিণ্ড বলতে বাধা আছে। তবে কেন্দ্রক যদি উপর্যুক্ত আশঙ্কাগুলির উপযোগী হয়, সান্ত্বনা এই যে, সে ক্ষেত্রে সরাসরি নীরিক্ষা একটা মীমাংসা করতে পারবে। বস্তুতঃ এটা খুব সম্ভব যে, সার্লে প্রভৃতি দৃষ্ট প্রভবের আভ্যন্তরীণ বিক্ষুব্ধতা কেন্দ্রকের প্রাথমিক বিস্ফারণ বা অন্তর্ধাবনের ফলমাত্র। ওয়াই নীম্যান এবং নোভিকভ স্পষ্টতঃই এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, কেন্দ্রক সহ কোয়াসারগুলি ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হতে পারে। বলা বাহুল্য, এই ছবি বহুলাংশে বিশ্ব-জাগতিক ধরণের এবং বিস্ফারণের কারণ অনেকটা বিগ ব্যাং ধারণানুযায়ী বিশ্ববিতানের মতই (অবশ্য বিশ্বসম্প্রসারণ যদি সমধর্মী পদবাচ্য হয়, এরা তা থেকে বঞ্চিত) এবং সেই ছবিতে কোয়াসারগুলি বিশ্ববিতানের সঙ্গে তাল না রাখতে পারা উপাংশমাত্র। পক্ষান্তরে অন্তর্ধাবনী মডেলটির পক্ষে উইলারের বক্তব্যও স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে, বহুদিন আগে আমাদের নীহারিকায় একটি কোয়াসার বিস্ফোরণ ঘটে গেছে এবং গোল তারার ঝাঁক তারই ধ্বংসাবশেষ। তা যদি হয়, এদের প্রত্যেকটিতেই একটি কেন্দ্রক থাকবে, যার সহসা অন্তর্ধাবন মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

বিস্ফারণ বা অন্তর্ধাবন যাই ঘটুক না কেন, এই ঘটনাতে (১) সিনক্রোটন বিকিরণের ফ্লাক্স ঘনত্বের যথাক্রমে হ্রাস বা বৃদ্ধি এবং (২) বিকিরণের সমবর্তন ধর্মাবলীর পরিবর্তন অবশ্যই লক্ষিত হবে এবং এর পক্ষে একাধিক তথ্যও ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত এবং পরীক্ষিত হয়েছে।

যাই হোক, বিশেষ করে সমবর্তন এবং সমবর্তনের মাত্রা পরিবর্তনের হারগুলির পরিমাপ বেতার পরিবর্ত কোয়াসারগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী বলে প্রমাণিত হতে পারে। এসব তথ্য আরো সংগৃহীত হলে প্রস্তাবে চৌম্বক

কেন্দ্রের জ্যামিতি ও পরিমাণ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে, প্রভবের পরিবর্ত-কেন্দ্রক থেকে রৈখিক সমবর্তনবিশিষ্ট বেতার বিকিরণ ঘটছে কিনা এবং তা যদি ঘটেই, এই পরিবর্ত-বিকিরণের উৎস নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি সেই উৎস সিনক্রোট্রন প্রক্রিয়ায় এবং পর্যায়ী পরিবর্তন কার্যকরী কেন্দ্রকের বিস্ফোরণে সৃষ্ট হয়, সে ক্ষেত্রে সমবর্তন ধর্মাবলীর পরিবর্তন অবশ্যই দৃষ্টিগোচর হবে। বিশেষ করে প্রাগোক্ত বিকীর্ণ তড়িৎ ভেকটরের অবস্থান-কোণের (পজিশন্যাল অ্যাঙ্গল)। নীহারিকাভ্যন্তরে ঘটিত ফ্যারাডে ঘূর্ণন, সিনক্রোট্রন স্ববিশোষণ-জাত অস্বচ্ছতা এবং বিস্ফোরণের আপেক্ষবাদী ফল ইত্যাদি উপেক্ষা করলে ৩ সি ৩৪৫ প্রভবটিতে ১৯৬৪ থেকে '৬৫ সালে বছরে শতকরা ২০ একক ফ্লাক্স ঘনত্ব হারে হ্রাস হয়ে থাকলে বর্ণালীর ১০.৬ সে মি.-এ বছরে প্রত্যেক ডিগ্রী অবস্থান-কোণে অন্যূন ৫ ডিগ্রী পরিবর্তন দৃষ্টি-গোচর হবে ($\propto = 0$, ঘূর্ণন ১০ র‍্যাডিয়ান/এম^২)। ৩ সি ২৭৯ প্রভবটিতে ($\propto - 0$ ঘূর্ণন ~২৮ র‍্যাডিয়ান/এম^২) ১৯৬৩-৬৫ সালে বছরে ৬% হারে ফ্লাক্স ঘনত্ব বৃদ্ধি অনুযায়ী উপযুক্ত পরিবর্তন ৯ ডিগ্রী হওয়া উচিত।

৫। সুতরাং কোয়াসারের মধ্যে আকার পরিবর্ত কেন্দ্রকের অবস্থিতি—তা প্রসরণশীল বা সঙ্কোচনশীল যাই হোক—অনুমান করে দ্যুতির পর্যায়ী পরিবর্তন এবং বর্ণালীর অন্ততঃ কয়েকটি ধর্ম (সেই সঙ্গে তাপীয় বিশোষণও, কেন না যে অঞ্চলে এটা অনুষ্ঠিত, তা বিস্ফোরণী কোয়াসা-রের উৎক্ষিপ্ত খোলস হওয়া সম্ভব) ব্যাখ্যা করা যায়। সে ক্ষেত্রে চন্দ্রশেখরের সমীকরণানুযায়ী অন্ত-র্ধাবিত গ্যাসপিণ্ডটির ব্যাসার্ধানুগ দোলক, হুইলারের ব্যাসার্ধানুগ দোদুল্যমান পিণ্ডের মধ্যে তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের সৃষ্টি, গোল্ডের মডেলে কেন্দ্রকে নির্দিষ্ট আয়তনে আয়নের সংখ্যাবৃদ্ধির দাবী, একমাত্র অন্তর্ধাবিত পিণ্ডের কেন্দ্রক-ঘনত্বে হফ্‌ম্যান কথিত ধনাত্মক স্তরের ঋণাত্মক জাতে বিয়োজিত হয়ে যাওয়া এবং হয়েল-ফাউলার ও প্যাসিনি-প্রোক্ত কোয়ার্ক-অ্যান্টিকোয়ার্ক বিক্রিয়ার সম্ভাবনা, কার্ডাশেভ কথিত ঔদচৌম্বকীয় তরঙ্গের সৃষ্টি ও ৎসারনোয়া-প্রোক্ত ঔদতাড়িৎ ঘটনাবলীর কাঠামোয় সিনক্রোট্রন বিকিরণের সম্ভাবনাকে এক সূত্রে এবং বিস্ফোরিত মডেলে সার্লে প্রভৃতি প্রস্তাবিত কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রভবের দার্শ বর্ণালীগত স্বাজাত্য, উইলার কথিত গোল তারার ঝাঁক (গ্লোবিউলার ক্লাষ্টার্স) কোয়াসার বিস্ফোরণের ধ্বংসাবশেষ হবার সম্ভাবনা, কেলারম্যান ইঙ্গিত ভারী কেন্দ্রকের পর্যায়ক্রমিক বিদ্যুতিন উৎক্ষেপের দাবী, পলিনি-টোথেরও অনুরূপ দাবীকে আরেক সূত্রে গ্রথিত করে সামগ্রিকভাবে কোয়াসার মডেলের প্রাথমিক চিন্তাপদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে।

সঞ্চয়ন

জীবন্ত কোষের মধ্যে রোগ নিরাময়ের নতুন পথের সন্ধান

বহু রোগের, এমন কি ক্যান্সার রোগেরও নিরাময় হতে পারে, মার্কিন বিজ্ঞানীরা জীবন্ত কোষের মধ্যে এরূপ একটি নতুন পথের সন্ধান পেয়েছেন।

রসওয়েল পার্ক মেমোরিয়েল ইনষ্টিটিউটের দু-জন রসায়ন-বিজ্ঞানী ডাঃ লিউনার্ড ওয়েজ ও তাঁর সহকারী ডাঃ এরিক মে-হিউ অন্য বিষয় নিয়ে গবেষণা করবার সময় দেখেছেন যে, জীবন্ত কোষ নিয়ন্ত্রক আর-এন-এ নামক রাসায়নিক উপাদান ঐ কোষের বহিরঙ্গে রয়েছে। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেছেন যে, এর পার্শ্ববর্তী কোষ বা সেলসমূহের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে ঐ সব কোষ সম্পূর্ণ এবং চিরতরেই পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। এই বিষয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জীববিজ্ঞান অনুযায়ী প্রচলিত মতের এটি সম্পূর্ণ বিরোধী। ঐ মতে কোষের কেন্দ্রে থাকে ঐ পদার্থটি এবং যে কোন জীবন্ত কোষের অণুর প্রাণ নিহিত থাকে ডি-এন-এ নামক বস্তুর মধ্যে। ডি-এন-এ সংক্রান্ত বিধিসমূহ আর-এন-এ-বাহী অণুসমূহ পালন করে, কার্যে রূপান্তরিত করে।

জীবন্ত কোষসমূহ একটির গায়ে আর একটি কি ভাবে সংলগ্ন হয়ে থাকে, ঐ বিজ্ঞানীরা সে বিষয়েই গবেষণা করছিলেন। এই বিষয় পর্যালোচনা কালেই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোষগুলিকে একটি কাচপাত্রের উপর রেখে দেখা গেছে—এরা সরে যায় এবং পিছনে ছাপ রেখে যায়। এই ছাপ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এতে আর-এন-এ-র চিহ্ন থাকে। পরে রসায়নাগারে তাঁরা এই বিষয়ে আরও পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, জীববিজ্ঞানের দিক থেকেই প্রকৃতিতে যেমন, তেমনি টেষ্ট টিউবের আর-এন-এ সক্রিয়।

এই বিজ্ঞানীরা এই প্রসঙ্গে আরও দেখিয়েছেন যে, কোষের বহিরাবরণ ভেদ করে আর-এন-এ নিঃসৃত হয়ে থাকে। তার চিহ্ন কাচের পাত্রে পাওয়া গেছে। তবে অন্য জীবন্ত কোষের মধ্যে যে এই বস্তুটির সংক্রমণ হয়ে থাকে, তা তাঁরা দেখান নি। তাঁরা বলেছেন যে, আর-এন-এ-র স্থানান্তরিত হবার প্রমাণ তাঁদের কাছে আছে।

বিজ্ঞানীরা স্তন্যপায়ী জীবের কোষ নিয়েই গবেষণা সুরু করেছিলেন। তবে তাঁরা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সব কোষের ত্বক বা বহিরঙ্গেই যে আর-এন-এ রয়েছে, তা নয়।

এই গবেষণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি মন্তব্য করেছেন যে, এই গবেষণার ফলে সুস্থ আর-এন-এ-র দ্বারা ক্যান্সার দুষ্ট-কোষসমূহকে স্বাভাবিক সুস্থ কোষে রূপান্তরিত করা যায় কি না, এই প্রশ্ন বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলতে পারে। এছাড়া কোষ সংক্রান্ত রসায়ন-বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতার ফলে বহু রোগের নিরাময় এখনও সম্ভব হয় নি। এই সব রোগের কোষসমূহকে সুস্থ কোষের আর-এন-এ-র প্রভাবে রেখে ঐ সব রোগ নিরাময় সম্ভব কি না, সে বিষয়েও বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা চিন্তার খোরাক জোগাবে।

ক্যান্সার সোসাইটি এই প্রসঙ্গে বলেছেন, অন্যান্য কোষের মধ্যে আর-এন-এ স্থানান্তরিত হবার সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্নও জেগেছে: প্রাথমিক পর্যায়ের কোষগুলি কি এই ভাবে গড়ে

ওঠে, বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের কোষ বার্ধক্য দশা প্রাপ্ত হয় ?

একই রকম আর-এন-এ-র অবস্থিতি দেখে সব কোষই কি একে অন্যকে চিনতে পারে এবং বাইরে থেকে কোন বীজাণু বা ভাইরাস কোষসমূহকে আক্রমণ করলে তার বিরুদ্ধে তাদের কি প্রতিরোধক শক্তি জন্মায় ?

লিওকেমিয়া রোগে কোষের মধ্যে যেমন হয়ে থাকে, তেমনি স্বয়ং প্রতিরোধক শক্তি জন্মাবার জন্যে পরজীবী বা প্যারাসাইট কোষসমূহের বহিরাবরণের উপর যে আর-এন-এ থাকে তা কি সুস্থ কোষগুলিতে স্থানান্তরিত হতে পারে ?

আর-এন-এ-যুক্ত ক্যান্সার রোগাক্রান্ত কোষসমূহের দ্বারা সুস্থ কোষ ছড়ে যাবার ফলে কি সংক্রামিত হতে পারে ?

আধুনিক কালের জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানীদের অভিমত—কোষের আচরণ ও ক্রিয়া নিরূপণ করে এর কেন্দ্রীনের পদার্থ ডিওক্সি নিউক্লিক অ্যাসিড, সংক্ষেপে ডি-এন-এ এবং রিবো নিউক্লিক অ্যাসিড, সংক্ষেপে আর-এন-এ। দেহে বিভিন্ন রকমের কোষ রয়েছে। কি ধরণের প্রোটিন তৈরি হবে, কোষের কেন্দ্রীনের পদার্থই তা নিরূপণ করে। মাংসপেশী অথবা যকৃৎ অথবা দেহের অন্য যে কোন অংশের কোষই প্রোটিন দিয়ে তৈরি। ঐ কেন্দ্রীনের পদার্থ কাজ করে ঠিক যেন একটি কম্পিউটারের মত।

আধুনিক কালে ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে, তার ভিত্তি ডি-এন-এ ও আর-এন-এ। তাঁদের অভিমত—কোষের কেন্দ্রের সংহতি বিনষ্ট হবার ফলেই ক্যান্সার রোগ দেখা দেয়। কোষের কেন্দ্রে যে সুস্থ ডি-এন-এ রয়েছে, বাইরে থেকে কোন ভাইরাস বা অন্য কোন কিছু আক্রমণ করে তাকে রোগদুষ্ট করে ফেলে এবং কোষটি বিকৃত হয়ে যায়। তারপর ঐ বিকৃত কোষ ঐ ধরণের কোষ উৎপন্ন করতে থাকে। ফলে অর্বুদ বা টিউমার ইত্যাদি দেখা দেয়।

বর্তমানে এই রোগ সম্পর্কে যে সব গবেষণা হচ্ছে, তাতে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, দেহে ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি ও বিস্তার আর-এন-এ-বাহী কোষের আবরণের সঙ্গে সংলগ্ন কোষের ঘর্ষণের ফলে আবরণটি ছড়ে যাবার জন্যেও হতে পারে। এমন দিন হয়তো আসছে, যখন কৃত্রিম আর-এন-এ তৈরি হবে এবং ক্যান্সার রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ করবার জন্যে ঐ সব টিকা হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার সহজ ও অভিনব পদ্ধতি

আমেরিকার প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রিক কেমিক্যাল লেবরেটরির ডিরেক্টর ও অধ্যাপক ডাঃ হিউবার্ট এন. অ্যালইয়ে কর্তৃক সকল স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যেই সস্তায় রসায়ন-বিজ্ঞান শিক্ষার এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান উপকরণ পুস্তক নয়, বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামই তার শ্রেষ্ঠ বাহন। বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। সে সব বাদ দিলেও বিজ্ঞানের মূল নীতিসমূহ বোঝাতে ও শেখাতে গেলে যে সব সাজসরঞ্জাম ও উপকরণের প্রয়োজন, তা কয়টি বিদ্যালয়েরই বা সংগ্রহ করবার সামর্থ্য আছে ?

এই কথা ভেবেই তিনি পৃথিবীর সকলেই যাতে কম খরচে হাতে-কলমে রসায়ন-বিজ্ঞান

শিখতে পারে, তারই সহজ ও সস্তা পদ্ধতি ও সাজসরঞ্জাম উদ্ভাবনে ব্রতী হন।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ বছরের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে যে পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেছেন, তাতে বিজ্ঞানের যে কোন শিক্ষক চারটি পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করবার যে সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অর্থাৎ এক্সপেরিমেন্ট করা প্রয়োজন, তা বছরে মাত্র ৩৫ টাকা খরচ করেই চালানো যাবে। এক একটি পাঠ্যক্রমের জন্মে বিভিন্ন প্রকার দুশো এক্সপেরিমেন্ট বা হাতে-কলমে পরীক্ষা চালাতে হবে। যে সব সাজ-সরঞ্জাম ও পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেছেন, তা যে কোন দেশেরই উপযোগী।

এতগুলি এক্সপেরিমেন্ট করবার খরচ এত কম কি করে পড়বে, তার বর্ণনা প্রসঙ্গে ডাঃ অ্যালইয়ে বলেন, অতি সামান্ত পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য এই সকল গবেষণায় ব্যবহৃত হবে। ফলে, আগে যেখানে প্রতিটি গবেষণার জন্মে বেশ কিছু টাকা খরচ হতো, সেখানে খরচ হবে মাত্র কয়েকটি পয়সা। তারপর ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উঁচু মঞ্চের উপর একটি প্রোজেক্টার ও রিফ্লেক্টারের সামনে এই গবেষণা চালানো হবে। ফলে বিপরীত দিকের অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখের দেয়ালের উপর সেই গবেষণার পাত্র, রাসায়নিক উপকরণ ও তাদের প্রতিক্রিয়ার ছবি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হবে। ধীরে ধীরে গবেষণা চালানো হবে। বুঝতে কষ্ট হলে ছাত্রেরা প্রশ্ন করে বুঝে নিতে পারবে। তারপর ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা খুব বেশী হলেও ঐ মস্ত বড় ছবি দেখতে কারো কোন কষ্ট হবে না। একজন শিক্ষককে ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বছরের পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করবার জন্মে গবেষণা বা এক্সপেরিমেন্টের দরুণ যেখানে গড়পড়তা ৪০০০ টাকা খরচ করতে হয়, এই ভাবে সেই সকল গবেষণা চালালে বছরে খরচ পড়বে মাত্র ৩৫ টাকা।

তারপর প্রোজেক্টার নির্মাণের খরচও তেমন কিছু নয়। মাত্র ১২০ টাকা খরচ করে শিক্ষক নিজেই অথবা ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের হাতেই তা তৈরি করে নিতে পারবেন। যাদের এই অর্থ খরচ করবার সঙ্গতি নেই অথবা যে সকল বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের কোন ব্যবস্থাই নেই, তারা মাত্র একটি বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্‌ ও ছয় টাকা মূল্যের একটি বোর্ডের সাহায্যে একটি প্রোজেক্টার তৈরি করে কাজ চালাতে পারেন। ঐ সকল বিদ্যালয়ে কোন মোটর গাড়ী থাকলে সেই মোটর থেকেই ঐ প্রোজেক্টারটিকে চালু করতে পারবেন। প্রোজেক্টার ও অন্যান্ত সাজসরঞ্জাম একবার তৈরি করে নিলে তাদের দ্বারা বহুকাল কাজ চলবে। অধিকাংশ এক্স-পেরিমেন্টই এদের সাহায্যে চালানো যাবে।

তবে সাজসরঞ্জাম বাবদ প্রাথমিক খরচ এবং প্রথম বছরে চারটি ক্লাশের গবেষণার জন্মে রাসায়নিক দ্রব্যের খরচ পড়বে ২০০ টাকা।

তারপর থেকে প্রতি বছর রাসায়নিক দ্রব্যাদির জন্মে খরচ ৩৫ টাকার বেশী পড়বে না। রাসায়নিক আধারের ভাঙাচোরা আছে। তার জন্মে বছরে কয়েক টাকা বেশী খরচ হবে।

দেড় হাজার বিভিন্ন রকম এক্সপেরিমেন্ট তাঁর উদ্ভাবিত এই পদ্ধতিতে চালাবার কথা তিনি বলেছেন। এই সকল গবেষণা বা এক্সপেরিমেন্ট তিনি করেছেন। আরও আড়াই হাজার এক্সপেরিমেন্ট এই পদ্ধতিতে করবার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। তবে এগুলি এখনও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয় নি। এই সকল গবেষণা নিয়ে তিনি একটি পুস্তক প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করেছেন। পুস্তকটি তিনি নিজেই প্রকাশ করবেন। অল্প খরচে জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেবার জন্মেই এই ব্যবস্থা।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এই পুস্তক পুনঃমুদ্রণের কোন স্বত্ব আমি রাখতে চাই না। আমি চাই পৃথিবীর যে কোন লোক বিজ্ঞান শিক্ষার এই পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটাক। যে কোন দেশের যে কোন সরকারকে তাদের বিদ্যালয়ের পড়াবার জন্যে এই পুস্তক প্রকাশের তিনি অনুমতি দিয়েছেন।

সম্প্রতি আসামের গৌহাটিতে সর্বভারত বিজ্ঞান শিক্ষকদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সমবেত ভারতীয় বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান শিক্ষকদের সামনে তাঁর অভিনব শিক্ষা-পদ্ধতি প্রদর্শন করেছেন। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে এবং ভারতের ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব সায়েন্স এডুকেশনের উদ্যোগে তিনি ভারত সফরে এসেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন মিশন তাঁর এই ভারত সফরের ব্যবস্থা করেছেন। ভারতের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনি পরিদর্শন করে তাঁর এই পদ্ধতি প্রদর্শন করবেন।

তাছাড়া ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থার উন্নতিবিধান, ভারতীয় অবস্থার উপযোগী সস্তায় বিজ্ঞান শিক্ষার সাজসরঞ্জাম নির্মাণ, অল্প খরচে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা, কলেজ ও স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা, হাল আমলের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ভারতের মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে শত শত গ্রীষ্মকালীন বিজ্ঞান শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ডাঃ অ্যালইয়ের এই ভারত সফর এই সকল শিক্ষা-শিবিরের শিক্ষা-পরিকল্পনা রূপায়ণে অনেকখানি সহায়ক হবে।

তাছাড়া ডাঃ অ্যালইয়ের এই পদ্ধতি ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে অনেকখানি সহায়ক হতে পারে। বহু শিক্ষক ইতিমধ্যেই এই পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—আমি চাই আমার মত সকলের কাছে বিজ্ঞান-চর্চা আনন্দের বিষয় হোক। আমার এই সহজ পদ্ধতি হয়তো ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই শিক্ষা ও শিক্ষণের দিক থেকে আনন্দের বিষয়ই হবে।

রক্তশূন্যতা ও তার নিরাময়

অধ্যাপক ও এফ তারাসোফ এই সম্বন্ধে লিখেছেন—যে কোন জীবদেহে রক্তের ভূমিকা ছোট করে দেখা কঠিন। রক্তই অন্ত্র থেকে সমস্ত পুষ্টিকর পদার্থ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বয়ে নিয়ে যায়। ফুস্ফুস থেকে অক্সিজেনও সমস্ত কোষে নিয়ে যায় রক্ত। ব্যাধির বিরুদ্ধে আমাদের রক্ষা করবার ব্যাপারে রক্তের গুরুত্ব সমধিক। এছাড়া রক্ত অন্য অনেক কাজও করে থাকে।

অস্থি-মজ্জার জাত রক্ত তরল অংশ এবং লোহিত ও শ্বেত দুই রকমের কণিকা নিয়ে গঠিত। তরল ও কোষীয় উভয় অংশই সমান গুরুত্বসম্পন্ন। লোহিত কণিকায় রয়েছে এক বিশেষ পদার্থ—তথাকথিত হিমোগ্লোবিন। এটি অক্সিজেনের সঙ্গে সম্পর্কে আসতে পারে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এরিথ্রোসাইটিস ও হিমোগ্লোবিন গঠনে বিঘ্ন ঘটতে পারে এবং রক্তে থাকে কম পরিমাণ লোহিত কণিকা ও হিমোগ্লোবিন। একেই বলা হয় রক্তশূন্যতা।

এই ব্যাধির ব্যাপক প্রকোপ দেখা যায় উন্নয়নকামী দেশগুলিতে—যেখানে জীবনধারণের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। ভারতের জনগণের [illegible]

রক্তশূন্যতা বিরল নয়। এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো অপুষ্টি এবং খাদ্যে প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের স্বল্পতা।

লোহিত কণিকা হিমোগ্লোবিন তৈরির জন্যে চাই প্রোটিন, অল্প ভিটামিন বি-৬, বি-১২ ও সি এবং ফলিক অ্যাসিড। প্রোটিন ও অন্নসের প্রধান উৎস প্রাণীর মাংস। শাকসব্জীতেও কিছু পরিমাণ প্রোটিন ও অন্নস আছে, তবে মাংসের তুলনায় অনেক কম। এক আউন্স ভেড়ার মাংসে থাকে ৫.৩ রতি (গ্রেণ) প্রোটিন ও ৩.৮ রতি স্নেহ জাতীয় পদার্থ। এক আউন্স সীমে আছে ১.৩ রতি প্রোটিন, ০.১ রতি স্নেহ জাতীয় পদার্থ ও ১.৫ রতি কার্বোহাইড্রেট। পুরাতন ব্যাধির ফলেও পুষ্টিগত রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। যক্ষ্মা, পুরাতন আমাশয় ও অন্যান্য ব্যাধির ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে।

ভারতে রক্তশূন্যতা ব্যাধির আর একটি বহুল প্রচলিত কারণ হলো হুকওয়ার্ম। গাত্রচর্ম ভেদ করে হুকওয়ার্মের শূককীট দেহে প্রবেশ করে। রক্তনালীতে প্রবেশ করবার পর রক্তস্রোত তাকে শেষ পর্যন্ত অন্ত্রে প্রবেশ করায়। এখানেই শূককীট পুরা কৃমিতে পরিণত হয় ও রক্ত শোষণ করতে থাকে। স্থায়ী রক্তক্ষয় রক্তশূন্যতার জন্ম দেয়। সঙ্গে সঙ্গে হুকওয়ার্ম প্রচুর ডিম পাড়ে এবং সেগুলি মনুষ্যদেহ থেকে বেরিয়ে এসে আবার শূককীটে পরিণত হয় ও মনুষ্যদেহে প্রবেশের সুযোগ খুঁজতে থাকে। সংক্রামিত মাটি মুখে পুরলে শিশুরাও আক্রান্ত হতে পারে।

রক্তশূন্যতার চিকিৎসা খুব সহজ নয়। রোগ নিবারণ বরং অনেক সহজ। বয়স্ক এরূপ রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের উপদেশে খাবারের সমস্যা সহজে সমাধান করা যায় না। এখানে মিশ্র মাংস, শাকসব্জী ও ভিটামিনপূর্ণ ফলমূল খাবার পরামর্শ দেওয়া যায়। গরমের সময় এবং কঠিন দৈহিক কাজ ও গর্ভাবস্থায় ভিটামিন খাওয়া বাড়ানো দরকার। ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে অবস্থাটা অন্য রকম। যে কোন রকমের দুধ বেশী খাওয়ানো প্রায়ই রক্তশূন্যতার জন্ম দেয়। শিশুর জন্মের পর পাঁচ মাস পর্যন্ত তাকে খাদ্য হিসাবে শুধু মায়ের দুধ দেওয়া উচিত, পরে ক্রমে ক্রমে এর পরিবর্তে শক্ত খাবার দিতে হবে। ভিটামিন বি-১, বি-৬, বি-১২ ও সি সব সময় দিতে হবে। নিরামিষাশী পরিবারে খাদ্যে মাংসের বদলে নানা রকমের প্রোটিন দিতে হবে।

হুকওয়ার্ম সংক্রমণ নিবারণের জন্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয়বিধ ব্যবস্থাদি চাই। ব্যক্তিগত ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে—দেহে শূককীট প্রবেশ নিরোধের জন্যে সব রকম উপায় অবলম্বন। শাকসব্জী ও ফলমূল পুরাপুরি গরম জলে ধুয়ে নিতে হবে এবং পানীয় হিসাবে শুধু ফুটানো জল ব্যবহার করতে হবে। মাছি মেরে ফেলতে হবে এবং ঘরবাড়ী মাছির উৎপাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মাছির পায়ে হুকওয়ার্মের ডিম লেগে থেকে তা ছড়াতে পারে। শিশুরা যাতে মাটি না খায়, সে জন্যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। খাবার আগে হাত-মুখ ধুয়ে নিতে হবে।

সামাজিক ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে, মলমূত্রের সংক্রমণ থেকে মাটিকে রক্ষা করা—কারণ মাটিতে হুকওয়ার্মের ডিম থাকতে পারে।

পাইরোসেরাম কি কাচ?

শ্রীগৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর অপরাহ্নে এসে আজ যদি প্রশ্ন তুলি, কাচ কি? তাহলে কেউই আমার প্রশ্নের গুরুত্ব দেবেন না। কারণ স্বাভাবিক যে জিনিষ আবহমান থেকে চলে আসছে, যে জিনিষ মানব সভ্যতার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য জীবনের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছে, যে জিনিষের উপর বহু বিজ্ঞানী দীর্ঘ দিন গবেষণা করে কাচ কি ও কেন—এই প্রশ্নের প্রায় পুরাপুরি সমাধান করে দিয়ে গেছেন—আজ যদি তার জের টানবার চেষ্টা করি, তবে অনেকেরই ঠিক মনে ধরবে না। কাচ কি—এর সর্বসম্মত সংজ্ঞা হলো —Inorganic product of fusion which has cooled to a rigid condition without crystallisation. যার অর্থ হলো—কতকগুলি অজৈব পদার্থের পূর্ণ গলনের পর ঠাণ্ডা করে যাকে শক্ত পদার্থে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং যার মধ্যে কোন কেলাস নেই। কিন্তু আধুনিক কালে, কয়েক বছর আগে এমন একটি কাচের আবিষ্কার ঘটেছে, যাতে উপরিউক্ত কাচের সংজ্ঞাটি আজ বিপন্ন। যার ফলে উপরিউক্ত সংজ্ঞাটিকে অক্ষত রাখবার উদ্দেশ্যে অনেকেই একে কাচ না বলে সেরামিক পদার্থ বলে অভিহিত করেছেন। এই পদার্থটির নাম পাইরোসেরাম (Pyroceram) আবিষ্কারক করনিং গ্লাস কোম্পানী, যুক্তরাষ্ট্র। তাঁরা প্রথমে এক বিশেষ ধরণের কাচ তৈরি করেন, সেই কাচটিকে পুরাপুরি কেলাসে পরিণত করেন—ফলে কাচের মধ্যে এসে গেল কেলাস, যা একেবারে সংজ্ঞার বিপরীত তাই পাইরোসেরামকে কাচের মধ্যে না বসিয়ে সেরামিক্স-এর মধ্যে বসানো হচ্ছে। কিন্তু একটু বিচার করলেই দেখা যায়, এটি একটি নিষ্ফল প্রচেষ্টা। কারণ কাচও সেরামিক্সের অন্তর্ভুক্ত। সেরামিক্স হলো আদি শব্দ—যা থেকে পরবর্তী কালে বিভিন্ন শিল্প ভাগ হয়ে গেছে, যেমন—কাচ, সিমেন্ট, রিফ্রাকটরিজ, এনামেল, পটারিজ, ষ্টোন ওয়েয়ার ইত্যাদি। সেরামিক্স শব্দটি গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে—'Keramos' যার অর্থ হলো পোড়ানো মৃত্তিকাঘটিত বস্তু। অবশ্য এখন সিরামিক্স বলতে বোঝায়—The art & science of making & using solid articles which have as their essential components and are composed in large part of inorganic, non-metallic materials. এর ফলে সেরামিক্স হয়ে গেছে বিশাল—এর মধ্যে এসে গেছে উপরিউক্ত জিনিষ ছাড়াও অধাতু অথচ চৌম্বক শক্তি সমন্বিত পদার্থ, ফেরো ইলেকট্রিক সারমেট প্রভৃতি অত্যাধুনিক কয়েকটি বিশেষ পদার্থ।

তাই কাচ ও কাচশিল্প বহু পুরাতন হলেও বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে অন্যান্য শিল্পকর্মের ন্যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কলেবর ধারণ করে বলেই সময় সময় বিভিন্ন নিয়ে এদের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ঠিক সেই কারণেই বোধ হয় কাচ ও কাচশিল্প এবং তার আধুনিক সংযোজন পাইরোসেরাম সম্পর্কে এখানে আলোচনা অযৌক্তিক হবে না।

কিছু দিন আগে পর্যন্ত কাচ বলতে কেবলমাত্র সিলিকেট যৌগবিশিষ্ট কাচই বোঝাতো। এই সিলিকেট গ্লাস্ বহুকাল থেকেই মানব সভ্যতায়

ইতিহাসের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। কাচের ব্যবহার প্রস্তর যুগেও দেখা যায়—তবে সেই কাচ ছিল প্রাকৃতিক—মানুষ প্রকৃতি থেকে একে আহরণ করেছিল, তখনও একে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করতে শিখে উঠতে পারে নি। কিন্তু পাথরের নির্মিত বস্তুর উপর হাল্‌কা কাচের আস্তরণ, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Glazing, তা খৃষ্ট পূর্ব ১২০০০ (বি. সি) —এই সময়ে দেখা গিয়েছিল। কাচ তৈরির প্রণালী এবং তার ব্যবহার আমরা দেখতে পাই খৃষ্টপূর্ব ৭০০০-৫০০০ সালের মধ্যে—অবশ্য খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ সালে মিশর দেশে কাচশিল্পকে আমরা প্রতিষ্ঠিত শিল্প হিসাবে পাই।

কিছুদিন আগে এনামেল নামক প্রবন্ধে (এপ্রিল, ১৯৬৬) বলা হয়েছিল পটারিজ, রিফ্রাক-টরিজ ইত্যাদি জিনিসগুলিতে হচ্ছে Incipient fusion অর্থাৎ গলনের সূত্রপাত হবার পর গলনকে আর অগ্রসর হতে না দিয়ে মাঝ পথেই তার গতি রোধ করে দেওয়া হয়, আর কাচ হচ্ছে পরিপূর্ণ গলন এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার পূর্ণসাধন। পূর্বে বলা হয়েছে যে, কাচের মধ্যে কোন স্ফটিকা-কার পদার্থের স্থান নেই। প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, কাচের সান্দ্রতা (Viscosity) এত বেশী, যার ফলে কেলাসের সৃষ্টি হতে পারে না। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, যদি কঠিন ও তরলের মধ্যে একটি বিশেষ শক্তির (যাকে বলা হয় Free energy) তফাৎ কম হয়, তাহলে কেলাস সৃষ্টি হতে পারে না।

প্রথমে কাচের সঙ্গে অন্য কয়েকটি জিনিসের তুলনামূলক আলোচনায় আসা যাক। কাচের অসুবিধা হলো এই যে, কাচ ভঙ্গুর—এই অসুবিধা সবচেয়ে মারাত্মক। কাচ যদি ভঙ্গুর না হতো, তাহলে হয়তো পৃথিবীর অনেক কিছুকেই স্থান দিতাম না। যদিও আজ বিশেষ ধরণের অভঙ্গুর কাচ তৈরি হচ্ছে, যার কথায় আমরা পরে আসবো। কাচের সুবিধা হলো এই যে, কাচের ক্ষয় খুব কম হয়, পাত্রগুলি খুবই মসৃণ হয়, রাসায়নিক ক্রিয়ায় স্থিতিশীল, উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে, তাপ প্রয়োগে সম্প্রসারণ কম হয়—ইত্যাদি। সর্বোপরি কাচের সৌন্দর্য। কাচের গুণাগুণ সম্পর্কে আরও একটি গুণের কথা না বললে অসঙ্গত হবে—গুণটা হলো এই যে, সহজে কাচের উপর দাগ কাটা যায় না—এমন কি, লোহা দিয়েও না। যার শক্তি বেশী, যাকে বলা হয় Hardness, সেই তার উপর দাগ কাটতে পারে। যেমন হীরকখণ্ড কাচের উপর দাগ কাটতে পারে এবং সে জন্যে হীরকই কাচকে খণ্ডিত করবার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে—যেহেতু হীরকের উপরিউক্ত শক্তি সবচেয়ে বেশী। এইখানেই কাচের জয় প্লাস্টিকের জিনিষ থেকে —কাচ অপেক্ষা প্লাষ্টিকের জিনিষের বেশ কয়েকটি বেশী ক্ষমতা আছে, কিন্তু এই ক্ষমতা একেবারে কম।

এবার কাচে কি কি থাকে এবং কাচ তৈরি করতে গেলে কোন্ কোন্ জিনিষের দরকার হয়, তার কথায় আসা যাক। প্রথমেই যদি আমরা এই প্রশ্নটিকে একটি বিশেষ ভাগে ভাগ করে নিই, তাহলে কিছুটা সুবিধা হবে—তিনটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যাক : (ক) কাচের উপাদান বা Glass Former, (খ) স্থিতিস্থাপক পদার্থ বা Stabilizer ও (গ) Flux অর্থাৎ যে জিনিষ পদার্থের গলনাঙ্কের মাত্রাকে নীচে নামিয়ে দেয়। একমাত্র সিলিকার দ্বারাই কাচ তৈরি করা যেতে পারে, এর সঙ্গে অন্য কোন উপাদান মেশাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাহলে অত্যন্ত উচ্চতাপের (প্রায় ২০০০° সেঃ) দরকার হবে, যা শিল্পের পক্ষে সহায়ক নয়, অন্য অসুবিধা যদিও আছে। এই সিলিকা হলো কাচের মুখ্য উপাদান এবং ক শ্রেণীভুক্ত। এর সঙ্গে বোরাক্সকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে,

যদিও বোরাক্স আরও একটি কাজে সহায়তা করে থাকে ; যেমন—গলনাঙ্কের মাত্রা হ্রাস করে। খ শ্রেণীর জিনিষগুলির মধ্যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (যা চুনা পাথর হিসাবে দেওয়া হয়) হলো অন্যতম। অন্যগুলির মধ্যে ম্যাগ্‌নেশিয়াম, সীসা, অ্যালুমিনিয়াম, বেরিয়াম ইত্যাদি ধাতুর অক্সিজেন-ঘটিত যৌগগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। গ শ্রেণীর মধ্যে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ধাতুর অক্সাইডই হলো অন্যতম। কেন এই ভাগ করা হলো, তার কথায় আসা যাক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র সিলিকা থেকেই কাচ তৈরি করা সম্ভব কিন্তু যেহেতু খুব উচ্চ তাপের প্রয়োজন হয়, সেহেতু তার সঙ্গে সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদির যৌগ মিশ্রিত করবার ফলে গলনাঙ্ককে নীচের দিকে নামানো সম্ভব হয়। কিন্তু আরও একটি উল্লেখযোগ্য জিনিষ এই যে, উল্লিখিত পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরি হয় সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সিলিকেট—এটি জলে দ্রবণীয়। সুতরাং এদের দ্বারা কাচ তৈরি সম্ভব নয়—যদি জলেই গুলে যায়, তবে আর লাভ কি? তাই দরকার হয় তৃতীয় পদার্থের—খ শ্রেণীভুক্ত জিনিষের, যা পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা এনে দেয়—যাকে বলা হয় Stabilize করে দেয়। চুনা পাথর মিশ্রণের ফলে পদার্থটি হয়ে যায় অদ্রবণীয়। এখন পৃথকভাবে এদের কাচের উপর ক্রিয়া লক্ষ্য করা যাক। প্রথমেই ধরা যাক সিলিকার কথা—যদি কাচে সিলিকার ভাগ বাড়ানো যায়, তাহলে কি হবে? (১) কাচের গলনাঙ্ক বেড়ে যাবে, (২) রাসায়নিক ক্রিয়ায় বেশী স্থায়ী হবে, (৩) তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি কম হবে এবং (৪) তৈরী করতে যে কাঁচা মাল লাগবে, তাতে খরচ কম পড়বে।

এরপর সোডার কথায় আসা যাক—এটির বৃদ্ধি ঘটলে—(১) রাসায়নিক ক্রিয়া কম স্থায়ী হবে, (২) কাচের গলনাঙ্ক কমে যাবে, (৩) তাপ প্রয়োগে বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, (৪) কাঁচা মাল সংগ্রহে বেশী দাম পড়ে যাবে।

এরপর চুনের কথায় আসা যাক। এর বৃদ্ধিতে—(১) স্থায়িত্ব বেড়ে যাবে, (২) কাচের গলনাঙ্কের কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটবে না, (৩) কাচের দ্রবণের মধ্যে কেলাস এসে যাবার সম্ভবনা দেখা দেবে, (৪) তাপমাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাচের সান্দ্রতার পরিবর্তন ঘটবে, (৫) কাঁচা মাল সংগ্রহে কম দাম পড়বে।

কাচের গলনাঙ্কের কথা বলতে গেলে দুটি তাপমাত্রার কথা বলতে হয়—একটি পূর্বের গলনাঙ্ক, যে তাপমাত্রায় কাচ তৈরির উপাদানগুলি গলে যাবে—তারপর রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হবে কাচ—সেই তাপাঙ্ক। আর দ্বিতীয়টি হলো যে তাপমাত্রায় গলিত কাচকে ইচ্ছানুযায়ী আকার দিতে পারা যায়, যাকে বলা হয় Work-ability। কাচ যদি চুল্লীতে গলিত অবস্থায় থাকে, তখন কাচের সান্দ্রতা থাকে কম। এই অবস্থায় একে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এই গলনের তাপমাত্রা আরও কমিয়ে দেওয়া হয়। ফলে সান্দ্রতার বৃদ্ধি ঘটে এবং এমন একটি সান্দ্রতায় আনা হয়, যখন ইচ্ছামত আকারে পরিণত করা সম্ভব হয়। সাধারণতঃ প্রথমোক্ত গলনাঙ্কের মাত্রা থাকে ১৪০০° সেঃ। অবশ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মাত্রা অনুসৃত হয়ে থাকে ; যেমন—ভারতে ১৩০০°-১৪০০° সেঃ, আমেরিকায় ১৫০০°-১৫৫০° সেঃ, ইংল্যাণ্ডে ১৪৫০°-১৫০০° সেঃ ইত্যাদি। মোট কথা, যত উপরের দিকে যেতে পারা যাবে, তত ভাল কাচ তৈরি করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয় তাপমাত্রা, যেখানে কাচকে আধারে পরিণত করা হয়—সাধারণতঃ ৪০০°-৫০০° সেঃ-এর কম গলনাঙ্কের তাপমাত্রা থেকে অর্থাৎ ৯০০°-১০০০° সেঃ।

কাচের উপাদানগুলির কথা যখন উল্লেখ করা

হয়েছিল, তখন দেখা গিয়েছিল যে, সবগুলিই কোন না কোন ধাতুর অক্সিজেনঘটিত যৌগ। এখন একটা কথা সহজেই মনে হবে যে, কোন কোন অক্সাইড থেকে কাচ পাওয়া যাবে—অর্থাৎ সবাই কেন ক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। সাধারণতঃ আমরা বলে থাকি, সব অক্সাইড থেকে কাচ পাওয়া যায় না অর্থাৎ সবাই Glass Former নয়—কেবল সিলিকা, বোরাক্স, আর্সেনিক অক্সাইড ইত্যাদি। এর অর্থ হলো, অন্য অক্সাইডগুলি গলিয়ে ঠাণ্ডা করলে তার মধ্যে কেলাস এসে পড়ে বলে কাচ তৈরি করা যায় না। তবে তত্ত্বগতভাবে সবাইকেই কাচে পরিণত করা যেতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করলে সবই কেলাসহীন পদার্থে পরিণত হবে। বোরাক্স কাচ অনেকগুলি সুবিধা এনে দিয়েছে; যেমন—স্থায়িত্ব, গলনাঙ্কের নিম্নমাত্রা এবং রাসায়নিক স্থিরতা। নীচে কয়েক প্রকার কাচের রাসায়নিক পরিসংখ্যান দেখানো হলো—

	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
SiO_2	৮০·৬	৬৪·৭	৬৬·০	৭১·৮	৭৪·০	৭১·৫	৬৭·২
Al_2O_3	২·০	৪ ২	২·৫	০·৫	০·৫	১·৫	—
Fe_2O_3	—	—	০·৩	—	—	—	—
CaO	১·১	০·৬	৭·৯	১৩·৫	৫·০	১৩·০	০·৯০
MgO	—	০·২	২·৪	০·৮	৩·৫	—	—
Na_2O + K_2O	৪·৪	৭·৭	২০·৯	১৩·৫	১৭·০	১৪·০	৯·৫+৭·৫
B_2O_3	১১·৯	১০·৯	—	—	—	—	—
ZnO	—	১০·৯	—	—	—	—	—
PbO	—	—	—	—	—	—	১৪·৮

(১) পাইরেক্স কাচ—উচ্চ তাপ সহনশীল এই কাচ পরীক্ষাগারের অপরিহার্য বস্তু। এর ক্ষয়ও খুবই কম। এটি বোরোসিলিকেট কাচের অন্তর্ভুক্ত। তাপ প্রয়োগে আয়তন বৃদ্ধি খুব কম।

(২) জেনা কাচ পাইরেক্স কাচের মত উচ্চ তাপ সহনশীল নয়, তবে এর রাসায়নিক স্থিতিশীলতা উপরিউক্ত কাচের মত। কিন্তু এই কাচের তাপে আয়তন বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত বেশী হয়।

(৩) পুরাতন ধরণের কাচ—এই ধরণের কাচের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে আজকাল এই ধরণের কাচ বেশী ব্যবহৃত হয় না।

(৪) প্লেট কাচ—প্লেট বা সিট (Plate & Sheet) তৈরির জন্যে ব্যবহার করা হয়। এই

কাচের আজকাল খুব চাহিদা, যেহেতু কাচের প্লেটের চাহিদা খুব বেশী।

(৫) Container Glass—এই কাচ দিয়ে কাচের বোতল বা নানান ধরণের পাত্র তৈরি করা হয়ে থাকে।

(৬) ১৯ শতকের জানালার কাচের একটি নমুনা।

(৭) টেবল কাচ—এই কাচের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই কাচের ঔজ্জ্বল্য খুব বেশী এবং এর প্রতিসরাঙ্কও (Refractive Index) বেশী।

তালিকায় যদিও লৌহ যৌগের স্থান দেওয়া আছে, তবু দেখা যায় প্রতি ক্ষেত্রেই তার কোন উল্লেখ নেই। লোহা কাচের কাছে অবাঞ্ছিত বস্তু। কাচে যে সবুজ রং দেখতে পাওয়া যায়, তা ঐ লৌহের উপস্থিতির ফল। তাই সর্বদাই চেষ্টা করা হয়, যাতে এই রং না আসে। প্রথম উপায়, লোহাকে কাছে ঘেঁষতে না দেওয়া—অবশ্য কাজটি খুবই কঠিন, কারণ কিছুটা পরিমাণ কাঁচা মালের সঙ্গে এসে যাবেই। তাই আমাদের দেখতে হবে, কি করে এর প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। দুটি উপায় আছে—একে বলা হয় Decolourization বা কাচ থেকে রং তাড়ানো। একটা কথা জেনে রাখা দরকার—লোহার (Fe) দুটি (প্রধানতঃ) যোজ্যতা—দুই ও তিন। যোজ্যতা যখন দুই, তখন রং সবুজ ও বেশ গাঢ় এবং যোজ্যতা যখন তিন, তখন রং হয় হলুদ—সে রং সর্বদাই ফিকে। তাই প্রথম উপায়ে চেষ্টা করা হয় ফেরাস (Fe^{+2}) যৌগকে ফেরিক যৌগে পরিণত করা এবং সেটা করা যেতে পারে জারিত করে; যেমন—

$$Fe^{+2} \rightarrow Fe^{+3} + e$$

একে জারিত করা যায় আর্সেনিক অক্সাইডের দ্বারা—

$$As^{+5} + 2\,Fe^{+2} \rightarrow As^{+3} + 2\,Fe^{+3}$$

অনুরূপভাবে অন্য কোন জারক পদার্থের দ্বারা এই কার্য সমাধা করা যেতে পারে। দ্বিতীয় উপায় হলো—এমন একটি জিনিষ কাচের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে, যার ফলে সেই পদার্থের একটি রং সৃষ্টি হবে (Complementary colour), যে রং লোহার সবুজ রঙকে ঢেকে দেবে। এমন একটি পদার্থ হলো (MnO_2) ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড।

কাচের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে একটি কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন—অ্যালকালি অর্থাৎ সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের কথা। এদের উপস্থিতিতে কাচের কি পরিবর্তন ঘটবে, তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন সমস্ত আধুনিক কাচ প্রস্তুতকারকগণের অ্যালকালি কম দেবার দিকে ঝোঁক। তার দুটি কারণ—(১) অ্যালকালি থাকলে কাচের স্থায়িত্ব কমে যায়—কাচের স্থায়িত্ব খুব দরকার। তাই অ্যালকালি সব সময় পরিমিত হারে দেওয়া প্রয়োজন, (২) এখন যান্ত্রিক যুগ, কাচ যন্ত্রের সাহায্যে আকার নিচ্ছে—আগে যেখানে মানুষে তৈরি করতো, সেখানে স্থান নিয়েছে যন্ত্র। যন্ত্রের গতি মানুষের চেয়ে অনেক বেশী। সে জন্যে যন্ত্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গেলে কাচের সান্দ্রতার পরিবর্তন কম সময়ের মধ্যে হওয়া দরকার, যাকে বলা যেতে পারে Shorter working range। তাই কাচের মধ্যে কম অ্যালকালি এবং বেশী পরিমাণে চুন ও ম্যাগ্নেশিয়াম দিয়ে ঐ অবস্থা আনতে পারা গেছে।

আর এক ধরণের কাচের কথা বলা দরকার—Optical glass বা চশমার কাচ। এই ধরণের কাচের ঔজ্জ্বল্য খুব বেশী দরকার আর তার জন্যে Refractive Index বা প্রতিসরাঙ্ক বেশী হতে হবে। বেশী পরিমাণে লেড দিয়ে ভাল ফল

পাওয়া গেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে এই ধরণের কাচ একেবারেই তৈরি হতো না। প্রথমে কলিকাতার সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এই কাচের উপর গবেষণা সুরু করে সাফল্য লাভ করে। তাদের উদ্যোগেই ওই গবেষণাগারে প্রথম এই ধরণের কাচ তৈরি হতে থাকে (Pilot plant production)। সম্প্রতি দুর্গাপুরে একটি কাচের কারখানা (Ophthalmic glass project) ভারত সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই বিশেষ ধরণের কাচ তৈরি করবার জন্যে। অত্যন্ত সুখের কথা এই যে, অল্প কয়েক দিন আগে এই কাচের কারখানায় উৎপাদন সুরু হয়েছে। এর ফলে ভারত কাচশিল্পের অগ্রগতির পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে।

কাচ উৎপাদনের কথায় আসতে গেলে প্রথমেই কাঁচা মাল সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। এখানে সকল প্রকার কাঁচা মাল সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কাজেই মুখ্য কাঁচা মালের কথাই বলছি। প্রথমেই ধরা যাক সোডিয়াম অক্সাইডের কথা। তিনটি অবস্থায় একে পাওয়া যেতে পারে—সোডিয়াম কার্বোনেট, সোডিয়াম সালফেট ও সোডিয়াম নাইট্রেট। এদের মধ্যে আবার সোডিয়াম কার্বোনেটই হচ্ছে বহুল ব্যবহৃত। পটাসিয়াম অক্সাইডের উৎস হলো পটাসিয়াম কার্বোনেট বা পার্ল ছাই, ফেল্ডস্পার (পটাশ) ও পটাসিয়াম ক্লোরাইড। ক্যালসিয়াম অক্সাইডের উৎস হলো চুনা পাথর। সিলিকার উৎস কোয়ার্ট্জ, ফ্লিন্ট ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রাস্তা-ঘাটে যে বালি আমরা দেখতে পাই, সেই বালি এই সব রাসায়নিক কাচ তৈরিতে খুব কমই ব্যবহৃত হয়—একমাত্র ঘর-বাড়ী তৈরি করবার কাজেই এদের ব্যবহার। বোরন অক্সাইডের (B_2O_3) প্রধান ও একমাত্র উৎস হলো বোরাক্স। কাঁচা মালের সঙ্গেই আরও একটি জিনিষের নাম এসে যায়, তার নাম কালেট (Cullet)। কালেট হচ্ছে ভাঙা কাচের অংশবিশেষ। যখন চুল্লীতে কাঁচা মালগুলি দেওয়া হয়, তার সঙ্গে শতকরা ২৫-৫০ ভাগ কালেট দেওয়া হয়ে থাকে। সাধারণতঃ কাচের কারখানায় নিয়মিত উৎপাদনের কালে অনেক কাচের টুকরা অবশিষ্ট থাকে। ফলে, চুল্লীতে দেবার সময় অসুবিধা ঘটে না—কিন্তু যদি এমন হয় এবং এমন দেখাও গেছে যে, কারখানায় এই টুকরা কাচ বা কালেটের অভাব ঘটেছে, তখন আরও একটি চুল্লী চালানো হয় এই কালেট উৎপাদনের জন্যে। এই কালেট দেবার সঠিক বৈজ্ঞানিক কারণ আজও জানা সম্ভব হয় নি, তবে যা দেখতে পাওয়া যায়, তা হলো এতে কাচ গলতে (কাঁচা মাল থেকে সুরু করে) সহায়তা করে এবং গলিত কাচের কার্য-ক্ষমতার উন্নতি দেখা যায়।

চুল্লীতে কাঁচা মাল দেবার পর কি কি পরিবর্তন ঘটে দেখা যাক :—

(ক) কাঁচা মালগুলির পরস্পরের সঙ্গে রাসায়নিক সংযুক্তি ঘটে।

(খ) এর ফলে যে বুদ্বুদের সৃষ্টি হয়, সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হয়। এই পদ্ধতির তিনটি নাম আছে রিফাইনিং, ফাইনিং ও প্লেনিং। এদের মধ্যে প্রথম নামটিই বহুল প্রচারিত।

(গ) যখন গলিত কাচ কাজের উপযোগী হবে, তখন সেই কাচকে এমন ভাবে ঠাণ্ডা করতে হয়, যার ফলে সান্দ্রতার পরিবর্তন ঘটবে এবং সেই গলিত কাচকে উপযুক্ত আধারে রূপান্তরিত করবার কাজে ব্যবহৃত করা যাবে।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে প্রথমে অ্যাল-কালি গলে যায় এবং তারপর সুরু হয় চুনা পাথর ও বালির সঙ্গে বিক্রিয়া। বালির সঙ্গে বিক্রিয়া

হতেই একটু সময় লাগে। তবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় ২০-৩০ ভাগ—কাচ যতক্ষণ চুল্লীতে থাকে। বেশী সময় অর্থাৎ শতকরা ৬০-৮০ ভাগ সময় লাগে পূর্বোল্লিখিত রিফাইনিং-এ। এই সময় ধরা হয়—উৎপন্ন বুদ্বুদ গলিত কাচ থেকে উপরে উঠে আসা এবং তারপর ফেটে যাওয়া পর্যন্ত। সুতরাং এই সময় কমাবার জন্যে অনেক চেষ্টা চলেছিল—তার ফলে দেখা গেছে, এই সময় অর্থাৎ বুদ্বুদের কাচের মধ্যে গতি ষ্টোক্সের সূত্র মেনে চলে। এই সূত্র অনুসারে দুটি উপায় আছে —(১) কাচের সান্দ্রতা কমানো এবং (২) কাচের মধ্যের বুদ্বুদের আয়তন বৃদ্ধি করা। প্রথমোক্ত উপায়ের একটি কথা হলো, যদি চুল্লীর তাপমাত্রা বাড়ানো যায় তাহলে সান্দ্রতা কমে যাবে, কিন্তু চুল্লীর আয়ুও হ্রাস পাবে। কারণ যে রিফ্রাক্টরিজ (সাধারণতঃ সিলিমেনাইট) দিয়ে এই চুল্লী তৈরি হয়ে থাকে, সেই রিফ্রাক্টরিজ বেশী তাপ-মাত্রায় বেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, ফলে উচ্চ তাপ কথাটি ব্যবহারে একটু কৃপণতা দেখাতে হবে। আর একটি জিনিষ হচ্ছে—এমন কতকগুলি দ্রব্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন ১ ভাগ বোরাক্স বা ০·২০ ভাগ ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড, যাদের উপস্থিতিতে কাচের সান্দ্রতা কমে যাবে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে কাচের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। দ্বিতীয় উপায়ের মধ্যে আছে—কাচের কাঁচা মালের সঙ্গে এমন কতকগুলি দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে—যেমন আর্সেনিক, নাইটার ইত্যাদি, যেগুলি অপেক্ষাকৃত শেষের দিকে ভাঙতে সুরু করে এবং এক সঙ্গে ভাঙে বা বুদ্বুদ সৃষ্টি করে। ফলে যদি অনেক বুদ্বুদ একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়, তাহলে বুদ্বুদগুলি পরস্পর ধাক্কা খেয়ে আকারে বড় হয়ে যায়—যার ফলে সহজেই গলিত কাচ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। আর্সেনিক রিফাইনিং-এর কাজে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। এটি উপরিউক্ত কাজ ছাড়াও নিম্নোক্ত ভাবেও কাজ কাজ করে। প্রথমে আর্সেনিক উৎপন্ন বুদ্বুদের অক্সিজেনকে আকর্ষণ করে (অল্প তাপে)—
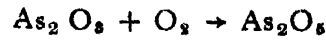
$$As_2O_3 + O_2 \rightarrow As_2O_5$$

তারপর তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে As_2O_5 ভেঙে যায় এবং গৃহীত অক্সিজেনকে ছেড়ে দেয়।
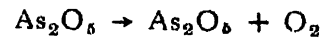
$$As_2O_5 \rightarrow As_2O_3 + O_2$$

এই অক্সিজেন কাচ থেকে সব বুদ্বুদকে তাড়িয়ে দেয়। ফলে শেষে কাচের মধ্যে কেবলমাত্র অক্সিজেন থাকে। এইবার যখন কাচকে কাজে ব্যবহার করবার জন্যে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা করতে হবে, তখন পূর্বোল্লিখিত রাসায়নিক ক্রিয়া অর্থাৎ $As_2O_3 + O_2 \rightarrow As_2O_5$ ঘটবে। ফলে কাচের মধ্যেকার সব অক্সিজেনও থাকবে না গ্যাসীয় অবস্থায়।

সাধারণভাবে দুই প্রকারের চুল্লী ব্যবহৃত হয়ে থাকে—(১) পট ও (২) ট্যাঙ্ক। পটগুলি আকারে ছোট, বড় জোর ১ টন। ৮।১০টি পট এক সঙ্গে একটি চুল্লীতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়—তারপর একে একে একটি একটি পট ব্যবহার করা হয়। এতে বিভিন্ন রঙের কাচ, বিভিন্ন রাসায়নিক সংযুক্তি-যুক্ত কাচ এবং বিশেষ ধরণের কাচ একই সঙ্গে প্রস্তুত করা সম্ভব। চশমার কাচ তৈরি করতে গেলে এই পদ্ধতি শ্রেয়। ট্যাঙ্ক চুল্লী আবার দুই প্রকারের—Day tank furnace বা প্রতি-দিনের ট্যাঙ্ক চুল্লী। এই চুল্লীতে কাচ তৈরি হতে ২৪ ঘন্টা লাগে, তাই প্রতিদিন কাঁচামাল দিয়ে তার পরের দিন কাচ তৈরি সুরু হয়। অন্য প্রকারের চুল্লী হলো Continuous tank furnace বা সর্বক্ষণের কাচ উৎপাদক চুল্লী। এই ধরণের চুল্লী থেকে সর্বদাই কাচ পাওয়া যাবে এবং বর্তমানে এই চুল্লীই সকলে তৈরি করে থাকেন। সাধারণভাবে যত উচ্চ তাপ ব্যবহার করা

যাবে, ততই চুল্লীর আয়তন সমপরিমাণ কাচ উৎপন্ন থেকে কমে যাবে। বোতল ইত্যাদি তৈরির জন্যে প্রতিদিন ১ টন কাচ উৎপাদন করতে গেলে ১০ বর্গফুট ক্ষেত্রবিশিষ্ট চুল্লী দরকার। যত টন দরকার সেই মাপকে ১০ দিয়ে গুণের পরিমাণ জায়গা দরকার বা চুল্লীর আয়তন অনুরূপ হওয়া দরকার। চুল্লীর গভীরতা সাধারণতঃ ৫ ফুট থেকে ৩ ফুট থাকে।

কাচের একটি জিনিষ হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, হঠাৎ তাপ পরিবর্তিত হলে কাচ ফেটে যায়—ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কাচ ফাটে বেশী সময় ঠাণ্ডা করবার সময়—গরম করবার সময় কম ফাটে। তার কারণ কি? পরীক্ষার ফলে দুটি জিনিষ দেখা যায়; যেমন—(১) কাচের চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা (Compressive strength) টানের (Tension) ক্ষমতার চেয়ে বেশী। (২) কাচকে যখন গরম করা হয়, তখন কাচের বাইরের তলে থাকে Compression বা চাপ এবং ভিতরে থাকে টান। যখন ঠাণ্ডা করা হয়, তখন হয় বিপরীত অর্থাৎ বাইরের তলে থাকে টান আর ভিতরে থাকে চাপ। ভাল করে দেখলে আর একটি ব্যাপার প্রতীয়মান হয় যে, কাচে যে ফাটের সৃষ্টি হয়, তা সর্বদা বাইরের তল থেকেই সুরু হয়। এখন তাহলে বলা যেতে পারে—কেন কাচ ঠাণ্ডা করবার সময় ফেটে যায়? ঠাণ্ডা করবার সময় টান এসে যায় বাইরের তলে—যেহেতু কাচের টান সহ্য করবার ক্ষমতা কম, সেহেতু ফাটল দেখা দিলে ঠাণ্ডা করবার সময় সুরু হবে। তাই সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে কাচে টানের পরিমাণ খুব কম থাকে। কাচে দুই প্রকারের টানের সৃষ্টি হতে পারে—(ক) অস্থায়ী টান—এই টান হলো, যতক্ষণ কাচের মধ্যে তাপমাত্রার তফাৎ থাকবে, ততক্ষণই কাচের মধ্যে টান থাকবে, যখন এই তাপমাত্রার তফাৎ ঘুচে যাবে টানও অদৃশ্য হবে। (খ) স্থায়ী টান—এই টান কাচের মধ্যে ঠাণ্ডা অবস্থায়ও বিদ্যমান থাকে, যার জন্যে কাচ তৈরি করবার পরেই যদি কাচকে কোমলায়িত (Annealing) না করা হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে ফেটে যাবে। এই কোমলায়ন পদ্ধতি হলো কাচ থেকে স্থায়ী টান দূরীকরণ। এই কোমলায়নের একটা সীমা রেখা আছে, যার মধ্যে টানকে সুযোগ ও সুবিধামত দূর করা যেতে পারে। এই সীমারেখার নিম্ন সীমা হলো, যে তাপমাত্রায় কাচের টান ৪ ঘন্টায় দূরীভূত হবে, আর উর্ধ্ব-রেখা হলো, যে তাপমাত্রায় কাচের টান মাত্র ১৫ মিনিটেই চলে যাবে। সাধারণতঃ ৫০০°-৫৫০° সেঃ তাপমাত্রা হলো কোমলায়ন সীমা-রেখা। কাচ তৈরি হবার পরেই গরম অবস্থায় কোমলায়ন যন্ত্রে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। কাচকে উচ্চ তাপমাত্রা থেকে ৫৫০° সেঃ পর্যন্ত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা যেতে পারে, তাতে কোন ক্ষতি হবে না—কারণ এই সময় সান্দ্রতা এমনি থাকে, যার ফলে কোন টানের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু এই তাপমাত্রার পর কাচকে ধীরে ধীরে খুব সাবধানে ঠাণ্ডা করতে হবে, যার ফলে স্থায়ী টানের পরিমাণ খুব কম হবে।

যদি স্থায়ী টানকে পুরাপুরি সরানো যেতে পারা যায় বা প্রায় পুরাপুরি হয়, তাহলে যে কাচ তৈরি হবে সেই কাচ সহজে কাটবে না বা ভাঙবে না। এর নাম Toughend বা Safety glass বা বিপদশূন্য কাচ। এই কাচ দিয়ে গাড়ীর জানালা ইত্যাদি—এমন কি, বাড়ীও তৈরি হচ্ছে। অনেক জায়গায় আজ কাচের বাড়ীর কথা শুনতে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে এই কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শিল্পমেলায় কাচের বাড়ীর কথা হয়তো অনেকেরই স্মরণ আছে। মেঝে থেকে সিঁড়ি

সবই কাচের তৈরি। এমন কাচও তৈরি করা সম্ভব, যার মধ্য দিয়ে বুলেটও প্রবেশ করতে পারে না।

যে পাইরোসেরামের কথা নিয়ে প্রবন্ধ সুরু হয়েছিল, এবার তার কথায় আসা যাক। এবার পাইরোসেরামকে কেন কাচের শ্রেণীভুক্ত করতে অসুবিধা হচ্ছে, সেটা বুঝতে সুবিধা হবে। গত ১৯৫৭ সালে আমেরিকার করনিং গ্লাস কোম্পানী একটি বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে এই কাচ তৈরির কথা প্রকাশ করেন এবং তার নাম দেন পাইরো-সেরাম। এই শ্রেণীতে সেগুলিই পড়বে, যেগুলিকে প্রথমে কাচে পরিণত করা হয়, তারপর তাপ নিয়ন্ত্রণের ফলে সেই কাচকে কেলাস গঠিত সেরামিক্স-এ পরিবর্তিত করা যেতে পারে। এই কেলাস সৃষ্টির জন্যে কোন একটি কেন্দ্রীনের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ এই জন্যে টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয়। এই পদার্থটিকে কাচের গলিত দ্রবণের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন পদার্থটি কাচের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যায়। তারপর ঠাণ্ডা করবার সময় এই পদার্থটিই কেন্দ্রীনের সৃষ্টি করে। পরবর্তী কালে তাপ নিয়ন্ত্রণের সময় পুরাপুরি কেলাসের আবির্ভাব ঘটে—এমন কি, শতকরা ১০০ ভাগ কেলাস উৎপন্ন করাও সম্ভব। এই কাচের যখন ছবি তোলা হয়, তখন দেখা যায় অসংখ্য কেলাস এবং তার ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে কিছু কাচ; অর্থাৎ কিছুটা কেলাসে পরিবর্তিত হয় নি। এই কাচ হলো খুব শক্ত, আর ছুটি বিশেষ গুণ সমন্বিত—এই কাচের Scratch resistance খুব বেশী অর্থাৎ এই কাচের উপর সহজে দাগ কাটতে পারা যায় না। আর এই কাচ ধাক্কা খেলে সহজে ভাঙ্গে না। এই কাচের অবশ্য বৈদ্যুতিক ক্ষমতা ও তাপমাত্রার পরিবর্তন সহ্য করবার ক্ষমতাও বেশী। এই পাইরোসেরাম কাচশিল্পেই হোক আর সেরামিক শিল্পেই হোক, একটি বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এই আবিষ্কারের ফলে গবেষণা ও শিল্প--উভয় দিকেই একটি নতুন পথের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করবো, কখন ভারতবর্ষে এই পাইরোসেরামের যুগ সুরু হবে।

ভেষজ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

১৯৬৭ সালের জন্যে ভেষজ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে যৌথভাবে। এই তিনজন বিজ্ঞানী হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ জর্জ ওয়াল্ড, নিউইয়র্কের রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব-পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ হলডেন কেফার হার্টলাইন এবং সুইডেনের ষ্টকহোমের স্নায়ু-শারীরতত্ত্ব বিষয়ক নোবেল ইনষ্টিটিউটের প্রধান ডাঃ র‍্যাগ্‌নার গ্রানিট। চোখে আমরা কি ভাবে দেখতে পাই—জৈব রসায়ন, জৈব পদার্থ-বিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্বের দিক থেকে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে এই তিনজন বিজ্ঞানীর অনন্যসাধারণ গবেষণার ফলে। দৃষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব কিভাবে চোখ থেকে মস্তিষ্কে বাহিত হয়, তা সুস্পষ্টরূপে এখন জানা গেছে। এই তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর কর্মকৃতি ও গবেষণার বিষয় আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

ডাঃ জর্জ ওয়াল্ড

অক্ষিপটে আলোকগ্রাহী কোষগুলি কিভাবে আলোর দ্বারা সক্রিয় হয়ে ওঠে, সে বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে ডাঃ ওয়াল্ড ব্যাপক গবেষণা চালান। কোন বস্তু দেখবার সময় চোখের আণবিক পুনর্গঠন কিভাবে সাধিত হয়, তাও তিনি দেখিয়েছেন। গত ৩০ বছর ধরে তিনি এই বিষয়ে গবেষণা করছেন। দর্শন প্রণালীতে দৃক-রঞ্জকগুলির ভূমিকা এবং ভিটামিন-এ-র গুরুত্ব তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। আলো যখন অক্ষিপটে আঘাত করে, তখন রড নামে অভিহিত আলোকগ্রাহী কোষে বিদ্যমান রডপ্‌সিন বা ভিসুয়াল পার্পল নামে পদার্থটি কিভাবে ভেঙে যায়, তা তিনি দেখিয়েছেন। প্রোটিন অপ্‌সিন এবং ভিটামিন-এ-র সংযোগে রডপ্‌সিনের উৎপত্তি হয়। আলোর আঘাতে রডপ্‌সিন ভেঙে

ডাঃ জর্জ ওয়াল্ড

যায় এবং অন্ধকার হলে তা আবার পুনর্গঠিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় অক্ষিপটে এমনভাবে সাম্য বজায় থাকে, যাতে রডপ্‌সিনের ভাঙন ও গঠনের হার হয় একই রকম। ভিটামিন-এ-র অভাব ঘটলে রডপ্‌সিনের গঠনের হার কমে যায়। এই কারণে যে সব প্রাণী ভিটামিন-এ-র অভাবঘটিত খাদ্য গ্রহণ করে, তাদের অক্ষিপটে রডপ্‌সিনের পরিমাণ হয় কম। পক্ষান্তরে যারা

ভিটামিন-এ-সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করে, তাদের অক্ষিপটে রডপ্‌সিনের পরিমাণ হয় বেশী। ডাঃ ওয়াল্ড দেখিয়েছেন, যখন অক্ষিপটের আলোকগ্রাহী কোষগুলি আলোর দ্বারা উত্তেজিত হয়, তখন কোষের রঞ্জকগুলিতে পূর্বোক্ত রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। কোষের রঞ্জকগুলি আবার স্নায়ুতন্তুগুলিতে বৈদ্যুতিক স্পন্দন সৃষ্টি করে।

ডাঃ ওয়াল্ড ১৯০৭ সালে নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৪ সাল থেকে তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং ১৯৪৮ সালে জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর আগে বার্লিন, জুরিখ ও হাইডেলবার্গে গবেষণাগারে তিনি গবেষণা করেন। দর্শনেন্দ্রিয়ের জৈবরসায়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে তিনি বহু সম্মাননা লাভ করেছেন।

ডাঃ হলডেন কেফার হার্টলাইন

কাঁকড়া এবং অমুষ্ণশোণিত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দর্শনেন্দ্রিয় সম্পর্কে ডাঃ হার্টলাইন ব্যাপক গবেষণা করেছেন। এই সব প্রাণীদের দর্শনতন্ত্র অপেক্ষাকৃত সরল। আলো যখন অক্ষিপটে পড়ে, তখন স্নায়ুকোষ ও তন্তু থেকে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত হয়, তা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তিনি পরিমাপ করেছেন। তিনিই প্রথম স্নায়ু-পদার্থ-বিজ্ঞানী, যিনি একক দর্শনেন্দ্রিয় কেন্দ্রের সক্রিয়তা পরিমাপ করেন। আলো যখন আলোকগ্রাহী কোষে পড়ে, তখন কোষের সঙ্গে সংযুক্ত একক স্নায়ুতন্তু যে বৈদ্যুতিক স্পন্দন সৃষ্টি করে, তা ব্যাখ্যা ও পরিমাপ করবার একটি পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেছেন। গত ৩০ বছরব্যাপী তাঁর গবেষণার ফলে জানা গেছে, চোখ কি করে সূক্ষ্ম তুলনামূলক বৈসাদৃশ্যের সাহায্যে দৃশ্য বস্তুর আকৃতি, কাঠামো, প্রান্তদেশ ও চালচলনের পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে।

ডাঃ হার্টলাইন ১৯০০ সালে পেনসিলভেনিয়ার ব্লুমসবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। লাফায়েত কলেজ থেকে বি. এস-সি. ডিগ্রী লাভের পর ১৯২৭ সালে তিনি জন্স হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব মেডিসিন ডিগ্রী অর্জন করেন।

ডাঃ হলডেন কেফার হার্টলাইন।

চিকিৎসাগত শিক্ষার সঙ্গে তিনি লাইপজিগ ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত থেকে তিনি চিকিৎসা-পদার্থ-বিজ্ঞানে গবেষণা চালান। ১৯৪৯-৫৩ সালে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও প্রধানরূপে কাজ করেন। ১৯৫৩ সালে নিউইয়র্কের রকফেলার ইনষ্টিটিউটে তিনি যোগদান করেন এবং বর্তমানে সেখানকার জৈব পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজে এবং পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি অধ্যাপনা

করেছেন। বহু পুরস্কার ও সম্মানসূচক ডিগ্রী তাঁকে প্রদান করা হয়েছে।

ডাঃ র‍্যাগনার গ্রানিট

১৯৪৭ সালের ডাঃ গ্রানিট চোখের বর্ণ-গ্রাহিতা সম্পর্কে যে অনন্যসাধারণ গবেষণা করেন, তার ফলে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। অক্ষিপটের বিভিন্ন স্নায়ু-এককগুলি আলোর বর্ণালীর
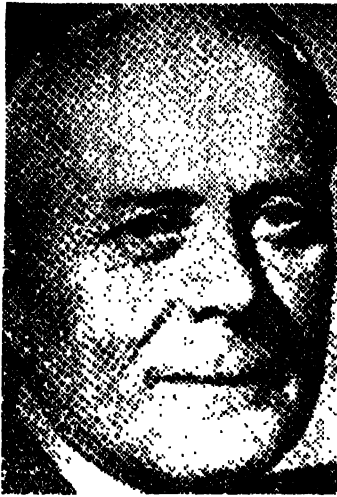
ডাঃ র‍্যাগনার গ্রানিট।

বিভিন্ন অংশে কিভাবে সাড়া দেয়, তা তিনিই সর্বপ্রথম দেখান। বর্ণালীর বিভিন্ন অংশে সাড়া দেবার জন্যে অক্ষিপটে যে তিন শ্রেণীর কোন্ (Cone) বা বর্ণগ্রাহী কোষের অস্তিত্ব আছে, তা ডাঃ গ্রানিট প্রমাণ করেছেন তাঁর মতানুযায়ী বর্ণ সম্পর্কে যে বার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার কোন্ থেকে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক স্পন্দনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল। ৪০ বছরেরও বেশী তিনি যে গবেষণা করেছেন, তা থেকে তিনি দেখিয়েছেন, স্নায়ুতন্ত্রে আলো কেবলমাত্র বৈদ্যুতিক স্পন্দনের উত্তেজনাই সৃষ্টি করে তা নয়, অবদমনও করে।

১৯০০ সালে ডাঃ গ্রানিট ফিনল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯২৯-৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে শিক্ষকতা করেন। অক্সফোর্ডে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত সার চার্লস শেরিংটনের অধীনে তিনি স্নায়ু-শারীরতত্ত্বের কয়েকটি বিষয়ে গবেষণা করেন। পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রিজস জনসন রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের ফেলো হিসাবেও তিনি চিকিৎসা-পদার্থ-বিজ্ঞানে গবেষণা করেন। ১৯৪০ সালে তিনি ষ্টকহোমের রয়েল ক্যারোলীন ইনষ্টিটিউটে যোগদান করেন এবং ১৯৪৫ সালে সেখানকার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সাল থেকে তিনি নিউইয়র্কের রকফেলার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপকরূপে কাজ করছেন। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্বৎসমাজ থেকে তিনি পুরস্কার ও সম্মানসূচক ডিগ্রী পেয়েছেন।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞান-সংবাদ

হৃৎপিণ্ড সংযোজন
দশ বছরব্যাপী গবেষণার ফল

শল্যচিকিৎসার দ্বারা একজনের হৃৎপিণ্ড অন্যের দেহে সংযোজনের ব্যাপারটি এতই নতুন যে, এপর্যন্ত এই ধরণের মাত্র কয়েকটি অস্ত্রোপচার হয়েছে। তবে এই নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হয়েছে অন্ততঃ দশ বছর আগে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড এবং ক্যালিফোর্ণিয়ার পালো আলটোর ডাঃ নরম্যান এডওয়ার্ড শুমওয়ে—এই উভয় শল্য চিকিৎসকই এই শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রোপচার সম্পর্কে কিছুটা শিক্ষালাভ করেছিলেন।

সেই সময়ে প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক ডাঃ ওয়েন ওয়ানগেনষ্টিনের অধিনায়কত্বে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব মেডিসিন তরুণ শল্য চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করেছে।

ডাঃ বার্নার্ড ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এখানে হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচার সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন। ডাঃ শুমওয়ে ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে এখানে শিক্ষালাভ করে ডি. ফিল. উপাধি লাভ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি মিনেসোটা ত্যাগ করে ক্যালিফোর্ণিয়ার ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

এখানে ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী তাঁর নেতৃত্বে এক অস্ত্রোপচারে এক সদ্যমৃতের দেহ থেকে হৃৎপিণ্ড নিয়ে এক মুমূর্ষ বয়স্ক রোগীর দেহে সংযোজন করা হয়। এই অস্ত্রোপচারে আরও ১৪ জন শল্যবিদ তাঁকে সহায়তা করেন। যাঁর দেহ থেকে হৃৎপিণ্ডটি নেওয়া হয়েছিল, তাঁর নাম শ্রীমতী ভার্জিনিয়া হোয়াইট। এঁর বয়স ৪৩। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে এঁর মৃত্যু হয়েছিল।

তাঁর হৃৎপিণ্ডটি দু-ঘন্টা পরে ৫৪ বছর বয়স্ক ইস্পাত শ্রমিক মাইক কাসপেরাকের দেহে সংযোজিত হয়। অস্ত্রোপচারের দু-দিন আগে ইস্পাত শ্রমিকটি মারাত্মক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। অস্ত্রোপচার শেষ করতে সাড়ে ৪ ঘন্টা সময় লাগে।

১৯৬৭ সালের ২০শে নভেম্বর জার্ণাল অব দি আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের একটি সংখ্যায় এক প্রবন্ধে ডাঃ শুমওয়ে লেখেন যে, ষ্ট্যানফোর্ডে দশ বছর গবেষণার ফলে তিনি এখন এই ধরণের অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম। কি পদ্ধতিতে এই অস্ত্রোপচার করা হবে, তাও তিনি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে প্রথম সুযোগ আসে। ডাঃ বার্নার্ড ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে সর্বপ্রথম এই ধরণের অস্ত্রোপচার করেন এবং তিনি ডাঃ শুমওয়ের পদ্ধতিই অবলম্বন করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে হৃৎপিণ্ড পরিবর্তনের এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত। রোগীর নাম লুই ওয়াস্কানস্কি। ১৮ দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়, তবে তাঁর মৃত্যু হয় অন্য কারণে। তাঁর দেহে নতুন সংযোজিত হৃৎপিণ্ডটি ভালভাবেই কাজ করেছিল।

পরে ১৯৬৮ সালের ৩রা জানুয়ারী ডাঃ বার্ণার্ড এই পদ্ধতি অবলম্বনে অনুরূপ আর একটি অস্ত্রোপচার করেন।

১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে ডাঃ শুমওয়ে ও তাঁর আর একজন সহকর্মী ডাঃ রিচার্ড লোয়ার একটি কুকুরের দেহে হৃৎপিণ্ড সংযোজন করেন। ঐ কুকুরটি আট দিন জীবিত ছিল।

সেই থেকে ডাঃ শুমওয়ে আরও অনেকগুলি কুকুরের দেহে অস্ত্রোপচার করেন।

ডাঃ শুমওয়ের পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচারের বৈশিষ্ট্য এই যে, অসুস্থ হৃৎপিণ্ডটি অপসারণের সময় তিনি শিরাসমন্বিত হৃৎপিণ্ডের উর্ধ্ব কক্ষটি যথাযথ রেখে দেন, যাতে নতুন হৃৎপিণ্ড সংযোজনের সময় শুধু টিস্যু ও ধমনীগুলি সেলাই করলেই চলে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা মনে করছেন—আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই ধরণের আরও অসংখ্য অস্ত্রোপচার হবে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা অনেক আশা পোষণ করেন।

বিমানের সোজাসুজি উপরে ওঠা

সোজাসুজি উপরে উঠতে পারে, পৃথিবীর এরূপ প্রথম সামরিক জেট বিমান হলো বৃটেনের রয়াল এয়ার ফোর্সের জন্যে নির্মিত হকার্স সিডলী হ্যারিয়ার। গত ৪ঠা জানুয়ারী দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের ডান্সফোল্ডে এই বিমান সোজাসুজি উপরে ওঠবার কৌশল প্রদর্শন করে।

একটি মাত্র ইঞ্জিনচালিত এই হ্যারিয়ার বিমান শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন, একটানা ২০০০ মাইল উড়তে পারে এবং উড়ন্ত অবস্থায় নতুন করে জ্বালানি গ্রহণে সক্ষম।

বনের মধ্যে ফাঁকা জায়গা থেকে, অমসৃণ স্থানে জমি থেকে এবং ৫০ ফুট ল্যাণ্ডিং ষ্ট্রীপের সাহায্যে কর্ষিত ভূমি থেকেও এটি ব্যবহার করা চলে।

গত অক্টোবর মাসে এই বিমান ভূমধ্যসাগরে ভাসমান ইটালীয় জাহাজ অ্যাণ্ড্রিয়া ডোরিয়ার ডেক থেকে সোজাসুজি উপরে ওঠে।

গত ৪ঠা জানুয়ারী হ্যারিয়ার সীমাবদ্ধ অবতরণ ক্ষেত্রের উপরে সোজাসুজি উপরে ওঠা, চক্রাকারে ঘোরা ও অন্যান্য নানাবিধ কলাকৌশল প্রদর্শন করে।

রয়াল এয়ার ফোর্স (আর. এ. এফ) প্রাথমিকভাবে ৬০টি হ্যারিয়ার বিমানের অর্ডার দিয়েছেন। ১৯৬৯ সালের গোড়ার দিকেই এই বিমান আর. এ. এফ-এর পক্ষে ব্যবহৃত হবে।

বহুমুখী লাঙ্গল

একটি বৃটিশ ফার্ম এমন একটি লাঙ্গল নির্মাণ করেছেন, যার সঙ্গে দুই, তিন, চার বা পাঁচটি ফলা প্রয়োজনমত সংযোজিত করে নেওয়া চলে।

দুটি বা তিনটি ফলা সংযোজিত করা হলে বীম ও ফলার মধ্যে ৩০ ইঞ্চির ব্যবধান থাকে ও সার নিক্ষেপক আধারটিকে গুটিয়ে রাখা চলে।

দ্রুতগতিতে কাজ করা চলে, এমন ভাবে এই লাঙ্গলের ৭৫ শতাংশ যন্ত্রপাতি দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ।

এই লাঙ্গলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ছয়টি পর্যন্ত ফলা সংযোজিত করা চলে এবং প্রয়োজন না হলে এদের যে কোনটিকে গুটিয়ে তুলে রাখা যায়।

প্রধান ফ্রেমটি ইস্পাতের তৈরি এবং হাল্কা ও মজবুত। ১২-১৪ ইঞ্চি ফলাযুক্ত অবস্থায় এখন এই লাঙ্গল পাওয়া যাচ্ছে।

প্রত্যেক সংস্করণের সঙ্গেই ফলাগুলির শেষে রয়েছে ফারো হুইল। এতে লাঙ্গলটি মসৃণভাবে চলাফেরা করতে পারে। এছাড়া প্রত্যেকটি ফলার সঙ্গে মাটি ভাঙ্গা ও আগাছা পরিষ্কারের ব্যবস্থা সংযুক্ত করা চলে।

বৃহত্তম হোভারক্র্যাফ্টের পরীক্ষা

ইংল্যাণ্ডের সোলেণ্ট রোডষ্টেড অঞ্চলে ১৬৫-টন এস. আর. এন. মার্ক-৪ মাউণ্টব্যাটেন হোভারক্র্যাফ্ট-এর (সম্ভবতঃ পৃথিবীর বৃহত্তম হোভারক্র্যাফ্ট) উপযুক্ততা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

কর্পোরেশনের চীফ টেষ্ট কম্যাণ্ডার পিটার

ন্যাম অশান্ত সমুদ্রে হোভারক্র্যাফ্‌টটিকে আধ ঘণ্টা ধরে চালান।

সমুদ্রে প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ হলে মাউণ্ট-ব্যাটেনকে পাঠানো হবে ডোভার প্রণালীতে। সেখানে তার চ্যানেল পারাপারের পরীক্ষা সুরু হবে।

এই হোভারক্র্যাফ্‌ট পূর্ববর্তী যে কোন হোভারক্র্যাফ্‌টের চেয়ে অন্ততঃ চারগুণ বড়। এটি একই সঙ্গে ২৫৪ জন যাত্রী ও ৩০টি মোটর গাড়ী বহন করতে সক্ষম। এই বছর শেষ হবার আগেই এই হোভারক্র্যাফ্‌ট চ্যানেল পারাপার করবে।

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের বরফখণ্ডে ইতিহাসের ইঙ্গিত

মার্কিন ইঞ্জিনীয়ারগণ দক্ষিণ মেরুর বরফাবৃত অঞ্চলে আড়াই কিলোমিটার পর্যন্ত ছিদ্র করে বরফখণ্ডগুলি সংগ্রহ করেছেন। ঐ বরফাবৃত মহাদেশের দু-লক্ষ বছরের ইতিহাসের ইঙ্গিত ঐ খণ্ডগুলির মধ্যে নিহিত আছে। ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে সম্প্রতি বলা হয়েছে যে, এই প্রথম ঐ অঞ্চলে সাফল্যজনক ভাবে ছিদ্র করা সম্ভব হয়েছে। ২,১৩০ মিটার গভীরে সাড়ে চার মিটার জমাট স্তর পাওয়া গেছে। এগুলি পাওয়া গেছে দক্ষিণ মেরু থেকে ৮০০ কিলোমিটার দূরবর্তী আমেরিকার বার্ড কেন্দ্রে। এই বরফখণ্ডগুলির দিকে নজর দিলেই একটি বিস্ময় জেগে ওঠে। দুটি স্তরের মধ্যে যে ধূসর ভস্ম আবদ্ধ হয়ে আছে, তাতে প্রমাণিত হয় যে, গত দু-লক্ষ বছরে দু-বার বিরাট আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটেছিল।

চিকিৎসায় সাহায্যের জন্যে রঙীন টেলিভিসন

আমেরিকার গবেষকগণ পরীক্ষামূলক এক টেলিভিশন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। মানুষের দেহের অভ্যন্তরভাগ এর সাহায্যে রঙীন অবস্থায় দেখা যাবে। এই ছোট টেলিভিশন যন্ত্রটি খুব মৃদু আলোয় কাজ করে। এর ফলে চিকিৎসার ব্যাপারে, গবেষণা ও শিক্ষাদানে এটি একটি অতি মূল্যবান যন্ত্র হয়ে উঠবে। মানুষের দেহের ভিতরে এর আগেও টেলিভিশন কাজ করেছে, কিন্তু তাতে শুধু সাদা-কালো ছবিই দেখা যেত এবং সেগুলির জন্যে তীব্র আলো আর অনেক বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতির দরকার হতো। নতুন যন্ত্রটির জন্যে অস্ত্রোপচার কক্ষের বর্তমান যন্ত্রপাতি ও আলোর কোন রকম রদবদল দরকার হবে না।

পরিত্যক্ত জিনিষ থেকে সার উৎপাদন

পুরনো গদি অথবা রেফ্রিজারেটর, কাগজ অথবা চায়ের পাতা প্রভৃতি যে কোন রকমের পরিত্যক্ত জিনিষকে কাজে লাগাবার জন্যে একটা নতুন পদ্ধতিতে বৃটেনে কাজ হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে এই সব জিনিষ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে বাগান ও পার্কের জন্যে সার—জমি উদ্ধারের কাজেও তা লাগছে।

ন্যাশন্যাল রিসার্চ ডেভালপমেণ্ট কর্পোরেশন এই ব্যাপারে মোটা রকমের সাহায্য দেবার জন্যে প্রস্তুত আছেন। যে যন্ত্রের সাহায্যে এই কাজ হচ্ছে, তার পরিকল্পনাকারী হলেন উলভার-হ্যাম্পটনের লডেন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী (বার্মিংহাম) লিমিটেড।

যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয় এবং ১০০ টন হারে উৎ-পাদনক্ষম। এটি চালাবার জন্যে সাতজন অপারেটরই যথেষ্ট।

পরিত্যক্ত জিনিষগুলিকে প্রথমে গুঁড়া করে ফেলা হয়। তারপর তা ডাইজেষ্টরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ফারমেনটেশন পদ্ধতিতে পদার্থটিকে উত্তপ্ত করা হয়, যাতে মাইক্রো-অর্গানিজম্‌ বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুগুলিকে ধ্বংস

করতে পারে। পদার্থটিকে ডাইজেষ্টরে বেশ কয়েকদিন রাখা হয় এবং তাতে জল ও হাওয়া যোগ করা হয়, 'ডাইজেশন' সম্পূর্ণ করবার জন্যে।

তারপর লোহা রবার ও প্লাষ্টিকের অংশগুলিকে সরিয়ে ফেলা হয় এবং অবশিষ্ট পদার্থটিকে পিষে ফেলবার পর ছেঁকে নেওয়া হয়। ছাঁকার কাজ কয়েকবার বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে। ছাঁকা শেষ হয়ে গেলে পদার্থটির সঙ্গে মেশানো হয় প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য, সার তৈরির জন্যে। এই সারটিকে বলা হয় স্নুইটস্‌য়েল।

পুস্তক পরিচয়

তারামণ্ডল পরিচয় ও বিশ্বের বিশালতা— শ্রীকামিনীকুমার দে; বুক সিণ্ডিকেট, প্রাইভেট লিমিটেড; ২, রমানাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৯, পৃঃ—১০০, মূল্য—এক টাকা মাত্র।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ অন্ধকার রাতের পরিষ্কার আকাশে অগণিত জ্যোতিষ্কগুলিকে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে ভেবেছে—ওরা কত দূরে, কি ভাবে আছে? এদের পরিচয় কি? আকাশের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যেন রেখাচিত্রের মত বিভিন্ন রকমের জীবজন্তু ও অন্যান্য পদার্থের আকার ধারণ করেছে এবং পরিচয়ের সুবিধার জন্যে মানুষ সেগুলিকে কল্পিত জীবজন্তুর নাম দিয়েছে। কল্পিত হলেও এদের পরিচয়ের জন্যে এই নামগুলিই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মেষ, বৃষ মিথুন, কর্কট প্রভৃতি বারোটি রাশি বা তারকামণ্ডলের নাম এভাবেই কল্পনা করা হয়েছে। রাশিচক্রে চিহ্নিত তারকা ব্যতীত অন্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগুলি গ্রহ নামে পরিচিত। জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে অনেকেরই অনেক কিছু জানা থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাদের অনেকের পক্ষেই হয়তো জ্যোতিষ্কগুলিকে চিনে নেওয়া সম্ভব হয় না। ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশে আকাশের জ্যোতিষ্কাদির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় লাভের জন্যে জনসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নির্দেশিকা ও পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে তার একান্ত অভাবই লক্ষিত হয়। আলোচ্য পুস্তকখানির লেখক এই বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি এই পুস্তকখানিতে বহু চিত্রাদির সাহায্যে জ্যোতিষ্কগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার সহজ উপায়ের কথা বলেছেন। যারা আকাশের নক্ষত্রাদির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে আগ্রহশীল, এই পুস্তকখানি তাদের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলেই মনে হয়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ—১৯৬৮

২১শ বর্ষ, ঃ ৩য় সংখ্যা
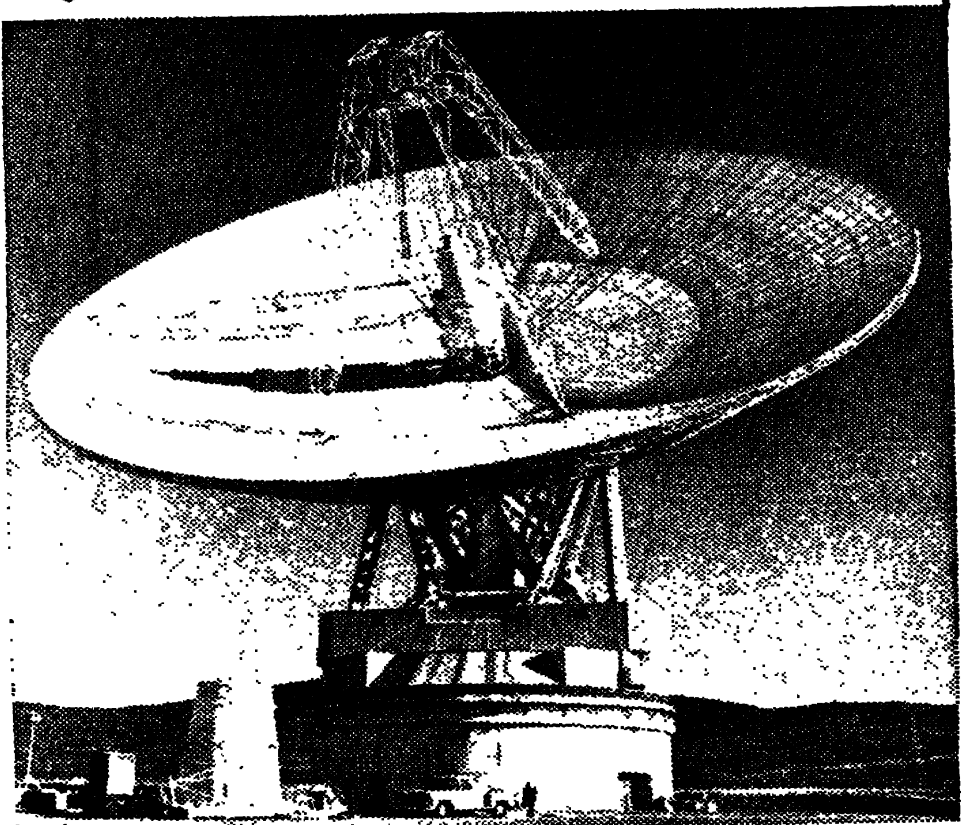
মহাকাশের বহু দূরবর্তী স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যে সর্বাধিক শক্তিশালী এই কমিউনিকেটর অ্যান্টিনাটি ক্যালিফোর্নিয়ার গোল্ডস্টোনে স্থাপিত হয়েছে। এটির পিরিচের মত ডিস্‌টির ব্যাস ৬৪ মিটার।

করে দেখ

জ্যামিতিক উপপাদ্যের সহজ প্রমাণ

পিথাগোরাসের বিখ্যাত থিওরেম, যেটি ইউক্লিডের ৪৭তম উপপাদ্য হিসাবে পরিচিত, তাতে বলা হয়েছে—কোন সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের (Hypotenuse) উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ বর্গক্ষেত্রটি ত্রিভুজের অপর দুটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র (স্কোয়ার) দুটির যোগফলের সমান। এর সত্যতা নির্ধারণের জন্যে অনেক রকম প্রমাণের অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু সে সব জ্যামিতিক প্রমাণ ছাড়াও তোমরা অতি সহজেই বুঝতে পারবে, এরূপ একটা প্রমাণের কথা বলছি। অনায়াসেই তোমরা এটা করে দেখতে পারবে।
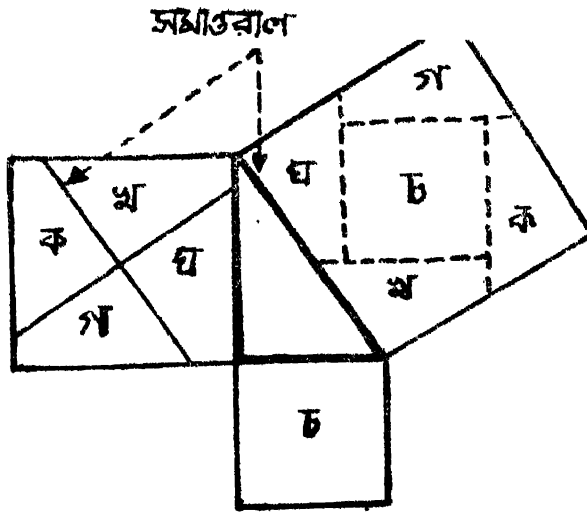
প্রথমে ছোট বা বড়, যে কোন রকমের একটা সমকোণী ত্রিভুজ এঁকে তার ছোট বাহু দুটির উপর দুটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত কর। এই দুটি বর্গক্ষেত্রের বড়টির মধ্যস্থলে সমকোণে ছেদকারী দুটি সরল রেখার দ্বারা সেটিকে চার ভাগে ভাগ করে নাও। লক্ষ্য রাখবে, পরস্পর ছেদকারী সরল রেখার একটি যেন সমকোণী ত্রিভুজটির অতিভুজের সঙ্গে সমান্তরাল হয়।* ছবিতে দেখ—সমকোণে ছেদকারী সরল রেখা দুটির সাহায্যে বাঁ-দিকের

---

*অতিভুজটি বাদে ত্রিভুজটির অপর দুটি বাহুর দৈর্ঘ্যের যোগফলকে অর্ধেক করে ঐ মাপে ত্রিভুজটির শীর্ষ থেকে বাঁ-দিকের চতুর্ভুজের উপরের বাহুতে একটি বিন্দু স্থাপন কর এবং ঐ বিন্দু থেকে অতিভুজের সমান্তরাল করে একটি সরল রেখা নীচের বাহু পর্যন্ত প্রসারিত কর। এখন এই রেখাটির ঠিক মধ্যস্থলে একটি লম্ব টানলে দ্বিতীয় রেখাটি পাওয়া যাবে।

বর্গক্ষেত্রটি গ ঘ খ ক—এই চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ত্রিভুজের নীচের বাহুর উপর অঙ্কিত চ বর্গক্ষেত্রটি ও তার চেয়ে বৃহত্তর বর্গক্ষেত্রটির গ ঘ খ ক—এই চারটি অংশ কাঁচি দিয়ে কেটে নাও এবং অতিভুজটির উপর চিত্রের খ ক গ ঘ-এর মত সাজিয়ে দেবার পর চ অংশটিকে মধ্যস্থলে বসিয়ে দাও। দেখবে এই পাঁচটি অংশ মিলে অতিভুজটির উপর যথাযথ বর্গক্ষেত্র গঠন করেছে। কাজেই ত্রিভুজের অতিবাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র যে অপর দুটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের যোগফলের সমান, এতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

—গ—

জীবাণু ও মানুষের সংগ্রাম

জীবাণুর সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের কথা ভাবতে অবাক লাগে। এত শক্তিশালী জীব মানুষ, তার সঙ্গে ঐ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুর আবার সংগ্রাম কিসের? বস্তুতঃ তাই ঘটে। জীবাণু মানুষের চিরকালের শত্রু—একথা সকলেরই জানা আছে। জীবাণু আসলে এক রকমের জীব বা প্রাণী। একটি মাত্র কোষ দিয়ে এদের দেহ গঠিত। তাই অণুবীক্ষণের সাহায্য ছাড়া দেখা একেবারেই অসম্ভব। দেখতে ছোট হলে কি হবে, এদের ক্ষমতা অপরিসীম। এদের একটা সুবিধা হলো এই যে, এরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বংশবৃদ্ধি করতে পারে অর্থাৎ সংখ্যায় বেড়ে যায়। আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে, খাদ্যের সঙ্গে, চামড়ার উপর ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এবং ক্ষতস্থান দিয়ে অসংখ্য জীবাণু সর্বদা আমাদের অজান্তে শরীরে প্রবেশ করছে। ভিতরে প্রবেশ করে নিজেদের পছন্দমত জায়গায়, যেমন—নাক, মুখ, গলা, অন্ত্র প্রভৃতি স্থানে বাস করবার মত ব্যবস্থা করে নেয় এবং সুবিধামত দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধি করে। এই ভাবে ক্ষুদ্র এককোষী জীবাণু যেন সর্বদাই আমাদের ক্ষতি করবার জন্যে পিছনে লেগে আছে।

যে সব জীবাণু আমরা অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখতে পাই, তারা হলো ব্যাক্টিরিয়া ও ফাঙ্গাস শ্রেণীভুক্ত। এদের বৈশিষ্ট্য হলো, এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করতে পারে না। স্বভাবতঃই খাদ্যের জন্যে এরা অন্য জীবদেহের উপর নির্ভর করে। ব্যাক্টিরিয়ার মত জীবাণুর জন্যে যে সব রোগ রোগ হয়, তাদের মধ্যে রয়েছে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, যক্ষ্মা ইত্যাদি। ফাঙ্গাস জাতীয় জীবাণুর জন্যে হয় নানারকম চর্মরোগ, চুল পড়ে যাওয়া প্রভৃতি। এই দুই রকম ছাড়া আর এক রকমের জীবাণু (ভাইরাস) আছে, যারা আরো অনেক ছোট বলে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না। ব্যাক্টিরিয়ার সঙ্গে এদের তফাৎ হলো এই যে, ব্যাক্টিরিয়া যে কোন স্থানে বংশবৃদ্ধি

করতে পারে। কিন্তু ভাইরাস জীবিত দেহের উপর ছাড়া বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। ভাইরাসের দ্বারা যে সব রোগ হয়, তাদের মধ্যে ফ্লু, বসন্ত, হাম, জলাতঙ্ক, পক্ষাঘাত ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, ক্যান্সারের জীবাণুও এক রকমের ভাইরাস।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে যে, আমাদের চারদিকে যদি সব সময় এত ভয়াবহ শত্রু থেকে থাকে, তবে আমরা বেঁচে আছি কি করে? সেটা সত্যই আশ্চর্য। কারণ আমরা নিজেরাই জানি না যে, আমরা সর্বদাই এই সব জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছি। আমাদের দেহের ভিতরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিশ্বস্ত প্রহরীর দল প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করে সর্বদাই পাহারা দিচ্ছে।

নাকের ভিতর দিয়ে যে সব জীবাণু প্রবেশ করবার চেষ্টা করে, তারা পথি-মধ্যে শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থে আট্‌কে যায় এবং পরে হাঁচির সঙ্গে বা নাকের জলীয় পদার্থের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। যদি কোন প্রকারে জীবাণু শ্বাসনালীর ভিতরে প্রবেশ করে তবে সেখানেও শ্লেষ্মা তাদের আক্রমণ করে এবং কাশির সঙ্গে তারা বেরিয়ে যায়। মুখের ভিতর দিয়ে যে সব জীবাণু ঢুকতে চায়, তারা মুখের মধ্যস্থিত লালার দ্বারা আক্রান্ত হয়। তৎসত্ত্বেও যারা খাদ্যের সঙ্গে পাকস্থলী পর্যন্ত যায়, সেখানে অ্যাসিড তাদের বিনষ্ট করে। জীবাণু-ভর্তি ধূলিকণা চোখের ভিতর চলে যেতে পারে, কিন্তু চোখের জলে যে জীবাণু ধ্বংসকারী পদার্থ আছে, তা এই সব জীবাণুকে ধ্বংস করে ফেলে। এছাড়া ত্বকেরও জীবাণু-ধ্বংসকারী ক্ষমতা আছে।

এই সব প্রাথমিক এবং স্থূল ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেহের অভ্যন্তরে জীবাণু প্রবেশ করে। তখন তাদের বিনষ্ট করবার জন্যে সূক্ষ্ম ব্যবস্থাও আছে। দেহের ভিতরে টহলদারী সৈন্যেরা প্রস্তুত। তারা কোথায় আছে? আছে রক্তের মধ্যে। রক্তের যে সব বিভিন্ন উপাদান আছে, তাদের মধ্যে শ্বেত কণিকাই হচ্ছে সদাজাগ্রত প্রহরী। এরা দেহের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অবিরাম শত্রুর সন্ধান করে চলেছে। এরাও জীবাণুর মত এককোষী জীব। শত্রুর আক্রমণ হলেই এরা সংখ্যায় প্রচুর বেড়ে যায় এবং আক্রমণকারী জীবাণুদের দিকে এগিয়ে এসে দেহ থেকে জেলী জাতীয় একপ্রকার পদার্থ বের করে জীবাণুর চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। এই ভাবে জীবাণুগুলিকে কোণঠাসা করে দিয়ে তারা নিজেদের দেহের মধ্যে এক একটা ছিদ্র সৃষ্টি করে এবং শত্রুকে চুষে খেয়ে ফেলে। অনেক সময় দেখা গেছে, এরা যুদ্ধক্ষেত্রের চারদিকে একটা দেয়ালের মত সৃষ্টি করে আক্রমণকারী জীবাণুগুলিকে ছড়িয়ে পড়তে দেয় না। এই ভাবে বন্দী করে তাদের ধ্বংস করে।

এই তো গেল স্বাভাবিক উপায়ে জীবাণু ধ্বংসের কাহিনী। কৃত্রিম উপায়েও যে জীবাণু ধ্বংস করা যেতে পারে, তার প্রথম সন্ধান দিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক

লুই পাস্তুর—তাঁর টিকা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। কলেরা রোগাক্রান্ত মুরগী নিয়ে পাস্তুর তখন গবেষণায় ব্যস্ত। সেই কলেরার কিছু জীবাণু একটি পাত্রে রেখে অসাবধানতাবশতঃ পাস্তুর কিছুদিনের জন্যে বাইরে চলে যান। ফিরে এসে ঐ জীবাণু দিয়ে কয়েকটি মুরগীকে টিকা দিলেন। মুরগীগুলি যথাসময়ে আক্রান্ত হলো বটে, কিন্তু মারা গেল না। পরে সতেজ ও নতুন জীবাণু দিয়ে তাদের আবার টিকা দেওয়া হয়, কিন্তু তবুও তারা রোগের হাত থেকে মুক্তি পায়। পক্ষান্তরে অন্য মুরগীদের (যাদের প্রথমবার টিকা দেওয়া হয় নি) এই নতুন সতেজ জীবাণু দিয়ে টিকা দেবার ফলে তারা মারা যায়। পাস্তুর তখন সিদ্ধান্ত করেন যে, পুরনো জীবাণুগুলি দুর্বল হয়ে পড়ায় তারা আক্রমণ করে বটে, কিন্তু রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। অপর পক্ষে, এদের উপস্থিতি এই বিশেষ জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে শরীরের ভিতর বিশেষ ধরণের প্রতিরোধক সৈন্যবাহিনী গঠন করে, যাদের ইংরেজীতে বলা হয় Antibody। নতুন ও সতেজ জীবাণু পরে দেহের মধ্যে প্রবেশ করলে এরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং দেহকে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি রোগের টিকার এই হলো মূল তাৎপর্য। এইভাবে পাস্তুরের যুগান্তকারী আবিষ্কার সমগ্র মানব জাতিকে ভয়াবহ রোগের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

এই প্রসঙ্গে আরও যাঁদের নাম স্মরণীয়, তাঁরা হলেন ফ্লেমিং ও ওয়াক্সম্যান। এঁদের মধ্যে প্রথম জন আবিষ্কার করেন পেনিসিলিন ও দ্বিতীয় জন ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন। এছাড়া ক্লোরোমাইসিন, টেরামাইসিন ইত্যাদি ওষুধও আবিষ্কৃত হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আজকাল অধিকাংশ অসুখেই কোন না কোন মাইসিন ব্যবহার করা হয়। এদের বলা হয় অ্যান্টিবায়োটিক্স। পাস্তুরই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন—এক শ্রেণীর জীবাণুর দ্বারা অন্য শ্রেণীর জীবাণু বিনষ্ট করা যায়। এর পর অনেকেই দেখতে পান যে, ফাঙ্গাস জাতীয় জীবাণুর কোষ থেকে একপ্রকার যৌগিক পদার্থ বেরিয়ে আসে—যা অন্য জীবাণুকে মেরে ফেলতে পারে। এই ভাবেই অ্যান্টিবায়োটিক্সের উৎপত্তি। পেনিসিলিন এবং অন্যান্য সব মাইসিনেরও এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এই নতুন ধরণের চিকিৎসা প্রচলনের ফলে রোগের ভয়াবহতা অনেক হ্রাস পেয়েছে।

মানুষের বুদ্ধির কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। বড় বড় হাতিয়ার দিয়ে এই সব ক্ষুদে যোদ্ধাদের সঙ্গে পারা যাবে না—একথা সে বুঝেছে। তাই জীবাণুকেই লাগিয়ে দিয়েছে জীবাণু ধ্বংসের কাজে। ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরছে। কিন্তু এত সব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ পেরেছে কি ঐ নিকৃষ্ট ক্ষুদে জীবাণুগুলিকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে? কোন পক্ষই হার স্বীকার করতে রাজী নয়। তাই সংগ্রামও চলছে অবিরত।

দীপক বসু ও দেবিকা বসু

নিকোলা টেস্‌লা

আধুনিক যুগে জীবনের প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সঙ্গে বিজ্ঞানের পরিচয়। কিন্তু বিজ্ঞানের যে সুগঠিত রূপের সঙ্গে আমাদের সকলের পরিচয়, তা গড়ে তোলবার পিছনে রয়েছে বহু বিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসু মন, অক্লান্ত সাধনা ও কর্মপ্রচেষ্টা। কিন্তু এই সকল বিজ্ঞানীদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁদের নাম তাঁদের কাজের আড়ালেই ঢাকা পড়ে গেছে। এমন একজন বিজ্ঞানী হচ্ছেন নিকোলা টেস্‌লা, যাঁর সম্বন্ধে এখানে তোমাদের কিছু বলবো।

সার্বিয়া প্রদেশের ছোট্ট শহর স্মিলযান। এখানে বাস করতো ছোট্ট এক পরিবার—টেস্‌লা পরিবার। ছোট ছেলে নিকোলা সব সময়েই ছোটখাটো জিনিষ তৈরি ও মেরামতের কাজে ব্যস্ত। ছোটবেলা থেকে তিনি ইঞ্জিনীয়ার হবার স্বপ্ন দেখতেন। নতুন কিছু আবিষ্কারের উৎসাহে তিনি সব সময়েই মেতে থাকতেন এবং তাঁর এই উৎসাহের প্রেরণা যোগাতেন তাঁর বাবা রেভারেণ্ড মিলুটিন টেস্‌লা। তাঁর বড় ভাই ডেন ছিল প্রতিভাবান। ছেলেবেলাতেই ডেনের বুদ্ধির প্রাখর্যে তাঁর ভবিষ্যতের কর্মময় ও খ্যাতিময় জীবনের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। ডেন ছিল তাঁর বাবা, মা ও সকলের প্রিয়পাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মাত্র বারো বছর বয়সে ডেন মারা গেল। ডেনের মৃত্যুতে বাবা ও মায়ের দুঃখ অনুভব করে নিকোলা সেই দিনই মনে মনে সঙ্কল্প করেন—যে সম্মান ডেন তার বাবা ও মাকে এনে দিত, তার চেয়ে বেশী সম্মান তাঁদের সে এনে দেবে।

ছোটবেলায় প্রিয় সঙ্গী কুকুরকে নিয়ে জলপ্রপাতের ধারে ঘুরে বেড়ানো তাঁর একটা নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস ছিল। জলের শক্তিকে কি করে কাজে লাগানো যায়, নিকোলা সব সময় তাই নিয়ে চিন্তা করতেন। তোমরা নিউটনের সম্বন্ধে জান যে, তিনি ছোটবেলায় ছোটখাটো যন্ত্রপাতি তৈরি করতেন। টেস্‌লাও তেমনি ছোটবেলা থেকেই নিউটনের মত অনেক ছোটখাটো জিনিষ আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর তৈরি ব্লো-গান, পপ্‌গান ইত্যাদি মটকা জাতীয় জিনিষগুলির ব্যবহার পাড়ার লোকদের রীতিমত ফ্যাসাদে ফেলেছিল। কারণ ছোট ছেলেরা এগুলি ব্যবহার করে পাড়ার লোকদের বাড়ীর জানালার কাচ ভাঙ্গার হিড়িক লাগিয়ে দিয়েছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম শেষ করে নিকোলা দশ বছর বয়সে গস্‌পিক শহরে রিয়াল জিমন্তাসিয়ামে প্রবেশ করেন। পড়াশুনার ব্যাপারে তাঁর দ্রুত উন্নতি হতে লাগলো। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে

পারলেন না, অন্য কোন উচ্চতর জিমন্যাসিয়ামে যাবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সেখানকার খরচ চালাবার মত আর্থিক সঙ্গতি টেস্‌লা পরিবারের ছিল না। কাজেই নিকোলা একটি চাকরির খোঁজ করতে লাগলেন এবং অবশেষে গস্‌পিক শহরে গ্রন্থাগারিকের কাজ পেলেন। কিন্তু একাজ চালাবার জন্যে জার্মান, ইতালী ও ফরাসী ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। নিকোলা কিন্তু ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলেন না। স্কুলের পড়া শেষ হবার পর নিজেই চেষ্টা করে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ভাষাগুলি আয়ত্তে আনলেন। এই ভাষা শিক্ষা তাঁর পরবর্তী জীবনে, যখন তিনি এখানকার পাঠ শেষ করে উচ্চতর জিমন্যাসিয়ামে প্রবেশ করেন—খুবই কাজে লেগেছিল। এখানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের কালেই তিনি পদার্থবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। অবসর সময় তিনি বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী ও তাঁদের কার্যপদ্ধতির ব্যাখ্যা পড়বার কাজে নিয়োগ করতেন। একাগ্র মনোযোগ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে নিকোলা চার বছরের পাঠ্যসূচী তিন বছরেই শেষ করলেন। স্নাতক হবার পর শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তিনি সেই বছরে পলি-টেকনিক ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হতে পারলেন না। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে পদার্থবিদ্যা ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়, আবার এর মধ্যেও বিদ্যুতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। এক বছর পরে পলিটেকনিক পড়বার জন্যে তিনি অষ্ট্রিয়ার গ্রাজ শহরে যাত্রা করলেন। এখানেও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করে পড়াশুনা করতে লাগলেন। প্রথম বছরের পরীক্ষায় তাঁর সাফল্যে আনন্দিত হয়ে কারিগরী বিভাগগুলির ডীন নিকোলার বাবাকে তাঁর পুত্রের কৃতিত্ব ও অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, নিষ্ঠা ও তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা জানিয়ে একখানা চিঠি লিখলেন। এই পলিটেকনিকে তিনি পোয়েসল নামক একজন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের সংস্পর্শে আসেন, যাঁর সাহচর্যে তিনি অনেক নতুন তথ্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পেরেছিলেন।

পলিটেকনিকে তাঁর পরীক্ষার ফল খুবই ভাল ছিল, যার জন্যে কোন পরীক্ষা ছাড়াই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার অধিকার পেলেন। ইতিমধ্যে পোয়েস্‌লের সহযোগিতায় তিনি একটি চাকরিতে যোগ দিলেন। এর ফলে অর্থাভাব থেকে নিষ্কৃতি পান। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রধান পাঠ্যবিষয় ছিল বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ারিং। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বছরের পাঠ্যসূচী শেষ করবার পর স্নাতক উৎসবান্তে তিনি বাড়ী ফিরে যান। এর অব্যবহিত পরেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। কাজের চেষ্টায় তিনি বুদাপেষ্টে আসেন এবং এখানে স্থাপিত প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জে একটা চাকরি গ্রহণ করেন। তখন আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেল আবিষ্কৃত টেলিফোন সম্বন্ধে জনসাধারণের পক্ষ থেকে অনেক অভিযোগ আসছিল। টেলিফোনের এক প্রান্তের শ্রোতা অপর প্রান্তের বক্তার কথা স্পষ্ট বুঝতে পারে না—এটাই ছিল প্রধান অভিযোগ। নিকোলা এই

অসুবিধার কারণ ও তা সমাধানের জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা করতে লাগলেন। ফলস্বরূপ আবিষ্কৃত হলো অ্যাম্পলিফায়ার বা বর্তমান যুগের লাউড স্পীকার। নিকোলা সব সমেত মোট দু-শো বারোটি মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করেন। এই মৌলিক আবিষ্কারগুলির অধিকাংশের ব্যবহার আমাদের কর্মজীবনে একান্তই অপরিহার্য।

সমপ্রবাহ অর্থাৎ ডিরেক্ট কারেন্টের ব্যবহারই ছিল সেই সময়ে প্রচলিত এবং সীমিত। টমাস আল্‌ভা এডিসন কর্তৃক আবিষ্কৃত মোটর, ডায়নামো ইত্যাদি ডি-সি যন্ত্রপাতিগুলি তখনকার দিনে খুব ব্যবহার করা হতো। নিকোলা এডিসন কোম্পানীতে চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। এই কোম্পানীর ডায়নামোগুলি একেবারে ত্রুটিমুক্ত ছিল না। তিনি এই ডায়নামোগুলির ত্রুটি বের করলেন এবং সেগুলির সংশোধনে নিজস্ব মতবাদ প্রয়োগ করলেন। এই সময়েই টেস্‌লা ডি-সি মোটর ও অল্টারনেটিং কারেন্ট বা পরিবর্তী প্রবাহ আবিষ্কার করেন। কিন্তু জনসাধারণ এই নব আবিষ্কৃত অল্টারনেটিং কারেন্টের গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল, কিন্তু টেস্‌লা এই নতুন মতবাদ পুরোদ্যমে প্রচার করতে লাগলেন। অবশেষে ব্রাউন ও ওয়ার্বার নামে দু-জন ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পান, যাঁরা তাঁর মতবাদের সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। এঁদের সহযোগিতা ও অর্থসাহায্যে তিনি নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপন করে ডি. সি. অর্থাৎ সমপ্রবাহের তুলনায় এ. সি. বা পরিবর্তী প্রবাহের উৎকর্ষ প্রমাণ করে বিজ্ঞান-জগতে একটা বিপ্লব এনে দিলেন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে টেস্‌লার উল্লেখযোগ্য অবদান—টেস্‌লা কয়েলের আবিষ্কার, যেটা তাঁর নিজের নামেই পরিচয় লাভ করে। উচ্চ কম্পনাঙ্কের বিদ্যুৎ-প্রবাহ যখন কোন কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন কুণ্ডলীর চতুর্দিকে যথেষ্ট শক্তিশালী বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। সেই ক্ষেত্রে নিয়ন ইত্যাদি নিষ্ক্রিয় গ্যাসবাতি রাখলে অন্য কোন বাহ্যিক প্রবাহ ছাড়াই সেগুলি জ্বলতে থাকে। এই আবিষ্ট বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের আবিষ্কার বর্তমান শিল্প ও গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ছোট বেলা থেকে তিনি যে বড় হবার স্বপ্ন দেখতেন, সে স্বপ্ন ব্যর্থ হয় নি—সে স্বপ্ন পূর্ণ সফলতা নিয়ে তাঁর জীবনে বাস্তব রূপ নিয়েছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান জগতের সকলেরই স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সেদিন তার কর্মময় জীবনের পূর্ণতার আভাস কেউ-ই উপলব্ধি করতে পারেন নি। অবশেষে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে নিকোলা টেস্‌লার কর্মময় জীবন পূর্ণতার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করে। যদিও আজ তিনি নেই—তবুও তাঁর আবিষ্কারের মাধ্যমেই তিনি বিজ্ঞান-জগতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন ও থাকবেন।

মহুয়া বিশ্বাস

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। ব্রাউনিয়ান গতি কি?

রেখা দত্ত, কলিকাতা-৯

উঃ ১। অসংখ্য অণু দিয়ে পদার্থ তৈরি হয়। পদার্থের মধ্যে অণু এলোমেলোভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে বলে ধরে নেওয়া হতো। বিভিন্ন গতিতে ছুটাছুটির জন্যে অণুতে অণুতে সংঘর্ষ হয়। গাণিতিক সূত্রে এই গতির ব্যাখ্যা মেলে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন ১৮২৭ সালে জলের মধ্যে মেশানো মৃত বীজরেণুকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষার সময় কতকগুলি জিনিষ লক্ষ্য করেন। তিনি দেখলেন, মৃত বীজরেণুগুলি এলোমেলো গতিতে ছুটাছুটি করছে। এই স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চরণকে বলা হয় ব্রাউনিয়ান গতি। পরীক্ষা করে আরও দেখা গেল, তাপ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রেণুগুলিও বেশী বেগে সঞ্চারিত হয়। ছোট রেণুগুলি অপেক্ষাকৃত বেশী বেগে সঞ্চারিত হয়। কখনও একই গতিতে দুটি রেণু সঞ্চারিত হয় না। কাজেই এই গতি পরিচলন প্রবাহের জন্যে হয় না। বড় রেণু বা কণিকাগুলির গতি খুবই কম। এরকম গতি যে কোন কলয়ড্যাল দ্রবণেও দেখা গেল।

আগে বলা হয়েছে, পদার্থের অণুগুলি এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়। এই অণু-সাগরে মেশানো ফুলের রেণুগুলি চারদিক থেকে মাধ্যমের অণুগুলির ধাক্কা খায়। ফুলের রেণুর ভর কম হওয়ায় সেগুলি মাধ্যমের অণুর বিভিন্ন দিকের ধাক্কা সংহত করতে পারে না। ফলে যে দিকে ধাক্কা বেশী, সে দিকে ছুটে যায়। অণুর গতি এলোমেলো হওয়ায় ফুলের রেণুর গতিও হয় এলোমেলো। অপেক্ষাকৃত বড় রেণু বা কণিকাগুলির জাড্য বেশী। তাদের ধাক্কা সংহত করবার ক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই তাদের গতিও কম বা থাকেই না। তাপ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমের অণুর গতি বাড়ে। ফলে ব্রাউনিয়ান কণিকাগুলির উপর ধাক্কার জোর হয় বেশী। সেই জন্যে ব্রাউনিয়ান কণিকার গতিও যায় বেড়ে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, পদার্থের অণুর স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চরণের জন্যেই ব্রাউনিয়ান কণিকার সঞ্চরণ, অর্থাৎ ব্রাউনিয়ান গতি পদার্থের গতিতত্ত্বের পরীক্ষণীয় প্রমাণ।

এই ধারণা থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও পরে আইনষ্টাইন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্রাউনিয়ান কণিকাগুলির গড় সরণ ও অ্যাভোগ্যাড্রো সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেন। অ্যাভোগ্যাড্রো সংখ্যা বিভিন্ন উপায়ে বের করা যায়। তবে অন্য উপায়ের তুলনায় এই

ব্রাউনিয়ান গতি সাধারণভাবে ওজন করবার মানকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সাধারণভাবে (ব্যালেন্সে) ১০^{-৯} গ্র্যামের কম কোনও পদার্থের ওজন ধরা যাবে না। অবশ্য আমরা সাধারণভাবে ১০^{-৫} গ্র্যামের বেশী এগুতে পারি না।

শ্যামসুন্দর দে

বিবিধ

ভারতের থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র

১৯৬২ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘে জনকল্যাণে মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে একটি পরীক্ষামূলক আন্তর্জাতিক রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারেই ত্রিবেন্দ্রাম সহর থেকে ১১ মাইল দূরবর্তী ধীবরদের সমুদ্রোপকূলবর্তী থুম্বা পল্লীটি আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী ও সর্বোৎকৃষ্ট রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচিত হয়। কারণ এর উপর দিয়েই গিয়েছে চৌম্বক নিরক্ষীয় রেখা বা বিষুব রেখা। তারপর ১৯৬৩ সালে আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ফ্রান্সের সহযোগিতায় ভারতের মহাকাশ সংক্রান্ত জাতীয় গবেষণা কমিটি কর্তৃক ৬০০ একর জমির উপর এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ সুরু হয় এবং ঐ বছরের ২১শে নভেম্বর ঐ কেন্দ্র থেকে সোডিয়াম বাষ্পের একটি রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়। এটি রকেট উৎক্ষেপণ এবং মহাকাশ সম্পর্কে গবেষণার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র।

এই বছরে এই কেন্দ্র নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে এখানে ৩রা ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আলোচনা বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল সহ দেশ-বিদেশের বহু বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন।

বায়ুপ্রবাহের প্রকৃতি নিরূপণ, ঊর্ধ্বাকাশের মেরুজ্যোতি এবং ৩০ থেকে ৭০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে মহাকাশে বাতাসের গতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই কেন্দ্র থেকে নাইক, অ্যাপাশে, জুডিডার্ট প্রভৃতি নানা রকমের রকেট ছাড়া হয়েছে। বায়ুপ্রবাহের প্রকৃতি নিরূপণ ও তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সোডিয়াম বাষ্পের রকেট ছাড়া হয়েছিল। জুডিডার্ট রকেট সরবরাহ করেছে আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা। সংস্থা বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করেও এই কেন্দ্রকে সাহায্য করেছে। এখানকার বিজ্ঞানীদের ট্রেনিং এর ব্যাপারেও সাহায্য করেছেন।

জুডিডার্ট রকেটের সাহায্যেই মহাকাশে ৬০ কিলোমিটারের ঊর্ধ্বে অতি সূক্ষ্ম তামার তার ও সূত্র ছাড়া হয়েছিল। এরা ছিল দৈর্ঘ্যে ২'১ ইঞ্চি আর এদের বেধ ছিল এক ইঞ্চির ৫০০০ ভাগের এক ভাগ। নিরক্ষ বৃত্ত এলাকায় বৈদ্যুতিক প্রবাহ, ভূচৌম্বক শক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এসকল গবেষণা চালানো হয়েছিল।

এই কেন্দ্রের বায়ুর গতি প্রভৃতি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি যুক্তরাষ্ট্রের আবহ সংস্থাকে

সরবরাহ করা হয়েছে। এসকল তথ্য যাতে পৃথিবীর সকল আবহ-বিজ্ঞানীদেরই কাজে লাগতে পারে তারই জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সম্মিলিতভাবে মহাকাশ সম্পর্কে গবেষণা চালাবার জন্যে মহাকাশ সংক্রান্ত ভারতের জাতীয় গবেষণা কমিটির সঙ্গে মার্কিন জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার একটি চুক্তি ১৯৬৫ সালে সম্পাদিত হয়েছে। মহাকাশ ও আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের দিক থেকে ইতিমধ্যেই এই কেন্দ্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ভার্জিনিয়ার ওয়ালপস, ট্রেনিং ষ্টেশনের ডিরেক্টর ডাঃ রবার্ট ক্রেগার, মার্কিন জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার ডাঃ টাউনসেণ্ড এবং নিউ-হাম্পশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এল. জে. ক্যাহিল এই সকল কাজের বিশেষ সুখ্যাতি করেছেন।

ভারতে এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হওয়ায় ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এবিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনে বিশেষ সুযোগ পাচ্ছেন। কিছুদিন আগে রকেটের সাহায্যে যে সকল উপকরণ মহাকাশে প্রেরণ করা হয়েছে, তা ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ারেরাই সংগ্রহ ও প্রেরণ করেছেন। তাতে খরচ পড়েছে মাত্র ১০ হাজার টাকা। বাইরে থেকে এই সকল উপকরণ আমদানী করলে খরচ পড়তো ৫০ হাজার টাকা।

সুমেরু পরিক্রমা

একজন ভদ্রলোক গত বছরের শেষ মাস-গুলিতে লণ্ডনের ওয়েষ্টএণ্ড অঞ্চলের এক উষ্ণ আরামপ্রদ অফিস রুমে বসে পৃথিবীর দীর্ঘতম ও নির্জনতম একক পদযাত্রার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির কাজ শেষ করেছেন। কালো দাঁড়ি, তীক্ষ্ণ নীল চোখ, ছোটখাটো এই ভদ্রলোকের নাম ওয়ালী আর্বার্ট, বয়স ৩৩ বছর। ইনি ফেব্রুয়ারীতে বৃটিশ সুমেরু অভিযানে নেতৃত্ব করেন। আলাস্কার পয়েন্ট ব্যারো থেকে ২,৩০০ মাইলের এই দীর্ঘ অভিযান সুরু হবে এবং ১৬ মাস পরে নরওয়ের দ্বীপ স্পিৎবারজেনে তা শেষ হবে। অভিযাত্রীরা যাতে উত্তর মেরুর খুব কাছ দিয়ে যেতে পারেন, অভিযানের যাত্রাপথ এমনভাবেই রচনা করা হয়েছে।

লণ্ডনের রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সমর্থনপুষ্ট এই অভিযানের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন ডিউক অব এডিনবরা।

অভিযানে ওয়ালী হার্বার্টের সহযাত্রী হবেন —ডাঃ ফ্রিৎজ কোয়েরনার (৩৪), প্রস্রবণ ও আবহাওয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অ্যালান গিল (৩৬), ভূপদার্থবিদ এবং ক্যাপ্টেন কেনেথ হেজেস (৩২) ও সামরিক বিভাগীয় ডাক্তার, যিনি এখন স্পেশাল এয়ার সার্ভিসে আছেন।

কুমেরু বৃত্তে অভিযান চালানো অপেক্ষাকৃত সহজ; কেন না, সেখানে কঠিন ভূখণ্ড রয়েছে। কিন্তু সুমেরু বৃত্তে ভাসমান বরফস্তূপের উপর দিয়েই এই অভিযান চালাতে হবে। এই স্তূপগুলি আবার প্রায়ই ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এজন্যে বিমান বা উদ্ধারকারী দলও এখানে নামানো সম্ভব হয় না।

ফেব্রুয়ারীতে যে সময় যাত্রা সুরু হয়, তখন মাত্র তিন ঘন্টার জন্যে দিনের আলো পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম না আসা অবধি অভিযাত্রীদল সোজা উত্তর দিকে এগোবেন। মাঝ-গ্রীষ্মে যখন বরফ গলতে সুরু করবে, তখন তাঁরা সরে আসবেন এবং শরৎকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। পথ স্লেজ চলার উপযোগী হয়ে উঠলে তাঁরা আবার উত্তর অভিমুখে যাত্রা করবেন। আবার দ্বিতীয় বার যখন শীত পড়বে, বরফ শক্ত হবে, তখন তাঁরা শিবির স্থাপন করবেন ও নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে উত্তর মেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

মার্চে আবার সূর্যের মুখ দেখা যাবে। গ্রীষ্ম এসে বরফ ভাঙতে সুরু করবার আগেই—৫০° ফাঃ তাপমাত্রার মধ্যেই তাঁরা স্পিৎজবারজেন অভিমুখে রওনা হয়ে যাবেন।

অভিযানের প্রধান লক্ষ্য চারটি :

(১) আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও উত্তর গোলার্ধের আবহাওয়া অফিসগুলিতে তথ্য প্রেরণ

(২) তুষারাবৃত ভূখণ্ডের প্রকৃতি বিচার, হিমবাহের দিক ও গতি নির্ণয়, উন্মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ, বরফ ও তুষারের ঘনত্ব নির্ণয়।

(৩) সুমেরু অঞ্চলের যাবতীয় পশু-পক্ষীর হিসাব নেওয়া। এদের সম্পর্কে বস্তুতঃ কিছুই জানা নেই।

(৪) অভিযাত্রীদের শরীরের উপর সুমেরুর আবহাওয়ার প্রভাবের শারীরতত্ত্বগত দিকগুলি পর্যবেক্ষণ।

অভিযানের প্রস্তুতি হিসাবে ওয়ালী হার্বার্ট তাঁর দু-জন সহযাত্রীর সঙ্গে ১৯৬৬-৬৭ সালের শীত কাটিয়েছেন গ্রীনল্যাণ্ড-এর উত্তর প্রান্ত-সীমায় অবস্থিত এস্কিমো উপনিবেশ ক্যানাডায়।

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে তাঁরা কুকুর-চালিত স্লেজে করে উত্তর-পশ্চিম ক্যানাডায় ১,২০০ মাইল পরিক্রমা করেন। সুমেরু অভিযানে যে সব সরঞ্জাম ব্যবহৃত হবে, এই সময় তাঁরা তা পরীক্ষা করে নেন।

সত্যই কেউ কোন দিন উত্তরমেরু পৌঁচেছিলেন কি না, সে ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কিছু সন্দেহ থেকে গেছে। ১৮৯৩ সালে নানসেন তাঁর জাহাজ 'ফ্র্যামে' করে উত্তর মেরুতে পৌঁছাবার যে চেষ্টা করেন, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দু-জন আমেরিকান ডাঃ ফ্রেডারিক কুক ও রবার্ট পিয়ারী দাবী করেন, তাঁরা যথাক্রমে ১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে উত্তরমেরুতে পৌঁচেছিলেন। কিন্তু তাঁদের দাবীর যাথার্থ্যও একটি বিতর্কিত বিষয়। ১৯৬৪ সালে নরওয়ের বজবন ষ্টেইবের সুমেরু অভিযানও ব্যর্থ হয়। ১৯৬৭ সালে আর এক জন আমেরিকান স্কিজোতে (স্কি-স্কুটার) করে উত্তরমেরু পৌঁছাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

গৃহনির্মাণে চীনাবাদামের খোসার ব্যবহার

গৃহনির্মাণ ও গৃহসজ্জায় চীনাবাদামের খোসা ও নারিকেল ছোবড়া ব্যবহারের কথা ভাবছেন। লণ্ডনের ট্রপিক্যাল প্রোডাক্টস্ ইনষ্টিটিউট।

সম্প্রতি প্রকাশিত ইনষ্টিটিউটের ১৯৬৬ সালের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে—দেখা গেছে ঝড়তি-পড়তি কাঠ, শাক-সব্জীর অবশেষ ইত্যাদিকে পার্টিকল বোর্ডে রূপান্তরিত করা যায়।

শুধু ভারতে প্রতি বছর প্রায় ১৫ লক্ষ টন চীনাবাদামের খোসা ফেলা যায়। চীনাবাদামের খোসার সঙ্গে রেজিন মিশিয়ে ১৪০° সেঃ তাপমাত্রায় ১৫ মিনিট কমপ্রেস করলে গৃহনির্মাণের উপযোগী বোর্ড তৈরি করা যায়।

গিলবার্ট ও অ্যালিস আইল্যাণ্ডস থেকে পাওয়া নারকেলে গুঁড়ির কুচিকে বোর্ডে রূপান্তরিত করে দেখা গেছে, তার শক্তি ইংল্যাণ্ডে তৈরি অনুরূপ বোর্ডের চেয়ে বেশী।

ছোবড়ার গুঁড়া কমপ্রেস করে লেবরেটরিতে নমুনা বোর্ড উৎপাদন করা হয়েছে।

বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্যে পার্টিকল বোর্ড তৈরির প্ল্যান্ট-এর ডিজাইন সম্পর্কে আলোচনা চলেছে ন্যাশন্যাল রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সঙ্গে। এই প্ল্যান্টের সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণে ষ্টাণ্ডার্ড সাইজের বোর্ড তৈরি করা যাবে ও স্থানীয়ভাবে বিক্রয় করা চলবে। গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্র তৈরির কাজে এই বোর্ডগুলি বিশেষ উপযোগী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। সন্তোষকুমার রায়
(ভূবিদ্যা বিভাগ)
উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়
উড়িষ্যা

২। শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল
F/7, M. I. G. Housing Estate
37, Belgachia Road
Calcutta-37

৩। অপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
৩১/১৬, মতিলাল মল্লিক লেন
কলিকাতা-৩৫

৪। শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী
শান্তিনিকেতন
বীরভূম

৫। অত্রি মুখোপাধ্যায়
রাধাবাজার
নবদ্বীপ, নদীয়া

৬। শ্রীগৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
হিন্দুস্থান ষ্টিল লিঃ
সেণ্ট্রাল ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড ডিজাইন ব্যুরো
(রিফ্র্যাক্টরিজ সেকশন)
পোঃ রাউরকেল্লা
উড়িষ্যা

৭। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্যালকাটা কেমিক্যাল
৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড
কলিকাতা-২৯

৮। দীপক বসু ও দেবিকা বসু
Radio & Elec. Engg Div.
National Research Council
Ottawa-7
Canada

৯। মহুয়া বিশ্বাস
১৫বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

১০। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ ;
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একবিংশ বর্ষ | এপ্রিল, ১৯৬৮ | চতুর্থ সংখ্যা

পরিবর্জন নীতি

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

পরমাণু-জগতের অভ্যন্তরের ঘটনাস্রোত যে সব মূল নীতির দ্বারা পরিচালিত, পাউলির পরিবর্জন নীতি (Pauli's Exclusion Principle) তাদের অন্যতম। এই নীতির তাৎপর্য হয়তো পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার গভীরে প্রবেশ না করলে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তবে আঙ্কিক জটিলতা যথাসম্ভব পরিহার করে এর মূল বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

পাউলির নীতির মূল উদ্দেশ্য, পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কক্ষে ইলেকট্রনসমূহের বণ্টন সম্পর্কে আলোকপাত করা। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করবার আগে পরমাণু সম্পর্কে একটা প্রাথমিক আলোচনা নিশ্চয়ই অবান্তর হবে না। কিন্তু পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার সুবিশাল ইতিহাসের জটিল গ্রন্থি উন্মোচনের চেষ্টা আমরা করবো না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অসংখ্য ব্যর্থতার অধ্যায় রচিত হয়েছে, সে সব অতিক্রম করে আমরা চরম সাফল্যের কয়েকটি অধ্যায়ই কেবল মাত্র আলোচনা করবো।

কোন পদার্থের উপর উচ্চ কম্পনাঙ্কের রঞ্জেন রশ্মি ফেলে দেখা গেছে যে, বিচ্ছুরিত রঞ্জেন রশ্মির মধ্যে আপতিত রঞ্জেন রশ্মি ছাড়াও আরো অনেক নতুন নতুন কম্পনাঙ্কের রশ্মি এসে পড়ে। এই বিচ্ছুরিত আলোর (রঞ্জেন রশ্মির) বর্ণালী

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন মৌলকে বিচ্ছুরক পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করলে বিভিন্ন রেখা বর্ণালীর শ্রেণী পাওয়া যায়। হাইড্রোজেনের রেখা বর্ণালী শ্রেণী, অক্সিজেন বা নাইট্রোজেনের থেকে ভিন্ন। মোট কথা, কোন মৌলের রঞ্জেন রশ্মি—বর্ণালী রেখার শ্রেণী সম্পূর্ণ ঐ মৌলের নিজস্ব। কোন মৌলের রঞ্জেন রশ্মি বর্ণালীর বিভিন্ন রেখাকে K, L, M, N ইত্যাদি অক্ষর দ্বারা সূচিত করা হয়: অর্থাৎ কোন মৌলের রঞ্জেন রশ্মি বর্ণালী বিশ্লেষণ করলে যে সব রেখা বর্ণালী পাওয়া যায়, তরঙ্গ কম্পন সংখ্যার বর্ধক্রম অনুসারে তাদের K, L, M, N ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন মৌলের K বা L রেখার তরঙ্গ কম্পন সংখ্যা বিভিন্ন হয়ে থাকে, যেহেতু দুটি মৌলের বর্ণালী সব সময়ই আলাদা। পরবর্তী কালে আরও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বর্ণালী বিশ্লেষক যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেল যে, প্রতিটি রেখা আসলে ঘন সন্নিবিষ্ট দুই বা তিনটি রেখার সমষ্টি। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কোন একটি বিশেষ শ্রেণী, যেমন—K শ্রেণী, L শ্রেণী, আসলে দুই বা তিনটি কম্পন সংখ্যার রঞ্জেন রশ্মির সমবায়ে গঠিত হয়ে থাকে এবং এই সব রশ্মির পরস্পরের কম্পনাঙ্কের পার্থক্য খুবই কম হওয়ায় তাদের সাধারণ যন্ত্রের দ্বারা পৃথক করা যায় না। এই রেখাগুলিরও ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে; যেমন—K শ্রেণীর রেখাগুলির নাম K_α, K_β; L শ্রেণীর রেখাগুলির নাম L_α, L_β, L_γ ইত্যাদি। কোন একটি শ্রেণীর α রেখার চেয়ে β রেখার কম্পনাঙ্ক বেশী। আবার β-এর চেয়ে γ-র কম্পনাঙ্ক আরও বেশী।

পরমাণুর রঞ্জেন রশ্মির বর্ণালীর অনুশীলনের ক্ষেত্রে বহু বৈজ্ঞানিকের অমূল্য অবদান রয়েছে। সব মৌলের মধ্যে পারমাণবিক গঠনের দিক থেকে সরলতম হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং সেই জন্যে রঞ্জেন রশ্মির বর্ণালীর গবেষণার ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের উপর বৈজ্ঞানিকদের খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। হাইড্রোজেন বর্ণালীর বিভিন্ন রেখার কম্পনাঙ্কের পরিবর্তনের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ধারা লক্ষ্য করে বামার তাদের মধ্যে একটি গাণিতিক সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। প্রকৃতপক্ষে হাইড্রোজেন বর্ণালীর সবগুলি আবিষ্কৃত হবার আগেই (পরীক্ষাগারে) বামার তাঁর সমীকরণটি আবিষ্কার করেন। আবার বিভিন্ন মৌলের বর্ণালী রেখাগুলি পরীক্ষা করে মোজ্‌লে দেখালেন যে, পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি রেখা উচ্চতর কম্পন সংখ্যার দিকে নিয়মিতভাবে সরে যায়; অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ রেখার কথা যদি আমরা ধরি (যেমন K_α), তবে মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাবে, K_α রেখার কম্পন সংখ্যাও ততই বেড়ে যাবে। মোজ্‌লে তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে লেখচিত্রের সাহায্যে দেখালেন যে, কোন বিশেষ বর্ণালী রেখার কম্পনাঙ্কের বর্গমূল, মৌলের পারমাণবিক সংখ্যার সঙ্গে রৈখিক নিয়মে (Linearly) বৃদ্ধি পায়।

উপরিউক্ত বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি রেখে নীল্‌ বোর ১৯১৩ সালে তাঁর বিখ্যাত হাইড্রোজেন পরমাণু তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের সামনে উপস্থাপিত করেন। তাঁর তত্ত্বে পরমাণুর যে প্রতিকৃতি কল্পনা করা হয়েছে, তা অনেকাংশে রাদারফোর্ডের পরমাণুরই অনুরূপ, কিন্তু তাঁর তত্ত্বে দুটি যুগান্তকারী কল্পনা আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি হাইড্রোজেন বর্ণালী এবং হিলিয়াম বর্ণালীর কোন কোন রেখার একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন। তিনি বলেন যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রনগুলি বৃত্তাকার কক্ষপথে কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পরমাণুটি যদি শক্তি শোষণ করে, তবে কোন একটি বা একাধিক ইলেকট্রন একটি ছোট কক্ষ থেকে লাফিয়ে বড় কক্ষে চলে যায়—কেন না, বৃহত্তর কক্ষস্থিত ইলেকট্রনের শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী। আবার পরমাণুটি যদি শক্তি বিকিরণ করে, তবে ঘটে ঠিক এর উল্টো ব্যাপার, অর্থাৎ এক বা একাধিক ইলেকট্রন এক কক্ষ থেকে অপর একটি ক্ষুদ্রতর কক্ষে লাফিয়ে চলে যায়। প্রথমতঃ তিনি কল্পনা করলেন যে, কোন পরমাণু যখন শক্তি শোষণ (বা বিকিরণ) করে, তখন তা সব সময়েই শক্তির ফোটন বা কোয়ান্টাম হিসাবে শোষণ (বা বিকিরণ) করে; অর্থাৎ যদি একটি ইলেকট্রন কোন একটি কক্ষ থেকে একটি ক্ষুদ্রতর কক্ষে লাফিয়ে চলে যায়, তবে বিকিরিত শক্তির পরিমাণ হবে, দুটি কক্ষে ইলেকট্রনের শক্তির যতখানি পার্থক্য, ঠিক ততখানিই এবং এই শক্তি অবশ্যই একটি কোয়ান্টাম রূপে ছাড়া পাবে। যদি দুটি কক্ষে ইলেকট্রনটির শক্তি যথাক্রমে E_1 এবং E_2 হয়, তবে বিকিরিত শক্তির পরিমাণ হবে,

$$E_2 - E_1 = h\nu \cdots\cdots\cdots (1)$$

এখানে h হচ্ছে একটি ধ্রুবক, যাকে বলা হয় প্লাঙ্কের ধ্রুবক এবং ν হচ্ছে বিকিরিত রশ্মির কম্পনাঙ্ক (Frequency)।

বোরের তত্ত্বের দ্বিতীয় কল্পনাটি আরো চমকপ্রদ। তিনি ধরে নিলেন যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনগুলির কৌণিক ভরবেগ (Angular momentum) যে কোন মানের হতে পারে না। তিনি বললেন—ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের (অর্থাৎ ইলেকট্রনের ভরবেগ × কক্ষের ব্যাসার্ধ) সম্ভাব্য মানগুলি হচ্ছে $h/2\pi$, $2h/2\pi$, $3h/2\pi$, $4h/2\pi$, $5h/2\pi$ অথবা কোন ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ $\frac{nh}{2\pi}$ দ্বারা সূচিত কেবলমাত্র যে কোন একটি হতে পারে, যেখানে n=1, 2, 3, 4 অথবা 5, এই দুটি কল্পনার উপর ভিত্তি করে বোর দেখালেন যে, প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রনগুলির জন্যে কতকগুলি কক্ষপথ নির্দিষ্ট রয়েছে এবং এই কক্ষপথগুলি ছাড়া একটি ইলেকট্রন অন্য কোন কক্ষপথে নিউক্লিয়াসকে পরিক্রমা করতে পারে না। কোন একটি ইলেকট্রনের কক্ষের ব্যাসার্ধ নির্ভর করে ইলেকট্রনটির শক্তি বা কৌণিক ভরবেগের উপর। অতএব n সংখ্যাটি কক্ষের ব্যাসার্ধ নির্দেশ করে। এই সংখ্যাটিকে বলা হয় পরমাণুস্থিত ইলেকট্রনটির প্রিন্সিপ্যাল কোয়ান্টাম নাম্বার। স্পষ্টতঃই এই সংখ্যাটি পরমাণুস্থিত ইলেকট্রনটির শক্তির পরিচয় দেয়।

কিন্তু পরমাণুর বর্ণালী তত্ত্বের যত বিকাশ ঘটতে লাগলো, ততই একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, কেবলমাত্র একটি কোয়ান্টাম সংখ্যার দ্বারা একটি ইলেকট্রনের গতি সংক্রান্ত অবস্থাগুলির পুরাপুরি বর্ণনা দেওয়া যায় না। বিভিন্ন বিষয় থেকে দেখা গেল যে, অন্ততঃ চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার প্রয়োজন। সমারফেল্ড তাঁর পরমাণু তত্ত্বে বোরের ইলেকট্রন কক্ষগুলিকে শুধু মাত্র বৃত্তাকার মনে করবার বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন যে, প্রতিটি বোর কক্ষ একাধিক উপ-বৃত্তাকার কক্ষের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে। এই সব উপবৃত্তগুলিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে দ্বিতীয় একটি কোয়ান্টাম সংখ্যার দ্বারা। এই সংখ্যাটির বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাজিমিউথ্যাল কোয়া-ন্টাম সংখ্যা এবং এর গাণিতিক প্রতীক হচ্ছে l। l-এর বিভিন্ন মান বিভিন্ন উপবৃত্তকে সূচিত করে। কিন্তু একটু আগেই বলা হয়েছে যে, একটি বোরের কক্ষ একাধিক উপবৃত্তের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে অথবা একথাও বলা যায় যে, n-এর একটি বিশেষ মানের জন্যে l-এর একাধিক মান থাকা সম্ভব, যারা প্রত্যেকে এক-একটি উপবৃত্তকে সূচিত

করবে। তাত্ত্বিক ভিত্তিতে এটা প্রমাণ করা গেছে যে, n-এর একটি বিশেষ মানের জন্যে l-এর মানগুলি যা যা হওয়া সম্ভব, তা হচ্ছে $(n-1)$, $(n-2)$, $(n-3)$,......, 1, 0, অর্থাৎ n-তম ঘোর কক্ষটি n সংখ্যক উপবৃত্তাকার ও বৃত্তাকার কক্ষে বিভক্ত। সম্ভাব্য কক্ষগুলির মধ্যে একটি মাত্র কক্ষ বৃত্তাকার এবং বাকীগুলি উপবৃত্তাকার। প্রকৃতপক্ষে l-এর শূন্য মানটি বৃত্তাকার কক্ষপথকে সূচিত করে।

জিম্যান পরীক্ষা করে দেখালেন যে, পদার্থকে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রেখে তার বর্ণালী বিশ্লেষণ করলে তার প্রতিটি বর্ণালী রেখা অনেকগুলি আলাদা আলাদা রেখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে একথা ধরে নিতে হয় যে, চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োগের ফলে ইলেকট্রনগুলি একাধিক সমতলে নিউক্লিয়াসকে পরিভ্রমণ করতে পারে এবং এই সব সমতলগুলির সংখ্যা ও অবস্থান নির্ধারিত হয় ম্যাগ্‌নেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা বা m-এর দ্বারা। দেখা গেছে যে, l-এর একটি বিশেষ মানের জন্যে m-এর $(2l+1)$ সংখ্যক মান থাকা সম্ভব এবং সেই মানগুলি হচ্ছে যথাক্রমে l, $(l-1)$, $(l-2)$, $(l-3)$, ..., -2, 1, 0, -1, -2,...... $-(l-3)$, $-(l-2)$, $-(l-1)$, এবং $-l$, অর্থাৎ যখন $l=4$, m-এর সম্ভাব্য মানগুলি হচ্ছে 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 এবং -4।

কিন্তু এই তিনটি সংখ্যা ছাড়া আরও একটি কোয়ান্টাম সংখ্যার প্রয়োজন। এই কোয়ান্টাম সংখ্যাটি ইলেকট্রনের নিজস্ব অক্ষের চতুর্দিকে ঘূর্ণন গতিবেগকে সূচিত করে। ইলেকট্রনের এই গতিকে পৃথিবীর আহ্নিক গতিবেগের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এবং এই চতুর্থ কোয়ান্টাম সংখ্যাটির নাম হচ্ছে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা। পরমাণুস্থিত ইলেকট্রনগুলির স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কেবলমাত্র $+\frac{1}{2}$ অথবা $-\frac{1}{2}$ হতে পারে। স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যাকে s অক্ষরের দ্বারা সূচিত করা হয়।

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হলো, পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রনের বিন্যাস সম্বন্ধে তাথেকে কোন সুস্পষ্ট ধারণা হয় না। কিন্তু পরমাণুর আভ্যন্তরীণ ইলেকট্রনসমূহ যে মূল নীতিটির দ্বারা বিন্যস্ত, তা বুঝতে গেলে উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা একান্তই আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে পাউলির নীতি বা তথাকথিত পরিবর্জন নীতিকে নানা উপায়ে বর্ণনা করা যায়। আমরা সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে এবং সহজতম পথে একে বর্ণনা করবো। নীতিটি হচ্ছে এই রকম—কোন একটি পরমাণুর অভ্যন্তরে এমন দুটি বা ততোধিক ইলেকট্রন থাকা কখনই সম্ভব নয়, যাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম সংখ্যা-গুলির মান অভিন্ন। অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, কোন একটি পরমাণুর অভ্যন্তরে n, l, m ও s-এর মানসমূহের একটি বিশেষ সমবায়ের দ্বারা সূচিত একটি নির্দিষ্ট ইলেকট্রনই থাকা সম্ভব। আমরা যদি কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলিকে ছক কাগজের উপরিস্থিত একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক-গুলির (Co-ordinates) সঙ্গে তুলনা করি, তবে বিষয়টি সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। মনে করুন, ছক কাগজটি হচ্ছে পরমাণু এবং এর এক-একটি বিন্দু হচ্ছে এক-একটি ইলেকট্রন। তাহলে একথা বলা যেতে পারে যে, কোন একটি ছক কাগজের উপর এমন দুটি বিন্দু থাকা কখনই সম্ভব নয়, যাদের প্রত্যেকের স্থানাঙ্কগুলির মান (x ও y) অভিন্ন; অর্থাৎ x ও y-এর মানগুলি একটি বিশেষ সমবায়ের দ্বারা (3, 4 বা 4, 6) একটি এবং কেবল মাত্র একটি বিন্দুকেই সূচিত করা যায়। পাউলির নীতির বক্তব্য বিষয়টা হয়তো পাঠকের কাছে আর দুর্বোধ্য নাও ঠেকতে পারে।

এখন মনে করুন, একটি পরমাণু থেকে সব ইলেকট্রনগুলিকে কোন উপায়ে সরিয়ে নেওয়া হলো এবং তারপর একটি একটি করে তার মধ্যে ইলেকট্রন ছাড়া হতে লাগলো। প্রথম যে ইলেকট্রনটি ছাড়া হবে, সেটি স্বভাবতঃই নিম্নতম শক্তির কক্ষপথটি বেছে নেবে এবং পরমাণু-কেন্দ্রটিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে; অর্থাৎ ইলেকট্রনটির প্রিন্সিপ্যাল কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হবে $n=1$, কেন না, এটিই নিম্নতম শক্তির কক্ষকে সূচিত করে। এই কক্ষে ইলেকট্রনের l-এর একমাত্র সম্ভাব্য মান হচ্ছে, $1-1=o$ এবং m-এর সম্ভাব্য মানটিও হচ্ছে o। কিন্তু s-এর মান $+\frac{1}{2}$ও হতে পারে, $-\frac{1}{2}$ও হতে পারে; অর্থাৎ প্রথম বোর কক্ষে $(n=1)$ দুটি মাত্র ইলেকট্রন থাকা সম্ভব এবং তাদের ক্ষেত্রে $n=1$, $l=o$ এবং $m=o$, কিন্তু একটির ক্ষেত্রে $s=+\frac{1}{2}$ এবং অপরটির ক্ষেত্রে $s=-\frac{1}{2}$। সুতরাং যদি দ্বিতীয় একটি ইলেকট্রনকে পরমাণুর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে সেটিও প্রথম বোর কক্ষে স্থান করে নিতে পারবে। কিন্তু তৃতীয় একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে তাকে যেতে হবে দ্বিতীয় বোর কক্ষে; অর্থাৎ এটির ক্ষেত্রে $n=2$ হবে। কিন্তু দ্বিতীয় বোর কক্ষটিতে l-এর দুটি মান থাকা সম্ভব, 1 এবং o; অর্থাৎ এই কক্ষটি দুটি উপকক্ষে (Sub-level) বিভক্ত বলে মনে করা যায়। যে উপকক্ষটিতে $l=o$, সেটির নাম s উপকক্ষ এবং যেটির ক্ষেত্রে $l=1$, সেটির নাম দেওয়া হয়েছে p উপকক্ষ। s উপকক্ষটিতে l যেহেতু o, m-এর মানও অবশ্যই o হবে, কিন্তু s-এর মান $+\frac{1}{2}$ হতে পারে, আবার $-\frac{1}{2}$ও হতে পারে; অর্থাৎ s উপকক্ষে দুটি মাত্র ইলেকট্রন থাকা সম্ভব এবং তাদের পার্থক্য কেবল মাত্র স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যায় (প্রথম বোর কক্ষের মত)। কিন্তু p উপকক্ষটিতে $l=2$, সুতরাং m-এর মান তিনটি হতে পারে, $+1$, o এবং -1, আবার m-এর প্রত্যেকটি মানের জন্যে s-এর মান $+\frac{1}{2}$ এবং $-\frac{1}{2}$ হতে পারে। অতএব p উপকক্ষে $3\times 2=6$টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। তাহলে দেখা গেল যে, দ্বিতীয় বোর কক্ষটিতে সর্বাধিক মোট আটটি ইলেকট্রন থাকতে পারে, তার মধ্যে দুটি থাকবে s উপকক্ষে এবং এটি পূর্ণ হবার পর বাকীগুলি p উপকক্ষে স্থান পাবে।

এভাবে দেখানো সম্ভব যে, তৃতীয় বোর কক্ষ তিনটি উপকক্ষে বিভক্ত। এই উপকক্ষগুলি s, p এবং d-এর দ্বারা সূচিত হয় এবং তৃতীয় উপকক্ষটির ক্ষেত্রে $l=2$। এই d উপকক্ষে দশটি ইলেকট্রন থাকতে পারে। সুতরাং তৃতীয় বোর কক্ষে মোট $2+6+10=18$টি ইলেকট্রন থাকতে পারে।

এবার চতুর্থ বোর কক্ষের কথায় আসা যাক। এটি চারটি উপকক্ষে বিভক্ত এবং এগুলির সূচক হচ্ছে s, p, d এবং f। f উপকক্ষটির ক্ষেত্রে স্পষ্টতঃই $l=3$ এবং এটিতে সর্বাধিক 14টি ইলেকট্রন অবস্থান করতে পারে। সুতরাং চতুর্থ বোর কক্ষে সর্বাধিক $2+6+10+14=32$টি ইলেকট্রন থাকতে পারে।

পাউলির নীতির সাহায্যে এই ভাবে দেখানো যাবে যে, পঞ্চম কক্ষে মোট 50টি ইলেকট্রনের অবস্থান সম্ভব। কিন্তু সবচেয়ে বেশী পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট মৌল ইউরেনিয়ামের পরমাণুতেই মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা 92। এর মধ্যে প্রথম তিনটি কক্ষে ($n=1$, 2 এবং 3) থাকে সবসমেত $2+8+18+32=60$টি ইলেকট্রন এবং মোট 32টি ইলেকট্রন মাত্র পঞ্চম কক্ষে যায়। কাজেই এই কক্ষটি পুরাপুরি পূর্ণ হয় না।

পাউলির নীতির সাহায্যে কোন মৌলের পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় এবং পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম যেহেতু ইলেকট্রনের বিন্যাসের উপরেই নির্ভর করে,

সেহেতু পারমাণবিক সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের রাসায়নিক ধর্মের নির্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্তনের (পর্যায় নিয়ম অনুসারে) একটা মনোজ্ঞ ব্যাখ্যাও দেওয়া সম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে এই নীতিটি কোন একটি বিশেষ পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে উৎপন্ন নয় এবং কোন একটি বিশেষ তত্ত্বের ভিত্তিতে একে প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। কিন্তু সত্যতার সপক্ষে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যদি প্রকৃতিতে পরিবর্জন নীতির অস্তিত্ব না থাকতো, তবে সমস্ত পরমাণু হতো একই রকমের এবং প্রকৃতির এত সৌন্দর্য, এত বৈচিত্র্যও আর থাকতো না। হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম ছাড়া আর সমস্ত পদার্থের ঘনত্ব হতো আরো অনেক বেশী। পাউলির নীতি বর্জিত হলে সম্ভবতঃ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেহারা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতালব্ধ জগৎ থেকে এত ভিন্ন প্রকৃতির হতো যে, তার কল্পনা করাও মানুষের সাধ্যাতীত।

কৃত্রিম উপগ্রহের দশ বছর

দীপক বসু

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ চেষ্টা করে চলেছে প্রকৃতিকে জয় করে নিজের বশে আনতে। অতি দুর্গম অরণ্য, চির তুষারাবৃত মেরু প্রদেশ, সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, গভীর উত্তাল সমুদ্র, তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি, সুনীল অম্বর—সবই একে একে মানুষের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এতেও মানুষ সন্তুষ্ট হলো না। বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন ও কল্পনা এরপর তাকে টেনে নিয়ে চললো এই পৃথিবীর জল, মাটি ও বাতাস ছাড়িয়ে অনেক উর্ধ্বে—অসীম মহাশূন্যের পথে। পূর্ণিমার রাতে নীল আকাশের বুকে উজ্জ্বল চন্দ্রকে দেখে কবি যুগে যুগে লিখে গেছেন কত অমর কবিতা। সেই চন্দ্রকে দেখে বিংশ শতাব্দীর কোন এক সুন্দর প্রভাতে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক দেখলেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন—নকল চন্দ্র গড়তে হবে। কিছুদিন আগেও এই স্বপ্ন অলীক বলেই মনে হয়েছে এবং সাধারণ লোক একে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু নানা রকম শক্তির বলে বলীয়ান এই যুগের বৈজ্ঞানিক এসব পরিহাসে কর্ণপাত করেন নি। তাই আজ বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মানুষের কল্পনা নয়—স্বয়ং মানুষই ডানা মেলেছে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে গ্রহ-উপগ্রহের পথে।

মহাশূন্য বিজয়ের ইতিহাসে ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর এক চরম গৌরবোজ্জ্বল দিন। ঐ দিনেই সর্বপ্রথম মানুষের তৈরি প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ রাশিয়ার স্পুটনিক-১ বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে আকাশের বুক চিরে মহাশূন্যের পথে যাত্রা করেছিল। তারপর একমাস অতিবাহিত হবার পূর্বেই ৩রা নভেম্বর রাশিয়ার দ্বিতীয় উপগ্রহও আকাশে উঠে গেল। বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়। দ্বিতীয় উপগ্রহটির ওজন প্রথমটির ৬ গুণেরও বেশী। আর এর ভিতরে ছিল একটি জীবন্ত কুকুর—নাম লাইকা। মহাশূন্যের প্রথম যাত্রী এই কুকুরটি অবশ্য আজ মৃত, কিন্তু একথা সত্যি যে, লাইকা তার নিজের জীবন দিয়ে মহাশূন্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। এদিকে আমেরি-

কাননা চুপ করে বসে ছিল না। অনতিবিলম্বে তাদেরও কৃত্রিম উপগ্রহ একের পর এক অন্তরীক্ষলোকে যাত্রা করলো।

এরপর থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত বহু সংখ্যক মহাশূন্যগামী যান সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এদের অনেকেই আবার মহাশূন্য থেকে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করে নিরাপদে ফিরেও এসেছে। সাধারণ মানুষ অবশ্য প্রথম কয়েকটা কৃত্রিম উপগ্রহ দেখে যতটা উত্তেজিত হয়েছিল, ক্রমশঃ সম্ভবতঃ কিছুটা পুরনো হয়ে যাওয়ায় সে উত্তেজনা আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে গেছে। চমকপ্রদ কিছু থাকলে অবশ্য এখনও উত্তেজনাটা মাঝে মাঝে বেড়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিকের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম। কারণ প্রত্যেকটি উপগ্রহই পৃথিবী ও বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তাঁদের এনে দিয়েছে নতুন সব তথ্য। তারই উপর ভিত্তি করে বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাঁরা গড়ে তুলেছেন নতুন সব তত্ত্ব। তাই প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত উৎক্ষিপ্ত সবগুলি মহাকাশযান সম্বন্ধে তাঁরা সমান

ীল।

রাশিয়ার কুকুর লাইকা আর আমেরিকার বানর এব্‌ল্ নিজেদের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে মানুষের মহাশূন্য ভ্রমণে কোন ভয় বা অসুবিধা নেই। তাই রাশিয়ার উরী গাগারীন পৃথিবীর মানুষ, নিশ্চিন্ত মনে মহাশূন্যের পথে পা বাড়ালেন। তারপর একে একে রাশিয়া ও আমেরিকার বেশ কয়েকজন মহাশূন্যে ভ্রমণ করে এসেছেন। শুধু তাই নয়, এই পথের পথিকদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। তিনি হচ্ছেন রাশিয়ার ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা।

গত দশ বছরের হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে, মানুষ নিরাপদে ভূপৃষ্ঠের উপর ৮৫০ মাইল পর্যন্ত ভ্রমণ করে এসেছে। ওজনহীন অবস্থায় ১৪ দিন পর্যন্ত সে মহাশূন্যে বিচরণ করেছে। এতে তার মানসিক বা শারীরিক ক্ষতিকর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি। মহাশূন্যযানের মধ্যে বসে সে হাতে-কলমে নানারকম কাজ করেছে। ভূপৃষ্ঠে বসে দুটি মহাশূন্যযানকে মহাশূন্যেই একত্রে মিলিয়েছে। যান থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে সত্যিকারের মহাশূন্যে সে হেঁটে বেড়িয়েছে। নিজের যানের গতি নিয়ন্ত্রণ করে মহাশূন্যে চলমান অন্য যানের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়েছে। অনেকটা যেন কলকাতার রাস্তায় গাড়ী চালিয়ে যেতে যেতে অন্য গাড়ীতে চলমান বন্ধুর সঙ্গে একটু গল্প করবার মত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মানুষ যাবার আগে ও পরে লাইকা ও এব্‌ল্ ছাড়া আরও বহুসংখ্যক নানা ধরণের জীবজন্তু ও গাছপালা মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে ইঁদুর, খরগোস, মুরগী, ছাগল, নানারকম পোকামাকড় ও শাকসব্জী ইত্যাদি। এরা সকলেই মহাশূন্য সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করে বিজ্ঞানীর জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে।

রাশিয়া ও আমেরিকার যন্ত্রবাহী যান চাঁদে অবতরণ করেছে। শুধু তাই নয়, এরা শুক্র ও মঙ্গলগ্রহের পাশ কাটিয়ে চলে গেছে অসীম মহাশূন্যের বুকে। এদের মধ্যে এমনও আছে, যে সূর্যের চারদিকে কৃত্রিম গ্রহরূপে ঘুরছে। রাশিয়ার ভেনাস-৪ গত ১৮ই অক্টোবর শুক্রগ্রহে অবতরণ করে সেখানকার আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করেছে। চাঁদ, মঙ্গল ও শুক্রগ্রহে মানুষের অবতরণ করা আর কল্পনাপ্রসূত নয়। হয়তো বিংশ শতাব্দীর শেষ হবার আগেই এসব দেখতে পাওয়া যাবে। বৃহস্পতি বা শনিগ্রহের কাছাকাছি গিয়ে মহাশূন্যযানের ঘুরে আসাও কিছু মাত্র বিচিত্র নয়।

আমাদের দেশে টেলিভিশন এখনও খুব বেশী প্রচলিত হয় নি। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এর

প্রচলন অত্যধিক। টেলিভিশন-তরঙ্গ আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয় না বলে বেশী দূর পর্যন্ত তা পাঠানো যায় না। দূরপাল্লার টেলিভিশন যোগাযোগের জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহকে কাজে লাগানো হয়েছে। এরই জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল টেলষ্টার নামে কৃত্রিম উপগ্রহ। পৃথিবীর দুই গোলার্ধ মিলিয়ে ২৪টি দেশের লোকেরা এক সঙ্গে টেলিভিশন দেখেছে এই কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে। শুধু টেলিভিশনই নয়, ভূপৃষ্ঠে বেতার যোগাযোগের ব্যাপারেও কৃত্রিম উপগ্রহ ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভূপৃষ্ঠের উপর ২৩,০০০ মাইল দূরে যদি একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে স্থাপন করা যায়, তবে সে যখন বিশেষ গতিবেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে, তখন তাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে একটি স্থির নক্ষত্রের মত দেখাবে। উপরিউক্ত টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখাবার জন্যে এই ধরণের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করা হয়েছিল। অদূর ভবিষ্যতে এরকম মোট তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে পৃথিবীর চারদিকে স্থাপন করা হবে। এরা থাকবে পরস্পরের সঙ্গে ১২০° কোণ করে। এদের সাহায্যে পৃথিবীর সর্বত্র বেতার যোগাযোগ করা যাবে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ছাড়া আজকাল আমাদের একেবারেই চলে না। কিন্তু এই পূর্বাভাসের বিজ্ঞপ্তি যে সব সময় ঠিক হয়, তা নয়। সম্ভবতঃ আমাদের পর্যবেক্ষণ এখনও ত্রুটিহীন হয় নি। সাধারণ লোকের কাছে অবশ্য এসব ত্রুটি খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু বিমান-চালক ও জাহাজ-চালকদের পক্ষে নির্ভুল আবহাওয়ার পূর্বাভাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ আরও উন্নত ধরণের করবার জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহকে কাজে লাগানো হয়েছে। এর উদাহরণ হচ্ছে—টিরস। এরা উপর থেকে বিরাট এলাকা জুড়ে মেঘের ছবি তোলে ও বায়ুপ্রবাহ সম্বন্ধে নানা খবর সংগ্রহ করে। যখন বিভিন্ন দেশের উপর দিয়ে এরা যায়, সে দেশ বেতার যোগাযোগের মারফৎ উপগ্রহ থেকে ঐ সব ছবি ও খবর সংগ্রহ করে। বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক সঠিকভাবে করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন।

কৃত্রিম উপগ্রহের যে সব কীর্তির কথা এতক্ষণ বলা হলো, এসবই সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ আবেদনসম্পন্ন। কিন্তু এছাড়াও কৃত্রিম উপগ্রহের আর এক শ্রেণীর অবদান আছে, যা শুধুমাত্র বিজ্ঞানীদের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ।

কৃত্রিম উপগ্রহের বৈজ্ঞানিক অবদানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়ের আবিষ্কার। পৃথিবী থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে দুটি স্তরে ভাগ হয়ে অতি শক্তিশালী বিদ্যুৎ-কণার দ্বারা গঠিত এই অঞ্চল রয়েছে। প্রথমটি অর্থাৎ অন্তর্বলয়টি রয়েছে পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত কাছে—কেন্দ্র থেকে মোটামুটি ১৩,০০০ কিঃ মিঃ দূরে। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বহির্বলয়টি ২৫,০০০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। উভয় বলয়েরই দুই প্রান্ত শিং-এর মত বেঁকে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে মিশেছে। কৃত্রিম উপগ্রহ ওঠবার আগে এই বলয় দুটির সত্যিকারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কোন ধারণাই ছিল না। আবিষ্কর্তা আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেম্‌স ভ্যান অ্যালেনের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।

সৌরমণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহ পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে কৃত্রিম উপগ্রহের অবদান অসামান্য। রাশিয়ার লুনিক-১ হচ্ছে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ, যে এতকাল লুক্কায়িত চাঁদের বিপরীত দিক আমাদের সামনে প্রথম তুলে ধরেছিল। এরপর বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে চাঁদের উত্তর দিকের মানচিত্র সম্পূর্ণ করা হয়েছে। আমে-

রিকার সার্ভেয়ার উপগ্রহ চাঁদের মাটি পরীক্ষা করে দেখেছে, তা যথেষ্ট শক্ত। মানুষের সেখানে নামতে কোনই অসুবিধা হবে না। রাশিয়ার ভেনাস-৫ জানিয়েছে, শুক্রগ্রহ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে আবৃত এবং সেখানকার উত্তাপ ৫৩৮° ফাঃ। পৃথিবীর মত শুক্রের কোন চৌম্বক ক্ষেত্র বা বিকিরণ বলয় নেই। এর আগেই কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছিল যে, চাঁদেরও কোন চৌম্বক ক্ষেত্র নেই। অন্য কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা, সেটা স্থিরীকৃত হতে বোধ হয় আর বেশী দেরী নেই।

এসব ছাড়াও পৃথিবী, সূর্য এবং সূর্য ও পৃথিবীর সম্পর্ক সম্বন্ধে গত দশ বছরে বিজ্ঞানীদের অনেক কৌতূহল মিটিয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ। কৃত্রিম উপগ্রহের বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এক হাজারেরও বেশী নতুন জিনিষের সন্ধান পেয়েছেন। এদের মধ্যে নতুন ধরণের মিশ্রধাতু ও রকেটের জ্বালানী থেকে সুরু করে পকেটে রাখবার মত কম্পিউটার যন্ত্র পর্যন্ত রয়েছে।

দশ বছরে কৃত্রিম উপগ্রহের বিভিন্ন অবদানের সম্যক পরিচয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়—একথা সহজেই অনুমেয়। এখানে শুধু বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অবদানের কথাই উল্লেখ করা হলো। ১৯০৩ সালে কিটি হক নামক স্থানে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় যখন ছোট্ট একটি বাক্সের মত বস্তুকে প্রথম আকাশে উড়িয়েছিলেন, তখন কে জানতো—মাত্র অর্ধশতাব্দী কাল অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বায়ুমণ্ডল ও মহাকাশ মানুষের অধিকারে আসবে? যাঁদের অসামান্য জ্ঞান ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই সব অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে, বিংশ শতাব্দীর সেই সব মনীষীদের সমস্ত জগৎ জানাচ্ছে তাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

ক্লোরোফর্ম ও ডাঃ সিমসন

আব্দুল হক খন্দকার

কঠিন অস্ত্রোপচারের পূর্বে ক্লোরোফর্মের সাহায্যে অজ্ঞান করবার রীতির আজ তেমন প্রচলন না থাকলেও অল্প কিছুদিন পূর্বেও এই পদ্ধতিটি শল্যচিকিৎসার এক অত্যাবশ্যক অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অথচ ক্লোরোফর্ম যে শল্য-চিকিৎসা ও প্রসব-বেদনা মুক্তির কাজে লাগতে পারে, এক-শ' কুড়ি বছর আগেও সে কথা কেউ ভাবতে পারে নি। তখনকার দিনে অস্ত্রোপচারের সময় রোগীকে যে কি অসহনীয় দুর্ভোগ ভোগ করতে হতো, তা বলবার নয়। রোগী যাতে নড়তে-চড়তে না পারে এবং ডাক্তারের কাজে অসুবিধার সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্যে তার হাত-পা বেশ শক্ত করে বাঁধা হতো কিংবা কয়েকজন শক্তিশালী লোক মিলে তাকে আয়ত্তে রাখতে চেষ্টা করতো। শুধু তাই নয়—রোগী নিজের চোখেই অস্ত্রোপচারের ভয়াবহ যন্ত্রপাতি—এমন কি, নিজের দেহে তাদের ব্যবহারও দেখতে পেত। অন্য দিকে আবার ক্ষত-স্থান জোড়বার জন্যে যে তপ্ত আলকাত্‌রা ব্যবহৃত হতো, তার স্ফুটনের শব্দ সে শুনতে পেত এবং স্ফুটন্ত আলকাত্‌রার উগ্র গন্ধও তার নাকে প্রবেশ করতো। অস্ত্রোপচারের সময় তাই রোগীকে

স্থির রাখা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। অনেক সময় কোন কোন রোগী এই সব অমানুষিক আচরণ সহ্য করতে না পেরে অথবা প্রবল আতঙ্কে মূর্ছা যেত। রোগীর কাতরানি ও আর্ত-আবেদন উপেক্ষা করে ডাক্তারকে অস্ত্রোপচারের কাজে অসীম মনোবলের পরিচয় দিতে হতো এবং অতি ক্ষিপ্র গতিতে কাজ সারতে হতো। কাজেই শল্যচিকিৎসায় পারদর্শী হতে হলে চিকিৎসককে হতে হতো কসাইয়ের চেয়ে হৃদয়হীন এবং প্রয়োজন হতো অস্ত্রোপচার দ্রুত সম্পন্ন করবার দক্ষতার। যিনি যত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই কাজ করতে পারতেন, শল্যচিকিৎসক হিসাবে তাঁর তত সুনাম হতো। ক্লোরোফর্মের সাহায্যে অজ্ঞান করবার সহজ ও কার্যকরী পন্থা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে যে জনহিতৈষী চিকিৎসক মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন—অস্ত্রোপচারের ভীতি ও যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে যিনি শল্যচিকিৎসাকে দ্রুত উন্নতির শিখরে উন্নীত করেন—তিনি হলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং লিনলিথগোর এক রুটি প্রস্তুতকারী ডেভিড সিমসনের সপ্তম সন্তান জেম্‌স ইয়ং সিমসন। ডাঃ সিমসন ছিলেন সত্যকারের মানবদরদী। অন্যান্য ডাক্তারের মত তিনি রোগীর যন্ত্রণা উপেক্ষা করতে পারতেন না। তখনকার দিনের যন্ত্রণাদায়ক অস্ত্রোপচার-পদ্ধতির প্রতি তাই তিনি প্রথম থেকেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং কেমন করে রোগীকে অস্ত্রোপচারের নিগ্রহ থেকে রক্ষা করা যায়, নিরন্তর সেই চিন্তা ও চেষ্টা করতে থাকেন।

লিনলিথগোর বাথগেট নামক পল্লীতে ১৮১১ সালের ৭ই জুন সিমসন জন্মগ্রহণ করেন। বালক সিমসনের লেখাপড়ার দিকে অসীম আগ্রহ—তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যবহারিক বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় পেয়ে আট বছর বয়সে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করানো হয়। পরিবারের মধ্যে এই ছেলেটিই লেখাপড়া শিখছে এবং ভবিষ্যতে মানুষ হয়ে বংশের মুখোজ্জ্বল করবে, এই প্রত্যয়ে সিমসন পরিবার তাঁদের আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও তেরো বছর বয়সে তাঁকে উচ্চ শিক্ষার জন্যে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠালেন। তাঁদের আশা বিফল হলো না—আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়েও একুশ বছর বয়সে সিমসন ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারী ডিগ্রি লাভ করেন। ডাক্তারী উপাধি লাভের জন্যে তিনি যে "ডেথ্ ফ্রম ইনফ্লামেশন" নামক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করেন, তাতে তিনি তাঁর বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, বিচক্ষণতা, যুক্তি ও দূরদর্শিতার যে গভীর পরিচয় দেন, সে জন্যে তদানীন্তন প্যাথোলজির অধ্যাপক ডাঃ টমসন অত্যন্ত খুশী হয়ে তাঁকে তাঁর সহকারী করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সিমসনও সানন্দে সে প্রস্তাবে সম্মত হন। ১৮৩৭ সালে ডাঃ টমসন অসুস্থতার জন্যে এক বছর ছুটি নিলে তিনি তাঁর কাজ দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন এবং পরের বছর তিনি ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা দেন। ১৮৩৯ সালে এডিনবরার ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপকের পদ খালি হলে তিনি সেই পদের প্রার্থী হন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই যে, তিনি উক্ত পদের জন্যে উপযুক্ত বিবেচিত হলেও একদিক থেকে তাঁর মনোনয়নে অন্তরায় ঘটলো—কেন না, তখনকার দিনে উক্ত পদের জন্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও বিবাহিত হওয়া অন্যতম যোগ্যতা বলে গণ্য হতো। কিন্তু সিমসন ছিলেন এক গরীব রুটিওয়ালার পুত্র এবং অবিবাহিত। বিপাকে পড়ে সিমসন এক দূরসম্পর্কিত আত্মীয়া এবং লিভারপুলের ধনী ব্যবসায়ীর কন্যা জেসি গ্রিণ্ডলের নিকট হাজির হলেন। এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে সিমসনের পূর্বেই পরিচয় ছিল। ছুটির সময় তিনি মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়ীতে কাটিয়ে আসতেন। এই ব্যাপারে তিনি জেসি গ্রিণ্ডলের শরণাপন্ন হলেন। জেসি গ্রিণ্ডলে তাঁকে নিরাশ করলেন না এবং শীঘ্রই এই ধনী কন্যাকে

বিবাহ করে সিমসন সর্বতোভাবে অধ্যাপক পদের যোগ্যতা অর্জন করেন। ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হবার কয়েক বছর পর তিনি আমেরিকার দন্তচিকিৎসক ডাঃ মর্টনের ইথারের সাহায্যে বিনা যন্ত্রণায় দাঁত তোলবার সংবাদ পান এবং চেতনানাশক দ্রব্য ইথারের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

তখনকার দিনে রোগীকে অজ্ঞান করবার জন্যে সবে মাত্র দু-একটি দ্রব্যের প্রচলন সুরু হয়েছে। আমেরিকার দন্তচিকিৎসক ডাঃ হোরাস ওয়েল্‌স ও ডাঃ বিগ্‌স সর্বপ্রথম নাইট্রাস অক্সাইড বা লাফিং গ্যাসের সাহায্যে বিনা যন্ত্রণায় কয়েকজনের দাঁত তুলতে সক্ষম হন। ডাঃ লং, ডাঃ মর্টন, ডাঃ ওয়ারেন, ডাঃ হেওয়ার্ড প্রভৃতি ইথারের সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করে অস্ত্রোপচারে সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু এই দুটি দ্রব্যের প্রয়োগ সম্পর্কে ডাক্তারদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল—কেন না, এগুলির ব্যবহার ভবিষ্যতে রোগীর পক্ষে ক্ষতিকারক হয় কিনা, সে সম্বন্ধে তখন সঠিক কিছু জানা ছিল না। কাজেই অনেকে এই ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না এবং এগুলির প্রয়োগ খুবই সীমিত ছিল। তবুও সিমসন যখন চেতনানাশক দ্রব্য হিসাবে ইথার ব্যবহারের সংবাদ পেলেন এবং তখনকার বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক রবার্ট লিস্‌টনকে ইথারের সাহায্যে একটি কঠিন অস্ত্রোপচার করতে দেখলেন—তখন তিনি প্রসূতির প্রসবকালে ইথার ব্যবহারে আর দ্বিধা করলেন না—কেন না, প্রসূতির অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক প্রসব-বেদনা তাঁকে অত্যন্ত কাতর করে তুলতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিমসন যে মনোভাব নিয়ে এই কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন—জনসাধারণ সেরূপ মনোভাব নিয়ে প্রথমে তা গ্রহণ করলো না। ডারউনের মতবাদের মত চারদিকে এই ব্যাপার নিয়ে তুমুল আন্দোলন ও কোলাহলের সৃষ্টি হলো। ধর্মযাজকেরা ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে চিৎকার সুরু করলেন—এটা অন্যায়, চেতনানাশক দ্রব্য দিয়ে প্রসব-বেদনা দূর করা নীতিবিরুদ্ধ ও ধর্মবিরুদ্ধ—কেন না, বাইবেলে আছে—স্ত্রীলোকেরা দুঃখের সঙ্গে এবং ব্যথার সঙ্গে সন্তান ধারণ করবে, তারপর কষ্টের সঙ্গে সন্তান প্রসব করবে (ইন সরো দাউ স্যাল ব্রিং ফোর্থ চিলড্রেন)। সিমসন যদিও বাদানুবাদ পছন্দ করতেন—কিন্তু তিনি ছিলেন ধর্মেবিশ্বাসী—বাইবেলকে তিনি ভক্তি করতেন। তাই বাইবেলের উল্লেখে তিনি ভালভাবে আবার বাইবেল পড়া সুরু করলেন এবং বাইবেলের মূল হিব্রু থেকে দেখালেন যে, এই দুঃখ-কষ্ট শারীরিক কোন ব্যথা বা যন্ত্রণা নয়। তাছাড়া ইভের জন্মকথা পড়তে গিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে যে শাণিত অস্ত্রের সন্ধান পেলেন, তাও তিনি প্রয়োগ করলেন। ঈশ্বর নিজে যখন আদমের পাঁজরার হাড় থেকে ইভকে সৃষ্টি করেন, তখন তিনি আদমকে জাগ্রত না রেখে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রেখেছিলেন। সিমসন জোরালোভাবে প্রচার করলেন—এই গভীর ঘুমের অর্থ কি—তাৎপর্য কি? চেতনানাশক দ্রব্য মানুষকে এমনি গভীর ঘুমেই আচ্ছন্ন করে। কাজেই ঈশ্বর নিজেই অস্ত্রোপচারের আগে অজ্ঞান করে নেবার পক্ষপাতী এবং অ্যানেস্থেসিয়া বা অবেদনের প্রথম প্রবর্তক। সিমসন যখন ফেরাফিরতি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে এমনি জোরালোভাবে তাঁর কাজের সমর্থন করলেন, তখন ধর্মযাজকদের মুখ বন্ধ হলো বটে, কিন্তু অন্যান্য বাদানুবাদ একেবারে বন্ধ হলো না। সকল বাদানুবাদের অবশ্য অবসান ঘটেছিল অনেক পরে—যখন সিমসন ইথারের বদলে ক্লোরোফর্মের ভাল চেতনানাশক ক্ষমতা আবিষ্কার করে বহু ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেন এবং পরিশেষে ১৮৫৩ সালে এপ্রিলের মাঝামাঝি মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর সপ্তম সন্তান

প্রিন্স লিওপার্ডের জন্মের সময় নিজেই যখন ক্লোরোফর্ম ব্যবহারে রাজি হলেন।

যাহোক, ক্লোরোফর্মের সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করবার সূত্রটি সিমসন কিভাবে আবিষ্কার করেন, সে কথাই এখন বলছি। আগেই বলেছি যে, লাফিং গ্যাস বা ইথারের সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করবার ব্যবস্থার প্রচলন তখনকার দিনে কিছুটা সুরু হয়েছিল, কিন্তু এগুলির উপযোগিতা সম্পর্কে অনেক চিকিৎসকই নিঃসন্দেহ ছিলেন না। তাছাড়া সিমসন ইথার ব্যবহার করে নিজেও কিছু কিছু অসুবিধা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। তাই তাঁর চেষ্টা ছিল—একটি সুষ্ঠু চেতনানাশক দ্রব্য আবিষ্কার করা। এজন্যে প্রত্যহ তিনি নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করে মিশ্রণ তৈরি করতেন এবং সেগুলি নিয়ে পরীক্ষা চালাতেন। এই কাজে সাহায্যের জন্যে তিনি দু-তিন জন সহকারী ডাক্তার বন্ধুকেও সংগ্রহ করেছিলেন। এই ডাক্তার বন্ধুরা রোজ সন্ধ্যায় তাঁর বাসায় আড্ডা জমাতেন আর সে সময় সকলে মিলে সে দিনের তৈরি মিশ্রণগুলি শুঁকে শুঁকে পরীক্ষা করতেন। এমনি করে অনেক দিন শোঁকাশুঁকি চললো—কিন্তু তেমন কিছু আবিষ্কারের সম্ভাবনা দেখা গেল না। বার বার বিফলতা সত্ত্বেও তাঁরা কিন্তু দমলেন না—নিয়মিত আড্ডা ও সেই সঙ্গে পরীক্ষা চলতে লাগলো।

দিন যায়, রাত আসে—আর এমনি করে একদিন আসলো ১৮৪৭ সালের ৪ঠা নভেম্বরের রাত। এই বিশেষ রাতটি যেমন সিমসনের জীবনে, তেমনি শল্যচিকিৎসার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়—কেন না, এই রাতের পরীক্ষাই তাঁর জীবনে এনে দিয়েছিল চরম সাফল্য—সার্থক হয়েছিল তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনা।

সে দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ কেন যেন ক্লোরোফর্মের কথা সিমসনের মনে হলো। অবশ্য ইতিপূর্বে এটি নিয়ে একবার তিনি পরীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু গাঢ় জিনিষ বলে তিনি তা বাতিল করেছিলেন। ক্লোরোফর্মের চেতনানাশক গুণের কথা তিনি তাঁর শ্বশুর বাড়ী লিভারপুলের ওয়ালডি নামক এক কেমিষ্টের কাছে জানতে পারেন। ক্লোরোফর্ম আবিষ্কৃত হয় ১৮৩১ সালে। জার্মেনীতে লিবিগ, প্যারীতে সুবেরাঁ, আমেরিকায় সামুয়েল গুথরী একই সময়ে ক্লোরোফর্ম আবিষ্কার করেন। ইথারের মত ক্লোরোফর্মও তাড়াতাড়ি উবে যায়। শুঁকলে প্রথমে নেশা হয় এবং পরে চেতনা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ক্লোরোফর্মের এই গুণ জানা সত্ত্বেও এবং তা আবিষ্কারের ষোল বছর পরেও কেউ তা অস্ত্রোপচারে প্রয়োগ করেন নি। তাই মনে হয়, দীর্ঘদিন নানা রকম দ্রব্য নিয়ে পরীক্ষায় বিফল হয়ে সিমসন সে রাতে ক্লোরোফর্মের চেতনানাশক গুণাগুণ ভাল ভাবে আবার পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে মনস্থির করলেন, কিন্তু ক্লোরোফর্মের শিশিটিকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুজির পর শেষ পর্যন্ত সেটিকে যখন তাঁর কাজের ঘরে ফেলনা কাগজপত্রের স্তূপের নীচে পাওয়া গেল, তখন তিনি তাঁর বন্ধু ডাঃ কিথ ও ডাঃ ম্যাথিউ ডানকানকে নিয়ে খাবার টেবিলে বসলেন। তিনটি গ্লাসে শিশি থেকে ক্লোরোফর্ম ঢালা হলো। সবার আগে শুঁকলেন ডাঃ কিথ। শুঁকে বললেন—বাঃ! বেশ মিষ্টি গন্ধ—খুব ভাল লাগছে—বেশ নেশা হচ্ছে। তাই শুনে সিমসন ও ডাঃ ডানকানও শোঁকা সুরু করলেন। তাঁদেরও বেশ ভাল লাগলো—মনে বেশ স্ফূর্তি এলো—রক্তে মাদকতা জাগলো আর তাঁদের কথাবার্তা ও আলোচনায় বেশ চমৎকারিত্ব ফুটে উঠতে লাগলো। ঠাট্টা-কৌতুকে তাঁরা সবাই মেতে ওঠলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল—তাঁদের হাস্য-কৌতুক, আনন্দ-কোলাহলে বাড়ীটা যেন উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর পরেই অবস্থা দাঁড়ালো অন্যরূপ। তাঁদের

চোখের সামনে পরস্পরের মুখ, বাতি, চেয়ার, টেবিল সবই দুলতে লাগলো—তাঁরা নিজেরাও মাতালের মত টলতে লাগলেন—চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো এবং তাঁরা তিন জনেই মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। মিসেস সিম্‌সন প্রথম দিকে এই ঘরের ভিতরেই ছিলেন—এঁদের কাণ্ড-কারখানাও তিনি বেশ উপভোগ করছিলেন, বিশেষ করে ডাঃ কিথ যখন মেঝেতে শুয়ে হাত-পা ছুড়ছিলেন—কিন্তু যখন তিনি হাঁটু ও হাতের উপর ভর দিয়ে টেবিলের সমান সমান উঁচু হয়ে দৃষ্টিহীন দুই চোখ বিস্ফারিত করে তাঁর দিকে তাকালেন, তখন তিনি ভয় পেয়ে অন্যত্র পালিয়ে গেলেন। যাহোক, সিম্‌সন কিন্তু সকলের আগেই প্রকৃতিস্থ হলেন এবং কৌতুকের সঙ্গে দুই বন্ধুর মাৎলামি লক্ষ্য করতে লাগলেন। এসময়ে সর্বপ্রথম তাঁর মনে যে কথাটি খেলে গেল, সেটি হলো এই যে, চেতনানাশক দ্রব্য হিসাবে ক্লোরোফর্ম ইথারের চেয়ে অনেক ভাল। কিছুক্ষণের মধ্যে ডাঃ কিথ ও ডাঃ ডানকানও সুস্থ হলেন এবং তাঁরাও বললেন—ক্লোরোফর্ম ইথারের চেয়ে ভাল। এঁদের কথা শুনে সিম্‌সনের ভাইঝি—মিস পেটি যেন সাহস পেলেন এবং তাঁর উপরেও পরীক্ষা চালাবার জন্যে সিম্‌সনকে অনুরোধ করলেন। সিম্‌সন তাঁকেও কিছুটা ক্লোরোফর্ম শুঁকতে দিলেন। শোঁকবার কিছুক্ষণ পর মিস পেটি আনন্দে অধীর হয়ে বলে উঠলেন—আমি স্বর্গপরী গো—আমি স্বর্গপরী। একথা বলবার পরেই তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

যে সুষ্ঠু চেতনানাশক বস্তুর সন্ধানে সিম্‌সন এতদিন ব্যাপৃত ছিলেন, ক্লোরোফর্ম যে সেই বাঞ্ছিত বস্তু, তা সে রাতের এমনি কৌতুকপূর্ণ ঘটনাবলীর সূত্রে তিনি উপলব্ধি করলেন এবং অবিলম্বে শল্যচিকিৎসা ও প্রসূতিদের প্রসবের সময় তিনি তা প্রয়োগ করতে ব্রতী হলেন। প্রথম শোঁকবার পর মাত্র এগারো দিনের মধ্যেই তিনি পঞ্চাশটি রোগীর উপর সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করে এর উপযোগিতা ও যাথার্থ্য প্রমাণ করলেন। দু-বছরের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, একমাত্র এডিনবরাতেই চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার রোগীর উপর ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করা হয়েছিল।

ক্লোরোফর্ম চেতনানাশক দ্রব্য হিসাবে এর পর এতটা চালু হলো যে, রোগীকে অজ্ঞান করবার পদ্ধতিটিকে লোকে নাম দিল 'ক্লোরোফর্ম করা'। অবশ্য শেষের দিকে এই প্রথায় কোন কোন ক্ষেত্রে বিপত্তি দেখা দিল—এমন কি, কয়েক জন মারাও গেল। তাই সিম্‌সন আবার ক্লোরোফর্মের চেয়ে আরও ফলপ্রদ ওষুধের সন্ধান করতে লাগলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বহু চেষ্টা—এমন কি, এরূপ পরীক্ষায় নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি তেমন কিছু আর আবিষ্কার করতে পারেন নি।

তথাপি সিম্‌সন এককালে ক্লোরোফর্মের প্রবর্তন করে শল্যচিকিৎসার যে দ্রুত উন্নতি সাধন করেছিলেন—প্রসূতির প্রসব-বেদনা লাঘবের দুর্নিবার চেষ্টা চালিয়েছিলেন—মানুষের কুসংস্কার ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সাহসী যোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সে জন্যে মানুষ শ্রদ্ধাভরে চিরকাল তাঁকে স্মরণ করবে। আজ যদিও সংজ্ঞালোপ করবার কাজে আর ক্লোরোফর্ম ব্যবহৃত হয় না—অধুনা আবিষ্কৃত অনেক কার্যকরী ওষুধ ক্লোরোফর্মের স্থান দখল করেছে, তথাপি ক্ষেত্রবিশেষে ক্লোরোফর্ম ও ইথারের এক বিশেষ মিশ্রণ আজও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাছাড়া সিম্‌সনের বড় কৃতিত্ব বোধ করি এইখানেই যে, যে কোন চেতনানাশক দ্রব্যের সাহায্যেই রোগীকে অজ্ঞান করা হোক না কেন, আজও রোগীকে বলতে শোনা যায় যে, তাকে ক্লোরোফর্ম করা হয়েছে। তাই শল্যচিকিৎসায় ক্লোরোফর্ম—তথা সিম্‌সনের নাম হয়তো বা কোন কালে মুছে যাবার নয়।

বিদেশে পরিভ্রমণ ও কৃষির উন্নতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

দেশ স্বাধীনতা লাভ করবার পর হইতে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কত ভি. আই. পি, কত উচ্চ পদস্থ, কত মধ্য পদস্থ কর্মচারী (রাম, শ্যাম, হরি—আর বলিলাম না) কত উন্নত দেশের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য কত উন্নত দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং ইহার জন্য 'সাধারণ তহবিল' হইতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় বা অপব্যয় হইয়াছে, তাহার সঠিক হিসাব কেহ কখনও দিতে পারিবেন কিনা, জানি না। এই সমুদয় পরিভ্রমণ বা পর্যটনের উদ্দেশ্য ছিল, উন্নত দেশগুলির উন্নত প্রণালীসমূহ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেশের উপযোগী উন্নত প্রণালীসমূহ দেশে প্রবর্তন করা। উদ্দেশ্য মহৎ, সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা কত দূর কার্যে পরিণত করা হইয়াছে, তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় এবং খরচের তুলনায় উহা সমানুপাতিক হইয়াছে কিনা, তাহাও নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অন্য রাষ্ট্রের কথা জানি না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কথা, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের কথা কতকটা জানি। এই সকল বিদেশ পরিভ্রমণের মধ্যে জাপানও নিশ্চয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল; এমন কি, পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ও জাপান পর্যটনে গিয়াছিলেন। যত দূর মনে আছে তিনি জাপান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এক ভাষণে জাপানের কৃষি-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, সেখানকার উন্নত কৃষি-পদ্ধতি পশ্চিমবঙ্গে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রবর্তন করিবার প্রয়াস করিবেন। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে কতটা সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন, জানি না। দুই বৎসর পূর্বে আমার গ্রামের (হুগলী জেলার আঁটপুর) বার্ষিক পল্লীমঙ্গল প্রদর্শনীর উদ্বোধনী ভাষণে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জাপানের কৃষি-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, জাপানের কৃষি-পদ্ধতি আমাদের দেশে অনুসৃত হইতেছে না কেন।

জাপানের অবস্থা বা পরিবেশ আমাদের দেশের অবস্থা বা পরিবেশের প্রায় সমান, কেবল সেখানে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের হার খুব বেশী—প্রায় শতকরা ১০০ জন শিক্ষিত। সেখানে মোট জমির শতকরা ১৬ ভাগ জমি কৃষি কার্যের উপযোগী। সেখানে অনেক প্রকারের মাটি আছে, কিন্তু সকল প্রকার মাটি সমান উর্বর নয়। গড়পড়তা এক এক জন কৃষকের আড়াই একর জমি আছে। অথচ সেখানে শস্যের ফলন পৃথিবীর সকল দেশের শস্যের ফলন অপেক্ষা বেশী। সেখানে এই পরিমাণ জমি হইতে শতকরা ৮০ ভাগ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়, অবশিষ্ট ২০ ভাগ বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। ইহার মূলে আছে প্রধানতঃ শিক্ষা (Literacy) এবং নিবিড় বা ঘন (Intensive) চাষ প্রণালী। জাপানে একই জমিতে বৎসরে দুই বার ধানের চাষ হয়। ইহা ছাড়া ঐ জমিতে মূলা, বেগুন, কুমড়া প্রভৃতি ৩/৪ রকমের সব্জী উৎপাদিত হয়। প্রধানতঃ জলসেচনের দ্বারাই বৎসরে একই জমিতে দুইবার ধানের চাষ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কর্ষণোপযোগী প্রত্যেক

ইঞ্চি পরিমাণ জমিতে ছোট ছোট বাগান আছে। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর চারিধারে সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জমিতে বাগান রচনা করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীর শোভা ও সৌন্দর্য বর্ধন করিতে প্রয়াসী হন। একজন পর্যটক ইহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, সমস্ত দেশটাই যেন খুঁটিনাটি বিষয়েও যত্নে গঠিত। The whole Country looks manicured.

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশের অনেক রথী-মহারথী—এমন কি, মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত জাপান এবং কৃষি বিষয়ে উন্নত বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরিবর্তে আমরা কি ফল লাভ করিয়াছি? এমন কোন বিস্তীর্ণ জমি দেখিতে পাইয়াছি কি, যেখানে চিরাচরিত কৃষি-পদ্ধতির পরিবর্তে উন্নত কৃষি-পদ্ধতির প্রবর্তন হইয়াছে? হয়তো এখানে-সেখানে এলোমেলো-ভাবে উন্নত কৃষি-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা চোখে পড়ে না এবং তাহার দ্বারা দেশের খাদ্য-উৎপাদনও তেমন বৃদ্ধি পায় নাই।

আমরা সকলেই জানি, পল্লী অঞ্চলের শতকরা প্রায় ৯৯ জন গৃহস্থের গৃহের চারিদিকই ঝোপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া আছে এবং উহা নানা রকম ব্যাধির উৎপত্তি স্থল তো বটেই, পল্লী অঞ্চলের শ্রী, সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতি ঘটাইতেছে। কিন্তু কৃষি বিভাগের তেমন কোন কার্যকরী প্রচেষ্টা দেখিতে পাই না, যাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থ উৎসাহিত হইয়া গৃহের চারিধার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া উহাতে শাকসজীর বাগানের প্রবর্তন করেন। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, একটি প্ল্যান বা পরিকল্পনা অনুসারে ৬½ কাঠা জমিতে শাকসজীর বাগান রচনা করিলে প্রত্যেক দিন অন্ততঃ দুই সের টাট্কা শাকসজী পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ছয়জন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি-বিশিষ্ট একটি পরিবারের পক্ষে এই পরিমাণ শাকসজী অর্থাৎ দুই সেরই যথেষ্ট। ইহা ছাড়া উক্ত ৬½ কাঠা জমির আশেপাশে গোটা কতক কলাগাছ, পেঁপেগাছ, লেবুগাছ ইত্যাদি রোপণ করা যাইতে পারে। অথচ প্রতি বৎসর কৃষি বিভাগ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া শাকসজীর বীজ, চারা ইত্যাদি বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। শুনিতে পাই, ইহার জন্য নগদ অর্থও দেওয়া হয়। কিন্তু ইহার পশ্চাতে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নাই; দায়সারা হিসাবে এই কাজ চলিতেছে। যদি দেখিতাম জাপানের অনুকরণে এই সহজসাধ্য পরিকল্পনাটি অর্থাৎ প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর সংলগ্ন জঙ্গলাকীর্ণ পতিত জমিতে শাকসজীর বাগান প্রবর্তন করিবার জন্য কার্যকরী প্রয়াস হইতেছে, তাহা হইলেও বুঝিতে পারিতাম যে, জাপান পরিভ্রমণের ফলে অন্ততঃ একটা সহজসাধ্য পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। সেই জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রায়ই বলিতেন, বিদেশে যাওয়ায় দেশের যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" যায়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বার বার বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশের কৃষকেরা লিখিতে পড়িতে জানেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা নির্বোধ নহেন। কেহ যদি প্রকৃত দরদীর মত তাঁহাদিগকে তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে সহজসাধ্য উন্নত কৃষি-প্রণালী হাতে কলমে দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা (কৃষকেরা) উহা সহজেই গ্রহণ করিবেন। আচার্যদেবের এই উক্তি বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু দেশে এইরূপ প্রকৃত দরদীর একান্ত অভাব। বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন প্রচার কার্যের ফলে কৃষক সম্প্রদায় আরও বেশী বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। কোন্ দল তাঁহাদের প্রকৃত দরদী, কোন্ দল নয়,—ইহা তাঁহাদের (কৃষক সম্প্রদায়ের) পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। তাঁহারা দিশাহারা অবস্থায় পড়িয়াছেন। কৃষিকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখিতে হইবে, এই সহজ

কথাটা কেহই বুঝিতেছেন না। বক্তৃতা, ভাষণ বা স্লোগানের দ্বারা কৃষির উন্নতি হইবে না। কৃষকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। কৃষির উন্নতি কল্পে তাঁহার চাহিদাকে অগ্রাধিকার তো দিতেই হইবে, তাঁহার চাহিদাও সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে হইবে। চাষের সকল প্রকার উপকরণ (Inputs) সরবরাহ করিতে হইবে।

আমাদের দেশের কৃষক নিরক্ষর হইলেও যে নির্বোধ বা অবুঝ নহেন, তাহার একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি। আলুর চাষের ব্যাপক প্রচলন কাহার দ্বারা সাধিত হইল? ইহার জন্য রাষ্ট্রের বা অন্য কাহারও প্রচার কার্যের প্রয়োজন হয় নাই। আলুকে এখনও লোকে বিলাতী আলু বলেন, ইহা আমাদের পূজাপার্বণে ব্যবহৃত হয় না। আলুর চাষকে আমাদের কৃষকেরা নিজেরাই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে এইরূপ অনেক রকমের উন্নত শ্রেণীর শস্য তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। উহাদের উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ করিতে চাহি না। স্থূল কথা, কৃষকদিগের আয়ত্তের মধ্যে উন্নত কৃষি-পদ্ধতি বা উন্নত শস্য প্রবর্তন করিতে হইবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথায় বলি—দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া বিদেশ হইতে আমদানী করা কৃষি-পদ্ধতি এই দেশে প্রচলন করিবার চেষ্টা যে কেবল অর্থের অপব্যয় তাহা নহে, ইহাকে বাতুলতাও বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ জাপানী প্রথায় ধানের চাষ এদেশে প্রবর্তন করিবার কথা বলিতে পারি। রাণাঘাট সরকারী কৃষিক্ষেত্রে কত বর্ষব্যাপী অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া ইহার পরীক্ষা চলিল; পরিশেষে উহা নিষ্ফল হইল—ছাড়িয়া দিতে হইল। এই অজস্র অর্থব্যয়ের জন্য দায়ী কে?

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছি, জাপানের কৃষির উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ সাক্ষরতা (Literacy)। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষক সম্প্রদায়ের সন্তানগণের নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য এখনও তেমন কোন প্রবল অভিযান সুরু করা হয় নাই। এই কথা সত্য যে, বর্তমানে কৃষক-সন্তানগণ অধিকতর সংখ্যায় স্থানীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন, কিন্তু অধ্যয়নের শেষে তাঁহারা তাঁহাদের অগ্রজদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া নিজেদের কৃষিকার্যে নিযুক্ত করিতেছেন না; হয় তাঁহারা স্ব স্ব গ্রাম ত্যাগ করিয়া বিদেশে তথাকথিত সম্মানজনক কাজে নিজেদের নিযুক্ত করিয়াছেন, না হয় তাঁহারা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতেছেন। সুতরাং এমন একটি সুষ্ঠু সুপরিচালিত পরিকল্পনার প্রয়োজন, যাহাতে কৃষক-সন্তানগণ স্ব স্ব গ্রামে অবস্থান করিয়া গ্রামীন পরিবেশের মধ্যেই উন্নত কৃষি-শিক্ষা অর্জন করিতে পারেন এবং এই শিক্ষা অর্জনের শেষে স্ব স্ব গ্রামেই অবস্থান করিয়া নিজেদের ক্ষেত-খামারে অর্জিত উন্নত কৃষি-শিক্ষা প্রয়োগ করিয়া স্থানীয় কৃষির উন্নতি সাধন করিতে পারেন। আর একটি আসল কথা হইতেছে এই যে, যতদিন শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কৃষি ও কৃষককে সম্মানজনক স্থান না দিবেন, ততদিন স্কুল ও কলেজে পড়া শিক্ষিত কৃষক-সন্তানগণ কৃষিকে একটি সম্মানজনক পেশা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। তাঁহারা শিক্ষিত হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সহিত একই স্তরে একই আসনে বসিবার জন্য প্রয়াসী ও যত্নবান হইবেন। বর্তমানে ইহাই ঘটিতেছে এবং কৃষি যে তিমিরে ছিল, এখনও প্রায় সেই তিমিরেই আছে।

সাবান প্রসঙ্গ

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

বাজারে কত রকমের সাবান রয়েছে—কাপড়-কাচা ও গায়ে-মাখা। কোনটার রং হলদে, কোনটা গোলাপী আভাযুক্ত, কোনটা সবুজ, আবার কোনটা ধবধবে সাদা। সুগন্ধযুক্ত সাবানের মধ্যে কোনটা চন্দনের সুবাসে ভরপুর, কোনটা জুঁই, কোনটা গোলাপ বা অন্য কোন রকম কৃত্রিম গন্ধযুক্ত। সচরাচর সাবান কঠিন (বার বা কেক) আকারে বিক্রয় হয়। তবে আঠালো এবং জলের মত তরল সাবানও আছে। আবার কঠিন আকারের গুঁড়া সাবান, চিলতা সাবান সুজির দানার মত এবং পুঁতির আকারে বড় দানার মত সাবান পাওয়া দুষ্কর নয়। এই তো গেল সাবানের আকৃতির কথা।

গায়ে-মাখা সাবানও অনেক রকমের আছে। এর মধ্যে আছে শিশুদের কোমল ত্বকের উপযোগী বেবী সোপ; খর ও লবণাক্ত সমুদ্র জলের উপযোগী বিশেষ ধরণের সাবান (যাকে চলতি কথায় বলা হয় গ্লিসারিন সাবান), জীবাণুনাশক (যেমন Tar soap) আয়োডিন সাবান, কার্বলিক সাবান, মারকারি সাবান, পারঅক্সাইড সাবান, অতি আধুনিক কালের হেক্সাক্লোরোফিন বা অন্যান্য জীবাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থযুক্ত (যেমন—ফরম্যালডিহাইড যুক্ত) সাবান, অতিমাত্রায় স্নেহ পদার্থ সমন্বিত সুপারফ্যাটেড সাবান, জান্তব সাবান, ভাসমান সাবান, ছাপ্কা দাগবিশিষ্ট মটল্ড সাবান ইত্যাদি। তালিকাটি এখানেই শেষ নয়, আরও আছে ভিটামিন এফ সাবান, ট্যানারী সাবান, পশমের জন্যে সাবান, মোটর গাড়ীর জন্যে অটোমোবাইল সাবান, ক্ষৌরকর্মের উপযোগী সাবান, স্যাডেল সাবান এবং আরও কত কি।

কিন্তু এভাবে সাবানের শ্রেণী বিভাগ করতে গেলে তা বিজ্ঞানসম্মত হবে না। বিজ্ঞানীরা তাই সব রকম সাবানের সঠিক সংজ্ঞা ও মান বেঁধে দিয়েছেন।

সাবানের সংজ্ঞা

সাধারণ সংজ্ঞা অনুসারে সাবান হলো উচ্চতর পর্যায়ের অ্যালিফ্যাটিক কার্বোক্সিলিক অম্লের সোডিয়াম ও পটাশিয়াম লবণ। সর্বনিম্ন কার্বোক্সিলিক অম্লে অন্ততঃ ৪টি কার্বন পরমাণু সন্নিবিষ্ট থাকবে। সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত অথবা হাইড্রোক্সি গ্রুপ সমন্বিত সব রকম মেদজ অম্ল এই পর্যায়ভুক্ত। এই জাতীয় মেদজ অম্লগুলির অ্যামোনিয়াম লবণকেও সাবানই আখ্যা দিতে হবে। ভারী ধাতুগুলির লবণও সাবান আখ্যা লাভ করে থাকে, তবে সেগুলি দিয়ে ধৌতকার্য চলে না—এদের ব্যবহার হয় বিশেষ বিশেষ ধরণের কাজ ও শিল্পে। তাছাড়া সাবান সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে কোলিক ও ডেসোক্সিকোলিক অম্লের অ্যালকালি লবণ, ন্যাপথিন কার্বোক্সিলিক অম্লের লবণ, সাইক্লো অ্যালিফ্যাটিক, কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের লবণ, ন্যাপথিন সাবান, অ্যারোমেটিক কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের লবণগুলি ও রেজিনেট (Resinate) সাবানের উপাদানগুলিকে।

বিশুদ্ধ যে কোন এক-একটি মেদজ অম্লের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে রসায়ন-বিজ্ঞানীর কাছে। সাধারণের কাছে শিল্পজ সাবানরূপে পরিচিত

জিনিষটি তো আর একটি মাত্র লবণ নয়, কয়েকটি লবণের একত্র সমাবেশ। বিষয়টি প্রাঞ্জল হওয়া প্রয়োজন। পটাশিয়াম ষ্টিয়ারেট, পটাশিয়াম ওলিয়েট, পটাশিয়াম লিনোলিয়েট, সোডিয়াম ষ্টিয়ারেট ইত্যাদি হলো মেদজ অম্লগুলির লবণ এবং পৃথক পৃথকভাবে এরাও সাবান। বাজারে যে বার বা কেক সাবান পাওয়া যায়, তা হলো পূর্বোক্ত লবণগুলির মিশ্রণ, উপরন্তু রয়েছে অন্যান্য জিনিষ। কাপড়-কাচা সাবানে আর্দ্রতা থাকে প্রায় ৩০%, তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে সিলিকেট, খড়ির গুঁড়া, সোপষ্টোন ইত্যাদি জাতীয় Filler বা Builder ও সামান্য মাত্রায় রং এবং গন্ধ। গায়ে-মাখা সাবানে আর্দ্রতা থাকে ৮-১০%, সময়ে সময়ে কোন কোন Superfatting agent, যেমন—ল্যানোলিন অথবা জিলেটিন, অ্যাগার-অ্যাগার, গঁদ, কেজিন, শ্বেতসার, চিনি এবং অপরাপর কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি।

উপরে যে সব সাবানের কথা বলা হলো, সেগুলি অজৈব ক্ষার সহযোগে তৈরি। জৈব ক্ষার ব্যবহার করলেও সাবান পাওয়া যাবে; যেমন—ট্রাইইথানল অ্যামিন। এই জৈব ক্ষার জাতীয় দ্রব্যটির দ্বারাও তেল ও চর্বির সংস্পর্শে সাবান উৎপন্ন হবে। ফিনাইল—ন্যাপথাইল মিথেন-অর্থো-কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের হাইড্রো কম্পাউণ্ডের লবণগুলির সাবানের মত ধর্ম রয়েছে—জলে তাদের দ্রাব্যতা, সান্দ্রতা, পৃষ্ঠটান ও অবদ্রবীভবন শক্তি বিষয়ে। তবে এই শ্রেণীর সাবানের প্রয়োগ ক্ষেত্রও সীমিত।

এপর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তাথেকে সার কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, তেল ও চর্বি ক্ষারের সঙ্গে রাসায়নিক সংমিশ্রণে সাবান তৈরি করবে। তেল ও চর্বির ব্যবহার কমিয়ে এনে কৃত্রিম উপায়ে সাবান তৈরির জন্যেও চেষ্টা চলেছে। উন্নত দেশগুলিতে এই ধরণের খবর প্রায়ই প্রকাশিত হয়। রাশিয়ায় বিশুদ্ধ পেট্রোলিয়ামকে বাতাসের সাহায্যে অক্সিডাইজ করে সংশ্লেষিত মেদজ অম্ল তৈরির খবর এসেছে—যদিও এর সাহায্যে সাবান তৈরি করতে কোন কারণে একটু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া হাইড্রোকার্বন থেকে সাবান তৈরির খবরও পাওয়া গেছে। তবে এই ভাবে সাবানের অধিক উৎপাদন এখনও সম্ভব হয় নি—এক রকম খর পরীক্ষাগারেই এটা সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আশা করা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে এই বিষয়টিও উৎকর্ষ লাভ করবে। চর্বির উৎপাদন কখনো কখনো হ্রাস পেতে পারে—এই চিন্তা করেই বিজ্ঞানী এই ব্যাপারে ব্রতী হয়েছেন সফলতা-বিফলতার দোটানার মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় মহাসমরের সময়ে একবার জার্মেনীতে এমনই চর্বির সঙ্কট দেখা দেয় যে, ধৌতাগারে খরচ হয়ে যাওয়া সাবানজল সংগ্রহ করে পাঠানো হতো চর্বি উৎপাদনের কারখানায়। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—অব্যবহৃত সাবানটুকু জল থেকে উদ্ধার করা।

ভারতের মত দেশে খাদ্যের একান্ত অভাব। সেখানে বাদাম তেল, নারকেল তেল, তিল তেল ইত্যাদি থেকে সাবান তৈরি করতে দেওয়া চলে না। এককালে অবশ্য প্রচুর মাত্রায় এগুলি ব্যবহৃত হতো। তবে দিন দিন খাদ্য হিসাবে এদের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভোজ্য তেল থেকে সাবান তৈরির বিষয়ে উৎসাহ দান করা হচ্ছে।

এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাঃ সদ্গোপাল লিখ-ছেন—কয়েক দশক আগে ভারত ভোজ্যরূপে ব্যবহৃত তৈলবীজের রপ্তানী করবার মত উদ্বৃত্তের জন্যে গর্ব করতে পারতো।

দেশ বিভাজনজনিত অধিবাসীদের চাপের প্রভাবে তৈলবীজের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারে নি। ভোজ্য বা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত

তেলের মূল্যও অত্যধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোন নিয়ন্ত্রণ এযাবৎ বলবৎ করা হয় নি।

কেউ কি আশা করতে পারে যে, উপবাসী লোকেরা দেহশুদ্ধির জন্যে সাবান কিনে মাখবে?

অভোজ্য তৈলসমূহ, যাদের ভুলক্রমে নগণ্য তৈল আখ্যা দেওয়া হয়, তাদের ঠিকমত ব্যবহারের দ্বারা এর প্রতিবিধান করা সম্ভব। Rice bran (চালের তেল), Tobacco seed (তামাক-বীজের তেল), Niger seed, Karonja (করঞ্জা), নিম ইত্যাদির পর্যাপ্ত ভাণ্ডার দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রয়েছে; তবে এগুলি সংগ্রহের ব্যাপারে মুখ্য অসুবিধা এই যে, বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদনের অভাব। দ্বিতীয়তঃ, যা উৎপন্ন হয়, তার কোন নির্দিষ্ট মান বরাবর বজায় থাকে না।

মেদজ অম্লগুলিও কষ্টিক সোডা বা পটাশ বা কার্বনেটের সংস্পর্শে সাবান উৎপাদন করে থাকে। সুতরাং তৈল বা চর্বি থেকে সাবান তৈরি অপেক্ষা মেদজ অম্ল থেকে সাবান তৈরি অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা। প্রক্রিয়াটি সবিরাম ও অবিরাম পদ্ধতিতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে। এই পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়ক হয়—(১) প্রবাহ মিটার, (২) অনুপাত অনুযায়ী পাম্প, (৩) উৎপন্ন সাবানের সান্দ্রতা অথবা (৪) pH।

সাবানের কার্যকারিতা

আগেকার দিনে ধরে নেওয়া হতো যে, জলের সংস্পর্শে সাবান থেকে Hydrolysis-এর দ্বারা উদ্ভূত ক্ষারই পরিষ্করণ শক্তিটি এনে দেয়। ইদানীং গবেষণায় জানা গেছে যে, পরিষ্কারের কাজটা পৃষ্ঠটান, উপরে উপরে শোষণ (Adsorption) এবং ঐ জাতীয় কয়েকটি ভৌত বলের পারস্পরিক ক্রিয়াজনিত—এইভাবে সংক্ষেপে অভিমত প্রকাশ করেছেন বিখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী T. P. Hilditch।

জলের পৃষ্ঠটান কমাতে যে সাবান যত পারবে, ততই সেই সাবানের দ্রবণের পরিমাপ দেবে। ০·১ গ্র্যাম (১০০ সি. সি.) সোডিয়াম সাবানগুলির পৃষ্ঠটান নিম্নরূপ:—

সাবানের নাম	পৃষ্ঠটান
	পৃষ্ঠটান (ডাইন্‌/সেণ্টিমিটার)
বিউটাইরেট	৬৪·৬৬
ক্যাপ্রোয়েট	৬১·১৫
ক্যাপ্রাইলেট	৬০·০৩
ক্যাপরেট	৪৯ ৩০
লরেট	৪৩·২৭
মিরিষ্টেট	২৬·৬১
পামিটেট	৫৭·৫৫
স্টিয়ারেট	৬১·৩৫
ওলিয়েট	৩৫·০১
লিনোলিয়েট	৩৯·৪৫
রিশিনোলিয়েট	৪৮ ৭৩

সাধারণ সিক্তকরণের মাপকাঠি হিসাবে যদি পৃষ্ঠটানের পরিমাপকে গণ্য করা হয়, তাহলে দেখা যাবে (Saturated-এর ভিতর) মিরিষ্টেট এবং (Unsaturated-এর ভিতর) ওলিয়েট সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। বিজ্ঞানী আরো জটিল সাবানের পৃষ্ঠটান পরিমাপ করে চলেছেন, যেমন—২, ১০, ১২ হাইড্রক্সি-স্টিয়ারেট ইত্যাদি।

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বাতাসের প্রতি সাবানের পৃষ্ঠটান, কাপড়ের প্রতি আন্তস্তলীয় শক্তি, সমস্ত জমা ধূলিবালির প্রতি আন্তস্তলীয় শক্তি এবং ফেনার স্থায়িত্বের উপর সাবানের পরিষ্কার করবার কাজটি নির্ভর করে।

খরজলের সংস্পর্শে সাবান

কেমন করে ও কিভাবে সাবানের ক্ষয়-ক্ষতি খরজলে হয়ে থাকে, তার একটা হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল। ১ লিটার জলে ১° খরতার জন্যে প্রায়

১২ গ্র্যাম ভাল Curd সাবান নষ্ট হয়; ১ লিটার জলের খরতা যদি ১০° হয়, তবে সাবানের অপচয় দাঁড়ায় ১'২ কে. জি। আর ১ লিটার জলের খরতা ২০° হলে ২'৪ কে. জি, (৫ পাউণ্ডের কিছু বেশী) সাবান বৃথা নষ্ট হয়।

বিজ্ঞানীরা জলের খরতার একটা মাপকাঠিও ঠিক করে ফেলেছেন, যথা—

০—৪°	মোট খরতা	খুব মৃদু
৪—৮°	„ „	মৃদু
৮—১২°	„	কিছুটা খর
১২—১৮°	„ „	মাঝামাঝি খর
১৮—৩০°	„ „	খর
৩০° উর্ধ্বে	„	খুব খর

অনেক সময়ে কাপড়-কাচা সাবান উৎপাদন কালে মৃদুতা আনয়নকারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি মিশ্রিত করা হয়। যেমন ধরা যাক, সোডিয়াম সিলিকেট। এই ধরণের জিনিষ সাবানকে আরো ক্ষারাত্মক করে তোলে। এমনিতেই সাধারণ কাপড়-কাচা সাবান পশম ও রেশম ধোয়ার কাজের অনুপযোগী—তারপর সিলিকেটের মত ক্ষারধর্মী জিনিষ সাবানে মিশ্রিত থাকলে তা এসব ব্যাপারে হয়ে ওঠে আরো অনুপযুক্ত। তারপর আরো কথা রয়েছে—বাহ্যতঃ ভিজা বা আর্দ্র না দেখালেও সাবানের ভিতর অনেক ক্ষেত্রেই এরা যথেষ্ট মাত্রায় জল ধরে রাখবার ব্যাপারে সহায়ক হয়। ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাত্রায় জলযুক্ত ভেজাল সাবান তৈরিতে সহায়ক হয়ে থাকে।

ক্ষার অথবা অম্লাত্মক ধর্মবিহীন (অর্থাৎ এক কথায় প্রায় Neutral) সাবান ঈষদুষ্ণ (গরম নয়) জলে ব্যবহারের ফলে পশম ও রেশমের রং বিকৃত হয় না—পশম, রেয়ন ও অন্যান্য কৃত্রিম সূতা এতে ঠিক অবস্থায় থাকে। মারাত্মক দ্রব্যসমন্বিত (যাদের বলা হয় Builder) সাবান ব্যবহারে পূর্বোক্ত ধরণের সূতা রুক্ষ হয়। কীট ও পশুজাত সূতা (বা দিয়ে রেশমী ও পশমী তন্তু তৈরি হয়) স্বভাবতঃই অম্লধর্মী। এক কথায় পশম, রেশম ও কৃত্রিম বস্ত্রাদির রঞ্জক দ্রব্যগুলি সচরাচর অম্লাত্মক। সাবানের মধ্যস্থিত ক্ষার এই অম্লের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে সূতার জোর কমিয়ে আনে এবং রংও ফিকে হয়ে আসে।

সুতরাং তত্ত্বগতভাবে পশম ও রেশমের পক্ষে ক্ষার বিঘ্নকারী—সেই কারণে Neutral সাবান ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যথার্থ ক্ষারবর্জিত সাবান তৈরি কি সম্ভব? এই বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে।

জলে দ্রবীভূত হলে সাবান সর্বদাই ক্ষারধর্মী (ফেনোল্পথালিনের রং গোলাপী করে ফেলে) হয়ে ওঠে। সুতরাং তাকে কড়া কথায় ক্ষারবর্জিত সাবান আখ্যা দেওয়া যায় না। তথাকথিত ক্ষারবর্জিত সাবানও জলে ফেনোল্পথালিনের রং গোলাপী করে দিয়ে থাকে। ক্ষারমুক্ত সাবানের একটা সংজ্ঞা এই যে, এই সব সাবানের অ্যালকোহলে দ্রবণ ক্ষারভাব প্রকাশ করে না (অর্থাৎ ফেনোল্পথালিনের রং বদল করে না)। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে, যে সব জিনিষ সোডিয়াম, পটাশিয়াম অথবা লিথিয়াম (এক কথায় Alkali metal) সমন্বিত, তারা কখনই ক্ষারমুক্ত পদবাচ্য নয়। তাঁর মতে, ক্ষারমুক্ত সাবান তাকেই বলা হবে, যখন তা হবে মৃদু জৈব ক্ষারের দ্বারা প্রস্তুত।

গায়ে-মাখা সাবান যতটা সম্ভব ক্ষারমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিশুদের কোমল ত্বকের দরুণ তাদের উপযোগী সাবান শতকরা ৫ ভাগ ল্যানোলিন বিশিষ্ট (বা পশমজাত মোম) হয়ে থাকে। আবার জলে সাবানের দ্রবণ ক্ষারাত্মক হয় বলে শিশুদের উপযোগী সাবানের ভিতর অনেক ক্ষেত্রে টার্কি রেড অয়েল (বা সালফোনেটেড রেড়ির তেল) মিশিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

শেষোক্ত জিনিষ মৃদু অম্লধর্মী হওয়ায় সুফল পাওয়া যায়। সাবানের দ্রবণজাত ক্ষার ও শেষোক্ত দ্রব্যটির অম্ল—এই দুটির মিলিত প্রভাব কোমল ত্বকের উপর কোন অপক্রিয়া হতে দেয় না।

এটা সুবিদিত যে, পাতিত ও রাসায়নিক মতে, খাঁটি জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১ ও স্ফুটনাঙ্ক ১০০° সেন্টিগ্রেড। সমুদ্র-জলের বৈশিষ্ট্য কি? বিশ্লেষণের ফলে জানা যায় যে, সমুদ্র-জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০২ থেকে ১·০৩, স্ফুটনাঙ্ক ১০৩° সেন্টিগ্রেড এবং গলনাঙ্ক—২·৫ সেন্টিগ্রেড। সমুদ্র-জলে লবণ ও লবণজাতীয় উপাদানের দরুণ এই রকম হয়ে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সমুদ্র-জলে শতকরা দ্রবীভূত লবণ হলো ৩·৫ ভাগ এবং এই লবণের উপাদান হলো নিম্নোক্তরূপ :—

সোডিয়াম ক্লোরাইড	৭৭—৮০%
ম্যাগ্‌নেশিয়াম	১০—১১%
ম্যাগ্‌নেশিয়াম সাল্‌ফেট	৪—৫%
জিপসাম অথবা সোডিয়াম সালফেট	২—২·৫%

সমুদ্র-জলের সাবান

লবণযুক্ত জলে সাধারণ সাবান অদ্রব অবস্থায় রয়ে যায় এবং অধঃক্ষেপের সৃষ্টি করে, একথা আগেই বলা হয়েছে। সমুদ্রের জলে ব্যবহার্য সাবানের আদর্শ হবে এই যে, সেগুলি লবণের অবস্থিতি হেতু পরিষ্কার করা অথবা ফেনা উৎপাদনের পক্ষে যেন কোন রকম বাধার সৃষ্টি না করে।

গো-চর্বি বা তজ্জাতীয় চর্বি থেকে উৎপন্ন হলে সে সাবান সমুদ্র-জলে সফেন দ্রবণ ঘটানো থেকে বিরত থাকে। নারকেল ও পাম্‌-কারনেল শ্রেণীর তৈলজাত সাবান ব্যবহারে এরূপ জলে বেশ কতকটা ফেনার উদ্ভব হয়। আর রজনজাত সাবানে এরকম জলের সংস্পর্শে এদের চেয়ে কিছুটা কমই ফেনা হয়। বস্তুতঃ সমুদ্রের লবণাক্ত জলে ব্যবহারের উপযোগী সাবান মুখ্যতঃ নারকেল ও পাম-কারনেল তেলের সাবান। অনেক সময়েই খরজলের গায়ে-মাখা সাবান তৈরিতে অতিরিক্ত মাত্রায় নারকেল তেল থাকে। ফেনার দিকে নজর রাখতে গিয়েই এই তেল বেশী ব্যবহার করতে হয়। এই ধরণের সাবান অবশ্য কারো কারো ত্বকে প্রদাহ এনে থাকে।

সাবান তৈরির নির্ধারিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মধ্যে সবচেয়ে সহজ ও প্রাচীন পদ্ধতি হলো Cold process। সাবান তৈরির সময়ে কোন রকম গরম দেবার প্রয়োজন হয় না বলে পদ্ধতিটির নামকরণ এইরূপ হয়েছে। এতে তেল ও ক্ষারের সংমিশ্রণে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তারই সহায়তায় সাবানের উদ্ভব হয়ে থাকে। সাধারণতঃ নারকেল তেল থেকে এই ভাবে সাবান তৈরি হয়; অর্থাৎ এতে কোন কিছু গরম করার প্রয়োজন নেই। আর সামুদ্রিক সাবান এক কালে এই ভাবেই তৈরি হতো বা এখনও হয়ে থাকে। এই রকমের সাবানের ভিতর শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ নারকেল তেল রয়ে যায় মুক্ত অবস্থায় (Free fat)। এই ১৫ ভাগ নারকেল তেলকে সাবানে পরিণত না করে শুধুই সাবানের ভিতর থাকতে দেওয়া হয়। এর কারণ এই যে, পুরামাত্রায় নারকেল তেলকে সাবানে পরিবর্তিত করলে উৎপন্ন সাবানটি হয় ভঙ্গুর ও অতিরিক্ত শক্ত। তার ফলে তাতে নামধাম ছাপা যায় না। চর্মের প্রদাহ নিবারণের জন্যে অনেক সময় নারকেল তেলের সঙ্গে রেড়ির তেল এবং রজন কিছুমাত্রায় দেবার বিধি রয়েছে।

আজকাল 'খরজলের সাবান'—এই নামের আওতায় অবশ্য পদ্ধতিকৃত সাবান বিক্রয় হয়। সাধারণ জ্ঞান থেকে অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর যে কোন দেশে স্থানীয় জলের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে সাবান ও অন্য পরিষ্কারক দ্রব্যের চাহিদা। সমীক্ষার দ্বারাও এটা সমর্থিত

হয়েছে। স্বভাবতঃই যেখানকার জল খর, সেখানকার অধিবাসীরা বাধ্য হয়ে Cold process-এ তৈরি নারকেল তেলের সাবান গায়ে মাখে। এক সময়ে যে কোকো-ক্যাস্টিল সাবানের প্রচলন ছিল, তার উদ্দেশ্য ক্রেতাকে প্রবঞ্চিত করবার জন্যে নয়। জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া হতো এমনই এক গায়ে-মাখা সাদা সাবান, যা অবাধে খরজলে ফেনার সৃষ্টি করতে সক্ষম। জলপাই তেলের সাবান (যাকে সচরাচর বলা হয় Castile সাবান) যে জলে ফেনা উৎপাদনে হার স্বীকার করতো, সেখানে পূর্বোক্ত শ্রেণীর সাবান হয়ে উঠতো প্রচুর মাত্রায় সফেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এক সময়ে অংশতঃ সাবান ও বিন্দুমাত্রায় সোডা অ্যাসের মিশ্রণ খরজলের মৃদুতা আনয়নের জন্যে পরিষ্কারক হিসাবে প্রচলিত ছিল। যথেচ্ছ খরজলকে দমনে রাখা হতো এইভাবে। সোজাসুজি ট্রাইসোডিয়াম ফস্‌ফেট পরিষ্কারক দ্রব্যগুলি সকল উদ্দেশ্যসাধক হিসেবেই বাজারে ছাড়া হয়েছিল। এরা খরজলীয় অঞ্চলে চাহিদা মেটাতে অর্থাৎ অদ্রব ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম সাবানের গন্ধ যাতে না জমে, সে জন্যে তাদের প্রচলন ছিল। ইদানীং পদ্ধতিকৃত গো-চর্বি ও নারকেল তেল মিশ্রণের সাবান খরজলে ব্যবহারের জন্যে উৎপাদন ও বিপণন করা হয়। এই ধরণের সাবানের সুবিধা এই যে, এরা Cold process-জাত শুধু নারকেল তেলের সাবানের মত ত্বকে কর্কশ ভাব আনে না।

বাজারে শ্রমিকদের জন্যে যে সাবান বিক্রয় হয়, তার নাম Grit অথবা Mechanic's hand soap। কারখানার শ্রমিকদের হাতে ঝুলকালি তুলতে এগুলি সহায়ক। এগুলি পিউমিস বা মিহি বালি মিশ্রিত হয় এবং বার ও চটচটে আঠালো অবস্থায় পাওয়া যায়। এই ধরণের বার সাবানের ভিতর জলীয় অংশ থাকে নিতান্তই নগণ্য—সুতরাং ক্রেতার পক্ষে লাভজনক। লেখবার কালির দাগ, কালো ও গ্রীজযুক্ত ময়লা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাফ করতে এগুলি অদ্বিতীয়।

চর্মশিল্পের সাবান

চর্মশিল্পে ব্যবহারের জন্যে সাবান সোডা অথবা পটাশ দিয়ে তৈরি হতে পারে। তবে সাধারণতঃ আঠালো সাবানের প্রচলনই বেশী। কারণ এদের মধ্যস্থিত তেল বা চর্বির মেদজ অম্লগুলির কঠিন হয়ে যাবার তাপ স্বভাবতঃই হয় কম। এই তাপকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় Titre। যে সব তেল বা চর্বির Titre বেশী, তারা এই ধরণের সাবান তৈরির কাজে লাগে না, কারণ কষ লাগানো চামড়ার তারা কালক্রমে শুকিয়ে গিয়ে সাদা ছিট ছিট দাগের সৃষ্টি করে।

বয়নশিল্পে সাবান

বয়নশিল্পে পদ্ধতিকরণ, সিক্তকরণ, বিক্ষিপ্তকরণ, ফেনার উৎপাদন ও পরিষ্করণ ক্ষমতায় সাবানের গুণাবলী সর্বাগ্রে বিচার্য। অপর পক্ষে এই ব্যাপারে কিছু বাঁধাধরা অসুবিধাও আছে—খরজলে যে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম সাবানের উদ্ভব, বয়নশিল্পে এতে যে শুধুমাত্র সাবানের অপচয় হয় তা নয়, কাপড়ের উপর ছিট্ ছিট্ দাগ পড়ে যায়। কখনো কখনো পদ্ধতিকরণের সময়ে এরূপ দাগ না দেখা গেলেও জলে ধোয়ার সময় অতর্কিতে দাগ ধরা পড়ে, অর্থাৎ দাগের বিভ্রাট ঘটে থাকে অজ্ঞাতসারে। আর ক্যাল-সিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কেন—লোহা, তামা, ক্রোমিয়াম, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি শ্রেণীর ধাতব সাবান জলে অদ্রব অবস্থায় থেকে বয়নশিল্পে বিঘ্ন ঘটায়। সাবান ব্যবহারের অন্য প্রধান অসুবিধা হলো এই যে, অম্লের সংস্পর্শে তা ভয়ানক বিফলতাপূর্ণ এবং লবণাক্ত ও ক্ষারাত্মক জলেও অদ্রব অবস্থায় রয়ে যায়। বয়নশিল্পে

পদ্ধতিকরণের সময় এই সব বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার হয়ে পড়ে। এই সব অসুবিধার প্রতিবিধানের জন্যে সোডিয়াম ফস্‌ফেট ইত্যাদির ব্যবহার রয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, কোন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে মাথাপিছু সাবান ব্যবহারের পরিমাণ নির্ভর করে সেখানকার জলের অবস্থার উপর। তুলনামূলক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, যেখানে খরজলের প্রাচুর্য সেখানে মাথাপিছু কাট্‌তি বছরে ৫০ পাউণ্ড, চলনসই খরজলীয় অঞ্চলে তা কমে এসে দাঁড়ায় ২৮ পাউণ্ডে। সুতরাং প্রকারান্তরে এটা সুস্পষ্ট যে, সাবানের কাট্‌তি জলের খরতার উপর একান্ত নির্ভরশীল।

যখন অধিবাসীদের মধ্যে খরজল সরবরাহ করা হয়, তখন সেই জলকে মৃদু করবার জন্যে যে সব যন্ত্রাদির প্রয়োজন ও তাতে যে অর্থব্যয় হয়, তার পরিমাণ কত? খরজলের দরুণ সাবানের অযথা অপচয় বাবদ সাবানের যে দাম পড়ে, পূর্বোক্ত খরচ তার সমান অথবা অধিকাংশ স্থলে বেশী। আর খরজল ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সাবানের অপচয়জনিত অভিযোগ অপেক্ষাকৃত কম। অধিকাংশ অভিযোগ কেন্দ্রীভূত হয় ধৌত বস্ত্রখণ্ডের উপর অদ্রব সাবানের গাদ জমা হওয়ায় কাপড়-চোপড়, পোষাক-পরিচ্ছদে কাল্‌চে নিষ্প্রভ ভাবের দরুণ। আরো বেশী অভিযোগ আসে যদি গায়ে-মাখা সাবান ব্যবহার কালে রীতিমত ফেনার উদ্ভব না হয়।

সাবান ও pH

পরীক্ষায় জানা গেছে যে, pH যখন আটের বেশী, তখন সাবান সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যায়। pH মান নির্ভরশীল সাবানের সংযুতি ও অন্যান্য কারণের উপর। সয়াবীন বা গৌরি কলাইয়ের মেদজ অম্লের সোডিয়াম সাবানের ২০° সেন্টি. ০.২৫% দ্রবণের pH পরিলক্ষিত হয় ৯.২। নারকেল তেল মেদজ অম্লাদির সোডিয়াম সাবানে এই অঙ্কটি হলো ৯.৬। ঘরের তাপে সাধারণ গো-চর্বি সাবানের ০.১% দ্রবণের pH হলো ১০.০। গায়ে-মাখা সাবানের হাল্কা দ্রবণে pH ৯.৮-১০.৪ হয়ে থাকে। pH ৯.৩-৯.৬ হলে এরকমের সাবানে ফেনা ভাল হয়। ত্বকের অম্লত্বই নিম্ন ক্ষারত্বের সূচক।

সাবান যে শুধু খরজল ও অম্লের সংস্পর্শে তার পরিষ্কারের কৃতিত্ব হারায়, তা নয়। কাঁচা পশমে চুন ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম লবণাদি (যা অশোধিত অবস্থায় পশমের উপর থেকে যেতে পারে) সাবানের ক্ষতিসাধন করে। খরজলে ক্ষয়ের জন্যে সাবানের যে অপচয় হয়, তা যেমন নগণ্য নয়, অশোধিত পশমের বেলায়ও সেই রকম। রজন-জাত সাবান হলে এসব ক্ষেত্রে তা দোষাবহ—পশম থেকে রজনের সাবান পরিপূর্ণরূপে ধুয়ে ফেলা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। জলপাইয়ের তেলের সাবান এসব ক্ষেত্রে বিশেষরূপে ফলপ্রদ।

কাঁচা সিল্কের সূতায় শিরিষের মত বাইরের আস্তরণ থাকে, যাকে বলা হয় Sericin। এই Sericin-এর আস্তরণ বিলোপ সাধনার্থে (যে পদ্ধতিকে বলা হয় Degumming) জলপাই তেলের সাবান সমভাবে কার্যকরী।

রিঠা

প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে রেশমী ও পশমী জিনিষ কাচবার জন্যে রিঠার (Soapnut, Soaproot) প্রচলন আছে। এই গাছগুলি ৪০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ে পাওয়া যায়। বাংলা, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা, বোম্বাই, দক্ষিণ ভারতে এই জাতীয় ফলের গাছ জন্মে। এই সব ফলের জলে দ্রবণযোগ্য মূল উপাদানকে বলা হয় Saponin। এটা শতকরা ৩২ ভাগ থাকে রিঠার মধ্যে।

জলে ০'০৫% স্যাপোনিন দ্রবণের অবদ্রবীভবনও ফেনা সৃষ্টিকারী ক্ষমতা Curd সাবানের ০'১২৫ ভাগের সমতুল্য। সাবানের দ্রবণের চেয়ে এর সিক্তকরণ ক্ষমতা কম। সাবান ও স্যাপোনিনের মিশ্রণের ফেনাদায়ক ক্ষমতা যথেষ্ট মাত্রায় কম। Ostwald photometer-এ এর পরিষ্করণ ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়েছে। পাতিত জলে স্যাপোনিনের পরিষ্কার করবার শক্তি বেশী। স্যাপোনিনের ০'০২০% দ্রবণে সোডা অ্যাস যুক্ত করলে পরিষ্কার করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ০'০৫% দ্রবণে তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। স্যাপোনিনের ০'০৭৫% দ্রবণের চেয়ে ০'০৫% দ্রবণের ধৌতকরণ ক্ষমতা বেশী। ব্যবসায়গত ক্বাথ অপেক্ষা খাঁটি স্যাপোনিন আরো বেশী পরিষ্করণ ক্ষমতাযুক্ত। সাবানের তুলনায় রঞ্জিত বস্ত্রখণ্ডের ক্ষতিসাধন কমই করে থাকে স্যাপোনিন। খরজলে সিল্ক ও রেয়নের প্রভা বজায় রাখতে স্যাপোনিন অদ্বিতীয়। এই জিনিষটা পশমী কাপড়-চোপড়ের সংকোচন হতে দেয় না।

নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যাদি

সাবানের প্রায়োগিক অসুবিধা দূর করবার জন্তেই নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যাদির সূচনা। বিশেষজ্ঞ প্রবীণ অধ্যাপক T. P. Hilditch-এর মতে—নিঃসন্দেহে সালফেট ও সালফোনেট শ্রেণীর পরিষ্কারক দ্রব্যসমূহের অধিকাংশের প্রয়োজনীয় গুণাবলী রয়েছে, যা সাধারণ সাবানের নেই। যুক্তিসঙ্গতভাবে ক্যালশিয়াম ও ম্যাগ্‌নেশিয়াম লবণের দ্রবণ তারা ঘটিয়ে থাকে। মৃদু অম্লাত্মক দ্রবণে কতকগুলি কার্যকরী এবং অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল। এদের কতকগুলির খর্তব্য মাত্রায় সিক্তকরণ, বিক্ষিপ্তকরণ অথবা অন্যান্ত গুণাবলী রয়েছে। অপর পক্ষে, যথার্থ ধৌতকরণের ক্ষমতায় সাধারণ সাবান এই নতুন দ্রব্যগুলির চেয়ে উৎকৃষ্ট।

ওলিয়েট ধরণের সাবানসমূহে এমনিই একটা জিনিষ থাকে (যাকে বলা হয় Body), যা অতিমাত্রায় ময়লা জিনিষকে পরিষ্কারে সক্ষম।

নিম্নে কয়েকটি নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের (Fatty alcohol sulphates) ক্যালসিয়াম লবণের দ্রবণের হার দেওয়া গেল (বলা বাহুল্য, এই সব ক্যালসিয়াম লবণের সৃষ্টি হয় খরজল ব্যবহারের ফলে)—

	কার্বন পরমাণুর সংখ্যা	দ্রবণীয়তা (গ্রাম, প্রতি ১০০০ সিসি)
ক্যালসিয়াম অক্টাইল সালফেট	৮	৪০-এর বেশী
„ ডেকাইল „	১০	২৫—৩০
„ লরিল „	১২	৩০০—৪০০
„ মিরিষ্টিল „	১৪	৩০—৪০
„ সিটাইল „	১৬	৫-এর কম
„ ষ্টিয়ারিল „	১৮	৫-এর কম

আসলে কিন্তু দ্রবণগুলি প্রকৃত নয়, Colloidal Sols-এর দরুণ। তবে এদের ফেলে রেখে দিলে থিতিয়ে যায় না। Fatty alcohol sulphate-সমূহের মূল্য সাবানের চেয়ে বেশী, তবে সাবানের চেয়ে এদের ব্যবহার কম করতে হয়—প্রায় সাবানের এক-ষষ্ঠাংশ। পরিষ্করণ ক্ষমতা হিসাবে সাদা কাপড়-চোপড় ময়লা হলে তা সাফ করতে এগুলি সবিশেষ কার্যকরী নয়—নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলির ক্ষারত্বের নিতান্ত অভাবের দরুণ এরকম হয়ে থাকে।

নিঃসাবান স্যাম্পুগুলির দাম সাবানের চেয়ে এত বেশী যে, খরজলে তাদের গুণাধিক্য থাকলেও মূল্য বাবদ সৌন্দর্যবিলাসীদের পক্ষে দাম দিয়ে ব্যয় সঙ্কুলান করতে পারা সম্ভব হয় না।

ধাতব সাবান

ম্যাগ্‌নেশিয়াম, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যালু-

মিনিয়াম, দস্তা, ক্যালসিয়াম, ষ্ট্রনসিয়াম, বেরিয়াম ইত্যাদি সচরাচর ভারী যাবতীয় ধাতুর মেদজ অম্লের লবণকে ধাতব আখ্যা দেওয়া হয়। এগুলি জলে অদ্রব অবস্থায় থাকে এবং এদের প্রয়োগ ক্ষেত্র সাধারণ সাবানের মত পরিষ্কার করবার কাজে নয়, তার চেয়েও ব্যাপক। জলনিরোধক আস্তরণ, ছাপার কালি, প্রসাধন ও অন্যান্য কোন না কোন শিল্পে আজকাল এদের ব্যবহার দেখা যায়?

মেদজ অম্লগুলি আজকাল পৃথক পৃথকভাবে এবং অত্যন্ত খাঁটি অবস্থায় প্রস্তুত হচ্ছে। আগেকার দিনে নিছক খাঁটি কোন মেদজ অম্ল পাওয়া যেত না—সচরাচর এদের মোটামুটি মিশ্রণই পাওয়া যেত। ফলে মেদজ অম্লের মিশ্রণজাত ধাতব সাবানের কোন নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা সম্ভব হতো না।

ইদানীং শতকরা ৯০ ভাগ বা তদূর্ধ্ব বিশুদ্ধ মেদজ অম্ল পাওয়া যাচ্ছে। লণ্ডনের Universal Oil Company Ltd.-এর বিজ্ঞাপনে জানা যায় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত পদার্থের শোধিত মেদজ অম্ল উৎপাদন করে থাকেন—

ক্যাপরাইলিক অম্ল	৯০%
ক্যাপরিক অম্ল	৯০%
লরিক অম্ল	৯০-৯৮%
মিরিষ্টিক অম্ল	৯০%
ইরিউসিক অম্ল	৮৫-৯০%
বিহিনিক অম্ল	৮৫-৯০%

এই রকম পরিশোধিত মেদজ অম্লজাত ধাতব সাবান স্বভাবতঃই হয়ে থাকে নির্দিষ্ট মানের। এগুলি এখন দানাদার পর্যায়ের বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী, (তত্ত্বগত হিসাব অনুযায়ী) এই রকমের বিশুদ্ধ লবণগুলির রাসায়নিক সংযুতি যা থাকা উচিত, তাথেকে বাণিজ্যিক পণ্যটির সংযুতির বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। সাধারণ কাপড়কাচা ও গায়েমাখা সাবানের মতই ষ্টিয়ারিক, পামিটিক, ওলিক, লরিক ও ন্যাপথিনিক জাতীয় মেদজ অম্লসমূহ ধাতব সাবান প্রস্তুতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। কখনো কখনো রেজিনেট, লিনোলিয়েট ইত্যাদি শ্রেণীর রজন ও মেদজ অম্ল থেকেও ধাতব সাবান তৈরি করা হয়, যা মুদ্রণ শিল্পের কালি ও তেল রং বা পেন্ট তৈরিতে লাগে।

সাধারণতঃ অধঃক্ষেপণ ও ফিউসন পদ্ধতির দ্বারা ধাতব সাবান তৈরি হয়। তবে ভেষজ দ্রব্যে ব্যবহারোপযোগী ধাতব সাবান প্রস্তুতিতে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। তখন Double decomposition পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। কারণ ঔষধার্থে প্রযুক্ত সাবান অবশ্যই খাঁটি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন নির্জলা দ্রাবক, যথা—তিসির তেল, টারপেন্টাইন, বেঞ্জিন, পেট্রোলিয়াম ইথার ইত্যাদিতে ধাতব সাবানগোষ্ঠীর দ্রাব্যতা যথেষ্ট মাত্রায় পৃথক হতে দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট অম্ল ও ধাতব অংশের (Radical) উপরেই দ্রাব্যতা নির্ভরশীল নয়, তৈরির পদ্ধতি, যেমন—অধঃক্ষেপণ অথবা ফিউসনের উপরেও অনেকাংশে নির্ভরশীল।

ধাতব সাবানগোষ্ঠীর বিভিন্ন দ্রাবকে আচরণ-বিধি কি রকম, দেখা যাক। গরম পেট্রোলিয়াম ইথারে লেডলিনোলিয়েট সহজেই দ্রবীভূত হলেও অবিলম্বে থিতিয়ে যায়। নিকেল সাবান কয়েক দিনের মধ্যেই তলায় জমে যায়। লৌহ ঘটিত (Ferrous) সাবান সহজেই দ্রবীভূত হয় বটে, তবে দ্রুত হারে (Oxidation-এর ফলে) ফেরিক পর্যায়ে নীত হয়। এই শেষোক্ত সাবান জলে অদ্রব অবস্থায় থাকে। স্থায়ী বিক্ষিপ্ত অবস্থার জন্যে প্রয়োজন হয় সংরক্ষণকারী Colloid-এর, যেমন—মৌমাছির মোম, ল্যানোলিয়াম ইত্যাদি।

ধাতব সাবান প্রস্তুত কালে আনুষঙ্গিক মেদজ অম্লেরই গুরুত্ব বেশী। এই ব্যাপারে

অম্লটি সামান্য ভিন্নধর্মী হলে সাবানের ধর্মও বদ্‌লে যায় সুস্পষ্টরূপে। উৎপাদন পদ্ধতির উপরও ধাতব সাবানের গুণাবলী নির্ভর করে। আর অম্লাংশ (Acid radical) মুখ্যতঃ নিরূপিত করে সাবানের গলনাঙ্ক। পক্ষান্তরে সাধারণ ভৌত গুণাবলী এবং ধাতব অংশ নিয়ন্ত্রণ করে সাবানটির রাসায়নিক বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য।

যে সব স্নেহজ অম্লে আয়োডিনের মাত্রা বেশী, তজ্জাত সাবান হয় গলন্ত ও মোমের মত। এই ধরণের প্রতীকস্থানীয় হলো ওলেইক ও লিনোলেইক অম্লগুলি। উচ্চ গলনাঙ্ক ও নিম্ন আয়োডিন অঙ্কবিশিষ্ট হলে প্রস্তুত সাবানটি হবে স্থায়িত্বসম্পন্ন, দানাদার এবং পরিপাটিরূপে প্রকট ও তার গলনাঙ্ক হবে একেবারে সঠিক। তবে ব্যতিক্রম দেখা যায় ন্যাপথিনিক অম্লের সাবানে। নিম্ন আয়োডিন অঙ্ক হওয়া সত্ত্বেও এর সাবান হয় গলন্ত শ্রেণীর। অপর পক্ষে রেজিনেট ও টুঙ্গেট্‌স্ (রজন ও Tung অম্ল থেকে প্রাপ্ত) অধঃক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে যায়।

সোডিয়াম ন্যাপথিনেট গ্রীজের মত জিনিষ, যার রয়েছে অসুন্দর বদ্রবীভবন ও ফেনা উৎপাদনের ক্ষমতা। এর একটা ধর্মের (যাকে বলা হয় Gelation) বিশুষ্ক ধৌতকরণে সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্যান্য সোডিয়াম লবণের মতই এটা জলে দ্রবীভূত হয়, তবে খুব অল্প মাত্রায় (Hydrolysis-এর দ্বারা) বিভক্ত হয়ে পড়ে।

বিশুষ্ক ধৌতকরণ (Dry cleaning)

শিল্ক ও পশমী পোষাকাদির পক্ষে বিশুষ্ক ধৌতকরণ প্রযোজ্য ও প্রশস্ত। কারণ এভাবে ধোয়ার ফলে তাদের চাকচিক্য নষ্ট হয় না। বলা বাহুল্য, সাধারণ সাবান-জলে উল্টা ফল পাওয়াই সম্ভব।

নির্জলা ধৌতাগারে পেট্রোলিয়াম ন্যাপথা দ্রাবকরূপে ব্যবহৃত হয়। এর অন্যান্য অনেকগুলি বাণিজ্যিক নামও রয়েছে। পেট্রোলিয়াম ন্যাপথা এসব ক্ষেত্রে পরিষ্কারক দ্রব্য নয়, তৈলাক্ত গ্রীজ ও আনুষঙ্গিক যৌগসমূহের দ্রাবক। এই তৈলাক্ত পদার্থগুলিই পোষাক-পরিচ্ছদের দৃঢ়ভাবে লেগে-থাকা ময়লা আট্‌কে ধরে রাখে। ন্যাপথা তৈলাক্ত ময়লাকে উপর উপর দ্রবীভূত করে ধূলিকণাকে (যেগুলি সূতার ভিতর বহুদূর পর্যন্ত গেঁথে বসে নেই) মুক্ত করে দেয়। ন্যাপথা হলো দ্রাবক, সাবান হলো পরিষ্কারক। ন্যাপথায় সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও অ্যামোনিয়াম সাবান দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু ট্রাইথানল অ্যামিন সাবান হয়। অতিরিক্ত মুক্ত মেদজ অম্ল (যা সাবানে অনেক সময়েই থাকে) জৈব দ্রাবকে সাবানকে বিক্ষিপ্ত করতে সহায়ক হয়। ধৌতকার্যের শেষে এই দ্রাবক পুনরায় সংগ্রহ করা হয়—সাধারণ সাবান-জলের মত ফেলে দেওয়া হয় না। এই রকমের সাবানে প্রকৃত সাবানের অংশ ১০-৫০%, ১০-২০% মুক্ত মেদজ অম্ল, বাকীটা জল ও দ্রাবক। জলের পরিমাণ সচরাচর ১০%-এর কম থাকে এবং কখনও কখনও ১৫% হতে দেখা যায়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পশমে স্বাভাবিক আর্দ্রতার পরিমাণ শতকরা ১৮-৩০ ভাগ এবং শিল্কে ১০-৩০ ভাগ (যদিও সচরাচর পশম ও রেশমের স্বাভাবিক আর্দ্রতা যথাক্রমে শতকরা ১৮ ও ১০ ভাগ মাত্র)।

পেট্রোলিয়াম ন্যাপথা ছাড়া অন্যান্য ব্যবহৃত দ্রাবক হলো বেঞ্জিন, অ্যালকোহল, ইথাইল অ্যাসিটেট, আইসোপ্রোপাইল, অ্যালকোহল ও অপরাপর ক্লোরিনযুক্ত দ্রাবক; যেমন—কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, ইথিলিন ডাইক্লোরাইড ইত্যাদি। বিশুষ্ক ধৌতকার্যের উপযোগী সাবান তৈরি একরূপ দুরূহ ব্যাপার—কারণ এরকমের ধৌতাগারে ধূলাবালির রকমও যেমন বিচিত্র হয়ে থাকে, পোষাকাদির ধরণও সেই রকম।

সাধারণ সোডিয়াম সাবান যখন জলে দ্রবীভূত করা হয়, তখনি এর দু-রকম আয়ন হয়—এক সোডিয়াম ও অপরটি ষ্টিয়ারেট। তবে প্রকৃতপক্ষে এই আয়নের ব্যাপারটি শুধু অণু ভাঙ্গনেই সীমিত নয়। কারণ আধুনিক তত্ত্বের মতে জটিল আয়নের উদ্ভব হয়। তবে এটা ধরে নেওয়া যায় যে, এসব ক্ষেত্রে মেদজ অংশ (Radical) ঋণাত্মক।

বিপরীত-ধর্মী সাবান

বিজ্ঞানী তাই উপযুক্ত সাবান (যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় Anion active) থেকে বিপরীত-ধর্মী সাবানের প্রবর্তন করলেন। এরা অম্লাত্মক মাধ্যমে ক্রিয়াশীল থাকে, এই টুকুই বৈশিষ্ট্য। অতি আধুনিক কালে Reverse বা Cation active সাবানের পর্যায়ে পড়ে কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়ম যৌগসমূহ। তবে এরা নিঃসাবান পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় এদের বিষয় বিস্তৃত আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেল। এদের কয়েকটি মাত্র চমকপ্রদ প্রয়োগের কথা উল্লেখ করা হলো।

একদা এক জার্মান প্রতিষ্ঠান রেয়নের চাকচিক্য কম করতে Reverse সাবানের ধর্মের আশ্রয় নেন। এই প্রক্রিয়ায় জিঙ্ক অক্সাইড এবং সালফেটেড ফ্যাটি অ্যালকোহলের আঠালো মণ্ড তৈরি করা হয়। এখন সালফেটেড ফ্যাটি অ্যালকোহলগুলি Anion active শ্রেণীভুক্ত।

$$C_{16}H_{33}—SO_4Na \rightarrow Na^+ + SO_4— C_{16}H_{33}^-$$
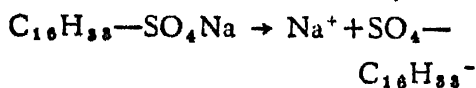
একটি সোডিয়াম সাবানের কথা ধরা যাক—সোডিয়াম ষ্টিয়ারেট। এটি যখন আয়নে বিভক্ত হয়, তখন Cation হলো সোডিয়াম এবং ষ্টিয়ারেট হলো Anion। প্রকৃতপক্ষে Ionisation প্রক্রিয়াটি শুধু অণুর উক্তরূপ ভাঙ্গনেই সীমিত নয়, আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী জটিল আয়নসমূহের উদ্ভব হয়ে থাকে। তবে এটা ধরে নেওয়া এখনো হয়ে থাকে যে, Fatty radical বা অংশটি ঋণাত্মক আয়ন হয়ে থাকে।

এই রকম সিটাইল পিরিডিনিয়াম ক্লোরাইড সিক্তকরণের ব্যাপারে আদর্শস্থানীয়; কিন্তু এটা Cationic। দ্রবণে এর আয়নে বিভাজন নিম্নোক্তরূপ—

Cation $C_{16}H_{33}—(CH_3)_3N^+$
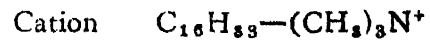
তলকর্মণ্য নিয়ামক
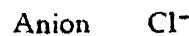
Anion Cl^-

এই ধরণের অর্থাৎ Reverse সাবানের এক বিশেষ প্রয়োগ ক্ষেত্র হলো সুতীবস্ত্রের উপর রবারের প্রলেপ। রবার ল্যাটেক্সের কণাগুলির তড়িৎ সচরাচর ঋণাত্মক; কিন্তু অত্যধিক মাত্রায় Cationic বা Reverse সাবানের সংস্পর্শে কণাগুলি বিপরীত-ধর্মী অর্থাৎ ধনাত্মক তড়িদ্বাহী হয়ে পড়ে। পশম বা অন্য সুতীবস্ত্র সোডিয়াম কার্বনেটের হাল্কা দ্রবণে প্রথমে ডুবিয়ে রাখা হয় তন্তুজালের উপর ঋণাত্মক তড়িৎ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। তারপর বিপরীত-ধর্মী ল্যাটেক্সে নিমজ্জিত করা হয়। রবারের কণাগুলি বস্ত্রখণ্ডে খুব সুষ্ঠুভাবে আটকে যায় এবং পরিশেষে যে জলীয় অংশটুকু অবশিষ্ট থাকে, তা সম্পূর্ণরূপে রবারমুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর রবারের ভাল্ক্যানিজেশন করা হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, Cation active সাবানগুলি সাধারণ সাবানের সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী। উভয়েই নির্দিষ্ট ব্যবস্থাধীনে ময়লা পরিষ্কার করে থাকে, তবে যদি উভয়ের দ্রবণ মিশ্রিত হয়, তাহলে তারা পরস্পরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। যদি সমান অনুপাতে মিশ্রিত হয়, তবে ফেনা না হয়ে অধঃক্ষেপের সৃষ্টি অনিবার্য। আর দ্রবীভূত মিশ্রণের ভিতর যদি Anionic ও Cationic সাবান অসম মাত্রায় বর্তমান থাকে অর্থাৎ একটি অপরটির চেয়ে পরিমাণে বেশী থাকে,

তবে মিশ্রণটি অতিরিক্ত মাত্রায় অবস্থিত আয়নের ধর্ম সমন্বিত হয়। এই হিসাবে এদের Reverse সাবান নামটি সার্থক।

উপর্যুক্ত স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টির সমর্থনে একটি পরীক্ষার উল্লেখ করা গেল। যদি সাধারণ (বা Anionic) সাবানের ক্ষারযুক্ত দ্রবণের ভিতর ধূলাবালি ভাসমান অবস্থায় থাকে, আর ঐ প্রকার দ্রবণে Cationic সাবান অত্যধিক মাত্রায় ঢালা যায়, তবে বস্ত্রতন্তুর উপর ধূলাবালি পরিষ্কার হওয়ার পরিবর্তে জমা হয়ে যাবে।

কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম যৌগগুলির (নিঃসন্দেহে যারা Cationic বা Reverse সাবান পর্যায়ভুক্ত) থাকে তলকর্মণ্য (Surface active) Cation। জটিল সালফোনিয়াম এবং ফস্‌ফোনিয়াম যৌগসমূহের বিষয় অনুশীলন করা হচ্ছে। স্যাপামিনগুলিও এই Reverse সাবানের পর্যায়ভুক্ত। অসম ডাই-ইথাইল ডাই-অ্যামিন-এর সঙ্গে ওলেইক অম্লের প্রতিক্রিয়াবশতঃ যে দ্রব্যটি পাওয়া যায়, তার ১ ভাগ নাকি ২,০০০,০০০ ভাগ জলে ফেনার সৃষ্টি করে। Reverse সাবানগুলি ঘাম ও জলের সংস্পর্শে পাকা রঞ্জন-কার্যের পরিপোষক।

সঞ্চয়ন

বিংশ শতকের স্ফিংক্‌স্

এম, বাগ্রেয়েভা এ-সম্বন্ধে লিখেছেন—পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক অস্ত্রোপচার কক্ষে বিজ্ঞানীদের কঠিন কর্ম-দিবস তখন শুরু হয়ে গেছে। সার্জনেরা নির্দেশ দিচ্ছেন—অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতির টুং টাং শব্দ হচ্ছে। উজ্জ্বল আলোর নীচে দুটি অস্ত্রোপচারের টেবিলে দুটি কুকুর শায়িত ছিল। একটি ফুস্‌ফুস দান করবে, অন্যটি সেই ফুস্‌ফুস গ্রহণ করবে।

দাতা কুকুরের টেবিলের চারদিক ঘিরে ছিলেন অধ্যাপক আই গেরাসিমেঙ্কো, এম. আভেরবাক, ডাঃ জি. লাৎসিস ও এ. আবিসোফ। কুকুরের বুকে ছুরি চালিয়ে ফুস্‌ফুস উন্মুক্ত করা হলো। লাৎসিস সযত্নে রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা থেকে এটিকে বিচ্ছিন্ন করলেন। সার্জন ফুস্‌ফুসটি কেটে বের করে নিজের হাতের তালুতে রাখলেন। মনে হচ্ছিল যেন ফুস্‌ফুসটিতে তখনও শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। একটা বিশেষ দ্রবণে পরিষ্কার করে ঠাণ্ডা করবার জন্যে ফুস্‌ফুসটিকে ৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রেখে দেওয়া হলো।

এবার অন্য কুকুরটির পালা। একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি। গ্রহীতা কুকুরের ফুস্‌ফুসটিও উন্মুক্ত করা হলো। ঠাণ্ডা কক্ষে রক্ষিত ফুস্‌ফুসটি গ্রহীতার বুকে সংযোজিত করা হলো তার নিজের ফুস্‌ফুসের বদলে। বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে নালী সেলাই করে দেওয়া এবং বিশেষ সুতার সাহায্যে গ্রহীতা কুকুরের নার্ভের সঙ্গে দাতার ফুস্‌ফুসকে যুক্ত করে দেবার প্রয়োজন ছিল।

মনে হলো, সব কাজ শেষ। রক্ত চলাচল বন্ধ করবার জন্যে যে আঁকরা এঁটে দেওয়া হয়েছিল, তা সরিয়ে নেওয়া হলো। এবার যেন এক ভোজবাজি ঘটে গেল। বিজাতীয় ফুস্‌ফুসটি গরম তাজা রক্তে পূর্ণ হয়ে গেল এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া শুরু হলো।

অস্ত্রোপচার শেষ হবার পর সংযোজিত ফুস্‌ফুসটি পর্যবেক্ষণাধীন রাখবার জন্যে একটি

যন্ত্র মুক্ত করে দেবার পর কুকুর দুটিকে কক্ষ থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো। অস্ত্রোপচারে পাঁচ ঘণ্টা সময় লেগেছে। অস্ত্রোপচারের কক্ষ থেকে আমরা বেরিয়ে এসে প্রধান ভবনে যাবার সময় জি. লাৎসিস একটি বড় কালো কুকুর নিয়ে আমাদের সঙ্গী হলেন।

এম. আভেরবাক বললেন, এই কুকুরটির নাম সিগান। এক বছর আগে এটির দেহে অন্য একটি ফুস্ফুস সংযোজন করা হয়েছে। নতুন ফুস্ফুসটি বেশ ভালভাবে জুড়ে গেছে এবং কুকুরটির স্বাস্থ্যও খুব ভাল আছে।

অঙ্গ-সংযোজনকে বলা হয় 'বিংশ শতকের স্ফিংক্স্'। বিভিন্ন দেশের বহু বিজ্ঞানী এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত রয়েছেন। দেহ যাতে সুস্থ বিজাতীয় অঙ্গ বাতিল করে না দিতে পারে, তাঁরা সে চেষ্টা করছেন। স্ফিংক্স্ এই সব সমস্যা সমাধানের হদিস দিচ্ছে ধীরে ধীরে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তাঁদের অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। হাড়, কোমলাস্থি ও কর্ণিয়া, এমন কি—হৃৎপিণ্ডও সংযোজন করা হচ্ছে।

গত তিন বছরে মস্কোর কেন্দ্রীয় যক্ষ্মা ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপক এন. গেরাসিমেঙ্কো ও এস. এ. এরবাখ-এর নেতৃত্বে একদল শারীরবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী, সার্জন মস্কোর দ্বিতীয় মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট ও কেন্দ্রীয় গবেষণা লেবরেটরীর বিজ্ঞান-কর্মীদের সহযোগিতায় ফুস্ফুস সংযোজনের সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন। অনেক অস্ত্রোপচার হয়েছে—অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি, সংযোজনের বিভিন্ন রূপ, দাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা ফুস্ফুসটি ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

অধ্যাপক গেরাসিমেঙ্কো বলেছেন যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর থেকে বাস্তব চিকিৎসার পর্যায়ে যাবার পথে আর কোন বাধা নেই। ৎসিগণের কেস-হিষ্ট্রীই এর প্রমাণ।

পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করবার উদ্যোগ

আমেরিকা পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করে পানীয় জলে পরিণত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে দেড়মাইল দূরবর্তী বলসা নামে একটি কৃত্রিম দ্বীপে এই কারখানাটি নির্মিত হবে। এটিই হবে সমগ্র পৃথিবীতে এই ধরণের বৃহত্তম কারখানা।

পৃথিবীর বহু স্থানে যথেষ্ট জলাভাব রয়েছে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে, তা নানা দেশের নানা স্থানের জলাভাব দূরীকরণে সহায়ক হবে।

এই দ্বীপ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হবে ১৯৬৮ সালে এবং এখানে পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যে দুটি কারখানা স্থাপিত হবে, তাতে—হুভার বাঁধ থেকে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যায়, তার চেয়েও বেশী বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে। এই কারখানা দুটি ১৯৭৩ ও ১৯৭৭ সাল নাগাদ চালু হবে।

এই কারখানায় পাতন বা ডিষ্টিলেশন পদ্ধতিতে পানীয় জল উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন একই সঙ্গে চলবে বলে সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করবার খরচ অনেক কম পড়বে। প্রতি হাজার গ্যালন পানীয় জল উৎপাদন করতে যেখানে ১ ডলার খরচ পড়ে, সেখানে খরচ পড়বে মাত্র ২১ সেণ্ট। কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নতি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্যেই খরচ কমানো সম্ভব হবে। বহুপর্যায়ী পাতনক্রিয়া বা

মালটিষ্টেজ ফ্লাশ ডিষ্টিলেশনের মাধ্যমে প্রতিদিন তিনটি বিরাটকায় বাষ্পীকরণ ব্যবস্থায় সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত করে ১৫০ কোটি গ্যালন লবণাক্ত জল শোধন করা হবে। এর দশ ভাগের নয় ভাগকে হিমায়িত এবং বাকী দশ ভাগের এক ভাগকে পরিস্রুত করা হবে। এই বহুপর্যায়ী পাতন-পদ্ধতি অনুসারে সমুদ্রের উত্তপ্ত জল একটি প্রকোষ্ঠে নিয়ে ঠাণ্ডা করা হবে। এই প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে অনুসৃত হবে এবং ক্রমেই চাপ ও তাপমাত্রা কমানো হবে। বলসা কারখানায় থাকবে ৫৩টি পর্যায়।

এতে পরমাণু থেকে তাপ উৎপাদনকারী দুটি রিয়্যাক্টর থাকবে। এই তাপশক্তির সাহায্যে সমুদ্রের জলকে উত্তপ্ত করে পাতনক্রিয়ার মাধ্যমে লবণমুক্ত করা হবে। ঐ কারখানায় এছাড়া বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের একটি টারবাইন জেনা-রেটারও থাকবে। এটি বাষ্পশক্তির সাহায্যে চালিত হবে।

সামুদ্রিক ঝড় অথবা ভূমিকম্প যাতে কোন রকম ক্ষতি করতে না পারে, সেভাবেই ১৬ হেক্টার জমির উপর এই দ্বীপটি নির্মিত হবে। এই সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সমীক্ষাদি সংক্রান্ত কাজকর্ম ইতিপূর্বেই সমাপ্ত হয়েছে।

শক্তি উৎপাদনের জন্যে আমরা যেমন কয়লা এবং তেল ব্যবহার করে থাকি, এখানেও তেমনি পরমাণুকে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করা হবে। এছাড়া এই প্রক্রিয়ায় বিভাজনযোগ্য উপাদান এত অল্প পরিমাণে রিয়্যাক্টরে কেন্দ্রীভূত করা হয় যে, পরমাণু-বোমার মত কোন রকম বিস্ফোরণ ঘটবার আশঙ্কা থাকবে না। তাছাড়া তেজ-ক্রিয়তা সম্পর্কেও কোন দুর্ভাবনার কারণ নেই। কারণ সমুদ্রের যে জল নিয়ে কারবার এবং কারখানা থেকে সমুদ্রের যে জল বেরিয়ে যাবে, তা ফিরে যাবে সমুদ্রেই। ঐ জল পারমাণবিক ইন্ধন এবং পারমাণবিক অন্যান্য উপাদানের সংস্পর্শেই আসবে না। এজন্যে সামুদ্রিক জীবজন্তুর প্রাণনাশের আশঙ্কারও কারণ থাকবে না।

কোন কোন বিজ্ঞানীর অভিমত এই যে, পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করবার এই পদ্ধতি বিশ্বের জলাভাব সমস্যা সমাধানে অনেকখানি সহায়ক হবে। তাঁরা বলেন, পারমাণবিক শক্তি সহজলভ্য। তাছাড়া পরমাণুকে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করলে তেল প্রভৃতি ইন্ধনের খরচ অনেক কমে যাবে। তেল এবং কয়লা পরমাণুর মত সহজলভ্য নয়। এজন্যে পারমাণবিক শক্তি আজ সমৃদ্ধির বিরাট সম্ভাবনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছে। প্রচুর লোকের প্রয়োজন এই শক্তির সাহায্যে মেটানো যাবে। কোন কোন দেশে অন্যান্য ইন্ধন প্রচুর পরিমাণে থাকলেও এই সহজলভ্য ইন্ধন ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া পারমাণবিক শক্তি-চালিত একটি কারখানা পরি-চালনার জন্যে খুব বেশী লোকজনেরও প্রয়োজন হয় না। ক্যালিফোর্নিয়ার এই কারখানাটিতে প্রতিদিন ১৫০ কোটি গ্যালন সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করা হবে। এই বিরাট কারখানা পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন হবে মাত্র ১২০ জন কর্মচারী। এরা পালাক্রমে দিনরাত্রি কাজ করবেন।

পৃথিবীর শিল্পোন্নত অঞ্চলে যেমন, তেমনি শুষ্ক, উষর ও অনুন্নত অঞ্চলেও বিদ্যুৎ-শক্তি এবং পানীয় জল উৎপাদনকারী পারমাণবিক শক্তি-চালিত এই ধরণের কারখানার চাহিদা ভবিষ্যতে ক্রমেই বেড়ে যাবে। পারমাণবিক শক্তি-চালিত কার-খানাসমূহ কৃষির সার উৎপাদন, জলসেচন এবং নানা ধরণের শিল্পোদ্যোগে বিশেষ সহায়ক হবে।

বারাণসীতে বিজ্ঞান কংগ্রেস

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দীর্ঘ ২১ বছর পরে পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে আবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের আসর বসেছিল ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে। ইতিপূর্বে ১৯২৫ এবং ১৯৪০ সালে বারাণসীতে আরও দু-বার বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল। কিন্তু সে দুটি অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ আমাদের অনেকেরই হয় নি। আমাদের কাছে বারাণসীতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান এই প্রথম।

প্রতি বছরের মত এবারও কলকাতা থেকে আমরা এক বিরাট প্রতিনিধি দল বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৫তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বারাণসীতে সমবেত হয়েছিলাম। এই প্রতিনিধিদলে একদিকে যেমন ছিলেন প্রবীণ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা, অপর দিকে তেমনি ছিলেন তরুণ বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-কর্মী ও গবেষক ছাত্র-ছাত্রীরা। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় দু-হাজার প্রতিনিধি এবারের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। বারাণসীতে ভাষা-আন্দোলন উপলক্ষে হাঙ্গামার আশঙ্কায় অন্যান্য বারের তুলনায় এবার প্রতিনিধির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হয়েছিল, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারত থেকে।

তেসরা জানুয়ারী সকাল সাড়ে দশটায় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপে এক মনোরম পরিবেশে বিদেশাগত বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর উপস্থিতিতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। বারাণসীতে প্রধান মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে একদল হিন্দীপ্রেমী ছাত্রের বিক্ষোভের আশঙ্কায় পূর্বাহ্ণেই ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। আমাদের প্রত্যেকের প্রতিনিধি-পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে তবে অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে যেতে দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঁচজন হিন্দী সমর্থক ছাত্র কোন উপায়ে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সদস্য-পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে মণ্ডপে উপস্থিত হয় এবং প্রধান মন্ত্রীর উদ্বোধনী ভাষণের সূচনাতেই কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শন ও শ্লোগান দেবার চেষ্টা করে। অবশ্য তা স্বল্পক্ষণের জন্যে। তারা 'ইন্দিরা গান্ধী ফিরে যাও' ধ্বনি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সাদা পোশাকে পুলিশ তাদের মণ্ডপের বাইরে নিয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার করে। এরপর আর গোলমাল হয় নি এবং শেষ অবধি শান্তিতেই সভার কাজ চলেছিল। অবশ্য হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে প্রধান প্রবেশ পথের কাছে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে কিছু সংঘর্ষ ঘটেছিল।

কিন্তু একদিক থেকে বলতে গেলে হিন্দী-প্রেমীদের আন্দোলন বিজ্ঞান কংগ্রেসের ক্ষেত্রে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ প্রধান মন্ত্রী থেকে সুরু করে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল গোপাল রেড্ডি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ অমরচাঁদ যোশী এবং বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি ডাঃ আত্মারাম সকলেই তাঁদের ভাষণ হিন্দী ভাষায় সূচনা করেন এবং শেষ দিকে কিছু অংশ ইংরেজিতে বলে শেষ করেন। প্রধান মন্ত্রী তো তাঁর প্রায় সমগ্র ভাষণই হিন্দীতে প্রদান করেন, শুধু বিদেশী বিজ্ঞানীদের সুবিধার জন্যে শেষের কিছু অংশ ইংরেজিতে বলেন। তাছাড়া

স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি প্রদত্ত পরিচয়পত্র থেকে সুরু করে যাবতীয় অনুষ্ঠানপত্র ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দীতে ছাপা হয়।

স্তোত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি উপাচার্য ডাঃ যোশী এবং রাজ্যপাল ডাঃ রেড্ডি বিদেশী বিজ্ঞানীদের ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী অধিবেশনের উদ্বোধন কালে তাঁর ভাষণে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রসারে বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে এক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলবার জন্যে বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন জানান। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য—পৃথিবীকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা, পারমাণবিক যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করা নয়। অতি উন্নত এবং অনগ্রসর দেশগুলির মধ্যে অসাম্যও ধ্বংসের কারণ হতে পারে। পৃথিবীতে ৭০ ভাগ দরিদ্র-দের সঙ্গে যদি অবশিষ্ট অবস্থাপন্ন মানুষের জীবনযাত্রার বৈষম্য সকল দেশের সহযোগিতায় দূর না হয়, তাহলে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

তিনি আরও বলেন, রাজনীতিক ক্ষেত্রে আকাঙ্খা বৃদ্ধির যে বিপ্লব ঘটেছে, সেই চিন্তাধারার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হবে। গত দুই দশক ধরে ভারত অনগ্রসরতা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। শুধুমাত্র জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে নয়, সমাজে যে কোটি কোটি মানুষ সবচেয়ে অবহেলিত রয়েছে, তাদের দিকেও আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। তবেই প্রাচীন ধারণা ও সংস্কারের বশবর্তী মানুষকে আমরা আধুনিক যুক্তিনিষ্ঠ জাতিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবো। পরিকল্পনায় বিজ্ঞানের ব্যবহার যেমন বেশী করতে হবে, তেমনি বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্যে পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

উপসংহারে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, সমাজ-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে নিবিড় যোগা-যোগ রেখেই ভৌত ও কারিগরী বিজ্ঞানকে কাজ করতে হবে। আর এই সব প্রচেষ্টাই আমাদের জীবনকে নৈতিক মূল্যবোধ ও সমাজ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

মূল সভাপতি ডাঃ আত্মারাম তাঁর ভাষণে 'ভারতে বিজ্ঞান' বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিকাশশীল সমাজে বিজ্ঞানের ভূমিকা, সাধনার গুরুত্ব, বিজ্ঞানের আয়োজন ও সংগঠন, বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও জনশক্তি, বিদেশী সহযোগিতা এবং বিজ্ঞান, সরকার ও রাজনীতি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি জাতির সমৃদ্ধি ও স্বস্তি নির্ভর করে তার বৈজ্ঞানিক সামর্থ্য ও শিল্প-শক্তির উপর। এজন্যে বিজ্ঞান ও শিল্পনীতিকে একসূত্রে গ্রথিত করবার উদ্দেশ্যে কারিগরী নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এর ফলে বিজ্ঞান সংক্রান্ত আমাদের অনেক নীতি কার্যকরী করা সম্ভব হবে এবং আমাদের শিল্পনীতি পথের নির্দেশ পাবে। তিনি যে কারিগরী নীতির কথা বলেছেন, সে প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বিবেচ্য—(১) আধুনিক কারিগরী নীতি মূলধন অভিমুখী এবং তাতে শ্রম লাগে কম। কিন্তু ভারতে পরিস্থিতি উল্টো অর্থাৎ মূলধন কম আর শ্রমিক অপর্যাপ্ত। (২) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দেশের বাইরে থেকে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন আছে এবং এমন কোন্ ক্ষেত্র আছে, যেখানে আমাদের নিজস্ব প্রয়োগশালা ও সংস্থার দ্বারা জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্যে আমরা প্রতীক্ষা করতে পারি? (৩) কতিপয় ক্ষেত্র, যেমন ইস্পাত নির্মাণ, মূল রসায়ন, প্রতিরক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি, যেখানে সর্বোত্তম কারুবিদ্যা আমরা নিজেরাই গড়ে তুলতে পারি।

তিনি মনে করেন, ভারতের প্রগতি প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—(১) ভারতের বৈষয়িক সম্পদের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা ও পরিমাপ এবং যতদূর সম্ভব সেগুলিকে কাজে লাগানো, (২) পুঁজি যাতে উৎপন্ন হয়, সে জন্যে উৎসাহ দেওয়া এবং (৩) জাতীয় লোকবলকে অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে কাজে লাগানো। এই তিনটি ব্যাপারেই তিনি বিদেশের মুখাপেক্ষী না হয়ে দেশের নিজস্ব সম্পদ যতদূর সম্ভব ব্যবহার করবার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, বৈষয়িক সম্পদের উপর অর্থ লগ্নী করে যে লাভ হয়, তার চেয়েও অনেক বেশী লাভ হয় মানবিক সম্পদের (লোকবল) উপর টাকা খাটিয়ে। কারণ বিজ্ঞানী, কারুবিদ্, যন্ত্রবিদ্ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের আমরা যত বেশী তালিম দিয়ে তৈরি করতে পারবো, জাতির উন্নতি হবে তত বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এপর্যন্ত যাঁরা এসব বিষয়ে তালিম পেয়েছেন, তাঁদের সকলের জন্যে উপযুক্ত বেতনে কর্মসংস্থান করা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা আমাদের নেই। বক্তা বলেন—তাঁর ধারণা এই যে, যতদিন আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি না হবে, ততদিন দেশ থেকে যুবকদের বিদেশে যাওয়া বন্ধ করা যাবে না। এঁরা সকলেই দেশভক্ত, কিন্তু কেবল মাত্র দেশভক্তি সম্বল করে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না।

উপসংহারে ডাঃ আত্মারাম বলেন, বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করছি, তা বিজ্ঞান ও কারুবিদ্যার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। বিজ্ঞানীকে তাঁর উত্তরদায়িত্ব সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন হতে হবে। আধুনিক কালে দেশের সমস্যা সমাধানের ভার কেবল মাত্র রাজনীতিজ্ঞদের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না এবং দেওয়া উচিত নয়। বিজ্ঞানীরা কেবল পরামর্শদাতা হয়ে থাকতে পারেন না, দেশের প্রগতির জন্যে তাঁদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

মূল সভাপতির ভাষণের পর বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ অজিতকুমার সাহা বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী ও মূল সভাপতির পরিচয় করিয়ে দেন। বিদেশ থেকে এবার সর্বসমেত কুড়ি জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এসেছিলেন। তাঁরা হলেন, আফগানিস্থানের ডাঃ সৈয়দ শাহ্ গজনফর এবং ডাঃ শাহ্ মহম্মদ আলেকোজাই; অষ্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক জে. আর. এ. ম্যাকমিলান; সিংহলের ডাঃ বি. এ. আবেইকরামা এবং ডাঃ আর. এস. রামকৃষ্ণ; চেকোস্লোভাকিয়ার অধ্যাপিকা হেলেনা রাসকোভা এবং ডাঃ জ্যান জেরি, জার্মান সাধারণ-তন্ত্রের অধ্যাপক জি. প্রেশচেন, হাঙ্গেরীর ডাঃ মার্টিন পেশী এবং ডাঃ ক্যারোলী ভাস; জাপানের ডাঃ জিরো ওগাওয়া এবং অধ্যাপক জিরো ওনোকুরা; পোল্যাণ্ডের অধ্যাপক মেরিয়ান কোকর; যুক্তরাজ্যের অধ্যাপক জি. ডি. সিমস্; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক রে. কোপেলম্যান, অধ্যাপক পি. আর. হোয়াইট এবং ডাঃ জেন ক্রীষ্টিয়ান এবং সোভিয়েট রাশিয়ার অ্যাকাডেমিসিয়ান এ. আই. ওপারিন, অধ্যাপক আই. এম. খালাৎনিকভ এবং অধ্যাপক বি. এম. সামাকিন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন আবার সস্ত্রীক এসেছিলেন।

মূল অধিবেশনের শেষে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে আয়োজিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞান পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। অন্যান্য বারের তুলনায় এবারের প্রদর্শনী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর হয়েছিল। প্রদর্শনীতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমোন্নতি এবং ভারতীয় ভাষায় অধিকতর সংখ্যায় বিজ্ঞান পুস্তক প্রকাশের পরিচয় পেয়ে আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছি।

দ্বিতীয় দিন থেকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্তর্গত তেরোটি শাখার পৃথক পৃথক অধিবেশন সুরু হয়। পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ এ. আর. ভার্মা তাঁর ভাষণে আলোচনা করেন 'ক্রষ্টাল গ্রোথ অ্যাণ্ড ওয়ান-ডাইমেনশন্তাল পলিমরফিজম' সম্পর্কে, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ পি. এন. নন্দী বলেন 'মৃত্তিকার জীবাণুর দ্বারা অ্যান্টিবায়োটিক্স উৎপাদন' বিষয়ে, শারীরবিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ এম. এন. চাটার্জি আলোচনা করেন 'ভেষজতত্ত্বের বিজ্ঞান', মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক ভি. কে. কোথারকার বলেন 'মৌখিক শিক্ষার সুসংবদ্ধ ব্যবস্থাপনা' সম্পর্কে, যন্ত্রবিজ্ঞান ও ধাতুবিদ্যা শাখার সভাপতি ডাঃ কে. কে. মজুমদার আলোচনা করেন 'ভারতে খনিজ দ্রব্যের উপযোগিতা'র বিষয়, সংখ্যায়ন শাখার সভাপতি শ্রীহরিকিঙ্কর নন্দী বলেন 'সংখ্যায়ন তত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কে পুন-র্বিবেচনা', রসায়ন শাখার সভাপতি অধ্যাপক এস. কে. ভট্টাচার্য আলোচনা করেন 'অসমসত্ত্ব অনু-ঘটকের কয়েকটি ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতি', ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখার সভাপতি শ্রীকে. এল. ভোলা বলেন 'ভারতে তেজস্ক্রিয় খনিজের ভবিষ্যৎ', প্রাণিবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখার সভাপতি অধ্যাপক এম. ডি. এল. শ্রীবাস্তব বলেন 'ক্রমোসোমের গঠন-শৈলী', গণিত শাখার সভাপতি অধ্যাপক জে. এন. কাপুর আলোচনা করেন 'সাম আসপেক্টস্ অফ ম্যাথামেটিক্স অফ অপারেশন্স রিসার্চ', কৃষিবিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ এম. এস. স্বামীনাথন বলেন 'দি এজ অফ অ্যালগেনি, জেনেটিক ডেস্ট্রাকসন অফ ইন্ড বেরিয়ার অ্যাণ্ড এগ্রি-কালচারাল ট্রান্সফরমেশন্', চিকিৎসা ও পশু-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক এস. আর. রাও বলেন 'প্রতিরোধ তত্ত্ব ও পরাশ্রিত রোগ' বিষয়ে এবং নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখার সভাপতি ডাঃ এল. পি. বিদ্যার্থী আলোচনা করেন 'আধুনিক ভারতে আদিবাসীদের মধ্যে কৃষ্টির রূপান্তর' সম্পর্কে।

বিভিন্ন শাখায় যথারীতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা-চক্রে বিশেষ বক্তৃতা ও গবেষণা-পত্র পাঠ করা হয়েছিল। এবার সর্বাধিক গবেষণা-পত্র পঠিত হয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখায় এবং তারপর রসায়ন শাখায়। যাঁরা বিশেষ বক্তৃতা দেন, তাঁরা হলেন গণিত শাখায় শ্রীপ্রিমলকান্তি ঘোষ, অধ্যাপক টি. ওয়াই. লী এবং অধ্যাপক জে. এস. রাসতোগী; পদার্থ-বিজ্ঞান শাখায় অধ্যাপক খালাৎনিকফ, অধ্যাপক জি. ডি. সিমস; রসায়ন শাখায় অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্রি, ডাঃ ইউ. পি. বসু, অধ্যাপক নীলরতন ধর, অধ্যাপক এস. আর পালিত, অধ্যাপক পি. টি. নরসিংহম, ডাঃ কে এস. জি. ডস্ এবং অ্যাকাডেমিসিয়ান এ. আই. ওপারিন; ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখায় ডাঃ ডাবলিউ. ডি. ওয়েষ্ট, মিঃ ডাবলিউ. বি. মিটার, অধ্যাপক বি. এম. সামাকিন, ডাঃ এ. জি. জিনগ্রান এবং অধ্যাপক ইউ. অশ্বত্থনারায়ণ; উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখায় অধ্যাপক পি. আর. ওয়াইট, ডাঃ এস. সি. মহেশ্বরী এবং ডাঃ বি. এম. পানিগ্রাহী; প্রাণিবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখায় অধ্যাপক বি. বোনেল এবং ডাঃ পি. জে. ডেওরাস; নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখায় ডাঃ পিটার গার্ডনার; কৃষিবিজ্ঞান শাখায় অধ্যাপক জি. প্রেশচেন; যন্ত্রবিজ্ঞান ও ধাতুবিদ্যা শাখায় ডাঃ এ. লাহিড়ী, শ্রী এম. দয়াল, ডাঃ তমহঙ্কর এবং ডাঃ এস. কে. বসু। ভারতের ও বিদেশাগত কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কয়েকটি লোকরঞ্জক বক্তৃতাও প্রদান করেন। ডাঃ আত্মারাম 'অপ্টি-ক্যাল গ্রাস' সম্পর্কে, অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্রি 'কয়েকটি সুন্দর গাছ, বিষ ও ভেষজ উদ্ভিদ' সম্পর্কে', ডাঃ বি. ডি. নাগচৌধুরী 'মৌলিক ও ফলিত গবেষণার যোগসূত্র' সম্পর্কে পঞ্চম বার্ষিক ডাঃ বি. সি. গুহ স্মারক বক্তৃতা, অধ্যাপক নীলরতন

ধর 'মানুষের প্রাচীনতম শত্রু : ক্ষুধা' সম্পর্কে, ডাঃ কালিপদ বিশ্বাস 'দার্জিলিং ও সিকিম-হিমালয় অঞ্চলের ভেষজ উদ্ভিদ ও ফুল' সম্বন্ধে, অধ্যাপক পি. জি. ডেওরাস 'সাপ ও সাপের বিষ' সম্পর্কে, ডাঃ কে. এন. উডুপা 'বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সম্মিলিত আবিষ্কারের উদ্দীপনা' সম্পর্কে অধ্যাপক এস. কে. ঘোষ ইজরাইল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা মেহরা 'মেণ্ডেল স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন। বিজ্ঞান ও সামাজিক সম্পর্ক কমিটির উদ্যোগে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও জাতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-চক্র আয়োজিত হয়েছিল। ডাঃ নীলরতন ধরের সভাপতিত্বে এই আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণ করেন ডাঃ ইউ. পি. বসু, ডাঃ জে. এন. মৈত্র, ডাঃ এ. পি. ভট্টাচার্য, ডাঃ

সারনাথের মূল-গন্ধকুটি বিহার

ফটো—শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ

সম্বন্ধে, অধ্যাপক জি. বি. পান্থ 'চন্দ্রলোকে যাত্রা' সম্পর্কে হিন্দীতে এবং ডাঃ হরনারায়ণ 'ভূমিকম্প' সম্বন্ধে হিন্দীতে লোকরঞ্জক বক্তৃতা প্রদান করেন। এছাড়া ডাঃ এম. জে. থিরুমালাচার 'সুন্দরলাল হোরা স্মারক বক্তৃতা', অধ্যাপক পি. আর. ওয়াইট 'ভুবকর স্মারক বক্তৃতা' এবং অধ্যাপক পি. এন. এস. পি. রায়চৌধুরী, ডাঃ জে. এন. কাপুর, ডাঃ এস. কে. বাতরা, ডাঃ এইচ. সি. গাঙ্গুলী, ডাঃ এন. এন. সাহা এবং ডাঃ এস. আর. মেহরা।

এবারের অধিবেশনে একটি নতুন অনুষ্ঠান সংযোজিত হয়—বিশেষ সমাবর্তন উৎসব। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই সমাবর্তন

উৎসবে অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্রি এবং ডাঃ আত্মারামকে সম্মানসূচক ডি. এস-সি. ডিগ্রীতে ভূষিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বেনারসের মহারাজা ডাঃ বিভূতিনারায়ণ সিং। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ত্রিগুণা সেনকেও এই সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের কথা ছিল, কিন্তু কোন বিশেষ কারণে তিনি এই ডিগ্রী গ্রহণ করেন নি।

করেছিলেন স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি। তার মধ্যে ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ ও তাঁর সম্প্রদায়ের সুমধুর সানাইবাদন আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

অধিবেশনের শেষ দু-দিন অর্থাৎ ৮ই ও ৯ই জানুয়ারী সারনাথ ও ডিজেল লোকোমোটিভ কারখানা এবং বারাণসী থেকে প্রায় ১০০ মাইল

হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম কারখানার একাংশ

ফটো—লেখক

বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও বিদেশাগত বিজ্ঞানীদের প্রীতি সম্মেলনে চার দিন আপ্যায়িত করেছিলেন রাজ্যপাল, বেনারসের মহারাজা, অভ্যর্থনা সমিতি এবং বারাণসীর নাগরিকবৃন্দ। সারাদিন বিজ্ঞান বিষয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনার পর চার দিন রাত্রে আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন

দূরে রিহান্দ বাঁধ ও হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম করপোরেশনের কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সারনাথে আমরা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহশালা, ধামেক স্তূপ, মূলগন্ধকুটি বিহার, প্রাচীন স্তূপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ, চীনা বুদ্ধমন্দির, ডিগ্রী কলেজ, সারনাথ রেল-

ষ্টেশন ইত্যাদি দেখেছিলাম। রিহান্দ বাঁধের ভ্রমণসূচী ছিল সারাদিনের। রিহান্দ মূলতঃ একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্রকল্প। বাঁধটি লম্বায় ৩০৬৫ ফুট, আর গভীরতম ভিৎ থেকে এর উচ্চতা ৩০৪ ফুট। একটি বিশাল জলাধারে জল সংরক্ষণ করা হয়। বাঁধের নীচেই বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র। এখানে ৬টি বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র আছে। এর প্রত্যেকটির বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ক্ষমতা শোনলাম ৫০ মেগাওয়াট। ১৯৬৩ সালের গোড়ার দিকে রিহান্দ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় এটি নির্মিত হয়েছে এবং খরচ পড়েছে মোট ৪৬ কোটি টাকা। রিহান্দ থেকে ৩ মাইল দূরে রেণুকুটে অবস্থিত হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম কারখানাটি বিরাট। বিড়লা গোষ্ঠী পরিচালিত এই কারখানার অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন থেকে সুরু করে অ্যালুমিনিয়ামের পাত, তার, বার, করোগেটেড শীট ইত্যাদি সব কিছুই নির্মিত হচ্ছে। এখানকার অতিথি-ভবনটিও সুন্দর, সেখানে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। বারাণসীতে থাকবার সময় আমরা ও অনেক ভারতীয় প্রতিনিধিই বিশ্বনাথের মন্দির ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন, গঙ্গাবক্ষে নৌকা-বিহার এবং রামনগর প্রাসাদ ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পৈত্রিক কুটির দেখবার সুযোগও গ্রহণ করেছিলাম।

অস্ফুট জগৎ

রমেশ দাশ

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অনাদি অনন্ত। তার বিরাটত্ব আমাদের কল্পনাতীত। যেন সর্বস্থান, সর্বকালব্যাপী বিচিত্র বিস্ময়কর অস্তিত্বের এক অকূল, অতল মহাসিন্ধু। সেই মহাসিন্ধুর একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিন্দু আমাদের এই পৃথিবী। এই বিন্দুটুকুই আমাদের কাছে এত বিশাল যে, তার সঙ্গে সম্যক পরিচয় লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, যদিও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উন্মোচনের দুরন্ত সাহস আমরা পোষণ করি। এই সাহস প্রশংসনীয়; এই সাহস স্বাভাবিক; এই সাহস মানুষের সুস্থ ও বলিষ্ঠ মানসিকতারই পরিচয় বহন করে। পৃথিবী এবং তার নৈসর্গিক পরিমণ্ডল সম্বন্ধে মানুষ যে অমূল্য তথ্যরাজি সংগ্রহ করেছে এবং সেই সব তথ্যকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করে প্রকৃতির উপর যে পরিমাণ আধিপত্য বিস্তার করেছে, তার জীবনযাত্রাকে যে পরিমাণে সহজতর ও সমৃদ্ধতর করতে পেরেছে, তা নিঃসন্দেহে তার একটি মহান কীর্তি। কিন্তু অসীম, অনন্ত, নিখিল বিশ্বের অগাধ, অপার, অতল রহস্যের কতটুকু উদ্ঘাটন করতে পেরেছে সে? কতটুকু উদ্ঘাটন করা সম্ভব তার পক্ষে, তার সীমিত শক্তি কতিপয় ইন্দ্রিয় আর নির্দিষ্ট-গঠন একটি মস্তিষ্ক নিয়ে?

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্যে আমরা মূলতঃ নির্ভর করি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির উপর। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা কিন্তু সীমাবদ্ধ। চতুষ্পার্শ্বে কত আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যা আমরা দেখতে পাচ্ছি না; কত শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে, যা আমরা শুনতে পাচ্ছি না। কত স্বাদ অনাস্বাদিত থেকে যাচ্ছে, কত গন্ধ অনাঘ্রাত থেকে গেল,

কত স্পর্শের আবেদন আমাদের অনুভূতির সীমানায় এসেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। তাছাড়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিসরটাও কতই না সঙ্কীর্ণ! আমার সঙ্গে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একটা নগণ্যতম অংশেরই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। নিখিল বিশ্বের কথা তো দূরের কথা, তার অণুকণাস্বরূপ এই যে পৃথিবী—আমাদেরই পৃথিবী—তারই বা কতটুকু আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারি? বিশ্বকবির ভাষায়—বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকু জানি! আমাদের জ্ঞানের অধিকাংশটাই তাই পরোক্ষ। "তাই জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে, পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।" অন্যের কাছে শোনা, গ্রন্থাদি থেকে সংগ্রহ করা বা অনুরূপ কোন উৎস থেকে আহৃত তথ্যরাজি দিয়েই আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের বেশীর ভাগটা আমরা পূরণ করে থাকি। পরোক্ষ জ্ঞানের অন্য একটা প্রধান ভিত্তি হলো আমাদের বিচার-শক্তি। এমন অনেক কিছুর অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি, যার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও যুক্তির সাহায্যে যাকে প্রমাণ করা যায়। আমরা সব সময়ই যে নিজেদের যুক্তির উপর নির্ভর করি তা নয়, বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতায় বিশ্বাস করে তাঁরা যা বলেন, নির্দ্বিধায় তা স্বীকার করে নিই। অথচ যে বিচার-শক্তির এত গর্ব আমরা করে থাকি, বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই দেখা যায়, সেই বিচার-শক্তির প্রয়োগ করেও আমরা সব সময় অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হই না। আজ যা বিজ্ঞানে সত্য বলে গৃহীত হলো, আগামী কাল দেখা দেখা গেল, তাই আবার পরিমার্জিত অথবা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে—এরকম নজির বিজ্ঞানের ইতিহাসে অজস্র দেখা যায়। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তাই তাঁর কোন সিদ্ধান্তকেই ধ্রুব সত্য বলে দাবী করেন না; প্রয়োজনানুসারে তাকে পরিমার্জন করতে—এমন কি, বর্জন করতেও সব সময় প্রস্তুত থাকেন। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যের বিশ্লেষণেই বিচার-শক্তির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সীমিত-শক্তি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে সব তথ্য লাভ করি, স্বাভাবিক কারণেই সেগুলি সব সময় সম্পূর্ণ ও অভ্রান্ত নাও হতে পারে, আর সেই কারণেই তাদের বিশ্লেষণ করে যেসব সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই, সেগুলিও ত্রুটিযুক্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান এত সীমাবদ্ধ জেনেও আমরা আমাদের জ্ঞান-বিচারের বাইরে যে একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় বিশাল জগতের অস্তিত্ব আছে, সেই সহজ কথাটা স্বীকার করতে চাই না এবং কোনও নিগূঢ় উপায়ে যদি সেই জগতের তরঙ্গ এসে কোনও ব্যক্তির চেতনায় স্পন্দন জাগায়, যদি আকস্মিকভাবে চকিতের জন্যে তার সুমুখে সেই জগতের বদ্ধ দুয়ারটি খুলে গিয়ে তাকে বিস্ময়াভিভূত করে দেয়, তাহলে আমরা তার এই অভিজ্ঞতাকে তার মনের ভ্রম বলে বাতিল করে দিই।

মনোবিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট শাখা Psychophysics—বস্তুজগতের সঙ্গে মনোজগতের নিগূঢ় সম্পর্কটি নিরূপণ করাই এই শাখা-মনোবিজ্ঞানটির উদ্দেশ্য। একটি বস্তুর (যেমন একটি রঙের) তীব্রতাকে ন্যূনতম কতটুকু কমালে বা বাড়ালে তার এই হ্রাস বা বৃদ্ধি টের পাওয়া যায়; কোন দ্রব্যের ওজন, দৈর্ঘ্য, স্থায়িত্ব (Duration) বা অনুরূপ অন্য কোন বিশিষ্টতার কি পরিমাণ ক্ষয়-বৃদ্ধি হলে তার স্বল্পতম তারতম্য আমরা বুঝতে পারি; কত পরিমাণ লাল রঙের সঙ্গে কত পরিমাণ হলুদ রং মেশালে কমলা রঙের উদ্ভব হয়—এই ধরণের বহু সহজ অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের উপর সযত্ন পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এই সব পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদির বিশ্লেষণ করে জড় ও মনের সম্পর্ক-সূত্রটি নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত সূত্রটি নিরূপণ

করবার উদ্দেশ্যে সব সময়েই একক (Individual) অভিজ্ঞতাকে বিবেচনা না করে, বিবেচনা করা হয়েছে গড় (Mean) অভিজ্ঞতাকে।

একটা সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ক-নামক ব্যক্তির সম্মুখে ১০০ গ্র্যাম একটি ওজনের সঙ্গে ৯৯ গ্র্যাম, ৯৮ গ্র্যাম, ৯৭ গ্র্যাম, ৯৬ গ্র্যাম ও ৯৫ গ্র্যাম ওজনগুলি পৃথক পৃথকভাবে, প্রয়োজনীয় সমূহ সতর্কতা অবলম্বন করে, প্রত্যেকটিকেই দশবার উপস্থাপিত করা হলো এবং তাকে প্রত্যেকবারই বলা হলো ১০০ গ্র্যামের সঙ্গে প্রদত্ত নির্দিষ্ট ওজনটির কোন তারতম্য সে বুঝতে পারছে কিনা। দেখা গেল, প্রত্যেক বারেই ৯৯ গ্র্যাম ও ৯৮ গ্র্যামকে সে ১০০ গ্র্যামের সমান অনুভব করেছে, কিন্তু ৯৭ গ্র্যামকে দশ বারের মধ্যে তিনবার, ৯৬ গ্র্যামকে ছয়বার এবং ৯৫ গ্র্যামকে দশ বারই ১০০ গ্র্যামের তুলনায় হাল্কা অনুভব করেছে। সুতরাং সহজ হিসাবে বলা যেতে পারে, ১০০ গ্র্যাম থেকে ওজন কমিয়ে কমিয়ে $\left(১০০ - \frac{৯৭ \times ৩ + ৯৬ \times ৬ + ৯৫ \times ১০}{১৯}\right)$

অর্থাৎ ৯৫·৬ গ্র্যামে নেমে এলে তবেই ক ওজনের হ্রাস ঠিক বুঝতে পারে। সাধারণভাবে সিদ্ধান্তটি গ্রহণযোগ্য সন্দেহ নেই এবং মনোবিজ্ঞানের মত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সামান্যীকরণের (Generalisation) জন্যে গড়-মূল্যের উপর নির্ভর করা একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু একক অভিজ্ঞতাগুলির যে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় একটি তাৎপর্য আছে, সেটিকে এড়িয়ে যাওয়া বা অস্বীকার করাও সমীচীন নয়। উদাহরণস্বরূপ ক ৯৭ গ্র্যামকে দশবারের মধ্যে তিনবার ১০০ গ্রামের তুলনায় হাল্কা, কিন্তু সাতবার ১০০ গ্র্যামের সঙ্গে সমান অনুভব করেছে। এক্ষেত্রে স্পষ্টতঃই দুটি ওজনের যে প্রভেদ সেটা ক-এর চেতনায় ধরা দিয়েও যেন দিচ্ছে না। তার শুধু একটা অস্পষ্ট আভাস যেন অত্যন্ত ক্ষীণ ও অনির্দিষ্টভাবে ক-এর চেতনায় বিম্বিত হয়েছে। কিন্তু ক্ষীণ ও অনির্দিষ্ট হলেও এই অনুভূতিটি সত্য এবং বাস্তবের সঙ্গে তার তদনুপাতিক সঙ্গতিও বর্তমান।

বস্তুতঃ আমাদের অভিজ্ঞতায় বিশ্বনিখিল সর্বদা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তরভেদ আছে। প্রত্যূষে পরিষ্কারভাবে সূর্য দর্শন হবার পূর্বে পূর্বাকাশে প্রথমে আমরা একটি আলোর আভাস দেখতে পাই। আভাসের পর উদ্ভাস, তারপর উদয়, অবশেষে অভ্যুদয়—তখন পরিষ্কারভাবে সূর্যদেব আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হন। আমাদের ইন্দ্রিয়াদি ও মস্তিষ্কের শক্তি সীমিত বলেই বিশ্ব-সংসারের অনেক কিছুর শুধু আভাস অথবা উদ্ভাসটুকুই আমাদের চেতনায় ধরা দেবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

শুধু কবি, শিল্পী বা দার্শনিকই নয়, সাধারণ মানুষ আমরাও প্রতিনিয়ত যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করছি, তার কতটুকু পারি প্রকাশ করতে? পারি না, তার কারণ—সীমার মাঝে অসীমের যে ইঙ্গিত, স্থূলকে আশ্রয় করে সূক্ষ্মের যে ব্যঞ্জনা আমাদের চেতনায় ছন্দিত হয়, তাকে অনুভব করি, কিন্তু স্পষ্ট করে বুঝতে পারি না। তাই আমাদের অভিজ্ঞতার বেশীর ভাগটাই অনির্বচনীয় থেকে যায়। Gestalt Psychology অনুসারে আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখন শুধু সেই বস্তুটিকেই বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ

করি না, অতিরিক্ত অন্য কিছুর সঙ্গে—তার চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিমণ্ডলের সঙ্গে—তাকে একীভূত করে প্রত্যক্ষ করে থাকি। সরোবরের স্থির কৃষ্ণ জলে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মকে যেমনটি প্রত্যক্ষ করি, সেই পদ্মটিকেই বৈঠকখানার ফুলদানিতে এনে রাখলে তেমনটি আর প্রত্যক্ষ করি না। পরিবেশের তারতম্যে সমগ্রের ব্যঞ্জনায় একটি অনির্বচনীয় অথচ সুনির্দিষ্ট তারতম্য ঘটে। তাছাড়া ফুলটিকে যখন প্রত্যক্ষ করি, তখন তাকে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশের (পত্র, দল ইত্যাদি) সমষ্টিরূপে দেখি না, দেখি তাদের সমন্বিত একটি রূপ—একটি অনির্বচনীয় পূর্ণতা, একটি অবর্ণনীয় ঐক্য, একটি অরূপ সৌন্দর্য। আমাদের প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষিত স্থূল বস্তুকে এইভাবে পরিবেষ্টন করে থাকে একটি সূক্ষ্ম পরিমণ্ডল। সূক্ষ্মের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে, সূক্ষ্মের দ্বারা বিধৃত ও পরিস্নাত হয়ে একটি অনন্ত ব্যঞ্জনায় স্থূল প্রতিভাত হয়ে ওঠে আমাদের চেতনায়।

বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন, নিখিল বিশ্ব একটি অবিচ্ছিন্ন একক সত্তা। একই শক্তির বহু বিচিত্র প্রকাশ এই বিশ্ব-জগৎ। সমূহ জড় বস্তুকে বিশ্লেষণ করতে করতে একটিমাত্র মূলীভূত শক্তিরই সন্ধান মেলে। চেতনা বা প্রাণশক্তিরও উৎস সেই একই শক্তি একথা বিশ্বাস করবারও যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। ডারউইন প্রমুখ বিবর্তনবাদীগণের এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বিজ্ঞানীবর্গের সযত্ন সম্পাদিত পরীক্ষা ও নিরীক্ষালব্ধ তথ্যাবলী জড় ও জীবনের মধ্যে মৌলিক অভিন্নতাই প্রমাণ করে। আর, কেউ যদি এই অভিন্নতা স্বীকার নাও করেন, তথাপি জড় ও জীবনের মধ্যে যে একটি সুস্পষ্ট সুনিবিড় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিশ্ব-জগৎ একটি সুসম্বদ্ধ একক সত্তা বলেই তার দূরতম প্রান্তের প্রভাব (তা সে যত ক্ষীণই হোক না কেন) অপর প্রান্তে এসে পড়বে। কোনও এক স্থানে একটি তরঙ্গের সৃষ্টি হলে সব স্থানেই তার স্পন্দন জাগবে।

আমাদের সকলেরই চেতনায় অনুক্ষণ বিশ্ব-নিখিল স্পন্দিত হচ্ছে, কিন্তু নানা কারণেই আমরা সকলে সব সময় তা টের পাচ্ছি না। যেমন—পৃথিবী সব সময়ই ঘুরছে, অবিরাম আভ্যন্তরীণ আলোড়নে কম্পিত হচ্ছে, কিন্তু তার এই ঘূর্ণন ও কম্পনের দ্বারা প্রভাবিত হলেও সাধারণ অবস্থায় আমরা তা অনুভব করতে পারবো না। অথচ উন্নত ধরণের ভূ-কম্পন যন্ত্রে দূরান্তের একটি ক্ষীণ কম্পনও ধরা দেয়। তেমনি কারও মস্তিষ্কের গঠনটি যদি যথেষ্ট পরিমাণ উন্নত হয় কিংবা যথার্থ প্রক্রিয়ার সাহায্যে যদি তাকে সেই পরিমাণে উন্নত করা যায়, তাহলে দূর বিশ্বের কোনও সংবাদ তাঁর চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে বৈকি! আমরা জানি, অন্ধকারে সমস্ত রং নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আলোর বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রং আত্মপ্রকাশ করে। মস্তিষ্কের বিশেষ একটি অবস্থায় অতীন্দ্রিয় জগতের বিশেষ একটি অংশ সেই রকম আপনা থেকেই কি বিশেষ একটি মানুষের কাছে উন্মোচিত হতে পারে না? কান পেতে রইলে দূরবর্তী ক্ষীণ শব্দ-প্রবাহ ধীরে ধীরে আমাদের শ্রবণে প্রকটিত হয়ে ওঠে। উন্মুখতা থাকলে সূক্ষ্ম

জগৎও স্থূলীভূত হয়ে আমাদের গোচরে আসতে পারে—এক অতীন্দ্রিয় রহস্যময় জগতের দুয়ার খুলে যেতে পারে আমাদের চেতনার সম্মুখে।

স্থূল জগৎ চালিত হচ্ছে সূক্ষ্ম শক্তির দ্বারা। সূক্ষ্ম শক্তিই স্থূলীভূত হয়ে প্রত্যক্ষের জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ব-শক্তির সূক্ষ্মতম অবস্থার নাম দেওয়া যেতে পারে 'সম্ভাবনা' (Potentiality)। বিশ্ব-সংসারে যা কিছুর সৃষ্টি হয়েছিল বা হয়েছে এবং হবে, অনাদি কাল থেকে অনন্ত কালের জন্যে তার সবই সম্ভাবনারূপে বিদ্যমান। স্থূলের বিনাশ (রূপান্তর) ঘটতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মের বিনষ্টি নেই। যে সব বস্তু অতীতে সৃষ্টি হয়েছিল বা যে সব ঘটনা পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল, তার কিছুই হারায় নি। বিবেকানন্দের কথায় "Uniformity is the rigorous law of nature, what once happened can happen always" বিজ্ঞান-স্বীকৃত Law of uniformity-র নিগূঢ় অর্থই তাই। ঠিক ঠিক যোগাযোগ ঘটলে অতীত পুনরায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে। অনুরূপভাবে ভাবী কালের সমূহ অনাগত সৃষ্টি ও সংঘটনের সম্ভাবনাও বর্তমানেই নিহিত। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত নয়, সুনির্দিষ্ট—শুধু অপ্রকট। ভাবী বংশবংশান্তরের সংখ্যাতীত বনস্পতি-মালার প্রতিটি বৈশিষ্ট্যেরই সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে ক্ষুদ্র বীজটির গহন সত্তায়। রামের জন্মের পূর্বেই রামায়ণ রচিত হয়ে আছে। ঠিক ঠিক কারণ ঘটলে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও জীবন্ত হয়ে প্রতিভাত হতে পারে। মস্তিষ্কের উপযুক্ত অবস্থায় উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক সন্নিবেশে ভবিষ্যতের সূক্ষ্ম সম্ভাবনাও কি ব্যক্তি-চেতনায় প্রকটিত হয়ে প্রতিফলিত হতে পারে না?

সুতরাং বিশিষ্ট একটি পরিবেশে, বিশেষ একটি লগ্নে নির্দিষ্ট একটি মানুষের চেতনায় যদি অতীতের বা ভবিষ্যতের কোনও সম্ভাবনা চকিতের জন্যে প্রকটিত হয়ে ওঠে, তাহলে কি তার সম্ভাব্যতায় আমরা সন্দিহান হবো? ক্ষুধিত পাষাণে আর দৃষ্টিপ্রদীপে যে ধরণের অপার্থিব, অলৌকিক, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে তেমনটি ঘটা কি নিতান্তই অসম্ভব? ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান-দ্রষ্টা বিশ্বের মহাপুরুষগণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অলৌকিক বলেই কি অবিশ্বাস্য? নির্জন বনপ্রান্তরের নিঃসঙ্গ পথিক পত্রমর্মরের মধ্যে যে অস্ফুট বাণীর আভাসটুকুই লাভ করেন, জ্যোৎস্না নিশীথে সরোবরের মৃদু তরঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্গে আলোর আশ্চর্য কানাকানিতে যে অপার্থিব রূপ ও ধ্বনির ইঙ্গিতটুকুই দর্শকের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়, সেই আভাস, সেই উদ্ভাস যদি বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ একটি ব্যক্তি-চেতনায় প্রকটিত হয়ে ওঠে, তাহলে কি আমরা তার এই অপূর্ব অভিজ্ঞতাকে শুধু অলীক বলেই ক্ষান্ত হবো?

মাদাম কুরী ও মানবসভ্যতার অগ্রগতি

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

বিজ্ঞানের ইতিহাসে মাদাম কুরীর অক্ষয়-কীর্তি হলো রেডিয়াম ও তার গুণাবলীর আবিষ্কার। এথেকে জন্ম নিয়েছে বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা, যার নাম হলো তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity)। এর পরিণতি ঘটেছে আধুনিক পরমাণুকেন্দ্রিক পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞানে (Nuclear physics and Nuclear Chemistry)। চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও জৈব রসায়নের গবেষণায়ও এর ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে অব্যাহতভাবে। মানুষ এখন জানতে পেরেছে যে, পরমাণুর কেন্দ্রস্থল হলো এক অপরিমিত বিপুল শক্তির আধার। পরমাণুকেন্দ্রে অবরুদ্ধ এই শক্তিকে উন্মোচন করে মানুষ আজ সৃষ্টি করেছে ভয়াবহ অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা এবং পরমাণুকেন্দ্রের শক্তিতে পরিচালিত সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন; সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তিকে সে প্রয়োগ করছে আপন সুখ-সম্ভোগের বিচিত্র দ্রব্য নির্মাণে ও নানাবিধ শিল্পের উন্নয়নে। সুতরাং মাদাম কুরীকেই বিজ্ঞানের এই নবযুগের প্রবর্তক ও পথিকৃৎরূপে গণ্য করা যায়।

বিজ্ঞান-সাধনার অপূর্ব কাহিনীতে মাদাম কুরীর জীবনী যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি আবার নারীত্বের মহিমায় ও চরিত্রের গৌরবে তা কম সমুজ্জল নয়। সত্যের সন্ধানে ও জ্ঞানের আহরণে গভীরভাবে নিমগ্ন থেকেও তিনি নারী জাতির প্রধান ধর্ম সেবা ও ত্যাগ কখনো উপেক্ষা করেন নি। বিজ্ঞানী কুরীর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল এক মহীয়সী আদর্শ নারী-পতিপ্রাণা পত্নী, স্নেহময়ী জননী ও প্রিয়তমা ভগিনী।

বিজ্ঞানের সেবাই ছিল মাদাম কুরীর জীবনের একমাত্র ব্রত। এই ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করেছেন সারা জীবনব্যাপী কঠোর সংযম ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে। অবশেষে তারই হোমানলে তিনি আত্মাহুতি দান করেন মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুকালে তাঁর দেহ পরীক্ষা করে চিকিৎসকগণ বলেছিলেন, দীর্ঘকাল যাবৎ শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কাজ করবার দরুণ তাথেকে বিকিরিত প্রবল আলোকরশ্মির আক্রমণে দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির—বিশেষতঃ ফুসফুস ও যকৃতের গুরুতর বিকৃতি ও ক্ষতি হলো তাঁর মৃত্যুর প্রধান ও অব্যবহিত কারণ। মাদাম কুরী হলেন আধুনিক যুগের এক সত্যিকার বিজ্ঞান-তপস্বিনী। স্বপনে বা জাগরণে বিজ্ঞানের গবেষণা ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যানের বিষয়। বিজ্ঞানের বর্তমান অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর সমৃদ্ধি তাঁরই তপস্যার পরিণতির ফল বললে অত্যুক্তি হয় না। জীবনে তিনি বহু দুঃখদৈন্য ও শোকতাপ সহ্য করেছেন; অযাচিত সুখসম্পদ ও সম্মান লাভ করেছিলেন অতুল। কিন্তু এসব দুঃখদৈন্যে তিনি কখনো উদ্বিগ্ন হন নি। সুখসম্পদের আতিশয্যও কখনো তাঁকে প্রলুব্ধ বা বিচলিত করতে পারে নি। গীতার ভাষায় বলা যায়, তিনি ছিলেন স্থিতধী বা স্থিতপ্রজ্ঞ।

দুঃখেষু নদিমগ্ন সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগ ভয়ক্রোধ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।

তাই মাদাম কুরীকে আমরা মুনি বা মুনিকন্যা বলে গণ্য করতে পারি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান হলো নোবেল পুরস্কার। এই পুরস্কার মাদাম কুরী পর পর দু-বার লাভ করেন। বিজ্ঞানের

ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল। প্রথমবার তিনি এই পুরস্কার পান ১৯০৩ সালে, রেডিয়াম ও তার তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের জন্যে পদার্থ-বিজ্ঞানে—তাঁর স্বামী পিয়ের কুরী ও হেনরী বেকরেলের সঙ্গে যুক্তভাবে। দ্বিতীয়বার তিনি আবার এই পুরস্কার পান ১৯১১ সালে, বিশুদ্ধ রেডিয়াম ধাতু প্রস্তুতের জন্যে রসায়ন-বিজ্ঞানে। তাঁর অন্যবিধ বহু গবেষণার মধ্যে আর একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ পলোনিয়ামের আবিষ্কার এবং থোরিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানসেবায় তাঁর কঠোর তপশ্চর্যার দৃষ্টান্ত হিসাবে মাদাম কুরীর জীবনী থেকে এখন কয়েকটি ঘটনার কথা বলবো। সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার জন্যে তিনি যখন প্যারিস শহরে আসেন, তখন তাঁর খুবই অর্থাভাব। তাই কোন বাড়ীর ছাদে একটি সিঁড়ির ঘর অল্প ব্যয়ে থাকবার জন্যে ভাড়া করেন। ঐ ঘরটিই ছিল একাধারে তাঁর থাকবার, রান্নার, খাবার এবং লেখাপড়া করবার ঘর। শীতের দিনে ঘরটিকে গরম করবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। একটি স্টোভে তাঁর রান্নার কাজ চলে যেত। তাঁর দৈনিক আহার্য ছিল রুটি, মাখন, কিছু শাকসব্জী, চা এবং চেরী। কদাচ কখন মাংস, ডিম, দুধ জুটতো। এরূপ স্বল্পাহার ও কঠোর পরিশ্রমে তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। একদিন লেবরেটরীতে কাজ করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সহপাঠীরা তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে আসে এবং তাঁর বোন ব্রনিয়া ও তাঁর স্বামীকে খবর দেয়। ব্রনিয়ার স্বামী মাদাম কুরীকে প্রশ্ন করলেন, 'আজ কি খেয়েছ'? উত্তরে মাদাম কুরী বললেন 'অনেক কিছু—চা, গাঁজর ও চেরী'। ব্রনিয়া ও তাঁর স্বামী তখন তাঁকে বাড়ী নিয়ে যান এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া অবধি তাঁদের বাড়ীতে রাখেন।

মাদাম কুরী ও তাঁর স্বামী পিয়ের কুরীর রেডিয়াম আবিষ্কারের কাহিনী উপন্যাসের গল্পের মতো চিত্তাকর্ষক। ১৮৯৬ সালে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী হেনরী বেকরেল পরীক্ষায় দেখলেন যে, হাঙ্গেরীর জোয়াকিমস্থাল অঞ্চল থেকে আনা পিচব্লেণ্ড নামক ইউরেনিয়াম-ঘটিত খনিজ পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়ামের চেয়ে বহুগুণ বেশী। তিনি কুরী দম্পতিকে এই বিষয়ে গবেষণা করতে আহ্বান করেন। কুরী-দম্পতি অনুমান করলেন যে, ঐ খনিজ পদার্থে ইউরেনিয়াম ব্যতীত অধিক শক্তিশালী কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ বর্তমান আছে। তাঁরা তখন ঐ অজানা পদার্থটি আবিষ্কার করবার সিদ্ধান্ত করেন। পিচব্লেণ্ড থেকে ইউরেনিয়াম বের করে নেবার পর যে মাল পড়ে থাকে, তা প্রায় বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে তাঁরা হাঙ্গেরী থেকে গাড়ী বোঝাই করে আনিয়ে নেন। এভাবে ইউ-রেনিয়ামবর্জিত কয়েক টন পরিত্যক্ত পিচব্লেণ্ড নিয়ে কাজ সুরু করেন। খোলা জায়গায় একটি চালা ঘরে নির্দিষ্ট হলো তাঁদের কাজের স্থান। বড় বড় কটাহে অ্যাসিড ও জলে এসব পরিত্যক্ত মাল সেদ্ধ হতে লাগলো। অ্যাসিড ও জলের বাষ্পে এবং ধোঁয়ায় ঘরটি ভর্তি হয়ে থাকতো। কোন সুস্থ সবল লোক ঐ ঘরে দুদণ্ড থাকলে প্রাণের দায়ে পালিয়ে আসতো। কিন্তু কুরীদম্পতির এতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁরা অজানার সন্ধানে তন্ময় হয়ে দিনের পর দিন সকাল থেকে সন্ধ্যাবধি—এমন কি, কখনো কখনো মধ্যরাত্রি অবধি ঐ ঘরে কাটিয়ে দিতেন। ঐ পরিত্যক্ত মাল থেকে যে জলীয় অ্যাসিড দ্রব ছেঁকে নেওয়া হতো, তা বারবার অংশানুক্রমিক দানাগঠন ও তাদের পুনর্দ্রবণ করে অবশেষে ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে মাদাম কুরী একটি সাদা গুঁড়া সংগ্রহ করেন। পরীক্ষায় দেখা গেল, এটি ইউরেনিয়াম থেকে ৩০০ গুণ অধিক তেজস্ক্রিয়। বাসভূমি পোল্যাণ্ডের নামের অনুসরণে

মাদাম কুরী এর নাম দিলেন পলোনিয়াম। কিন্তু এটি বিশুদ্ধ পলোনিয়াম ছিল না।

বিসমাথঘটিত লবণের সঙ্গে এটি মিশানো ছিল। পলোনিয়াম পৃথক করবার পর যে জলীয় দ্রবণ ছিল, তার তেজস্ক্রিয়তা পলোনিয়াম থেকেও অনেক বেশী বেড়ে গেছে দেখা গেল। তখন ঐ পলোনিয়ামবর্জিত দ্রব নিয়ে পুনরায় অংশানুক্রমিক দানাগঠন ও পুনর্দ্রবণের কাজ চলতে লাগলো। ১৮৯৮ সালের শেষভাগে তাঁদের এই কঠোর পরিশ্রমের ফল দেখা গেল। তাঁরা একটি দানাদার পদার্থের কয়েকটি কণিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন, যার তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তার চেয়ে দশ লক্ষ গুণ প্রবল। এবার তাঁরা তাঁদের অজানা বাঞ্ছিতের সন্ধান পেলেন। এরই নাম হলো রেডিয়াম—দীর্ঘ দেড় বছরব্যাপী তাঁদের কঠোর সাধনার ফল।

শেষ বয়সে চোখে ছানি পড়ায় মাদাম কুরীর দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, তখনো বিজ্ঞান-সাধনায় তিনি হার মানেন নি। চোখে পুরু কাচের চশমা দিয়ে ও হাতে লেন্স নিয়ে নিয়মিতভাবে পরীক্ষাগৃহে উপস্থিত হতেন। যন্ত্রপাতির সামনে বসে তাদের কাঁটার চলাচল লক্ষ্য করে ওদের অবস্থানকে লিপিবদ্ধ করতেন কিংবা কোন ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম পদার্থ তুলাদণ্ডে মেপে তার ওজনাঙ্ক লিখে নিতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যখন রুগ্নাবস্থায় শয্যাগত, তখনো তাঁর সহকর্মীদের ডেকে গবেষণা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও বিজ্ঞানের সেবা অসমাপ্ত রেখে তিনি মরবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারেন নি।

মাদাম কুরীর একটি মনোরম জীবনচরিত লিখেছেন তাঁর কন্যা ইভ। তাতে তাঁর জীবনের সকল ঘটনাবলী, তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কীর্তিকলাপ এবং তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের একটি নিপুণ, নিখুঁত ও নিরুপম বর্ণনা আমরা পাই। বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীগণ বইখানি পড়লে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং অনেক কিছু শিখতেও পারবেন। পোল্যাণ্ড ছিল মাদাম কুরীর বাসভূমি, কর্মভূমি হয়েছিল ফরাসী দেশ, কিন্তু তিনি বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডারে যে অবদান দিয়ে গেছেন, তার উত্তরাধিকারী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীবাসী। এই মরণশীল জগতে জন্মগ্রহণ করে তিনি দেশকালের সীমা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতত্ব লাভ করেছেন। তাই আজ তাঁর শতবার্ষিকী জন্মদিনে পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে বিজ্ঞানীরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদানের আয়োজন করেছেন। আমরাও আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি নিয়ে এই আয়োজনে যোগদান করে নিজেদের ধন্য মনে করি।

মাদাম কুরীর আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের জ্ঞানের পরিধি যে অভাবনীয়ভাবে বেড়ে গেছে, তাতে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে বা অতলান্ধকারে ডুবে যাবে, এ-নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। এটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। কারণ আজ পৃথিবীর পরাক্রান্ত রাষ্ট্রসমূহ যেভাবে অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ও উত্তরোত্তর ভয়াবহ মারণাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতায় মেতে গেছেন, তাতে বিশ্ববাসী সন্ত্রস্ত ও সশঙ্কিত হয়ে উঠেছে। অ্যাটম বোমার পতনে হিরোসিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসলীলা মানুষ কখনো ভুলতে পারবে না। কিন্তু বিজ্ঞান সৃষ্টির পশ্চাতে প্রকৃতির যে বিধান বা নিয়মের আবিষ্কার হয়েছে, তা হলো অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের নিয়ম অথবা যোগ্যতমের উদবর্তনের নিয়ম। সৃষ্টির ধারা সতত ঊর্ধ্বমুখী। উত্তরই এর গতির অঙ্গ। এই গতির ভঙ্গী হলো তরঙ্গের মত উঁচু-নীচু হয়ে চলা। এই গতির কোন বিরাম নেই। এই পথ শুধু গড়বার পথ সুগম করবার জন্যে। মানুষের ইতিহাসে বহু প্রাচীন সভ্যতার বিলোপ ঘটেছে এবং তার পরিবর্তে গড়ে উঠেছে নতুন সভ্যতা। এই নতুন সভ্যতার মালমশলা এসেছে তাদের পূর্ববর্তী

সভ্যতা থেকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ভিত্তি রয়েছে পূর্ববর্তী প্রস্তরযুগ, কাংস্যযুগ এবং লৌহযুগের সভ্যতার উপর। এই আধুনিক সভ্যতার যদি কখনো বিলোপ হয়, তার বদলে দেখা দেবে আর এক উচ্চতর নতুন সভ্যতা। সুতরাং অন্যভাবে বলা যায়—সভ্যতার রূপান্তর ঘটে, কিন্তু সম্যক বিনাশ ঘটতে পারে না। তবে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যাঁরা মানতে রাজী নন, তাঁরা এতে সন্তুষ্ট হবেন না বা সান্ত্বনা পাবেন না।

ভবিষ্যতে মানবসভ্যতা কি রূপ পরিগ্রহ করবে, তা সঠিক কেউ বলতে পারে না। তবে কতকটা অনুমান বা কল্পনা করা সম্ভব। বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে সত্তার স্বরূপ নির্ণয় করে মানুষ আজ অফুরন্ত শক্তি ও তাথেকে অপরিমিত সম্পদ বা অর্থ সৃষ্টির সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু শক্তির ধর্ম হচ্ছে, অন্যের উপর আধিপত্য করা এবং সম্পদ বা অর্থের ধর্ম হলো সঞ্চয় ও শোষণ বৃত্তির উদ্দীপনা। ফলে, শক্তি ও অর্থের আহরণ ও তাদের ব্যবহারের প্রচেষ্টায় মানুষের সমাজে দেখা দিয়েছে যত অনর্থ। মানুষের সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, রাষ্ট্রনৈতিক দলে দলে জেগে উঠেছে সংঘাত এবং সংঘর্ষ। মানুষ আত্মঘাতী হতে চলেছে। মানুষের স্বার্থবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধি আজ বেড়ে উঠেছে, তার সকল কল্যাণের সীমা ছাড়িয়ে তার শুভবুদ্ধি বা ধর্মবুদ্ধিকে প্রশমিত করে। এর প্রতিকার মিলতে পারে মানুষের স্বার্থের সঙ্গে পরার্থের সমন্বয়ে, তার ভেদবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধির ঐক্যে, বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে ধর্মসাধনার উৎকর্ষসাধনে। ধর্ম বলতে এখানে সাম্প্রদায়িক ধর্ম মনে করলে ভুল হবে। ধর্ম বললে বুঝতে হবে সার্বজনীন মানুষের ধর্ম। আনুষ্ঠানিক ধর্মোপদেশ বা ধর্মাচরণ কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক বিধিবিধান এর সমন্বয় ঘটাতে পারে না। এর জন্যে চাই ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির ঐক্যের, ব্যক্তি মানবের সঙ্গে বিশ্বমানবের ঐক্যের উপলব্ধি। উপায় কি—এই প্রশ্ন স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের পন্থায় চেতন বা চেতনসত্তার স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টাতেই এই উপলব্ধির পথ উন্মুক্ত হতে পারে। মানুষের অভিব্যক্তি হবে তখন সভ্যতার এক উচ্চস্তরে। তাই বলা যায়, মাদাম কুরীর আবিষ্কার সভ্যতার অগ্রগতির পথে এক উজ্জ্বল দিশারী নিশান।

[বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত 'মাদাম কুরী ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি' আলোচনাচক্রে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ]

কয়লা-সংরক্ষণ

শ্রীরঘুনাথ দাস

কয়লা-সংরক্ষণ ব্যয়সাপেক্ষ হলেও শিল্পক্ষেত্রে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রচুর পরিমাণ কয়লা শিল্পক্ষেত্রে পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী না রাখা হলে যে কোন সময়ে এর অভাব ঘটতে পারে। ফলে শুধু যে কারখানার ক্ষতি হয় তা নয়, জাতীয় অর্থনীতিরও অপচয় ঘটে। উদাহরণস্বরূপ ইস্পাত কারখানাগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এর জন্যে কয়লার শুধুমাত্র নিত্য সরবরাহের উপর নির্ভর করা যায় না, আগে থেকেই প্রচুর পরিমাণ কয়লা সংরক্ষণ করা দরকার। আলোচনা করে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন কারণে কয়লা সরবরাহের ঘাটতি পড়তে পারে। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক কারণে অনেক সময় কয়লা উত্তোলনের তারতম্য ঘটে; যেমন—আমাদের দেশে বর্ষাকালে এবং শীতপ্রধান দেশে শীতকালে কয়লা উৎপাদনের ঘাটতি পড়ে। আবার ঋতুপরিবর্তনে কয়লার খরচ হ্রাস-বৃদ্ধির জন্যে কয়লা-সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, কয়লা খনির শ্রমিকদের ধর্মঘট বা ট্রেড ইউনিয়নের গোলমালের জন্যে সমানভাবে কয়লা সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অনেক সময় যান্ত্রিক গোলযোগ কিংবা পরিবহন ব্যবস্থার অসুবিধার জন্যে শিল্পাঞ্চলে কয়লার ঘাটতি পড়ে। এই সব কারণে স্বাভাবিক ও সুস্থ ব্যবস্থা চালু রাখতে হলে কয়লা-সংরক্ষণ শিল্পক্ষেত্রে একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গস্বরূপ বলেই বিবেচনা করতে হয়।

কিন্তু এই কয়লা-সংরক্ষণে অতিরিক্ত খরচ বাদেও যেটা সর্বপ্রধান অন্তরায়, তা হলো কয়লার স্বতঃপ্রজ্বলন (Spontaneous combustion of coal)। এছাড়া আরও একটা অসুবিধা এই যে, কিছুদিন রেখে দেবার ফলে কয়লার তাপমান (Calorific value) কমে যায়। তবে এটা কয়লার মানের উপর নির্ভর করে। যে সব কয়লায় উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ বেশী, তার তাপমান তত বেশী কমে। আবার শিল্পক্ষেত্রে স্থানাভাবজনিত অসুবিধার জন্যে কয়লা-সংরক্ষণ বেশ কষ্টকর।

এইবার আলোচনা করা যাক, স্বতঃপ্রজ্বলন কি এবং কেন হয়? পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রচুর পরিমাণ কয়লা যদি অনেক উঁচু করে বেশ কিছুদিন ফেলে রাখা হয়, তবে সময় সময় এতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। কোন রকম আগুনের সংস্পর্শ ব্যতিরেকেই এই রকম দুর্ঘটনার বহু সংবাদ পাওয়া গেছে। এর প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, বাতাসের সংস্পর্শে কয়লার জারণ-প্রক্রিয়াই (Oxidation of coal) এর জন্যে দায়ী। পাইরাইট হিসাবে কয়লার মধ্যে যে সালফার আছে, বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে তার মৃদু দহন চলে, ফলে কিছু পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়। এই উত্তাপই কয়লার দহনে সহায়তা করে। আবার বেশ কিছুদিন পড়ে থাকবার পর কয়লার স্তূপের মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এলে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু কয়লা তাপের কুপরিবাহী বলে এই উদ্ভূত তাপ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়তে পারে না। তাই কয়লার স্তূপের স্থানে স্থানে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপ যখন কয়লার প্রজ্বলন তাপমাত্রা (Ignition temp.) অতিক্রম করে, তখনই

অগ্নিকাণ্ড ঘটে। কয়লার মধ্যে জারণ-প্রক্রিয়া যত দ্রুতগতিতে চলে, ততই উষ্ণতা বাড়তে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রথম দিকে বিক্রিয়ার হার (Reaction kinetics) কম থাকে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এর অক্সিজেন শোষণ করবার ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং সময় সময় দু-তিন গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। ফলে, জারণ-প্রক্রিয়াও সমান তালে বাড়তে থাকে এবং কয়লার স্বতঃপ্রজ্বলন ত্বরান্বিত হয়। জানা গেছে যে, প্রতিপাউণ্ড বাতাস শোষণের ফলে কয়লার মধ্যে প্রায় ১০ বি টি ইউ. তাপ উদ্ভূত হয়।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক আবার কয়লার মধ্যে খনিজ অঙ্গারের উপস্থিতিকে স্বতঃপ্রজ্বলনের জন্যে দায়ী করেছেন। তাঁদের মতে, এগুলি কয়লাকে ভঙ্গুর করে ফেলে, ফলে তাপ সঞ্চালন ঠিকমত হয় না। আবার এই জাতীয় কয়লার গ্যাস শোষণের ক্ষমতা সাধারণ কয়লার চেয়ে বেশী বলে বেশী পরিমাণ গ্যাসের মধ্যে সঞ্চিত হয়। এই গ্যাসই অগ্নি প্রজ্বলনে সহায়তা করে।

এইবার আলোচনা করা যাক, কি কি জিনিসের উপর স্বতঃপ্রজ্বলন নির্ভর করে।

১। পারিপার্শ্বিক উষ্ণতা—যদি প্রাথমিক অবস্থাতেই কয়লা বা তার পারিপার্শ্বিক উষ্ণতা বেশী থাকে, তবে স্বাভাবিকভাবেই স্বতঃপ্রজ্বলন ত্বরান্বিত হয়।

২। কয়লার প্রকৃতি—যদি কয়লার মধ্যে লিগ্‌নাইট, বিটুমিনাস এবং স্বল্প উদ্বায়ী বিটুমিনাসের পরিমাণ বেশী থাকে, তবে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা বাড়ে। বিজ্ঞানী কেয়লের মতানুসারে, গুঁড়া লিগ্‌নাইট ১৫০° সে, গ্যাসকোল ২০০° সে, কোক ২৫০° সে. এবং অ্যানথ্রাসাইট কোল ৩০০° সেন্টিগ্রেডে প্রজ্বলিত হয়। তাই কয়লার মধ্যে যদি অ্যানথ্রাসাইট বেশী থাকে অথবা লিগ্‌নাইট কম থাকে, তবে সেই কয়লা নিরাপদে সংরক্ষণ করা যায়। সাধারণভাবে কয়লার র‍্যাঙ্ক যত বাড়ে, তার মধ্যে উদ্বায়ী পদার্থ এবং জলীয় অংশ তত কমে, ফলে প্রজ্বলন তাপমাত্রাও বাড়ে। তাই স্বতঃপ্রজ্বলন কয়লার পেট্রোগ্র্যাফিক্যাল ধর্মের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

৩। কয়লার বিশুদ্ধতা—পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে যে, বিশুদ্ধ কয়লা বাতাসের সংস্পর্শে তাড়াতাড়ি জারিত হয়।

৪। সালফার জাতীয় পদার্থের উপস্থিতি—পাইরাইট বাতাসের সংস্পর্শে জারিত হয়ে জলীয় বাষ্পের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করে। কয়লার স্তূপের মধ্যে এই অ্যাসিড তৈরি হওয়ায় প্রচণ্ড তাপের উদ্ভব হয়, ফলে অগ্নিকাণ্ড ঘটবার আশঙ্কা থাকে।

৫। কয়লার আকার—বড় আকারের কয়লার মধ্যে আগুন লাগবার সম্ভাবনা কম থাকে, কারণ এর মধ্যে সহজেই তাপ চলাচল করতে পারে। কিন্তু গুঁড়া কয়লা অতি সহজেই জমাট বেঁধে যায় বলে তাপ সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে। উপরন্তু গুঁড়া কয়লার তলপরিমাপ (Surface area) বেশী বলে বেশী পরিমাণ বাতাস শোষিত হয়। তার ফলে জারণ-প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

৬। শোষিত গ্যাসের উপস্থিতি—সঞ্চিত গ্যাসের পরিমাণ কয়লার মধ্যে বেশী থাকলে সহজেই স্বতঃপ্রজ্বলন ঘটতে পারে। বিশেষ করে যদি দাহ্য গ্যাস, যেমন—মিথেন ইত্যাদি থাকে, তবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা জটিল হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে কয়লার মধ্যে প্রতি পাউণ্ডে ০·০২ কিউবিক ফুট মিথেন শোষিত হতে পারে।

৭। জলীয় বাষ্প—কয়লার মধ্যে জলীয় বাষ্প বেশী পরিমাণে থাকলে স্বতঃপ্রজ্বলন তাড়াতাড়ি হয়; কারণ এর উপস্থিতি কার্বন এবং পাইরাইটের জারণ-প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

৮। অক্সিজেন সরবরাহ—অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে জারণ-ক্রিয়া দ্রুত হয়, ফলে অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা বাড়ে।

৯। কয়লার চাপ—যদি কয়লার চাপ বেশী হয়, তবে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দ্রুত অগ্নিকাণ্ড ঘটতে সহায়তা করে। তবে এই চাপের পরিমাণ কত এবং কিভাবে কাজ করে, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি।

১০। সংরক্ষণ কাল—যদি কোন কয়লা তিন মাসের বেশী সময় সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে, তবে তার স্বয়ংপ্রজ্বলন ক্ষমতা কমে যায়। কারণ এই সময়ের মধ্যে ঐ কয়লায় জারণ-ক্রিয়ার ফলে অসম্পৃক্ত যৌগগুলি নিঃশেষিত হয়ে যায়।

১১। সংরক্ষণ স্থান—এই স্থানটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার এবং উন্মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কারণ খনিজ তৈল, গ্রীজ অথবা কোন দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি কয়লার স্বতঃপ্রজ্বলন ত্বরান্বিত করে।

কয়লার স্বতঃপ্রজ্বলন পরীক্ষা করবার জন্যে কোন্ শ্রেণীর কয়লা সংরক্ষণের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী, তা নির্ধারণের অনেক পদ্ধতিই প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বৃটিশ পদ্ধতিটি সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা করবো।

এতে কয়লার নমুনা নিয়ে একটা চুল্লীতে রাখা হয় এবং চুল্লীর প্রাথমিক উষ্ণতা থার্মোমিটারের সাহায্যে মাপা হয়। এইবার এর ভিতর দিয়ে অক্সিজেন পাঠানো হতে থাকে এবং কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর উষ্ণতা দেখা হয়। পরীক্ষার ফলাফল একটি রেখাচিত্রে (১নং চিত্র) আঁকা হয়। যদি এতে দেখা যায় যে, ৬০ মিনিট পরে উষ্ণতা হঠাৎ বেড়ে যায়, তবে চুল্লীর প্রাথমিক উষ্ণতাই ঐ কয়লার স্বতঃপ্রজ্বলন নির্দেশ করে।

এই ভাবে কয়লার বিভিন্ন নমুনা নিয়ে চুল্লীতে পরীক্ষা করবার সময় প্রাথমিক উষ্ণতা এমনভাবে ঠিক করা হয়, যাতে ৬০ মিনিট অক্সিজেন পাঠাবার পর উষ্ণতা হঠাৎ বেড়ে যায়। বিভিন্ন কয়লার ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক উষ্ণতা বিভিন্ন। যে সব কয়লার এই প্রাথমিক উষ্ণতা ১২৫° সে.-এর কম, সেগুলিকে সংরক্ষণ করা বিপজ্জনক। আবার যে সব কয়লার ঐ উষ্ণতা ১৬০° সে.-এর বেশী, সেগুলি নিরাপদে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

১নং চিত্র

কয়লা সংরক্ষণের জন্যে তাই কতকগুলি

সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার: (১) জারণ-প্রক্রিয়া বন্ধ করবার জন্যে কয়লা জলের নীচে রাখা যেতে পারে। কিন্তু এর প্রধান অসুবিধা হলো এই যে, একে আবার প্রয়োজনমত শুকিয়ে নেওয়া দরকার। তাই এতে খরচ পড়ে বেশী। (২) একই আকারের কয়লা সংরক্ষণ করা—কারণ, ছোট এবং বড় সাইজের কয়লার সংমিশ্রণে তাপ চলাচল ব্যাহত হয়। (৩) কয়লার স্তূপের উচ্চতা কম রাখা—এতে চাপ কম থাকে এবং তাপ সঞ্চালন দ্রুত হয়। (৪) বাইরের উত্তপ্ত বস্তুর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখা।

এইবার দেখা যাক, কয়লা-সংরক্ষণে এর কি কি ধর্ম কিভাবে প্রভাবিত হয়। বেশী দিন থাকবার ফলে কয়লার তাপমাত্রা (Calorific value) কমে যায়—একথা আগেই বলেছি। সাধারণতঃ এই ক্ষয়ের পরিমাণ ২-১০% এবং কয়েক মাসের মধ্যেই এই ক্ষয় সাধিত হয়। এরপর আর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। বিজ্ঞানী পার মনে করেন যে, উষ্ণতা যদি ১৮০° ফাঃ-এর বেশী না হয়, তবে এই ক্ষয় খুবই কম, কারণ ২০০° ফাঃ-এর নীচে CO_2 বের হতে পারে না। তাঁর মতে, তাপমাত্রা কমে যাবার প্রধান কারণ, অক্সিজেন শোষিত হওয়া।

তাই দেখা যাচ্ছে যে, কয়লা-সংরক্ষণের ব্যবস্থা শিল্পক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সার্থক রূপায়ণের উপরই নির্ভর করছে শিল্পের নিরাপত্তা এবং সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখবার ব্যবস্থা।

বিজ্ঞান-সংবাদ

মিনি-জেট

জেট-চালিত অতি হাল্কা বিমান এখন প্রায় বাস্তব জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের সর্বাধুনিক মিনি-জেট উদ্ভাবন করেছেন বলে একটি বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি দাবী করছেন।

কভেন্টির এই কোম্পানীর নাম রোভার গ্যাস টারবাইন্‌স্ লিমিটেড। এঁদের উদ্ভাবিত জেটটি দৈর্ঘ্যে ২২¾ ইঞ্চি, প্রস্থে ১১ ইঞ্চিরও কম এবং গভীরতায় মাত্র ১২ ইঞ্চি। সব সরঞ্জাম মিলিয়ে এটির ওজন মাত্র ৪৩ পাউণ্ড।

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম জেট স্থুটির মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা জটিল। 'টি-জে ১২৫' নামে এর নতুন ইঞ্জিনটি মাত্র ছ-মাসে তৈরি করা হয়েছে।

রোভার গ্যাস টারবাইনের জনৈক মুখপাত্র জানান, মিনি-জেট ইঞ্জিন টার্বো-প্রপ বা কেবল জেটচালিত হাল্কা বিমানে ব্যবহার করা চলবে।

এই ইঞ্জিনের জ্বালানী খরচ একটি শক্তিশালী স্পোর্টস্ কারের জ্বালানী খরচের সমান এবং এটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে ২,০০০ পাউণ্ডের মত।

নতুন ভূগর্ভস্থ রেলপথে ট্রেন চালাবে ইলেকট্রনিক 'মস্তিষ্ক'

লণ্ডনের নতুন ভূগর্ভস্থ রেলপথে ড্রাইভারের বদলে ট্রেন চালাবে ইলেকট্রনিক 'মস্তিষ্ক'।

ট্রেন অপারেটরের কাজ হবে গোটা দুই বোতাম টেপা; একটি টিপবেন গাড়ীর দরজা বন্ধ করবার জন্যে এবং আর একটি টিপবেন ইলেকট্রনিক 'মস্তিষ্ক' চালু করবার জন্যে।

গাড়ীর যাত্রা শুরু করবার বোতামটি টেপার

সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা তার কাজ সুরু করে দেয়।

মাছ তাজা রাখবার উপায়

প্রোটিন খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বর্তমানে বহু দেশই উদ্যোগী হয়েছেন। প্রোটিন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির একটা উপায় হলো—সমুদ্র, হ্রদ, নদী, পুকুর ইত্যাদি থেকে বেশী করে মাছ ধরা অথবা পুকুর বা অন্য জলাশয়ে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়, এমন মাছের চাষ করা।

সাধারণতঃ জনবসতির কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে মাছ ধরবার উৎসাহ দেওয়া হয়। কারণ, তাহলে মাছ ধরবার অল্প সময়ের মধ্যেই তা সস্তায় বিক্রয় করা যায়। অনেক স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিটিয়েও কিছু মাছ বাড়তি থাকে, কিন্তু সেগুলি নষ্ট হবার আগে অন্যান্য বাজারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না।

এটি এমন একটি সমস্যা, যা নিয়ে লণ্ডনের ট্রপিক্যাল প্রোডাক্টস ইনষ্টিটিউট (TPI)-এর ফ্রেশ ফুড্‌স্ সেকশন গবেষণা করছেন। ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে এই নতুন সেকশনটি খোলা হবার পর থেকে উগাণ্ডা, তানজানিয়া, কেনিয়া, মালাউই, ইন্দোনেশিয়া, ব্রেজিল এবং অন্যান্য ক্যারিবিয়ান দেশ থেকে প্রাপ্ত মাছ ধরা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

বর্তমানে ইনষ্টিটিউট তাঁদের লণ্ডনের লেবরেটরিতে মধ্য আফ্রিকা থেকে আনা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মাছের চাষ করছেন। কিভাবে মাছকে সবচেয়ে ভালভাবে খাদ্যোপযোগী রাখা যায়, তার সকল পন্থাগুলিই পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ঠাণ্ডা এলাকার মাছ নিয়ে এই জাতীয় পরীক্ষা এর আগেই করা হয়েছে। কিন্তু নিরক্ষীয় অঞ্চলের মাছ সম্পর্কে বিশেষ তথ্য এপর্যন্ত সংগ্রহ করা হয় নি।

উগাণ্ডা তার ফিসারিজ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট সম্প্রসারণের জন্যে একজন বিশেষজ্ঞ চেয়ে পাঠান এবং টি-পি-আই একজন প্রবীণ মৎস্য-বিশেষজ্ঞকে সেখানে প্রেরণ করেন। এই প্রবীণ বিশেষজ্ঞ শুধু উন্নত পদ্ধতিতে মাছ ধরা সম্পর্কেই পরামর্শ দেবেন না, উগাণ্ডার হ্রদ ও নদীগুলি থেকে বহুদূরে অবস্থিত অঞ্চলে মাছ বিক্রয় করবার পথ নির্দেশও করবেন।

ধরা পড়বার পরে শ্রিম্প মাছের গায়ে কেন কালো দাগ দেখা দেয়, সে বিষয়ে গবেষণার জন্যে ব্রেজিলের সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ফ্রেশ ফুড্‌স্ সেকশন সহযোগিতা করছেন। কোন প্রতিষেধক উপায় আবিষ্কৃত হলে তা বহু দেশেরই কাজে লাগবে।

সূর্যের গ্যাসাবরণের আলোকচিত্র

মানুষ এই প্রথম সূর্যের করোনা অর্থাৎ সূর্যের চতুর্দিকস্থ গ্যাসাবরণের ত্রিমাত্রিক ছবি দেখতে পাবে। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির তেজস্ক্রিয়ার আলোকচিত্র গ্রহণরত একটি মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে অনেক তথ্য পৃথিবীতে পাওয়া গেছে। আলোকচিত্র গ্রহণ করছে অরবিটিং সোলার অবজারভেটরী (ও. এস. ও-৪)। এই উপগ্রহটি ১৯৬৭ সালের ২৪শে অক্টোবর থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রগুলিতে তার পর্যবেক্ষণের ফলাফল পাঠাতে আরম্ভ করেছে। প্রতিদিন ঐ কৃত্রিম উপগ্রহটি প্রায় ১৫০টি আলোকচিত্র পাঠায়।

ফসল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্যসহ নানাবিধ উদ্ভিদের উৎপাদন দ্বিগুণিত করবার এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। উদ্ভিদের চতুর্দিকস্থ বায়ুমণ্ডলে অক্সি-

জেনের পরিমাণ হ্রাস করে এই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করেছেন কার্নেগী ইনষ্টিটিউসনের একদল বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীদের নেতৃত্ব করেন বিখ্যাত সুইডিশ উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী ডাঃ ওলী বোর্কম্যান। ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ হলো ২১ শতাংশ। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় ডাঃ বোর্কম্যান প্রথমে অক্সিজেনের পরিমাণ ৫ শতাংশ ও পরে ২.৫ শতাংশ হ্রাস করেছিলেন।

মহাকাশ-সন্ধানী উপগ্রহ ও. জি. ও-৫

যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি অত্যন্ত জটিল যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি মহাকাশ-সন্ধানী উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছে। উপগ্রহটির নাম অরবিটিং জিওফিজিক্যাল লেবরেটরি (কক্ষ পরিক্রমারত ভূপদার্থ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত মানমন্দির) বা ও. জি. ও-৫। উপগ্রহটির মাধ্যমে ২৫টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদিত হবে। ও. জি. ও-৫ প্রথমে নীচু কক্ষপথে পৃথিবী পরিক্রমা করবার পর ডিম্বাকার কক্ষপথ অবলম্বন করে। এই ডিম্বাকার পথে এটি পৃথিবীর এত দূরে যাচ্ছে, যা দূরত্বের হিসাবে চন্দ্রের দূরত্বের এক তৃতীয়াংশ। গত ২২শে জানুয়ারী চন্দ্রলোকে যাত্রার মহড়া হিসাবে অ্যাপোলো যানের সার্থক মহাকাশ পরিক্রমার পর যুক্তরাষ্ট্র এই উপগ্রহটি মহাকাশে প্রেরণ করেছে।

প্রাচীনতম ফসিল

চণ্ডীগড় থেকে পি. টি. আই. ও ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—চণ্ডীগড়ের নিকট শিবালিক পাহাড়ে পাওয়া একটি ফসিলের ভগ্নাবশেষ নিয়ে যে গবেষণা হচ্ছে, তা সফল হলে ডারউইনের বিবর্তনবাদ গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে।

চণ্ডীগড়, ইয়েল (বিশ্ববিদ্যালয়) নামে একটি প্রকল্প এই গবেষণা চালাচ্ছেন। পরিবহন ও জাহাজী মন্ত্রী ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। রেমাপিথেকাস নামে পরিচিত এই ফসিলটি ১৯৩২ সালে একদল আমেরিকান বিজ্ঞানী শিবালিক পাহাড়ে আবিষ্কার করেছিলেন।

ফসিলটি যদি মানুষের দেহাবশেষ বলে প্রমাণিত হয়, তবে মানুষের আবির্ভাব কাল ২০ লক্ষ বছর থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ বছরের মধ্যে কোন এক সময়ের বলে ধার্য হতে পারে।

হিমাচল প্রদেশে বিলাসপুরের প্রায় ২৩ মাইল উত্তর-পূর্বে এই গবেষণা প্রকল্প স্থাপিত। এর ব্যয় বহন করছেন স্মিথ্‌সোনিয়ান ফরেন কারেন্সি প্রোগ্রাম ও মার্কিন জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থা।

ডাঃ রাও প্রকল্পের উদ্বোধনী ভাষণে এটিকে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সহযোগিতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলে উল্লেখ করেন।

শিবালিক অঞ্চলে যে ফসিল পাওয়া গেছে, তা উপরের ও নীচের চোয়াল। এগুলি এমন কোন মানুষের চোয়াল বলে মনে হয়, যার বয়স হবে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ বছর। বর্তমানে মানুষের আবির্ভাব ২০ লক্ষ বছর আগে হয়েছিল বলে ধরা হয়।

শিবালিক পাহাড়ে ঐ রকম আরও চোয়াল পাওয়া যায় কিনা, তার সন্ধান করতে সম্প্রতি একদল নৃতাত্ত্বিক অভিযানে বেরিয়েছেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই. এল. সাইমন্স এই দলের নেতৃত্ব করছেন। তিনি বলেন, এপর্যন্ত যত ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে শিবালিকের ফসিলই প্রাচীনতম।

পুস্তক পরিচয়

মাটি ছেড়ে আকাশে—শ্রীগোলকেন্দু ঘোষ; বিচিত্রা প্রকাশন—১৮, রমানাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৯। পৃঃ ১৩৮; মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

মানুষের অক্লান্ত সাধনার ফলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, মহাকাশযাত্রায় প্রাথমিক সাফল্য তার মধ্যে অন্যতম। অদূর ভবিষ্যতেই মানুষের পক্ষে চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহে যাওয়া সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন। মানুষের আকাশ-ভ্রমণ এবং মহাকাশযাত্রার পিছনে রয়েছে বিচিত্র ইতিহাস। আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার এই ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, আকাশযানের ক্রমোন্নতি, মহাকাশযাত্রায় উদ্দেশ্যে রকেট উদ্ভাবন ও তার ক্রমবিকাশ, রকেটের সাহায্যে কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন, মানুষের চন্দ্রপৃষ্ঠে অভিযান ও গ্রহান্তর পরিভ্রমণের পরিকল্পনা এবং প্রসঙ্গতঃ সৌরজগতের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বিবরণ চিত্র সহযোগে সরল ভাষায় আলোচনা করেছেন। বইখানি ছোট-বড় প্রত্যেকের কাছেই আদৃত হবে বলে আশা করি। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

ক্যালেণ্ডারের কাহিনী—অজিত সেন; গ্রন্থবিতান, কলিকাতা—২৬; মূল্য—দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক আদিম যুগ থেকে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্যালেণ্ডার কিভাবে বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছে, তার সুদীর্ঘ কাহিনী কিশোরদের কাছে বলবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর বলবার ভঙ্গী সহজ, সরল ও সাবলীল। বইটি পড়ে ছোটরা দেশ-বিদেশের ক্যালেণ্ডার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে। ভারত সরকার শকাব্দের ভিত্তিতে সর্বভারতের জন্যে যে বর্ষপঞ্জী গণনা প্রবর্তন করেছেন, গ্রন্থকার তারও পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন বইটিতে। ভারতের পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির প্রাক্তন সদস্য-সম্পাদক শ্রীনির্মল চন্দ্র লাহিড়ী বইটির ভূমিকা লিখেছেন। বইখানি ছোটদের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমরা মনে করি।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল—১৯৬৮

২১শ বর্ষ, ঃ ৪র্থ সংখ্যা

রিহান্দ বাঁধ, নীচে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

ফটো : ইউ, এস, আই, এস-এর সৌজন্যে

করে দেখ

জলে ভাসানো সোলার ছিপি

টেবিলের উপর একটা গ্লাস বসিয়ে তার কানার প্রায় কাছাকাছি জল ভর্তি কর। এবার ছোট্ট একটা সোলার ছিপি নিয়ে বন্ধুদের কাউকে বল—গ্লাসটার কোন অংশ স্পর্শ না করে সে সোলাব ছিপিটাকে গ্লাসের জলের ঠিক মধ্যস্থলে ভাসিয়ে রাখতে পারে কিনা। যতই চেষ্টা করুক, কোন রকমেই ছিপিটাকে গ্লাসের মধ্যস্থলে ভাসিয়ে রাখতে পারবে না—প্রত্যেকবারই ছিপিটা সরে গিয়ে গ্লাসটাব একপাশে লেগে থাকবে।
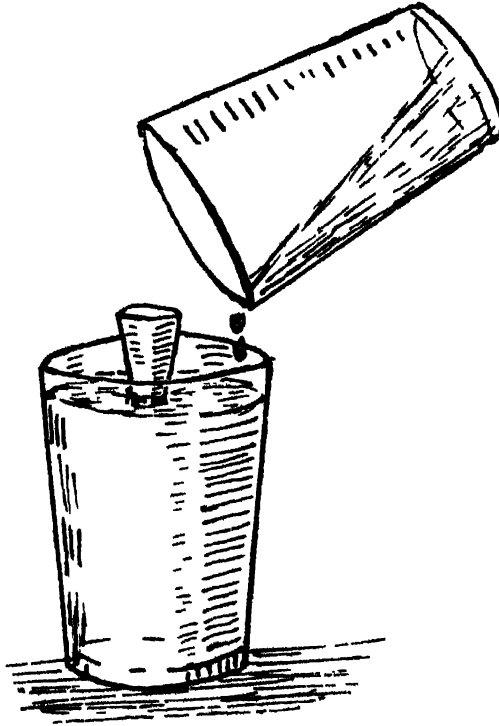
এবার তোমার বন্ধুকে একটা সহজ উপায়ের কথা বলে দিতে পার, যাতে ছিপিটা অনায়াসেই জলের ঠিক মধ্যস্থলে ভেসে থাকবে। উপায়টা আর কিছুই নয়—ঐ গ্লাসের জলে আর একটা গ্লাস থেকে অতি সন্তর্পণে আস্তে আস্তে এমনভাবে জল ঢাল, গ্লাসের জলটা যেন কানা ছাড়িয়ে সামান্য একটু উপরে উঠে যায়। এর ফলে জলের উপরিতলটা পৃষ্ঠটানের জন্যে একটু কুব্জাকার ধারণ করবে। কাজেই তখন সোলার ছিপিটা জলের সর্বোচ্চ স্থান অর্থাৎ ঠিক মধ্যস্থলে গিয়েই অবস্থান করবে।

—গ—

ন্যাপ্থালিন

ন্যাপ্থালিন নামের সঙ্গে আজ আমরা সুপরিচিত। পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গের হাত থেকে জামা-কাপড় ও কাগজপত্র রক্ষা করবার জন্যে ছোট ছোট গোলাকার মার্বেলের গুলির মত সাদা রঙের দ্রব্যটি আজ আমাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৮১৯ সালে বিজ্ঞানী গার্ডেন কয়লা থেকে প্রাপ্ত আলকাত্রায় এই পদার্থটির উপস্থিতি লক্ষ্য করেন এবং ১৮২১ সালে বিজ্ঞানী কিড্ এই রাসায়নিক পদার্থটি আলকাত্রা থেকে পৃথক করতে সক্ষম হন এবং তিনিই এই পদার্থটিকে ন্যাপ্থালিন নামে অভিহিত করেন। গ্যাস শিল্পের প্রথম অবস্থায় এই ন্যাপ্থালিনকে নিয়ে বেশ দুর্ভাবনায় পড়তে হয়েছিল। ন্যাপ্থালিনের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবহার তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। সুতরাং কয়লা থেকে পাতিত আলকাত্রায় যে প্রচুর পরিমাণ ন্যাপ্থালিন পাওয়া যেতো, সেগুলি প্রায় অব্যবহার্যভাবে পড়ে থাকতো। বর্তমানে রাসায়নিক বাণিজ্যে জৈব কাঁচা মাল হিসাবে ন্যাপ্থালিনের ব্যবহার এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

বর্তমানে ন্যাপ্থালিনের বাণিজ্যিক উৎস, বিটুমিনাস কয়লা থেকে প্রাপ্ত এক প্রকার গ্যাস।

বিটুমিনাস কয়লাকে যদি অত্যধিক তাপে উত্তপ্ত করা যায়, তবে বিটুমিনাসের চেয়ে ভাল জাতের কয়লা পাওয়া যায় এবং তার সঙ্গে পাওয়া যায় কোক ওভেন গ্যাস। এই গ্যাসকে ঠাণ্ডা করবার পর যে তরল আলকাত্রা পাওয়া যায়, সেই আলকাত্রাই ন্যাপ্থালিনের প্রধান উৎসরূপে ব্যবহৃত হয়। কয়লার গুণগত পার্থক্য এবং পাতনের বিভিন্ন অবস্থায় আলকাত্রায় শতকরা ৫ ভাগ থেকে ১১ ভাগ ন্যাপ্থালিন পাওয়া যায়। এই আলকাত্রাকে অনুপ্রেষ পাতন পন্থায় পাতিত করবার ফলে অবশিষ্ট তরল থেকে প্রায় চল্লিশ শতাংশ ন্যাপ্থালিন পাওয়া যায়। খনিজ তেলে যদিও কিছু কিছু ন্যাপ্থালিন পাওয়া যায়, কিন্তু ব্যবসায়ের প্রয়োজনে সেগুলি থেকে ন্যাপ থালিন তৈরি হয় না।

পেট্রোলিয়াম থেকে গ্যাসোলিন তৈরি করবার সময় এই ন্যাপ্থালিনকে উপজাত দ্রব্যরূপে পাওয়া যায় এবং শোনা যায় যে, কতকগুলি আমেরিকান তৈল কোম্পানী ন্যাপ্থালিন তৈরি করবার এই পন্থাটির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ন্যাপ্থালিনকে সাধারণতঃ ব্যবহার করা হতো

কীট-পতঙ্গনাশক দ্রব্যরূপে। গোশালা, ফার্ম, কৃষি ইত্যাদিতে ন্যাপ্‌থালিন ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে বাণিজ্যিক জৈব যৌগ হিসাবে ন্যাপ্‌থালিন ব্যবহার করা হয়।

ন্যাপ্‌থালিনকে বায়ুতে জারিত করবার ফলে তৈরি হয় থ্যালিক অ্যানহাই-ড্রাইড। এই থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইডকে প্লাষ্টিক শিল্পে এবং রেসিনের এক অপরিহার্য দ্রব্যরূপে ব্যবহার করা হয়।

ন্যাপ্‌থালিনকে হাইড্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে অত্যধিক তাপমাত্রায় যুক্ত করবার ফলে যে জৈব যৌগিক পাওয়া যায়, ইউরোপে আজকাল উন্নত ধরণের মোটরের তেলরূপে সেটির ব্যবহার হচ্ছে।

ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে ন্যাপ্‌থালিন সালফোনিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই যৌগটিকে সাংশ্লেষণিক ভেষজরূপে ব্যবহার করা হয়। এই ন্যাপ্‌থালিন সালফোনিক অ্যাসিডকে যদি অ্যালকোহলের সঙ্গে সাল-ফিউরিক অ্যাসিড ও অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড অনুঘটকের সংস্পর্শে উত্তপ্ত করা যায়, তবে যে তরল যৌগটি তৈরি হয়—তা ব্যবহৃত হয় কৃত্রিম সাবান জাতীয় দ্রব্যরূপে (Wetting agent and Emulsifier)।

তুলাবীজ ও সয়াবিন থেকে গ্লিসারল পৃথক করবার কাজে ন্যাপ্‌থালিন ব্যবহার করা হয়।

ন্যাপ্‌থালিনকে চর্ম শিল্পেও ব্যবহার করা হয়। ন্যাপ্‌থালিনকে বিশেষ উপায়ে হাইড্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে যুক্ত করে ডেকালিন এবং হেক্সালিন নামে দুইটি যৌগ পাওয়া যায়। বিশেষ দ্রাবক হিসাবে এই যৌগ দুটির পরিচয় আছে। আজকাল ন্যাপ্‌থালিনকে বস্ত্রশিল্পের রাসায়নিক দ্রব্যরূপেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

ন্যাপ্‌থালিন এবং এর যৌগগুলির ব্যবহার বর্তমান বিশ্বে মানুষের নানা কাজে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। হয়তো এমন দিন আসবে, যখন ন্যাপ্‌থালিনের আরো নতুন নতুন ব্যবহার আবিষ্কৃত হবে এবং তা মানব সমাজকে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছাবার সহায়ক হবে।

হিরণ্ময় নাথ

সোনার কথা

প্রস্তরযুগ বলতে আমরা বুঝি—যে যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, জিনিষপত্র ব্যবহার করতো। কিন্তু স্বর্ণযুগ বলতে ইতিহাসে বোঝায় একটা শ্রেষ্ঠ সময়, যখন সব বিষয়ে একটা সভ্যতা বা জাতি বা দেশ উন্নতির চরমশিখরে ওঠে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সোনা কথাটার সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বের সম্বন্ধ রয়েছে।

সোনা শুধু ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নয়—ব্যবহারের দিক দিয়েও খুবই প্রাচীন। খুব প্রাচীন গ্রীক গাথায়, বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া মিশরীয় প্যাপিরাসে লেখা কাহিনীতে সোনার উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টজন্মের ৬০০ বছর আগেও এশিয়া মাইনরের লিডিয়াতে রাজার ছবিসমেত সোনার শীলমোহর ব্যবহারের প্রথা চালু ছিল। এর জের কিছুদিন আগে পর্যন্ত কয়েকটি দেশে চলেছিল। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, পৃথিবীর প্রাচীনতম সোনার খনিগুলিতে খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বছর আগেও কাজ চলতো।

সোনার এত গুরুত্বের কারণ দুটি। সবাচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, এর অপরিবর্তনীয়তা। আর দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের টাকার মূল্যমান স্থির রাখবার উপায় হিসাবে সোনার প্রয়োজনীয়তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত।

সোনার আরও অনেক গুণ আছে, যা অন্য কোনও ধাতুর নেই। যেমন—সাধারণ অ্যাসিডে এর কোনও ক্ষতি হয় না—যার জন্যে একে Noble metal বলা হয়। একমাত্র ক্লোরিন, একোয়া রিজিয়া (নাইট্রিক আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের এক বিশেষ সংমিশ্রণ) আর কয়েকটি বিষাক্ত সায়ানিক অ্যাসিড ছাড়া আর কিছুতেই এই ধাতু দ্রবণীয় নয়। সোনাকে পিটিয়ে ১ ইঞ্চির ২৫০,০০০ ভাগ পাতলা করা সম্ভব। এক আউন্স সোনা থেকে ৩২ মাইল লম্বা তার করা যায়। বৈশিষ্ট্যের জন্যে খুব অল্প পরিমাণ সোনাও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধরা শক্ত নয়। আধুনিক রসায়নবিদেরা অন্য ধাতুর ১,০০০,০০০,০০০ অণুর সঙ্গে সোনার একটি অণু মেশানো থাকলেও সেটা ধরতে পারেন।

পৃথিবীতে সোনার চাহিদা প্রচুর। এত হাজার বছর ধরে চেষ্টা করে মানুষ আজ পর্যন্ত মাত্র ৫০,০০০ টন সোনা পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে বের করে নিজের কাজে লাগিয়েছে। অবশ্য এখন প্রতি বছরে গোটা পৃথিবীতে আনুমানিক ২০০০ টন সোনা বিভিন্ন খনি থেকে উত্তোলিত হয়। এই পরিমাণের শতকরা ৭০ ভাগ আসে দক্ষিণ আফ্রিকার ১১০০০ ফুটের বেশী গভীর বিখ্যাত র‍্যাণ্ড খনি থেকে। উৎপাদনের দিক থেকে রাশিয়া দ্বিতীয় (মোট উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ)।

সোনার চাহিদা আর মূল্য দেখে মনে হতে পারে, হয়তো বা পৃথিবীতে এই ধাতুটি খুবই কম পাওয়া যায়। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, ভূত্বকের উপাদানের মধ্যে গড়ে শতকরা ০'০০০,০০০৫ ভাগ সোনা আছে। রূপা আছে এর দ্বিগুণ, অথচ চাহিদা আর মূল্যের হিসাবে এই সম্পর্ক মেলানো যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে, সমুদ্রের জলে ১ ঘন কিলোমিটারে ৫ টন সোনা পাওয়া সম্ভব। শুধু পৃথিবীতেই নয়, সূর্যের চতুষ্পার্শ্বের বায়ুমণ্ডলে—এমন কি, উল্কার মধ্যেও সোনার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে পৃথিবীর মানুষের চাহিদা মেটাবার জন্যে সোনার খনি খোলা সম্ভব হবে।

ব্যাঙ্ক আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাগজের টাকার নিয়ামক হিসাবে সোনার প্রয়োজন আধুনিক মানুষের জানা। গহনা হিসাবে এর ব্যবহার কয়েক হাজার বছরের পুরনো। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন শিল্পেও এই ধাতুর ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

অন্য ধাতু থেকে সোনা তৈরি করবার চেষ্টা মানুষ বহু প্রাচীন কাল থেকেই করে আসছে। পরশ পাথরের খোঁজে কতজনেরই না জীবন ব্যর্থ হয়েছে। সেই খোঁজার কিন্তু আজও শেষ হয় নি। আজকের বিজ্ঞানী সাইক্লোট্রন যন্ত্রে পারমাণবিক ভাঙ্গনের সাহায্যে সেই স্বপ্ন সফল করতে প্রয়াসী। হয়তো বিজ্ঞানীর স্বপ্ন একদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে।

শ্রীশিবদাস ঘোষ

মমি

একথা বোধহয় অস্বীকার করা যাবে না যে, আমাদের অনেকেরই মনে মমি সম্বন্ধে একটি ভয়মিশ্রিত কৌতূহল আছে। অবশ্য এটা খুব অস্বাভাবিক নয়, কারণ বিলাতি ছায়াছবিগুলিতে মমির যে সব অলৌকিক কাণ্ড দেখা যায়, তাতে এরকম একটা মনোভাব না হওয়াটাই হয়তো আশ্চর্যের ব্যাপার হতো। সুতরাং স্বভাবতঃই মমি সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা অজ্ঞতা থেকে গেছে।

প্রাচীন মিশরে মমি করবার রীতি প্রথম প্রচলিত হয় ফ্যারাওদের ক্ষেত্রে। ফ্যারাওরা সে দেশে সর্বোচ্চ সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; শুধু দেশের শাসন-কর্তাই নয়, ঈশ্বরের প্রেরিত মহাপুরুষ বলে প্রজারা ফ্যারাওদের সম্মান করতো। তাই তাঁদের মৃত্যুর পর সেই পবিত্র দেহকে নষ্ট করতে না দিয়ে সংরক্ষিত করে

রাখতো নানা পদ্ধতিতে। পরে অবশ্য মিশরের সব লোকের ক্ষেত্রেই আবশ্যিক ভাবে মমি করবার রীতি চালু হয়—এমন কি, কোন বিদেশী পর্যটক মিশরে মারা গেলে তাকেও মমি করে রেখে দেওয়া হতো। একটা হিসাবে দেখা যায়, যীশুখৃষ্ট জন্মাবার তিন হাজার বছর আগে থেকে রোমানদের অভ্যুদয় পর্যন্ত—এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৬৩ কোটি মৃতদেহকে মমি করা হয়। মিশর দেশে মৃতদেহ সংরক্ষণের এই পদ্ধতি কবে প্রচলিত হয়েছিল, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা একমত নন—তবে মোটামুটি হিসাব থেকে বলা যায়, খ্রিশুখৃষ্ট জন্মাবার ৩৮০০ থেকে ৪০০০ বছরের মধ্যে এই প্রথা প্রথম সুরু হয়। সবচেয়ে আধুনিক যে মমির সন্ধান পাওয়া গেছে, সেটি আজ থেকে প্রায় ১২০০ বছর আগেকার।

মমি তৈরির পদ্ধতিটি বেশ কঠিন ও জটিল, কিছুটা কৌতূহলজনকও বটে। এই পদ্ধতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে—প্রথম নতুন আশ্রয়ে যাবার প্রস্তুতি। এই সময় মৃতদেহের অভ্যন্তর ভাগ সম্পূর্ণরূপে বদ্‌লে ফেলা হতো। একটা লোহার রড নাকের মধ্য দিয়ে গলিয়ে মগজ প্রভৃতি বের করে ফেলা হতো, তারপর শরীরের বাঁ-দিকে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ স্থান কেটে সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে পেটের নাড়ীভুঁড়ি বের করে সেই স্থানটিকে পরিষ্কার করে নেওয়া হতো। এতে সময় লাগতো ১৫-১৬ দিন। দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম তেব। সে সময় এক রকম আরক দিয়ে সমস্ত দেহটি ধুইয়ে পরিষ্কার করা হতো। এতে সময় লাগতো ১৯-২০ দিন। তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ের নাম কেসাউ। এটাই সবচেয়ে দরকারী ও জটিল অংশ। নানা দুষ্প্রাপ্য ওষুধপত্রের গুঁড়া ইত্যাদি দেহটির অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে সেটি কাপড়ের আবরণে ঢেকে দেওয়া হতো। এতে সময় লাগতো ৩৪-৩৫ দিন; অর্থাৎ একটি মৃতদেহকে সংরক্ষণের উপযোগী করে তৈরি করতে সময় দরকার হতো ৭০ থেকে ৭২ দিন।

এথেকে বোঝা যায়, একটি মাত্র মমি প্রস্তুত করতে প্রায় আড়াই মাসের মত সময় লাগতো। সেই জন্যে মাঝে মাঝে পেশাদার মমি-প্রস্তুতকারীদের কাছে এক সঙ্গে অনেকগুলি মৃতদেহ জমা হয়ে পড়তো। কখনো কখনো এমনও দেখা যেত—এই সব কারীগরেরা এক সঙ্গে ৫০০ থেকে ৬০০ মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত। এই গোলমালে যাতে এক পরিবারের মৃতদেহ আরেক পরিবারে গিয়ে হাজির না হয়, তার জন্যে প্রত্যেকটি কফিনের উপর সিলভার নাইট্রেট থেকে তৈরি বিশেষ একপ্রকার কালি দিয়ে মৃতের নাম ঠিকানা ইত্যাদি লিখে রাখা হতো। তাছাড়া কাপড়ের আবরণ দিয়ে মৃতদেহ ঢাকা দেওয়া হতো, তারপর কখনো কখনো তৎকালীন রাজার নাম এবং পরিচয়ও লিখে রাখবার রীতি প্রচলিত ছিল। এই আবরণের আরো একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—লিনেনের তৈরি এই আবরণ দেখে মৃতব্যক্তির কৌলিন্য বোঝা যেত;

যেমন—ধনী ও উচ্চ বর্ণের ব্যক্তির মৃতদেহ যে কাপড়ে আবৃত করা হতো, তা হতো খুব পাত্‌লা, কখনো রঙীন লিনেনের, আর দরিদ্র লোকের মৃতদেহের আবরণ হতো সাধারণতঃ মোটা কাপড়ের। এক-একটি মমি আবৃত করতে যে পরিমাণ কাপড় ব্যবহার করা হতো, তা শুনলে আশ্চর্য মনে হবে। কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত একটি মমি থেকে ব্যাণ্ডেজের মত সরু যে কাপড় পাওয়া গেছে, সেটি চার ইঞ্চি চওড়া আর লম্বায় ১২৫০ গজ, অর্থাৎ প্রায় পৌণে এক মাইল।

আজ পর্যন্ত যে সব মমি আবিষ্কৃত হয়েছে, বিশেষজ্ঞদের মতে সেগুলিকে মোটামুটি ছুটি ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম, মিশরের অন্যতম প্রাচীন নগরী মেম্‌ফিসে প্রস্তুত মমি; দ্বিতীয়, থিবিস নগরে তৈরি মমি। প্রথমোক্ত মমিগুলির রং কালো, শুষ্ক এবং গাছের পাতার মত নরম অর্থাৎ তাতে হাত লাগালেই গুঁড়া হয়ে যাবার ভয় থাকে। এই মমিগুলির শরীরের অভ্যন্তরে বিশেষতঃ বক্ষদেশে নানা রকমের মন্ত্রপূতঃ কবচ দেখা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মমিগুলি নমনীয়, কোমল ও হলুদ রঙের। এগুলির প্রস্তুত-প্রণালী এত চমৎকার যে, গায়ের মাংস জীবন্ত মানুষের মতই নরম এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—এমন কি, আঙুলগুলি পযন্ত স্বাভাবিকভাবে ঘোরানো-ফেরানো চলে। এই সব মমির দেহের উর্ধ্বাংশে বক্ষ-অলঙ্কার, হাতে আংটি, গলায় হার, চুড়ির মত গহনা ইত্যাদি প্রচুর দেখা যেত। এই অলঙ্কার-গুলি সোনার তো বটেই, বহু মূল্যবান প্রস্তর দিয়েও তৈরি হতো।

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে মমির সন্ধান পাওয়া গেছে, সেটি খৃঃ পূঃ ৪০০০ বছর আগেকার মেন্‌কারা নামক এক ব্যক্তির। মমিটি বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এটি অক্ষতভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি, টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে বুকের পাঁজর, মেরুদণ্ড, পা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। শরীরের প্রায় কোন অংশেই মাংস নেই বললেই চলে।

মমি করবার ব্যাপারে বহু মজার কাহিনী প্রচলিত ছিল। শোনা যায়, ফ্যারাও, রাজা বা এই শ্রেণীর কোন ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর মমির সঙ্গে তার প্রিয় সেনাপতি, দেহরক্ষক—এমন কি, ঝি-চাকরকেও হত্যা করে একই কবরে মমি করে রাখা হতো। শুধু তাই নয়, সেই কবরের মধ্যে অনেক সময় প্রচুর ধনদৌলত, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদিও রক্ষিত হতো। এই সব জিনিষ সেখানে রাখবার কারণ আর কিছুই নয়, সেই মহামান্য ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গবার পর তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধা বা পরিচর্যার ব্যাঘাত যাতে না হয়, সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা। সে যুগে প্রচলিত নিছক মিথ্যা কুসংস্কারের জন্যে এভাবে অনেক নিরীহ লোককে অনর্থক প্রাণ হারাতে হতো।

মিলতি সেন

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। টাক পড়ে কেন এবং তার প্রতিকার কি?

গোপালচন্দ্র দাস, হাওড়া

প্রঃ ২। ভেষজ-বিজ্ঞানে পারদ কিভাবে ব্যবহৃত হয়?

অনুশ্রী বিশ্বাস, কলিকাতা-৯
মণিরাণী সাধু, কলিকাতা-৬

উঃ ১। মাথার চামড়ার লোমকূপ থেকে চুল বের হয়। শরীর থেকে এই সব লোমকূপে রক্ত সরবরাহ হয়ে থাকে। এই রক্ত সরবরাহ ঠিক থাকলে চুলের কোনও ক্ষতি হয় না। যদি কোন কারণে চুলের গোড়াতে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হয়, তাহলে চুল উঠে যায়। একেই টাকপড়া বলে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, টাক পড়বার কারণ কিছুটা শারীরিক ও কিছুটা মানসিক উত্তেজনাঘটিত। অবশ্য এই বিষয়ে বিভিন্ন দেশে বহু গবেষক গবেষণা করছেন।

টাকপড়ার ব্যাপারে পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা বলেন যে, চামড়ার মধ্যে যে সিবেসাস গ্রন্থি থাকে, সেগুলি বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে। এই সব রাসায়নিক পদার্থ যদি অত্যধিক পরিমাণে তৈরি হয়, তাহলে লোমকূপে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে—এমন কি, রক্ত চলাচল বন্ধও হয়ে যেতে পারে। তাঁরা দেখেছেন যে, টাকওয়ালা লোকের মাথার ঘাম সাদা ইঁদুর বা খরগোসের গায়ে লাগালে কিছু দিনের মধ্যে তাদের লোম ঝরে পড়ে। আরও বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে তাঁরা মন্তব্য করেন যে, সিবেসাস গ্রন্থির অতিরিক্ত ক্ষরণই টাক পড়বার কারণ। তবে কি জন্যে সিবেসাস গ্রন্থির অতিরিক্ত ক্ষরণ হয়, তা জানা যায় নি। মানসিক উত্তেজনার জন্যে যেহেতু স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়, সেহেতু অনুমান করা হয়েছে যে, মানসিক উত্তেজনাই সিবেসাস গ্রন্থির অতিরিক্ত ক্ষরণের জন্যে দায়ী।

ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক বলেন যে, যে সব লোকের মাথায় টাক পড়ে, তাদের মাথার করোটির উপর একটা ক্যালসিয়ামের স্তর থাকে। এই স্তরের জন্যে লোমকূপে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। তাঁরা দেখেছেন যে, করোটির উপর এই স্তর পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কম থাকে। তাই পুরুষের মাথায় স্ত্রীলোক অপেক্ষা বেশী টাক পড়ে। শারীরিক কি কারণে করোটির উপর এই স্তর পড়ে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন।

পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে—ভয়, মানসিক অশান্তি প্রভৃতির সঙ্গে রক্তপ্রবাহ ও গ্রন্থিক্ষরণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে।

অনেক সময় কঠিন চর্মরোগ বা দীর্ঘস্থায়ী কোনও রোগ হলে মাথার চুল উঠে যায়। তবে রোগ ভাল হলে আবার চুল জন্মাতে দেখা যায়। কোন কোন সময় টাক-পড়াটা পুরুষানুক্রমেও চলে। টুপি পড়লে টাক পড়ে—এরকম ধারণাও অনেক লোকের মধ্যে আছে। ত্বক-বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

টাকপড়া বন্ধের কোনও উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। এই বিষয়ে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন। তবে মাথার চামড়ার লোমকূপে ঠিকমত রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা থাকলেই টাক পড়বে না। তার জন্যে নিয়মিতভাবে মাথার চামড়া পরিষ্কার রাখা দরকার। তার সঙ্গে মনকেও দুশ্চিন্তামুক্ত করা দরকার।

উঃ ২। পারদ একটি মৌলিক পদার্থ। অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভেষজ-বিজ্ঞানে পারদের ব্যবহার চলে আসছে। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা-শাস্ত্রেও পারদের তৈরি নানারকম ভেষজের উল্লেখ আছে। অন্যান্য মৌলিক পদার্থের মত পারদেরও অনেক যৌগিক পদার্থ আছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাদের মধ্যে মারকিউরিক ক্লোরাইড, ক্যালোমেল, মারকিউরিক সালফাইড প্রভৃতি খুবই ব্যবহৃত হয়। রোগ-প্রতিষেধক ও জীবাণুনাশক হিসাবে মারকিউরিক ক্লোরাইডের ব্যবহার বহু প্রাচীন কাল থেকেই আছে। মারকিউরিক ক্লোরাইডের সঙ্গে কষ্টিক-ক্ষারের বিক্রিয়ায় হলদে রঙের এক অক্সাইড তৈরি হয়—যা ভেসেলিনের সঙ্গে মিশিয়ে চক্ষুরোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজে লাগানো হয়। মারকিউরিক ক্লোরাইডের পাত্‌লা দ্রবণ আন্ত্রিক রোগ ও অন্য বহু রোগের জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। চোখের কর্ণিয়ার রোগে ক্যালোমেলের গুঁড়া ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া বহু প্রাচীন কাল থেকেই একে জোলাপের কাজে লাগানো হয়েছে। 'মকরধ্বজ' নামে যে কবিরাজী ওষুধটি বাজারে খুবই পরিচিত—তার মধ্যে মারকিউরিক সালফাইড থাকে।

পারদ খুবই বিষাক্ত পদার্থ। সাধারণ তাপেও পারদ থেকে যে বাষ্প ওঠে, তা লোমকূপের মধ্যে দিয়ে ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি করতে পারে। সিফিলিস রোগের প্রতিষেধক হিসাবে পারদের ব্যবহার কিছুদিন আগে পর্যন্তও প্রচলিত ছিল।

এই জাতীয় রোগে পারদের যে লবণ ব্যবহৃত হতো, তার মাত্রা বেশী হলেই শরীরে বিষক্রিয়া সঞ্চারিত হতো। দেহের জলীয় পদার্থের সংস্পর্শে এসে এই সব লবণ আয়নিত হয়ে যায় এবং নির্গত পারদ-অণুসমূহ দেহের প্রোটোপ্লাজমকে আক্রমণ করে। এই অবস্থায় পারদের বিষক্রিয়া কমাবার জন্যে কাঁচা ডিমের মধ্যেকার সাদা অংশ ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ডিমের সাদা অংশ প্রতিবিষের কাজ করে। পারদের

রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতাকে কাজে লাগাবার সময় যাতে দেহকোষের কোনও ক্ষতি না হয়, তার উপায় বের করতে গিয়ে পারদের বহু জৈব রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু কিছুর রোগনাশক ক্ষমতাও আছে অথচ বেশী প্রয়োগে তেমন বিষক্রিয়া দেখা যায় না।

শ্যামসুন্দর দে

বিবিধ

ডাঃ এম. এন. চাটার্জি জন্ম-শতবার্ষিকী ওয়ার্ডের উদ্বোধন

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে এই ওয়ার্ডটি নির্মিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ নিরঞ্জন চাটার্জি।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে (বাঁ দিক থেকে) ডাঃ নিরঞ্জন চাটার্জী, শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ নীহার মুন্সী এবং শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখার্জী

ফটো—শ্রীকার্তিক দাস

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের ডাঃ এম. এন. চাটার্জি স্মারক চক্ষু-চিকিৎসালয়ে ১৯টি বেড সমন্বিত একটি নতুন ওয়ার্ডের উদ্বোধন করেন। ডাঃ চাটার্জির জনকল্যাণে ডাঃ এম. এন. চাটার্জির অতুলনীয় দানের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সভাপতি, প্রধান অতিথি, ডাঃ নারায়ণ

রায় ও শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়। প্রারম্ভে চক্ষু-চিকিৎসালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতি ডাঃ নীহার মুন্সী সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

পরলোকে মহাকাশের প্রথম মানুষ ইউরি গাগারিন

পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গাগারিন গত ২৭শে মার্চ এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

ভ্লাডিমির সারগেভিচ সেরিওগিন নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার কর্নেলের সঙ্গে পরীক্ষা-মূলকভাবে একটি নতুন বিমান চালাবার সময় গাগারিন নিহত হন। কর্নেল সেরিওগিনও নিহত হয়েছেন।

১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল গাগারিন মহাকাশ-যান ভষ্টক-১-এ চড়ে মানুষের মহাকাশ যাত্রার প্রথম পথিকৃৎ হয়ে সারাবিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেন।

পরলোকে অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ চাটার্জি

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ও মানসিক রোগ-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ চাটার্জি ২৬শে মার্চ বণ্ডেল গেট লেভেল ক্রসিং-এ ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়ে মারা গেছেন।

ডাঃ চাটার্জি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল চিকিৎসক হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

চন্দ্রের দিকে সোভিয়েট মহাকাশ-যান

মস্কো থেকে রয়টার এবং এ. পি. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—'আরোহীবিহীন একখানা সোভিয়েট যান জণ্ড-৪ গত ৩রা মার্চ মহাকাশের দিকে উড়ে চলে যায়। লক্ষণ দেখে মনে হয়, মহাকাশ-যানটি চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে আবার পৃথিবীতেই ফিরে এসে ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

কি উদ্দেশ্য নিয়ে মহাকাশ-যানখানা পাড়ি দিল, সরকারী ঘোষণায় তা উল্লেখ করা হয় নি। শুধু মাত্র বলা হয়েছে যে, একটি কৃত্রিম উপগ্রহে ভর করে জণ্ড-৪ মহাকাশে উঠে যায় এবং সেখানে উপগ্রহটিকে রেখে দিয়ে শূন্যলোকের দিকে চলে যায়।

ইতিপূর্বে রাশিয়া অন্যান্য মহাকাশ পরিক্রমার পরীক্ষায় 'পৃথিবীর কাছাকাছি শূন্যলোক বলতে চন্দ্রের আকাশকেই বুঝিয়েছে। তাথেকেই অনুমান করা যায়, এবারও লক্ষ্যস্থল চাঁদ।

নতুন মহাকাশ-যানটির ওজন কত বা সেটার আকৃতিই বা কেমন, সরকারী ঘোষণায় তাও উল্লেখ করা হয় নি।

তবে, একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, জণ্ড-৪ আসলে একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-ঘাঁটি। এর যন্ত্রপাতিগুলি পৃথিবী থেকে কোন নির্দেশ ছাড়াই কাজ করে যাবে।

পঃ জার্মেনীর উকাম মানমন্দিরের বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন, সোভিয়েটের এই নতুন মহাকাশ-যানটি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আবার যাত্রাস্থলেই ফিরে আসবে বলে মনে হচ্ছে। চন্দ্রে মানুষ পাঠাবার প্রস্তুতিপর্বে জণ্ড-৪-এর এই অভিযানের গুরুত্ব অত্যধিক।

তাঁরা আরও বলেছেন, জণ্ড-৪-এর কক্ষপথ সম্পর্কে যে সব তথ্য ধরা পড়েছে, তাথেকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, একটা বড় রকমের কিছু করবে বলেই ওটিকে পাঠানো হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে জণ্ড-৩-এর কথাও উল্লেখ করতে হয়। জণ্ড-৩ সূর্যের দিকে যাবার পথে চন্দ্রের অদৃশ্য দিকের ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। কৃতিত্বের দিক থেকে সেটিও কম ছিল না।

জণ্ড-৪ যে কৃত্রিম উপগ্রহটিতে ভর করে উঠে গিয়েছিল, অনুমান হয়, সেটি এখনও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে।'

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
২৭, পার্ক অ্যাভিনিউ, টালা
কলিকাতা-২

২। দীপক বসু
Radio & Elec Eng. Div.
National Research Council,
Ottawa-7
Canada

৩। আব্দুল হক খন্দকার
East Regional Laboratories
P. C. S. I. R.
Dhanmandi,
Dacca-2
East Pakistan

৪। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র
১৭৪।এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

৫। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর
২, মায়াপাড়া রোড,
কলিকাতা-৫০

৬। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং
৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড,
কলিকাতা-২৯

৭। শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
"স্বস্তিক"
৫০/১, হিন্দুস্থান পার্ক,
কলিকাতা-২৯

৮। রমেশ দাশ
গভর্ণমেন্ট কলেজ অব এডুকেশন,
বর্ধমান

৯। শ্রীরঘুনাথ দাস
গ্রাঃ-আউষবালী, পোঃ-মসাট
জেলা-হুগলী

১০। শ্রীহিরণ্ময় নাথ
১৮৩, রাসবিহারী...

১১। শ্রীশিবদাস ঘোষ
২৮৯।সি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

১২। মিনতি সেন
অবধায়ক/শ্রীপরেশনাথ সেন
ব্যারাকপুর,
২৪-পরগণা

১৩। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ ;
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একবিংশ বর্ষ | মে, ১৯৬৮ | পঞ্চম সংখ্যা

রেডিয়াম আবিষ্কার ও আধুনিক চিকিৎসা-ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ

বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়

১৮৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর মেরী স্কোলো-ডাওস্কা কুরী ওয়ারশ সহরের একটি সামান্য মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পোলাণ্ড তখন নানারকম রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন। শিক্ষাক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রগতির পথ প্রায় রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এমতাবস্থায় মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে মেরী কুরীর পক্ষে নিজের দেশে থাকিয়া উচ্চশিক্ষার আশা পোষণ করা সম্ভব হয় নাই। তাই পিতামাতার পরামর্শ অনুসারে মেরী কুরীকে তদানীন্তন স্বাধীন গণতন্ত্রবাদী প্রগতিশীল দেশ ফ্রান্সে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এইখানেই—প্যারী শহরে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হয় এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার যুগান্তকারী অবদানের বীজ উপ্ত হয়। মেরী কুরীর আবিষ্কার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে, যেমন—পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, ফলিত বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্য সত্যই পৃথিবীব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রায় সত্তর বৎসর পরেও সে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয় নাই বরং উত্তরোত্তর নূতন দিগন্তের দিকে প্রসারিত হইতেছে।

পোলোনিয়াম ও রেডিয়ামের আবিষ্কার

১৮৯৮ সালে ঘোষণা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মেরী কুরীর বিজ্ঞান-প্রতিভার পরিচয় চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ১৯০৩ সালে মেরী কুরী ও তাঁহার স্বামী পিয়ের কুরীকে পদার্থ-বিজ্ঞানে যুগান্তকারী অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করা হয়। ১৯১১ সালে তিনি যুক্তভাবে ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের জন্য হেনরী বেকেরেলের সঙ্গে আবার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নোবেল পুরস্কারের ৪০ বৎসরের ইতিহাসে আর একজন মাত্র বৈজ্ঞানিক, লিনাস পাউলিং দুইবার এই সম্মানের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু মহাশয় কয়েক মাস আগে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় মাদাম কুরীর জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে আপনারা মেরী কুরীর ছাত্রী-জীবন হইতে বিবাহিত জীবন এবং তাঁহার বিজ্ঞান-সাধনার আদ্যোপান্ত ইতিহাস জানিতে পারিবেন। এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। এখানে শুধুমাত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মেরী কুরী ও তাঁহার সহকর্মীদের অবদানের একটি দৃশ্যপট তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিব।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও রেডিয়াম

বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকেরেল (Bacquerell) ১৮৯৬ সালে প্রথম প্রমাণ করেন যে, ইউরেনিয়ামে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তার অস্তিত্ব আছে। বেকেরেলের আবিষ্কারের কিছুদিন পরে কুরী দম্পতি পিচব্লেণ্ড হইতে তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়াম এবং রেডিয়াম বাহির করিতে সক্ষম হন। রেডিয়াম নিষ্কাশন ও তাহার তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের ফলে কেবল যে তেজস্ক্রিয়তা লইয়া নানা ধরণের গবেষণার সুযোগ সহজসাধ্য হইয়া যায়, তাহাই নহে—জীব-জগৎ এবং চিকিৎসা-জগতে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবের একটি নূতন দিগন্তের সন্ধান পাওয়া যায়।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে রেডিয়ামের প্রচলন সম্পর্কে এই কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৮৯৫ সালে রঞ্জেন কর্তৃক এক্স-রে বা রঞ্জেন-রশ্মি আবিষ্কারের মাত্র দুই মাসের মধ্যেই চিকিৎসার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভাবনীয় ঘটনার মাধ্যমে উহার অবদান উপলব্ধি করা গিয়াছিল। শিফ ও ফ্রয়েণ্ড নামক দুইজন বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে, রঞ্জেন-রশ্মি প্রয়োগের ফলে চামড়ায় একরূপ পোড়াভাব দেখা যায় এবং ১৯০১ সালে বেকেরেলও নিজের দেহে রেডিয়াম প্রয়োগের ফলে অনুরূপ পোড়াভাব লক্ষ্য করেন। এই সকল লক্ষণীয় বিষয়গুলিই চিকিৎসার ক্ষেত্রে রঞ্জেন-রশ্মি ও রেডিয়াম ব্যবহারের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। চিকিৎসার ক্ষেত্রে মূল্যবান এবং সহজলভ্যতার দিক হইতে রেডিয়াম অপেক্ষা রঞ্জেন-রশ্মি অনেক সুবিধাজনক বলিয়া রেডিয়ামের প্রয়োগবিধি প্রথম দিকে বিশেষ সীমিত হইয়া যায়। অবশ্য ১৯১৫ সালে ক্যান্সার রোগ নিরাময়ে রেডিয়ামের কার্যকরী ক্ষমতার প্রমাণ পাইবার পর হইতেই ইহার বহুল প্রচলন সুরু হইতে থাকে। বর্তমান কালে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় অন্যান্য বহুবিধ তেজস্ক্রিয় পদার্থের সহিত রেডিয়ামও বিশেষ সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রেডিয়াম ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ প্রধানতঃ বিকিরণের মাধ্যমেই রোগ নিরাময় করিয়া থাকে। সেই জন্য এখানে জৈব পদার্থের উপর বিকিরণের কার্যকারিতার মূল তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

জৈব পদার্থের উপর বিকিরণের কার্যকারিতার মূল তত্ত্ব

বিকিরণের* প্রভাবে জৈব পদার্থসমূহে নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এই সকল

*ইহার সহিত প্রদত্ত বিকিরণ-এর ক্রিয়া-সংক্রান্ত তালিকা-চিত্রটি দ্রষ্টব্য।

পরিবর্তনগুলি প্রায়ঃশই ডিঅক্সি-রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে ডি-এন-এ) অণুতেই সংঘটিত হইয়া থাকে। এই তত্ত্বটি প্রায় সকল জাতীয় আয়ন সৃষ্টিকারী বিকিরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিকিরণ দুই প্রকারের পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে; যথা—(১) চিরস্থায়ী এবং (২) স্বল্পস্থায়ী। দেখা গিয়াছে, কখনও কখনও জৈব কোনও কোষ দেখা যায়, যাহা চলতি অর্থে ধ্বংসকারী বিকিরণের প্রভাব গ্রহণ করিয়াছে, তৎসত্ত্বেও জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম পদ্ধতির দ্বারা তাহার মধ্যে কোন গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন আবিষ্কার করা যায় না। লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, এক হাজার রন্ট্‌গেন (1000r) বিকিরণ দেওয়া সত্ত্বেও কোন কোন ইঁদুরের শরীরে

পদার্থসমূহের বৃদ্ধি, তাহাদের বৈদ্যুতিক অবস্থা প্রভৃতির উপর বিকিরণজনিত পরিবর্তনগুলি বিকিরণের অবসানে তাহাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। যেহেতু এই সকল পরিবর্তন জৈব পদার্থগুলির কোন চিরস্থায়ী পরিবর্তন ঘটায় না, সেহেতু এইগুলিকে শরীরগত বা ক্ষণধর্মী বা স্বল্পস্থায়ী বলা যাইতে পারে। আবার এমন কোনও কোনরূপ দৃশ্য পরিবর্তন ঘটে না, যদিও চার দিনের মধ্যে তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

বিকিরণের প্রভাবে কোষ-পর্যায়ে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহকে প্রধানতঃ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়:—

(১) মাইটোসিস বা কোষ-বিভাজনের বিলম্বিত শুরু,

(২) মাইটোসিস বা কোষ-বিভাজন একেবারে বন্ধ হইয়া যাওয়া,

(৩) কয়েকটি বিভাজনের পর কোষগুলির মৃত্যু,

(৪) অত্যধিক পরিমাণ বিকিরণের প্রভাবে (প্রায় এক লক্ষ র‍্যাড) কোষগুলির তাৎক্ষণিক মৃত্যু,

(৫) কোষাভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়াসস্থিত ক্রোমোজোম ভগ্ন হওয়া,

(৬) বিকিরণের প্রভাবে কোষগুলির কার্যপ্রণালীতে বাধা সৃষ্টি হওয়া।

বিকিরণের দ্বারা ক্যান্সার চিকিৎসার মূল তত্ত্ব

নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের দ্বারা চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিকেরা প্রাণিদেহে এবং মানবদেহে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি উপযুক্ত পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনুকূল ফল পাওয়া সম্ভব। এই প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, কয়েক প্রকারের চর্মরোগ তেজস্ক্রিয়তা ব্যবহারের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করা যায়। গবেষণার মাধ্যমে আরও জানা যায় যে, রেডিয়াম-রশ্মি বিভিন্ন জাতীয় কোষ ও কোষসমষ্টির উপর বিভিন্নভাবে কাজ করে, বিশেষতঃ কোষগুলি যখন বিভাজন-প্রক্রিয়ার দ্বারা সংখ্যাবৃদ্ধি করে, সেই সময়ে তাহাদের উপর রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কোন টিউমার বা অর্বুদ যদি প্রাণঘাতী (Malignant) হয়, তাহা হইলে তাহার কোষগুলি অতি দ্রুত এবং শৃঙ্খলাবিহীনভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপরপক্ষে স্বাভাবিক ও সুস্থ কোষগুলির বিভাজনের হার তুলনামূলকভাবে কম হইয়া থাকে। ইহার ফলস্বরূপ রেডিয়াম-রশ্মির ধ্বংসকারী প্রভাব দূষিত কোষগুলির উপর স্বাভাবিক ও সুস্থ কোষ অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী হইয়া থাকে এবং অবশেষে টিউমারটি বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

রেডিয়ামের দ্বারা ক্যান্সারের চিকিৎসা

বর্তমান কালে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার জন্য রেডিয়ামের সহিত ইহার আত্মজ র‍্যাডনও (Radon) একই রকম সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রেডিয়ামের বিকিরণ-প্রক্রিয়ার ব্যবহার প্রধানতঃ তিন রকম পদ্ধতিতে পরিচালিত হইয়া থাকে :—

(১) দূরপ্রক্ষেপক পদ্ধতি (Teletherapy),

(২) সংস্পর্শ পদ্ধতি (Contact method),

(৩) পুঞ্জীভূতকরণ বা অনুপ্রবেশকরণ পদ্ধতি (Infiltration method)।

শেষোক্ত দুইটি পদ্ধতিতে রেডিয়ামকে একটি নল, শলাকা অথবা আবদ্ধ পাত্রে রাখিয়া প্রয়োগ করা হয়।

(১) দূরপ্রক্ষেপক পদ্ধতি (Teletherapy) :— এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র গামা (γ) রশ্মিকে কাজে লাগান হয় এবং সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ইহা প্রায় রঞ্জেন-রশ্মির পদ্ধতির ন্যায় কাজ করিয়া থাকে।

(২) সংস্পর্শক পদ্ধতি (Contact method) :— এই পদ্ধতিতে নল বা শলাকার মধ্যে রেডিয়াম রাখা হয় এবং তাহাকে একটি প্রয়োগোপযোগী বস্তুর (Applicator) মধ্যে ভরিয়া রোগাক্রান্ত স্থানের সংস্পর্শে অথবা কখনও সামান্য দূরে রাখিয়া প্রয়োগ করা হয়। চর্মরোগের প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসার জন্য যত বেশী সম্ভব বিটা (β)-রশ্মিকে কাজে লাগানই যুক্তিসঙ্গত এবং সেই জন্য এই সকল ক্ষেত্রে খুব পাতলা আবরণীর দ্বারা আবৃত করিয়া রেডিয়ামকে রোগাক্রান্ত স্থানে অথবা রোগীর দেহের সংস্পর্শে রাখা হয়। শরীরের অপেক্ষাকৃত গভীর স্থানে উৎপন্ন ক্ষতের চিকিৎসার সময় অবশ্য বিটা (β)-রশ্মির বিচ্ছুরণ

বদ্ধ রাখা হয় এবং রশ্মির গভীর অনুপ্রবেশ ঘটাইবার জন্য রেডিয়াম-উৎসকে ত্বক হইতে একটি নির্দিষ্ট ব্যবধানে রাখা হয়।

(৩) অনুপ্রবেশকরণ পদ্ধতি (Infiltration method) :—

কয়েকটি ক্ষেত্রে রেডিয়াম শলাকা অথবা র‍্যাডন শলাকা (Radon needle) সরাসরিভাবে রোগাক্রান্ত ক্ষতের অভ্যন্তরে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। র‍্যাডন শলাকা প্রয়োগের সুবিধা হইতেছে এই যে, বিকিরণ ক্ষমতায় রেডিয়ামের সমকক্ষ হইলেও ইহার অর্ধ জীবনকাল (Half life) বা হইতেছে মাত্র ৩'৮ দিন এবং সেই জন্য ইহাকে স্থায়ীভাবে দেহাভ্যন্তরস্থ রোগাক্রান্ত স্থানে রাখা সম্ভব।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ

রোগনির্ণয় ও রোগনিরাময়ের ক্ষেত্রে আইসো-টোপের ব্যবহার প্রথম প্রবর্তন করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হেভিসি (Hevesy) এবং আজ পর্যন্ত বহুসংখ্যক তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আবিষ্কৃত হইবার ফলে তাহাদের কার্য-পরিধি বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং যথেষ্ট সাফল্য লাভ করাও সম্ভব হইতেছে। এই কারণে রেডিয়াম প্রয়োগের সীমিত ক্ষেত্র আজ প্রসারিত হইয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ক্রমবর্ধমান নামের তালিকায় মধ্যে নিম্নলিখিত আইসোটোপগুলি এবং তাহাদের ব্যবহারের পদ্ধতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) দূরপ্রক্ষেপক পদ্ধতি :— (Teletherapy)	কোবাল্ট ৬০ (Co^{60})	সিজিয়াম১৩৭ (Cs^{137}) ইত্যাদি
(২) অনুপ্রবেশকরণ পদ্ধতি (স্থানীয় পুঞ্জীভূতকরণ) (Infiltration)	স্বর্ণ১৯৮ (Au^{198})	ফস্‌ফরাস৩২ (P^{32}) ইত্যাদি
(৩) রোগনির্ণয় ও নিরাময় করিবার জন্য :—	আয়োডিন১৩১ (I^{131})	স্বর্ণ১৯৮ (Au^{198}) ইত্যাদি

এখন বহুপ্রচলিত কয়েকটি প্রধান তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

তেজস্ক্রিয় আয়োডিন১৩১ (I^{131})

বর্তমান কালে যত রকম আইসোটোপ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ আয়োডিন১৩১ একমাত্র তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, যাহা রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যক্ষমতা এবং তাহার রোগাক্রান্ত অবস্থার গতি-প্রকৃতি একমাত্র এই আইসোটোপের দ্বারাই সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব। আয়োডিন১৩১ হইতে বিটা ও গামা—এই উভয় প্রকার রশ্মি বিচ্ছুরণের দরুণ ইহার ব্যবহার অত্যন্ত সুবিধাজনক। ইহার গামা-রশ্মিকে ইহার অবস্থান ও পরিমাণ নির্ধারণের কাজে এবং বিটা-রশ্মিকে রোগ-চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস৩২ (P^{32})

১৯৪০ সালে লরেন্স এবং তাঁহার সম্প্রদায় (Laurence et al) এই তেজস্ক্রিয় আইসো-টোপটিকে লিউকেমিয়া রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করেন। ইহার অপেক্ষাকৃত উচ্চশক্তি-সম্পন্ন বিটা-রশ্মিকে প্রাথমিক স্তরের চর্মরোগের

(Haemangioma) চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যদিও তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাসকে^{৩২} (P^{32}) রক্ত সম্বন্ধীয় বিভিন্ন রোগ, যেমন—Polycythemia vera, Chronic leukemia প্রভৃতি এবং Hodgkin's Disease, Lymphosarcoma, Multiple Myeloma প্রভৃতি রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হইতেছে, তথাপি ইহা যে কেমোথেরাপির পদ্ধতি অপেক্ষা ভাল, ইহা প্রমাণ করা যায় না।

তেজস্ক্রিয় স্বর্ণ^{১৯৮} (Au^{198})

এই আইসোটোপটির ভারী ধাতব প্রকৃতি (Heavy metal property) এবং কলোইডাল ধর্মকে (Colloidal property) অনেক ক্ষেত্রে লিউকেমিয়া প্রস্টেট গ্রন্থির ক্যান্সার, মূত্রাশয়ের ক্যান্সার, পেরিটোনিয়াল অ্যাসাইটিক সেলস, প্লুরাল অ্যাসাইটিক সেলস্ প্রভৃতির নিরাময়ের কাজে লাগান হয়।

উল্লিখিত আইসোটোপগুলি ছাড়া আরও বহু আইসোটোপ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নানাভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ব্যবহারের একটি তালিকা দেওয়া হইল।

বিকিরণ-প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় বিকিরণকারী পদার্থসমূহের প্রধান প্রধান উৎসের নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(১) আচ্ছাদিত উৎসসমূহ (Sealed sources)

উৎসসমূহ	অর্ধ-জীবন	শক্তি (Mev) (মিলিয়ন ইলেকট্রিক ভোল্ট)	প্রয়োগ-বিধি
সিজিয়াম ১৩৭	৩০ বৎসর	গামা ০'৬৬	দূরপ্রক্ষেপণ পদ্ধতি (Teletherapy), প্রবিদ্ধকরণ পদ্ধতি (Interstitial) এবং গহ্বর অনুপ্রবেশকরণ পদ্ধতি (Intracavitory) (সূচ অথবা নলের মাধ্যমে)
কোবাল্ট ৬০	৫'২১ বৎসর	গামা ১'১৭—১'৩৩	দূরপ্রক্ষেপণ পদ্ধতি (Teletherapy), প্রবিদ্ধকরণ এবং গহ্বর অনুপ্রবেশকরণ পদ্ধতি (সূচ অথবা নলের মাধ্যমে) বহিঃপ্রয়োগকারী বস্তুর মাধ্যমে
স্বর্ণ ১৯৮	২'৭০ দিন	গামা ০'৪১	প্রবিদ্ধকরণ পদ্ধতি
ইরিডিয়াম ১৯২	৭৪ দিন	গামা ০'৩—০'৬	প্রবিদ্ধকরণ পদ্ধতি (এবং শলাকার মাধ্যমে)
ফস্‌ফরাস ৩২	১৪'৪৫ দিন	বিটা ০'৬৯	বিটা-রশ্মি প্রয়োগ পদ্ধতি (বহিঃপ্রয়োগকারী বস্তুর মাধ্যমে)

(১) আচ্ছাদিত উৎসসমূহ (Sealed sources)

উৎসসমূহ	অর্ধ-জীবন	শক্তি (Mev) (মিলিয়ন ইলেকট্রিক ভোল্ট)	প্রয়োগ-বিধি
রেডিয়াম ২২৬	১'৬২ বৎসর	গামা ০'১৯-২'৪৩	দূরপ্রক্ষেপণ পদ্ধতি, প্রবিদ্ধকরণ এবং গহ্বর অন্তঃপ্রবেশকরণ পদ্ধতি (সূচ এবং নলের মাধ্যমে)
রেডন ২২২	৩'৮২৫ দিন	গামা ০'১৯-২'৪৩	প্রবিদ্ধকরণ পদ্ধতি
ষ্ট্রনসিয়াম ৯০	২৮ বৎসর	বিটা ০'২	বিটা-রশ্মি প্রয়োগ পদ্ধতি (বহিঃপ্রয়োগকারী বস্তুর মাধ্যমে)
ট্যান্টেলাম ১৮২	১১৫ দিন	গামা ০'০৭-১'২	প্রবিদ্ধকরণ পদ্ধতি (দানাকারে)
ইট্রিয়াম ৯০	৬৪ ২ ঘণ্টা	বিটা ০'৯৩	প্রবিদ্ধকরণ পদ্ধতি (শলাকাকারে)
ষ্ট্রন্সিয়াম ৯০ / ইট্রিয়াম ৯০			দূরপ্রক্ষেপণকারী বিটা-রশ্মি প্রয়োগ পদ্ধতি (Beta Teletherapy)

(২) অনাচ্ছাদিত উৎসসমূহ (Unsealed sources)

উৎসসমূহ	অর্ধ-জীবন	শক্তি (Mev)	প্রয়োগ-বিধি
স্বর্ণ ১৯৮	২'৭০ দিন	গামা ০'৪১	কলয়ডীয় দ্রবণ অবস্থায় গহ্বর অন্তঃপ্রবেশকরণ পদ্ধতি অথবা প্রবিদ্ধকরণ পদ্ধতি
আয়োডিন ১৩১	৮'০৬ দিন	গামা ০ ৩৬ (৮০%), বিটা ০'৬১(৮৭%)	গলাধঃকরণকারী দ্রবণাকারে
আয়োডিন ১৩২	২'৩ ঘণ্টা	গামা ০'৬৭ (৯৯%), বিটা ২'১৪(৮১%)	„
ফস্ফরাস ৩২	১৪'৪৫ দিন	বিটা ০'৬৯	গলাধঃকরণকারী এবং বিদ্ধকরণকারী দ্রবণাকার অবস্থায় (ক্রোমিয়াম ফস্ফেট কলয়ডীয় দ্রবণ অবস্থায়)
ইট্রিয়াম ৯০	৬৪'২ ঘণ্টা	বিটা ০'৯৩	সিরামিক মাইক্রোস্ফিয়ার ইঞ্জেকশন দেবার উপযুক্ত দ্রবণের মাধ্যমে

মন্তব্য

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের বিকিরণ-শক্তি ক্যান্সার নিরাময় এবং অন্যান্য মানব-কল্যাণকর কার্যে প্রভূত ব্যবহৃত হইতেছে এবং প্রকৃত পক্ষে বর্তমান কালে বিকিরণ-চিকিৎসা ক্যান্সার (কর্কট রোগ) নিরাময়ের একটি প্রধান উপায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ক্যান্সার রোগের মূল তত্ত্ব—ইহা কি

এবং কেন হয়—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে এখনও পর্যন্ত দ্বিধাহীনভাবে কিছুই বলা যায় না। অপর পক্ষে জৈব পদার্থের উপর বিকিরণ-শক্তির কার্যকারণ বিধি সম্পর্কেও জ্ঞান অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ক্যান্সার রোগ এখন বিশ্বব্যাপী একটি ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে—এক দিকে এই সীমিত জ্ঞানের দ্বারা যথাসাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইতেছে, অন্য দিকে উহাকে পূর্ণরূপে দমন করিবার জন্য তীব্র বহুমুখী অভিযান চালান হইতেছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ক্যান্সার রোগ ও বিকিরণ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব জানা যাইবে এবং তখন অধিকতর সাফল্যের সহিত এই রোগ ও অন্যান্য মানব-কল্যাণকর কার্যে বিকিরণ-শক্তি (এক্স-রে, রেডিয়াম এবং অন্যান্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ) ব্যবহার করা যাইবে।

[মাদাম কুরীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা-সভায় প্রদত্ত ভাষণ।]

জীবের উৎপত্তি

রমেন দেবনাথ

জীব-বিজ্ঞানে দুটি তত্ত্ব সম্পর্কে আজ আর কোন দ্বিমত নেই—তাদের একটি হলো, ডারউইন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জৈব অভিব্যক্তিবাদ (Organic evolution, অর্থাৎ প্রাথমিক জীবের ক্রমবিবর্তনের ফলে বর্তমান কালের জীবজন্তুর উদ্ভব হয়েছে) আর একটি হলো, লুই পাস্তর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জীবজনি মতবাদ (Biogenesis, অর্থাৎ জীব থেকে জীবের জন্ম, নির্জীব থেকে নয়)। এই দুটি মতবাদে বর্তমান কালের বিভিন্ন জীবজন্তুর জন্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু পৃথিবীতে যখন কোনও জীব ছিল না—সেই জীবহীন পৃথিবীতে প্রাথমিক জীবের জন্ম কিভাবে হয়েছে? এই প্রশ্নের জবাব উক্ত মতবাদ দুটিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে জীবের সৃষ্টি প্রথম কিভাবে ঘটলো—এই প্রশ্নের সঠিক সমাধান আজও কেউ করতে পারে নি। তবে এই সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করছেন এবং কিভাবে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে, তার একটা সুনির্দিষ্ট মতবাদ প্রদান করেছেন। এই বিজ্ঞানভিত্তিক মতবাদটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার আগে জীবের সৃষ্টি সম্পর্কিত আরও যে কয়েকটি থিওরি বা মতবাদ আছে, সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

(১) অলৌকিক সৃষ্টিতত্ত্ব: এই মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রথম জীবের জন্ম হয়েছে কোন অলৌকিক শক্তির সাহায্যে। বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়েও এই অলৌকিক সৃষ্টিতত্ত্বের কথা আছে। কোন অলৌকিক ক্ষমতার অস্তিত্ব প্রমাণ করা বিজ্ঞানের এক্তিয়ারের বাইরে—তাই সৃষ্টি সম্পর্কিত এই তত্ত্বকে বিজ্ঞানীরা সর্বদাই দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

(২) অন্য গ্রহ থেকে পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব: আরহেনিয়াস (Arrhenius) নামক এক মনীষী এই মতবাদের উদ্ভাবক। তাঁর মতে, পৃথিবীর বাইরের কোন গ্রহ থেকে জীবের বীজ উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসে পতিত হয়েছিল এবং তা থেকেই পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি হয়েছে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়—তাহলে

অন্ত গ্রহে জীবের জন্ম হলো কি করে? এই মতবাদে এই প্রশ্নর জবাব মেলে না।

(৩) তৃতীয় মতবাদ অনুযায়ী অজৈব পদার্থ (Inorganic matter) থেকে জীবের সৃষ্টি হয়েছে। এই থিওরি মানতে হলে জীব-কোষের বিভিন্ন উপাদানকে অজৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি হতে হবে; কিন্তু আধুনিক জৈব রাসায়নিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, জীবের উপাদান জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি। এমন কি, সরলাকৃতির সাধারণ যে ব্যাক্টিরিয়া, তার উপাদানও জটিল জৈব রসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। সুতরাং অজৈব পদার্থ থেকে জীবের উৎপত্তির সম্ভাবনা খুবই কম।

(৪) জৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবের জন্ম—এটিই বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ—যার কথা প্রথমেই বলা হয়েছে। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক ওপারিন এই মতবাদ প্রবর্তন করেন, পরে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হ্যারল্ড ইউরিও (Harold Urey) এই মতবাদ সমর্থন করেন। তাঁদের মতে, আদি পৃথিবীর সমুদ্র-জলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্ভূত জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলির মধ্যে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের (Physical and Chemical change) ফলে জটিল থেকে জটিলতর জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং এই জটিলতম জৈব পদার্থের মধ্যে সজীব বস্তুর লক্ষণ, যেমন—বংশবৃদ্ধি, কলেবর বৃদ্ধি—ইত্যাদি ব্যাপার দেখা দেয়। এভাবে জৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সজীব বস্তুর সৃষ্টি হয়।

ওপারিন মনে করেন যে, আদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল হাইড্রোজেন, মিথেন, অ্যামোনিয়া ও জলীয় বাষ্প—এই সব পদার্থ দিয়ে তৈরি ছিল। বর্তমান কালের অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন ইত্যাদি গ্যাস তখনকার বায়ুমণ্ডলে ছিল না।

তাঁর মতে, প্রাচীন পৃথিবীর আবহাওয়া ছিল মেঘাচ্ছন্ন এবং ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ—তখন অনবরত বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ ঘটতে থাকে; আর তারই ফলে তৎকালীন বায়ুমণ্ডলের হাইড্রোজেন, মিথেন, অ্যামোনিয়া ও জল থেকে জৈব রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী বিজ্ঞানী হ্যারল্ড ইউরিও এই মতবাদ পোষণ করেন। ওপারিন ও ইউরির এই ধারণা যে অমূলক নয়, গবেষণাগারে তা পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, বিজ্ঞানী ষ্ট্যানলী মিলার (ইউরির ছাত্র) কর্তৃক। মিলার ১৯৫৩ সালে এই মূল্যবান পরীক্ষাটি সম্পাদন করেন। তিনি একটি ফ্লাস্কে পৃথিবীর আদিকালের বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করে অর্থাৎ হাইড্রোজেন, মিথেন, অ্যামোনিয়া, জল ইত্যাদি অজৈব রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে ফ্লাস্কটি ভর্তি করে তাতে কৃত্রিম উপায়ে কয়েক দিন যাবৎ অনবরত বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালাতে লাগলেন (পৃথিবীর আদিকালের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও বজ্র-বিদ্যুৎ সমন্বিত আবহাওয়া)। পরে ফ্লাস্কের ভিতরকার পদার্থ বিশ্লেষণ করে তিনি দেখলেন—তাতে অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino acid), ফ্যাটি অ্যাসিড (Fatty acid) ইত্যাদি সরল জৈব রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং অজৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে জৈব রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে।

এই ভাবে আদি পৃথিবীতে জৈব রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি হতে থাকে। ক্রমে এই সব পদার্থের গ্যাসীয় লক্ষণ হারিয়ে যেতে থাকে এবং সেগুলি পৃথিবীর বৃহৎ জলরাশির (Hydrosphere) মধ্যে থিতিয়ে যেতে থাকে। এভাবে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হলো, পরে আরো রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে প্রোটিন নামক যৌগিক জৈব পদার্থটি তৈরি হয়—যা জীবদেহের প্রতি অংশে কাঠামোর কাজ করে। প্রোটিন সৃষ্টির পর

নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid) নামক আর এক জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয়। এই দুই-এর মিশ্রণে গঠিত নিউক্লিয়ো-প্রোটিন (Nucleoprotein) নামক পদার্থটিই রয়েছে জীবসৃষ্টির মূলে, কারণ শুধু এই পদার্থের মধ্যেই সজীব বস্তুর প্রধান বৈশিষ্ট্য, যথা—বংশবৃদ্ধি বা দ্বিগুণিতকরণ (Reproduction or Reduplication) পরিলক্ষিত হয়।

প্রাথমিক সজীব বস্তুর আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কে স্বভাবতঃই কৌতূহল জাগে। বিজ্ঞানীদের মতে, সজীব বস্তুটি আণুবীক্ষণিক নিউক্লিয়ো-প্রোটিন-কণা (Microscopic Nucleoprotein particle) ছাড়া আর কিছুই নয়—কেন না, সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান। অবশ্য নিউক্লিয়োপ্রোটিনের ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (Deoxyribo nucleic acid) বা ডি. এন. এ-র (D N A) মধ্যেই শুধু বংশবৃদ্ধি, দ্বিগুণিতকরণের সব লক্ষণ আছে। এই নিউ-ক্লিয়োপ্রোটিন সাধারণ জড় এবং নির্জীব রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়, জীবকোষের মধ্য দিয়ে এটি সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য লাভ করে। সুতরাং প্রথমে নিউক্লিয়োপ্রোটিন ও পরে কোষ-সৃষ্টি এবং তার পর জীবের জন্ম হয়েছে।

বিজ্ঞানী ওপারিনের মতে, প্রাথমিক সজীব বস্তু ডি. এন. এ নয়, একরকম আঠালো পদার্থের কণা (Coacervate particle)—যার মধ্যে জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিহিত আছে। কতকগুলি আঠালো কণা স্বল্পস্থায়ী, আবার কতকগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়। যেগুলি দীর্ঘস্থায়ী—সেগুলি আরও পরিবর্তিত হয়ে জটিলতর পদার্থে পরিণত হয় আর স্বল্পস্থায়ী কণাগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং জীবসৃষ্টির সুরুতেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural selection) আভাস পাওয়া যায়। দীর্ঘস্থায়ী আঠালো কণাগুলি রাসায়নিক উপায়ে জল থেকে প্রোটিন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ বিশোষণ (Absorb) করে। ফলে কলেবর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই ভাবে বিভাজন-পদ্ধতি আস্তে আস্তে স্থায়িত্ব লাভ করবার পর ডি. এন এ. বা বংশানুক্রমের বাহকের সৃষ্টি হয়।

প্রাথমিক সজীব বস্তুর আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও নির্জীব এবং জড় রাসায়নিক পদার্থ থেকেই যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবের জন্ম হয়েছে, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা একমত। জীবহীন পৃথিবীর আদি অবস্থা থেকে প্রাথমিক জীবের জন্ম পর্যন্ত যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে, বর্তমান কালের বিজ্ঞানীরা তা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করছেন। কোটি কোটি বছরব্যাপী এই সব বিক্রিয়াকে বিজ্ঞানীরা সাতটি ধাপে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

সূর্য থেকে যখন পৃথিবী তৈরি হলো, তখন সেটি উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই গ্যাসপিণ্ড ৯২টি মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি; কিন্তু তখন কোন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় নি, কারণ অত্যধিক তাপমাত্রা হেতু একটি পরমাণু আর একটি পরমাণুর সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশতে পারে নি। সে জন্যে তখনকার পৃথিবীতে ছিল শুধু স্বাধীন পরমাণু (দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া আজকের পৃথিবীতে কোথাও স্বাধীন পরমাণু নেই—একটি আর একটির সঙ্গে মিশে যৌগিক পদার্থ তৈরি করেছে)। গ্যাসীয় পৃথিবী ক্রমে ক্রমে তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হয়ে যখন রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical reaction) ঘটাবার অনুকূলে এসেছিল, তখন মৌলিক পদার্থের স্বাধীন পরমাণুগুলি একটি আর একটির সঙ্গে মিলে অণু (Molecule) সৃষ্টি করলো এবং অনেকগুলি অণু মিলে এক-একটি যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করলো। এভাবে যে

রাসায়নিক বিক্রিয়া সুরু হলো, তাথেকেই ক্রমে সজীব বস্তুর জন্ম হয়েছিল।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রথম ধাপ

পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে থাকলে মৌলিক পদার্থ-গুলি তাদের ওজন অনুযায়ী পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। সবচেয়ে ভারী পদার্থগুলি কেন্দ্রস্থলে, মাঝারীগুলি মধ্যবর্তী স্থানে এবং হাল্কাগুলি উপরিভাগে অবস্থান করে। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন ও নাইট্রোজেনের স্বাধীন পরমাণুগুলি সবচেয়ে হাল্কা বলে সেগুলি পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থান করে এবং সর্বপ্রথম তাদের মধ্যেই রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এর মধ্যে হাইড্রোজেন খুবই বিক্রিয়াশীল এবং বিভিন্ন পরমাণুর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে নিম্নোক্ত তিনটি প্রাথমিক রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে—

(১) $H—O—H = H_2O$ (জল)

(২) $H—\overset{H}{\underset{H}{C}}—H = CH_4$ (মিথেন)

(৩) $H—\overset{H}{\underset{H}{N}} = NH_3$ (অ্যামোনিয়াম)
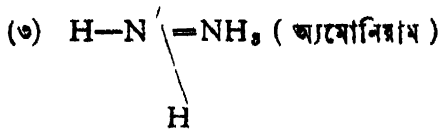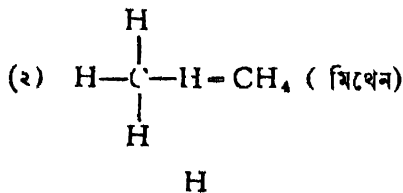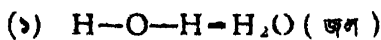
বিজ্ঞানীদের মতে, আদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল উপরিউক্ত এই তিনটি পদার্থ দিয়ে তৈরি, বর্তমান বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন তখনকার বায়ুমণ্ডলে ছিল না।

বিক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ

এই ধাপে কতকগুলি সরল জৈব রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ রাসায়নিক পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—অজৈব এবং জৈব। কার্বনবিহীন পদার্থকে অজৈব এবং কার্বনযুক্ত পদার্থকে জৈব পদার্থ বলে। কার্বনের ৪টি বণ্ড (Bond) থাকায় এটি খুব সক্রিয় এবং বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে নতুন নতুন যৌগিক পদার্থ তৈরি করে। দ্বিতীয় ধাপে নিম্নলিখিত জৈব পদার্থগুলি তৈরি হয়েছে—কার্বোহাইড্রেট, গ্লিসারিন ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড, পিউরিন ও পাইরিমিডিন।

প্রত্যেক বিক্রিয়ার জন্যেই শক্তির দরকার হয়। দ্বিতীয় ধাপে যখন সমস্ত পদার্থ তৈরি হয় নি, তখন কি করে বিক্রিয়ার শক্তি (Reaction energy) পাওয়া যেত—এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, তখন সূর্য ও বজ্রপাত—এই দুটি ছিল শক্তির প্রধান উৎস এবং তাথেকে প্রয়োজনীয় বিক্রিয়ার শক্তি তৈরি হয়ে জৈব রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি করেছে। বজ্রপাতজনিত বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণের (Electric discharge) ফলে যে প্রাচীন পৃথিবীতে (যখন বায়ুমণ্ডলে শুধু জলীয় বাষ্প, মিথেন, অ্যামোনিয়া ছিল) জৈব রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে, তা গবেষণাগারে পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। পূর্বেই এই সম্পর্কে বলা হয়েছে।

বিক্রিয়ার তৃতীয় ধাপ

এখানে সরল জৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে অ্যাডিনোসিন ফস্ফেট, জটিল কার্বোহাইড্রেট, চর্বি, প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড প্রভৃতি জটিল জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। কার্বোহাইড্রেট ও পাইরিমিডিন মিলে অ্যাডিনোসিন তৈরি হয়—এর সঙ্গে ফস্ফেট মিলে অ্যাডিনোসিন ফস্ফেট হয়। ফস্ফেটের সংখ্যার উপর নির্ভর করে অ্যাডি-নোসিন ফস্ফেট তিন রকম হতে পারে—

অ্যাডিনোসিন মনোফস্ফেট—AMP (যখন ১টি ফস্ফেট থাকে)

অ্যাডিনোসিন ডাইফস্‌ফেট—ADP (যখন ২টি ফস্‌ফেট থাকে)

অ্যাডিনোসিন ট্রাইফস্‌ফেট—ATP (যখন ৩টি ফস্‌ফেট থাকে)

শেষোক্ত দুটি পদার্থ খুবই দরকারী, কারণ ঐগুলি থেকে রাসায়নিক শক্তি তৈরি হয়। ADP থেকে ATP তৈরি হবার সময় যে শক্তির দরকার হয়, সেই শক্তিই আবার ATP থেকে বেরিয়ে আসে, যখন একটি ফস্‌ফেট কমে গিয়ে ATP, ADP-তে রূপান্তরিত হয়। নিম্নে তা দেখানো হলো।

ADP+P+Energy=ATP

ATP=ADP+P+Energy
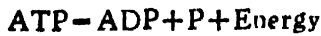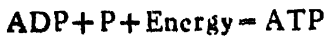
এই ATP-এর মধ্যে শক্তির একটি নতুন উৎস পাওয়া গেল, যা পরবর্তী সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। এর আগে পর্যন্ত সূর্য আর বজ্রপাত, শুধু এই দুটিই শক্তির উৎস ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে, জটিলতর জৈব রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টির জন্যে যে জটিলতর রাসায়নিক বিক্রিয়ার দরকার, তা ভৌত-শক্তির (Physical energy) সাহায্যে সম্পন্ন হতে পারে না। এসব বিক্রিয়ার জন্যে রাসায়নিক শক্তির দরকার এবং ATP হচ্ছে রাসায়নিক শক্তির উৎস। সুতরাং ATP-এর উৎপত্তি নতুন নতুন জটিল জৈব পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব করে তুলেছে। সাধারণভাবে ATP-কে রাসায়নিক শক্তিদাতা (Chemical Energy Donor) বলা হয়।

অ্যাডিনোসিন ফস্‌ফেটের কথা অনেক বলা হলো। এবার জটিল কার্বোহাইড্রেট, চর্বি ইত্যাদি জৈব রাসায়নিক পদার্থের উৎপত্তির কথা বলা দরকার। সরল কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে পারস্পরিক বিক্রিয়ার ফলে জটিল কার্বোহাইড্রেটের সৃষ্টি হয় এবং ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারিনের বিক্রিয়ার ফলে চর্বিজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়।

বিক্রিয়ার তৃতীয় ধাপে এপর্যন্ত যে সব জৈব রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হলো, তাতে জীব সৃষ্টির কোন লক্ষণ নেই। যে পর্যন্ত প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড—এই দুটি পদার্থের উৎপত্তি না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত জীব-সৃষ্টি সম্ভব নয়। নিম্নলিখিতভাবে এই দুটি অপরিহার্য জৈব রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রোটিন

অনেকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড একত্রে মিলিত হয়ে একটি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রোটিন তৈরি হয়। এই জটিল প্রক্রিয়াকে পলিমেরিজেসন (Polymerisation) বলে, যার ফলে কোন পদার্থের একাধিক অণুর রাসায়নিক মিলনে বৃহত্তর অণুবিশিষ্ট নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়। দেখা গেছে যে, সব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে প্রোটিনের অণুই বৃহত্তম। এক-একটি প্রোটিন অণুতে ১০০,০০০-এরও বেশী অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। সাধারণতঃ সর্ব-সাকুল্যে ২৪ প্রকারের অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। প্রোটিন তৈরির সময় এক এক প্রকারের অ্যামিনো অ্যাসিড অনেকগুলি একসঙ্গে একত্রিত হয়ে থাকে এবং সেগুলি বিভিন্ন অনুক্রমে সজ্জিত থাকে। এই জন্যে প্রোটিনের গঠন-বৈচিত্র্য অপরিসীম। জীবের পক্ষে প্রোটিনের অপরিহার্যতা হলো তার দুটি গুণের জন্যে—একটি হলো গঠন-মূলকতা এবং অন্যটি হলো উৎসেচক (Enzyme)। অসংখ্য ইট দিয়ে যেমন একটি অট্টালিকা তৈরি, তেমনি জীবকোষও অসংখ্য প্রোটিনরূপ ইট দিয়ে তৈরি। পূর্বে আমরা রাসায়নিক শক্তি ATP-এর কথা বলেছি, এবার আর একটি শক্তির উৎস তৈরি হলো প্রোটিন থেকে, যা রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এই নতুন উৎসটির নাম হলো উৎসেচক বা এনজাইম। এনজাইম ছাড়া কোন জীব বাঁচতে পারে না।

নিউক্লিক অ্যাসিড

নিউক্লিক অ্যাসিডকে প্রাণের মূল চাবিকাঠি-রূপে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ এই রাসায়নিক পদার্থের মধ্যেই জৈব বৈশিষ্ট্যের প্রথম প্রকাশ দেখা যায়। বংশবৃদ্ধি (Reproduction), পরিব্যক্তি (Mutation) এবং রাসায়নিক বার্তাবাহক (Chemical messenger)—এই তিনটি লক্ষণ নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে আছে। এই অ্যাসিড তৈরি হয় যখন শত সহস্র নিউ-ক্লিয়োটাইড একটি চেইনে 'পলিমেরাইজ্‌ড্‌' হয়। এক-একটি নিউক্লিয়োটাইড আবার শর্করা, ফস্‌ফরিক অ্যাসিড ও জৈব ক্ষার (Base)—এই তিনটি উপাদান দিয়ে গঠিত। এই নিউক্লিক অ্যাসিড সামান্ত রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু এই জড় পদার্থ টিই বংশবৃদ্ধিতে সক্ষম—ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য মনে হলেও বিজ্ঞানীরা তা প্রমাণিত করেছেন।

জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পাবার পর যা দরকার, তা হলো কোষ। জীব-কোষের সৃষ্টি কি করে হলো, এবারে তা আলোচনা করা যাক। উপরিউক্ত তিনটি ধাপে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থের জন্মের কথা বলা হয়েছে। বাকী চারটি ধাপে জীবের জন্ম-প্রক্রিয়ার কথা বলা হবে।

বিক্রিয়ার চতুর্থ ধাপ—কোষের সৃষ্টি

জীবের অপরিহার্য যৌগিক জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলির সৃষ্টির পর তাথেকেই জীব-কোষের জন্ম হয়। যে কোন উপায়েই হোক, এই অপরিহার্য পদার্থগুলি একত্রিত হয়ে আদি সমুদ্রের তীরে জায়গায় জায়গায় জমতে থাকে এবং এই পুঞ্জীভূত পদার্থগুলি বিন্দু বিন্দু আঠালো পদার্থে (Cohesive drop) রূপান্তরিত হয়, যার চতুর্দিকে একটি আবরণী থাকে। এই আবরণ-বিশিষ্ট আঠালো বিন্দুকেই কোষ বলা হয় এবং এর মূল উপাদান হলো নিউক্লিয়ো-প্রোটিন—যা নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন মিলে তৈরি হয়। প্রাথমিক কোষ সৃষ্টি হবার পরেই বিভিন্ন বিপাকক্রিয়া অর্থাৎ পুষ্টি, শ্বসন, গঠন ইত্যাদি সুরু হয়ে যায়। একটি কোষের প্রধান উপাদান ও বিভিন্ন কার্যাবলী (বিপাক-ক্রিয়া) নিয়ে দেখানো হলো।

বিক্রিয়ার পঞ্চম ধাপ—প্রাথমিক কোষের প্রকারভেদ

প্রাথমিক কোষ থেকে দুই প্রকারের কোষ তৈরি হয়েছে—একটি হলো নিউক্লিয়াসবিহীন কোষ, যেখানে নিউক্লিয়াস, প্রোটিন ও অন্যান্য কোষ উৎপাদনের মধ্যে যোগাযোগ থাকে; যেমন—ভাইরাস। দ্বিতীয়টি হলো নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ, যেখানে নিউক্লিয়াস ও প্রোটিন

কোষের কেন্দ্রস্থলে একত্রিত হয়ে নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হয়। এই নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে একটি পর্দা থাকে, যা কোষের অন্যান্য উপাদান থেকে নিউক্লিয়াসকে পৃথক করে রাখে। এই শেষোক্ত কোষ থেকেই পরে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে।

বিক্রিয়ার ষষ্ঠ ধাপ—পৈষ্টিক বিবর্তন (Nutritional evolution)

প্রাথমিক জীব সৃষ্টির পর সমুদ্রস্থ খাদ্যবস্তু আস্তে আস্তে নিঃশেষিত হবার ফলে খাদ্যাভাব দেখা দিতে থাকে। এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলবার জন্যে জীবের মধ্যে খাদ্য-গ্রহণ রীতির নানারকম পরিবর্তন দেখা দেয়—এরই নাম পৈষ্টিক বিবর্তন। প্রাথমিক কোষ থেকে চার রকম জীবের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের মধ্যে পাঁচ রকম পৈষ্টিক প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে—

আদি ভাইরাস (Protovirus) আদি ব্যাক্টিরিয়া (Protobacteria) উদ্ভিদ প্রাণী	——→	পরজীবিতা (Parasitism) মৃতজীবিতা (Saprophitism) হলোজোইক (Holozoic) রাসায়নিক সংশ্লেষণ (Chemosynthesis) আলোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis)

পরজীবিতা—আদি পৃথিবীতে স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব ঘটলে সর্বপ্রথম যে পৈষ্টিক প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়, তা হলো পরজীবিতা। এর ফলে একে অন্যের ক্ষতিসাধন করে তার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে।

মৃতজীবিতা—এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে এক জীব অন্য মৃত জৈব পদার্থ খেয়ে জীবনধারণ করে।

হলোজোইক পুষ্টি—এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রাণী সজীব এবং আস্ত খাদ্য গ্রহণ করে। সমস্ত প্রাণী-জগতে এই পুষ্টিক্রিয়া বিদ্যমান। এর জন্যে একটি পৈষ্টিক প্রণালী দরকার, যার মধ্যে মুখ, পাকস্থলী, অন্ত্র, পায়ু এবং তার সঙ্গে পরিপাক গ্রন্থি থাকবে। উপরিউক্ত তিন প্রকার পৈষ্টিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন জীবই তার নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে না। ফলে আদি পৃথিবীর মজুদ খাদ্যের মধ্যে নতুন কোন খাদ্যের জোগান সম্ভব হয় নি। সুতরাং নতুন খাদ্যের উৎস যদি না পাওয়া যায়, তাহলে মজুদ খাদ্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন নতুন জীবের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। সৌভাগ্যের বিষয়, ব্যাক্টিরিয়া ও সবুজ উদ্ভিদের মধ্যে নতুন খাদ্যের উৎস পাওয়া গেল।

রাসায়নিক সংশ্লেষণ—গন্ধক, লৌহ ইত্যাদি অজৈব রাসায়নিক পরিপোষক থেকে আহৃত শক্তি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের মিশ্রণে নতুন খাদ্য তৈরি হয়। ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে তা দেখা যায়।

আলোকসংশ্লেষণ—সৌরশক্তি, উদ্ভিদের ক্লোরোফিল, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে নতুন জৈব খাদ্যবস্তু তৈরি হয়।

জীবসৃষ্টির শেষ পর্যায় হলো, অক্সিজেনের বিপ্লব সাধন (Oxygen revolution)। আলোক-সংশ্লেষণের ফলে স্বাধীন আণবিক অক্সিজেনের (Free molecular oxygen) উদ্ভব হয়েছে, যা খুবই প্রতিক্রিয়াশীল এবং যে কোন পদার্থের

সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে নতুন পদার্থের সৃষ্টি করে। নিম্নে তা দেখানো হলো—

O_2 + Methane ← CO_2

O_2 + Ammonia → N_2

O_2 + Oxygen → O_3

O_2 + Metals → Ores, Rocks

O_2 + Organisms → Arobic respiration
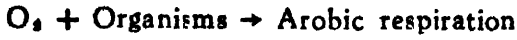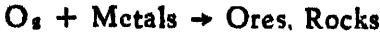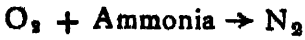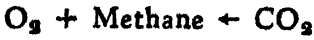
উপরিউক্ত অক্সিজেন বিপ্লবের ফলে পৃথিবীতে নতুন বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি হলো, যাতে বাষ্প, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন বিদ্যমান। এর আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বাষ্প, মিথেন ও অ্যামোনিয়া দিয়ে তৈরি ছিল—যা বর্তমান কালের জীব-জন্তুর বেঁচে থাকবার পক্ষে ছিল প্রতিকূল। সুতরাং কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন, স্বাধীন আণবিক অক্সিজেন—ইত্যাদি গ্যাসের উদ্ভব হওয়ায় উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের পক্ষেই অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হলো এবং তা সম্ভব হলো অক্সিজেন বিপ্লবের ফলে। জীব-জগতে অক্সিজেনের প্রয়োজন যে কতখানি, তা বলাই বাহুল্য।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আদি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে জড় ও জৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে প্রাথমিক জীবের জন্ম হয়েছে। লুই পাস্তুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জীবজনি মতবাদ (Biogenesis—জীব থেকে জীবের জন্ম, জড় থেকে নয়) এই ক্ষেত্রে অচল—এই মতবাদ বর্তমান কালের জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু পৃথিবীতে যখন কোন জীব ছিল না—সেই জীবহীন পৃথিবীতে জড় এবং নির্জীব জৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাথমিক জীবের জন্ম হয়েছে।

বরফে ঢাকা মহাদেশ

সুবিমল সিংহরায়

পৃথিবীর এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বরফের রাজত্ব। এই বরফ আজকের নয়। মানুষ পৃথিবীতে আসবার অনেক আগে হিমযুগ কয়েক বার পৃথিবীকে গ্রাস করেছিল—এমন কি, আদিম মানুষও হিমযুগের কবল থেকে মুক্তি পায় নি। তারপর বরফ আস্তে আস্তে গলে গেছে, শুধু কতকগুলি বিশেষ অঞ্চলে সেই পুরনো দিনের স্মৃতি হিসাবে এখনো জমাট বেঁধে আছে। বরফে ঢাকা এসব অঞ্চলের মধ্যে অ্যাণ্টার্কটিক মহাদেশ অন্যতম।

বিংশ শতকে মানুষ যদিও মহাকাশ জয়ের পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে, তথাপি পৃথিবীর বিচিত্র গঠন-প্রকৃতি সংক্রান্ত এমন অনেক সমস্যা রয়ে গেছে, আজ পর্যন্তও যার কোন সমাধান হয় নি। এমন কি পৃথিবীপৃষ্ঠের কতকগুলি বিন্যাস-বৈচিত্র্য এখনো সমস্যা হয়েই রয়েছে। অ্যাণ্টার্কটিক মহাদেশ সংক্রান্ত সমস্যা তাদের মধ্যে একটি। বরফের নীচে লুকিয়ে থাকবার ফলে এই মহাদেশের চল্লিশ ভাগেরও বেশী আজও অজানা রয়ে গেছে, যদিও বেশ কিছুদিন ধরে এখানে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। এই মহাদেশ অতীতে অনেক অভিযাত্রীর জীবন নিয়েছে এবং বর্তমানে উন্নত ধরণের সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত অভিযাত্রীদলের চেষ্টাতেও এর রহস্য সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয় নি। তবে এযাবৎ সমীক্ষা থেকে যেটুকু জানা গেছে, তারই ভিত্তিতে

এই লুকিয়ে-থাকা মহাদেশের একটি ছবি তৈরি করা হয়েছে।

এই মহাদেশের আয়তন প্রায় ১৩,১০০,০০০ বর্গ-কিলোমিটার—যুক্তরাষ্ট্রের দেড়গুণ। যদিও পৃথিবীর এই মেরুপ্রান্তে বরফেরই রাজত্ব, তবু বিস্তীর্ণ বরফ-স্তরের উপর এদিক-ওদিকে কিছু কিছু পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই পাহাড়গুলি ছাড়া সমুদ্রের ধার পর্যন্ত

পৃথিবীপৃষ্ঠে মহাদেশ এবং মহাসাগর যখন তৈরি হয়েছিল, তখন ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা ইত্যাদি বর্তমানে বিচ্ছিন্ন দেশগুলি জড়াজড়ি করে অ্যান্টার্কটিক মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অতীতের এই অতিকায় মহাদেশের নাম দেওয়া হয়েছে গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড। এক সময় কোন কারণে এই মহাদেশে ভাঙন ধরলো, ধীরে ধীরে
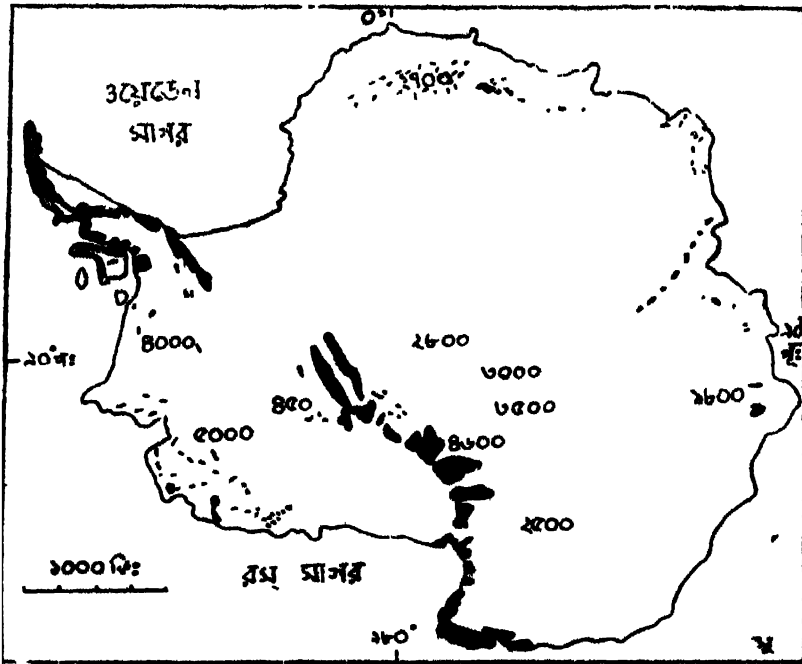
অ্যান্টার্কটিক মহাদেশের সাধারণ মানচিত্র। কালো জায়গাগুলি পাহাড় আর সমস্ত সাদা অঞ্চল জুড়ে বরফ। ভিতরের সংখ্যাগুলি দিয়ে স্থানীয় উচ্চতা মিটারে দেখানো হয়েছে।

দাঁড়াবার মত শক্ত ঠাঁই আর কোথাও নেই। এই মহাদেশের চার পাশেই সমুদ্র—আসলে এটি অষ্ট্রেলিয়ার মত একটি বিরাট দ্বীপ। এই সমুদ্রের দুটি অংশের নাম দেওয়া হয়েছে—ওয়েডেল ও রস্ সাগর। এই দুই সাগরের কাছাকাছিই বড় বড় পাহাড়গুলি অবস্থিত। মেরুর খুব কাছে পৃথিবীপৃষ্ঠ কচ্ছপের পিঠের মত, তবে গোলাকৃতি নয়, একটু চ্যাপ্টা।

ভূপৃষ্ঠের স্তর খণ্ড খণ্ড হয়ে সরে যেতে লাগলো এবং কোটি কোটি বছর সঞ্চরণের পর আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। অনেক ভূবিদের মতে, আমাদের অনুভূতির অগোচরে মহাদেশের সঞ্চরণ এখনো চলছে। যদিও অ্যান্টার্কটিক এখন অনেক দূরে বরফের কবরের নীচে রহস্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে, ভূবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সে আমাদের নিকট প্রতিবেশী—বিশেষ করে ভারতবর্ষের।

অ্যান্টার্কটিক মহাদেশের পাথরের দেহকে এই যে বরফের আচ্ছাদন যুগ যুগ ধরে ঢেকে রেখেছে, তার গভীরতা কত হবে? এই সম্পর্কে অবশ্য সঠিক কিছুই বলা যায় না; তবে একটি বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার ভিত্তিতে এটুকু বলা যায় যে, কোন কোন জায়গায় এর গভীরতা ২৪০০ মিটার তো হবেই। এক্ষেত্রে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে, বরফের নীচে পাথরের উপরিভাগ সমতল না হবার জন্যে বরফের গভীরতা সব জায়গায় সমান নয়। অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গাগুলিই শুধু এখনো বরফের উপরে মাথা তুলে আছে আর সমস্ত নীচু এবং সমতল ভূমি কোন দিনই সূর্যের আলো দেখে না।

এই বরফের রাজত্বে স্বভাবতঃই হিমবাহের প্রাচুর্য। হিমবাহের দল চারদিক থেকে সমুদ্রে এসে পড়ছে, ঠিক যেমন অন্যান্য মহাদেশে নদী এসে সাগরে মেশে। উত্তর মেরুর তুলনায় এদের গতি খুবই মন্থর। জলে পড়েও কিন্তু বরফ গলে যায় না, ভাসতে ভাসতে বহু দূর চলে যায়—এমন কি, অষ্ট্রেলিয়ার উপকূল পর্যন্ত। এই সব বিরাট বরফের চাঁই-এর (আইস বার্গ) দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এখানে এত বরফ কেন? অ্যান্টার্কটিক মহাদেশ দক্ষিণ গোলার্ধের একটি উচ্চ মালভূমি, সাধারণ উচ্চতা প্রায় ২০০০ মিটারের মত। তাপমাত্রা বেশীর ভাগ সময়েই শূন্যের নীচে থাকে। সুতরাং এখানে যে বরফের প্রাচুর্য থাকবে, এটা আর বিচিত্র কি! তবে যে সব হিমবাহ বরফ নিয়ে সমুদ্রে ফেলছে, তারা কেন শেষ হয়ে যাচ্ছে না এবং কেমন করে নতুন বরফ আবার জমা হচ্ছে, এটিও অনেক প্রশ্নের মধ্যে একটি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এই মহাদেশ একটি ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র এবং কোন কোন সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া এর উপর দিয়ে বয়ে যায়। আর এই ঠাণ্ডা হাওয়া যখন বিষুব ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকে বয়ে-আসা অপেক্ষাকৃত গরম হাওয়ার সঙ্গে মেশে, তখনই তুষারপাত হয়। ওয়েডেল ও রস্ সাগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে বার্ষিক তুষারপাতের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০ থেকে ৮০০ মিলিমিটার এবং ৩০০ মিলিমিটার। মেরু-কেন্দ্রে অবশ্য তুষারপাত খুবই কম, মাত্র ২০ মিলিমিটার। মহাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে ঢাল বেয়ে হিমবাহের আকারে বরফ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও এখানে প্রচুর পরিমাণে তুষারপাত হয়, তবু অনেকের মতে, অ্যান্টার্কটিকের বরফ কিন্তু ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে এবং বরফের গভীরতাও কমে আসছে। তাঁরা মনে করেন যে, নিকট অতীতে এই বরফের গভীরতা কোন কোন জায়গায় আরও ৩০০ মিটার বেশী ছিল। অনেক বিজ্ঞানী আবার এর বিপরীত মতও পোষণ করেন। তাঁদের মতে, অ্যান্টার্কটিকের আবহাওয়া দিনে দিনে গরম হয়ে যাচ্ছে এবং গরম হাওয়া বেশী পরিমাণে জলীয় বাষ্প ধরে রাখছে আর সে জন্যে উপযুক্ত পরিবেশে, বিশেষ করে মহাদেশের মধ্যাঞ্চলে বেশী পরিমাণে তুষারপাত হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বরফের গভীরতাও বাড়ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে এবং এখনও সন্দেহাতীতভাবে এই সমস্যার সমাধান হয় নি। যাহোক, এই বরফে ঢাকা মহাদেশ বেশী দিন আর হয়তো রহস্যাবৃত থাকবে না এবং অদূর ভবিষ্যতে আর পাঁচটা মহাদেশের মতই তাকে আমরা ভালভাবে চিনতে পারবো।

রূপা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

রূপা চাঁদের আলোর মতই চকচকে ও উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের বলিয়া প্রাচীন যুগের রাসায়নিকেরা ইহার প্রতীকরূপে চন্দ্রকলা ব্যবহার করিতেন। প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বেও যে রূপার প্রচলন ছিল, ঐতিহাসিকেরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াছেন। সোনা ও তামার পরেই রূপার ব্যবহার আরম্ভ হয়। খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে সিন্ধু ও নীলনদের মধ্যবর্তী দেশসমূহে সোনা ও রূপার মুদ্রার প্রচলন ছিল।

এই ধাতব পদার্থটি প্রধানতঃ রৌপ্য ও গন্ধকঘটিত খনিজ আর্জেন্টাইট হইতে সংগৃহীত হয়, তবে মৌলিক ধাতব অবস্থায়ও দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত গন্ধকমিশ্রিত খনিজ সীসা, তামা বা দস্তা হইতেও যথেষ্ট পরিমাণ রূপা উদ্ধার করা হইয়া থাকে। সারা পৃথিবীর খনি হইতে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ১০,০০০ টন আন্দাজ রূপা উত্তোলিত হয়। বিভিন্ন দেশের রৌপ্য উৎপাদনের হার নিম্নরূপ—

মেক্সিকো	৩৩%
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	২৫%
ক্যানাডা	৮.৫%
ইউরোপ	৮%
পেরু	৫%
অষ্ট্রেলিয়া	৫%
জাপান, রাশিয়া, বর্মা, বলিভিয়া	১৫%

নরওয়েতে তারের মত শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট সুন্দর দানাদার রূপা পাওয়া যায়। ইহার কোন কোনটির ওজন ৭৫০ পাউণ্ড পর্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। আমেরিকার কলোরাডো প্রদেশের খনিতে একবার একটি ১৮৪০ পাউণ্ড ওজনের নিরেট রূপার চাঁই পাওয়া গিয়াছিল এবং ঐ দেশেই অণ্টারিও প্রদেশে আর এক সময় ১০০ ফুট লম্বা ও ৬০ ফুট পুরু একটি বিশাল রৌপ্যখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার নাম দেওয়া হয় রূপার রাস্তা। পৃথিবীর বৃহত্তম রৌপ্য উৎপাদনের স্থান হইল মেক্সিকো। এখানকার খনি হইতে কোন এক সময়ে ২৭৫০ পাউণ্ড ওজনের এক বৃহৎ রৌপ্যখণ্ড উত্তোলন করা হইয়াছিল। বৃটিশ কলম্বিয়ায় যে বিশাল রূপা, দস্তা ও সীসার খনি আছে, তাহার সুড়ঙ্গপথ সর্বশুদ্ধ ১১৫ মাইল লম্বা। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় সম্পদরূপে ১১০,০০০ টনেরও বেশী খাঁটি রূপা সংগৃহীত রহিয়াছে।

আর্জেন্টাইট নামক খনিজ রৌপ্য হইতে পারদ, সায়ানাইড দ্রব, বিদ্যুৎ অথবা অগ্নির সাহায্যে রৌপ্য নিষ্কাশন করা হয়। সন্ত বিশ্লিষ্ট রৌপ্য উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০.৫ এবং ইহার কাঠিন্য ২.৭। রূপা ৯৬০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গলিয়া যায় এবং ২০০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ফুটিতে থাকে। এই ধাতুটি খুবই ঘাতসহ। রূপার পাত্ পিটাইয়া .০০০০১ ইঞ্চি পর্যন্ত পাত্লা করা যায়। এক গ্র্যাম আন্দাজ খাঁটি রূপা হইতে প্রায় এক মাইল লম্বা তার টানা সম্ভব। তাপ ও বিদ্যুতের সর্বোত্তম পরিচালক পদার্থ হইল রৌপ্য। সাধারণ অবস্থায় বাতাসের অক্সিজেন রূপার উপর বিশেষ ক্রিয়া করে না, তবে উহার মধ্যে গন্ধক

বাষ্প থাকিলেই কালো হইয়া যায়। রূপা স্বর্ণ অপেক্ষা কঠিন, কিন্তু তামা অপেক্ষা কোমল।

মুদ্রা, বাসনপত্র, অলঙ্কার ও আরসি প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য এখনও রূপার আদর আছে। ৯২৫ ভাগ রূপার সহিত ৭৫ ভাগ তামা মিশাইলে ষ্টার্লিং সিলভার তৈয়ারী হয়। ফটোগ্রাফির ফিল্ম ও কাগজ তৈয়ার করিবার জন্য রৌপ্যঘটিত রাসায়নিক বস্তু সিলভার ক্লোরাইড ও ব্রোমাইড বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। এই দুই পদার্থের উপর আলো পড়িলেই রাসায়নিক পরিবর্তন ও বিশ্লেষণ ঘটে। চিকিৎসা-কার্যে রৌপ্যঘটিত ঔষধ সঙ্কোচক, বিশোধক ও দাহক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চর্মরোগের চিকিৎসায় কখনও কখনও বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য রৌপ্যযুক্ত ঔষধ সিলভার নাইট্রেট ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সিলভার নাইট্রেট হইতে কাপড়ে চিহ্ন দিবার জন্য এক রকম চিরস্থায়ী কালি তৈয়ার করা যায়। শিল্প-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে রূপার ব্যবহার এইরূপ :—

মুদ্রা	৪০%
অলঙ্কারাদি	৩৫%
ফটোগ্রাফি	১৫%
কলকব্জা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি ও ঔষধ	১০%

কোন রূপার জিনিষের উপর গোলাপী রং করিতে হইলে ঐ বস্তুটি প্রথমে কিউপ্রিক ক্লোরাইডের তীব্র ও তপ্ত দ্রবণের মধ্যে কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া নিমজ্জিত রাখিবার পর জলে ধুইয়া তুলিয়া রাখিতে হয়। রূপার পাত্র ও অলঙ্কারাদি মলিন ও বিবর্ণ হইয়া গেলে তিন ভাগ খড়িমাটির সঙ্গে এক ভাগ ভাল সাবান ও জল মিশাইয়া ব্রাসের সাহায্যে পরিষ্কার করা যাইতে পারে অথবা শুধু খড়ির সঙ্গে অ্যামোনিয়া দ্রব মিলাইয়া ব্যবহার করা যায়। পিতল কিম্বা তামার দ্রব্যাদির উপর রূপার জল করিতে হইলে নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট মাত্রার রাসায়নিক মিশ্রণ প্রস্তুত করিয়া আর্দ্র কোমল চর্মের সাহায্যে পুনঃ পুনঃ লেপন করিতে হয়।

সিলভার ক্লোরাইড	১	আউন্স সূক্ষ্ম চূর্ণ
পটাস কার্বোনেট	৩	„ „ „
সাধারণ লবণ	১½	„ „ „
খড়ি	১	„ „ „
জল		যৎসামান্য

পাঁচ ভাগ অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে এক ভাগ রূপা মিশাইয়া খুব সুন্দর সাদা ও সস্তা মিশ্রধাতু প্রস্তুত করা যায়।

বিভিন্ন সময়ে সোনার অনুপাতে রূপার দাম কি রকম ছিল, তার একটি হিসাব এখানে দেওয়া হইল। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগে মিশরে চতুর্থ রাজবংশের আমলে রূপা সোনা অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান ছিল। রোমান সাম্রাজ্য বিস্তারের সময়—প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে,—এক ভাগ সোনা দশ ভাগ রূপার সমান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে এক গুণ সোনা ১৫ গুণ রূপার সমকক্ষ ছিল। বর্তমান ভারতে এক মাত্রা সোনা প্রায় ৫৫ মাত্রা রূপার সমান।

বিজ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক সমস্যা

প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়

ইদানীং একটি কথা আমরা শুনতে পাই—প্রতিজীবক ওষুধ পেনিসিলিন নাকি আর তেমনটি কাজ করছে না—যেমনধারা অব্যর্থ কাজ দেখাতো দশ-বিশ বছর আগেও। কিন্তু আদতে পেনিসিলিন যা, এখনো সে তা-ই আছে; তবে কাজ না করবার কারণটা কি? শুধু পেনিসিলিনের কথাই বা কেন, প্রতিজীবক অন্যান্য ওষুধও (যেমন ধরুন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন) অনেক ক্ষেত্রে আর সে রকম চমকপ্রদ সুফল দিচ্ছে না। যেখানে সুফল দিচ্ছে—সেখানে হয়তো অনেক সময় নিচ্ছে কিম্বা প্রয়োগ করতে হচ্ছে অনেক বেশী পরিমাণে। গনোকক্কাস জাতীয় জীবাণু (Bacteria)—একদিন যার প্রবল শত্রু ছিল সালফোনামাইড-ঘটিত ওষুধগুলি—আজ তাকেও তোয়াক্কা করছে না।

বিজ্ঞানীরা বলছেন—এর কারণ, এই ধরণের ওষুধপত্রের প্রাচুর্যজনিত ব্যাপক ব্যবহার। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং এক সময় বলেছিলেন, আমি তৈরি করলেও পেনিসিলিন পারতপক্ষে ব্যবহার না করবারই পক্ষপাতী। আসলে, বারবার এই ওষুধগুলি ব্যবহার করবার ফলে বিশেষ জাতের কোন জীবাণু বহুদিনের চেষ্টায় একটি বিশেষ ওষুধের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার বিশেষ উপায় আয়ত্ত করবার সুযোগ পায়।

বহুকাল আগে ডারুইন বলেছিলেন, সৃষ্টি-মুখে মহাকালের অসীম যাত্রায় প্রাণের সেই অস্তিত্বই টিকে থাকবে—চলবার পথে এই সংগ্রামে যে বিজয়ী হবে। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলে বেঁচে থাকবার জন্যে সংগ্রাম করছে সবাই—করছে জীবাণু ও ভাইরাস-গুলিও। জীবাণুগুলি নানারকম রোগে আমাদের ঘায়েল করতে সচেষ্ট। আবার জীবাণুগুলিকে জব্দ করবার ধান্দায় রয়েছে ভাইরাস বা ব্যাক্টি-রিয়োফাজের দল। এই ভাবেই এগিয়ে চলেছে সৃষ্টির জয়যাত্রা।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অথচ ভয়াবহ ভাইরাস ও জীবাণু জাতীয় এই সব শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার পথে কয়েকটি বাধাও আছে।

মহাবিশ্বের অস্বাভাবিক অনেক পরিবেশেই (মানুষের জীবন যে পরিবেশে অকল্পনীয়) এরা টিকে থাকতে পারে।* প্রকৃতিতে খুব সাধারণ-ভাবেই, কখনো বা পরিব্যক্তির (Mulation) ফলে বিভিন্ন ধরণের (Strains) অসংখ্য ভাইরাস ও জীবাণু প্রতিনিয়তই তৈরি হচ্ছে, এহেন বৈচিত্র্যের জন্যেই এদের সঙ্গে পেরে ওঠা দুষ্কর। একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যায়—গম গাছের মরচে রোগ (Rust fungi) প্রতি-রোধে সক্ষম একটি প্রজাতি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু হলে কি হবে, মরচে রোগের জন্মদাতা বিভিন্ন জাতের এত ছত্রাক রয়েছে, যার কেউ না কেউ আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা কোন এক সময় ভেঙ্গে ফেলবেই। তখন আমাদের অন্য কোন উপায় খুঁজতে হবে। Fungicides, Bactericides প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ আমরা রোগ-প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহার

---

* বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে, বহির্বিশ্বেও এদের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়।

উচ্চ তাপাঙ্ক কিংবা হিমাঙ্কের বহু নিম্নের তাপমাত্রায়ও এরা স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে।

করছি। প্রথম প্রথম হয়তো রোগের উপশমও হয়, কিন্তু অচিরেই জন্ম নেয় এমন ধরণের সব ছত্রাক, ভাইরাস ও জীবাণু—যারা আর ঐসব ওষুধের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, বহাল তবিয়তে টিকে থাকে। এজন্যে এগুলিকে Resistant variety বলা হয়।

জীবাণু ধ্বংসকারী প্রক্রিয়াগুলি কাজ করে সেই জীবাণুর কোষের মধ্যস্থিত ডি. এন. এ-র (DNA) উপর। ডি. এন. এ-র আণবিক সংগঠন পরিবর্তিত হলে সামগ্রিকভাবে জীবাণুর ক্রিয়া-পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়ে যায়। রাসায়নিক কিম্বা প্রতিজীবক ওষুধগুলি প্রয়োগ করে সচরাচর এই ভাবেই এদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া হয়। রঞ্জেন-রশ্মি বা গামা-রশ্মি কি কোবাল্ট ৬০ কেও অনেক সময় এই কাজে লাগানো হয়। আল্ট্রা-ভায়োলেট-রশ্মিও নিউক্লিক অ্যাসিডের উপর আলোকরাসায়নিক ক্রিয়া (Photochemical reactions) করে। এই সমস্ত রশ্মি অত্যধিক পরিমাণে (Lethal radiation dose) প্রয়োগ করলে জীবাণুগুলি মরে যায়। অনেক সময় আবার জীবাণুগুলির পরিব্যক্তিও (১) ঘটে থাকে।

পরীক্ষার দ্বারা সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে যে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে ডি এন. এ অণুর আভ্যন্তরীণ যে পরিবর্তন হয়, অনেক জীবাণু আবার তা মেরামত করে নিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়। এই মেরামতের কাজে ভুলচুক হওয়া স্বাভাবিক; আর তার ফলেই হয় পরিব্যক্তি (২)।

যে ভাবেই সম্ভব হোক না কেন, রোগ প্রতিরোধক রাসায়নিক প্রতিজীবক (Antibiotic) অথবা মারাত্মক সব রশ্মির হাত থেকে দেহাভ্যন্তরস্থ সংখ্যাতীত জীবাণুগুলির যে কয়টি বংশধর কোনক্রমে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়, তারাই কালক্রমে সৃষ্টি করে সেই জীবাণুগোষ্ঠীর এমন এক প্রজাতি, যার উপর পেনিসিলিন প্রভৃতির হুকুম আর চলে না (৩)।

এই কারণেই আজকের বিজ্ঞানীরা রোগ সারাবার চেয়ে রোগ যাতে না হয়, আগে থাকতে সে ব্যবস্থা নেবার উপর জোর দিচ্ছেন। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে পরাগ সংযোগ ঘটিয়ে রোগ প্রতি-রোধক্ষম বর্ণসঙ্কর প্রজাতি তৈরি করা হচ্ছে। সিমলা আলু গবেষণা কেন্দ্রে আলু গাছের লেট ব্লাইট রোগ (ছত্রাক জাতীয়) প্রতিরোধে সক্ষম উপজাতি তৈরি করা হয়েছে। এতে কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার কোন কারণ নেই, ভবিষ্যতে ছত্রাকগুলিও পুনরাক্রমণের উপযোগী প্রজাতি তৈরি করে ফেলবে।

মানুষ আবার আরো অসহায়। শুধু মাত্র টিকা দেওয়া ছাড়া উদ্ভিদের মত সহজে মানুষের বর্ণসঙ্কর তৈরি করা সম্ভব নয়। অধ্যাপক সি. ডি. ডার্লিংটন তাই আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, বিজ্ঞানের অসাধারণ অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রতিপক্ষ বিরাট জীবাণুকুলও সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

এ যেন এক চ্যালেঞ্জের খেলা। এই খেলায় মেতে আজকের বিজ্ঞান এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছে।

১। এই পরিব্যক্তির (Mutation) মূল কারণ ডি. এন. এ-স্থিত নাইট্রোজেনসমৃদ্ধ পিউরিন-পিরিমিডিন জুটির (Purine-pyrimidine pairs) সজ্জাক্রমের পরিবর্তন।

ই. ক্রীজ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন।

২। অধ্যাপক ইভলিন এম. উইট্‌কিন সম্প্রতি Escherochia coli নামক জীবাণুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করেছেন।

৩। ডি. এন. এ-র গঠনগত পার্থক্য (সজ্জাক্রম) এবং অ্যাডিনিন+থাইমিন: গুয়ানিন +সাইটোসিনের বিভিন্ন পরিমাণগত সম্পর্ক জীববজগতের বিচিত্র গুণাগুণ নির্ধারণ করে থাকে। জীবাণুর ওষুধ প্রতিরোধের বিশেষ ক্ষমতাও আসে এথেকেই।

বায়োকেমিক চিকিৎসা-পদ্ধতি

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

নানাদেশে নানা পদ্ধতিতে রোগের চিকিৎসা ও নিরাময়ের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতের পদ্ধতি আয়ুর্বেদিক এবং প্রাচীন আরবীয় পদ্ধতি ইউনানি। বর্তমান কালে পৃথিবীর সর্বত্র যে অ্যালোপেথিক পদ্ধতি প্রচলিত, তা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত। এই পদ্ধতিতে যখন কোন দেহাংশের ক্রিয়ার অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, তখন ওষুধ-রূপে ঐরূপ অস্বাভাবিক ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া-সম্পন্ন কোন ওষুধের ব্যবস্থা করতে হয়, যেমন—যখন কোন কারণে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়, তখন আমরা ডিজিটেলিস জাতীয় কিছু এবং যখন অন্ত্রের সঞ্চালন কমে যাবার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য ঘটে, তখন ঐ সঞ্চালন বাড়াবার জন্যে জোলাপের ব্যবস্থা করি।

পাশ্চাত্য জগতে আর একটি চিকিৎসা-পদ্ধতিও প্রচলিত আছে, সেটি হলো বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত মহাত্মা হ্যানিম্যান প্রবর্তিত হোমিও-প্যাথিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যে কোন দেহাংশের অস্বাভাবিক ক্রিয়ার চিকিৎসায় অনুরূপ ক্রিয়াসম্পন্ন কোন ওষুধের সূক্ষ্মাতিতম লঘু দ্রবণ প্রয়োগে তা নিরাময় করবার চেষ্টা করা হয়। প্রায় ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের সমসাময়িক কালে (১৮৭৩ সাল) জার্মেনীর অন্তর্গত অল্ডেন-বুর্গের চিকিৎসক ডক্টর উইলহেল্‌ম্‌ শুস্‌লার (Schuessler) আর একটি নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তার নাম বায়োকেমিক চিকিৎসা। বিখ্যাত বিজ্ঞানী মলেস্‌কোট (Moleschott) এবং ভিরচাও (Virchow) তার পূর্বে এক সময়ে মন্তব্য করেন যে, দেহের যে কোন অংশের ক্রিয়া সেখানকার অজৈব উপাদানের উপর নির্ভরশীল; যেমন—ক্যালসিয়াম ছাড়া হাড়ের, সোডিয়াম ক্লোরাইড ছাড়া কোমলাস্থির এবং লোহা ছাড়া রক্তের স্বাভাবিকতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এরূপ অজৈব উপাদানের অভাবে দেহের কোন অংশের সেলের অস্বাভা-বিকতাই তার রোগের কারণ এবং স্বাভাবিকতাই স্বাস্থ্যের মূল। একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক-রূপে শুস্‌লার যখন দেখতে পান যে, শুধুমাত্র লক্ষণ দেখে ওষুধের ব্যবস্থায় অনেক স্থলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, তখন তিনি ঐ দুজন বিজ্ঞানীর উক্তিকে ভিত্তি করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে লক্ষ্য করেন যে, কোন দেহাংশের কোন বিশিষ্ট সেলকে ক্রমাগত উত্তেজিত করতে থাকলে তার ফলে যে অজৈব উপাদানের হ্রাস ঘটে এবং স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়, ঐ উপা-দান আণবিক আকারে (Molecular Form) প্রয়োগে আবার তার সুস্থতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

আমাদের দেহ জৈব ও অজৈব উপাদানে তৈরি। তার মধ্যে দশ ভাগের সাত ভাগই জল, চার ভাগের তিন ভাগ প্রোটিন, শ্বেতসার স্নেহদ্রব্য প্রভৃতি দেহের চার ভাগের তিন ভাগ এবং অবশিষ্ট কুড়ি ভাগের এক ভাগ মাত্র লাবণিক (অজৈব) উপাদান। পরিমাণে এত কম বলে শেষোক্ত বা লাবণিক উপাদানকে আগে দেহের পক্ষে অত্যাবশুক বলে মনে করা হতো না। কিন্তু কালক্রমে সে ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে এবং শুস্‌লার ও তাঁর অনুবর্তীদের মতে, পরিমাণে নগণ্য হলেও

দেহের প্রয়োজন অর্থাৎ বৃদ্ধি এবং কর্মশক্তির জন্তে তারাই মুখ্য এবং জল ও জৈব উপাদান-গুলি সে অনুপাতে অনেকটা গৌণ বা নিষ্ক্রিয়। বর্তমানে অ্যালোপ্যাথিক মতও যে ঐ মতকে কতকটা সমর্থন না করে, এমন নয়; কারণ লাবণিক উপাদানগুলি বর্তমানে প্রোটিনের মতই আবশ্যকীয় দেহ-সংগঠনকারী উপাদান বলে পরিচিত এবং নিকেল, কোবাল্ট, জিঙ্ক, তামা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি ধাতুর কণিকা উপাদান (Trace elements) নামে দেহের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয়। তাদের ঐ সূক্ষ্ম পরিমাণের অনুপস্থিতিতেও যে অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে, তাও শারীরবিদ্যা-স্বীকৃত তথ্য।

শুস্লারের মতে, নিম্নলিখিত এগারোটি ধাতব-লবণ দেহের যথাযথ বৃদ্ধি, সুসংগঠন ও স্বাস্থ্যের জন্যে অতি প্রয়োজনীয়:

(১) ফস্ফেট লবণ—ক্যালসিয়াম (Calcarea phos)
লোহা (Ferrum phos)
পটাসিয়াম (Kali phos)
সোডিয়াম (Natrum phos)
ম্যাগ্‌নেসিয়াম (Magnesia phos)

(২) ক্লোরাইড লবণ—পটাসিয়াম (Kali mur)
সোডিয়াম (Natrum mur)

(৩) সাল্‌ফেট—সোডিয়াম (Natrum Sulph)
পটাসিয়াম (Kali Sulph)

(৪) ফ্লুরাইড লবণ—ক্যালসিয়াম (Calcarea fluor)

(৫) বিশুদ্ধ সিলিকা—(Silica)

শুস্লার প্রথমে ঐ সঙ্গে আর একটি সাল্‌ফেট লবণ (Calcarea Sulph) যোগ করেছিলেন, কিন্তু পরে তার ধারণা হয় যে, তা সেল সংগঠনের জন্তে অত্যাবশ্যক নয়। সে কারণে তিনি তাঁর তালিকা থেকে ঐ লবণটির নাম তুলে দেন, যদিও বর্তমানে আবার এই লবণটি সহ আরো কয়েকটি লবণ এই তালিকায় সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

শুস্লারের মতে, এসব লবণগুলি দেহের স্বাভাবিক উপাদান বলে এগুলিকে ঠিক ওষুধ-রূপে গণ্য করা যায় না। প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাবে যেমন শরীর রুগ্ন হতে থাকে, লোহার অভাবে যেমন রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, ক্যালসিয়ামের অভাবে যেমন দেহের সম্যক বৃদ্ধি হয় না, আবার যথাক্রমে ঐ সকল উপাদানের পরিপূরণে যেমন অস্বাভাবিকতা দূর হয়ে স্বাস্থ্য ও দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া ফিরে আসে, ঠিক তেমনি এই সকল উপাদানের যথাযথ প্রয়োগেও অস্বাভাবিকতা দূর হয়ে হৃতস্বাস্থ্য আবার ফিরে আসে। সুতরাং যখন কোনটির অভাবে রোগলক্ষণ দেখা দেয়, তখন প্রকৃতি যেভাবে (এবং যে পরিমাণে) সেলগুলির মধ্যে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অস্বাভাবিক অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে, ঠিক প্রয়োজনমত সে ভাবেই তাদের কম বা বেশী প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। সে জন্তে তিনি দুগ্ধশর্করা বা ল্যাকটোজের সঙ্গে যৎসামান্য লাবণিক উপাদানের উপযুক্ত মিশ্রণের দ্বারা ঐ বিশেষ লবণটিকে ওষুধরূপে প্রয়োগ করবার নির্দেশ দেন। চূর্ণ কিংবা বড়িরূপেও ঐগুলি ব্যবহার করা চলে এবং বড়ির আকারে খাওয়াই সুবিধাজনক। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সাধারণতঃ দিনে তিন থেকে পাঁচ গ্রেন মাত্রায়, বালক-বালিকাদের পক্ষে তার অর্ধেক মাত্রায় এবং শিশুদের পক্ষে তারও অর্ধেক অর্থাৎ স্বাভাবিক মাত্রার এক-চতুর্থাংশ মাত্র গ্রহণীয়। বড়িগুলিকে শুষ্ক অবস্থায় জিভের উপর রেখে কিংবা জলে গুলে, শক্তরোগে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর এবং রোগ তত শক্ত নয় বিবেচনায় এক ঘণ্টা অন্তর গ্রহণ করা উচিত। এক সঙ্গে দুই বা ততোধিক

ওষুধের ব্যবস্থায় পালা করে একটির পর একটি, নির্দেশ মত নিয়মিতভাবে খাওয়া আবশ্যক। অত্যন্ত যন্ত্রণা বা অত্যধিক খিঁচুনি হতে থাকলে ওষুধটাকে গরম জলে গুলে প্রতি দশ মিনিট পর পর খেতে দেওয়া বিধেয়। পুরাতন (Chronic) রোগে প্রতিদিন তিন বা চার বার পূর্ণমাত্রায় দেওয়া আবশ্যক। বায়োকেমিক ওষুধগুলিকে খাবার আগে উপযুক্তভাবে গুলে নেবার জন্যে গরম জলই প্রশস্ত। কোন কোন রোগে ওষুধের বাহ্য প্রয়োগে, অর্থাৎ লেপন করলেই উপকার পাওয়া যায়। আবার কোন কোন স্থলে ঐ সঙ্গে খাবার বিধানও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

বায়োকেমিক চিকিৎসায় উপযুক্ত ফল পেতে হলে ওষুধ খাবার সঙ্গে সঙ্গে যথাযোগ্য দেহচালনা ও ব্যায়াম করাও আবশ্যক। শুধু দেহচালনা বা পেশীর ব্যায়ামই নয়, ঐ সঙ্গে সুস্থ মনের সুষম ক্রিয়াও অত্যাবশ্যক। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে তাও দূর করা কর্তব্য। সে জন্যে ফলমূল, শাকসব্জি ও ছিব্‌ড়ে আছে যে সকল তরিতরকারিতে, সেগুলি অধিক পরিমাণে খাওয়া অথবা তলপেটের পেশীর উপযুক্ত ব্যায়াম বা তার উপর মালিশ কিংবা গরম এনিমা (Tepid enema) প্রভৃতির দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কারের যথাযথ ব্যবস্থা আবশ্যক। কিন্তু কোন অবস্থাতেই দেহের পক্ষে অনিষ্টকর কোন তীব্র জোলাপের দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা অনুচিত। আবার প্রচুর জল বা লেবুর সরবৎ পান করে মূত্র পরিষ্কার রাখবার ব্যবস্থা করাও অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যেক রোগীর শারীরিক অবস্থা, পছন্দ-অপছন্দ, সুলভতা, পরিপাক শক্তি প্রভৃতি অনুযায়ী উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। কখনই মদ, কড়া চা বা কফি প্রভৃতি পান করা উচিত নয় এবং সর্বদা শীতল জল, ফলের রস, সরবৎ, দুধ বা ঘোল প্রভৃতি স্নিগ্ধ পানীয়ই গ্রহণ করা চিকিৎসার আনুষঙ্গিক ফলপ্রদ ব্যবস্থা। পান, আহার, পরিশ্রম, নিদ্রা প্রভৃতি সকল বিষয়ে মিতাচারও ঐ সঙ্গে আবশ্যক।

নিম্নে কতকগুলি সাধারণ অসুখের জন্যে বায়োকেমিক ওষুধের উল্লেখ করা গেল।

(১) শীতকালের সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি নাক, গলা, শ্বাসনালী ও ফুস্‌ফুসের রোগে প্রতিদিন প্রাতে পাঁচ বড়ি ফেরাম ফস্‌ এবং অপরাহ্ণে পাঁচ বড়ি ক্যালি মূর। এভাবে রোগ হবার আগে খেলে ঐ সকল রোগের প্রতিষেধও সম্ভব।

(২) বসন্তকালের রক্তাল্পতা ও সামান্য জ্বরে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে পাঁচটি করে ফেরাম ফস্‌ ও ক্যালকেরিয়া ফস্‌ বড়ি সেব্য। প্রতিষেধেরও ঐ একইরূপ ব্যবস্থা।

(৩) গ্রীষ্মকালের বদ্‌হজম ও অন্যান্য আন্ত্রিক রোগের চিকিৎসা ও প্রতিষেধকল্পেও প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঁচটি করে বড়ি ক্যালি মূর ও নেট্রাম মূর।

(৪) ঋতুপরিবর্তনের সময় হঠাৎ তাপমাত্রা বা আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে যে সকল অসুখ হয়, তাদের চিকিৎসা কিংবা প্রতিষেধের জন্যে প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্ণে যথাক্রমে পাঁচটি করে বড়ি ফেরাম ফস্‌ ও ক্যালি মূর গ্রহণীয়।

এভাবে অসুস্থ হবার আগেই উপযুক্ত বায়োকেমিক ওষুধ গ্রহণে বহু রোগের আশঙ্কা দূর করা সম্ভব, এরূপ দাবী করা হয়। রোগ হবার পর নিরাময়ের চেয়ে রোগের প্রতিষেধই সব সময়ে কাম্য। বায়োকেমিক পদ্ধতিতে প্রতিষেধক চিকিৎসা নাকি খুবই ফলপ্রদ।*

---

*লেখক একজন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক। সুতরাং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকাতে এই বিষয়ে জোর করে কিছু বলবার অধিকারী নন।

সঞ্চয়ন

সমুদ্র-নগরী—একটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সমুদ্রগুলিকে (ভূ-পৃষ্ঠের তিন-চতুর্থাংশ) খাদ্য-সংগ্রহের উৎস, শিল্প কেন্দ্র স্থাপন ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যে বাসগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই ব্যবহার করা হবে।

বৃটেনের পিলকিংটন গ্লাস এজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি সমুদ্রে নগর স্থাপনের যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তাকে এই ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়। সমুদ্র-উপকূল থেকে কিছু দূরে কাচ ও কংক্রিটে এই নগরগুলি তৈরি হবে। শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে উন্মুক্ত স্থানের পরিমাণ ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। এই সমুদ্র-নগরীগুলি তৈরি হলে তা আর হবে না। তাছাড়া এই সমুদ্র-নগরীগুলিতে নতুন মৎস্য-উৎপাদন শিল্প গড়ে উঠবে এবং সমুদ্রের তলদেশ থেকে উত্তোলিত প্রাকৃতিক গ্যাসকে সুদীর্ঘ পাইপের সাহায্যে মূল ভূখণ্ডে নিয়ে যেতে হবে না, এই দ্বীপ-নগরীগুলিতেই তা কাজে লাগানো যাবে।

হয়তো আগামী ৫০ বছরেও এরকম একটি পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হবে না, কিন্তু তা হবার জন্যে প্রয়োজনীয় কলাকৌশল এখনই আমাদের হাতের কাছে প্রস্তুত। পিলকিংটন কমিটির স্থপতি ও ইঞ্জিনীয়ারেরা এরূপ একটি দ্বীপ-নগরীর নক্সাও প্রস্তুত করে ফেলেছেন। এই নগরী হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এর বাসিন্দারা যে কোন স্থল-শহরের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। তদুপরি তাঁরা স্থল-ভাগের চেয়ে অনেক স্বাস্থ্যকর ও প্রীতিপ্রদ আব-হাওয়ায় বাস করবেন।

সমুদ্র-নগরী তৈরির পরিকল্পনাটি নিম্নরূপ: প্রথমতঃ লোহার খুঁটির উপর ১৬-তলা একটি অ্যাম্পিথিয়েটার তৈরি করা হবে, যার মধ্যে থাকবে সমুদ্র—হ্রদের আকারে। হ্রদ না বলে লেগুন বলা ভাল, কারণ এর মধ্যে ঢোকবার একটি মাত্র প্রবেশপথ থাকবে। লেগুনের উপর ভাসবে মনুষ্য-নির্মিত অসংখ্য দ্বীপ।

সমুদ্রের বুকে লোহার খুঁটিগুলি পোঁতা হয়ে গেলে তার উপর নানা মাপের পূর্বনির্মিত কংক্রিটের টুকরা জুড়ে ঘর-বাড়ী তোলা হবে।

মধ্যের হ্রদ বা লেগুনটিতে বহু ত্রিকোণাকার কংক্রিটের সমতল নৌকা ভাসতে থাকবে। সেগুলিকে প্রয়োজনমত জুড়ে বা বিচ্ছিন্ন করে নানা মাপের দ্বীপের আকার দেওয়া হবে। তাদের উপর হাল্কা ধরণের কাচ বা প্লাষ্টিকের বাড়ী তৈরি হবে।

সহরকে ঘিরে শান্ত জলের পরিখার সৃষ্টি করা হবে। প্রাকৃতিক গ্যাসকে কাজে লাগানো হবে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে। এতে যে অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হবে, তার সাহায্যে জলকে লবণহীন করবার প্ল্যান্টগুলি চালানো হবে। নানা ঘরোয়া কাজেও এই তাপ ব্যবহার করা যাবে।

শহরের চারপাশে ১৬-তলা যে সব বাড়ী উঠবে, তাদের ফ্ল্যাটগুলিতে ২১,০০০ লোক বসবাস করতে পারবে। লেগুনের উপর দ্বীপগুলিতে আরও ৯,০০০ লোক বাস করতে পারবে। ঘরগুলি এমন ভাবে তৈরি হবে, যাতে আলোর অভাব না ঘটে। ব্যবহৃত কাচগুলি যাতে সূর্যের তাপে অতিরিক্ত গরম না হয়, সেদিকেও নজর রাখা হবে।

সহরের অধিবাসীরা এস্‌ক্যালেটর, ট্রাভেলেটর

ইত্যাদি করে যাতায়াত করবেন, এবং ছাউনি-দেওয়া পথে হাঁটবেন। জিনিষপত্র দেওয়া-নেওয়া হবে কন্‌ভেয়র বা নিউম্যাটিক টিউবের সাহায্যে।

এছাড়া আভ্যন্তরীণ পরিবহনের জন্যে থাকবে বিদ্যুৎ-চালিত নৌকা ও ওয়াটার বাস। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে হোভার-ক্র্যাফ্‌ট্‌ ও হেলিবাস।

স্কুল, থিয়েটার, লাইব্রেরী, সিনেমা বা অন্যান্য সরকারী বাড়ীগুলি থাকবে লেগুনের উপর ভাসমান বড় বড় দ্বীপগুলিতে।

বলা বাহুল্য, সমুদ্র-নগরীর একটি বড় বিনোদন ব্যবস্থা হবে জলক্রীড়া, কিন্তু সেখানে টেনিশ কোর্টও থাকবে, পাওয়ার ষ্টেশনের মাথার উপর একটা ফুটবল মাঠও থাকবে।

সমুদ্র-নগরীকে নিশ্চয়ই সমুদ্র শিল্পের উপরই নির্ভর করতে হবে, যেমন—মৎস্য-শিল্প।

সমুদ্র-জলকে লবণহীন করতে যে প্ল্যান্ট বসবে, তাতে যথেষ্ট স্বাদু জল উৎপন্ন হবে। সহরের চাহিদা মিটিয়েও পাইপযোগে মূল ভূখণ্ডে তা রপ্তানী করা যাবে।

নৌকা-নির্মাণও সহরের অর্থনীতির অন্যতম অঙ্গ হবে। তাছাড়া সমুদ্রতল থেকে বালি তুলে তা চালান দেওয়া হবে। কিন্তু সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রত্যাশা হলো সমুদ্র থেকে খনিজ সম্পদ আহরণ করা যাবে। গত বিশ্ব-যুদ্ধের সময় সমুদ্র থেকে ম্যাগ্‌নেসিয়াম আহরণ করা হয়েছিল। কমিটি মনে করেন, এভাবে সমুদ্র থেকে ষ্ট্রন্‌সিয়াম, রুবিডিয়াম, তামা এবং ম্যাঙ্গানীজ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

বিমানবাহিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারতের ভূগর্ভে সঞ্চিত ধাতব সম্পদের সন্ধান

লৌহেতর ধাতুর চাহিদা ভারতে প্রচুর। এই চাহিদা বাইরে থেকে আমদানী করেই মেটাতে হয়। বর্তমানে ভারত প্রতি বছর এই সকল ধাতু আমদানী করবার জন্যে ৬০ কোটি টাকারও বেশী খরচ করে থাকে এবং ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই খাতে ভারতের খরচের পরিমাণ ১০০ কোটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে বলে অনেকেরই ধারণা। এই অভাব মেটাবার উদ্দেশ্যে কিছুকাল ধরে বিমানবাহিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারতের ভূগর্ভে নিহিত এই সকল লৌহেতর ধাতু, যেমন—তামা, সীসা ও দস্তার সন্ধান ও সমীক্ষা করা হচ্ছে। ভূগর্ভে নিহিত ধাতব সম্পদের এইভাবে সন্ধান লওয়ার পদ্ধতি সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে। পূর্বে ভূগর্ভে সঞ্চিত ধাতব সম্পদের সমীক্ষা গ্রহণে যেখানে কয়েক বছর লাগতো, সেখানে একটি বিরাট এলাকায় উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সমন্বিত বিমানের সাহায্যে তথ্য সন্ধান এবং সমীক্ষা গ্রহণে লাগে মাত্র কয়েক সপ্তাহ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ভারত এই কাজে উদ্যোগী হয়েছে। এই পরিকল্পনার নামকরণ করা হয়েছে 'অপারেশন হার্ডরক'। ভারত সরকারের ইস্পাত ও খনি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে ৩৫ লক্ষ ডলার বা ২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমেরিকার পার্সন্স কর্পোরেশন নামে একটি বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একাজে সাহায্য করেছেন। তাদের এক্ষেত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর বিমানবাহিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভূগর্ভে নিহিত ধাতব সম্পদের সমীক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন এরো সার্ভিস কর্পোরেশন নামে একটি সংস্থা। পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই এই ধরণের

কাজ তাঁরা করেছেন। তথ্যসন্ধান ও সমীক্ষা গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায়ে কাজটি তাঁদের দ্বারাই সম্পন্ন হবে। তাঁরা বিমানযোগে ভারতের ১১৭০০০ বর্গকিলোমিটার স্থানের সমীক্ষা গ্রহণ করবেন।

বিমানবাহিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে অন্ধ্র প্রদেশের কুডাপা উপত্যকার ৩৩০০০ কিলোমিটার স্থানের সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে এই বিমানটি সমীক্ষা চালাচ্ছে রাজস্থানে। আর একটি বিমানও এই কাজে যোগ দেবে। তারপর ছটিতে মিলে ভূগর্ভে সঞ্চিত ধাতব সম্পদ সম্পর্কে ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেটিক, ম্যাগ্‌নেটিক এবং রেডিও-মেট্রিক পদ্ধতিতে সমীক্ষা চালানো হবে। বিহারের কোন কোন অংশেও এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এই পদ্ধতিতে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়ে থাকে, তাতে পরস্পর বিরোধী বিষয়বস্তুও থাকে। অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা এসব পরীক্ষা করে দেখবার পরেই ভূপদার্থ-বিজ্ঞানী ও ভূ-বিজ্ঞানীরা যথাস্থানে গিয়ে পুনরায় সমীক্ষা গ্রহণ করেন। কূপ খনন করে ধাতব পদার্থের নমুনা গ্রহণ করা হয়।

কুডাপা উপত্যকায় বিমানবাহিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে সকল স্থানে ধাতব সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে, ভূ-বিজ্ঞানী ও ভূপদার্থ-বিজ্ঞানীরা সে সকল স্থানে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন। তাঁদের পর্যালোচনার পর নির্দিষ্ট স্থানসমূহে আগামী চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে কূপ খনন করা হবে। আশা করা যাচ্ছে, সেখানে কয়েক প্রকার লৌহেতর ধাতুরই সন্ধান পাওয়া যাবে।

যে সকল মার্কিন বিজ্ঞানী ভারতের এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করেছেন, তাঁদের চেষ্টায় পৃথিবীর বহু দেশে বহু রকমের ধাতব সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে।

পার্সন্স কর্পোরেশনের এই অপারেশন হার্ডরক পরিকল্পনার ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষ মিঃ জি. কনর্যাড ওয়েক্স এই পরিকল্পনা রূপায়ণে যে সকল ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞানী ও ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানী তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের খুবই সুখ্যাতি করেছেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা মার্কিন বিজ্ঞানীরা চলে যাবার পরেও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বেশ সুষ্ঠুভাবেই এই ধাতব সম্পদ সন্ধানের কাজ চালিয়ে যাবেন।

ধাতব সম্পদ সন্ধানের ব্যাপারে এছাড়া আমেরিকার সঙ্গে ভারতের আর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তিটির নামকরণ করা হয়েছে 'অপারেশন সফ্‌ট রক'। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারতে ফস্‌ফেট কোথায় পাওয়া যেতে পারে, তারই সন্ধান নেওয়া হবে। ফস্‌ফরাস ফস্‌ফেটের প্রধান উপাদান এবং কয়েক প্রকার রাসায়নিক কৃষিসারের উপাদানও বটে। ভারত ফস্‌ফেট বাইরে থেকে আমদানী করে থাকে। ভারত সরকারের জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ফস্‌ফেট সন্ধানের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এজন্যে ১৯৬৮ সালের গত ৫ই জানুয়ারী যে ভারত মার্কিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেই চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক উন্নয়ন মিশন এই পরিকল্পনা রূপায়ণে মার্কিন ভূ-বিজ্ঞানী, রসায়ন-বিজ্ঞানী এবং ধাতু-বিজ্ঞানীরা যাতে সাহায্য করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করবেন।

ক্যান্সার নিবারণে চূড়ান্ত সাফল্যের প্রত্যাশা

ভেষজ-বিজ্ঞানী অ্যাকাডেমিশিয়ান লিওন শাবাদ এই সম্বন্ধে লিখেছেন—অসম্পূর্ণ তথ্যাদি থেকে দেখা যায়, প্রতি বছর বিভিন্ন দেশে ২৫ লক্ষেরও বেশী নর-নারী ক্যান্সারে মারা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্যান্সারবিশারদেরা জয়যুক্ত হচ্ছেন; যেমন—তিন-চার দশক আগে চর্ম-

ক্যান্সারে হাজার হাজার প্রাণহানি হতো, কিন্তু এখন আর এই ব্যাধিটি মারাত্মক নয়। স্বরযন্ত্র, জিহ্বা ও বুকের ক্যান্সারের চিকিৎসায়ও চিকিৎসকেরা সফল হয়েছেন।

নতুন নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে উন্নত হচ্ছে। অল্পকাল আগে প্রথম সংবাদ পাওয়া গেল যে, কোন কোন ধরণের ক্যান্সারের উপর হর্মোনের প্রভাব রয়েছে। প্রোষ্টেট ও স্তনের গ্ল্যাণ্ডে ক্যান্সারের চিকিৎসায় যৌন হর্মোন ব্যবহার করা হয়েছে। দেখা গেছে, যৌন হর্মোনের ব্যবহার সমগ্র ক্যান্সার-প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে।

এণ্ডোক্রিনের কাজকর্মের উপরও ক্যান্সার নির্ভরশীল। সে জন্যেই ক্যান্সারকে অবদমিত করা সম্ভব। বর্তমানে বহু বীজঘ্ন ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব ওষুধ চিকিৎসার ক্ষেত্র প্রসারিত করছে। গাছ-গাছড়া থেকে তৈরি ওষুধপত্রও চর্ম-ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

ক্যান্সারের কেমোথেরাপির বয়স এখনও পঁচিশ পার হয় নি। এক্ষেত্রে বেশ কিছু ওষুধ বেরিয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নির্দিষ্ট কয়েক ধরণের ক্যান্সারের উপর এগুলির ফল দেখা যায় এবং এই ফলও পুরাপুরি আশানুরূপ নয়। তবে এমন কতক রোগী আছে, যাদের ক্যান্সার এই পদ্ধতিতে সেরে গেছে। ১০।১২ বছর ধরে আমরা কিছু কিছু রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে আসছি। তাদের শুধু রসায়নঘটিত ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা করা হয়েছিল এবং তারা পুরাপুরি সেরে গেছে। তথাপি এখনও এটিকে ব্যাপকভাবে সফল পদ্ধতি বলা যায় না।

যে বিশেষ স্থানে ক্যান্সার হয়েছে, সেই স্থানের ধমনীতে ওষুধ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কখনো কখনো ক্যান্সারগ্রস্ত প্রত্যঙ্গকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে ওষুধযুক্ত রক্ত প্রবেশ করানো হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ৩—৮ দিনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ওষুধ প্রবেশ করালে ক্যান্সারগ্রস্ত প্রত্যঙ্গে ওষুধের ফল ৩—৪ গুণ বেড়ে যায়। এভাবে সারা দেহের উপর ওষুধের সাধারণ বিষ-ক্রিয়া কমে যায় আর ক্যান্সারের উপর এর সরাসরি প্রভাব পড়ে। এটা ধরে নেবার কারণ এই যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ক্যান্সারগ্রস্ত প্রত্যঙ্গের ধমনীতে ওষুধ প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তারপর অস্ত্রোপচার-পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হবে।

ক্যান্সার-কোষগুলিকে বিষাক্ত করে দিতে হলে এগুলির প্রধান নির্মাণোপকরণ নষ্ট করে দেওয়া দরকার। বিজ্ঞানীরা বিষাক্ত দ্রব্যাদি অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে যোগ করবার পদ্ধতি বের করেছেন, কিন্তু বাস্তবে প্রযুক্ত কোন একটি ওষুধ সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয় নি, কারণ শতাধিক রকম ক্যান্সার রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা এমন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন, যার ফলে শুধু ক্যান্সারগ্রস্ত কোষগুলি বিনষ্ট হবে, সুস্থ টিসুগুলি অক্ষত থাকবে। বীজঘ্ন ওষুধের ক্ষেত্রে গবেষণা চলছে। প্রতি বছর তিন থেকে চার হাজার বীজঘ্ন ওষুধ পরীক্ষা করে আমরা অ্যাক্টিনোমাইসেটিনের একটা সক্রিয় গ্রুপ—কিরণছত্রাক বের করেছি। বীজঘ্ন ওলিভোমাইসিন কোন কোন ক্যান্সারে কাজ দেয়।

ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক বস্তু, তেজস্ক্রিয়ার সংস্পর্শ, দেহে হর্মোন সংক্রান্ত বৈকল্য ও ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ভাইরাস প্রবেশের ফলে ক্যান্সার হয়—এই মত যে সব বিজ্ঞানীরা পোষণ করেন, আমি তাঁদের পক্ষে।

আর একদল বিজ্ঞানী মনে করেন, ক্যান্সারের কারণ শুধুই ভাইরাস। তবে উপরে বর্ণিত কারণগুলি কোষের ক্যান্সার-ধ্বংসকারী ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়—একথাও তাঁরা বাতিল করে দেন না।

পদার্থবিদ্যার গবেষণার সাহায্যে ক্যান্সার উৎপত্তির কারণ নির্ণয়ে বৃহৎ এক ধাপ অগ্রগতি হয়েছে। এই হালে ইলেক্‌ট্রনিক-প্যারাম্যাগ্‌নেটিক

পরাবর্তন পদ্ধতির সাহায্যে কোষের উপর সব গ্রুপের ক্যান্সার সৃষ্টিকারী বস্তুর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। এগুলি অন্যান্য রাসায়নিক বস্তু থেকে পৃথক এবং কোষে প্রবেশ করে নিউক্লিক অ্যাসিড বা প্রোটিনের সঙ্গে মিশে মিশ্র পদার্থ গঠন করে। পরে আবার এই মিশ্রিত পদার্থটি দুটি বস্তুতে ভাগ হয়ে যায়। এগুলির কর্মশক্তি অত্যন্ত বেশী হওয়ায় কোষের বিপাক বিপর্যস্ত হয় এবং তার ফলে ক্যান্সার দেখা দেয়। এসব বস্তুকে বলা হয় ফ্রী-র‍্যাডিক্যাল। সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কারের ফলে ধরে নেওয়া যায় যে, ক্যান্সার সৃষ্টিকারী বস্তুর তৎপরতা ও প্রদ্যোতন চলাকালে ক্যান্সার হবার প্রক্রিয়া একই রকম।

আমাদের পরিবেশে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী বস্তুর উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্যে গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতি প্রয়োগের উপর সম্প্রতি বিশেস নজর দেওয়া হয়েছে।

সহরগুলির আবহাওয়ায় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী হাইড্রোকার্বন সংক্রমণের প্রধান উৎস হলো মোটর গাড়ী থেকে নির্গত গ্যাস। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্যান্সার দেখা দেয় না। এজন্যে দেহে বহু প্রক্রিয়া ঘটে। প্রতি বছর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ৩৫ বছর বয়সের নর-নারীদের সমীক্ষা করা হয়। প্রাক-ক্যান্সার অবস্থা আবিষ্কার করা শক্ত, কিন্তু এটা করা খুবই দরকার। সোভিয়েট চিকিৎসকেরা ব্যাধিগ্রস্ত ও সুস্থ ব্যক্তিদের রক্তের সিরাম তুলনা করে দেখবার পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এটা মনে করা যেতে পারে যে, রক্তে প্রোটিন যৌগিকগুলির মধ্যে ক্যান্সারগ্রস্ত যৌগিক কিছু রয়েছে। এই সম্পর্কে সমীক্ষা চালাবার ব্যাপারে ক্যান্সার বিশারদদের কাজকর্মের একটা বড় অংশ নিয়োজিত।

ক্যান্সার সম্পর্কে যা কিছু জানা গেছে, তা সবই আবিষ্কৃত হয়েছে গত ৭০-৮০ বছরের মধ্যে, আর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদির অধিকাংশই লিখিত হয়েছে গত ৩০-৪০ বছরের মধ্যে। রঞ্জেন-রশ্মি ও রেডিয়াম আবিষ্কারের পর প্রায় ৭০ বছর কেটে গেছে, কিন্তু মাত্র ৩৫ বছর আগে রোগ চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার সুরু হয়। ক্যান্সার-সৃষ্টিকারী ভাইরাস সম্পর্কে প্রথম তথ্য পাওয়া গিয়েছিল ৫৫ বছর আগে। ৩৫ বছর আগে ক্যান্সার সৃষ্টির সহায়ক রাসায়নিক বস্তু নিয়ে গুরুত্ব সহকারে অনুশীলন সুরু হয়। বিজ্ঞানের উন্নয়নে এটিই খুবই কম সময়।

ক্যান্সার-সমস্যা কোষের নিদান-তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। সে জন্যেই ক্যান্সার সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে কোষের আভ্যন্তরীণ গঠন, এর জননযন্ত্র ও তার বৈকল্য এবং কোষে বসবাসকারী ভাইরাস সম্পর্কে গভীর অনুশীলন দরকার। ক্যান্সার সম্পর্কে অন্যান্য দিকেও গভীর অনুশীলনের প্রয়োজন।

অতি জটিল এসব সমস্যার সমাধান ঠিক কবে হবে, তা বলা শক্ত। যাহোক আমি মনে করি, ক্যান্সার নিবারণে চূড়ান্ত সাফল্য প্রত্যক্ষ করবার সর্বপ্রকার সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃত্রিম রেশম

বিমান বসু

টেরিলিন বা নাইলনের নাম শোনে নি, এমন লোক আজকাল খুব কমই দেখা যায়। আর যাঁরা টেরিলিন বা নাইলনের জামা-কাপড় পরেন, তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, এই দুটি জিনিষ ব্যবহারের সুবিধা কত। কাচবার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুকিয়ে যায়, আর ইস্ত্রি করবার তো প্রায় দরকারই হয় না। কিন্তু এই দুটি জিনিষের চলন খুব পুরনো নয়। এদের আবিষ্কারের পিছনে আছে কৃত্রিম রেশম তৈরির জন্যে মানুষের চেষ্টার বহু পুরনো ইতিহাস।

আদিম কাল থেকেই পরিধেয় কাপড়ের জন্যে মানুষকে গাছপালা ও জীবজন্তুর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়েছে। যখন সে প্রথম নিজেকে ঢাকবার প্রয়োজন মনে করলো, তখন গাছের ছালই তার প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট ছিল। ক্রমে সে আরও সভ্য হলো এবং তুলা থেকে সুতা কেটে তা দিয়ে কাপড় বুনতে শিখলো। কিন্তু এ হলো হাজার হাজার বছর আগের কথা। কোনও কোনও দেশে—যেখানে ঠাণ্ডা বেশী, সেখানে জীবজন্তুর চামড়াও গাত্রাচ্ছাদনের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া পশুর লোম থেকে সুতা কেটে তা দিয়ে গরম কাপড় তৈরি করতেও মানুষ শিখেছে বহু বছর আগে।

কিন্তু সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, গাছপালা বা জীবজন্তুর সাহায্য ছাড়া মানুষ কোন প্রকারেই কাপড় তৈরি করতে সক্ষম হয় নি। সুতি বা পশমী—এই দুটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই যে, কাপড় বোনবার আগে তুলা বা পশুর লোম থেকে প্রথমে সুতা কাটতে হয়, কারণ তুলা বা পশম আঁশ জাতীয় পদার্থ। কিন্তু রেশমের বেলায় আমরা দেখতে পাই যে, অবিচ্ছিন্ন সুতা সোজা শুঁয়াপোকার (Silk worm) গুটি থেকেই পাওয়া যায় এবং এর বেলায় সুতা কাটবার দরকার হয় না। রেশম-সুতার একটি বিশেষত্ব হলো এই যে, প্রথমাবস্থায় এটি একটি তরল পদার্থরূপে থাকে। শুঁয়াপোকা গুটি তৈরির সময় সেই তরল পদার্থটিকে মুখ থেকে বের করে যখন নিজের চারদিকে একটি খোলস তৈরি করে, তখন বাতাসের সংস্পর্শে এসে তা সুতার আকার ধারণ করে। গুটি তৈরি হয়ে গেলে তাথেকে প্রজাপতি বেরোবার আগেই সেটিকে গরম জলে ফোটানো হয়, তার ফলে ভিতরের পোকাটি মরে যায়। তারপর সেই গুটি থেকে প্রায় আধ মাইল লম্বা সুতা পাওয়া যায়। গুটি থেকে তৈরি সুতা এত সূক্ষ্ম যে, তা প্রায় চোখে দেখা যায় না। কয়েক গাছা এই রকমের সুতা পাকিয়ে কাপড় বোনবার উপযোগী মজবুদ সুতা পাওয়া যায়। তরল বস্তু থেকে সুতা তৈরির আরও একটি উদাহরণ হলো মাকড়সার জাল। মাকড়সাও শরীরের পিছন দিক থেকে লালা জাতীয় এক প্রকার তরল পদার্থ বের করে, যা বাতাসের সংস্পর্শে এসে শুকিয়ে যায় এবং সুতার আকার ধারণ করে। কিন্তু মানুষ কিছুদিন আগেও এই প্রথায় সুতা তৈরি করতে সক্ষম হয় নি এবং তাকে রোঁয়া বা আঁশ জাতীয় জিনিষ থেকে সুতা কাটতে হতো।

কৃত্রিম উপায়ে সুতা তৈরি করবার প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৮৮৪ সালে। ইংল্যাণ্ডের যোসেফ সোয়ান ইলেক্ট্রিক বাল্বের ফিলামেণ্ট তৈরির উপযোগী কিছু দ্রব্য নিয়ে কাজ

করছিলেন। তিনি নাইট্রো-সেলুলোজ ভিনিগারে দ্রবীভূত করে তা যখন সূক্ষ্ম ছিদ্র-পথে অ্যাল-কোহলের ভিতর দিয়ে চালিত করলেন, তখন এমন এক প্রকার সুতা তৈরি হলো, যা রেশমের মত দেখতে। সেই সুতা থেকে যে কাপড় তৈরি হলো, তা রেশমী কাপড়ের মতই চক্‌চকে ও মসৃণ। সেই কারণে এই সুতা কৃত্রিম রেশম নামে পরিচিত হয়।

তখন গরম হাওয়ার সংস্পর্শে এসে অ্যাসিটোন উবে যায় এবং সূক্ষ্ম সুতা পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত প্রথায় উৎপন্ন দ্রব্য কৃত্রিম রেশম নামে অভিহিত হলেও আসলে কিন্তু তাতে রেশমের চিহ্নমাত্র নেই, কারণ সব ক্ষেত্রেই কাঁচামাল হিসাবে সেলুলোজ ব্যবহার করতে হয়েছে এবং সব পদ্ধতিতেই মূলতঃ সেলুলোজকে দ্রবীভূত করে তাকে পুনরুৎপাদন করা

১নং চিত্র

ড্রাই স্পিনিং প্রোসেস। এই উপায়ে অ্যাসিটেট রেয়ন থেকে সুতা তৈরি হয়।

সেলুলোজ নাইট্রেট অথবা নাইট্রো-সেলুলোজ এবং সেলুলোজ অ্যাসিটেট কার্পাস তুলা বা পাইন জাতীয় গাছের কাঠের উপর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা তৈরি করা যায়। এই দুটি বস্তুই অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত করা যায় এবং সেই দ্রবণটি যখন সূক্ষ্ম ছিদ্র-পথে নির্গত করা হয়,

হয়েছে। সে কারণেই তাথেকে তৈরি কৃত্রিম রেশম কেবল পুনরুৎপাদিত সেলুলোজ মাত্র। প্রকৃত রেশম ও সেলুলোজের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো এই যে, রেশম বা সিল্ক প্রোটিন জাতীয় দ্রব্য, কিন্তু সেলুলোজ শর্করা (Carbohydrate) জাতীয় বস্তু। এই কারণে উপরিউক্ত বস্তুগুলিকে

কৃত্রিম রেশম না বলে রেয়ন বলা হয়। অ্যাসিটেট রেয়ন ও নাইট্রেট রেয়ন ছাড়া আরও বহু প্রকার রেয়ন উৎপাদন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কিউপ্রা রেয়ন (Cupra rayon) ও ভিস-কোজ রেয়ন (Viscose rayon) উল্লেখযোগ্য। কিউপ্রা রেয়ন তুঁতে, অ্যামোনিয়া (NH_4OH) ও সেলুলোজ থেকে তৈরি হয়। তুঁতে বা কপার সালফেট ও অ্যামোনিয়ার সংযোগে গাঢ় নীল রঙের একটি দ্রাবক তৈরি হয়, যা তুলা, কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি সেলুলোজ জাতীয় বস্তু দ্রবীভূত করতে পারে। সেই দ্রবণটি যখন জল মিশানো সালফিউরিক অ্যাসিডের ভিতর সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বের করা হয়, তখন কিউপ্রা রেয়ন পাওয়া যায়। ভিসকোজ রেয়ন তৈরির সময় সেলুলোজকে প্রথমে কষ্টিক সোডায় ভিজিয়ে রাখা হয়। পরে সেটিকে কার্বন ডাইসালফাইডে দ্রবীভূত করলে ভিসকোজ নামে গাঢ় হলুদে রঙের একটি সিরাপ জাতীয় বস্তু তৈরি হয়, যা ডাইলুট সালফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে সুতার মত শক্ত হয়ে যায়। সব রকম রেয়নই পাকিয়ে শক্ত করে তবে কাপড় বোনা হয় এবং সব ক্ষেত্রেই রেশমের মত মসৃণ ও চকচকে কাপড় পাওয়া যায়। রেয়ন মানুষের তৈরি সুতা হলেও কাঁচা মালের জন্যে আবার গাছপালার দরকার। কারণ সেলুলোজ কার্পাস তুলা, বাঁশ বা গাছের গুঁড়ি থেকেই পাওয়া যায়। গাছপালার সাহায্য ছাড়া প্রকৃত কৃত্রিম রেশম সর্বপ্রথম তৈরি হয় ১৯৩৯ সালে। সেই সালে আমেরিকার ডুপণ্ট কোম্পানীর ক্যারোথার্স (Wallace Hume Carothers) নামে এক বৈজ্ঞানিক বহু বছরের অক্লান্ত চেষ্টার পর সর্বপ্রথম কয়লা, খনিজ তেল, জল ইত্যাদির সাহায্যে রাসায়নিক প্রথায় কৃত্রিম রেশম তৈরি করেন, যা এখন নাইলন নামে পরিচিত।

বর্তমানে আমরা জানি—তুলা, পশম, রেশম ইত্যাদি সব রকম রোঁয়া বা সুতাজাতীয় জিনিষ পলিমার (Polymer) শ্রেণীভুক্ত। এদের মধ্যে তুলায় গ্লুকোজ ইউনিটগুলি [—C—O—C—] বন্ধনী দিয়ে যুক্ত। পশম বা রেশম প্রোটিন জাতীয় পলিমার, এতে

$$[-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-NH-]$$ বন্ধনির (Amide linkage)
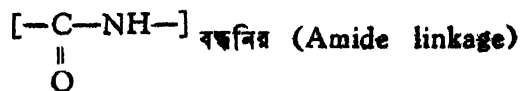
সাহায্যে পৃথক গ্রুপগুলি যুক্ত। ক্যারোথার্স হেক্সামিথিলিন ডাইআমিন (Hexamethylene diamine) ও অ্যাডিপিক অ্যাসিড (Adipic

২নং চিত্র

ওয়েট স্পিনিং প্রোসেস। এই উপায়ে ভিসকোজ রেয়ন ও কিউপ্রা রেয়ন তৈরি হয়

acid) নামে দুটি বস্তুর সাহায্যে যে নাইলন তৈরি করলেন, তাতেও [—CONH—] বন্ধনীর দ্বারাই আলাদা গ্রুপগুলি যুক্ত। সুতরাং নাইলনকে কৃত্রিম রেশম বলা চলে। তবে নাইলনের গুণ রেশমের তুলনায় অনেক বেশী। নাইলন রেশমের চেয়ে অনেক শক্ত, অনেক বেশী স্থিতিস্থাপক এবং মজবুদ। নাইলনের সুতায় বোনা কাপড়ের একটি বিশেষত্ব হলো এর ভাঁজরোধক গুণ (Anticrease property), যার জন্যে ইস্ত্রির দরকার হয় না। তাছাড়া এই সব কাপড় জলে ভেজে না বলে কাচবার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই শুকিয়ে যায়। নাইলনের ব্যবহার শুধু জামা-কাপড় তৈরিতেই সীমাবদ্ধ রইলো না। এর বিশেষ গুণের জন্যে মাছধরার সুতো ও জাল, দরজা-জানালার পরদা, মোজা, দাঁত মাজবার ব্রাশ ইত্যাদি বহু দৈনিক ব্যবহারের উপযোগী জিনিষ তৈরির কাজে নাইলন ব্যবহৃত হতে লাগলো।

অবশেষে বহু বছরের চেষ্টায় মানুষ সত্যই কৃত্রিম রেশম তৈরি করতে সক্ষম হলো। কিন্তু নাইলন আবিষ্কার মানুষের তৈরি কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক পথনির্দেশক মাত্র। নাইলনের পর ড্যু পন্ট কোম্পানী ওরলন (Orlon) ও ডেক্রন (Dacron) নামে আরও দুটি কৃত্রিম পলিমার বাজারে চালু করেন। এদের মধ্যে ওরলন একটি পলিঅ্যাক্রাইলো নাইট্রাইল (Polyacrylonitrile) এবং ডেক্রন একটি পলিএস্টার (Polyester)। ডেক্রন ইংল্যাণ্ডে টেরিলিন (Terylene) এবং ভারতে টেরিন (Terene) নামে প্রচলিত। উপরিউক্ত দুটি বস্তুই সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রথায় তৈরি। অ্যাক্রাইলোনাইট্রাইল বা ভিনা-
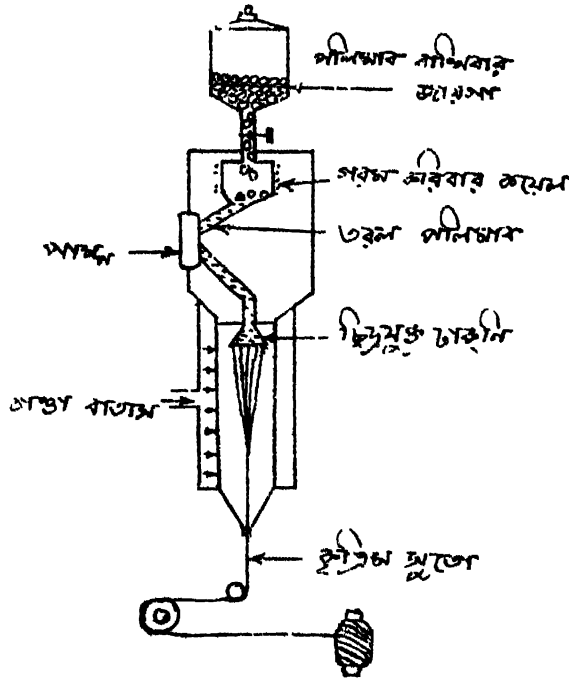
৩নং চিত্র

মেল্ট স্পিনিং প্রোসেস। এই উপায়ে নাইলন, ওরলন ও ডেক্রন থেকে সুতা তৈরি হয়।

ইল সায়ানাইডকে (Vinyl cyanide) পলিমা-রাইজ করে ওরলন তৈরি হয় এবং টেরিপ-থ্যালিক অ্যাসিড (Terephthalic acid) ও ইথিলিন গ্লাইকলের (Ethylene glycol) সংযোগে তৈরি হয় টেরিন বা ডেক্রন।

নাইলন, ওরলন ও টেরিন এই সব কটিই থার্মোপ্লাষ্টিক (Thermoplastic), কারণ গরম করলে এগুলিকে তরল অবস্থায় আনা যায়। এগুলি থেকে তা তৈরির সময়ে প্রথমে এগুলিকে তরল করা হয় এবং সেটিকে সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বের করলে ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে পুনরায় শক্ত হয়ে সূতার আকার ধারণ করে। ছিদ্রের সূক্ষ্মতার অদলবদল করে মোটা বা পাতলা সূতা তৈরি করা যায়।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের জন্যে মানুষের গাছপালা, জীবজন্তুর উপর নির্ভর ক্রমেই কমে আসছে; কারণ সে এখন কৃত্রিম উপায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নানা রকমের সূতা ও কাপড় তৈরি করতে পারে, যার গুণ সূতা বা রেশমের চেয়ে অনেক বেশী। বর্তমানে আমাদের দেশেও নাইলন ও টেরিন তৈরি সুরু হয়ে গেছে। সুতরাং যখন এই দুটি জিনিষের যথেষ্ট উৎপাদন হবে, তখন সূতা বা রেশমের ব্যবহার যে একেবারে উঠে যাবে না, তাই বা কে জানে?

লাক্ষা

শ্রীনিশীথকুমার দত্ত

সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে লাক্ষার বিভিন্ন ব্যবহার আজও অনেক মানুষের অজানা। এই পদার্থটি মানুষের কাজে লেগে আসছে প্রাচীন কাল থেকে। মহাভারতে পঞ্চ পাণ্ডবদের হত্যা করবার জন্যে দুর্যোধনের লাক্ষার গৃহে অগ্নিসংযোগের পরিকল্পনায় লাক্ষার ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মোগল দরবারে আসবাব-পত্রের পালিশ হিসাবে লাক্ষার ব্যবহারের কথা মোগল যুগের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে। খৃঃ পূঃ ১২০০ শতকেও আর্যগণ কর্তৃক ভারতে লাক্ষার ব্যবহারের কথা জানা যায়। ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব কালে ইউরোপ মহাদেশে লাক্ষার ব্যবহারের প্রচলন ঘটে। তখন অবশ্য আসবাবপত্রের পালিশ তৈরি করবার জন্যেই প্রধানতঃ লাক্ষা ব্যবহার করা হতো। প্রাকৃতিক লাক্ষাকে আজকাল রাসায়নিকের সাহায্যে বিশুদ্ধ পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে বলে এর প্রয়োগও হচ্ছে বিভিন্ন শিল্পে; যেমন—গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈরির কাজ, চীনা মাটির বাসনপত্র ও খেলবার তাসের মসৃণতা সম্পাদন, বিদ্যুৎ-অপরিবাহক পদার্থ নির্মাণ এবং অন্যান্য বহুবিধ কাজে লাক্ষার ব্যবহার হয়ে থাকে।

লাক্ষার ইতিবৃত্ত থেকে—এই পদার্থটি যে কি, অনেকেরই তা জানবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। লাক্ষা হলো একটি কীটজাত রেজিন জাতীয় (Resinous) পদার্থ। এক বিশেষ ধরণের কীটের শরীর থেকে নির্গত রস জমাট বেঁধে লাক্ষার সৃষ্টি হয়। এই কীটগুলিকে বলা হয় 'লাক্ষা-কীট', ইংরেজীতে এদের বলা হয় Laccifer Lacca। এই লাক্ষা কীট বিশেষ ধরণের বৃক্ষের নরম শাখায় আশ্রয় গ্রহণ

করে এবং এই কীটজাত রস জমাট বেঁধে বেশ কিছুটা কঠিন লাক্ষায় পরিণত হয়। যে সব বৃক্ষে এই লাক্ষা-কীট আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সব বৃক্ষগুলিকে বলা হয় আশ্রয়দাতা বৃক্ষ। অসংখ্য কীট এক জায়গায় একত্রে আশ্রয় নেয় বলেই ভারতীয় শব্দ 'লাখ' থেকে লাক্ষা নামের উৎপত্তি। এক পাউণ্ড লাক্ষা তৈরির জন্যে প্রায় ১৭,০০০—৯০,০০০ লাক্ষা-কীটের প্রয়োজন।

পৃথিবীর খুব অল্প কয়েকটি স্থানেই লাক্ষা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—ভারত, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ। ভারতের মধ্যপ্রদেশ ও বিহারেই সবচেয়ে বেশী লাক্ষা উৎপন্ন হয়। ভারত হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লাক্ষা উৎপাদন কেন্দ্র।

লাক্ষার রাসায়নিক স্বরূপ

অপরিশোধিত লাক্ষা মুখ্যতঃ একটি রজন জাতীয় পদার্থ হলেও এই রজনের (Resin) মধ্যে আছে, দুটি রঙীন রাসায়নিক, যার জন্যে লাক্ষা বা গালা দেখতে পোড়া লাল রঙের দেখায়। এগুলিকে বলা হয় লাক্ষা-রং (Lac dye)। লাক্ষা বেশ কঠিন বস্তু হলেও ভঙ্গুর এবং অল্প তাপেই গলে যায় এবং টানলেই রবারের মত বাড়ে। অপরিশোধিত লাক্ষায় কিছুটা মোম-জাতীয় পদার্থও থাকে।

রং দুটির রাসায়নিক স্বরূপ

অপরিশোধিত লাক্ষায় যে দুটি রঙীন রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, তাদের একটি জলেই দ্রবণীয় এবং জলীয় দ্রবণ দেখতে ফিকে লাল। আগেকার দিনের আল্‌তা এই জাতীয় রং (এখনকার দিনের অবশ্য বেশীর ভাগ আলতাই সাধারণ লাল রঙের জলীয় দ্রবণ)। এই লাল রঙের জলীয় দ্রবণের রাসায়নিকটি হলো ল্যাকেয়িক অ্যাসিডের (Laccaic acid) সোডিয়াম লবণ। ল্যাকেয়িক অ্যাসিডের আণবিক সঙ্কেত (Molecular formula) বলা হয়েছে $C_{20}H_{14}O_{10}$। এই বিষয়ে অবশ্য এখনও মতানৈক্য রয়েছে। উপরিউক্ত আণবিক সঙ্কেত ও আরও অন্যান্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে এই অ্যাসিডের মোটামুটি যে অণু বিন্যাস করা হয়েছে, সেটি হলো—

HOOC, O, OH, HOOC, COCH$_3$, HO, C$_2$H$_5$, O, OH
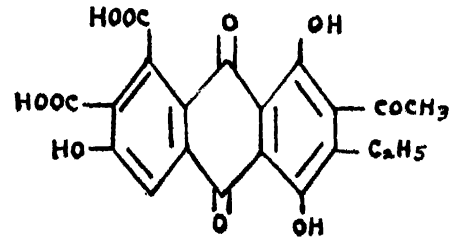
ল্যাকেয়িক অ্যাসিড ছাড়াও অপরিশোধিত লাক্ষায় আর একটি রঙীন রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, যেটি জলে দ্রবণীয় নয়, তবে স্পিরিটে দ্রবণীয়। এই জন্যেই অপরিশোধিত লাক্ষা-চূর্ণকে বহুবার জলে ধৌত করবার পরেও তাকে বর্ণহীন করা সম্ভব হয় না। এই দ্বিতীয় রঙীন রাসায়নিকটি হলো এরিথ্রোল্যাকিন (Erythrolaccin)। এরিথ্রোল্যাকিন অ্যাসিডের আণবিক সঙ্কেত হলো $C_{15}H_{10}O_6$। এরিথ্রোল্যাকিন অ্যাসিডের অণুর আণবিক বিন্যাস (Molecular structure) হলো—

O, OH, HO, OH, CH$_3$, OH, O
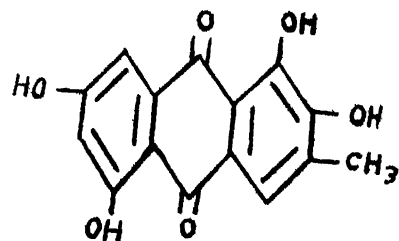
এই রঙীন রাসায়নিকটির স্পিরিট দ্রবণই আসবাবপত্রের বার্ণিস হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

লাক্ষা-রেজিনের রাসায়নিক স্বরূপ

রজনই হলো লাক্ষার প্রথম ও প্রধান অংশ। এই লাক্ষাস্থিত রজনের অধিকাংশ ভৌত ধর্মই লাক্ষার ভৌত ধর্ম হিসাবে প্রকাশ পায়। রঙীন রাসায়নিকগুলি কিছুটা মোম জাতীয় পদার্থকে অপরিশোধিত লাক্ষা থেকে রাসায়নিক উপায়ে বিচ্ছিন্ন করলেই বিশুদ্ধ লাক্ষা-রজন পাওয়া যায়। লাক্ষা-রজন অ্যালকোহলে সম্পূর্ণভাবে দ্রবণীয়। কিন্তু অ্যাসিটোনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় দেখা যায় যে, লাক্ষা-রজনের একটি অংশ অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত হয়, সেটিকে বলা হয় নরম রজন আর যে অংশটি দ্রবীভূত হয় না, সেই অংশটিকে বলা হয় কঠিন রজন। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এই দুই জাতের রজনের উপাদানগুলি বিভিন্ন। লাক্ষা-রজনকে অ্যাসিটোনের সাহায্যে অতি সহজেই এই দুই জাতের রজনে বিচ্ছিন্ন করা যায় বলে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন—লাক্ষায় এই দুই জাতের রজন সাধারণ মিশ্রণ (Mechanical mixture) হিসাবে বর্তমান। নরম রজন ও কঠিন রজনকে পৃথক পৃথকভাবে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে এই দুই ধরণের রজনের আণবিক গঠন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

কঠিন রজনকে ক্ষারের দ্বারা আর্দ্র বিশ্লেষণ (Hydrolysis) করে কতকগুলি অ্যাসিড পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

(ক) অ্যালুরিটিক অ্যাসিড (Aleuritic acid)

$$CH_2OH.(CH_2)_5.CH(OH).CH(OH).(CH_2)_7.COOH$$
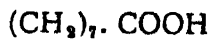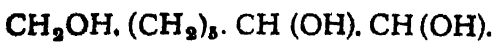
এটি হলো একটি হাইড্রক্সি পামিটিক অ্যাসিড। আণবিক ফর্মুলা $C_{16}H_{32}O_5$।

(খ) সেলোলিক অ্যাসিড (Shellolic acid)

অ্যাসিডটির আণবিক ফর্মুলা হলো—$C_{15}H_{20}O_6$। এটি একটি ডাইহাইড্রক্সি ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড।

HO, HOOC, COOH, CH_2OH, CH_3
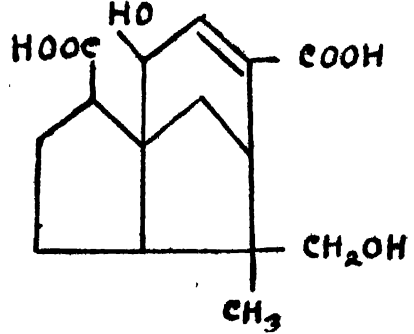
(গ) কেরোলিক অ্যাসিড (Kerrolic acid) এটি একটি টেট্রাহাইড্রক্সি মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড। আণবিক সঙ্কেত—$C_{16}H_{32}O_6$ বা $C_{15}H_{27}(OH)_4.COOH$। কঠিন রজনকে হাইড্রলিসিস করে উপরিউক্ত এই তিনটি অ্যাসিড ছাড়া আরও দুই তিনটি অ্যাসিড পাওয়া গেছে। অবশ্য সেগুলির গঠন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু এখনও জানা সম্ভব হয় নি।

কঠিন রজন থেকে এই ধরণের হাইড্রক্সি অ্যাসিড পাওয়া যায়। রসায়ন-বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন যে, লাক্ষার কঠিন রজন অংশটি হলো এষ্টার (Ester) জাতীয়। নরম রজনকে আর্দ্র বিশ্লেষণ (Hydrolysis) করে তিন-চারটি হাইড্রক্সি মেদজ অ্যাসিড (Hydroxy fatty acid) পাওয়া গেছে। বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমর্থনে বলা হয়েছে যে, নরম রজন অ্যাসিডগুলি আংশিক এষ্টার হিসাবে রয়েছে।

$$\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{Cx\,Hy}}-CO\;\vdots\,OH-H\,\vdots\;O-\underset{\displaystyle COOH}{\underset{|}{Cx\,Hy}} = \underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{Cx\,Hy}}-CO-O-\underset{\displaystyle COOH}{\underset{|}{Cx\,Hy}}$$

নরম রজনের ক্ষার জাতীয় পদার্থে দ্রবণীয়তা নিশ্চয়ই মুক্ত —COOH মূলকের অবস্থান সমর্থন করে।

এখন এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, লাক্ষা-রজন (Lac Resin) হলো আসলে দুটি ভিন্ন জাতের রজনের, অর্থাৎ নরম রজন ও কঠিন রজনের সাধারণ মিশ্রিত পদার্থ। কতকগুলি বিশেষ ধরণের হাইড্রক্সি অ্যাসিডের সংযোজনে সৃষ্টি হয়েছে নরম ও কঠিন রজনের এক একটি অণু।

বর্তমানে অনেক উন্নততর পরীক্ষা-পদ্ধতির সাহায্যে লাক্ষা-রজনের রাসায়নিক স্বরূপ সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

বিশুদ্ধতার পরিমাপ অনুযায়ী লাক্ষাকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়—

(ক) ষ্টিক ল্যাক (Stick lac)—আশ্রয়দাতা বৃক্ষ থেকে ছুরি দিয়ে চেঁচে নিয়ে যে অপরিশোধিত লাক্ষা পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় ষ্টিক ল্যাক। এই পর্যায়ের লাক্ষায় অনেক লাক্ষা-কীট ও গাছের ছালের গুঁড়া থাকে।

(খ) সিড ল্যাক (Seed lac)—সিড ল্যাক হলো ষ্টিক ল্যাকের চেয়ে কিছুটা বিশুদ্ধ। ষ্টিক ল্যাক চূর্ণকে এক গামলা জলে নাড়াচাড়া করবার পর থিতিয়ে নিলে গামলার তলদেশে যে লাক্ষাচূর্ণ পড়ে থাকে সেটা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কারণ জলের উপরিভাগে লাক্ষা-কীট ও ছালের টুকরাগুলি ভেসে ওঠে এবং ল্যাকেয়িক অ্যাসিডও জলে দ্রবীভূত হয়ে যায়। ষ্টিক ল্যাককে এইভাবে জলে ধৌত করবার পর যে লাক্ষা পাওয়া যায়, তাকে বলে Seed lac।

(গ) সেলাক (Shellac)—সিড ল্যাককে আরও বিশুদ্ধ করলে যে লাক্ষা পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় সেলাক। সিড ল্যাকের মধ্যেও ছোট ছোট কাঠের গুঁড়া, বালি ইত্যাদি থেকে যায়। অনেক সিড ল্যাককে এক সঙ্গে একটা বড় এক ধরণের কাপড়ের থলেতে রেখে থলের মুখ সেলাই করে দেওয়া হয়। একটি বিশেষ ধরণের চুল্লীর সাহায্যে তাপ দেওয়া হয়। ফলে গলিত লাক্ষা ক্রমশঃই থলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। কাপড়ের থলেটি আসলে একটি ছাঁকনির কাজ করে। বর্তমানে অবশ্য যান্ত্রিক উপায়ে সিড ল্যাককে বিশুদ্ধ করা হচ্ছে।

ব্লিচ্‌ড্‌ ল্যাক (Bleached lac)—ব্লিচ্‌ড্‌ ল্যাক হলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ লাক্ষা। সিড ল্যাক বা সেলাকে Erethrolaccin নামক রঙীন রাসায়নিকটি বর্তমান থাকে। ফলে এই দুই ধরণের লাক্ষার রং ফিকে কমলা দেখায়। সেলাককে ক্লোরিন গ্যাসের দ্বারা ধৌত করলে Erethrolaccin একেবারে বর্ণহীন পদার্থে পরিণত হয় এবং তাথেকে যে লাক্ষা পাওয়া যায় তাও হয় বর্ণহীন।

আমাদের দেশে রাঁচীর ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্রে (Indian Lac Research Institute) বহু বিজ্ঞানী লাক্ষা সম্পর্কিত গবেষণায় লিপ্ত রয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই তাঁরা লাক্ষার রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু তত্ত্বই প্রকাশ করেছেন। লাক্ষা-শিল্প প্রসারের জন্যেও এই সংস্থাটি বিশেষ উদ্যোগী।

পেট্রোলিয়াম পাতনের ইতিহাস

বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেলের শোধন-প্রক্রিয়াকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) পাতন (Distillation), (২) ভাঙন (Cracking), (৩) বিশোধন (Treating)। খনি থেকে তুলে আনা কাঁচা তেলের (Crude oil) অর্থাৎ অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের চরিত্র এমন থাকে যে, তাকে সোজাসুজি কোন প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা যায় না। কাঁচা তেলের এই অব্যবহার্যতার মোটামুটি তিনটি কারণ:

(ক) অপরিশোধিত তেলে নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যন্ত বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের এবং নানা রকম রাসায়নিক চরিত্রের অসংখ্য বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন এক সঙ্গে এমনভাবে খিচুড়ী পাকিয়ে থাকে যে, পাতনের দ্বারা তাদের বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের তৈলাংশে বিভক্ত না করলে কোন বিশেষ কাজে ব্যবহারের উপযোগী বিশেষ চরিত্রের তেল পাওয়া অসম্ভব। এখানে বিশেষ কার্যে ব্যবহার্য তেল বলতে মোটর ইঞ্জিনের জ্বালানী যন্ত্রাদির পিচ্ছিলকারী তেল (Lubricating oil) প্রভৃতির কথাই বলা হয়েছে।

(খ) শুধু স্ফুটনাঙ্কই কোন ব্যবহার্য তেলের একমাত্র প্রয়োজনীয় চরিত্র নির্ধারক নয়, এমন আরো সব চরিত্র আছে, যেমন—অকটেন মান (Octane number), যেগুলি তেলের স্ফুটনাঙ্কের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে না। কাজেই এই সব প্রয়োজনীয় চরিত্র সৃষ্টির জন্যে বিশেষ বিশেষ স্ফুটনাঙ্ক-ব্যাপ্তির (Boiling point range) তৈলাংশকে ভাঙন-ক্রিয়া (Cracking) প্রভৃতি নানারকম কৌশলে পুনরায় সংস্কার করবার (Processing) দরকার হয়।

(গ) তাছাড়া অপরিশোধিত তেলে গন্ধকাদি প্রভৃতি যে সব ক্ষতিকর তৈলমল গোড়া থেকেই থাকে, সেগুলি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সময় বিভিন্ন তৈলাংশে উপস্থিত হতে পারে। আবার তেলকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংস্কার করবার (Processing) সময় নানা ধরণের নতুন নতুন তৈলমলের উদ্ভব হতে পারে। এর একটা উদাহরণ হলো, ভাঙন-ক্রিয়ার সময় তেলে আঠা সৃষ্টিকারী উপাদানের উদ্ভব। কাজেই, এই সনাতন এবং নবোদ্ভূত তৈলমলগুলিকে দূর করবার জন্যে সর্বশেষে বিশোধনের প্রয়োজন।

এখন শোধনের অন্তর্গত প্রথম প্রক্রিয়া অর্থাৎ পেট্রোলিয়ামের পাতন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। বিভিন্ন সময়ে এই পদ্ধতি কিভাবে ক্রমোন্নত হয়েছে, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক পরম্পরা রক্ষা করে এই আলোচনা করা হবে।

পাতন (Distillation) হলো পেট্রোলিয়াম শোধনের প্রাথমিক ধাপ। সব জায়গার সব খনির কাঁচা তেলকেই এই প্রাথমিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

পাতনক্রিয়ার সাহায্যে কিভাবে বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের একাধিক তরলের কোন মিশ্রণকে তার উপাদানসমূহে বিভক্ত করা যায়, তার একটা অতি সরল উদাহরণ হলো—জল ও অ্যালকোহলের কোন মিশ্রণের পাতন। অ্যালকোহলের স্ফুটনাঙ্ক ৭৮·৩° সে, জলের ১০০° সে। কাজেই জল ও অ্যালকোহলের কোন মিশ্রণের কিছু পরিমাণ কোন পাত্রে নিয়ে পাত্রটিকে উত্তপ্ত করতে থাকলে তাপ যখন ৭৮·৩° সে-এর খুব কাছাকাছি পৌঁছাবে, তখন ঐ মিশ্রণের স্ফুটন আরম্ভ হবে এবং তা

বাষ্প হয়ে উবে যেতে থাকবে। ঐ বাষ্পের প্রথম অংশকে কোন ধারকযন্ত্রে ঘনীভূত করলে দেখা যাবে যে, তার প্রায় সবটাই অ্যালকোহল। অ্যালকোহলের স্ফুটনাঙ্ক নিম্ন মানের হবার জন্তে উত্তাপের ফলে অ্যালকোহলই প্রথমতঃ যথাসম্ভব পরিমাণে বাষ্পীভূত হয়ে মিশ্রণ থেকে আলাদা হয়ে যাবে। শেষে এমন একটা সময় আসবে, যখন মিশ্রণে আর অল্পই অ্যালকোহল অবশিষ্ট থাকবে। তাপ আরো বাড়ালে বাষ্প হিসাবে যে অংশ বেরিয়ে আসবে, তার মধ্যে প্রায় সবটাই জল। এইভাবে জল এবং অ্যালকোহলকে তাদের মিশ্রণ থেকে মোটামুটিভাবে আলাদা করা সম্ভব। সম্পূর্ণরূপে আলাদা করতে হলে প্রাপ্ত অংশগুলিকে পুনরায় পাতনক্রিয়ার দ্বারা সংস্কার করা প্রয়োজন।

অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম হলো বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের হাইড্রোকার্বন সমূহের একটি মিশ্রণ। কাজেই কোন পাতনযন্ত্রে ঐ তেলকে নিয়ে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করতে থাকলে সব চেয়ে নিম্ন স্ফুটনাঙ্কের হাইড্রোকার্বনগুলিই আগে বাষ্পীভূত হয়ে বেরিয়ে যাবে। কোন ধারকযন্ত্রে ঐ অংশকে ঘনীভূত করে রেখে দিলে যে তেল পাওয়া যাবে, তাই হলো পেট্রোলিয়ামের সবচেয়ে হাল্কা তরল অংশ, যাকে আরো পরিশুদ্ধ এবং সংস্কার করে মোটর-জ্বালানী গ্যাসোলিন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গ্যাসোলিনের অপর নাম পেট্রোল। একটা বিশেষ তাপাঙ্ক-ব্যাপ্তির মধ্যে (মোটামুটি ৪০° সে. থেকে ২০০° সে. পর্যন্ত) যে সব হাইড্রোকার্বনের স্ফুটনাঙ্ক থাকে, সেগুলিই প্রধানতঃ পেট্রোলিয়ামের এই প্রাথমিক, তথা হাল্কাতম অংশে আবির্ভূত হয়। এই অংশ আলাদা হয়ে যাবার পর পাতনযন্ত্রে অবশিষ্ট পেট্রোলিয়ামের তাপ যদি আরো বাড়ানো যায়, তবে উচ্চতর স্ফুটনাঙ্কের হাইড্রোকার্বনসমূহ বাষ্পীভূত হতে সুরু করবে। এবারও একটা বিশেষ তাপাঙ্ক-ব্যাপ্তির মধ্যে (ধরা যাক, ২০০° সে. থেকে ৩০০° সে. পর্যন্ত) যতটুকু তেল বাষ্পীভূত হয়, তাকে ঘনীভূত করে রেখে দিলে যে তৈলাংশ পাওয়া যাবে, আরো শোধনের পর তাই কেরোসিন নামে বাজারে বিক্রীত হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এই কেরোসিনের মধ্যে সেই সব হাইড্রোকার্বনই প্রধানতঃ থাকে, যাদের স্ফুটনাঙ্কের মান ২০০° সে. থেকে ৩০০° সে.-এর মধ্যে আছে। এরপর আরো বিভিন্ন উচ্চতর স্ফুটনাঙ্ক-ব্যাপ্তিতে গ্যাস তেল (Gas oil), পিচ্ছিলকারী তেল (Lubricating oil), প্যারাফিন, মোম, অ্যাস্ফাল্ট প্রভৃতি অন্যান্য অংশসমূহও পর পর পাওয়া যায়।

বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পেট্রোলিয়ামের এই পাতন করা হয়, তাকে বলা হয় আংশিক পাতন (Fractional distillation) এবং যে যন্ত্রের মধ্যে এই পাতন হয়, তার নাম বুদ্‌বুদ্‌ চোঙা (Bubble tower)। পেট্রোলিয়ামকে তার বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের অংশসমূহে বিভক্ত করবার কাজে এই যন্ত্র খুবই উপযোগী। বহু রসায়নবেত্তা এবং যন্ত্রবিদের বহুদিনের অভিজ্ঞতা, গবেষণা ও সহযোগিতার ফলে আজ এত ভাল পাতনযন্ত্র তৈরি করতে পারা গেছে। প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত কিভাবে পাতনযন্ত্রের যান্ত্রিক-কৌশল ধাপে ধাপে উন্নত হয়েছে, তার একটা চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে। আমরা এখানে সে বিষয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

এখন থেকে ঠিক কতদিন আগে এবং কোথায় সর্বপ্রথম পেট্রোলিয়ামের পাতন করা হয়েছিল, তা সঠিক জানা যায় না। অতি প্রাচীন কালে পেট্রোলিয়াম পাতনের কোন চেষ্টাই করা হয় নি—এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রাচীন কালে লেখা পুঁথিপত্রে কোথাও এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, যাতে প্রমাণ হতে পারে

যে, পেট্রোলিয়ামের পাতন-জাত অংশসমূহের ব্যবহার সম্পর্কে তখনকার লোকের কোন ধারণা ছিল। ঐসব পুঁথিপত্রের লেখা থেকে বোঝা যায় যে, মাটির উপরের স্তরে বা অল্প গভীরে পেট্রোলিয়াম বা ঐ জাতীয় সব জিনিষ তখন পাওয়া যেত। তাকে কোন রকম পরিষ্কার না করে সেই অবস্থাতেই বিভিন্ন কাজে তারা ব্যবহার করতো। বিচিত্র বর্ণের কাদা-গোলা ঘোলাটে জলের মত গাঢ় সেই অপরিশোধিত তেলকেই তখনকার লোকেরা তাদের আনাড়ী হাতে তৈরি আদিম লণ্ঠনে জ্বালিয়ে রাতের অন্ধকার দূর করতো। তাছাড়া ঐ তেল জ্বালিয়েই যে তাপ পাওয়া যেত, তাতে প্রাচীন মানুষ অনেক সময় রান্না করতো বা অন্য কোন কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় তাপ সৃষ্টি করতো। আবার অ্যাসফাল্ট-প্রধান কাঁচা তেলগুলিকে অনেক সময় নৌকা বা জাহাজের তলদেশে কাঠে লাগিয়ে সেগুলিতে যাতে সহজে নোনা না ধরে বা পচে না যায়, তার চেষ্টা করতো। কোন কোন তেলকে আবার ওষুধ হিসাবে, যেমন চর্মরোগে ব্যবহার করা হতো। শোনা যায়, এখন থেকে প্রায় দু'শো বছর আগে কোন একজন রাশিয়ান ককেশিয়ায় প্রাপ্ত পেট্রোলিয়াম থেকে পাতনক্রিয়ার সাহায্যে কিছুটা লণ্ঠন-জ্বালানী তেল প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যতদূর জানা যায়, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পেট্রোলিয়ামের পাতন সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়েছিল ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ার পিটস্‌বার্গ নামক স্থানে। এই পাতনক্রিয়ার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন যিনি তাঁর নাম স্যামুয়েল কীয়ের (Samuel Kier)। কীয়ের যে তেলের পাতন করেছিলেন, তা আকস্মিকভাবে পাওয়া গিয়েছিল এক লবণ-কূপ খুঁড়তে গিয়ে। নল বসিয়ে পেট্রোলিয়াম তোলবার রেওয়াজ তখনও প্রকৃত চালু হয় নি। এই সময়ের আরো চার বছর পরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অগাষ্ট তারিখে যেদিন ড্রেক নামক জনৈক আমেরিকান পেন্‌সিল্‌ভানিয়ার টিটাস্‌ভেলিতে ৬৯ ফুট গভীর এক নল বসিয়ে খনি থেকে প্রথম পেট্রোলিয়াম তোললেন, সেই দিন আধুনিক পেট্রোলিয়াম-শিল্পের যথার্থ জন্ম হলো। কীয়ের প্রথমে যে পাতনযন্ত্র বানিয়েছিলেন, সেটা আসলে ছিল খাড়া এবং স্তম্ভাকৃতির, অনেকটা যেন কালি রাখবার বোতলের মত, খুবই ছোট স্ফুটন-পাত্র (Distillatian still)। এই যন্ত্রে একদিনে এক ব্যারেলের বেশী তেলের পাতন করা সম্ভব হতো না। কিন্তু কয়েক বছর পরে ড্রেক এবং অন্যান্যদের তৈলকূপ থেকে যখন প্রচুর তেল উঠতে থাকলো, তখন আর এত ছোট স্ফুটন-পাত্র পেট্রোলিয়ামের অর্থকরী পাতনের উপযোগী বলে বিবেচিত হলো না। স্ফুটন-পাত্রের আয়তন অনেক বেশী বাড়িয়ে দেওয়া হলো, যদিও তাদের আকৃতি এবং পাতন-কৌশল সেই কীয়ের কর্তৃক আবিষ্কৃত স্ফুটন-পাত্রের অনুযায়ীই রইলো। প্রথম দিকে ব্যবহৃত স্ফুটন-পাত্রগুলি সাধারণতঃ ঢালাই লোহার দ্বারা তৈরি হতো। ফলে সেগুলিকে নিয়ে কাজ করা বা তাদের আয়তন বাড়ানো সহজ ছিল না। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ক্যানাডায় সর্বপ্রথম বয়লার প্লেট জুড়ে জুড়ে বৃহদাকারের স্ফুটন-পাত্র তৈরি করা হয়েছিল। সাধারণতঃ এগুলির তৈলধারণের ক্ষমতা হতো ২০০ থেকে ৪০০ ব্যারেল পর্যন্ত এবং দেখতে হতো কতকটা স্তম্ভাকৃতির। কতকগুলি আবার হতো তখনকার সময়ে সেই দেশে প্রচলিত বেটে গোলাকার পনির-বাক্সের মত আকৃতিবিশিষ্ট, যে জন্যে সেগুলিকে বলা হত পনির-বাক্স স্ফুটন-পাত্র (Cheese box stills)। কোন কোন বৃহদাকার পনির-বাক্স স্ফুটন-পাত্রের তৈলধারণ ক্ষমতা ১২০০ ব্যারেল পর্যন্তও হতো। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দেও কোন কোন জায়গায় এই ধরণের স্ফুটন-পাত্র ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। পনির-বাক্স বা চোঙাকৃতি স্ফুটন-পাত্রে সরল পাতন-ক্রিয়াতেই পেট্রোলিয়ামের

শোধন করা হতো এবং এই সব পাতন যন্ত্রের সাধারণ নাম ছিল খোল স্ফুটন-পাত্র (Shell stills)। এখন আর কোথাও এই খোল স্ফুটন-পাত্রের তেমন ব্যবহার নেই। অবশ্য তৈলাংশ বিশেষের সর্বশেষ বিশোধনের জন্যে ঐ তৈলাংশে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে তাকে পুনরায় পাতন করতে অথবা কোন কোন রকমের অ্যাস্‌ফাল্ট তৈরির জন্যে কোথাও কোথাও এখনও এই খোল স্ফুটন-পাত্রের ব্যবহার চলে। তবে এই ধরণের আধুনিক খোল স্ফুটন-পাত্রগুলি হয় অনুভূমিক ও বৃত্তাকৃতির। এগুলি সবই ইস্পাতের তৈরি এবং বৃহদাকার।

খোল স্ফুটন-পাত্রের পাতন-পদ্ধতির মূল ব্যাপারটা ১নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

থেকে বেরিয়ে যেত। এই অংশকে ঘনীভূত করলে যে তৈলাংশ পাওয়া যেত, তাই হলো ন্যাপ্‌থা বা গ্যাসোলিন। কিন্তু এই বস্তুর ব্যবহার তখন জানা ছিল না, কারণ তখনও মোটর গাড়ী আবিষ্কৃত হয় নি। অতএব একে নিয়ে যে কি করা যায়, তাই বুঝে উঠতে পারা যায় না। যেখানে-সেখানে ফেলা যায় না, কারণ এতে সহজেই আগুন ধরে যেতে পারে। নদীর জলে ফেললে জল দূষিত হবে, আবার ঘরে জমিয়ে রেখেও লাভ নেই, বরং অগ্নিকাণ্ডের ভয় আছে। তবু যেমন করেই হোক এই অস্বস্তিকর বস্তুটার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্যে তখনকার দিনের পাতনকারীরা এর পরবর্তী উচ্চতর স্ফুটনাঙ্কের তৈলাংশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।
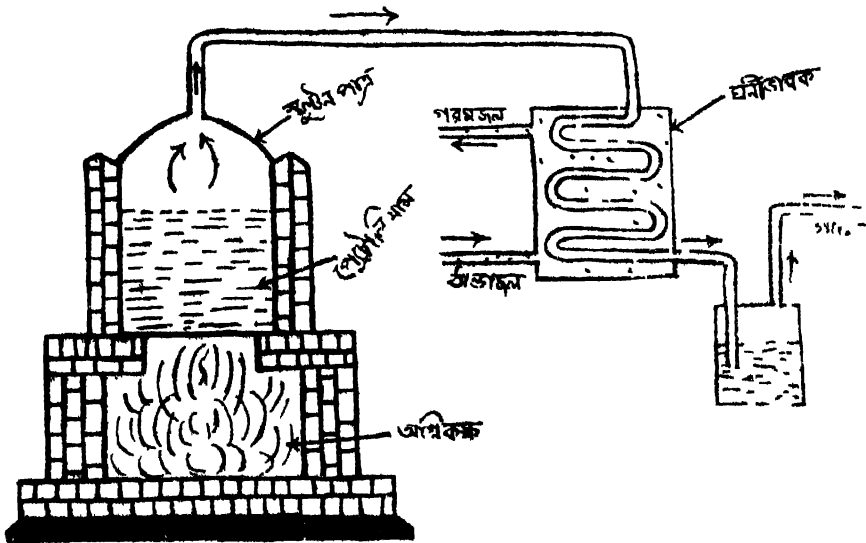
১নং চিত্র
খোল স্ফুটন-পাত্রে পেট্রোলিয়ামের পাতন।

অগ্নিকক্ষে কাঠ জ্বালিয়ে তাপ সৃষ্টি করা হতো। অনেকখানি পেট্রোলিয়ামকে একসঙ্গে একই স্ফুটন-পাত্রে রেখে তাপ দেওয়া হতো। তাতে তেলের মধ্যেকার নিম্ন-স্ফুটনাঙ্ক অধিকতর উদ্বায়ী অংশই প্রথমে বাষ্পীভূত হয়ে নলের সাহায্যে স্ফুটন-পাত্র

ন্যাপ্‌থা অংশ পাতিত হয়ে বেরিয়ে যাবার পর অগ্নিকক্ষে আরো ইন্ধন যুগিয়ে স্ফুটন-পাত্রের তাপ আরো বাড়িয়ে দেওয়া হলো। তখন উচ্চতর স্ফুটনাঙ্কের আর একটা তৈলাংশ বাষ্পীভূত হয়ে পাত্র থেকে বেরিয়ে এলো। ঘনীভবনের পর এই

অংশকে একটি বিশেষ আধারে আলাদাভাবে রেখে দেওয়া হতো। এটিই হলো কেরোসিন। তখনকার লোকেরা শুধু এই কেরোসিনের ব্যবহারই জানতো এবং এটি পাবার জন্তেই এত কষ্ট স্বীকার করে পেট্রোলিয়ামের পাতন করা হতো। অতএব যেমন করেই হোক পেট্রোলিয়াম থেকে যত বেশী পরিমাণ কেরোসিন তৈরি করা যায়, সেই দিকেই তখনকার লোকের ঝোঁক ছিল।

কেরোসিন অংশ বেরিয়ে যাবার পর অগ্নিকক্ষের তাপ কমিয়ে দেওয়া হতো। তারপর স্ফুটন-পাত্রের অবশিষ্ট ভারী তলানী পদার্থ পাম্পের সাহায্যে বাইরে বের করে এনে ফেলে দেওয়া হতো। কারণ তখন এই ভারী তেলের ব্যবহার জানা ছিল না। এই হলো কাঁচা তেলের প্রাথমিক পাতন এবং এইভাবে এক পাত্র তেলের পাতন শেষ হতে প্রায় তিন দিন সময় লাগতো।

পাত্র পরিষ্কার হলে আবার খানিকটা নতুন অপরিশোধিত তেল পাত্রে ভর্তি করা হতো এবং আগের মত আবার পাতনক্রিয়া চালানো হতো।

যেহেতু এই পদ্ধতিতে সরল পাতন-প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়েছিল, সেহেতু প্রাপ্ত কেরোসিন তৈলাংশে কিছু পরিমাণ হাল্কা তেল অর্থাৎ ন্যাপ্‌থা এবং কিছু পরিমাণ ভারী তেল অনিবার্যভাবেই অনীপ্সিত উৎপাদন হিসাবে মিশ্রিত থাকতো। ন্যাপ্‌থা অত্যন্ত উদ্বায়ী, কাজেই কেরোসিনে ন্যাপ্‌থামিশ্রিত থাকলে সেই কেরোসিনে অল্প তাপেই হঠাৎ আগুন ধরে যাবার ভয় থাকে। আবার কেরোসিনে ভারী তেল মিশে থাকলে, সহজে লণ্ঠনের ফিতা বেয়ে উপরে উঠতে পারে না। তার ফলে লণ্ঠন ভালভাবে জ্বলতে চায় না। তাছাড়া ভারী তেল মিশ্রিত কেরোসিন লণ্ঠনে জ্বালাবার সময় প্রচুর পরিমাণ ধোঁয়ারও সৃষ্টি হয়। কাজেই ভাল কেরোসিন পেতে হলে সরল পাতনক্রিয়ায় প্রাপ্ত কেরোসিন নামক অংশকে পুনরায় পাতন (Redistillation) করা প্রয়োজন, যাতে তার মধ্যেকার ঐ হাল্কা এবং ভারী উভয় তেলই দূর হয়। প্রাথমিক পাতনের মত একই রকম যন্ত্রে একই রকমভাবে তখনকার দিনে এই পুনঃপাতন করা হতো।

দেখা যাচ্ছে এই ধরণের পাতন-কৌশলের কতকগুলি অসুবিধা আছে। এখানে থেকে থেকে খানিকটা করে পেট্রোলিয়ামের পাতন করা হচ্ছে অর্থাৎ প্রথম এক পাত্র তেলের পাতন হয়ে গেলে অগ্নিকক্ষের তাপ কমিয়ে স্ফুটন-পাত্রকে ঠাণ্ডা করবার পর তাকে পরিষ্কার করে তবে আবার আর খানিকটা অপরিশোধিত তেলের পাতন করা সম্ভব। এই রকম পাতনকে বলে পরম্পরা পাতন বা খেপ-পাতন (Batch distillation)। কিন্তু যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, পাতনযন্ত্রে একদিক দিয়ে ক্রমাগতই অপরিশোধিত তেল ঢোকানো হচ্ছে এবং ঐ পাতনযন্ত্রকে এমন কায়দায় ক্রমাগত একইভাবে উত্তপ্ত রাখা হচ্ছে যে, সেই একই সময়ে অন্য দিক দিয়ে যন্ত্র থেকে বিরামহীনভাবে পাতিত তৈলাংশ বেরিয়ে যাচ্ছে, তবে সেই রকম পাতনকে বলা যায় অবিরাম পাতন। অবিরাম পাতনের তুলনায় খেপ-পাতনের সবচেয়ে বড় গলদ এই যে, এতে সময় অত্যন্ত বেশী লাগে এবং উৎপাদনের পরিমাণও হয় খুবই কম। পাতনযন্ত্রকে গরম করা, ঠাণ্ডা করা, পরিষ্কার করা প্রভৃতি কাজে যথেষ্ট পরিমাণ বাড়্‌তি মজুরী খরচও লাগে। তাছাড়া একই স্ফুটন-পাত্রকে বার বার গরম-ঠাণ্ডা করবার ফলে প্রচণ্ড রকমের তাপ-পরিবর্তন সহ্য করতে বাধ্য করলে পাত্রের আয়ু খুবই কমে যায়।

অতএব স্বভাবতঃই পেট্রোলিয়াম পাতনের পরবর্তী উন্নততর পদ্ধতি হলো অবিরাম পাতন-কৌশল। এরপর বিভিন্ন সময়ে পাতনযন্ত্রের গড়ন বা অন্যান্য অনেক রকম খুঁটিনাটির অনেক পরিবর্তন ও উন্নয়ন হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায়

সর্বত্রই অবিরাম পাতনকেই মূল অনুসরণীয় পদ্ধতি বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং আজও তাই করা হচ্ছে।

খোল স্ফুটন-পাত্রে অবিরাম পাতন

অবিরাম পাতনের কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা অনেক দিন ধরে অনেক দেশেই চলেছিল বটে এবং কোথাও কোথাও কেউ কেউ এই ব্যাপারে কিছুটা সাফল্যলাভও করেছিলেন সত্য, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ পেট্রোলিয়ামের অবিরাম পাতন সম্ভব করবার সর্বপ্রথম কৃতিত্ব হলো নোবেল ভ্রাতৃগণের, যাঁরা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার 'বাকু' নামক স্থানে প্রথম খোল স্ফুটন-পাত্রে অবিরাম পাতন সুরু করেছিলেন। আমেরিকায় এই ধরণের পাতন প্রথম আরম্ভ করা হয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। ২নং চিত্রে অবিরাম পাতন-পদ্ধতির মূল ব্যাপারটা দেখানো হলো।

কতকগুলি স্তম্ভাকৃতির খোল স্ফুটন-পাত্রকে একই সারিতে সাজিয়ে রাখা হতো। চিত্রে যেভাবে দেখানো আছে, সেইভাবে নলের দ্বারা পাত্রগুলি পর পর যুক্ত থাকতো। প্রথম পাত্রের যা উচ্চতা, দ্বিতীয় পাত্রের উচ্চতা হতো তার চেয়ে কম, যাতে সংযুক্ত নলের মধ্য দিয়ে সহজেই অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানেই তরল তেল প্রথম পাত্র থেকে দ্বিতীয় পাত্রে যেতে পারে। ঠিক ঐ ভাবে এবং ঐ কারণেই তৃতীয় পাত্রের উচ্চতাও দ্বিতীয় পাত্র অপেক্ষা কমিয়ে রাখা হতো। পাত্রগুলির নীচে অগ্নিকক্ষগুলির তাপ প্রয়োজনমত ক্রমিকভাবে পর পর বাড়িয়ে রাখা হতো। প্রথম অগ্নিকক্ষের তাপ এমন হতো যে, প্রথম পাত্রে অপরিশোধিত তেল প্রবিষ্ট হলে ঐ তাপে তেলের মধ্যেকার গ্যাসোলিন আংশিকভাবে পাতিত হয়ে বেরিয়ে যেত। বাকী উচ্চতর স্ফুটনাঙ্কের ভারী অবশিষ্টাংশ এবার মাধ্যাকর্ষণের টানে নিম্নগামী হয়ে নলের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় স্ফুটন-পাত্রে প্রবেশ করতো। এই দ্বিতীয় পাত্রের নীচে অবস্থিত অগ্নিকক্ষের তাপ এমনভাবে বাড়িয়ে রাখা হতো যে, ঐ তাপে ঐ
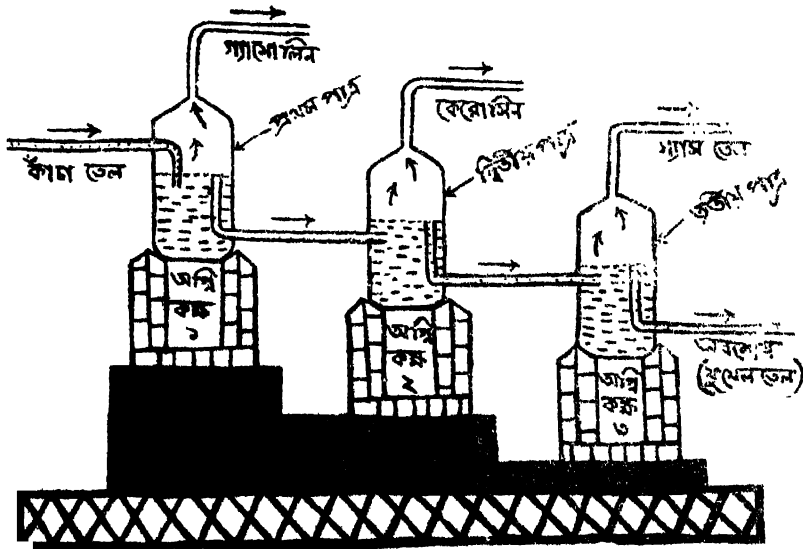
২নং চিত্র
খোল স্ফুটন-পাত্রে পেট্রোলিয়ামের অবিরাম পাতন-পদ্ধতি।

পাত্রের মধ্যেকার ভারী তেল থেকে মাত্র কেরোসিন তৈলাংশই পাতিত হয়ে বেরিয়ে যেত। এবার দ্বিতীয় পাত্রের অবশিষ্ট ভারী তেল আগের মত কৌশলে তৃতীয় পাত্রে প্রবেশ করতো এবং সে পাত্রে নীচেকার অগ্নিকক্ষের তাপ এমনভাবে আরো বাড়ানো থাকতো যে, তাতে ঐ ভারী তেল থেকে মাত্র গ্যাস-তেলের অংশই পাতিত হয়ে আলাদা হয়ে যেত। তৃতীয় পাত্রে অবশিষ্ট অপাতিত ভারী তেল অবশেষ হিসাবে পাত্র থেকে বেরিয়ে আসতো। এই ভারী অবশেষ থেকেই বিশেষ প্রক্রিয়ায় পিচ্ছিলকারী তেল তৈরি করা হতো অথবা ফুয়েল তেল হিসাবে তাপ সৃষ্টির জন্যে তাকে ব্যবহার করা হতো।

প্রথম পাত্রে অবিরাম ধারায় অপরিশোধিত তেল প্রবেশ করানো হতো এবং শেষ পাত্র থেকে অবিরামভাবে ঐ ভারী অবশেষ বেরিয়ে যেত, আর সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি স্ফুটন-পাত্র থেকে গ্যাসোলিন, কেরোসিন প্রভৃতি বিশেষ ধরণের তৈলাংশও অবিরাম ধারায় পাওয়া যেত। কাজেই এই প্রক্রিয়াকে বলা হতো অবিরাম পাতনক্রিয়া।

পরে এই প্রক্রিয়া থেকেই অবিরামভাবে পিচ্ছিলকারী তেল তৈরির কৌশল উদ্ভাবিত হয়। এই কৌশলে একই সারিতে আরো একটা স্ফুটন-পাত্র যুক্ত করা থাকতো (চিত্রে এটা দেখানো হয় নি) এবং তৃতীয় পাত্রের মধ্যেকার ভারী তেলকে বাষ্প-উত্তোলন পদ্ধতিতে (Steam lift) চতুর্থ পাত্রে নিয়ে যাবার পর সেখানে বিশেষ কৌশলে এবং সতর্কভাবে তাকে পাতন করে পিচ্ছিলকারী তেল তৈরি করা হতো।

বাষ্প-উত্তোলন পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ এই যে, ভারী তেলের সান্দ্রতা (Viscosity), তথা বহমানতার বাধা অত্যধিক হবার ফলে নলের মধ্য দিয়ে তাকে এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে নিয়ে যাওয়া কঠিন হতো। তাছাড়া ঐ তেলের স্ফুটনাঙ্ক এত উচ্চ যে, সাধারণ চাপে তাকে পাতন করতে গেলে যে পরিমাণ তাপ দিতে হয় অর্থাৎ যে তাপাঙ্কে তেলকে তুলতে হয়, তাতে তেলের মধ্যেকার উপাদানসমূহের অণুগুলির ভাঙন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পিচ্ছিলকারী তেল পেতে হলে অণুগুলিকে কোনক্রমেই ভাঙতে দেওয়া চলে না। কাজেই ঐ ভারী তেলকে অন্য কোন পাত্রে নিয়ে গিয়ে শূন্য চাপে (Under vacuum) তার পাতন করা দরকার—চাপ না থাকবার ফলে অল্প তাপেই তখন পাতন সম্ভব। কিন্তু এই কৌশলের গলদ এই যে, এতে প্রক্রিয়াটিকে অবিরাম রাখা যায় না। এর বদলে বাষ্প-উত্তোলন পদ্ধতি অবলম্বন করলে এই অসুবিধা হয় না। তৃতীয় পাত্রের মধ্যেকার ভারী তেলের নীচে কিছুটা অতি-তপ্ত (Super heated) জলীয় বাষ্প প্রবেশ করিয়ে দিলে পাত্রে তৈল-বাষ্প এবং জলীয় বাষ্পের যে মিশ্রণ উৎপন্ন হয়, তাতে তৈল-বাষ্পের আংশিক চাপ অমিশ্রিত তৈল-বাষ্পের চাপ অপেক্ষা অনেক কম থাকে। তাই তখন অল্প তাপেই ঐ তেলের পাতন সম্ভব হয়। তাছাড়া ভারী তেলের উচ্চ সান্দ্রতার জন্যে নলের মধ্য দিয়ে তাকে সহজে পাত্রান্তরিত করবার যে অসুবিধা সাধারণ পদ্ধতিতে হয়, তাও এই বাষ্প-উত্তোলন পদ্ধতিতে হয় না। কারণ অতি-তপ্ত বাষ্প তার নিজের চাপেই তেলকে নলের মধ্য দিয়ে সহজে ঠেলে নিয়ে গিয়ে অন্য পাত্রে ঢুকিয়ে দেয়।

থেপ পাতন-পদ্ধতির উন্নয়ন : আংশিক ঘনীভাবকের ব্যবহার :

অবিরাম পাতন-পদ্ধতির উদ্ভাবনে পেট্রোলিয়ামের পাতন ত্বরান্বিত হয়েছিল এবং পেট্রোলিয়ামজাত তেলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু পাতিত তৈলাংশসমূহের চরিত্রের তেমন কোন উন্নতি হয় নি। প্রক্রিয়া অবিরাম হলেও ব্যবহৃত

স্ফুটন-পাত্রগুলি এমন ছিল যে, সেগুলিতে সেই আদিম সরল পাতনের অতিরিক্ত কোন উন্নততর পাতন-পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। ফলে প্রত্যেক তৈলাংশে তার চেয়ে উচ্চতর এবং নিম্নতর স্ফুটনাঙ্কের উভয় রকমের কিছু বিশুদ্ধতর তৈলাংশসমূহ পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মোটর ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে এক দিকে গ্যাসোলিনের চাহিদা যেমন হু হু করে বেড়ে গেল, অন্য দিকে তেমনি ভালভাবে মোটর চালাবার জন্যে বিশুদ্ধতর গ্যাসোলিনের
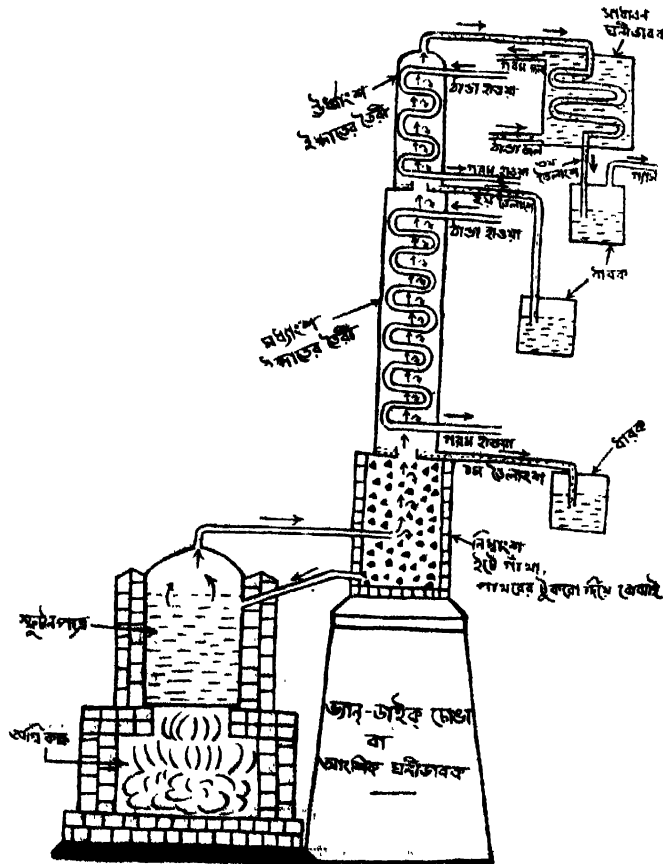
৩নং চিত্র

ভ্যান্-ডাইক টাওয়ারে উন্নত খেপ-পাতনের পদ্ধতি।

কিছু তেল অনিবার্যভাবেই মিশ্রিত থাকতো, যেগুলিকে দূর করবার জন্যে পুনঃপাতন প্রক্রিয়া অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কাজেই চেষ্টা চলছিল এমন একটা পদ্ধতি উদ্ভাবনের, যাতে পুনঃপাতন না করেই অর্থাৎ একবারেই প্রয়োজনীয়তাও বিশেষভাবে অনুভূত হলো। এই অবস্থায় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন আটলান্টিক অয়েল কোম্পানীর দু-জন কর্মী ও যন্ত্রবিদ্ ভ্যান্-ডাইক ও ইরিশ, এক নতুন পাতন-কৌশল উদ্ভাবন করেন, যা ছিল আসলে সেই

খোল স্ফুটন-পাত্রে খেপ-পাতনেরই এক উন্নততর সংস্করণ। এই পদ্ধতিতে একটা আংশিক ঘনীভাবক যন্ত্র ব্যবহার করা হতো, সেটা স্ফুটন-পাত্র এবং সাধারণ ঘনীভাবকের মাঝখানে বসানো থাকতো। এই আংশিক ঘনীভাবক যন্ত্রেরই অন্ত নাম ভ্যান্‌-ডাইক টাওয়ার (Van Dyke Tower) [৩নং চিত্র]।

আংশিক ঘনীভাবক টাওয়ারটি তিন অংশে বিভক্ত—নিম্ন, মধ্য ও উর্ধ্বাংশ। নিম্নাংশ ইটের তৈরি এবং পাথরের টুক্‌রা দিয়ে বোঝাই। মধ্যাংশ ইস্পাতের তৈরি এবং ভিতরে ঠাণ্ডা হাওয়ার দ্বারা শীতলীকরণের নল আছে। এই অংশ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। উর্ধ্বাংশও ইস্পাতের তৈরি এবং ঠাণ্ডা হাওয়াবাহী নলের দ্বারা শীতলীকৃত, তবে এই অংশ অপেক্ষাকৃত ছোট।

স্ফুটন-পাত্র থেকে উত্তপ্ত তৈল-বাষ্প নির্গত হয়ে নলের সাহায্যে ভ্যান-ডাইক টাওয়ারের নিম্নাংশের নীচের দিকে প্রবেশ করে এবং টাওয়ারের এই অংশের মধ্য দিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। ওঠবার সময় টাওয়ারের মধ্যেকার পাথরের টুক্‌রাগুলিতে তৈল-বাষ্পের গতি বাধা প্রাপ্ত হয়। ফলে বাষ্পের মধ্যেকার উচ্চতম স্ফুটনাঙ্কের ভারী অংশ ঘনীভূত হয়ে টাওয়ারের নীচে জমা হয় এবং নলের মধ্য দিয়ে আবার স্ফুটন-পাত্রে ফেরৎ যায়। যে বাষ্পাংশ ঘনীভূত হয় না, তা এবার উর্ধ্বগামী হয়ে টাওয়ারের মধ্যাংশে প্রবেশ করে এবং ঠাণ্ডা হাওয়ার নলের দ্বারা এই অংশ শীতলীকৃত থাকবার ফলে এর মধ্য দিয়ে উর্ধ্বগামী বাষ্পের মধ্যেকার অপেক্ষাকৃত ভারী অংশ ঘনীভূত হয়। টাওয়ারের মধ্যাংশের নীচে অবস্থিত নির্গমন-নলের পথে এই ঘনীভূত তেলকে বের করে নিলে পেট্রোলিয়ামের একটা ভারী তৈলাংশ পাওয়া যায়। অঘনীভূত বাষ্পাংশ এবার উর্ধ্বগামী হয়ে টাওয়ারের উর্ধ্বাংশে প্রবেশ করবে এবং এখানেও আগের মত আর একটা তৈলাংশ ঘনীভূত হয়ে নির্গমন-নল দিয়ে বেরিয়ে আসবে। টাওয়ারের এই অংশের তাপ মধ্যাংশের তাপ অপেক্ষা কম অর্থাৎ এই অংশের মধ্যেকার নলবাহিত হাওয়া অধিকতর শীতল। ফলে এখানে যে তৈলাংশ ঘনীভূত হয়, তার স্ফুটনাঙ্ক নিম্নতর। অবশ্য টাওয়ারের এই উর্ধ্বাংশেও সবটুকু তৈল-বাষ্প ঘনীভূত হয় না। অঘনীভূত বাষ্পাংশ টাওয়ারের শীর্ষ থেকে নলবাহিত হয়ে বেরিয়ে যায় এবং ঠাণ্ডা জলের দ্বারা শীতলীকৃত একটা সাধারণ ঘনীভাবকে তাকে ঘনীভূত করে আরো একটা তৈলাংশ পাওয়া যায়। এটাই পেট্রোলিয়ামের হাল্কাতম অংশ—গ্যাসোলিন। অবশ্য বাষ্পের যে অংশ ঘনীভূত হবার নয়, (অর্থাৎ পেট্রোলিয়ামের মধ্যেকার স্বাভাবিক গ্যাসীয় অংশ), তা ঐ সর্বশেষ তৈলাধার থেকে গ্যাস হিসাবে বেরিয়ে যায়। প্রয়োজন হলে তাকেও ধরে রাখা যায়।

আংশিক ঘনীভাবক যন্ত্র ব্যবহার করবার ফলে এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তৈলাংশসমূহ অধিকতর বিশুদ্ধ হয়, কিন্তু প্রক্রিয়াটি অবিরাম না হবার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না। অবশ্য তিনটি আরো বেশী স্ফুটন-পাত্র একসঙ্গে ব্যবহার করে প্রক্রিয়াটিকে অবিরাম করা অসম্ভব নয় অর্থাৎ তখন ব্যবস্থাটি এমন হবে যে, একটি পাত্রের ফুটন্ত তেলকে যখন আংশিক ঘনীভাবক যন্ত্রে পাঠানো হচ্ছে, সেই সময় আর একটি পাত্রে তেলকে ধীরে ধীরে গরম করা হচ্ছে এবং ঐ একই সময়ে পূর্বে ব্যবহৃত অন্ত একটি পাত্রকে পরিষ্কার করা হচ্ছে। কিন্তু এভাবেও স্ফুটন-পাত্রকে বারবার ঠাণ্ডা করা, গরম করা এবং পরিষ্কার করবার অসুবিধাগুলি থেকেই যায়। অতএব স্বভাবতঃই পাতন-কৌশলের পরবর্তী ধাপ উন্নয়নে এমন যন্ত্র তৈরির চেষ্টা হয়েছিল, যাতে একই সঙ্গে অবিরাম পাতনক্রিয়া চালানো যাবে এবং বিশুদ্ধতর তৈলাংশও পাওয়া যাবে। এই চেষ্টারই সর্বশেষ পরিণতি হলো পেট্রোলিয়ামের আধুনিক পাতন-যন্ত্র। অবশ্য এক দিনেই সে যন্ত্র বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয় নি, তারও পিছনে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োগ-

কুশলতার ক্রমোন্নতির ইতিহাস আছে, যদিও একই সঙ্গে অবিরাম পাতন এবং বিশুদ্ধতর তৈলাংশ তৈরির যে মূল অনুসরণীয় নীতি, তা পূর্বাপর রক্ষিত হয়েছে। আধুনিকতম পাতন-যন্ত্রের ঠিক আগে ঐ যন্ত্র তৈরির ভূমিকারূপে যে সব পাতন-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল, তাদের মধ্যে দুটির পাতন-কৌশল উল্লেখযোগ্য। এখানে তাদের বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

সঙ্গে একটি আংশিকীকরণ স্তম্ভ যুক্ত আছে।

অগ্নিকক্ষগুলির তাপ পর পর হিসাবমত এবং প্রয়োজনমত বাড়িয়ে রাখা হয় অর্থাৎ প্রথম কক্ষের যা তাপ, দ্বিতীয় কক্ষের তাপ তার চেয়ে বেশী এবং তৃতীয় কক্ষের তাপ তার চেয়েও বেশী। প্রত্যেক আংশিকীকরণ স্তম্ভের শীর্ষদেশের অভ্যন্তরে শীতলীকরণ কুণ্ডলী (Cooling coil) আছে, যেগুলির মধ্য দিয়ে সাধারণতঃ জল
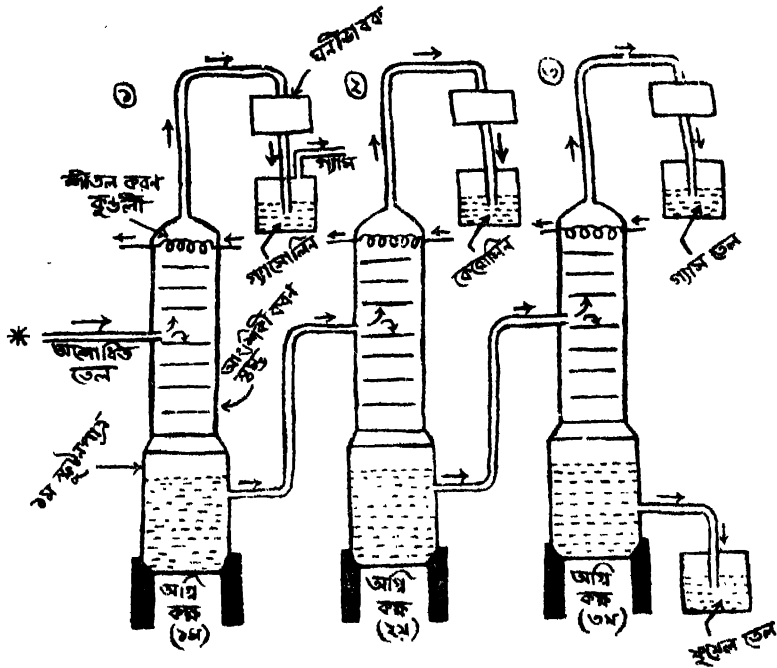
৪নং চিত্র

প্রাক-আধুনিক যুগের একটি পেট্রোলিয়াম পাতন-যন্ত্র (প্রথম যন্ত্র)।

প্রথম যন্ত্র

৪নং চিত্রে ঐ পাতন-পদ্ধতি বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে একই সারিতে (Battery) একই রকম তিনটি পাতন-একক (Distillation unit) পর পর নলের দ্বারা সংযুক্ত আছে। প্রতিটি একক হলো অগ্নিকক্ষের উপর বসানো আংশিকীকরণ স্তম্ভ (Fractionating column)-যুক্ত একটি স্ফুটন পাত্র অর্থাৎ প্রত্যেক অগ্নিকক্ষের উপর বসানো একটি স্ফুটন-পাত্রের

প্রবাহিত করে স্তম্ভের ঐ অংশকে প্রয়োজনীয় ভাবে ঠাণ্ডা রাখা হয়।

প্রথম স্ফুটন-পাত্রের সঙ্গে যুক্ত আংশিকীকরণ স্তম্ভের মাঝামাঝি স্থানে একটি নলের সাহায্যে অপরিশোধিত তেলকে অবিরামভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম স্ফুটন-পাত্রে আগে থেকেই যতটুকু তেল ছিল, তা প্রথম অগ্নিকক্ষের তাপে উত্তপ্ত থাকে এবং সেই তাপেই ঐ স্ফুটন-পাত্রের ঊর্ধ্বে অবস্থিত স্তম্ভের মধ্যেও তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখে

ক্রমনিম্ন থাকে। প্রথম অগ্নিকক্ষের তাপ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে যে, স্তম্ভের মধ্যেকার তাপ এবং উর্ধ্বমুখে তার ঐ ক্রমনিম্ন মান এমন হয় যে, ঐ স্তম্ভে প্রবিষ্ট অপরিশোধিত তেল থেকে মাত্র গ্যাসোলিন অংশই পাতিত হয়ে স্তম্ভের শীর্ষদেশের নির্গমন-নল দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। বাকী ভারী তৈলাংশ অপাতিত অবস্থায় স্তম্ভের মধ্য দিয়ে ঝরে ঝরে নীচে পড়বে এবং স্ফুটন-পাত্রে এসে জমা হবে। পাতিত গ্যাসোলিনের সঙ্গে একত্রে বাহিত হয়ে একটুখানি ভারী তৈলাংশও যদি বেরিয়ে যাবার জন্যে উর্ধ্বমুখী হয়, তবে তা ঐ শীতলীকরণ কুণ্ডলীর সংস্পর্শে আসা মাত্রই ঘনীভূত হয়ে তরল অবস্থায় ঝরে ঝরে নীচে পড়বে। তাছাড়া শীতলীকরণ কুণ্ডলীর তাপ ইচ্ছামত কমিয়ে-বাড়িয়ে নিম্নগামী তৈলাংশের স্ফুটনাঙ্ক-ব্যাপ্তিও অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। প্রথম স্ফুটন-পাত্রে যে অপাতিত তৈলাংশ জমা হয়েছে, তাকে পাম্পের সাহায্যে নলের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় আংশিকীকরণ স্তম্ভের মাঝামাঝি স্থানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই দ্বিতীয় পাতন-এককের মধ্যেকার ব্যবস্থাও প্রথম এককেরই মত, তবে দ্বিতীয় অগ্নিকক্ষের তাপ উচ্চতর থাকবার ফলে এখানকার আংশিকীকরণ স্তম্ভে পেট্রোলিয়ামের উচ্চতর স্ফুটনাঙ্কের কেরোসিন নামক অংশ পাতিত হয়ে স্তম্ভ থেকে বেরিয়ে যাবে এবং অধিকতর ভারী অংশ অপাতিত অবস্থায় আগের মতই ঝরে ঝরে পড়ে দ্বিতীয় স্ফুটন-পাত্রে জমা হবে। এখানকার স্তম্ভের শীর্ষদেশের শীতলীকরণ কুণ্ডলীর কাজও আগের মতই অর্থাৎ তা কেরোসিনকে তার সহ-বাহিত স্বল্প পরিমাণ ভারী তৈলাংশের অনীপ্সিত সংস্রব থেকে মুক্ত করে এবং কেরোসিনের স্ফুটনাঙ্ক-ব্যাপ্তিকে দরকারমত নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বিতীয় স্ফুটন-পাত্রে যে ভারী তৈলাংশ জমা হয়, তাকেও আগের মতই পাম্পের সাহায্যে নলের মধ্য দিয়ে তৃতীয় আংশিকীকরণ স্তম্ভের মাঝামাঝি স্থানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই তৃতীয় পাতন-এককের মধ্যেকার ব্যবস্থাদি আগের মতই এবং এখানকার অগ্নিকক্ষের তাপ উচ্চতর হওয়ায় এখানে গ্যাস-তেল নামক আরো ভারী এক তৈলাংশ পাতিত হয়ে স্তম্ভ থেকে নির্গত হয়। যে অংশ এখানেও পাতিত হয় না অর্থাৎ যে অংশ তৃতীয় স্ফুটন-পাত্রে জমা হয়, তার নাম ফুয়েল তেল। স্ফুটন-পাত্র থেকে নির্গমন-নলের পথে এই তেলকে বের করে নেওয়া হয় এবং অন্য রকমের প্রক্রিয়ার সাহায্যে সংস্কার করে তাথেকে পিচ্ছিলকারী তেল তৈরি করা হয়। অবশ্য ফুয়েল তেলের অন্য ব্যবহারও আছে।

এই পাতনের পদ্ধতিটি অবিরাম—কেন না, এখানে অবিরাম স্রোতে অপরিশোধিত তেলকে পাতন-যন্ত্রে প্রবেশ করানো যায় এবং অবিরাম পাম্প চালিয়ে অপাতিত তৈলাংশকে একটি পাতন-একক থেকে তার পরবর্তী এককে প্রবেশ করানো যায় এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন একক থেকে গ্যাসোলিন, কেরোসিন, গ্যাস-তেল প্রভৃতি পাতিত অংশসমূহকেও অবিরামভাবে সংগ্রহ করা যায়।

দ্বিতীয় যন্ত্র

প্রথম যন্ত্রের তুলনায় দ্বিতীয় যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে একটা বিশেষ স্ফুটন-পদ্ধতির দ্বারা উচ্চতর তাপ ব্যবহার করে অপরিশোধিত তেলকে প্রথমেই যথাসম্ভব বাষ্পীভূত করে নেওয়া হয় এবং সেই বাষ্পকে পরপর সাজানো একসারি আংশিকীকরণ স্তম্ভে বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্ক-ব্যাপ্তির তৈলাংশে ঘনীভূত করা হয়। প্রথম স্তম্ভের তলদেশ থেকে সবচেয়ে ভারী তৈলাংশ পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি স্তম্ভের তলদেশ থেকে প্রাপ্ত ঘনীভূত অংশগুলি ক্রমশঃ হাল্কা

আরও হাল্কা হতে থাকে। কিন্তু পূর্বালোচিত প্রথম যন্ত্রে অপরিশোধিত তেলকে অনুত্তপ্ত অবস্থাতেই প্রথম স্তম্ভে ঢোকানো হতো এবং বিভিন্ন স্তম্ভে যখন তা প্রবেশ করতো, তখনই ক্রমশঃ উচ্চতর তাপের সম্মুখীন হয়ে পথের মধ্যে ক্রমে এক-একটি নিম্ন স্ফুটনাঙ্কের তৈলাংশকে ছেড়ে ছেড়ে যেত। তাছাড়া প্রথম যন্ত্রের প্রথম স্তম্ভ থেকে সবচেয়ে হাল্কা তৈলাংশ পাওয়া যেত এবং পর পর বিভিন্ন স্তম্ভে প্রাপ্ত অংশগুলি ক্রমে আরো ভারী হতো।

গা দিয়ে একটা সুদীর্ঘ ধাতব নলকে চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, সেইভাবে বাঁকিয়ে-বাঁকিয়ে বসানো থাকে। অগ্নিকক্ষে আগুন জ্বলবার সময় নলটি যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়। ঐ উত্তপ্ত নলের মধ্য দিয়ে কাঁচা তেল অবিরাম ধারায় পাঠাতে থাকলে তেল তার চলবার পথে উত্তপ্ত হয়ে যায় এবং সেই উত্তপ্ত তেলের স্রোত এগিয়ে গেলে তার পিছনে যে অনুত্তপ্ত তেলের স্রোত আসছিল, তাও ঐ উত্তপ্ত নলের সংস্পর্শে উত্তপ্ত
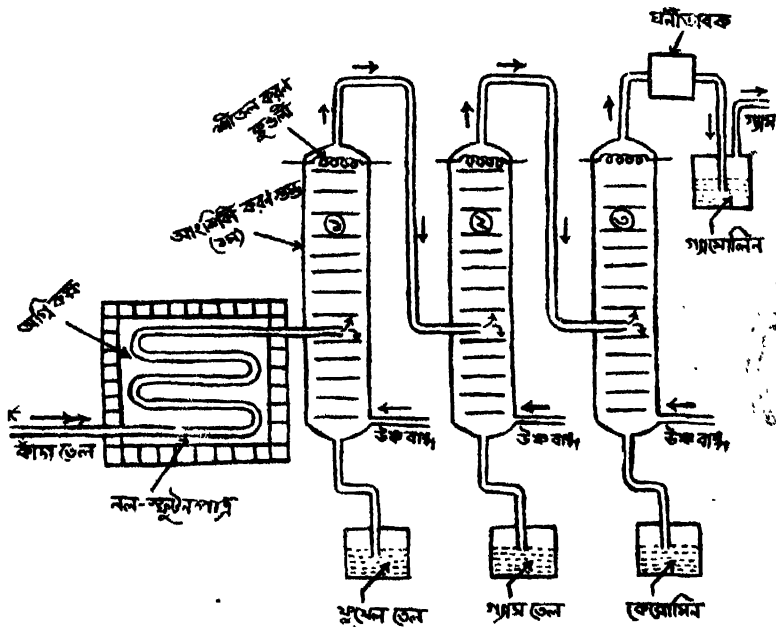
৫নং চিত্র
প্রাক-আধুনিক যুগের একটি পেট্রোলিয়াম পাতন-যন্ত্র (দ্বিতীয় যন্ত্র)।

যে বিশেষ স্ফুটন-পাত্র এই দ্বিতীয় যন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র, তার নাম নল স্ফুটন-পাত্র (Pipe still)। ক্যালিফোর্নিয়ার এম. জে. ট্রাম্বল (M. J. Trumble) নামক একজন যন্ত্রবিদ্ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এই নতুন স্ফুটন-পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন। সর্বাধুনিক পাতন-যন্ত্রেও এই নল স্ফুটন-পাত্রই ব্যবহৃত হয়। একটি অগ্নিকক্ষের অভ্যন্তরভাগের

হয়ে যায়। এইভাবে অবিরাম ধারায় তেলকে উত্তপ্ত করা সম্ভব।

দ্বিতীয় যন্ত্রের পাতন-কৌশলের একটা মোটামুটি ছক ৫নং চিত্রে দেওয়া গেল। অপরিশোধিত তেল প্রথমে নল স্ফুটন-পাত্রে প্রবেশ করে এবং সেখানকার উত্তপ্ত নলের সংস্পর্শে উত্তপ্ত হয়। নলের তাপ এত বেশী থাকে যে, তার স্পর্শে কাঁচা

তেলের মধ্যেকার ফুয়েল তেল নামক অতি ভারী অংশ ছাড়া বাকী সমস্ত কম ভারী এবং হাল্কা অংশই বাষ্পীভূত হয়। বাষ্পীভূত এবং অবাষ্পীভূত ঐ সমগ্র তপ্ত তেলই এবার প্রথম আংশিকীকরণ স্তম্ভে প্রবেশ করে। এই স্তম্ভের তলদেশ থেকে অবাষ্পীভূত ফুয়েল তেলকে সংগ্রহ করা হয় এবং বাকী অংশ বাষ্পীভূত অবস্থায় ঐ স্তম্ভ থেকে নির্গত হয়ে দ্বিতীয় স্তম্ভে প্রবেশ করে। এই দ্বিতীয় স্তম্ভে ঐ তৈল-বাষ্পের গ্যাস-তেল নামক অপেক্ষাকৃত ভারী অংশই মাত্র ঘনীভূত হয় এবং স্তম্ভের তলদেশ থেকে তাকে সংগ্রহ করা হয়। অঘনীভূত বাষ্পাংশ এবার তৃতীয় স্তম্ভে প্রবেশ করে। ঐ স্তম্ভের তলদেশ থেকে কেরোসিনকে ঘনীভূত তরল হিসাবে পাওয়া যায় এবং যে অংশ বাষ্পাকারে ঐ স্তম্ভের শীর্ষদেশের নলপথে নির্গত হয়, তাকে ঘনীভূত করলে পাওয়া যায় গ্যাসোলিন।

শীতলীকরণ কুণ্ডলী (Cooling Coils)

এখানকার প্রত্যেকটি আংশিকীকরণ স্তম্ভের শীর্ষদেশের অভ্যন্তরে শীতলীকরণ কুণ্ডলী আছে। প্রথমে যন্ত্রের আলোচনার সময়েই এদের কাজ কি, তা বলা হয়েছে। সাধারণতঃ এই কুণ্ডলীগুলির মধ্য দিয়ে শীতল জলের স্রোত প্রবাহিত করা হয়। যে জল বাইরে থেকে কুণ্ডলীতে প্রবেশ করে, তার তাপ কম থাকে এবং যে জল কাজ শেষ করে কুণ্ডলী থেকে বেরিয়ে আসে, তার তাপ হয় অনেক বেশী। এই উষ্ণ জলকে যদি ফেলে দেওয়া হয়, তবে ঐ জলে উষ্ণতারূপে যে তাপ-শক্তি রয়েছে, তা বৃথাই নষ্ট হয়। কিন্তু জলের বদলে অশুদ্ধ কাঁচা তেলকেই যদি এই সব কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা যায়, তবে তাপের জন্যে কোন বাড়্তি খরচ ছাড়াই সেই তেলকে অনেকটা তপ্ত করে নেওয়া যায়, অপর দিকে স্তম্ভের শীতলীকরণের কাজও ঠিকমতই হয়। এবার পূর্বোত্তপ্ত তেলকে নল স্ফুটন-পাত্রে প্রবেশ করালে তাকে সহজে এবং অল্প খরচেই প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় নিয়ে যাওয়া যায়। স্পষ্টতঃই তৃতীয় স্তম্ভের কুণ্ডলীর তাপ সবচেয়ে কম, দ্বিতীয়টির তাপ তার চেয়ে বেশী এবং প্রথমটির তাপ সবচেয়ে বেশী। কাজেই কাঁচা তেলকে কার্যকরীভাবে পূর্বোত্তপ্ত করবার জন্যে উচিত হবে, তাকে প্রথমেই তৃতীয় স্তম্ভের শীতলীকরণ কুণ্ডলীতে প্রবেশ করানো। তারপর সেখান থেকে পর পর দ্বিতীয় এবং প্রথম স্তম্ভের কুণ্ডলী পরিভ্রমণ করিয়ে তবে তাকে নল স্ফুটন-পাত্রে প্রবেশ করাতে হবে। শীতলীকরণ কুণ্ডলীতে জল প্রবাহিত করালে নির্গমনকারী উষ্ণ জলের মধ্যে যে পরিমাণ তাপ-শক্তি বৃথা নষ্ট হয়, তাকে এই কৌশলে ধরে রেখে কাজে লাগানো যায়। এই হলো তাপের পুনরুৎপাদন। পেট্রোলিয়াম শিল্পের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রকমের বহু তাপ-বিনিময়ক (Heat exchanger), তথা তাপ-পুনরুৎপাদক যন্ত্রের (Regenerator) ব্যবহার আর্থিক কারণেই অপরিহার্য।

প্রতিটি আংশিকীকরণ স্তম্ভের নিম্নাংশে উষ্ণ জলীয় বাষ্প প্রবেশ করানো হয়। এই বাষ্পের উপস্থিতির ফলে অঘনীভূত তৈল-বাষ্পের আংশিক চাপ কমে যায়। ফলে ঘনীভূত তৈলাংশের মধ্যেকার অধিকতর উদ্বায়ী উপাদানগুলি সহজেই বাষ্পীভূত হয়ে বেরিয়ে গিয়ে ঐ তৈলাংশের স্ফুটনাঙ্ক-নির্ভর চরিত্রগুলির সুস্থতা সম্পাদন করে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

গোদ রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মশা নিয়ে গবেষণা

আবদ্ধ মশা, যারা একই জায়গায় থেকে ডানা কাঁপাতে থাকবে, কিন্তু চলাচল করবে না, এমন মশাকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ—গোদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ ব্যবহার করা হচ্ছে।

লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মশাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, কারণ যে পোকা এই রোগের কারণ, তা মশার দ্বারা বাহিত হয়। আবদ্ধ মশার ডানার গতির পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করা হচ্ছে—কেন না, এই মশার জীবনের একটা পর্যায়ে গোদের পোকা তাদের ডানায় বাসা বাঁধে এবং তার জন্যে তাদের ডানার গতি পরিবর্তিত হয়।

ফাইলেরিয়া নামক পরজীবি পোকার দ্বারা লিম্‌ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ড ও চ্যানেলগুলি বন্ধ হয়ে গেলেই গোদের সৃষ্টি হয়। এই রোগে পা এবং হাতও বিপুলভাবে ফুলে যেতে পারে। মশার কামড়ের সঙ্গে সঙ্গেই রোগের পোকাগুলি মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। তারা মনুষ্যদেহে বড় হতে থাকে এবং তারপর লক্ষ লক্ষ মাইক্রো-ফাইলেরিয়া রক্তের মধ্যে ছেড়ে দেয়। সেই রক্ত পান করে যে মশা, সে আবার এই রোগের বিস্তার ঘটায়।

মশার ডানার মাংসপেশীই তার উড্ডয়ন শক্তির উৎস। এই পেশী অক্সিজেন ও পুষ্টিকর খাদ্যে পূর্ণ। গোদের পোকাগুলি এখানেই বাসা বাঁধে এবং মশার উড্ডয়ন-ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করে। লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার লক্ষ্য হলো এদের প্রভাবের পরিমাণ জানা।

পতঙ্গবিদ্যায় ব্যবহৃত পিনের মাথায় একটু আঠা মাখিয়ে মশাকে তার সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়। তারপর সেটিকে বায়ু-সুড়ঙ্গে রেখে তার মধ্য দিয়ে মৃদু বায়ুপ্রবাহ চালিত করা হয়। এর ফলে মশা একই জায়গায় স্থির থেকে ওড়বার জন্যে ডানা কাঁপাতে থাকে। স্ট্রোবোস্কোপের সাহায্যে মশার ডানার গতি মাপা হয়। সাধারণতঃ ডানার গতি মিনিটে ২৪,০০০ থেকে ৩০,০০০ হয়ে থাকে।

গোদ প্রতিরোধে এই গবেষণা এই রোগে বিশেষ কাজে লাগবে, তাছাড়া মশা-বাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধেও এই গবেষণা সাহায্য করবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর, ডেঙ্গু প্রভৃতি মশা-বাহিত রোগে ভুগে থাকে।

চন্দ্রলোকে উষ্ণতর স্থানের সন্ধান

স্ট্যান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা চন্দ্রের নীচু জমিতে এবং যে সকল অঞ্চলে মার্কিন মহাকাশচারীদের অবতরণের কথা, সে সকল অঞ্চলেও উষ্ণতর স্থানের সন্ধান পেয়েছেন এবং এজন্যে ঐ সকল স্থানে মহাকাশচারীদের বিপদের কোন আশঙ্কা নেই।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, চন্দ্রলোকের মেরিয়া বা শুষ্ক প্রান্তরেই এই সকল উষ্ণতর স্থানের সন্ধান পাওয়া গেছে। চন্দ্র-গর্ভ থেকে গলিত ধাতব পদার্থ বা লাভা নিঃসৃত হবার ফলেই ঐ সকল স্থান উষ্ণতর হয়েছে।

স্ট্যান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের এই তথ্যসন্ধানী কাজকর্ম ডাঃ এ. এম. পিটারসনের নির্দেশে পরিচালিত হয়েছে। আমেরিকান জিওফিজিক্যাল ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় এই বিজ্ঞানীদের রিপোর্ট পেশ করা হয়।

মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-৩৫ থেকে

বেতার তরঙ্গ চন্দ্রলোকে প্রেরিত হয় এবং সেই সব তরঙ্গ যাতে সেখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যান্‌ফোর্ডে স্থাপিত বিরাটাকার রেডিও-টেলিস্কোপ ডিসে প্রতিফলিত হতে পারে, বিজ্ঞানীরা তার ব্যবস্থা করেছেন। ঐ সব তরঙ্গ পরীক্ষা করেই বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। ঐ রিপোর্টে তাঁরা বলেছেন যে, ঐ সকল স্থানের তাপমাত্রা নিকটবর্তী অঞ্চলের তাপমাত্রার তুলনায় প্রায় দশ ডিগ্রী বেশী।

১৯৬৭ সালের ১৯শে জুলাই এক্সপ্লোরার-৩৫ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। বর্তমানে এই উপগ্রহটি চন্দ্রের বৃত্তাকার কক্ষপথে ভ্রমণ করছে। এই উপগ্রহে দশ রকমের স্বয়ংক্রিয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। ঐ উপগ্রহের নিকটবর্তী মহাকাশে যা কিছু ঘটছে, এই সকল যন্ত্র সে সম্পর্কে তথ্যাদি পৃথিবীতে প্রেরণ করছে।

এই উপগ্রহের সাহায্যেই এর আগে জানা গেছে যে, চাঁদে কোন চৌম্বক ক্ষেত্র নেই এবং পৃথিবীকে ঘিরে যেমন তেজস্ক্রিয় ভ্যান অ্যালেন বলয় রয়েছে, সে রকম কোন বলয়ও সেখানে নেই।

সোভিয়েট ইউনিয়নের লুনা-১০ নামে উপগ্রহটি এই বিষয়ে এক বছর পূর্বে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছে, তার সঙ্গে কিন্তু এই সব তথ্যের মিল নেই। লুনা-১০ চাঁদের পাশ দিয়ে যাবার সময় চন্দ্রলোকে চৌম্বক ক্ষেত্রের এবং ব্যাপক ক্ষেত্রে সৌরঝঞ্ঝার সন্ধান পায়।

এক্সপ্লোরার-৩৫-এর প্রধান বিজ্ঞানী ডাঃ নরম্যান এফ. নেস এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আট মাস ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে তথ্যানুসন্ধানের কাজে নিযুক্ত থেকেও এই উপগ্রহের সাহায্যে চন্দ্রলোকে চৌম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগ্‌নেটোস্ফিয়ারের সন্ধান পাওয়া যায় নি। আর সৌরঝঞ্ঝা চন্দ্রলোকের পাশ দিয়ে বিনা বাধায় বয়ে যাচ্ছে।

ভ্যান অ্যালেন বলয়ের আবিষ্কর্তা ডাঃ জেম্‌স্ এ. ভ্যান অ্যালেন বলেছেন যে, চাঁদে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মধ্যে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় না—অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেটিক্যালী এই গ্রহটি নিষ্ক্রিয় ও জড়।

গমের প্রোটিন অংশের বৃদ্ধি

বৃটেনে পরীক্ষায় দেখা গেছে, শীতকালীন গমের ক্ষেত্রে শেষ পরিচর্যার সময় যে নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়, তা যদি আরও বিলম্বে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে গমের প্রোটিনের অনুপাত বৃদ্ধি পায়। আরও দেখা গেছে—এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে গমের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

তিন বছর ধরে ফাইসন্স ফার্টিলাইজারস্ লিমিটেড এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তার ফল ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজের কাজের দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। দেখা গেছে, বৃটেনের আবহাওয়ায় শেষ পরিচর্যার কাল মে মাস পর্যন্ত বিলম্বিত করলে সর্বোত্তম ফল পাওয়া যায়।

আরও ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে, গমে শীষ আসবার মুখে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা সম্ভব হলে। কিন্তু সাধারণ প্রচলিত কৃষি-ব্যবস্থায় তা সম্ভব হয় না।

বার্লির ক্ষেত্রে কিন্তু বিলম্বিত নাইট্রোজেন প্রয়োগে এত ভাল ফল পাওয়া যায় না।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে—১৯৬৮

২১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা
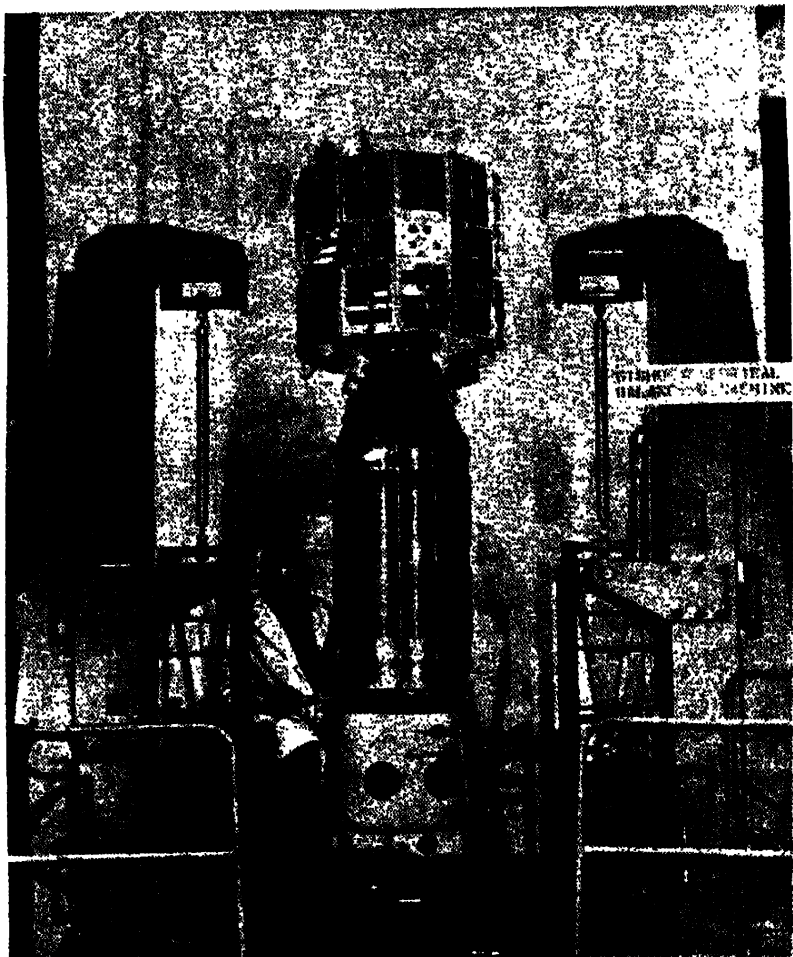
পৃথিবীর উপর সূর্যকিরণের এক্স-রে, আলট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রভাব নিরূপণের উদ্দেশ্যে গত ৫ই মার্চ এই ৮৯ গ্র্যাম ওজনের সোলরাড (*solrad*) উপগ্রহটি চার-পর্যায়ী স্কাউট রকেটের সাহায্যে 'নাসা'র ওয়ালোপস্ আইল্যাণ্ড ষ্টেশন (ভার্জিনিয়া) থেকে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে।

করে দেখ

একই ফুলে দু-রকম রং করবার কৌশল

ডাঁটাসমেত একটা সাদা কারনেশন ফুল (অন্য কোন রকম সাদা ফুল হলেও চলবে) নিয়ে এসে ডাঁটাটার খানিকটা অবধি দু-ভাগে চিরে নাও। এবার দুটা গ্লাসে জল ভর্তি কর। একটা গ্লাসের জলে একটু লাল রং (খাবার জিনিষে যে রং ব্যবহার করা হয়) মিশিয়ে দাও। জলটা লাল হয়ে যাবে। এবার রঙীন জল ও পরিষ্কার জলের গ্লাস দুটাকে পাশাপাশি রেখে ফুলের চেরা ডাঁটাটার এক অংশ রঙীন জলে ও অপর অংশটাকে পরিষ্কার জলের মধ্যে বসিয়ে দাও। কেমন করে করতে হবে, ছবিটা
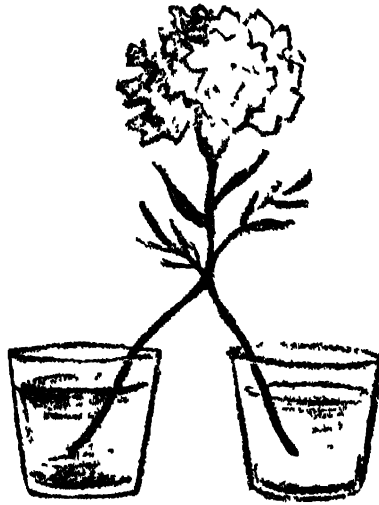
দেখলেই বুঝতে পারবে। কয়েক ঘণ্টা পরেই দেখতে পাবে—সাদা ফুলটার অর্ধেকটা সুন্দর হাল্কা লাল রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে এবং অপর অর্ধেক সাদাই রয়ে গেছে।

ব্যাপারটা হলো এই যে, উদ্ভিদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৈশিক নলের মধ্য দিয়ে মাটি থেকে জল উপরে উঠে গিয়ে কাণ্ড, পাতা ও ফুলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও কর্তিত স্থান দিয়ে তরল পদার্থ উপরে উঠে যায়। এই পরীক্ষা থেকে তোমরা উদ্ভিদের রস-শোষণের বিষয়টাও বুঝতে পারবে।

আখের কথা

মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় নানারকম ফসলের মধ্যে আখ অন্যতম। এই আখের রস থেকে তৈরি হয় চিনি। তাই পৃথিবীর সর্বত্রই আখের চাহিদা। অবশ্য আখের রস ছাড়া অনেক দেশে বীট থেকেও চিনি প্রস্তুত করা হয়। তবুও আখের চিনি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হবার ফলে এই ফসলের চাহিদাও ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। আখের ইতিহাস খুব প্রাচীন। আখ ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ। আখ কবে কোন্ দেশে প্রথম উৎপাদন করা হয়েছিল, সে কথা সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় নি। প্রায় ৩৭৫ অব্দের কোন সাহিত্যে আখের চিনির উল্লেখ আছে। খুব সম্ভব ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উর্বর জমি আর দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেই সর্বপ্রথম আখের চাষ হয়। সম্ভবতঃ এখান থেকে চৈনিক পর্যটকেরা আখের বীজ অন্যান্য দেশে নিয়ে যায়। এছাড়া আরবীয়রাও আখের চাষ অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রসারিত করে। প্রাচীন মিশরীয়রাও আখের রস থেকে চিনি প্রস্তুত করতে পারতো। রস থেকে চিনি তৈয়রর ক্ষেত্রে সর্ব-প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন Andreas Sigismund ১৭৪৭ সালে। এছাড়া ১৮০২ সালে আরও উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন Franz Karl Achard।

ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রচুর আখ উৎপন্ন হয়। এর প্রায় সবটাই চিনি প্রস্তুতে লাগানো হয়। আখ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের ফলে ভারত বিশ্বে চিনি উৎপাদনে একটি প্রধান ভূমিকাও নিতে পেরেছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রধান আখের চিনি উৎপাদনকারী দেশ আমেরিকার কিউবা রাজ্য। দু-বছর আগের হিসাব অনুযায়ী এখানে প্রায় আশি লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয়েছে। কিউবা ছাড়া ব্রেজিলও প্রচুর চিনি উৎপাদন করে। বিশ্বে এর স্থান দ্বিতীয়। ভারতবর্ষ তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে। ভারতে প্রতি বছরে প্রায় পাঁচ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয়। ভারতের উত্তর প্রদেশেই সবচেয়ে ভাল জাতের আখ উৎপন্ন হয়। বিশ্বের অন্যান্য চিনি-উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে ফিলিপাইন, আমেরিকার মেক্সিকো ইত্যাদি দেশই প্রধান। প্রায় সব দেশেই কম-বেশী এই অতি প্রয়োজনীয় ফসল উৎপন্ন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও একটি শ্রেষ্ঠ উৎপাদক। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আখ ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ। আখের কাণ্ড রসাল ও বেশ পুরু। নরম অবস্থায় আখ চিবিয়ে রসও পান করা হয়। আখের রস অতি সুস্বাদু আর দেহের পক্ষে উপকারীও বটে। সাধারণতঃ যন্ত্রের সাহায্যে আখ থেকে রস বের করে নেওয়া হয়। এই রস থেকেই চিনি বা গুড় তৈরি হয়ে থাকে। চিনিকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সুক্রোজ (Sucrose) বলা হয়। এর মধ্যে অন্য কোন পদার্থ প্রায়শঃই থাকে না, অথচ গুড়ের মধ্যে সুক্রোজ ছাড়া গ্লুকোজ ও (Glucose) বেশ কিছু পরিমাণে

থাকায় গুড় পুষ্টিকর। রস নিঙড়ানোর পর আখের ছিব্‌ড়া ভারতে সাধারণতঃ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অন্যান্য কতকগুলি ব্যবহার্য জিনিষও এই ছিব্‌ড়ার সাহায্যে তৈরি করা হয়। আখের রস ছাড়াও কয়েক ধরণের মোম আর রঞ্জন আখ থেকে পাওয়া যায়।

আখ নানা ধরণের মাটিতে জন্মায়, যেমন—এঁটেল বা দোআঁশ মাটি। সাধারণতঃ দোআঁশ মাটিতেই সবচেয়ে বেশী ফসল পাওয়া সম্ভব। যে সব অঞ্চলে বছরে প্রায় ত্রিশ থেকে দেড়-শ' ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, সে সব অঞ্চলেই আখ চাষ করা চলে। বিশ থেকে পঞ্চাশ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী ফলন সম্ভব। শীতকালেই আখের ফলন ভাল হয়। আখ সাধারণতঃ রোপণ করবার ১২ থেকে ২০ মাস পরেই পেকে ওঠে। আখের গায়ে এক ধরণের চোখ দেখা যায়। ঐ চোখ ফুলে উঠলে আখ কাটবার সময় হয়েছে বলে মনে করা হয়। এছাড়া অবশ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়। এটি হলো—আখের রস কোন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার দ্বারা চিনির মোট পরিমাণ ঠিক করা।

আখ খুব গভীর করে মাটিতে রোপণ করা দরকার। এর ফলে বীজ মাটির গভীরে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ উত্তর ভারতে ফেব্রুয়ারী আর সেপ্টেম্বর মাসেই এই ফসল রোপণের কাজ করা হয়। দক্ষিণ ভারতে জানুয়ারী আর জুলাই মাসে রোপণ করা হয়। উত্তর ভারতের আখ সরু আর দক্ষিণ ভারতের আখ মোটা। ভারতে উৎপন্ন আখের মোট পরিমাণের অর্ধেকেরও বেশী জন্মায় উত্তর ভারতে। এর ফলে এখানে ভারতে উৎপাদিত চিনির শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগই পাওয়া যায়।

আখ সাধারণতঃ এক বছর জমিতে থাকে। এই কারণে আখ চাষের জন্যে প্রচুর যত্নের দরকার। এই যত্নের মধ্যে সার প্রয়োগই প্রধান। এর মধ্যে জৈব আর রাসায়নিক সারই মুখ্য। ভাল সার প্রয়োগের ফলে জমির উৎপাদন-ক্ষমতা প্রচুর বৃদ্ধি পায়। সারের প্রয়োগ-পদ্ধতিও নিয়মিত হওয়া দরকার। ভারতে সাধারণতঃ জৈব সারের প্রয়োগ হয় বেশী। এর ফলে ভারতে আখের উৎপাদন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম—পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম, একর প্রতি মাত্র ১৫ টন। অথচ ভারতে আখ-চাষের জমির মোট পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। কিউবায় অতি উন্নত ধারায় চাষের ফলে এখানকার আখের উৎপাদন একর প্রতি অনেক বেশী। নানা সারের মধ্যে আখ-চাষে অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার ফস্‌ফেট ইত্যাদি প্রধানতঃ ব্যবহার করা হয়। ভারতে নানা জাতের আখ জন্মায়। বিভিন্ন প্রদেশে এই বিভিন্ন জাতের আখ উৎপন্ন হয়। সব অঞ্চলের আখে এক রকমের রস পাওয়া যায় না।

আখের উৎপাদন পৃথিবীর সর্বত্রই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। চিনি মানুষের অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ বলে সব দেশেই এজন্যে কৃষিবিদেরা নানা প্রকার গবেষণাও করে

থাকেন। ভারতবর্ষেও বর্তমানে এই ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। এসব সত্ত্বেও এদেশে চিনির উৎপাদন মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। এই ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী মহলে যথেষ্ট আগ্রহ থাকা দরকার। চিনি উৎপাদনের কারখানার সংখ্যাও এদেশে যথেষ্ট নয়। সাধারণতঃ ভারতের মোট কারখানাগুলির বেশীর ভাগই উত্তর ভারতে—কানপুর, গাজীপুর ইত্যাদি জায়গাতেই সবচেয়ে বেশী চিনি উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ ভারতের মহারাষ্ট্র, মহীশূর, হায়দরাবাদ ইত্যাদি জায়গায়ও চিনি উৎপাদন করা হয়। এছাড়া পাঞ্জাব, বিহার, মাদ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গেও প্রচুর চিনি উৎপন্ন হয়।

চিনি উৎপাদন করা ছাড়াও ভারতে আখের রস থেকে প্রচুর পরিমাণে গুড় তৈরি করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ যে সব জায়গায় কোন চিনির কারখানা নেই, সেই সব অঞ্চলে আখের রসের সবটাই গুড় তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে চিনিই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ভারতবর্ষে চিনির ব্যবহারও পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য ও উন্নত দেশের তুলনায় অনেক কম। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও এদেশে অত্যন্ত বেশী দামে চিনি কিনতে হয়। ভারতবর্ষে চিনির উৎপাদন ও আখ-চাষে আরও উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। এই দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল রেখে তাই আখের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে অবিলম্বে নজর দেওয়া দরকার।

সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর প্রথম পাখী—আর্কিঅপ্টেরিক্স

পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রাণীদের এখন আর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না—ক্রমে ক্রমে কালের অতল গহনে তারা লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক, ভূতাত্ত্বিক ও খনিজ সম্পদ আহরণকালীন খনন-কার্যের সময় পৃথিবীর নানাস্থানে সেকালের নানা জাতীয় প্রাণীর কিছু কিছু চিহ্ন আজও পাওয়া যায়। প্রাণী-বিজ্ঞানীরা এই সমস্ত প্রাণীর কঙ্কাল দেখে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করে তাদের সম্বন্ধে বহু অজানা তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যার সাহায্যে আমরা জানতে পারি, প্রাচীন প্রাণীদের বিচিত্র স্বভাব-চরিত্র ও আকার-আয়তনের কথা। এইভাবে পণ্ডিত ব্যক্তিদের গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে আমরা পৃথিবীর প্রথম পাখীর সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানতে পারি।

জার্মেনীর সোলেন্‌হফেন নামক স্থানে পাথরের খনিতে পৃথিবীর প্রথম পাখীর হাড় ও পালক পাওয়া যায়। এই কারণে এর প্রথম নামকরণ করা হয় 'সোলেন্‌হফেন পাখী'। কিন্তু বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এর নাম দিয়েছেন আর্কিঅপ্টেরিক্স। এটি গ্রীক শব্দ, এর অর্থ হলো—পুরাতন পাখী।

প্রাণী-বিজ্ঞানীরা পাথরের খনিতে পাওয়া হাড় ও পালক নিয়ে গবেষণা করে পৃথিবীর প্রথম পাখীর স্বভাব-চরিত্র ও শরীরের গঠন সম্পর্কে যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন—এখানে সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

আর্কিঅপ্টেরিক্স পাখী নাকি অনেকটা একালের কাকের মত ছিল। তবে এই পাখীরা আকারে ছিল কাকের চেয়ে বেশ বড়। মাথাটি ছিল বড় এবং চোখ দুটিও বেশ বড়-বড়। এই চোখের সাহায্যে এরা অনেক দূরের জিনিষ দেখতে পেত এবং দূর থেকেই শত্রুর আগমন টের পেয়ে সাবধান হতে পারতো।

এদের ডানা আজকালকার পাখীদের ডানার মত ছিল না। ডানাগুলি ছিল আকারে বেশ বড় এবং ডানার মধ্যে ছোট-ছোট আঙ্গুল ছিল। ডানার সাহায্যে এরা খুব দ্রুতবেগে উড়তে পারতো।

আজকালকার কোন পাখীর দাঁত আমরা দেখতে পাই না। স্তন্যপায়ী জীব এবং পক্ষী জাতীয় জীবের মধ্যে পার্থক্য এই দাঁত নিয়ে, অর্থাৎ যাদের ডানা আছে, তাদের দাঁত দেখা যায় না। কিন্তু পৃথিবীর প্রথম পাখীর পাখা তো ছিলই, সেই সঙ্গে নাকি দাঁতও ছিল। আজকাল আমরা অবশ্য পাখীর দাঁতের কথা ভাবতেও পারি না।

এই পাখীর গড়ন ছিল বিচিত্র। এদের লেজ ছিল সরীসৃপের মত লম্বা, হাড় ও মাংস দিয়ে গড়া এবং পালক দিয়ে ঢাকা। এদের লেজ এই যুগের সাধারণ পাখীর লেজের মত ছিল না—খানিকটা গোসাপের লেজের মত। গোসাপের লেজে জোড়া জোড়া করে পালক পরালে যেমন হয়, আর্কিঅপ্টেরিক্স পাখীদের লেজও ছিল ঠিক তেমনি।

এরা দুটি লম্বা লম্বা পায়ের সাহায্যে সহজেই হেঁটে বেড়াতে পারতো। এদের ডানায় বাঁকানো নখের মত আরো দুটি অঙ্গ ছিল। এই নখের সাহায্যে এরা বাঁদুড়ের মত গাছের ডালে ঝুলে থাকতে পারতো।

আর্কিঅপ্টেরিক্স সেকালের পোকামাকড়, গাছের ফল ও নদী বা সমুদ্রের মাছ ধরে খেতো। এরা অত্যন্ত সাহসী ছিল। সেকালের অন্যান্য পাখীরা যখন এদের আক্রমণ করতো তখন এই পাখীরা নিজেদের শক্ত ডানা এবং পায়ের আঙ্গুলের ধারালো নখ ব্যবহার করতো। অনেক সময় দাঁত দিয়েও শত্রুর গলা কামড়ে ধরতো।

এরা খুব শান্তিপ্রিয় না হলেও বিনা কারণে অন্য পাখীকে আক্রমণ করতো না। এটাই এদের স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল।

সুনীল সরকার

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। রঙীন আলোকচিত্র সম্বন্ধে কিছু বলুন।

মহুয়া দে, কলিকাতা-৫৪

প্র. ২। মানুষের দেহে জলের সমতা বজায় থাকে কি ভাবে?

কবিতা চক্রবর্তী, কলিকাতা-৫৭

শ্যামল গুপ্ত, কলিকাতা

উঃ ১। আলোকচিত্র আবিষ্কারের প্রথম যুগে শুধুমাত্র সাদা আর কালো রঙের মাধ্যমেই আলোকচিত্র পরিস্ফুট করা যেত। কিন্তু শুধুমাত্র সাদা ও কালো রঙের মাধ্যমেই সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা চলে না—তাই আবিষ্কার হলো রঙীন আলোকচিত্রের। কোন জিনিষ সাদা বলতে আমরা বুঝি, সাতটি রঙের সংমিশ্রণ। সেই রকমই কোন জিনিষ কালো মানে সাতটা রং-ই জিনিষটা শোষণ করেছে। ফটোগ্রাফিক প্লেটে প্রলেপ দেওয়া অবদ্রবকে (সাধারণতঃ রৌপ্য হ্যালাইড) আলো প্রভাবিত করতে পারে। যে বস্তুর প্রতিচ্ছবি আমরা চাই, তার দেহ থেকে প্রতিফলিত আলোর তীব্রতার তারতম্য অনুযায়ী অবদ্রবের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয় এবং আমরা তদনুরূপ প্রতিচ্ছবি পাই। এই ফটোগ্রাফিক প্লেটকে নেগেটিভ বলা হয় এই কারণে যে, আমাদের চুলের রং যেখানে কালো, ফটোগ্রাফিক প্লেটে—চুলের রং সেখানে ঠিক উল্টো অর্থাৎ সাদা। সাধারণ আলোকচিত্রে ব্যবহৃত ফটোগ্রাফিক প্লেটে রঙীন আলোর প্রভাব কালোরই সমতুল্য।

এখন আমরা রঙীন আলোকচিত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করবো। সাধারণতঃ আমরা সাতটি রঙের কথা বলে থাকি, কিন্তু দেখা যায় নীল সবুজ ও লাল—এই তিনটিই প্রধান রং। অবশিষ্ট রংগুলি এদের যথোপযুক্ত সংমিশ্রণে তৈরি করা যায়।

রঙীন আলোকচিত্রে ব্যবহৃত ফিল্মগুলিতে সাধারণ ফিল্মের একটি স্তরের পরিবর্তে তিনটি স্তরের অবদ্রব মাখানো থাকে। এই তিনটি স্তরের উপর প্রধান তিনটি আলো পর্যায়ক্রমে প্রভাব বিস্তার করে। সর্বপ্রথম স্তরে শুধুমাত্র নীল রঙের প্রভাব কার্যকরী। দ্বিতীয় স্তরের মাধ্যমে লাল ও সবুজ রং প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু নীল রং পারে না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে যথাক্রমে শুধুমাত্র সবুজ ও লাল আলোই প্রভাব বিস্তার করে। নীল, সবুজ ও লাল আলোর প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে হলুদ, নীল-লোহিত এবং নীল-সবুজ প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি হয়। প্রথম ও দ্বিতীয়

স্তরের মাঝে একটি শোষক স্তর নীল আলোর গতিরোধ করে এবং সর্বশেষ স্তরের নীচে একটি অ্যান্টি-হেলেশন স্তর থাকে, যে অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় আলো শোষণ করে নেয়, যাতে এই আলো ফিরে যাবার সময় প্রতিচ্ছবিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে।

সাধারণ আলোকচিত্র গ্রহণের সময় যেমন আলোছায়ার দিকে নজর রাখতে হয়, রঙীন আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে সেই রকম বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। সূর্য থেকে যে অতিবেগুনী রশ্মি নির্গত হয়, সেটা রঙীন চিত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই কারণে রঙীন আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে দিনের আলো অপেক্ষা কৃত্রিম আলোই শ্রেয়।

উঃ ২। জীবনধারণের জন্যে বায়ু এবং জল অপরিহার্য। এই দুটি ছাড়া জীবনধারণ করা অসম্ভব। আমাদের দেহের ওজনের শতকরা প্রায় সত্তর ভাগই জল। দেহের মধ্যেকার এই জল বিভিন্ন দেহের বিভিন্ন উপাদানকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে নানাভাবে সাহায্য করে।

সত্তর ভাগ জলের বেশীর ভাগই থাকে কোষের মধ্যে, বেশ কিছু ভাগ থাকে কোষের বাইরের তরল পদার্থে ও অল্প পরিমাণ থাকে রক্তে।

এত জল দেহের মধ্যে সাধারণতঃ দুই ভাবে আসে। প্রথমতঃ খাবারের সঙ্গে যে জল পান করা হয়, তাথেকে এবং খাদ্যবস্তুর জীবনক্রিয়ায় পাওয়া জল থেকে।

দেহের এই জল ব্যয় হয় সাধারণতঃ মলমূত্র, ঘাম ও ফুস্‌ফুসের মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে আমরা যতটা জল গ্রহণ করি ও যতটা জল ত্যাগ করি—তার উপরই দেহের জলের সমতা নির্ভর করে।

পানীয় দ্রব্য, খাদ্যবস্তু, খাদ্যবস্তুর জারনক্রিয়া প্রভৃতির মাধ্যমে যে জল আমরা গ্রহণ করি, ঠিক সেই পরিমাণ জল মলমূত্র, ঘাম ও ফুস্‌ফুস দিয়ে বেরিয়ে যায়—ফলে দেহে জলের সমতা রক্ষিত হয়।

এই সমতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। কেন না, আয়ের তুলনায় জলের ব্যয় বেশী হলে শরীরের রক্ত ঘনীভূত হতে থাকে, ফলে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। তবে অবশ্য ঘনীভূত যাতে না হয়—অবস্থাবিশেষে শরীরযন্ত্র তার জন্যে "কোষীয় তরল পদার্থ" (Cellular Fluid) দিয়ে জলের দরকার মেটাতে চেষ্টা করে। আয়ের তুলনায় শরীরের মধ্যে জলের ব্যয় বেশী হলে, সমতা বজায় রাখবার জন্যে শরীর থেকে বাইরে জলের নির্গমনও কমে যায়, অর্থাৎ প্রস্রাব ও ঘামের পরিমাণ কমে যায়। ফলে আয়-ব্যয়ের হিসাবও সমান থাকে। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, দেহে জলের সমতা ঠিক রাখবার ব্যবস্থা নানাভাবে দেহেই করা থাকে।

শরীরে জলের খরচার পরিমাণ বেশী হওয়াও যেমন খারাপ, তেমনি অত্যধিক

জলপানও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রয়োজনের তুলনায় বেশী জল থাকলে শরীরের বিভিন্ন কোষগুলি ফুলে যায়। ফলে নানারকম মারাত্মক উপসর্গ এসেও জুটতে পারে। সুতরাং পরিমিত পরিমাণ জল পান করাই উচিত।

ঘামের মাধ্যমে লবণ জাতীয় পদার্থ দেহ থেকে বাইরে চলে আসে। তাই প্রচুর ঘাম হলে দেহের মধ্যেকার বেশ কিছু পরিমাণ লবণ নষ্ট হয়। এজন্তে জলের প্রয়োজনের সময় জলের সঙ্গে লবণজাতীয় জিনিষ গ্রহণ করা দরকার। তা ছাড়া জলের সঙ্গে লবণ জাতীয় জিনিষ গ্রহণ করলে ঐ জল শুধু জলের তুলনায় প্রায় পনেরো ষোল গুণ বেশী সময় দেহের মধ্যে থাকে।

শ্যামসুন্দর দে।

বিবিধ

লোকরঞ্জক বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদকদের সভা

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জন্তে বিজ্ঞান ও শিল্প সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন কেমন করে আরো সুষ্ঠুভাবে করা যায়, সেই বিষয়ে আলোচনার জন্তে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ (CSIR)-এর উদ্যোগে নতুন দিল্লীতে কাউন্সিল ভবনে গত ১১ই এপ্রিল আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত লোকরঞ্জক বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদকদের একটি সভা আহূত হয়েছিল। CSIR-এর আমন্ত্রণে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে ঐ সভায় যোগদান করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর জয়ন্ত বসু। এছাড়া এলাহাবাদের 'বিজ্ঞান' (হিন্দী), আগ্রার 'বিজ্ঞান-লোক' (হিন্দী), উদয়পুরের 'লোক বিজ্ঞান' (হিন্দী), বম্বের 'মারাঠী বিজ্ঞান পরিষদ পত্রিকা', মাদ্রাজের 'ইলাম বিজ্ঞানী (তেলেগু), মহীশূরের 'বিজ্ঞানালোক' (কানাড়ী) প্রভৃতি পত্রিকার প্রতিনিধিরা সভায় যোগ দেন; CSIR-এর লোকরঞ্জক বিজ্ঞান বিভাগের কর্মকর্তারাও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সভার উদ্বোধন করে CSIR-এর ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর আত্মারাম লোকরঞ্জক বিজ্ঞান পত্রিকাগুলির কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই সব পত্রিকা যাতে আরো উন্নত হতে পারে, তার জন্তে যথাসাধ্য সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞান বলতে আমাদের দেশের মানুষ এখনো বিদেশের দিকেই কেবল তাকিয়ে থাকে। বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতে যে সব প্রচেষ্টা চলেছে, সেগুলিকে আরও ব্যাপকভাবে, আরো অন্তরঙ্গভাবে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরবার দায়িত্ব বিজ্ঞান পত্রিকাকে নিতে হবে। অতঃপর বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধিরা তাঁদের পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেন। এই সভার মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যে সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন, CSIR-এর কর্তৃপক্ষকে তাঁরা সে জন্তে ধন্যবাদ জানান।

নানাবিধ আলোচনার পর নিম্নলিখিত কয়েকটি

সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রথমতঃ, স্থির হয় যে, আমাদের দেশের জাতীয় গবেষণাগার এবং অন্যান্য বিজ্ঞান ও শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকেও সেখানকার কাজ সম্পর্কে নিয়মিতভাবে সংবাদ সংগ্রহ করে CSIR বিজ্ঞান পত্রিকাগুলিকে তা সরবরাহ করবেন, যাতে তারা তাদের পাঠককে সেই সংবাদ পরিবেশন করতে পারেন। অপর পক্ষে, কোন বিজ্ঞান পত্রিকা ঐ কাজ সম্পর্কে নতুন কোন সংবাদ পেলে CSIR-কে তা জানিয়ে দেবেন, যাতে তাঁরা তাঁদের নিজেদের পত্রিকা 'সায়েন্স রিপোর্টার' ও 'বিজ্ঞান প্রগতি'তে সেই সংবাদ প্রকাশ করতে পারেন এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য পত্রিকাকেও জানিয়ে দিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞান পত্রিকাগুলিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবার জন্যে CSIR চেষ্টা করবেন। তৃতীয়তঃ, পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত লোকরঞ্জক বিজ্ঞান পত্রিকার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সর্বভারতীয় 'বিজ্ঞান পত্রিকা সংস্থা' গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আনন্দ পুরস্কার

প্রতি বছর বাংলা নববর্ষে কয়েকটি পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে কয়েকটি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়। সম্প্রতি এই বছরের (১৩৭৫) পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আনন্দ বাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রতি বছর প্রফুল্লকুমার সরকার ও সুরেশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়। এই বছরে প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে এবং অপর পুরস্কারটি পেয়েছেন শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে গোপাল চন্দ্রকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। অমৃত-বাজার ও যুগান্তর পত্রিকা প্রদত্ত শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে সুধীরচন্দ্র সরকার (মরণোত্তর) এবং শ্রীমহাশ্বেতা দেবী।

অধিকতর কার্যকরী কৃত্রিম মূত্রাশয়

একটি নতুন ও অধিকতর কার্যকরী কৃত্রিম মূত্রাশয় এখন প্রস্তুতির পথে।

রোগীর দেহের রক্ত থেকে বিষ নিষ্কাশন যন্ত্রকে উন্নত করবার একটি গবেষণা-কার্যক্রম এখন গ্লাসগোর স্ট্যাথক্লাইড বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎসাহব্যঞ্জক পর্যায়ে পৌঁচেছে।

গবেষণার ফলে নতুন ধরণের কৃত্রিম মেম্‌ব্রেন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই মেম্‌ব্রেন পূর্ববর্তী যে কোন মেম্‌ব্রেনের চেয়ে বহু গুণ ভাল কাজ করবে। এর ফলে বাড়ীতে ব্যবহারযোগ্য ক্ষুদ্রাকৃতির কৃত্রিম মূত্রাশয় উদ্ভাবন ত্বরান্বিত হবে।

এপর্যন্ত কৃত্রিম মূত্রাশয়ে রক্ত থেকে বিষ নিষ্কাশনে যে সব মেম্‌ব্রেন ব্যবহার করা হয়েছে, তা সেলুলোজে তৈরি। এগুলি ব্যবহারের অনেক অসুবিধা ছিল। এতে কাজ হতো এত ধীর গতিতে যে, এই ব্যবস্থায় কয়েক ঘন্টা সময় লেগে যেতো।

স্ট্যাথক্লাইড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-যন্ত্রবিদ্যা বিভাগের ডাঃ উইলিয়াম মুইরের মতে, নতুন মেম্‌ব্রেনগুলি সেলুলোজ মেম্‌ব্রেনের চেয়ে তিন গুণ দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারবে।

তাছাড়া এগুলি রক্ত থেকে বিষ বের করে আনবে, কিন্তু রক্তকে গ্লুকোজ বা পটাশিয়াম শূন্য করে দেবে না। গ্লুকোজ ও পটাশিয়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং এই পদ্ধতিতে সেগুলি রক্তেই থেকে যাবে।

নতুন মেম্‌ব্রেনগুলি উদ্ভাবিত হবার ফলে বর্তমানে ব্যবহৃত কৃত্রিম মূত্রাশয়-যন্ত্রগুলির নতুন রূপ দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিশ্ব-

বিভালয় লণ্ডন ও এডিনবরার হাসপাতালগুলির সংযোগিতায় এই বিষয়ে কাজ করছেন।

বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলির সঙ্গে নতুন মেম্‌ব্রেন যুক্ত করলে তার ফল কি হবে, তা জানবার উদ্দেশ্যে স্কটল্যাণ্ডে শীঘ্রই পরীক্ষা সুরু হবে।

গত নবেম্বর মাসে সাফল্যজনকভাবে ভারতে প্রস্তুত প্রথম রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়।

পরীক্ষাধ্যক্ষ এইচ. জি. এস. মূর্তি বলেছেন—রকেটটির কাজ বেশ সন্তোষজনক হয়েছে।

থুম্বা থেকে পরীক্ষামূলক রকেট উৎক্ষেপণ

ত্রিবান্দ্রম থেকে প্রেরিত পি. টি আই-এর এক সংবাদে প্রকাশ—গত ২৪শে মার্চ থুম্বা রকেট উৎক্ষেপ কেন্দ্র থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ভারতে প্রস্তুত দ্বিতীয় রকেটটি (নাম মেনকা) উৎক্ষেপণ করা হয় এবং এই উৎক্ষেপণ সফল হয়েছে।

এই নতুন রকেটের মোটর ও যন্ত্রপাতি তৈরি করেছেন থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের ইঞ্জিনীয়ারেরা।

সপ্তম বার্ষিক রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতা

১৭ই এপ্রিল, ১৯৬৮, অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় ৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বক্তৃতা-কক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ৭ম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতা' প্রদান করেন ডক্টর মহাদেব দত্ত। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'বসু-সংখ্যায়ন'। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু সভায় সভাপতিত্ব করেন।

শোক-সংবাদ

পরলোকে বিশ্ববিশ্রুত পদার্থ-বিজ্ঞানী ল্যাণ্ডাউ

বিশ্ববিশ্রুত রুশ পদার্থ-বিজ্ঞানী অ্যাকাডেমিসিয়ান লেভ ল্যাণ্ডাউ গত পয়লা এপ্রিল মস্কোতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ৬ বছর আগে এক মোটর দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতরভাবে আহত হন এবং তারপর থেকে এতদিন শয্যাশায়ীই ছিলেন।

১৯০৮ সালে লেভ ল্যাণ্ডাউ-এর জন্ম। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে প্রতিভার স্ফূরণ দেখা যায়। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্যে তিনি চেষ্টা করেন, কিন্তু বয়স কম বলে তাঁকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নি। ফলে এক বছর অপেক্ষা করতে হয়। ১৪ বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং একসঙ্গে পদার্থবিদ্যা, গণিত ও রসায়ন তিনটি বিষয়ে অধ্যয়ন সুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে বেরিয়ে আসবার আগেই মাত্র ১৮ বছর বয়সে তাঁর 'কোয়ান্টাম বলবিদ্যা' সম্পর্কিত প্রথম গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রুশ বিজ্ঞানী-মহলে ল্যাণ্ডাউকে নিয়ে একটা সাড়া পড়ে যায় এবং তাঁকে ঘিরে এক নতুন বিজ্ঞানী-গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

১৯ বছর বয়সে ল্যাণ্ডাউ উচ্চতর গবেষণার উদ্দেশ্যে ইউরোপে গমন করেন এবং সে সময়কার প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ, পাউলি, বুর প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯৩২ সালে ২৪ বছর বয়সে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় ফিরে আসেন এবং খারকোভ টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটের

তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার স্বীকৃতিতে ১৯৩৪ সালে তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

অ্যাকাডেমিসিয়ান লেভ ল্যাণ্ডাউ

১৯৩৭ সালে তিনি খারকোভ থেকে মস্কোয় চলে আসেন এবং সেখানকার ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্যাল প্রোব্লেম্‌স্‌-এর সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে বিজ্ঞানী রুমার-এর সঙ্গে যৌথভাবে 'ইলেকট্রন কণিকার ধারাবর্ষণ' সম্পর্কে তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে পদার্থ-বিজ্ঞানের জটিল বিষয়বস্তু ইলেকট্রনিক গ্যাসের আচরণ সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্য বিশ্বের বিজ্ঞানী-মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জীবনের শেষ দিকে ল্যাণ্ডাউ বিস্ময়কর তরল পদার্থ 'হিলিয়াম-২' সম্পর্কিত গবেষণায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁর আগে কেউ এই পদার্থটির বৈশিষ্ট্য ভালভাবে উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি। তরল হিলিয়াম সংক্রান্ত তাঁর অনন্যসাধারণ গবেষণার জন্যে ১৯৬২ সালে তাঁকে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। কিন্তু সে সময় তিনি গুরুতর মোটর দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং হাসপাতালে রোগশয্যায় শুয়েই নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন।

আধুনিক তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানে ল্যাণ্ডাউ-এর অবদান অবিস্মরণীয়। এর স্বীকৃতিতে তিনি দেশ-বিদেশ থেকে অজস্র সম্মান ও উপাধি পেয়েছেন। এই বছরের গত ২২শে জানুয়ারী সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ল্যাণ্ডাউ তত্ত্বীয় পদার্থবিস্তার একাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা। ইয়াগনী লিফ্‌শিফ্‌টের সহযোগে রচিত তাঁর 'মেনি ভল্যুম কোর্সেস অব থিওরেটি-ক্যাল ফিজিক্স' গ্রন্থখানি সমধিক উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর একটি মনোজ্ঞ লোকরঞ্জক পুস্তিকা আছে।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়
চিত্তরঞ্জন ন্যাশন্যাল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার
৩৭, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৬

২। রমেন দেবনাথ
(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)
টি. ডি. বি. কলেজ
রাণীগঞ্জ
বর্ধমান

৩। সুবিমল সিংহরায়
২, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড
পোঃ বেহালা
কলিকাতা-৩৪

৪। রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৫।৪, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা-১৯

৫। প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়
১৬, কুণ্ডু লেন
ফ্ল্যাট নং ৪
কলিকাতা-২৫

৬। মণীন্দ্রনাথ দাস
"সাধনালয়"
পুরুলিয়া রোড
রাঁচী

৭। বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী
Birla Industrial
& Technological Museum
19/A, Gurusaday Rood
Calcutta-19

৮। বিমান বসু
7, U, F. College Rood
New Delhi-1

৯। নিশীথ দত্ত
বিবেকানন্দ কলেজ
বর্ধমান

১০। সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৫৯।১।বি, বকুলবাগান রোড
কলিকাতা-২৫

১১। সুনীল সরকার
B. P. C. Junior Technical
School, Krishnagar,
Nadia.

১২। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ ;
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিংশতি বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন ভাষণ দিতেছেন। মধ্যে উপবিষ্ট — অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একবিংশ বর্ষ | জুন, ১৯৬৮ | ষষ্ঠ সংখ্যা

বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসের নিবেদন

গত ১২ই মে, ১৯৬৮, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা-গৃহে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার এই পরিণত বয়সেও এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়া তিনি আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ভারতের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন। প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই তিনি এই পরিষদের একজন বিশিষ্ট সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ী। এই অনুষ্ঠানে তাঁহার উপস্থিতি আমাদিগকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই উপলক্ষে তাঁহাদের উভয়ের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অসীম ধৈর্য ও অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত দীর্ঘকাল যাবৎ তাহার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। বর্তমানে বিজ্ঞান-শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা যে মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইতে চলিয়াছে, ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর সেনই এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতেছেন। ইহাতে পরিষদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষাদানের বহুঘোষিত নীতিরই যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইতেছে। কেবল প্রতিভাবান শিক্ষাব্রতী হিসাবেই নহে, বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে এই যুগান্তকারী নীতির প্রবর্তক হিসাবে তাঁহাকে আমাদের মধ্যে পাইয়া বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়াছি এবং পরিষদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আশান্বিত হইয়াছি। পরিষদের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য এখন আমাদের অবিচল নিষ্ঠার সহিত দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহার জন্য দেশের সর্বস্তরের জনগণের অধিকতর সহযোগিতা ও সহানুভূতির একান্ত প্রয়োজন। লোকরঞ্জক বিজ্ঞান পুস্তক, বিজ্ঞান-কোষ, বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনা প্রভৃতি বিজ্ঞান পরিষদের যে সকল বিভিন্ন কার্যসূচী ও পরিকল্পনা রহিয়াছে, তাহাতে আমরা দেশের জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও আনুকূল্য কামনা করি।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিংশতি বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসের অনুষ্ঠান

গত ১২ই মে, রবিবার অপরাহ্নে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা-গৃহে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিংশতি বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীনমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করবার পর সভার সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে মাল্যদান করা হয়। অতঃপর পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর জয়ন্ত বসু উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর 'নিবেদনে' পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের উল্লেখ করেন এবং বার্ষিক কার্য-বিবরণী পেশ করেন। পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার উন্নতিকল্পে যে সব কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে এবং যে সব পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে, সেগুলির উল্লেখ করে পত্রিকা প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগ এযাবৎ যে বার্ষিক অর্থ সাহায্য করেছিলেন, ১৯৬৭-'৬৮ সালের জন্যে সেই সাহায্য দানে অস্বীকার করা হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের জন্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, বিশেষতঃ হিন্দী ভাষায় বিভিন্ন পত্রিকা কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হচ্ছে, অথচ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্রিকার গুরুতর আর্থিক সংকটেও কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ পরিষদকে সাহায্যদানে বিমুখ। তবে আনন্দের কথা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদ থেকে সম্প্রতি সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গেছে। পরিষদ এযাবৎ যে ২৭ খানা বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করেছে, সে প্রসঙ্গে ডক্টর বসু জানান যে, কেবলমাত্র লোকরঞ্জক পুস্তকই নয়, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য বাংলা বিজ্ঞান-কোষ প্রকাশেও পরিষদ উদ্যোগী হয়েছে এবং পরিষদের এই পরিকল্পনাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ অনুমোদনসহ কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগের নিকট প্রেরিত হয়েছে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ও অর্থসাহায্য লাভে সমর্থ হয়, সে জন্যে তিনি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান। পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা, আলোচনা সভা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার কথাও তিনি তাঁর বিবরণীতে পাঠ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর সেন তাঁর ভাষণে বলেন—এযুগে বিজ্ঞান শুধু উপকরণ মাত্র নয়, জীবন-চর্চায় প্রতিটি প্রহরে বিজ্ঞানের ভূমিকা আজ তর্কাতীত। বিজ্ঞানের প্রয়োগ কেবল স্বয়ংসিদ্ধ নয়, অনিবার্যও। ডক্টর সেন বলেন—বিদেশী ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে গেলে তরুণ সুকুমার মনে বিজ্ঞান শিক্ষার যে আনন্দ, তার অনেকটাই ব্যাহত হয়। সহজ সাবলীল স্ফুরণ ঘটে না, বিজ্ঞান চেতনার বিকাশে। অথচ প্রচলিত প্রথায় বিজ্ঞান শিক্ষা আজও বিদেশী ভাষার মাধ্যমেই, এর পরিবর্তন প্রয়োজন। সে পরিবর্তনকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে দরকার ব্যষ্টির, সমষ্টির, রাষ্ট্রের মিলিত উদ্যমের। তবু বিজ্ঞানের এই সার্বিক অবদানের পাশাপাশি

আর এক রূপ আমাদের হতাশ করে, বিভ্রান্ত করে, আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, বিজ্ঞানের এই অন্ধকার দিকের প্রশ্নে মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং অস্তিত্ব পর্যন্ত আজ বিপন্ন। এই প্রশ্নের উত্তরে অনিবার্যভাবেই আসে দায়িত্ববোধের প্রশ্ন। সে দায়িত্ববোধ সবার, বিজ্ঞানীর তো বটেই, বিজ্ঞান না জানা মানুষেরও।

বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিবের নিবেদন প্রসঙ্গে ডক্টর সেন বলেন—দু-বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, প্রান্তিক ভাষায় যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেগুলিকে সাহায্য করা হবে না; কেন্দ্রীয় সরকার নিজে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদ মারফৎ এধরণের পুস্তক প্রকাশ করবেন। এজন্যেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' সাহায্য পায় নি।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন এবং আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলিকে সাহায্য করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ডক্টর সেন জোরের সঙ্গে বলেন যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতি তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পরিষদ যাতে সর্বরকম সাহায্য পায়, তার জন্যে তিনি চেষ্টা করবেন।

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ভাষণে পরিষদের আদর্শ রূপায়ণে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন; পরিষদের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার জন্যে নিজস্ব গৃহের একান্ত প্রয়োজন। সেই গৃহের নির্মাণ-কার্য যাতে অনতিবিলম্বে সুসম্পন্ন হয়, তার জন্যে তিনি উপস্থিত সকলের কাছে আবেদন জানান।

অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সভাপতির ভাষণে বিজ্ঞানের উপযোগিতার কথা বলেন; বিশেষতঃ আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে কৃষি প্রসঙ্গে এই উপযোগিতার কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তবে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ যাতে না হয়, সে দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় দৃষ্টান্ত সহকারে এই ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে আয়োজিত 'মাদাম কুরী ও তাঁর অবদান' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন ডক্টর ত্রিগুণা সেন। প্রথম পুরস্কার লাভ করেন মণিমালা বালিকা বিদ্যালয়ের (আসানসোল) একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী শ্রীরেখা দাস এবং দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের (কলিকাতা) একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীনীতা বসু। অনুষ্ঠানের শেষে পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীসুশীল রঞ্জন মৈত্র। সর্বশেষ বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস-এর সৌজন্যে বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিংশতি বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসের অনুষ্ঠানে কর্মসচিবের নিবেদন

মাননীয় সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয়, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, আমাদের বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই বিংশতি বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসের অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। পরিষদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার একবিংশতিতম বর্ষের প্রারম্ভ উপলক্ষে আয়োজিত এই সম্মেলনে যোগদান করে আপনারা পরিষদের দেশগঠনমূলক সাংস্কৃতিক প্রয়াসের প্রতি যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। আমরা আশা করছি, আপনাদের, তথা সমগ্র দেশবাসী ও সরকারের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহযোগিতায় পরিষদের বিবিধ সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টা এই নববর্ষে আরও সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং উত্তরোত্তর দেশের অধিকতর কল্যাণ সাধন করতে সমর্থ হবে।

আজ এই অনুষ্ঠানে আমরা অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতিরূপে পেয়ে বিশেষ আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি। ডক্টর মুখোপাধ্যায় একদিকে যেমন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী, অন্যদিকে তেমনই তিনি দেশে বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণার প্রসার সাধনের জন্যে সারা জীবন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আজ এই পরিণত বয়সেও তিনি দেশের বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে দেশ ও জাতির যথাসাধ্য সেবা করছেন। তাঁর মত দেশসেবী বিজ্ঞানসাধক, যিনি আমাদের পরিষদেরও একজন প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য এবং পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত, তিনি যে আমাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেছেন, একথা স্মরণ করে আমরা বিশেষ গৌরব বোধ করি। আমরা আশা করি, এই বার্ষিক অনুষ্ঠান-সভার সভাপতি হিসেবে পরিষদের বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টাকে কিভাবে আরও সার্থক করে তোলা যায়, সে বিষয়ে তিনি তাঁর সুচিন্তিত উপদেশ ও গঠনমূলক কর্মপন্থার নির্দেশ দান করে উৎসাহিত করবেন।

পরিষদের এই প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী সম্মেলনে এই বছর আমরা ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন মহাশয়কে প্রধান অতিথি হিসাবে পেয়ে বিশেষ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। বিশাল ভারতের নানা সমস্যাসঙ্কুল শিক্ষামন্ত্রকের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এবং এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে পরিষদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছার পরিচয় দিয়েছেন, এজন্যে আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি আজ ভারতের শিক্ষামন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করছেন, কিন্তু দীর্ঘ বিশ বছর পূর্বে পরিষদের প্রতিষ্ঠা-কাল থেকেই তিনি পরিষদের একজন বিশিষ্ট সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী। তাই আমরা পরিষদের বিবিধ সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের জন্যে কেবল অনুরোধই নয়, পরিষদের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে দাবী করতেও পারি। ডক্টর সেন দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একজন প্রতিভাবান কৃতী পুরুষ, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কর্ণধাররূপে তিনি সুপরিচিত এবং জনকল্যাণমূলক নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিও তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি রয়েছে—এই

তিন গুণের আধার ডক্টর সেনকে আজ আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা একদিকে যেমন গৌরব বোধ করছি, অপর দিকে তেমনি পরিষদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর আস্থা ও আশা পোষণ করছি। আমরা পরিষদের সাংস্কৃতিক কর্তব্যাদি সম্পর্কে কয়েকটি পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই তাঁর কাছে পেশ করেছি এবং আর্থিক সাহায্যের জন্যে আবেদন জানিয়েছি। পরিকল্পনাগুলির বিষয় আমরা পরে যথাস্থানে উল্লেখ করবো সংশ্লিষ্ট আলোচনা প্রসঙ্গে। আমরা আশা করছি, মন্ত্রীমহোদয় তাঁর ভাষণে আমাদের পরিকল্পনা ও আবেদনগুলির ফলাফল সম্পর্কে যথোচিত আশ্বাস ও কার্যকর প্রতিশ্রুতি দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

এখন পরিষদের আদর্শ-উদ্দেশ্য ও তার বাস্তব রূপায়ণে আমরা কতটুকু অগ্রসর হয়েছি, আলোচ্য বছরে আমরা কি-কি কাজ করেছি ও নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, তার মোটামুটি একটি বার্ষিক বিবরণী আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করতে চাই। এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিষদের কাজকর্মের এরূপ একটি সমীক্ষা ও মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। কেন না, তাহলে আপনাদের আলোচনা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে আমরা আরও দৃঢ় প্রত্যয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারবো।

পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ

পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলবার না থাকলেও বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে শপথ-বাক্যের মত আমরা প্রতি বছরেই এর উল্লেখ করে থাকি এবং এথেকে প্রেরণা লাভ করি। বর্তমান যুগে যে কোন দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান-প্রগতির উপরে নির্ভরশীল—দেশ বিজ্ঞান-মুখী না হলে এই যুগে দেশের কল্যাণের নান্যঃ পন্থা। দেশের জনসাধারণকে এজন্যে আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এভাবেই কেবল বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অফুরন্ত স্ফুরণ সম্ভব। স্কুল-কলেজের নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে ও গবেষণাগারের গণ্ডীতেই বিজ্ঞান-শিক্ষাকে আবদ্ধ রাখলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ কখনো সাধিত হবে না। বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায়, গবেষণাগারের বাইরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছোট-বড় অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব সম্ভব হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতি কাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও তৎপরতা এলে তবেই দেশ বড় হয়ে ওঠে, বিজ্ঞানের কেবল বৃহৎ ও জটিল ব্যাপারগুলিই বিজ্ঞান নয়। কোন এক মনীষী বলে গেছেন—'যেখানে শস্যের একটি শিষ জন্মাতো, সেখানে যিনি দুটি শীষ জন্মাতে পারেন, তিনিও মহাবিজ্ঞানী'। কথাটা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য, বিশেষ করে আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে।

এভাবে বিজ্ঞানের তাৎপর্য ও ভাবধারা দেশের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হলে মাতৃভাষাই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক কার্যকরী মাধ্যম, একথা আজ সর্বত্র স্বীকৃত। বিজ্ঞানের মূল তথ্যাদি মনে-প্রাণে বুঝতে ও বোঝাতে হলে মাতৃভাষার আশ্রয় নিতে হয়। পরিষদ তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে মূল তত্ত্ব ও তথ্যাদি এবং আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নানাভাবে প্রচার করে দেশের জনগণকে বিজ্ঞান-সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করে আসছে। দেশের জনগণকে, বিশেষতঃ কিশোর-কিশোরীদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উদ্বুদ্ধ করতে ও জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব করে তুলতে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন, মাতৃভাষায় সরলভাবে বিজ্ঞানের অনুশীলন ও চর্চা। বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সাধনই পরিষদের আদর্শ।

কার্যবিবরণী

পরিষদের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে আমরা বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জনপ্রিয় পুস্তক প্রণয়ন, বিজ্ঞান পুস্তকের গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালনা, বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা, আলোচনা-সভা, বিজ্ঞান-প্রদর্শনী প্রভৃতি বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছি। এসব ছাড়া শিক্ষায়তনগুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বাংলায় বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তক রচনায় কাজেও পরিষদ বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগী হয়েছে। পরিষদের এসব কাজকর্ম ও বিভিন্ন প্রচেষ্টার কথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। তবে পরিষদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার বিবরণী দানের প্রসঙ্গে আমরা সর্বাগ্রে একটি কথার উল্লেখ করতে চাই। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের যে আদর্শ পরিষদ গ্রহণ করেছে, তার রূপায়ণে পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই একমাত্র মাতৃভাষাকে যোগ্য মাধ্যম হিসেবে আমরা বরণ করে নিয়েছি। বিজ্ঞান-শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাই যে প্রকৃষ্ট মাধ্যম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্পর্কে পথের নির্দেশ পরিষদ দিয়েছে। সর্বস্তরে, এমন কি, গবেষণাকার্যেও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের আলোচনা ও অনুশীলন করা যে সম্ভব, একথাও পরিষদ প্রমাণ করেছে। আমরা বিশেষ আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, এত কাল পরে আজ বিজ্ঞান শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রবর্তিত হতে চলেছে এবং এই পরিকল্পনার রূপ দান করছেন ভারতের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর সেন। পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার সাধনে এই বলিষ্ঠ নীতির জন্য অভিনন্দন জানাই। এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে যোগদান করে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মধারার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও স্বীকৃতি দান করেছেন বলে আমরা মনে করি।

যাহোক, আলোচ্য বছরে বিভিন্ন কাজে আমরা কতটা সাফল্য লাভ করেছি ও কিরূপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছি, সে বিষয়ে পরিষদের কার্যবিবরণী সংক্ষেপে এখন আমি বিবৃত করতে চাই।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা

পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪৮ সাল থেকেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক বিজ্ঞানের মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রবন্ধ, আলোচনা, বিজ্ঞান-সংবাদ, প্রশ্ন-উত্তর, করে দেখ, প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ও ভাবধারা পত্রিকাখানাতে নিয়মিত পরিবেশিত হচ্ছে। আশানুরূপ না হলেও পত্রিকাটির গ্রাহক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এর প্রকাশ সংখ্যা ২১৫০ কপি। নিছক একটি বিজ্ঞানের মাসিক পত্রিকার পক্ষে এই প্রকাশ-সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করবার জন্যে আমরা নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি; কিন্তু পত্রিকাখানাকে আরও আকর্ষণীয় করবার পথে আর্থিক অনটনই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দু'বছর যাবৎ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বিশেষ শারদীয় সংখ্যা বহু মূল্যবান প্রবন্ধাদির দ্বারা সুসমৃদ্ধ ও চিত্রসমন্বিত করে নব কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে। এই শারদীয় সংখ্যা বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানানুরাগী জনগণের বিশেষ সমাদর লাভ করেছে সত্য, কিন্তু পরিষদকে এর জন্যে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। সুখের কথা এই যে, শারদীয় সংখ্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা লক্ষ্য করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ শারদীয় সংখ্যার ১৪০০ কপি প্রতি বছর ক্রয় করে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন। এই ব্যবস্থার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা

বিভাগের নিকট পরিষদ বিশেষ কৃতজ্ঞ। কেবল আর্থিক সাহায্যই নয়, পত্রিকাখানার প্রচার ও প্রসারেও এরূপ সরকারী আনুকূল্য বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

একখানা মাসিক পত্রিকা, বিশেষতঃ বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিকপত্র প্রকাশ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বর্তমানে প্রকাশনের বিভিন্ন স্তরে মূল্যবৃদ্ধির দরুণ পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্যান্য কোন কোন পরিকল্পনায় পরিষদকে সাময়িক অর্থসাহায্য করে থাকেন, কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের খাতে ১৯৪৮ সাল থেকে প্রতি বছর ৩,৬০০৲ টাকার একই অর্থ সাহায্য করে আসছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষে এই বার্ষিক সাহায্য বৃদ্ধি করা অসুবিধাজনক বলে রাজ্য শিক্ষাবিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা-বিভাগের নিকট 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশের জন্যে রাজ্যের অনুরূপ একটি অনুদান মঞ্জুরীর সুপারিশ করছেন প্রতি বছর। গত কয়েক বছর যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে এই বাবদ কখনো বার্ষিক ৩,৬০০ টাকার, কখনো বা বার্ষিক ২০০০ টাকার অর্থ সাহায্য পেয়েছে পরিষদ। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের কথা এই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগ গত ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্যে এই পত্রিকা প্রকাশ বাবদ সাহায্য দানে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার অজস্র অর্থ ব্যয় করছেন; বিশেষতঃ হিন্দী ভাষায় বিভিন্ন পত্রিকা কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হচ্ছে। আর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়কে একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র গুরুতর আর্থিক সংকটেও কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ পরিষদকে সাহায্য দানে বিমুখ। এমন কি, গত কয়েক বছর যে সামান্য সাহায্যও পাওয়া যাচ্ছিল, গত বছর তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে ব্যাপারটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

যাই হোক, ডক্টর সেনেরই পরামর্শ অনুযায়ী গত জানুয়ারী মাসে আমরা বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের নিকট বার্ষিক অর্থসাহায্যের আবেদন জানিয়ে পত্র দিয়েছি। এযাবৎ সেই পত্রের কোন উত্তর না পেলেও আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, গত ১৮ই মার্চ তারিখে ঐ পর্ষদের অধিকর্তা ডক্টর আত্মা রামের সঙ্গে তাঁর দিল্লীর কার্যালয়ে যখন আমি পরিষদের পক্ষ থেকে দেখা করি, তখন তিনি ঐ অর্থসাহায্য সম্পর্কে আশ্বাস দিয়েছিলেন। ডক্টর সেন আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন; তাঁর নিকট আমরা সবিনয়ে আবেদন করছি, উক্ত সাহায্য যাতে আমরা অনতিবিলম্বে পেতে পারি, সে জন্যে তিনি যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেন।

বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ

বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় পুস্তক প্রকাশ ও সেগুলি স্বল্পমূল্যে পাঠকগণকে পরিবেশন করা পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে এই সব পুস্তক ব্যয়ানু-পাতে অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। এটা সম্ভব হয় সরকারী অর্থসাহায্যের ফলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশনের কাজে অনুদান দিয়ে থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকেও ইতিপূর্বে আমরা এই কাজে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পেয়েছি। পরিষদ এভাবে এযাবৎ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২৭ খানা পুস্তক প্রকাশ করেছে। বর্তমানে 'ভারতের অধিবাসীর পরিচয়' নামক একখানা নৃতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক প্রকাশের কাজে পরিষদ হাত দিয়েছে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী বিজ্ঞানের আদর্শস্থানীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করে দেবার জন্যে কলিকাতার সুবিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক

প্রতিষ্ঠান মেসার্স ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড সম্প্রতি আমাদের অনুরোধ জানিয়েছেন। পরিষদের কার্যকরী সমিতি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এবং এই পুস্তক রচনার প্রাথমিক কাজকর্ম ইতিমধ্যেই সুরু করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক রচনা করা, বলা বাহুল্য, পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যেরই অন্যতম; আবার সেই সঙ্গে পরিষদের আর্থিক অবস্থারও এর ফলে কিছুটা সুরাহা হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলা বিজ্ঞান-কোষ

কেবল লোকরঞ্জক পুস্তকই নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিবিধ তথ্যের আভিধানিক ব্যাখ্যামূলক আলোচনা ও পরিভাষা সম্বলিত 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' জাতীয় একখানা কোষগ্রন্থ প্রকাশ করবার একটি পরিকল্পনা পরিষদ গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলাভাষায় এরূপ একখানা কোষগ্রন্থ প্রকাশনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এরূপ গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে পরিষদ একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচনা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট পেশ করেছিল, গত বছরের জুলাই মাসে। এই কোষগ্রন্থের রচনা ও প্রকাশনা সম্পর্কিত বিস্তৃত পরিকল্পনা ও ব্যয়বরাদ্দের বিবরণী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন ও সুপারিশসহ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ও সাহায্যের জন্যে সরকারী স্তরে প্রেরিত হয়েছিল গত নভেম্বর মাসে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর সেনকেও আমরা এই বিষয়ে অবহিত করে পরিকল্পনাটির একটি কপি তাঁর হাতে দিয়েছিলাম।

বিজ্ঞান বিষয়ে এরূপ একখানা কোষগ্রন্থের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম এবং এটা হবে বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের সম্পদস্বরূপ। বিশেষতঃ আজ আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্যবস্থা হয়েছে; অথচ বাংলার বিজ্ঞান-চর্চার ভিত্তিস্বরূপ বিজ্ঞানের কোন কোষগ্রন্থ এখনও রচিত হয় নি। বর্তমানে বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার যে আয়োজন চলেছে, তাতে বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার বিভিন্ন শব্দ ও তথ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কোষগ্রন্থ রচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের ক্ষেত্রে এরূপ একখানা কোষগ্রন্থ পরিষদ যাতে প্রকাশ করতে পারে এবং প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ও যথোপযুক্ত অর্থসাহায্য লাভে সক্ষম হয়, তার জন্যে আমরা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে ব্যক্তিগতভাবে অবহিত হতে অনুরোধ জানাই এবং বাংলার জাতীয় দাবী হিসাবে এই পরিকল্পনাটিকে গ্রহণ করতে বলি।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের জ্ঞাতার্থে আমরা আর একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের পক্ষ থেকে উক্ত কোষগ্রন্থের পরিকল্পনা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগের নিকট লিখিত একখানা পত্রের কপি আমরা সম্প্রতি পেয়েছি। এই পত্রে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক পরিষদকে তাঁদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কমিশনের পক্ষে অনুবাদের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী ভাষার প্রধান অধ্যাপক ডক্টর লোধার সঙ্গে যোগাযোগ করতে লিখেছেন। বিজ্ঞানের কোষগ্রন্থ রচনার সঙ্গে অনুবাদের সংস্রব কোথায়, তা কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম না। আমাদের মনে হয়, বিজ্ঞানের কোষগ্রন্থ রচনা সম্পর্কে পরিষদের পরিকল্পনাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে উক্ত পত্রের রচয়িতা বিন্দুমাত্র অবহিত হন নি। পরিষদের প্রস্তাবিত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষভাবে অনুমোদিত পরিকল্পনাটির মধ্যে

অনুবাদের স্থান নেই, এটি হবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর বক্তব্যের এই পত্রের তাৎপর্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠে জনসাধারণকে উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার বহুদিন যাবৎ পরিচালিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক ও সাময়িক পত্র সংগ্রহ করে একটি সুসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করাই পরিষদের উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ স্থানাভাবের জন্যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার স্থাপন করা আজও সম্ভব হয় নি। আমরা আশা করি, পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হলে সেখানে পরিষদের কার্যালয় স্থানান্তরের পরে সর্বপ্রকার বিজ্ঞানপুস্তক সমন্বিত গ্রন্থাগার ও আধুনিক ধরণের একটি পাঠাগার স্থাপন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে যে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার আছে, তাতে বিজ্ঞানানুরাগী পাঠকদের চাহিদা মেটে না। তথাপি অনেক ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ পাঠক গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করে থাকেন। এই গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্যেই, বিশেষতঃ আমরা কলিকাতা পৌর সংস্থার শিক্ষাবিভাগের নিকট থেকে বার্ষিক ১,৫০০্ টাকা হিসাবে অর্থ-সাহায্য পেয়ে থাকি। তবে দুঃখের বিষয়, পৌর সংস্থার নিকট থেকে গত তিন বছরের সাহায্য এযাবৎ পাওয়া যায় নি।

বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক, বিশেষতঃ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর মূল্যবান পাঠ্যপুস্তকগুলি সংগ্রহ করতে না পেয়ে অনেক দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে পরিষদের গ্রন্থাগারে একটি পাঠ্যপুস্তকের বিভাগও খোলা হবে। এরূপ পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রাথমিক ব্যবস্থাদির জন্যে দক্ষিণ কলিকাতার একজন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও বদান্য ব্যক্তির নিকট থেকে সরকারী সঞ্চয়পত্রে আমরা ইতি-মধ্যেই ১১,০০০্ টাকা দান সংগ্রহ করে রেখেছি।

বিজ্ঞান-প্রদর্শনী, বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনা

আলোচ্য বছরে পরিষদ কর্তৃক কোন বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। তবে শ্যামবাজারের পার্ক ইন্‌ষ্টিটিউশন, হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-সংসদ ও দমদমের 'ইয়ংম্যান্‌স এসোসিয়েশন' কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীগুলিতে পরিষদ থেকে মডেল ও চার্ট দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করা হয়েছিল।

গত নভেম্বর মাসে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী মাদাম কুরীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মাদাম কুরীর জীবনী ও অবদান সম্পর্কে আমরা একটি বক্তৃতা ও আলোচনা-সভার আয়োজন করেছিলাম। এই সভায় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, ডক্টর বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা মাদাম কুরীর বৈজ্ঞানিক অবদান সম্পর্কে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এই আলোচনা-সভায় স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ যথেষ্ট জন-সমাগম হয়েছিল। এই সভায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'মাদাম কুরী ও তাঁর অবদান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, যাতে এই মহিয়সী মহিলার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব ও বৈপ্লবিক অবদান সম্পর্কে ছাত্রসমাজ কৈশোরেই আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। এই প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় কলিকাতা ও বিভিন্ন জেলার অনেক ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করেছিল। তাদের লিখিত প্রবন্ধগুলির গুণাগুণ

বিচার করেছেন অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, অধ্যাপক মৃণালকুমার দাশগুপ্ত ও পরিষদের সারস্বত সংঘের সচিব শ্রীপঙ্কজনারায়ণ রায়। এই বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান যারা অধিকার করেছে এবং তারপর আরও যে ৫ জন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, তাদের নাম এই সভাতেই ঘোষণা করে তাদের আমরা পুরস্কৃত করবো বলে স্থির করেছি।

পরিষদের আয়োজিত বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতা'র আলোচ্য বছরের সপ্তম বক্তৃতাটি গত ১১-৪-৬৮ তারিখে দিয়েছেন ডক্টর মহাদেব দত্ত। বিষয়বস্তু ছিল 'বসু সংখ্যায়ন'। পদার্থ-বিজ্ঞানের এরূপ একটি জটিল বিষয় বাংলা ভাষায় অতি সুন্দরভাবে ডক্টর দত্ত ব্যাখ্যা করেছেন। বক্তৃতার পরে এই সংখ্যায়ন তত্ত্বের প্রবক্তা অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্বয়ং বিষয়টির তাৎপর্য সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছিলেন। আমরা আশা করছি, এই বক্তৃতাটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার উপযোগী করে ডক্টর দত্ত পরিষদকে যথাসময়ে দেবেন এবং আমরা তা প্রকাশ করবো।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে জনপ্রিয় বক্তৃতা-দানের ব্যবস্থা করা পরিষদের পরিকল্পনাগুলির অন্যতম। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এটি একটি বিশেষ কার্যকরী পন্থা। বর্তমান বছরের এপ্রিল মাসে চন্দননগরে প্রবর্তক সংঘ কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ থেকে ঐরূপ একটি বক্তৃতা দান করেন শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী। তাছাড়া আলোচ্য বছরে সাহা ইন্‌ষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বক্তৃতাকক্ষে এক ঘরোয়া বৈঠকে ডক্টর তপেন রায় 'অ্যান্টি-ম্যাটার' বা 'বিপরীত বস্তু' সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করেছিলেন। গত অক্টোবর মাসে 'ইয়ং ইন্‌টেলেক্ট' নামক প্রতিষ্ঠানের একটি বৈঠকেও পরিষদের পক্ষ থেকে আমার সুযোগ হয়েছিল, প্লাজমা—পদার্থের চতুর্থ অবস্থা'—এই সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেবার। রুশ বিপ্লবের পঞ্চাশত্তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত 'মানুষের মহাকাশে জয়যাত্রা' বিষয়ক আলোচনা সভাতেও পরিষদের তরফ থেকে অংশগ্রহণ করা হয়েছিল।

সম্প্রতি ভারত সরকারের 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের' উদ্যোগে আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকাগুলির সম্পাদকদের একটি সম্মেলন আহূত হয়েছিল নতুন দিল্লীতে। আমাদের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের অসুস্থতার দরুণ পরিষদের কর্মসচিব হিসাবে আমি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম। একমাত্র আমাদের এই পত্রিকাই এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করে। আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের বিবিধ উপায় ও সমস্যাদি সম্পর্কে সম্মেলনে আলোচনা হয়। ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞানের লোকরঞ্জক পত্রিকা-গুলির সম্পাদকদের একটি সমিতিও গঠিত হয়েছে, যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ রক্ষিত হতে পারে। উক্ত সম্পাদক সম্মেলনে আহ্বান করবার জন্যে 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদ' আমাদের ধন্যবাদার্হ।

পরিষদের নির্মীয়মান গৃহ

গত কয়েক বছর যাবৎ পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের আয়োজন চলছিল, একথা আপনারা সকলেই জানেন। আমরা সানন্দে জানাচ্ছি যে, গৃহ-নির্মাণের কাজ গত বছর ডিসেম্বর মাসে আরম্ভ হয়েছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণের জন্যে সংবাদপত্রে টেণ্ডার আহ্বান করে গৃহনির্মাণ উপসমিতির সুপারিশ অনুযায়ী পরিষদের কার্যকরী সমিতি বিভিন্ন টেণ্ডারদাতাদের মধ্যে মেসার্স

প্রাসকন নামক একটি প্রতিষ্ঠানের উপরে গৃহ নির্মাণের ভার অর্পণ করেছেন এবং শ্রীসন্তোষ কুমার মজুমদার নামক পরিষদের নিযুক্ত একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে নির্মাণ-কার্য চলছে।

পরিষদের পরিকল্পিত গৃহের অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী গৃহের ভূ-গর্ভতল ছাড়া উপরে ত্রিতল হবে। কিন্তু আপাততঃ সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ অনুসারে মাত্র ভূ-গর্ভতল ও প্রথম তলের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করা হয়েছে। এযাবৎ সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ মোটামুটি ১,৬৭,০০০ টাকা মাত্র। এই অর্থে ভূ-গর্ভতল ও প্রথম তলের নির্মাণ-কার্য মোটামুটি সম্পূর্ণ হবে আশা করা যায়। কিন্তু এই অংশের জন্যে স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাদির জন্যে আরও অন্ততঃ ১৫,০০০ টাকার প্রয়োজন। তাছাড়া দ্বিতল ও ত্রিতলের জন্যে প্রয়োজন হবে টেণ্ডার অনুযায়ী মোটামুটি ৯১,০০০ টাকা, অর্থাৎ পরিষদের গৃহনির্মাণের কাজ সম্যক সম্পূর্ণ করতে এখনও মোট প্রয়োজন ১,০৬,০০০ টাকার। এই অর্থ যাতে সংগৃহীত হয়, তার জন্যে পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করতে আপনাদের নিকট আমরা সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি।

এই প্রসঙ্গে এযাবৎ যাঁরা পরিষদের গৃহ নির্মাণের জন্যে দান করেছেন, তাঁদের সকলকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে এককালীন ৫০,০০০ টাকা পেয়েছি। কুমার প্রমথনাথ রায় চেরিটেবল ট্রাষ্টের নিকট থেকে ৫০,০০০৲ টাকা এবং জনসাধারণের নিকট থেকে মোট ২৫,০০০৲ টাকা পেয়েছি কিছুকাল আগেই। সম্প্রতি পরলোকগত অধ্যাপক নীরেন রায় মহাশয়ের উইলের সর্ত অনুসারে পরিষদের গৃহনির্মাণকল্পে প্রদত্ত তাঁর দান মোট ৪২,০০০৲ টাকা আমরা পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে এরূপ বৃহৎ দান আমরা আর পাই নি। আমরা পরিষদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক রায়ের স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

উপসংহার

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আমাদের দেশের সমাজ-জীবনে আধুনিক যুগোপযোগী উন্নত জীবনযাত্রার আকাঙ্খা ও আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠেছে। জনজীবনে আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্প-সমৃদ্ধিই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের নিয়ামক। সমাজ-জীবনে যুগোপযোগী নব দিগন্তের দাবী পূরণের একমাত্র যে পথ—বিজ্ঞানের পথ, জনসাধারণকে সেই পথের নির্দেশ দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তার সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টাগুলি পরিচালিত করছে। দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে পরিষদের মত জনশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। পরিষদের এই বিংশতি বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে তাই আমি পরিষদের কাজকর্ম ও আশা-আকাঙ্খার কথা সংক্ষেপে আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করলাম। আর সেই সঙ্গে আমরা নিশ্চিতভাবে এই আশা রাখি যে, আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় পরিষদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও কর্মপ্রচেষ্টা আরও সুদৃঢ় ও ব্যাপক হয়ে উঠবে।

আপনারা এতক্ষণ যে ধৈর্য সহকারে কর্মসচিবের নিবেদন শুনেছেন, সে জন্যে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কলিকাতা
১২ই মে, ১৯৬৮

জয়ন্ত বসু
কর্মসচিব,
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অধ্যাপক হলডেন ও ভারতীয় বিজ্ঞান

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

একটা কথা আছে—'সত্যম ব্রুয়াৎ, প্রিয়ম ব্রুয়াৎ, মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম'। এই নীতি-বাক্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না, তা বিচার্য বিষয়। বিজ্ঞানের ধর্ম, সত্যকে আবিষ্কার করা। অসত্য থেকে সত্যের সন্ধান এবং তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই বিজ্ঞানীর আদর্শ। বিশ্ববিখ্যাত জীব-বিজ্ঞানী অধ্যাপক হলডেনের জীবনে এই আদর্শটি পুরাপুরি ফুটে উঠেছিল। স্পষ্টবক্তা হিসাবে তিনি বিজ্ঞানীমহলে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বক্তৃতায়, লেখায় ও সমালোচনায় স্পষ্টোক্তির ভুরি ভুরি পরিচয় পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় যদি কোন ভুল বা ত্রুটি তাঁর নজরে পড়তো, তবে অঙ্কের সাহায্যে, তথ্যের সাহায্যে রূঢ় ভাষায় তিনি তার সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের দ্বারে অতন্দ্র প্রহরী, এতটুকু ভুলচুক দেখলেই রেগে যেতেন এবং সেই ভুলচুক কোনমতেই বরদাস্ত করতে পারতেন না।

'হলডেনের সঙ্গে আট বছর' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীঅসিত কুমার ভট্টাচার্য এক জায়গায় লিখেছেন যে, তিনি 'অনেক', 'অসংখ্য', 'অপরিসীম' প্রভৃতি শিথিল বিশেষণগুলিকে মোটেই সহ্য করতে পারতেন না এবং এগুলিকে এক ধরণের মিথ্যাভাষণ বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন—How many is many? (কত বেশী হলে বেশী হয়?)। ফাঁপা বিশেষণের পরিবর্তে সত্য ও নির্দিষ্ট সংখ্যা বললে যে কোন জিনিষই সহজ হয়ে যায়। তিনি সব সময় সত্যনিষ্ঠ ও সুনির্দিষ্ট হবার জন্তে চেষ্টা করতেন।

অধ্যাপক হলডেন যেমন অপরের কাজের নির্মমভাবে সমালোচনা করতে ভালবাসতেন, তেমন তাঁর নিজের কাজের উপর অপরে সমালোচনা করুক, তাও তিনি মনেপ্রাণে কামনা করতেন। উন্নত ধরণের যুক্তি বা কাজ দেখিয়ে যদি কেউ তাঁর কাজের সমালোচনা করতো, তাহলে সেটাকে তিনি সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের সমালোচনা বলে গণ্য করতেন। Annals of Eugenics নামক এক বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় দেখা যায় যে, অধ্যাপক ফিসার প্রজনন-বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে যখন প্রবন্ধ লিখতেন, অধ্যাপক হলডেন তাঁর প্রবন্ধের দোষ-গুণ বিচার করে ঐ বিষয়ে উন্নততর প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। অধ্যাপক ফিসারও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় অধ্যাপক হলডেনের প্রবন্ধের সমালোচনা করে সত্যের আরও নিকটতর লক্ষ্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি নীরস হওয়া দূরে থাকুক, বরং পারস্পরিক সমালোচনায় প্রজনন-বিজ্ঞানের অশেষ উন্নতি ঘটেছিল।

অধ্যাপক হলডেন Journal of Genetics নামক এক বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সেই পত্রিকায় ছাপাবার জন্তে যে সব প্রবন্ধ পাঠানো হতো, সেগুলিকে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন এবং যেখানে তিনি তথ্যের সঙ্গে সিদ্ধান্তের কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পেতেন না, সেই সব প্রবন্ধগুলিকে বাতিল করে দিতেন। কিন্তু লেখকের সিদ্ধান্তে অবিশ্বাস করে বা তাঁর মৌলিক গবেষণা বুঝতে না পেরে কোন প্রবন্ধকে অপ্রকাশিত রাখতেন না। সমালোচনার জন্তে তাঁর কাছে অনেক পুস্তক আসতো। ভাল পুস্তককে তিনি যেমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন,

তেমনি আবার খারাপ পুস্তককে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতেও পিছপা হতেন না।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের মন্থর গতির কারণ অনুসন্ধান করে অধ্যাপক হলডেন বলতেন যে, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যে নির্বোধ বা অলস—তা নয়, কিন্তু তারা বড্ড বিনয়ী—তারা পরস্পরের কাজকে সমালোচনা করতে নারাজ। বিরুদ্ধ সমালোচনাই বিজ্ঞানকে উন্নতির ধাপে নিয়ে যায়। সমালোচনার অভাবে বিজ্ঞানের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। ইউরোপে নবীন বৈজ্ঞানিকদের কাজকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা হয়, কিন্তু প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিকদের কাজকে রূঢ় ভাষায় সমালোচনা করা হয়। বাইবেলে যা লেখা আছে এবং ডারউইন বা এঞ্জেল্‌স্ যা বলেছেন, তার সঙ্গে মিল হোক আর নাই হোক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল সূত্র হচ্ছে—তথ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। তিনি জোরের সঙ্গে বলতেন যে, বিজ্ঞানের উন্নতি করতে হলে সৌজন্য বা বিনয়ের চেয়ে দক্ষতার বেশী প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের বিজ্ঞানে যে সব দুর্বলতা ও দুর্নীতি লক্ষ্য করেছেন, তা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। ভারতে বিজ্ঞানের অনগ্রসরতার কারণ দেখিয়ে তিনি বলেছেন যে, এদেশের বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীদের পেশার প্রতি গর্ব নেই—তাঁরা বেতনের পরিমাণ ও পদের মর্যাদার উপর গর্ব অনুভব করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একবার যখন তাঁকে ভারতের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজনন-বিজ্ঞানের প্রধান হিসাবে কাজ করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তখন তিনি সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, যেখানে শিক্ষকদের বেতনের মানের দ্বারা পৃথকীকরণ করা হয়, সেখানে তাঁর যোগদানের ইচ্ছা নেই।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যে সব বিশৃঙ্খলা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, সে সম্বন্ধে সমালোচনা করতে তিনি কসুর করেন নি। সারা ভারতবর্ষে তিনি দেখেছেন যে, প্রবীণ বৈজ্ঞানিকেরা নবীন বৈজ্ঞানিকদের ঈর্ষার চক্ষে দেখে থাকেন এবং নবীনেরা যদি নতুন কিছু বলেন বা করেন, প্রবীণেরা তখন তাঁদের নিরুৎসাহিত করেন অথবা তাঁদের কাজকে নিজেদের কাজ বলে চালিয়ে থাকেন। কি করে একজন বৈজ্ঞানিক এক বছরে পঞ্চাশটি প্রবন্ধ প্রকাশ করতে পারেন, সে সম্বন্ধে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন—তাঁর এমন ব্যক্তি জানা নেই, যিনি ওই রকম হারে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে পারেন।

'নতুন বর্ণপ্রথা' (The New Caste System) নামে এক প্রবন্ধে অধ্যাপক হলডেন উল্লেখ করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বর্তমান ভারতবর্ষে নতুন বর্ণের সৃষ্টি করছে এবং মানুষের স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ভারতবর্ষে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ডিগ্রী ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে কোন বিষয়ে শিক্ষকতার কাজ করতে অনুমতি দেওয়া হয় না। পরিসংখ্যানের কোন ডিগ্রী না থাকা সত্ত্বেও অধ্যাপক সত্যেন বসু, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও অধ্যাপক রোনাল্ড আব্রাহাম ফিসার পরিসংখ্যানে মৌলিক গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছেন। নিজের কথা তুলে তিনি বলেছেন যে, বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর কোন ডিগ্রী না থাকলেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা পড়াবার জন্যে জীবনে অনেক অধ্যাপকের পদ পেয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছেন যে, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষে যাঁদের বিজ্ঞানে কোন ডিগ্রী নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার ক্ষেত্রে তাঁদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হয়; তাঁরা গবেষণায় যত ভাল ফলই দেখান না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার যোগ্যতা তাঁদের কোন দিন হয় না। তিনি মনে করেন যে, বিজ্ঞানের কোন

শাখার অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বিজ্ঞানের অন্য শাখায় কি ফাঁক আছে বা কি করণীয় আছে, তা যতটা ধরতে পারেন, সেই শাখার বিশেষজ্ঞেরা অতটা ধরতে পারেন না এবং যাঁরা আগ্রহী, তাঁরাই একমাত্র বিজ্ঞানের দুই শাখার মধ্যে সেতু নির্মাণ করতে পারেন। জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের মত বিজ্ঞানীরাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সেতু নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানের একটি শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন, তিনি যতটা বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন করতে পারেন, তার চেয়ে বেশী পারেন, যিনি বিজ্ঞানের দুটি শাখায় সমান যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যাঁরা প্রজনন-বিজ্ঞানের উপর প্রভুত্ব করতে চান, তিনি তাঁদের রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শী হবার জন্যে উপদেশ দিতেন।

সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি না হলে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কিছু করা যায় না—এই ধারণায় অধ্যাপক হলডেন বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলতেন যে, ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে যন্ত্রপাতির অভাব আছে, সেখানে এমন অনেক কিছু গবেষণা করা যায়, যাতে যন্ত্রপাতির মোটেই প্রয়োজন হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে হাজার হাজার টাকা বিদেশী যন্ত্রপাতির জন্যে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু ঐ টাকার কিছু অংশ পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল ও জলাভূমির প্রকৃতি জানবার জন্যে ব্যয় করতে নারাজ। ভারতবর্ষে নানান ধরণের জীবজন্তু ও গাছপালা আছে, তাদের প্রকৃতি ও কার্যকলাপ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ ও যথাযথ বিশ্লেষণ করলে নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বৃটেন ও আমেরিকার তুলনায় ভারতবর্ষে ভূ-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান ও প্রজনন-বিজ্ঞানে যথেষ্ট কাজ করবার সুযোগ আছে। বেশী পয়সায় সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি না কিনেও ইউরোপের বৈজ্ঞানিকদের অপেক্ষা উন্নত ধরণের গবেষণা করা যেতে পারে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু নিজের গবেষণাগারে ভাল ভাল যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ চালিয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাপক হলডেন নিজের গবেষণায় যন্ত্রপাতির ব্যবহারে পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি নৈতিকতার যুক্তি দেখিয়ে বলতেন যে, যে সব বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, তাঁরা সাধারণ কৃষক ও কুমোরদের নিকট থেকে দূরে সরে থাকেন। তিনি প্রশ্ন করতেন—ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রকার মাটিতে চাষ করবার জন্যে উন্নত ধরণের লাঙ্গল কি ব্যবহৃত হচ্ছে? হাঁস ও মুরগীর হাল্কা ও ভারী ওজনের ডিমের তুলনায় মাঝারি ওজনের ডিম কি কম বাচ্চা দিয়ে থাকে? যে সব পাখীরা গান গায়, তাদের যদি সদ্য ডিম-ফোটা অবস্থা থেকে পোষা যায়, তাহলে তারা কি গান গাইতে পারে? মানুষ যেভাবে ভাষা শেখে, পাখীরা কি সেইভাবে গান শেখে? ভারতবর্ষে প্রতি বছর কয়েক হাজার ব্যক্তি সর্পদংশনের ফলে মারা যায়। বসন্ত রোগের প্রতিরোধের জন্যে যেমন টিকা আছে, সেই রকম কি কোন টিকা আবিষ্কার করা যায় না, যার ফলে বিষধর সাপে কামড়ালেও মানুষ মরবে না! বিভিন্ন জাতের মধ্যে সঙ্কম ঘটিয়ে উন্নত জাতের হাঁস সৃষ্টি করবার ইচ্ছা অধ্যাপক হলডেন এক সময় প্রকাশ করেছিলেন। হাঁসের ন্যায় এমন উন্নত জাতের গরু সৃষ্টি করা যেতে পারে যে, তারা বেশী পরিমাণে এবং অনেক দিন ধরে দুধ দেবে। ভারতবর্ষে গরুর সংখ্যা বেশী, কিন্তু তারা দুধ কম পরিমাণে দিয়ে থাকে। অপ্রয়োজনীয় গরুগুলিকে হত্যা করা তিনি সমর্থন করতেন না, বরং তাদের বাচ্চা দেবার সুযোগ না দিয়ে উন্নত জাতের গরুর বংশবৃদ্ধি করে সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন। অনুমান করা যেতে

পারে যে, ট্র্যাক্টরের দ্বারা চাষের প্রবর্তন হওয়ায় ষাঁড় ও বলদের প্রয়োজন অদূর ভবিষ্যতে অনেক কমে যাবে। যাতে এঁড়ে বাছুরের তুলনায় বকনা বাছুরের সংখ্যা বাড়ানো যায়, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। এরূপ কাজে যন্ত্রপাতির বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

ভারতবর্ষের নবীন বৈজ্ঞানিকদের উপর অধ্যাপক হলডেনের গভীর আস্থা ছিল। তিনি মনে করতেন যে, ভারতীয় ছাত্রেরা কেম্ব্রিজ ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট তো নয়ই, বরং সাধারণভাবে তাদের তুলনায় ভাল বলা যেতে পারে। ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশ যাবার কারণ অনুসন্ধান করে তিনি বলেছেন যে, তারা মাঝে মাঝে অধ্যাপকদের নিকট থেকে এবং যেখানে কাজ করে, সেখানে এমন নির্যাতিত বা অপমানিত হয় যে, তারা বাধ্য হয়ে বিদেশে যাবার চেষ্টা করে।

ভারতীয় ছাত্রদের আমেরিকা যাবার সম্বন্ধে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করতে তিনি বারণ করতেন। মাটির বিশ্লেষণ ও জল-সংরক্ষণ সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে অষ্ট্রেলিয়া, ব্যাক্টিরিয়াঘটিত রোগ ও প্রজনন-বিজ্ঞানের জন্যে জাপান, দুগ্ধ-উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি শিক্ষার জন্যে ইস্রায়েল এবং পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানে গবেষণার জন্যে সোভিয়েট দেশে যাবার জন্যে তিনি তাদের উপদেশ দিতেন। তিনি মনে করতেন যে, স্বদেশে কিছু গবেষণা না করে কোন ভারতীয় ছাত্রের যেমন বিদেশে যাওয়া উচিত নয়, আবার বিদেশ থেকে পি-এইচ. ডি লাভ করে যাঁরা দেশে ফেরেন, স্বদেশে কিছু কাজ না করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোন উচ্চ পদে তাঁদের নিয়োগ করা উচিত হবে না।

প্লেনের পাইলট বা ডাক্তারী কাজ ছাড়া বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে অতিবিশেষজ্ঞ হওয়া অধ্যাপক হলডেন পছন্দ করতেন না এবং তিনি নিজেও বিশেষজ্ঞ হওয়া থেকে এড়িয়ে চলতেন। তিনি বলতেন যে, অতিবিশেষজ্ঞ হবার ফলে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের ক্ষুদ্র পরিধির বাইরে বিচরণ করতে পারেন না। উচ্চশিক্ষিত ছাত্রেরা বিদেশ থেকে দেশে ফিরে এসে কাজের জন্যে চেষ্টা করে কাজ পান না। তাঁরা বিদেশে থাকবার সময় এত সংকীর্ণ ক্ষেত্রে নিজেদের বিশেষজ্ঞ করে তোলেন যে, সেই রকম ক্ষেত্র দেশে পাওয়া দুষ্কর। যাঁরা বিদেশ থেকে ইলেকট্রন মাইক্রো-স্কোপ বা মেসার (Maser) নিয়ে কাজ করে দেশে ফিরে আসেন, তাঁরা ঐ ধরণের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করবার সুযোগ ভারতবর্ষের খুব কম গবে-ষণাগারেই পাবেন বলে মনে হয়।

অধ্যাপক হলডেনের বিভিন্ন লেখা থেকে যে সব দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে এটা সহজেই বোঝা যায় যে, তিনি যা সত্য বলে মনে করতেন, তা প্রকাশ করতে ভীত হতেন না। এখানেই তাঁর স্পষ্টবাদিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় বিজ্ঞানের কোথায় কি রকম গলদ আছে, তা যেমন স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছেন, তেমনি ভারতীয় বিজ্ঞানের কি ভাবে উন্নতি সাধন করা যায়, সে সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর চিন্তাধারায় অভিনবত্ব দেখে অনেকে তাঁকে পাগল বলে মনে করতেন, কিন্তু তিনি তা মোটেই গ্রাহ্য করতেন না। যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন তিনি বৈজ্ঞানিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

জীবনের রহস্য-সন্ধানে

শ্রীসত্যনারায়ণ চংদার

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে আমরা মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—জীব ও জড়। যাদের জীবন আছে, তারা সাধারণতঃ (১) পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে নিজেদের দেহগঠনের উপাদান সংগ্রহ করতে পারে, (২) এসব উপাদানকে নিজেদের দেহের পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্তে কাজে লাগাতে পারে, (৩) বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এই জীব-জগতের মধ্যে কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী সকলেই এক অসীম রহস্যের সন্ধান পান। বিজ্ঞানীদের মতে—জীবন-রহস্তের সমাধান করতে হলে জীবের দেহ যে সব কোষ দিয়ে তৈরি, সেই জৈব কোষের গঠনবৈচিত্র্য এবং তাদের বিচিত্র কাজের উপর আলোকপাত করতে হবে। কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব দেবার আগে স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কবে এবং কিভাবে হলো?

একথা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর সৃষ্টি অনেক-কাল আগে হলেও জীবের আবির্ভাব ঘটেছে অনেক পরে। আর পৃথিবীর জড় বস্তু (অর্থাৎ যাদের প্রাণ নেই) থেকেই বিচিত্র কোন এক কার্যকারণের ফলে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে। হয়তো প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল পুরনো পৃথিবীর কোন গভীর সাগরের তলদেশে অনেক জটিল জৈব অণু (Organic molecules) এবং পলিমারের (Polymer) সৃষ্টি এবং একজায়গায় অবস্থিতির ফলে। জলের তলায় প্রাকৃতিক পরিবেশের ফলে বিভিন্ন অণুর রাসায়নিক সংযোগের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল বৃহত্তর অণুর। এই সব বৃহত্তর অণুর হয়তো পরিবেশ থেকে বিশেষ ধরণের অণুকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা ছিল। এই বৃহত্তর অণুর বাইরের দিকে যে সব অণু-পরমাণু ছিল—বিভিন্ন বলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তারা একটা আচ্ছাদক পর্দার (Membrane) সৃষ্টি করেছিল। এই আচ্ছাদনের মধ্যে থেকে বিভিন্ন অণু-পরমাণু অনেক জটিল রাসায়নিক কার্যে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করলো এবং বাইরে থেকে সংগ্রহ করতো তথাকথিত 'খাদ্য'। এইভাবে বাড়তে বাড়তে তারা একটা নির্দিষ্ট আয়তন লাভ করে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হয়ে পড়তো। এই সব অতি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে প্রথম জীবের পদক্ষেপ ঘটলো। আপাতদৃষ্টিতে জীব-জগৎ ও প্রাণীজগতের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকলেও একথা এখন প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দেহের বিভিন্ন অংশের বিচিত্র এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাসই জীব-জগতের বৈচিত্র্যের জন্তে দায়ী। আর এই গঠনবৈচিত্র্য বুঝতে হলে জীবকোষের গঠন সম্পর্কে গবেষণা আবশুক।

জীবকোষের গঠন সম্পর্কে গবেষণা প্রায় তিন-শ' বছর ধরে চলে আসছে এবং এই বিষয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে সব তথ্যাদি পাওয়া গেছে, তা খুবই মূল্যবান। বিজ্ঞানীরা অনেক দিন আগেই জেনেছেন যে, কোষগুলি সমসত্ত্ব নয়—এর উপরে আছে একটা আচ্ছাদন আর মধ্যে আছে নিউক্লিয়াস। কিন্তু একথা আমাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র জীবকোষের গঠন-বৈচিত্র্য উন্মোচনই বিজ্ঞানীর একমাত্র কাজ নয়—জীবকোষের গঠন ও কর্ম-বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাণীর বিশেষত্ব-গুলিকে ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু এটা যে খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, তা সহজেই অনুমেয়।

প্রাণিজগতের বিবর্তন দুটি আপাতবিরোধী নিয়মের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়; যথা—স্থায়িত্ব ও পরিবর্তন। আমরা তো দৈনন্দিন জীবনে এটা সর্বদাই লক্ষ্য করি—সন্তানের মধ্যে পিতামাতার আকৃতি প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এই স্থায়িত্ব রক্ষার মধ্যেই আছে পরিবর্তনের এক বিচিত্র ব্যবস্থা, যার ফলে জীবজগতে বিপুল অভিনবত্ব দেখা যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যে এবং নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত না হতে দেবার নিরন্তর চেষ্টার ফলে এসেছে জীবজগতের অসংখ্য বৈচিত্র্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের পরমাণুর অতি জটিল সমাবেশের ফলেই জীবকোষের উৎপত্তি হয়েছে। কাজেই জীবতত্ত্ব বুঝতে গেলে পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার কিছু জ্ঞান আবশ্যক। পদার্থের নির্দিষ্ট আকার তার অণু-পরমাণুর আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে আমরা আয়নিক (Ionic), কোভ্যালেন্ট (Covalent) ইত্যাদি আণবিক বন্ধনের (Bond) আলোচনায় এসে পড়ি। আয়নিক এবং কোভ্যালেন্ট বন্ধনকে প্রাথমিক বন্ধন (Primary bond) বলা হয়। কারণ এই সব বন্ধনের শক্তির পরিমাণ বেশী, প্রতি মোলে প্রায় ১০০ কিলোক্যালোরি। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আরো নানা রকমের পারস্পরিক ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের অণু-পরমাণুর মধ্যে বিদ্যমান। প্রাথমিক বন্ধনের মত শক্তিশালী না হলেও এই দ্বিতীয় প্রকারের (Secondary) বন্ধন জীবদেহের কাজ ও গঠনের জন্যে বিশেষভাবে দায়ী এবং প্রয়োজনীয়। এটাও স্মরণীয় যে, যেখানে অনেক প্রকার দ্বিতীয় অর্থাৎ গৌণ (Secondary) শক্তি কাজ করছে, সম্মিলিতভাবে তারা উপেক্ষণীয় নয়। আবার এই সব বন্ধনের দুর্বলতাই এদের অধিক প্রয়োজনীয় করে তুলেছে—কেন না, স্বল্প-শক্তি প্রয়োগেই এদের ভেঙে নতুন ভাবে সাজানো যায়। প্রায় সমস্ত গৌণ শক্তিই ডাই-পোলের (Dipole) স্থির বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার (Electrostatic action) ফল এবং জীবদেহের প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের ভিতর ডাইপোল প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। হাইড্রোজেন বন্ধনও যে তার কতকগুলি বিশেষ ধর্মের জন্যে, এই প্রসঙ্গে একথা স্মরণীয়।

জীববিদ্যার পাঠে মনোনিবেশ করলে জলের প্রতি স্বভাবতঃই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রথম জীবনের উদ্ভব হয়েছিল এক জলীয় পরিবেশে এবং স্থলভাগের জীবের বিবর্তনও এমনভাবে হয়েছে, যার ফলে জীবনের পক্ষে অপরিহার্য এই পদার্থের কোনরূপ ঘাটতি না পড়ে। জীবের সৃষ্টি হয়েছে এমন এক গ্রহে, যেখানে জল অফুরন্ত এবং সমস্ত প্রাণিজগৎ যখন জলের উপর একান্ত নির্ভরশীল, তখন একথা বলা হয়তো ভুল হবে না যে, জলের এমন কতকগুলি বিশেষ ধর্ম আছে, যার ফলে প্রাণিজগতে জল অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে জল সত্যই একটা ব্যতিক্রম। জলের গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক যথাক্রমে ০° সে. এবং ১০০° সে.। এক মোল পদার্থকে তরল থেকে বাষ্পে পরিণত করতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে 'মোল পিছু বাষ্পীভবনের নির্দিষ্ট তাপ' (Molal heat of vaporization) বলা হয়। অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে জলের পার্থক্য এই সব বিশেষত্বের দিকে তাকালেই বুঝা যায়। সাধারণতঃ অণুভার (Molecular weight) যত কমে যায়—গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক এবং বাষ্পীভবনের নির্দিষ্ট তাপও তত কমে যায়। জল এই নিয়মের ব্যতিক্রম। আপেক্ষিক তাপের (Specific heat) ক্ষেত্রেও জল সাধারণ নিয়ম মেনে চলে না।

আমরা জানি, মোটামুটি স্থায়ী একটা তাপ-

মাত্রা না থাকলে জীবনের প্রাথমিক কাজগুলি চলতে পারে না এবং এই স্থায়ী তাপমাত্রা রক্ষার ব্যাপারে জল মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। পরিপাক ক্রিয়ার ফলে দেহের অভ্যন্তরে অনবরত তাপ উৎপন্ন হচ্ছে—কিন্তু বিভিন্ন জীবতন্তুর প্রায় ৭৫% জল এবং জলের এই অত্যধিক আপেক্ষিক তাপের জন্যেই তাপমাত্রা খুব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে না। আবার যেহেতু বাষ্পীভবনের তাপীয় শক্তি (Heat of vaporization) খুব বেশী, সেহেতু অল্প জলকে বাষ্পে পরিণত করতেই বেশী তাপের প্রয়োজন হয়। এক গ্র্যাম জলের বাষ্পীভবনের জন্যে ৫০০ ক্যালোরির বেশী তাপের প্রয়োজন। কাজেই দেহের তাপমাত্রা ১° কমাতে গেলে কিলোগ্র্যাম পিছু ২ গ্র্যাম জলের বাষ্পাভবনই যথেষ্ট। সেই হিসাবে জলের বাষ্পীভবন দেহ থেকে তাপ বিকিরণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়া।

জলের পৃষ্ঠটানও (Surface tension) বেশী। উদ্ভিদ-জগতের উপর প্রাণিজগতের নির্ভরতার কথা চিন্তা করলে জলের পৃষ্ঠটানের উপযোগিতা স্বীকার করতে হয়। কারণ জল ও দ্রবীভূত পদার্থের মাটির ভিতরে এবং উদ্ভিদ-তন্তুর মধ্যে সঞ্চারণে পৃষ্ঠটানের ভূমিকা কম নয়। আবার প্রোটিনের আচ্ছাদন (যা দিয়ে Cellular membrane তৈরি) প্রস্তুত করতেও এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

জলের ডাই-ইলেকট্রিক কন্স্ট্যান্ট (Dielectric Constant) অধিক হওয়াতে আয়নিক ক্রিষ্ট্যালের দ্রাবক হিসাবে এর উপযোগিতা অসামান্য। বেশীর ভাগ জৈব রাসায়নিক ক্রিয়াই জলের মধ্যে হয় এবং বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থকে দ্রবীভূত করবার ক্ষমতাও জলকে এক বিশেষ গুণে মণ্ডিত করেছে।

দেহাভ্যন্তরস্থ জীবকোষ এবং বিভিন্ন তরল পদার্থে আমরা নানাপ্রকার যৌগিক অণুর সন্ধান পাই এবং এদের মধ্যে অনেকের আণবিক ভার (Molecular weight) অত্যন্ত বেশী। এই সব দৈত্যাকৃতি বৃহদণুর (Macromolecules) কেবল বিচিত্র প্রকারের গঠনই নয়, তাদের কার্যও বিভিন্ন রকমের। খুব সাধারণ ভাবে বিচার করতে গেলেও এই বৃহদণুগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড এবং পলিস্যাকারাইড। এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, এরা সকলেই অণু-পরমাণুর একটা নির্দিষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাসের দ্বারা তৈরি এবং কতকগুলি ছোট এককের প্রাথমিক রাসায়নিক বন্ধনের (Primary chemical bond) দ্বারা বদ্ধ হবার ফলে বৃহদণুর সৃষ্টি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—যদি জীব ও জড়ের মোটামুটি একই প্রকার অণু-পরমাণুর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তাদের মধ্যে পার্থক্যের কারণ কি? একথা মনে রাখা উচিত যে, আমরা যদি জীবদেহকে সাধারণ পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার একটি অধিকতর জটিল সমস্যা বলে ধরি, তবে জীব ও জড়ের বিভাজক সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। কারণ, যদি উভয়ে একই প্রকার অণু-পরমাণুর দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে, তবে জীবকে আমরা কখন অজৈব পদার্থ থেকে আলাদা করে দেখবো—যখন অণুর সংখ্যা ১০ লক্ষ না ১০ কোটি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজসাধ্য নয়। আমরা সাধারণতঃ যাকে ভাইরাস বলি—সেগুলি অতি জটিল রাসায়নিক পদার্থ, যেগুলি বেশ কয়েক লক্ষ পরমাণুর দ্বারা তৈরি। আবার এদের অন্য বৈশিষ্ট্য—চারপাশের অণু-পরমাণু সংগ্রহ করে নিজেদের মত পদার্থ তৈরি করা। এই ভাইরাসকে জীব ও জড়-জগতের মধ্যেকার সেতু হিসাবে ধরা যেতে পারে।

প্রাণিজগতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—বংশবৃদ্ধির মধ্যেও আমরা কতকগুলি লক্ষণীয় জিনিষের

সন্ধান পাই। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে যে প্রাণীর জন্ম হয়—সেটা সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত কিছু হয় না। স্ত্রী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যের অনেক কিছুই সে পায়। আমরা জানি যে, প্রত্যেক নবজাতকের ক্রোমেজোমের অর্ধেক সে পায় পিতার কাছ থেকে আর অর্ধেক পায় মাতার কাছ থেকে। যদিও প্রজনন-বিদ্যার (Genetics) এখন পর্যন্ত শৈশব অবস্থা অতিক্রান্ত হয় নি, তথাপি প্রাণিজগতের রহস্য উদ্ঘাটনে এরই মধ্যে অনেক বিস্ময়কর তথ্যের আভাস দিয়েছে। জীবজগতের রহস্যের মধ্যে একটু একটু করে প্রবেশ করলে দেখা যায়—জীবনের মূল রয়েছে জিনের (Gene) মধ্যে। প্রাণিজগতের বৃদ্ধি, বিবর্তন এবং প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণীর নিজস্ব কাজ জীবকোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত Gene-এর দ্বারাই পরিচালিত হয়। একথা বললে হয়তো ভুল হবে না যে, প্রত্যেকটি জীব, প্রত্যেকটি উদ্ভিদ তার জিনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। Gene-এর সঙ্গে প্রাণিজগতের যে সম্পর্ক, নিউক্লিয়াসের সঙ্গে বড় কেলাসিত জিনিষেরও সেই সম্পর্ক।

এই প্রশ্ন সহজেই মনে জাগে যে, Gene-এর জন্যে প্রাণিজগতের এই বিশেষত্ব—গোলাপের গন্ধ থেকে উটের পিঠের কুঁজের মধ্যে যার প্রভাব পরিস্ফুট, সেই Gene-এর আয়তনই বা কত আর ওজনই বা কত? অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, ক্রোমোজোমের আয়তন প্রায় $১০^{-১৫}$ সি. সি.। ক্রোমোজোমের আয়তনকে জীনের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে একটা জীনের আয়তন হয় প্রায় $১০^{-১৭}$ সি. সি.। গড়পড়তা একটি পরমাণুর আয়তন প্রায় $১০^{-২৩}$ সি. সি.। কাজেই একটি জিন প্রায় দশ লক্ষ পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। একটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহে জীবকোষের সংখ্যা $১০^{১৪}$ এবং প্রত্যেকটি কোষে আছে ৪৬টি ক্রোমোজোম। কাজেই মনুষ্যদেহের সমস্ত ক্রোমোজোমের আয়তন $= ১০^{১৪} \times ৪৬ \times ১০^{-১৪} \simeq ৪৬$ সি. সি. যেহেতু প্রাণিদেহের ঘনত্ব $\simeq$ জলের ঘনত্ব, এর ভর দুই আউন্সেরও কম। এই অতি সামান্য বস্তুই অদ্ভুত কৌশলে নিজের চারপাশে জীবদেহের যে আস্তরণ তৈরি করে, তার ওজন হাজার গুণ বেশী শুধু তাই নয়, প্রাণিদেহের বৃদ্ধির প্রতিটি পদক্ষেপ এবং দেহ-গঠনের সূক্ষ্মতম বৈশিষ্ট্যকেও এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিষটি নিয়ন্ত্রিত করে। জিনের রহস্যজনক কর্মধারার আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি, কোন নির্দিষ্ট প্রাণীর বংশধারার বৈশিষ্ট্যে শত শত বছরেও কোন পরিবর্তন ঘটছে না; জিনের মধ্যে নির্দিষ্ট পরমাণুগুচ্ছ নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত থাকবার ফলেই জিনের এই বৈশিষ্ট্য। বিবর্তনের ফলে প্রাণীর যে রূপান্তর ঘটে, তার মূলেও আছে জিনের ভিতরকার পরমাণুর স্থান পরিবর্তন অথবা অন্য কোন প্রকারের পরিবর্তন।

অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ প্রস্তুতি-করণের চেষ্টার ক্ষেত্রে Heinz Frenkel-Conrat এবং Robley Williams-এর অবদানের কথা বলে এই আলোচনা শেষ করবো। Tobacco Mosaic Virus নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় তাঁরা একে দুটি রাসায়নিক পদার্থে ভাগ করে ফেলেন। একটি বৈদ্যুতিক চুম্বকে যেমন একখণ্ড লোহার চারপাশে তার জড়ানো থাকে, তেমনি এই ভাইরাসের দেহ রিবোনিউক্লিক অ্যাসিডের (RNA) দ্বারা গঠিত আর তার পাশে বৃহৎ প্রোটিন অণু জড়িয়ে আছে। উক্ত বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই রিবো-নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিনকে পৃথক করেন। এদের মধ্যে তখন জীবনের কোন সাড়াই পাওয়া যায় না। কিন্তু আবার

এদের একত্রিত করে দেখা গেল—রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড আর প্রোটিন মিলে তৈরি করলো পূর্বেকার ভাইরাস। কাজেই অজৈব পদার্থ থেকে পরীক্ষাগারে জীবন তৈরি করতে হলে আমাদের দেখতে হবে, সাধারণ রাসায়নিক পদার্থ থেকে রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন তৈরি করে তাথেকে পূর্বোক্ত ভাইরাস সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা। জীবনের রহস্য-সন্ধানে সেটা যে এক বৃহৎ পদক্ষেপ হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

চকোলেট

পুষ্পা মুখোপাধ্যায়

আগের চেয়ে আজকাল সংরক্ষিত খাদ্যের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে, তার ফলে এই সব জিনিষের আমদানীও বৃদ্ধি পেয়েছে। নানারকম দুধের গুঁড়া, চা, কফি, কোকো, চকোলেট, নানা জাতীয় মল্টমিশ্রিত পানীয়, তরিতরকারি, ফল, মাছ প্রভৃতি বহু রকমের জিনিষ সংরক্ষিত হচ্ছে। জেলি, জ্যাম, আচার, পিক্‌ল্‌, সস্‌, ফলের রস প্রভৃতির সংখ্যা এবং বৈচিত্র্যও কম নয়। আমাদের দেশে প্রধানতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই সংরক্ষিত খাদ্যের আমদানী যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এখন দেশের নানা স্থানে ছোট বড় অনেকগুলি শিল্প-সংস্থা গড়ে উঠেছে, যেগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো খাদ্য-সংরক্ষণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে অবশ্য নানারকম পানীয় প্রস্তুতের জন্যে গুঁড়া খাদ্য টিনভর্তি হয়ে এখানকার দোকানে শোভা পেয়েছে, তবে চা ছাড়া সেগুলির অধিকাংশই বিদেশজাত। এমনই একটি খাদ্য-পদার্থ কোকো বা চকোলেট চূর্ণের আদর বাঙালী ঘরে অনেক দিনের। এখন গুঁড়ানো চকোলেটের চেয়ে বার চকোলেটের আদর বেশী। তার বৈচিত্র্যও কম নয়, যেমন—মিল্ক চকোলেট, নাট চকোলেট, ক্যারামেল, টফি, ফলের রসযুক্ত চকোলেট ইত্যাদি। চকোলেট যে শুধু খেতে মধুর, তাই নয়—এর খাদ্যমূল্যও কম নয়—বিজ্ঞাপনের কল্যাণে অবশ্য শিশুদেরও তা জানতে বাকী নেই। কিন্তু এই চকোলেট আসছে কোথা থেকে?

উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো মালভূমিতে প্রাচীন কাল থেকে এক রকম পানীয়ের প্রচলন ছিল, যার স্বাদ তিক্ত, কিন্তু শক্তি যোগাবার ক্ষমতা অদ্ভুত। যে গাছের ফল থেকে এই পানীয় প্রস্তুত হতো, আদিম অধিবাসীরা তার নাম দিয়েছিল 'দেবতার খাদ্য' (Theobroma cacao)। এটা তাদের অতি প্রিয় খাদ্য ছিল। স্থানীয় অ্যাজটেক (Aztec) জাতির দেওয়া নাম Kakauatl থেকে স্পেনীয় নাম কোকোর (Cacao) উদ্ভব।

প্রাচীন মেক্সিকোবাসীরা কোকো গাছের ফল থেকে বীচিগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে আগুনে ভেজে তার সঙ্গে নানা রকম মশলা-চূর্ণ মিশিয়ে সবটা গুঁড়িয়ে নিত। এই মিশ্রিত পদার্থ জমে যখন ক্বাথের মত হতো, তখন চামচ দিয়ে তুলে সেটা খাওয়া হতো। অ্যাজটেক জাতির প্রাচীন পুঁথি-পত্রে এই পানীয়ের মহৎ গুণের বর্ণনা আছে—স্বাস্থ্য এবং শক্তির সমাহাররূপে কোকো এদের খাদ্যতালিকায় একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করেছিল। কোকোর এরূপ সমাদর লাভের আভাস পাওয়া যায় পুরাকালে এর বিনিময়-পদ্ধতির নজীরে—

স্বর্ণরেণুর সঙ্গে কোকোবীজ বিনিময়ের প্রচলন ছিল।

স্পেনীয় ঔপনিবেশিকেরা যখন মেক্সিকোতে পদার্পণ করে, তখন নতুন নতুন জিনিষ আবিষ্কারের প্রেরণায় তারা দিকে দিকে ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু যেখানেই অ্যাজটেক জাতির বাস, সেখানেই এক প্রকার অদ্ভুত গাছ দেখে তারা খুবই বিস্মিত হয়। মুগ্ধ হয় সেই গাছের সৌন্দর্যে—রামধনুর সাতটি রং যেন ঐ সকল গাছে আশ্রয় নিয়েছে। তারপর স্থানীয় লোকদের অনুরোধে এর বীজ থেকে তৈরি পানীয় আস্বাদন করে খুবই তৃপ্তি অনুভব করে। অ্যাজটেকদের কোকো প্রস্তুত-প্রণালীতে কোন রকম মিষ্টরসের সংশ্রব ছিল না। তাই স্পেনীয়দের মুখে স্বাদটা তিক্ত লাগলেও গন্ধ এবং গুণে তারা মুগ্ধ হয়ে যায়।

উত্তর আমেরিকায় স্পেনীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের আগে পর্যন্ত ইউরোপীয়েরা কোকোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানতো না। স্পেনীয়রা কোকো পানে অভ্যস্ত হয়ে নিজেদের দেশে এই বীজ চালান দিতে সুরু করলো এবং স্পেন দেশে যাতে এই পানীয় গ্রহণের প্রচলন বৃদ্ধি পায়, তার জন্যে অনেক চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু স্পেনে কোকোর তেমন আদর হলো না। লোকে খাদ্যবস্তুটিকে তেমন পছন্দ করলো না। কিন্তু স্পেন থেকে যখন ফ্রান্সে এই বীজ চালান গেল, ফরাসীরা তাকে লুফে নিল। কোকোর গুণ বর্ণনায় ফরাসীরা পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। এর কর্মক্ষমতা বাড়াবার শক্তির পরিচয় পেয়ে ডাক্তারেরা পর্যন্ত শিশু, রোগী ও বৃদ্ধের পক্ষে উৎকৃষ্ট পথ্য বলে রায় দিলেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে এই টনিক প্রায় দুর্লভ, তার একমাত্র কারণ এর আকাশস্পর্শী মূল্য। কোকো-বীজের আমদানী তখন স্পেনের একচেটিয়া, এই লাভের ব্যবসায়ে সে কাউকেই ভাগীদার করতে নারাজ। লাভের কড়ি তারা সবটাই নিজের মুঠোর মধ্যে রাখতে চায় এবং এর প্রস্তুত-প্রণালীও গোপন রাখে। স্পেনের হাত ঘুরে অন্যান্য দেশে চালান যাবার ফলে কোকোবীজের দামও ছিল সাধারণের নাগালের বাইরে।

কিন্তু যে জিনিষের এত চাহিদা, তার ব্যবসায়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের একাধিপত্য রাখা খুবই কঠিন —স্পেনও বেশী দিন একচ্ছত্র আধিপত্য রাখতে পারলো না। রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলো ইংরেজ, ডাচ প্রভৃতি ঝানু ব্যবসায়ীরা। ভেনেজুয়েলা ও ইকোয়েডরে কোকোগাছের সন্ধান পাওয়া গেল —আমদানীর হার হয়ে গেল দ্বিগুণ। প্রচুর আমদানীর ফলে মূল্যমান কমে গেল, খাদ্য-রসিকেরাও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লেগে গেলেন, প্রিয় জিনিষটাকে প্রিয়তর করবার জন্যে। কোকো-চূর্ণের সঙ্গে মিশলো চিনি, দারুচিনি-চূর্ণ বা অন্যান্য সুগন্ধি মশলা। চূর্ণ সুগন্ধযুক্ত করা হলো ভ্যানিলা দিয়েও। এভাবে আবিষ্কার হলো এক অপরূপ পানীয়ের, যা আজ পর্যন্ত দেশে-বিদেশে ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হচ্ছে।

গ্রীষ্মপ্রধান স্থান ছাড়া কোকোগাছের চাষ হয় না। বিষুব রেখার ২০ ডিগ্রি উত্তর-দক্ষিণ অঞ্চলে কোকোর উত্তম ফলন হয়। আফ্রিকার আবহাওয়া কোকো-চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। পশ্চিম আফ্রিকার কঙ্গো নদীর তীরে গোল্ডকোষ্ট অরণ্য। সেখানে যেমন গরম, তেমনই আবহাওয়াও আর্দ্র। বারো মাসের মধ্যে ছয় মাসই সেখানে বৃষ্টিপাত হয়। কোকো-চাষের পক্ষে এটি উৎকৃষ্ট পরিবেশ। এখানে গভীর অরণ্যের বড় বড় গাছগুলিকে উৎপাটন করে ব্যাপকভাবে কোকোর চাষ হয়। পৃথিবীর চাহিদা মেটায় সবচেয়ে বেশী এই গোল্ড-কোষ্ট অরণ্য।

বীজ থেকে কোকোগাছ উৎপাদন করা হয়। বড় বড় গাছের ছায়ার নীচে গাছগুলি ভাল

ভাবে বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ শিম্বি গোত্রের (Leguminous) গাছের নীচেই এগুলি বেড়ে ওঠে। বাল্য অবস্থায় গাছগুলি ২৫ থেকে ৪০ ফুট পর্যন্ত বাড়তে পারে; কিন্তু এগুলিকে ১৫ ফুটের বেশী বাড়তে দেওয়া হয় না। এই দৈর্ঘ্যেই ফলন ভাল হয়। নানা রঙের সমাবেশে গাছগুলি অতি সুন্দর দেখায়। ডালপালাগুলির রং উজ্জ্বল রূপালী, বড় বড় পাতার রং চক্চকে সবুজ, আর নতুন পাতার রং গোলাপী। পাঁচ পাপ্ড়িযুক্ত সাদা সাদা ফুলগুলি মূল, কাণ্ড ও মোটা শাখা-প্রশাখা ঘিরে ফুটে থাকে। অপর্যাপ্ত ফুল, কিন্তু তাদের কোন গন্ধ নেই। কচি ডালে কখনো ফুল ফোটে না। ফুল থেকে যে ফল হয়, কচি ডালগুলির পক্ষে তার ভার বহন করা সম্ভব নয় বলেই সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা।

বন্য অবস্থায় ৩ বছর বয়স থেকেই ফুল থেকে ফল ধরতে পারে। কিন্তু ৫।৬ বছর বয়সের আগে ফল ধরতে দেওয়া হয় না। ১০।১২ বছর বয়সে এরা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এবং ৫০ বছর পর্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি বছর ফল প্রসব করে। পরিণত বয়স্ক একটি গাছে বছরে প্রায় ৬০ হাজার পর্যন্ত ফুল ধরতে পারে, তবে একবারে ২০ থেকে ৪০টির বেশী ফল পাওয়া যায় না। বারো মাসই এই ফল ও ফুলের মরশুম লেগে থাকে।

ফলগুলি দেখতে লম্বা লম্বা শুঁটির মত। কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে, পাকলে হয় সোনালী অথবা কাঁচা অবস্থায় মেরুন রং এবং পাকলে টুকটুকে লাল হয়ে যায়। শ্রেণীভেদে রঙের পার্থক্য হয়ে থাকে। এই রঙের মাঝে মাঝে আবার সবুজ, সোনালী লাল বা ঘন বাদামী রঙের ছিট দেখা যায়। মূল, কাণ্ড ও বড় শাখাগুলির গায়ে যখন এই রং-বেরঙের ফলগুলি ঝুলতে থাকে, তখন মনে হয় যেন কেউ যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে। প্রায় ৭ ইঞ্চি লম্বা এক-একটি শুঁটির ওজন সাধারণতঃ এক পাউণ্ডের মত। তবে অধিকাংশ ওজনই বাইরের খোলাটির জন্যে। ভিতরে নরম সাদা ভিজে ভিজে শাঁসের উপর পাঁচ থাকে ২০ থেকে ৫০টি পর্যন্ত বীচির সারি, যার ওজন দু-আউন্সের বেশী নয়। তাই এক পাউণ্ড কোকো-চূর্ণ পেতে হলে রাশি রাশি বীচির প্রয়োজন হয়।

ফলগুলি গাছ থেকে পাড়বার জন্যে এক রকম লম্বা হাতলযুক্ত ছুরি ব্যবহার করা হয়। অনেকটা উঁচু থেকে পাড়তে হয় বলে এই রকম ঈষৎ বাঁকানো (হাতলযুক্ত দা-এর মত) ছুরির দরকার হয়। শুঁটিগুলি চিরে ফেলে বীচি ছাড়িয়ে নিয়ে বড় বড় ঝুড়ি বা প্যাকিং বাক্সে রাখা হয়। দু-চার দিন এমনিভাবে থাকবার ফলে বীচিগুলির মধ্যে এক প্রকার জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া চলে, যার ফলে এর তিক্ত স্বাদ কমে যায় এবং চকোলেটের পরিচিত গন্ধটির উদ্ভব হয়। এরপর এগুলিকে উত্তমরূপে শুষ্ক করা প্রয়োজন। যেখানে রোদের অভাব নেই, সেখানে দরমা বা চটের উপর ছড়িয়ে দিয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। রোদের অভাবে আগুনে সেঁকে নেওয়া হয়। এখন অবশ্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তাপযন্ত্রের সাহায্যে বহুল পরিমাণ বীচি একত্রে ভাজা হয়। বাদামী রং ধরলে বীচি থেকে যখন সুন্দর চকোলেটের গন্ধ বেরোতে থাকে, তখন ভাজা সম্পূর্ণ হয়। কোকোবীজের উপরে একটি পাত্লা খোসা থাকে, অনেকটা আমাদের চীনাবাদামের দানার উপরের খোসার মত। ভাজবার পর যেটা একটু ঘষলেই উঠে যায়। তখন এর নাম হয় কোকোনিব। এগুলিই কোকো ও চকোলেট প্রস্তুতির কাঁচা মাল। বীচিগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে। যার নাম কোকো-বাটার। এটি অতিশয় পুষ্টিকর। যাঁতার সাহায্যে বীচিগুলি পেষাই করা হলে ঐ

স্নেহজাতীয় পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে শিলে পেষাই করা বাটনার মত পিণ্ডে পরিণত হয়। ঐটাই হলো প্রকৃত চকোলেট। এর স্বাদ কিছুটা তিক্ত। এর সঙ্গে আরো কোকো-বাটার, দুধ চিনি, নানা রকম গন্ধদ্রব্য মিশিয়ে নানা রকমের চকোলেট তৈরি করা হয়।

কোকোনিবগুলি যখন হাইড্রলিক প্রেসারের (Hydraulic pressure) সাহায্যে পেষণ করা হয়, তখন কোকো-বাটার তরল আকারে নিঃসৃত হয়। যে শুষ্ক চূর্ণ পড়ে থাকে, সেটি কোকো হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং গরম জলে মিশিয়ে দুধ ও চিনি সহযোগে পান করা হয়। চকোলেটের গুঁড়াও ঠিক এইভাবেই খাওয়া হয় ও অন্যান্য অনেক মিষ্ট দ্রব্যেও (সন্দেশ, আইসক্রীম ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়। বার চকোলেটের প্রথম আবিষ্কর্তা গুয়াটামালানের অধিবাসীরা। এর পরেই লণ্ডন, আমাষ্টার্ডাম, প্যারিস প্রভৃতি সব জায়গায় চকোলেটের আদর বাড়তে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বার চকোলেটের খাদ্যমান সম্বন্ধে জনসাধারণ অবহিত হয়। সৈনিকের ক্লেশকর জীবনে বার চকোলেট যেন অমৃতের সন্ধান দিয়েছিল।

ধীরে ধীরে অনেক কারখানা গড়ে উঠলো —প্রথম আমেরিকায়, তারপর অন্যান্য দেশে। স্বাধীন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন প্রথম জীবনে এমনই একটি কারখানার শ্রমিক ছিলেন। কারখানাটির নাম ওয়াণ্টার বেকার অ্যাণ্ড কোম্পানী। ডরচেষ্টার সহরে এই কারখানাটির পত্তন হয়। মধ্য আমেরিকা তখন কোকোবীজ সরবরাহের প্রধান ঘাঁটি ছিল। স্বভাবতঃই আমেরিকানরা চকোলেটের অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়লো। বর্তমান কালেও আমেরিকার চকোলেট প্রীতির কথা জানা যায়, তার কোকোবীজ আমদানীর বহর দেখে। বছরে প্রায় ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড কোকো-বীজের ব্যবহার হয় এখানকার কারখানা-গুলিতে।

ইংল্যাণ্ড ১৭৩০ সালে প্রথম চকোলেটের কারখানা খুললো ব্রিষ্টলে ফ্রাই অ্যাণ্ড সন্স। তারপর কত কারখানার পত্তন হয়েছে এই লাভজনক ব্যবসায়ের। আজকাল যে নেসল্‌স্‌-এর চকোলেটের এত সুনাম ও সমাদর, তার জন্মস্থান সুইজারল্যাণ্ডের আল্পস্‌ পর্বতমালার কোলে লেক জেনেভার নিকট। এই কারখানার পত্তন হয় ১৮১৯ সালে। এখানকার দুগ্ধ-কেন্দ্রের স্বাস্থ্যবতী গাভীর দুধ চকোলেটের স্বাদ বর্ধিত করেছে।

বিদেশ থেকে আমদানী কমে যাবার ফলে আমাদের দেশে চকোলেট আজ আর সুলভ নয়, সস্তা তো নয়ই। এই যুগে আমাদের দেশের শিশুরা একটি সুস্বাদু, সুপাচ্য, পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বোধ হয় বঞ্চিত থাকবে।

এনজাইম

মিহিরকুমার কুণ্ডু

জীববিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞানের যোগসূত্র এনজাইমের উদ্ভব বিশ্ব-ইতিহাসের এক সুদূর-প্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। জীবনের মতই এনজাইমের আবির্ভাব এক বিচিত্র জটিল দুর্জ্ঞেয় রহস্যজালে আবৃত। জীবনের উদ্ভব সম্পর্কে এফ. জি. হপ্‌কিন্সের উক্তি—The most improbable and the most significant event in the history of the universe—এনজাইমের আবিষ্কার সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। এক দিকে সর্বব্যাপী জীবনপ্রবাহে এনজাইমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, অপর দিকে অজস্র রাসায়নিক বিক্রিয়ার সুষ্ঠু সংঘটনে এর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব—দুই-ই সমান বিস্ময়াবহ ও চাঞ্চল্যকর।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী পেন এবং পারজোত্‌স্ অঙ্কুরিত বার্লির মধ্যে একটি তাপভঙ্গুর পদার্থের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। পদার্থটি অদ্রাব্য স্টার্চ (অ্যামাইলাম) থেকে দ্রাব্য সুগার তৈরি করতে সক্ষম। তাঁরা এর নাম দেন ডায়াস্টেজ। অ্যামাইলেজ নামেও এটি পরিচিত। ফারমেন্‌টেসন সংক্রান্ত তাঁদের এই পর্যবেক্ষণই বস্তুতঃ এনজাইমের অস্তিত্বের সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট স্বীকৃতি। এরা উচ্চ অণুভারবিশিষ্ট যৌগগুলিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অণুভারবিশিষ্ট যৌগে রূপান্তরিত করতে পারে। ডাবলিউ. কুনে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এই পদার্থকে এনজাইম নামে অভিহিত করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ডুক্লাউক্স এনজাইমগুলির নামকরণের একটি পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে এনজাইম যে পদার্থের (সাবস্ট্রেট) উপর ক্রিয়া করে, সেই পদার্থের নামের শেষে 'এজ' যোগ করা হয়; যথা—

সাবস্ট্রেট	এনজাইম
মলটোজ	মলটেজ
প্রোটিন	প্রোটিনেজ
ইউরিয়া	ইউরিনেজ

কিন্তু ইতিপূর্বেই কোন কোন পরিপাককারী 'এনজাইমের নামের শেষে 'ইন' যোগ করা হচ্ছিলো, যথা—পেপসিন। এই কয়েকটি ক্ষেত্রে আর কোন পরিবর্তন করা হয় নি। অধুনা আবিষ্কৃত এনজাইমের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, অস্পষ্টতা দূর করবার জন্যে নামকরণে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়ে থাকে:—(১) বিকারক পদার্থ বা সাবস্ট্রেট এবং (২) বিক্রিয়ার স্বরূপ; যথা:

এনজাইম	সাবস্ট্রেট	বিক্রিয়ার স্বরূপ
অকজালেট ডিকার্বোক্সিলেজ	অকজালেট	কার্বন ডাইঅক্সাইড বিদূরিত হয়
গ্লাইসিন অক্সিডেজ	গ্লাইসিন	অক্সিজেন যুক্ত হয়
নাইট্রেট রিডাক্টেজ	নাইট্রেট	বিজারণ
অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনেজ	অ্যালকোহল	হাইড্রোজেন অপসারিত হয়

সমস্ত এনজাইমের রাসায়নিক স্বরূপ এক। প্রত্যেকের অণুতেই রয়েছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন। এরা সকলেই প্রোটিন। প্রোটিনকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় ছোট ছোট নাইট্রোজেনঘটিত জৈব যৌগ। এই সব যৌগের সাধারণ রাসায়নিক গঠন $R-\underset{NH_2}{\underset{|}{CH}}-COOH$; $-NH_2$-কে বলা হয় অ্যামিনোপুঞ্জ আর $-COOH$-কে কার্বক্সিল বা অ্যাসিডপুঞ্জ। এই জন্যে এই যৌগগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড নামে পরিচিত। R মূলক ২৫ রকমের হতে পারে। স্বভাবতঃই অ্যামিনো অ্যাসিডও ২৫ রকমের হয়। কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিড; $R-\underset{NH_2}{\underset{|}{CH}}-COOH$ যথা—

অ্যামিনো অ্যাসিড	R
গ্লাইসিন	$H-$
অ্যালানিন	CH_3-
থ্রিয়োনিন	$CH_3.\ CHOH-$
লিউসিন	$(CH_3)_2\ CH.\ CH_2-$
লাইসিন	$NH_2.\ (CH_2)_3.\ CH_2-$
মেথিয়োনিন	$CH_3—S—CH_2.\ CH_2-$
ফিনাইল অ্যালানিন	$C_6H_5.\ CH_2-$

একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের $—COOH$ পুঞ্জ আরেকটি অ্যামিনো অ্যাসিডের $—NH_2$ পুঞ্জের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বন্ধনীর সৃষ্টি করে এবং এভাবে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পরস্পর যুক্ত হয়:

$$H_2N-\underset{R}{\underset{|}{CH}}-CO\ \boxed{OH+H'}\ HN-\underset{R_1}{\underset{|}{CH}}-COOH \xrightarrow{H_2O} H_2N-\underset{R}{\underset{|}{CH}}-CO.$$

$$NH-\underset{R_1}{\underset{|}{CH}}-COOH$$
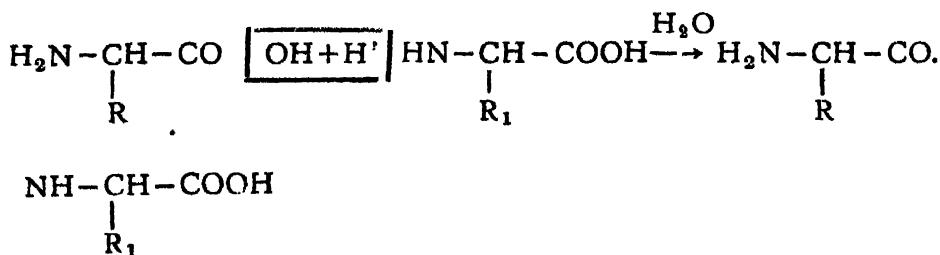
অ্যামিনো অ্যাসিড বন্ধনকারী $—CO.\ NH_2—$ পুঞ্জকে পেপ্টাইড বন্ধনী বলে। দুটি অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হলে বলা হয় ডিপেপ্টাইড, ৩টি অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হলে ট্রিপেপ্টাইড আর অনেকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হলে বলা হয় পলিপেপ্টাইড। যাবতীয় প্রোটিনই পলিপেপ্টাইড। প্রোটিনের দীর্ঘ পলিপেপ্টাইড শৃঙ্খল বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত হতে পারে। এটা সাপের ন্যায় এঁকে-বেঁকে থাকতে পারে, আবার কুণ্ডলী পাকিয়েও থাকতে পারে। কখনো কখনো একটি পলিপেপ্টাইড আরেকটি পলিপেপ্টাইডের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে যুক্ত হয়ে পরস্পর জড়াজড়ি করে থাকতে পারে।

এনজাইমের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এটি রাসায়নিক

বিক্রিয়ার গতিবেগ প্রভাবিত করে অর্থাৎ এনজাইম প্রাণিজ প্রভাবক। এনজাইমের প্রভাবন ক্ষমতা "টার্ণ ওভার" সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এক গ্র্যাম-অণু* এনজাইম প্রতি মিনিটে যত গ্র্যাম-অণু সাবষ্ট্রেটকে পরিবর্তিত করে, সেই সংখ্যাকে এনজাইমের "টার্ণ ওভার" সংখ্যা বলা হয়। একই এনজাইম সমস্ত বিক্রিয়া প্রভাবিত করতে পারে না। একটি এনজাইম সাধারণতঃ একটি বিশেষ বিক্রিয়া প্রভাবিত করে। এনজাইমের এই বৈশিষ্ট্য পলিপেপ্টাইড শৃঙ্খলের আকৃতি, শৃঙ্খলিত অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা এবং আপেক্ষিক বিন্যাসের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

কোন কোন এনজাইম একনিষ্ঠ। এদের মধ্যে অন্যাসক্তির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এই সব এনজাইম কেবলমাত্র একটি বিশেষ পদার্থের (সাবষ্ট্রেট) সঙ্গে মিলিত হয়, কিন্তু কোন প্রলোভনেই অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে মিলিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, এনজাইম মলটেজ সাবষ্ট্রেট মলটোজের সঙ্গে মিলিত হয়ে মলটোজকে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে, কিন্তু অন্য কোন পদার্থের প্রতি একে আসক্ত বা প্ররোচিত করা সম্ভব নয়। আবার আর এক শ্রেণীর এনজাইম দেখা যায়, যারা এদের মত অতটা নিষ্ঠাপরায়ণ নয়। এনজাইমের জগতে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের আসক্তি কেবলমাত্র একটি বিশেষ সাবষ্ট্রেটের প্রতি সীমিত নয়, কিন্তু এরা সকলেই দলনিষ্ঠ। কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রতিটি সদস্যের প্রতি এরা উদার। প্রত্যেকের সঙ্গে এদের মিলন সম্ভব এবং মিলনের স্বরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে এক। কিন্তু ভিন্ন গোষ্ঠীর কোন সদস্যের সঙ্গে জ্ঞানতঃ এরা মিলিত হয় না। লাইপেজ এই ধরণের একটি এনজাইম। এরা কেবল তেল, যথা—তিসির তেল, তুলাবীজের তেল, রেড়ির তেল প্রভৃতির উপর ক্রিয়া করে। প্রতি ক্ষেত্রেই বিক্রিয়াজাত পদার্থ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল। এই দলের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সদস্যের রাসায়নিক গঠন লক্ষণীয়:

$$\begin{array}{l} CH_2O.\ CO.\ R_1 \\ | \\ CHO.\ \ CO.\ R_2 \\ | \\ CH_2O.\ CO.\ R_3 \end{array}$$
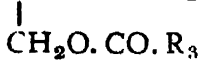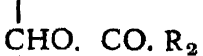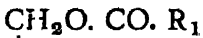
গ্লিসারাইড (তেল)

R_1, R_2, R_3 এরা অ্যালকাইলপুঞ্জ। এদের মধ্যে এক বা একাধিক অসম্পৃক্ত বন্ধনী থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। R_1, R_2 ও R_3 সর্বদা অভিন্ন নাও হতে পারে।

কখনো কখনো সাবষ্ট্রেটের অনুরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট কোন কোন পদার্থ এনজাইমকে প্রতারিত করে। এনজাইম সাবষ্ট্রেট ও এই ধরণের পদার্থগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারে না, ফলে এদের সঙ্গেও মিলিত হয়। কিন্তু এই মিলন নিষ্ফল হয়, কোন নতুন পদার্থ তৈরি হয় না। এই ধরণের পদার্থ একই এনজাইমের জন্যে সাবষ্ট্রেটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এনজাইম সাবষ্ট্রেট মিলনে বাধা সৃষ্টি করে বলে এদের প্রতিদ্বন্দ্বী বাধক বলা হয়। কিন্তু সাবষ্ট্রেটের পরিমাণ যদি বাধক অপেক্ষা অনেক বেশী হয়, তাহলে বাধকেরা কার্যতঃ কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। এই রকম ২টি সাবষ্ট্রেট ও প্রতিদ্বন্দ্বী বাধক ১নং চিত্রে দেখানো হলো।

*কোন পদার্থের অণুভারের সমান ওজন-বিশিষ্ট পরিমাণকে সি. জি. এস. পদ্ধতিতে গ্র্যাম-অণু বলা হয়, যথা ১ গ্র্যাম অণু অক্সিজেন= ৩২ গ্র্যাম অক্সিজেন।

আর এক ধরণের বাধক আছে, যারা উপরের বাধকদের শ্রেণীতে পড়ে না। এরা এনজাইমগুলিকে পর্যুদস্ত করে তাদের কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দেয়। সাবস্ট্রেটের পরিমাণ বৃদ্ধি করলেও কোন কাজ হয় না। সায়ানাইড, কার্বন মনোক্সাইড এই রকম কয়েকটি বাধক। বাধকদের ভূমিকা অনেক সময় কল্যাণকর হয়। কোন কোন এনজাইম রোগ-বিস্তারে সহায়তা করে। এই ধরণের এনজাইমের কার্যক্ষমতা নাশ বা হ্রাস করে' বাধকেরা রোগ দমন করে।

সাবস্ট্রেট	প্রতিদ্বন্দ্বী বাধক
NH_2 … $COOH$ — প্যারা অ্যামিনো বেনজয়িক অ্যাসিড	NH_2 … SO_2NH_2 — সালফানিলাম্যাইড
OH, N, CH_3, HO, N — থাইমিন	OH, N, Br, HO, N — 5-ব্রোমো ইউরাসিল

১নং চিত্র

এনজাইম সাবস্ট্রেটের মিলন সব সময় ফলপ্রদ নাও হতে পারে, কোন নতুন পদার্থ তৈরি না হওয়া বিচিত্র নয়। সকল মিলনের জন্যে প্রোটিন নয়, এমন অনেক পদার্থের সাহায্যের প্রয়োজন। এই সব সহায়ক পদার্থের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—প্রোস্থেটিক গ্রুপ—এরা প্রোটিনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে এবং এই অবস্থায় এনজাইমের প্রভাবন ক্রিয়ায় সহায়তা করে যায়। হিমোপ্রোটিন—এনজাইমের হিম অংশ (Haem) প্রোস্থেটিক গ্রুপের একটি উদাহরণ। কো-এনজাইম—এরা প্রোটিনের সঙ্গে খুব শিথিলভাবে সংলগ্ন থাকে, সহজেই প্রোটিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এনজাইমের কার্যকারিতা এদের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। ভিটামিন B_1, ভিটামিন B_2 এরকম কয়েকটি কো-এনজাইম। সুষ্ঠু প্রভাবনের জন্যে কোন কোন এনজাইমের আবার কতকগুলি ধাতুর সহায়তা আবশ্যক। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধাতু হলো—লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি। এরা অ্যাক্টিভেটর বা নামে পরিচিত।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলবার ক্ষমতা এনজাইমের খুবই কম। কার্যক্ষমতার সম্যক বিকাশের জন্যে দ্রবণের গাঢ়তা, তাপমাত্রা, অম্লতা প্রভৃতির কঠোর নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। দ্রবণের তাপমাত্রা বা গাঢ়তা একটি

নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে এনজাইমের ক্রিয়াশীলতা হ্রাস পেতে থাকে। নির্দিষ্ট সীমার বাইরে গাঢ়তা বা তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হলে এরা অবশেষে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, আর কার্যক্ষমতা ফিরে আসে না। কিন্তু ঐ সীমার বাইরে তাপমাত্রা হ্রাস করা হলে কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, অবশেষে লোপ পায়, কিন্তু কখনই নষ্ট হয় না, কেবল সুপ্ত থাকে। অনুকূল পরিবেশে আবার স্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। এনজাইমের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে নিম্ন তাপমাত্রায় এদের সংরক্ষিত করা হয়। কিন্তু সীমার বাইরে দ্রবণের অম্লতা হ্রাস বা বৃদ্ধি—দুই-ই এনজাইমের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

সঞ্চয়ন

ভারতে পারমাণবিক শক্তির বিকাশ

এম. এস. গুরুস্বামী এই সম্বন্ধে লিখেছেন—ভারতে স্বাধীনতার আগেই পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচীর আরম্ভ হয়। ১৯৪৫ সালেই স্থাপিত হয় টাটা ইনষ্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ। এই সংস্থাটিকেই ভারতে পারমাণবিক বিজ্ঞানের বিদ্যামন্দির বলে ধরা হয়। এই ইনষ্টিটিউটের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো, একদল সুপণ্ডিত পারমাণবিক পদার্থবিদ। এরাই এদেশে পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচীর কাজ আরম্ভ করেন। আমাদের এই কর্মসূচী কয়েক ধাপে উন্নতি করে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। টাটা ইনষ্টিটিউটে এই কর্মসূচীর পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন পরলোকগত ডাঃ ভাবা। ঐ ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতাকালে ডাঃ ভাবা একবার বলেছিলেন যে, ঐ সংস্থাটিকে একটি ভ্রূণ হিসাবে ধরা যায়। এই থেকেই গড়ে উঠবে পদার্থবিদ্যার এমন একটি গবেষণা কেন্দ্র, যেটি পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হয়ে থাকবে।

এখানে বরাবরই বিজ্ঞানীর উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। কেন না, বিজ্ঞানীকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে গবেষণার ব্যবস্থা। ডাঃ ভাবা বলেছিলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগানো যখন সম্ভব হয়েছে, তখন আর ভবিষ্যতে ভারতকে বিশেষজ্ঞের জন্যে বিদেশের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

আমাদের দেশে পারমাণবিক কর্মসূচীর কাজ নতুন ধাঁচে আরম্ভ হয়েছিল। পরীক্ষাগার নির্মাণ বা যন্ত্রপাতি সংগ্রহের আগেই আমরা বিজ্ঞানীর সন্ধানে ব্রতী হই। কাজেই আমাদের দেশে পরীক্ষাগার তৈরির আগেই গবেষণার কাজ সুরু হয়ে যায়।

১৯৪৮ সালে পারমাণবিক শক্তি কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল, পারমাণবিক খনিজ দ্রব্যের সন্ধান, শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ ও গবেষণা এবং পারমাণবিক গবেষণার জন্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কর্মীদের শিক্ষা। কমিশন একই সঙ্গে তিনটি কাজ আরম্ভ করেন। একটি পারমাণবিক খনিজ বিভাগ চালু করা হয়। তাঁদের কাজে টাটা ইনষ্টিটিউটসহ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সংস্থার সাহায্য নেওয়া হয়।

পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে গবেষণা ও ঐ শক্তির প্রয়োগের জন্যে ১৯৫৪ সালে ট্রম্বেতে স্থাপিত হয় পারমাণবিক শক্তি সংস্থা। বর্তমানে এটির নাম হলো ভাবা পারমাণবিক গবেষণা

কেন্দ্র। এখানে তিনটি রিয়্যাক্টর ও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট আছে।

১৯৫৬ সালে ভারতে তৈরি এক মেগাওয়াটের রিয়্যাক্টর অপ্সরা চালু হয়। পরে ১৯৬০ সালে ক্যানাডার সাহায্যে তৈরি ৪০ মেগাওয়াটের একটি রিয়্যাক্টর সাইরাস চালু হয়। এটিতে রেডিও আইসোটোপ তৈরি হয়। ১৯৬১ সালে চালু হয় রিয়্যাক্টর' জারলিনা। এই সঙ্গেই স্থাপিত হয় ইউরেনিয়াম ধাতু, জ্বালানী, ইলেকট্রনিক্স ও প্লুটোনিয়াম ইউনিটগুলি।

ভারতের এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হলো, শুধু শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক শক্তির সদ্ব্যবহার। এর সুফল জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে অনেক কিছু করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে আজ পরমাণু অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রেডিও আইসোটোপ ও বিদ্যুৎ-শক্তি হিসাবে পারমাণবিক শক্তিকে তারা চিনতে শিখেছে। কৃষি, শিল্প ও চিকিৎসার কাজে তার একাধিক ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চিকিৎসার কাজে তার একাধিক ব্যবহারে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হচ্ছে। আরও নানাভাবে ব্যবহারের জন্যে ট্রম্বেতে গবেষণার কাজ অক্লান্ত-ভাবে এগিয়ে চলেছে। শিল্পে রেডিওগ্রাফি ক্যামেরার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এর সাহায্যে বাঁধে ফাটল আছে কিনা, পোতাশ্রয়ের অবস্থা নির্ধারণ, ভূগর্ভে তার যোগাযোগ ঠিক আছে কি না এবং পাইপ লাইনে প্রবহমান বিভিন্ন তেলকে চেনা প্রভৃতি কাজ করা সম্ভব হয়েছে। কৃষিকার্যে, বিশেষ করে সার দেবার ব্যাপারে আইসোটোপের ব্যবহারে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। ভবিষ্যতে তা আরও কতভাবে যে মানুষের কাজে লাগবে, তা ধারণাই করা যায় না।

রাজস্থানের রাণা প্রতাপ সাগরে ৪০০ মেগা-ওয়াটের আর একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। তাছাড়া তারাপুরেও একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। ৩৮০ মেগাওয়াটের এই কেন্দ্রটি ১৯৬৮ সালের শেষা-শেষি চালু হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া মাদ্রাজে কালাপাক্কমে ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার আর একটি কেন্দ্রের কাজ সুরু হয়ে গেছে। তিনটি কেন্দ্রে হাজার মেগাওয়াটের বেশী শক্তি উৎপন্ন হবে এবং তা হবে চতুর্থ পরি-কল্পনার শেষ দিকে।

ভারতে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ অতি সামান্য। তা বাড়াতে হলে বিদ্যুৎ-শক্তির যাবতীয় সূত্রগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। দ্রুত শিল্পায়নের চাহিদা চিরাচরিত সূত্রগুলি পূরণ করতে পারছে না।

ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪ কোটি কিলোওয়াট বলে অনুমান করা হয় এবং তা সংলগ্ন অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। তাপীয় বিদ্যুৎ দূরে সরবরাহ করা ব্যয়বহুল। কাজেই এখন আকর্ষণীয় পারমাণবিক শক্তিকেই কাজে লাগাতে হবে। তা কি ব্যয়বহুল হবে না? এই প্রসঙ্গে ডাঃ ভাবার একটি কথা মনে পড়ে। তাঁর মতে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ যদি সম্ভব হয়, তাহলে ১৯৮৬ সালে ভারতের মোট ৭ কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হবে। কাজেই সেই সময়ের মধ্যে ভারতকে পারমাণবিক সূত্র থেকে দু' থেকে আড়াই কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করতেই হবে।

কিন্তু এত বেশী পরিমাণ পারমাণবিক বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন সময়সাপেক্ষ। তার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত জনবলও তৈরি করতে হবে।

অর্থনৈতিক বিচারে পারমাণবিক শক্তি উৎ-পাদনের একমাত্র অসুবিধা হলো—বর্তমানে মূলধনের খাতে ব্যয়াধিক্য। তবে তাপীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে অন্যান্য ব্যয় বেশী হলেও তা পুষিয়ে যায়। আমাদের দেশে থোরিয়াম প্রচুর আছে। কাজেই পারমাণবিক কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন

খুব ব্যয়সাধ্য হবে না। তবে পরে তা খুব স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন করা সম্ভব হবে। তবে পারমাণবিক যুগে পদার্পণের আগে উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে।

তারাপুর ও রাণা প্রতাপ সাগরের কেন্দ্র ছুটি স্থাপনে বৈদেশিক সহযোগিতা নেওয়া হলেও তৃতীয়টি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় প্রচেষ্টায় তৈরি হচ্ছে। এই তিনটি সম্পূর্ণ হলে ভারতের অর্থ-নৈতিক অগ্রগতিও যে অনেকটা ত্বরান্বিত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

নতুন ধরণের অস্ত্রোপচার

কোন কোন রকমের ক্ষত বা টিউমারের ক্ষেত্রে হাড়ে আঘাতপ্রাপ্ত কোন অংশ আংশিক বা পুরাপুরি কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, এমন হাত বা পায়ের সন্ধিস্থল অপসারণ করা দরকার হয়ে পড়ে। এই কারণেই সন্ধিস্থল বা হাড়ের অংশ গ্রাফটিং (জীবিত অংশের দ্বারা রুগ্ন অংশের স্থান পূরণ) সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে।

কারিগরী দিক থেকে এই কাজ করা খুবই সম্ভব; কিন্তু বাধা হলো টিস্যু বিপ্রতিপত্তি। যে কোন বহিরাগত অংশ সম্পর্কে মানবদেহ খুবই স্পর্শকাতর। গ্রাফটিং যত ভালভাবেই হোক না কেন, অল্পকালের মধ্যেই বহিরাগত হাড় বা টিস্যু অদৃশ্য হয়ে যায়।

দীর্ঘকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অধ্যাপক স্ভিয়াত ভলকোভের নেতৃত্বে ক্ষততত্ত্ব ও অস্থিবিদ্যা সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় ইনষ্টিটিউটের চিকিৎসকেরা হাইপোথার্মিয়ার (−১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) সাহায্যে গ্রাফটিং-এর টিস্যু সংরক্ষণের সর্বোৎকৃষ্ট পরিবেশ খুঁজে পেয়েছেন। ঠাণ্ডায় প্রায় জমে-যাওয়া হাড়কে এক স্থায়ী জীবন্ত অবস্থায় রাখা সম্ভব হয়েছে এবং কালক্রমে তা রোগীর নিজস্ব হাড়ের স্থান গ্রহণ করতে পারে। এই পদ্ধতি ক্লিনিক্যাল প্রাকটিসে প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশের বহু হাসপাতালে সন্ধিস্থলের হাড়ের প্রান্তভাগের গ্রাফটিং হচ্ছে এবং তার ফলও হচ্ছে চমৎকার।

প্লাষ্টিক সার্জারি সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাফটিং-এর মালমশলার নিয়মিত জোগান দেওয়া একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে।

এই চাহিদা মেটাবার জন্যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে টিস্যু ব্যাঙ্ক সার্ভিস স্থাপিত হয়েছে। টিস্যু ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে ক্ষততত্ত্ব ও অস্থিবিদ্যা সম্পর্কিত আঠারোটি ইনষ্টিটিউটের সবগুলিতেই। এর ফলে শুধুমাত্র ক্ষততত্ত্ব ও অস্থিবিদ্যা সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় ইনষ্টিটিউটই প্রায় জমে-যাওয়া টিস্যু ব্যবহার করে দুই হাজারের মত অস্ত্রোপচার সম্পাদন করেছে। দশ বছরে ইনষ্টিটিউটে টিস্যু সংরক্ষণ লেবরেটরী সাড়ে চার হাজার টিস্যু অ্যাম্পিউল তৈরি করে অন্যান্য শল্যচিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করেছে।

হাইপোথার্মিয়ার সাহায্যে মানুষের টিস্যু সংরক্ষণের ফলে গুরুতর অগ্নিদগ্ধ অর্থাৎ দেহের অর্ধেকেরও বেশী পুড়ে গেছে, এমন রোগীদেরও বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

−১২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জমানো গ্রাফটিং-এর মালমশলা ব্যবহার করে অধ্যাপক ভাসিলি গ্রভানোফ (মস্কো) সাফল্যের সঙ্গে অনেকগুলি নার্ভ-ট্রাঙ্ক সংযোজন করেছেন। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে বহু রোগীর ক্ষেত্রে আঘাতের দরুণ হৃত অনুভূতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

জীবিত প্রাণীর টিস্যু ব্যবহার করবারও চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। যেমন—মানুষের হৃৎপিণ্ড

সারাবার কাজে শূকর ও ভেড়ার হৃদ্‌পিণ্ডের ভাল্‌ব্‌ ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ ভাল্‌ব্‌ লাগিয়ে মানুষ তিন বছরেরও বেশী বেঁচে আছে। বানরের টিস্যু ব্যবহারেরও চেষ্টা চলছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যন্ত্রাংশ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। মানুষ রোগীদের জন্যে হৃদ্‌পিণ্ডে ভালভের কথা ধরা যাক—আমাদের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, তথাকথিত বল ভাল্‌ভ্‌। হৃদ্‌পিণ্ড ও বৃহৎ ধমনীর অসুখের চিকিৎসায় এগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্প্রতি একটি স্বয়ংক্রিয় ভাল্‌ভ্‌ আবিষ্কার করা হয়েছে। এই ধরণের ভাল্‌ভ্‌কে হৃদ্‌পিণ্ডের টিস্যুর সঙ্গে সেলাই করে দিতে হয় না। এই উদ্ভাবনের ফলে বহু লোকের জীবন রক্ষা পেয়েছে। তাছাড়া আছে মাত্র ১০০ গ্র্যাম ওজনের একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র। এটি হৃদ্‌পিণ্ডের তৎপরতাকে বৈদ্যুতিক উপায়ে উদ্দীপ্ত করে। তথাকথিত সেমি-বায়োলজিক্যাল ভাস্কুলার প্রস্থেসিস এখন ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে রক্ত জমে যাওয়া নিবারিত হয়।

হৃদ্‌পিণ্ড ফুস্‌ফুস যন্ত্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। দুই থেকে চার ঘন্টার জন্যে এই যন্ত্র হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের কাজ করতে পারে এবং এই সময়ের মধ্যে সার্জন হৃদ্‌পিণ্ড বা বৃহৎ ধমনীর অস্ত্রোপচার করবার সময় পান। কৃত্রিম মিনি হার্ট যন্ত্রটিকে একটি ছোট সুটকেশে রাখা যায়। গাড়ীর ব্যাটারী থেকেও এতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। বিদ্যুৎ না পাওয়া গেলে একটি হ্যাণ্ডেল দিয়ে এটি চালানো যায়। বাড়ীতে, এম্বুলেন্সে, বিমানে বা সুদূর এলাকায় অভিযান চালাবার সময় এই যন্ত্রটি খুবই কাজে আসে।

কৃত্রিম বৃক্ক যন্ত্রও স্বীকৃতি পেয়েছে। মানুষের বৃক্ক সাময়িকভাবে কর্মশক্তি হারিয়ে ফেললে এই যন্ত্র বৃক্কের কাজ করে। নতুন ঝিল্লী ব্যবহার করে এই যন্ত্রটির উন্নতিসাধন করা হয়েছে। এই ঝিল্লীগুলি সুস্থ বৃক্ক অপেক্ষা দ্বিগুণ দক্ষতা সহকারে রক্ত পরিষ্কার করে দেয়। বর্তমানে এগুলি চিকিৎসা-ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

আর একটি যন্ত্রাংশ বায়োইলেকট্রিক্যাল বাহু। সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত এই বাহুর সাহায্যে পঙ্গুব্যক্তি বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি, গাড়ী বা মোটর সাইকেল চালাতে ও লিখতে সক্ষম হচ্ছেন। এটি বর্তমানে বহু সোভিয়েট শিল্পসংস্থায় তৈরি হচ্ছে ও বিদেশের কিছু ফার্মকে এর লাইসেন্স বিক্রয় করা হয়েছে।

মস্তিষ্কের গুরুতর রক্তক্ষরণে আক্রান্ত জনৈক রোগীকে কিয়েভ নিউরোসার্জারি গবেষণা ইনষ্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়। হৃদ্‌পিণ্ড, ফুস্‌ফুস, বৃক্ক ইত্যাদির ক্রিয়া রোগীর স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল। দশ-পনেরো বছর আগে হলে এই রোগীর জীবনের আশা থাকতো না। কিন্তু বর্তমানে আলেকজাণ্ডার আরুতিউনোফ ও আন্দ্রেই রমদানোফের নেতৃত্বে কিয়েভের একদল নিউরোসার্জন অস্ত্রোপচারের সাহায্যে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের চিকিৎসার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন।

অবশ্য একথা বলা যায় না যে, একটি অস্ত্রোপচারেই অতি দ্রুত খুব সুফল পাওয়া যায়। প্রায়শঃই, বিশেষ করে রক্তক্ষরণের অব্যবহিত পরেই রোগী হাসপাতালে ভর্তি না হলে দুই পর্যায়ে অস্ত্রোপচার করা হয়। যেহেতু মস্তিষ্কের টিস্যুর মধ্যে চুঁইয়ে পড়া রক্ত তৎক্ষণাৎ চাপ বেঁধে যায় না, সে জন্যেই প্রথমে রক্তরস (সিরাম) বের করে ফেলা হয়। তারপর কয়েক ঘন্টা, কোন কোন ক্ষেত্রে একদিন বাদে রক্তের ডেলা বের করে ফেলা হয়। রোগের প্রথম অবস্থায়

অস্ত্রোপচার হলে ফল ভাল হয়। আরোগ্য লাভের সংখ্যা তিন গুণ বেড়ে গেছে।

করোটির অভ্যন্তরভাগের রক্তনালীর অস্ত্রোপচার আজও হয় নি। এরূপ অস্ত্রোপচার হলে মস্তিষ্কের ধমনীতে বহু প্যাথোলজিক্যাল পরিবর্তন নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হবে। হয়তো কোন প্রেসার চেম্বারে এরূপ অস্ত্রোপচার হবে। অতিরিক্ত চাপ জীবদেহে টিস্যুগুলিতে অক্সিজেনের ভাগ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। অস্ত্রোপচারের এই শাখায় গবেষণা ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে।

এতকাল অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের এলাকা ছিল, এরূপ ক্ষেত্রে সার্জনেরা সম্প্রতি হানা দিয়েছেন। সাধারণতঃ করোনারী নালীর চিকিৎসা করেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু এখন অস্ত্রোপচারের সাহায্যেও এরূপ চিকিৎসা হচ্ছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক পদ্ধতি প্রযুক্ত হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত অবশ্য এসব অস্ত্রোপচার পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে, তবে অনতিবিলম্বেই নিয়মিত চিকিৎসার পর্যায়ে আসবে বলে আশা করা যায়।

বিজ্ঞানে অবিজ্ঞানীর দান

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

যাঁদের দানে বিজ্ঞান পুষ্ট, তাঁরাই তো বিজ্ঞানী। তবে তাঁদের আবার অবিজ্ঞানী বলা কেন? এটা স্বাধীন ভারতের দৃষ্টি। এখানে এম. এস-সি ডিগ্রী না থাকলে ঐ আঙ্গিনায় ঢোকাই নিষেধ। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী জে. বি. এস. হলডেনের (এফ. আর. এস) নাম ভারতের বিজ্ঞানীর রেজিষ্টারে ছিল না, কারণ তাঁর ডিগ্রী ছিল হিউম্যানিটিজ গ্রুপে। অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই, এমন নয়। পত্রিকার খবরে প্রকাশ—ভারতের সরকারী গবেষণাগারে শ'-দুয়েক কর্ণধারস্থানীয় কর্মী আছেন, যাঁদের বিজ্ঞানের কোন ডিগ্রী নেই। মন্ত্রীদের আশীর্বাদ পেলে বিজ্ঞানের ডিগ্রীর দরকার কি? আমাদের আলোচনার বিষয় এ নয়। যাঁরা জীবিকায় বিজ্ঞানী নন কিংবা বিজ্ঞানের কোন ডিগ্রী নেই অথচ সারা জীবন বিজ্ঞান-চর্চা করেছেন, বিজ্ঞানের প্রেমে পড়ে আছেন, তাঁদের কথাই এখানে আলোচ্য। এই আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা দরকার, এর ক্ষেত্রের বিস্তৃতি কতটা। একখানি নয়নাভিরাম অট্টালিকা তৈরি করতে গেলে প্রথমেই সৃষ্টি হয় ব্লু-প্রিন্টের, করেন প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনীয়ার। তারপর ওভারসিয়ার, কনট্রাক্টর, রাজমিস্ত্রী, যোগানদার প্রভৃতির দরকার হয়। এদের সকলের মিলিত চেষ্টায় গড়ে ওঠে ইমারতটি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীর সংখ্যা বেশী নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তাত্ত্বিক ও গাণিতিক ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিতের সংখ্যা খুবই কম। তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের ফর্মূলা তৈরি করেছিলেন ম্যাক্সওয়েল, কিন্তু পরীক্ষাগারে তরঙ্গ উৎপাদন করেছিলেন হার্টজ এবং প্রয়োগ করেছিলেন ব্যবহারিক যন্ত্র নির্মাণে মার্কোনী। এঁদের কে বড়, কে ছোট? ইলেকট্রিক বাল্‌বে এডিসনের পর্যবেক্ষণ, ফ্লেমিং-

এর ডালব্ এবং লি ডি ফরেষ্টের ভালব্ না হলে রেডিওর জন্যে আরো অনেক দিন বসে থাকতে হতো। তিলোত্তমার মত সকলের তিলতিল দানে বিজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ডাঃ এম. সাহার ভাষায়—দুই চোখবিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা থাকবেন এই পিরামিডের চূড়ার উপর, বহুর দান থাকবে তলায়। বিজ্ঞান মানুষের প্রয়োজন মেটায় বলেই বিজ্ঞানের উপর মানুষের এত শ্রদ্ধা। আইনষ্টাইন, প্লাঙ্ক, ডিরাক, হাইজেনবার্গ, ল্যাণ্ডাউ, নীল্‌স্ বোর প্রভৃতি নামগুলি সাধারণের কাছে সুপরিচিত। পরম শ্রদ্ধার পাত্র এঁরা। কিন্তু কেন, তাঁরা তা জানেন না। জেমস্ ওয়াট, ফুলটন, ষ্টিভেনসন, রাইট ভ্রাতৃদ্বয়, হারগ্রিভ্‌স্, অর্করাইট, ক্রম্পটন তাঁদের অতি আপনার জন, নিত্যকার বন্ধু। অফিসের সময় হলেই ফোর্ডের নাম মনে পড়ে। বিজ্ঞানের ডিগ্রীহীন বিজ্ঞান-প্রেমিক এই সকল মনীষীদের দানেই বর্তমানে মানুষের সুখ-সুবিধা গড়ে উঠেছে। গাছের শিকড় মাটির নীচে থেকে গাছকে শক্ত করে ধরে রাখে এবং অলক্ষ্যে গাছের রস যোগায়। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা গাছের শিকড়ের মতই দৃষ্টির অন্তরালে থেকে বিজ্ঞানে প্রাণরস সঞ্চার করেন। নিশ্চয়ই তাঁরা শ্রেষ্ঠ এবং বরেণ্য। কিন্তু নাম না জানা যে ফরাসী দস্যু তাড়াতাড়ি পালাবার জন্যে বাই-সাইকেল উদ্ভাবন করেছিলেন, সেই বাইসাইকলই আজ অধিকাংশের নিত্য প্রয়োজনীয় বাহনরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। রেলের ইঞ্জিন ড্রাইভার, যিনি প্রথম লক্ষ্য করেন তাঁর গাড়ীর ইলেট্রিক বাতিগুলি ছায়ায় নিবে যাচ্ছে, রোদ পেলেই আবার জ্বলছে, তাঁর নাম আমরা জানি না। তাঁর বিবৃত কাহিনী পত্রিকায় পড়ে বিজ্ঞানীরা ছুটলেন—ঐ ইঞ্জিনের তার কি ধাতুতে তৈরি, তা পরীক্ষা করবার জন্যে। দেখলেন ওর তার ছিল সেলিনিয়ামের। সেলিনিয়ামের উপর আলো পড়লে তার বিদ্যুৎ-পরিবহন শক্তি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আলোর অভাবে কমে যায়। পরিণামে আবিষ্কৃত হলো ফটোইলেকট্রিক সেল। ফটোইলেকট্রিক সেল না হলে টকি সিনেমা সম্ভব হতো না। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানেও তাঁদের দান আছে, যাঁরা বিজ্ঞানকে নিয়েছিলেন 'হবি' হিসাবে। তাপ-বিজ্ঞানের কয়েকটি সূত্র এরূপভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছে। আমরা জানি, ৪.২ (মোটামুটি) জুল শক্তি ব্যয় করে এক ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন করা যায়। যান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে তাপ-শক্তির এই সম্পর্কে আবিষ্কার করেন জুল। তাঁর ছিল চোলাইয়ের ব্যবসায়। শৈশবে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। তিনি ঘরেই পড়াশুনা করতেন। তাঁর টিউটর ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডেলটন।

বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেই জানেন, বরফে তাপ দেওয়া মাত্রই বরফ গলে জল হয়ে যায় না। এবং জলের তাপ ১০০° সে. হলেই সবটা বাষ্পীভূত হয়ে যায় না, আরো বেশ কিছুটা তাপ দিতে হয়। যাতে তাপ দেওয়া হলো তার উষ্ণতা বাড়লো না, শুধু অবস্থার পরিবর্তন হলো—কঠিন তরল হলো, তরল বায়বীয় আকার ধারণ করলো। এই অতিরিক্ত তাপকে বলে লীন তাপ (ল্যাটেন্ট হিট)। এর আবিষ্কারক আইরিশ বিজ্ঞানী যোশেফ ব্ল্যাক ছিলেন চিকিৎসক। মানুষের শরীরের উপর চুন ও ক্ষারের (কষ্টিক পটাশের) ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা-পত্র পেশ করে তিনি ডক্টর অব মেডিসিন উপাধি লাভ করেন। সূর্যের আলো যে একটি মৌলিক রং নয়, তা আবিষ্কার করেন স্যার আইজাক নিউটন। একটা ত্রিশির কাচের মধ্য দিয়ে আলো পরিচালনা করলে সেটা সাতটি রঙে ভেঙে যায়, যার এক প্রান্তে লাল এবং অপর প্রান্তে বেগুনী রং। এই আলো উত্তপ্ত গ্যাসের মধ্য দিয়ে গেলে তা যে শোষিত হয়, তা ধরা পড়ে জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রনহফারের

(১৭৮৭-১৮২৬) চোখে। তিনি ছিলেন কাচের ব্যবসায়ী। চশমার লেন্স প্রভৃতি তৈরি হতো সেখানে। শৈশবেই তিনি পিতার এই ব্যবসায়ে যোগদান করেন। অথচ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞানের চর্চা করে গেছেন। আলো শোষিত হলে বর্ণালীর বিশেষ বিশেষ স্থানে কালো রেখা দেখা যায়। আবিষ্কর্তার নাম অনুসারে এগুলির নাম হয়েছে ফ্রনহফারস্ লাইন। এই কালো রেখার আলোতে অ্যাষ্ট্রোফিজিক্স আলোকিত। বর্ণালীর যেসব স্থানে কালো রেখার অস্তিত্ব দেখা যায়, সে সব স্থানে আলো শোষিত না হলে কি কি রং পাওয়া যেত এবং সেগুলি কোন্ কোন্ মৌলজাত, তা বিজ্ঞানীদের জানা আছে। অতএব সূর্য ও নক্ষত্রাদির উপাদান এবং ঐ উপাদানের অবস্থার সন্ধান দেয় এই লাইনগুলি। ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলে যদি একটা ট্রেন হুইসল দিতে দিতে প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটে আসে তাহলে শব্দটা ক্রমেই তীব্র ও সরু হয় এবং প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাবার সময় শব্দটা ক্রমেই নীচু খাদে নেমে আসে। কেন এমন হয়? একই ছন্দে বাঁশী বাজছে, গতিও তার এক, গাড়ীর গতির জন্যে কর্ণপটহে শব্দ-তরঙ্গগুলি প্রথমে তাড়াতাড়ি ও পরে ধীরে ধীরে আঘাত করে। দুটি তরঙ্গের আঘাতের মধ্যে সময় যত কম হয়, শব্দ ততই তীক্ষ্ণ হয়; আবার সময় যত বাড়ে, শব্দ ততই মোটা হয়। বিজ্ঞানী ডপ্‌লার একে সূত্রবদ্ধ করেন এবং এর নাম হয় ডপ্‌লারস্ এফেক্ট। আলোও তো একটা তরঙ্গ। যে বস্তু থেকে এই তরঙ্গ আসছে, সেই বস্তুটি যদি গতিশীল হয় এবং তার দূরত্ব যদি পৃথিবী থেকে বেড়ে যায়, তাহলে শব্দের মত কিছু একটা হওয়া দরকার। এখানে চ্যাঁধচেবে বা মোটা না হয়ে রং বদ্‌লাবে, অর্থাৎ কালো রেখা লালের দিকে যাবে। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে কিন্তু এটাই ধরা পড়লো। বিজ্ঞানীরা বের করলেন নক্ষত্র ও নীহারিকার আপেক্ষিক গতি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে সাবানের বুদ্বুদের মত কেবলই ফুলে উঠেছে, সেই 'এক্সপ্যাণ্ডিং ইউনিভার্স'-এর ধারণার সৃষ্টি এই পর্যবেক্ষণ থেকেই। একজন সাধারণ বিজ্ঞান-প্রেমিকের আবিষ্কৃত তথ্য কত প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীকেও সাহায্য করে আসছে! নিয়ন লাইট না হলে এখন আর ঘরের শোভা বাড়ে না। বড় বড় পথেও এখন নিয়ন লাইটের রোশনাই। এর সূত্র প্রথম যাঁর কাছ থেকে এসেছিল, সেই গেসলার (Geissler) ছিলেন একজন গ্লাস-ব্লোয়ার। নানা রকম কাচের নলে অতি নিম্নচাপে বিভিন্ন গ্যাস ভর্তি করে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করে দেখতে পান যে, গ্যাস উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বিভিন্ন গ্যাসে হয় বিভিন্ন রং। আমাদের দেশেও প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে বিজ্ঞান-গবেষণাগারে গ্লাস-ব্লোয়ার আছেন, কিন্তু বিজ্ঞান-জগতে তাঁরা শূদ্ররূপেই বিদায় নেন, কোন দিনই বিজ্ঞানে ব্রাহ্মণ হন না। এই জন্যে তাঁদের উচ্চাকাঙ্খা ও কৌতূহলের অভাব যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী কর্তৃপক্ষের উপেক্ষা।

আভিজাত্যের একটি অঙ্গ টেলিফোন। এর আবিষ্কর্তা স্কচ বিজ্ঞানী গ্র্যাহাম বেল। প্রথমে তিনি ক্যানাডার একটা বোবা-কালার স্কুলে শিক্ষক ছিলেন, পরে বোস্টনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বধিরের কাছে কণ্ঠস্বর কেমন করে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং তাতে কি ভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায়—এই ছিল তাঁর চিন্তার বিষয়। ১৮৭১ সালে মানুষের কণ্ঠস্বর একস্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দেবার পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন। জন্ম নিল টেলিফোন। এই আবিষ্কারের জন্যে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এম. ডি. উপাধিতে ভূষিত করেন।

বর্তমানে ভদ্রলোকের ব্যাধি রক্তচাপ।

ডাক্তারের কাছে মাথাধরা বা মাথাঘোরার কথা বললেই তাঁরা আগে রক্তের চাপ কত দেখে নেন। ধমনীতে রক্ত যে চাপ দেয় এবং সেই চাপের পরিমাণ কত, তা নির্ণয় করবার উপায়ের সূত্র যাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়, তিনি ছিলেন একটি গ্রাম্য গীর্জার পাদরী। ইংল্যাণ্ডের টেডিংটন গির্জার পুরোহিত ফাদার ষ্টিফেন হেইল্‌স্ (১৭০৯-১৭৬১) ছিলেন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। তাঁর খেয়ালের অন্ত ছিল না। পুরোহিতের নির্দিষ্ট কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি এসব করতেন। জনসাধারণের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন ছিট্‌গ্রস্ত পুরোহিতরূপে। একবার তিনি একটি ঘোড়ার ধমনীতে ছিদ্র করে তার মধ্যে একটা নল ঢুকিয়ে দেখেন, রক্ত কতদূর ওঠে। আর একবার ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতে একটি ঘোটকীকে বেঁধে চীৎ করে ফেলে তার ধমনীর মধ্যে ⅙ ইঞ্চি ব্যাসের একটা নল ঢুকিয়ে তার সঙ্গে অনুরূপ মাপের একটা কাচের নল যুক্ত করে দেন। ঐ কাচের নলে রক্ত আট ফুট তিন ইঞ্চি পর্যন্ত ওঠে। হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ের (Left ventricle) তল থেকে তিনি এই উচ্চতা মাপেন। এর প্রায় এক-শ' বছর পরে (১৮৫৬) মানুষের রক্তের চাপ মাপা হয়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করলে এমনি আরও অনেক নাম পাওয়া যাবে। এঁরা কেউই স্যর টমসন বা রাদারফোর্ডের ন্যায় বিজ্ঞানী ছিলেন না। এমন কি, অনেকেই প্রথম শ্রেণী তো দূরের কথা, দ্বিতীয় শ্রেণীতেও পড়বেন না। তবু এঁদের দান মনুষ্য-সমাজকে কম সাহায্য করে নি। বর্তমানে আমাদের দেশে বাজারে যে চিড়া পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই তৈরি হয় কলে। এই কল প্রথম তৈরি করেন যশোহরের ঈশ্বর ঘটক মহাশয়। কত রকম কুকার এখন বাজারে পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলা দেশে কুকার (ইক্‌মিক্ কুকার) প্রথম তৈরি করেন বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক। স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞান এঁদের কতটুকু স্বীকৃতি দিয়েছে? এরূপ আবিষ্কারক দেশে এখনও বহু আছেন, কিন্তু তাঁদের আবিষ্কারের খবর রাখে কে? তাঁদের সাহায্য করে কে? বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা সরকারী গবেষণাগারে গবেষণা করবার ভাগ্য ও সুযোগ বেশী লোকের হয় না। তাঁরা নিঃসন্দেহে 'ক্রিম অব দি সোসাইটি', অপরেরা তো সমাজের 'ঘোল'ও হতে পারেন। ঘোলটা কি খুবই উপেক্ষার বস্তু?

কেসান ফাউণ্ডেশন

রণধীর দেবনাথ

ফাউণ্ডেশন বলতে আমরা বুঝি, কোন কাঠামোর ভিত্তি; অর্থাৎ কোন কাঠামো যার উপর অবস্থান করে। কোন কাঠামোর ভিত্তি সুদৃঢ় না হলে তার স্থিতিকাল বেশী হয় না; অর্থাৎ অল্পকালের মধ্যেই তা ধ্বংস হয়ে যায়। এই ফাউণ্ডেশন বা ভিত্তি নানা রকমের হয়ে থাকে, যেমন—পাইল ফাউণ্ডেশন, সিলিণ্ডার ফাউণ্ডেশন, কেসান ফাউণ্ডেশন, পিয়ার ফাউণ্ডেশন ইত্যাদি। অন্যান্য ফাউণ্ডেশনের কথা বাদ দিয়ে এখানে আমরা কেসান ফাউণ্ডেশন নিয়ে আলোচনা করবো।

জলের নীচে যখন ভিত্তি তৈরি করা হয়, যেমন—সেতু তৈরি করবার বেলায়, তখন এই কেসান ফাউণ্ডেশন ব্যবহার করা হয়। একথা আমরা সবাই বুঝতে পারি যে, জলের উপরে ভিত্তি নির্মাণ করা যতটা সহজ, জলের নীচে ততটা সহজ নয়। সত্য কথা বলতে কি, জলের নীচে যত গভীরে যাওয়া যায়, সমস্যা ততই বাড়তে থাকে, কাজ শ্লথ হয় এবং কাজের বিপদ ও খরচ বেশী হতে থাকে। নদীর তলদেশে যাতে নিরাপদে কাজ করা সম্ভব হয়, সে জন্যে বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে ওয়েল ফাউণ্ডেশন (Well foundation) অথবা কেসান ফাউণ্ডেশন ব্যবহার করা হয়।

ওয়েল ফাউণ্ডেশন দেখতে অনেকটা কুয়ার মত। সাধারণ কংক্রিট অথবা রি-এনফোর্স´ড্ কংক্রিটের ফাঁপা সিলিণ্ডার নদীর জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং সিলিণ্ডারের নিম্নভাগ নদীর তলদেশে পৌঁছুলে এর ভিতরের জল পাম্পের সাহায্যে বের করে নেওয়া হয়। তারপর সিলিণ্ডারটিকে কংক্রিট দিয়ে ভর্তি করে তার উপর থেকে সেতুর থামগুলি তৈরি করা হয়। কিন্তু যেখানে নদীর গভীরতা ৬০ ফুটের বেশী, সেখানে চাপ এত বেশী হয় যে, রি-এনফোর্স´ড্ কংক্রিটও তা সহ্য করতে পারে না। তখনই কেসান ফাউণ্ডেশন ব্যবহার করতে হয়। এই কেসানের উচ্চতা ১৫০ ফুট পর্যন্ত করা যেতে পারে, অর্থাৎ নদীর গভীরতা যেখানে ১৫০ ফুট, সেখানেও এই কেসান ফাউণ্ডেশন ব্যবহার করা যায়।

কেসানগুলি কংক্রিট অথবা ইস্পাতের তৈরি জল-নিরোধক বিরাট বাক্স অথবা সিলিণ্ডারের মত—আকারে প্রায় দশ-বারো তলা বাড়ীর সমান। কেসানগুলি সাধারণতঃ তিন রকমের হয়ে থাকে, যেমন—(১) বাক্স বা ভাসমান কেসান (Box or Floating caisson); (২) দু-মুখ খোলা কেসান (Open caisson) এবং (৩) বায়ু-চালিত কেসান বা নিউমেটিক কেসান (Pneumatic caission)।

১। বাক্স বা ভাসমান কেসান:—নাম শুনেই হয়তো অনেকটা ধারণা করা যায় যে, এই কেসান দেখতে বাক্সের মত; কিন্তু বাক্স কেসানের উপরের দিক খোলা থাকে। এগুলি নদীর ধারে তৈরি করে নির্বাচিত স্থানে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর বাক্সটিকে সিমেন্ট কংক্রিট অথবা পাথর দিয়ে ভর্তি করে নদীর জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। যেখানে নদীর গভীরতা কম এবং যেখানে কোন খনন-কার্যের দরকার হয় না, এগুলি সাধারণতঃ সে সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়।

২। দু-মুখ খোলা কেসান:—এগুলি দেখতে

অনেকটা বাক্স কেসানেরই মত, তবে ছুটি মুখই খোলা থাকে। উপযুক্ত স্থানে এগুলিকে নিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে তার উপর ভারী জিনিষ চাপিয়ে নদীর জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং নদীর তলদেশে পৌঁছুলে ড্রেজারের সাহায্যে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কঠিন পাথরের নাগাল পাওয়া যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং যার প্রচলন বর্তমানে সবচেয়ে বেশী, সেটি হলো বায়ুচালিত কেসান। এই বায়ুচালিত কেসান সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় ইউরোপে এবং মিসিসিপি নদীর সেতু তৈরির কাজে এই কেসান সর্বপ্রথম সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। লোকজন নদীর তলদেশে নেমে
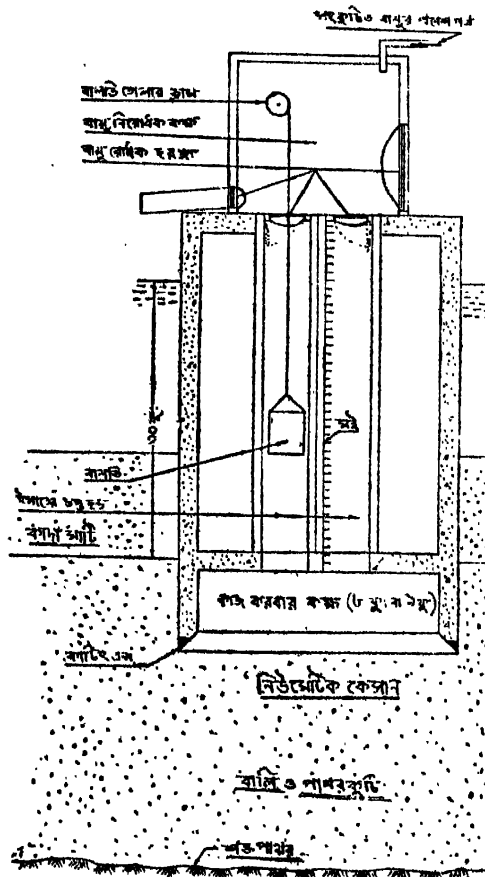
১নং চিত্র

গেলে পাত্রটির কিছু অংশ কংক্রিটে ভর্তি করে ফেলা হয়। ঐ কংক্রিট শক্ত হয়ে গেলে পাম্পের সাহায্যে জল বের করে সমস্ত পাত্রটিকে কংক্রিট দিয়ে ভর্তি করে ফেলা হয়।

৩। বায়ুচালিত কেসান বা নিউম্যাটিক কেসান:—বিভিন্ন প্রকারের কেসানের মধ্যে যাতে ভিত্তি তৈরি করতে পারে, তার জন্যে বায়ুচাপসমন্বিত একটি পাত্র ব্যবহার করা হয়। এই পাত্রটিও দেখতে বিরাট বাক্সের মত। বায়ু-চাপসমন্বিত এই বিরাট পাত্রটিকেই বলা হয় বায়ুচালিত কেসান বা নিউম্যাটিক কেসান। এই পাত্রটির নিম্নভাগ থাকে খোলা আর উপরি-

ভাগ থাকে বন্ধ। এর ভিতরে এমন একটি কক্ষ আছে, যেখান থেকে বাতাস বেরিয়ে যেতে পারে না। পাত্রটিকে নদীর তলদেশে স্থাপন করা হলে এতে জল ঢুকতে পারে না, ফলে একটি ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়। এই ফাঁকা জায়গা থেকেই শ্রমিকেরা নদীর তলদেশের কাঁদা, পাথর ইত্যাদি খুঁড়ে বের করতে থাকে। এই কেসানকে নদীর তলদেশে স্থাপন করাও বেশ কষ্টকর। প্রথমে কাজ করবার কক্ষ (Working chamber) এবং ক্রিব-এর (Crib) কিছু অংশ নদীর তীরে তৈরি করে জলে ভাসিয়ে নিয়ে নির্বাচিত স্থানে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। কেসানের নীচের দিকে বের হয়ে থাকে ইস্পাত অথবা লোহার অংশ, যাতে এর অগ্রভাগ মাটি কেটে ভিতরে ঢুকতে পারে। এই লোহার অংশটিকে বলা হয় মাটি বা পাথর কাটবার কাটিং এজ্ (Cutting edge)। এই কাটিং এজ্ নদীর তলদেশে না পৌঁছা পর্যন্ত একের পর এক ক্রিব পরস্পর সংযুক্ত করে এভাবে জলে ডুবানো হয়ে থাকে। একটি ক্রিব জলে ডুবিয়ে দেবার পর নীচের বায়ুরোধক দরজা (১নং চিত্রে একটি নিউম্যাটিক কেসান দেখানো হলো) বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বায়ুনিরোধক কক্ষটিকে নতুন ক্রিবের উপরে স্থাপন করা হয়। এভাবে ক্রিবগুলিকে জলে ডুবানো হয়ে থাকে। কাজ করবার কক্ষের বায়ুর চাপ কেসানের তলদেশের জলের চাপ অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী রাখতেই হবে। কারণ জলের চাপ যদি বায়ুর চাপ অপেক্ষা বেশী হয়, তাহলে কক্ষের মধ্যে জল ঢুকে কর্মরত শ্রমিকদের প্রাণহানি হবে। মাটি, পাথর প্রভৃতি তুলে ফেলবার ফলে সমগ্র কেসানটি আস্তে আস্তে নদীর তলদেশের মাটিতে বসে যেতে থাকে। এভাবে খুঁড়তে খুঁড়তে কঠিন পাথরের নাগাল পাওয়া গেলে সমগ্র পাত্রটি কংক্রিটে ভর্তি করে ফেলা হয়। কংক্রিট হলো সিমেন্ট, বালি, পাথরকুচি এবং জলের সংমিশ্রণে তৈরি গৃহনির্মাণের একটি উপকরণ। শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেলে কংক্রিট পাথরের মতই মজবুত হয়। উক্ত কেসানটি শক্ত ভিত্তি হিসাবে জলের মধ্যেই থাকে। সেখান থেকে থামগুলি তৈরি করা হয়। এগুলি থাকে জলের উপরিভাগে।

কেসান ফাউণ্ডেশনের কাজ করবার কক্ষে শ্রমিকদের নানা রকম অসুবিধায় পড়তে হয়। কোন সময় হয়তো প্রচণ্ড ঝড় এসে সব যন্ত্রপাতি নষ্ট করে দেয় এবং তলায় যে সব শ্রমিক কাজ করে তাদের প্রাণহানি ঘটে। কিন্তু কেসানের তলদেশে মাটির মধ্যে কর্মরত শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে যেটি সবচেয়ে মারাত্মক, বেণ্ডস নামে সেই অসুখের কথা প্রথম অবস্থায় কারুরই জানা ছিল না। জলের তলায় একটানা অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলে এই অসুখ হয়। এই অসুখের ফলে শ্রমিকদের হাত-পা অকেজো হয়ে যায় এবং অনেক সময় মারাও যায়। এই রোগ প্রতিরোধের জন্যে ডাক্তারেরা প্রায়ই কর্মরত শ্রমিকদের পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং তাদের কাজের সময়ও কমিয়ে দেওয়া হলো। তৎসত্ত্বেও দেখা গেল, কাজের পর কেসান থেকে বেরিয়ে আসবার সময় দু-একজন শ্রমিক হঠাৎ মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। অথচ পাঁচ মিনিট আগেও মনে হয়েছে যে, তারা সম্পূর্ণ সুস্থ। কত বছর কেটে গেল, কত লোকের প্রাণহানি হলো—তারপর মানুষ শিখলো বেণ্ডস রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা। এখন অবশ্য জানা গেছে যে, বায়ুর চাপ যে জায়গায় প্রতি বর্গইঞ্চিতে চল্লিশ পাউণ্ড, সেখানে যদি কোন লোক চার ঘণ্টা একটানা কাজ করে, তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার আগে এমন আরেকটি বিশেষ ধরণের ঘরে তাকে দু-ঘণ্টা থাকতে হবে, যেখানে বায়ুর চাপ কমিয়ে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক করা যায়।

বিজ্ঞান-সংবাদ

পেট্রোলিয়াম থেকে খাদ্যোপযোগী প্রোটিন

পেট্রোলিয়াম হাইড্রোকার্বন থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন উৎপাদন ভারতবর্ষে সুরু হয়েছে। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব পেট্রোলিয়াম (দেরাছুন) এবং রিজিওন্যাল রিসার্চ লেবরেটরীতে (জোরহাট) প্রতিদিন ৫০ কেজি উৎপাদনক্ষম ছুটি পাইলট প্লান্টের কাজ সুরু হয়েছে। এর খাদ্য ও পুষ্টিমূল্য পরীক্ষাধীন এবং আশা করা যাচ্ছে—আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বাণিজ্যিক পরিমাণে প্রোটিন উৎপাদন করা যাবে। সম্প্রতি জোরহাটে রিজিওন্যাল রিসার্চ লেবরেটরীতে অনুষ্ঠিত পেট্রোলিয়াম থেকে প্রোটিন তৈরির কনসালটেটিভ কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন আসামের মুখ্য মন্ত্রী বি. পি. চালিহা-তিনি রিজিওন্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। এই অধিবেশনে গবেষণাগারের বিজ্ঞানী, বিধান সভার সদস্য এবং অন্যান্য কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞান ও শিল্পগবেষণা পর্ষৎ ফ্রান্সের Institute Francais du Petrole-এর সঙ্গে একটি চুক্তি করেছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী জোরহাটের রিজিওন্যাল রিসার্চ লেবরেটরি এবং দেরাছুনের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব পেট্রোলিয়ামে প্রোটিনের উৎপাদন সম্পর্কে গবেষণা চলছে।

জোরহাটের রিজিওন্যাল রিসার্চ লেবরেটরীর অধ্যক্ষ ডাঃ এম. এস. আয়েঙ্গার মুখ্য মন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই লেবরেটরীর উদ্যোগে তৈলকূপের মাটির নমুনা থেকে বিভিন্ন কৌতূহল-জনক স্ট্রেন (Strains) পৃথক করা সম্ভব, যা তেলের মোমের মতন উপাদানকে খাদ্যোপযোগী প্রোটিনে পরিবর্তিত করবে। তিনি আরও বলেন—তেলের সন্ধিতকরণের (Fermentation) ফলে উৎপন্ন বস্তুতে শতকরা ১০ ভাগ প্রোটিন ছিল।

নতুন ধরনের করাত

বৃটেনে একটি নতুন ধরণের চক্রাকৃতির করাত উদ্ভাবিত হয়েছে, যার ফলে কাঠের গুঁড়ার পরিবর্তে কাঠের কুচি বেরুবে এবং কাঠের অপব্যয় বন্ধ হবে।

লণ্ডনের কাছে প্রিন্সেস্ রিসবরোতে ফরেষ্ট প্রোডাক্টস্ রিসার্চ লেবরেটরী রয়েছে। সেখানকার গবেষণার ফলে এটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই মাসের শেষ দিকে এই নতুন করাতের প্রথম নমুনাটি সাধারণকে দেখানো হবে।

নতুন যন্ত্রটি কাঠের গুঁড়ার বদলে কাঠের কুচি বের করে, কিন্তু এতে তক্তার সংখ্যা কম হবে না।

ঐ লেবরেটরী আর একটি অপব্যয়ও বন্ধ করবার জন্যে সচেষ্ট। একটি 'ব্যাণ্ড-স' উদ্ভাবিত হয়েছে, যা চালাতে দু-জন লোকের জায়গায় একজন লোক হলেই চলবে।

চিঠিপত্র

পাঠকের নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র পত্তন থেকে আমি এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। পত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষজ্ঞদের লেখা প্রবন্ধাদি থেকে জ্ঞানলাভ করেছি, নবীন লেখকদের লেখা পড়ে পেয়েছি কত নতুন খবর ও আনন্দ। কিন্তু কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি, এই পত্রিকায় প্রকাশিত সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের যে সব বিবরণ দেওয়া হচ্ছে তাতে কোথাও কোথাও সংশয় ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাচ্ছে। প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তথ্য, সংবাদাদি ও তাদের ব্যাখ্যা সাধারণ পাঠকের গোচর করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসরে নেমেছে অগ্রণী হয়ে এই পত্রিকা ও তাতে এক গৌরবের স্থান করে নিয়েছে। সকল শ্রেণীর লোকের কাছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' আমন্ত্রণ, তাঁদের সামর্থ্যমত বিজ্ঞানের বিষয়ে তাতে লিখতে—পত্রিকা সাদরে তা প্রকাশিত করেছে। রচনা পটুত্বের কথা আসে না, বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার হোক—বাংলা ভাষার উন্নতি হোক, বিজ্ঞান-তথ্য পরিবেশনের উপযুক্ততা বাংলা ভাষা লাভ করুক। কিন্তু লেখায় তথ্যাদিতে বা ব্যাখ্যায় যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল থাকে আর সে সব যদি অসংশোধিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তাহলে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র হবে আদর্শচ্যুতি। যাঁরা এই লিখিত বিষয় থেকে জ্ঞান লাভ করবেন ও বিদেশী ভাষায় লেখা বই পড়ে মিলিয়ে দেখবার সময় ও সুযোগ পাবেন না, তাঁদের হবে ভুল জ্ঞান লাভ। এর চেয়ে পরিতাপের কথা আর কি হতে পারে? লেখা পাওয়া গেলে, যে বিষয়ে লেখা, প্রবন্ধকার যদি সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হন, তাহলে তা উপযুক্ত কাউকে দিয়ে দেখিয়ে নেওয়া কি সঙ্গত ও সম্ভব নয়? কোন দেশের বিজ্ঞান-পত্রিকায় নির্বিচারে প্রবন্ধ ছাপা হয় না।

এ বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সম্প্রতি প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধের উল্লেখ করব এখানে।

প্রথমটি হোল, গত ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পালের প্রবন্ধ "তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ"। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক লিখেছেন—"ইলেকট্রনগুলি একটি পরমাণু থেকে অন্যটিতে সহজেই স্থান পরিবর্তন করতে পারে এবং ঐ সঙ্গে তড়িৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।" কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পরাণু থেকে পরাণুতে সঞ্চরণ করতে প্রয়োজন বৈদ্যুতিক বলের (e. m. f)। তাছাড়া, তড়িৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয় যখন ইলেকট্রন উচ্চ শক্তির কক্ষ থেকে নিম্ন শক্তির কক্ষে অবতরণ করে—পরাণু থেকে পরাণ্বন্তরে সঞ্চরণে নয়। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকেও দেওয়া আছে এ কথা।*

অধ্যাপক মহাশয় লিখেছেন, "পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন বলে তিনটি প্রধান ও পজিট্রন ও মেসন বলে দুটি অপ্রধান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ আছে বলে জানা গেছে।" অতঃপর—"নিউক্লিয়াসের মধ্যে ইলেকট্রন ও প্রোটনের আকারের মাঝামাঝি আকারের মেসন নামে যে সূক্ষ্মাংশ থাকে, সেগুলি খুব সম্ভব নিউট্রন বা

---

*'পরমাণু' শব্দের পরিবর্তে আমি 'পরাণু' শব্দ ব্যবহার করি। এই প্রতিশব্দটি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বোসের অনুমোদিত।

প্রোটনের ভগ্নাংশ মাত্র।”......“মহাশূন্যে অবস্থিত অজ্ঞাত কোন মূল উপাদান থেকে তীব্র গতি-বিশিষ্ট প্রোটনগুলি যখন বহু উর্ধ্বে অবস্থিত আবহস্তরে সংঘাতের সৃষ্টি করে তখন তারা নানাবিধ নিউক্লিয়াসকে এমনভাবে আঘাত করে যে, তারা খানখান হয়ে ভেঙে পড়ে। এসব ভগ্নাংশের কতকগুলি মেসন কণিকা।”

পজিট্রন পরাণুর অংশ বা অপ্রধান অংশ, একথা ঠিক নয়।

তেজস্ক্রিয়ায় নানাভাবে নানা কণিকা থেকে পজিট্রন নির্গত হয়—কিন্তু সে কথা আলাদা। ইলেকট্রন পরাণুর অংশ, কেন না প্রোটন ও নিউট্রনে গড়া কেন্দ্রের চতুর্দিকে ইলেকট্রন বিভিন্ন কক্ষে পরিভ্রমণ করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন বিপরীত পরাণু (ও বিপরীত পদার্থ, বিপরীত জগৎ) আছে। এই বিপরীত পরাণুর চতুর্দিকে রয়েছে প্রদক্ষিণরত কণিকা পজিট্রন। কিন্তু ডক্টর পাল যে বলেছেন পজিট্রন পরাণুর অংশ—একথা অবাস্তব

মহাশূন্যে ও বীক্ষণাগারে প্রোটনের সংঘাতে নিউক্লিয়াস থেকে মেসন ছাড়া ‘হাইপারন’ ও অন্যান্য কণিকা উৎপন্ন হয়; আবার বিভিন্ন কণিকার অবনতির ফলে (Decay) প্রোটন, নিউট্রন, মেসন, ইলেকট্রন প্রভৃতিতে রূপান্তরণ হয়—কিন্তু বিজ্ঞানীরা আদি কণিকার ভগ্নাংশ বলেন নি। এই সব অবনতি ও রূপান্তরণ যে কি, সে তত্ত্ব এখনও জানা যায় নি।

ডক্টর পাল কেবলমাত্র পাঁচটি ছাড়া অন্যান্য প্রাথমিক কণিকাদের (Fundamental particles) কথা উত্থাপন করেন নি। মেসনের কথা বলেছেন, কিন্তু মেসন অন্ততঃ তিনটি, π, μ, κ —নামধেয়। এর মধ্যে কেবল π-মেসন পরাণু-ঘটিত বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। পরাণুর কেন্দ্রীনে প্রোটন, নিউট্রনরা একজোট বেঁধে যে একটা পিণ্ডবৎ হয়ে থাকে, π-মেসন সেগুলিকে আটা বা জেলির মত হয়ে গায়ে গায়ে আঁট করে ধরে রাখে—প্রোটন প্রোটনের বিকর্ষণ ব্যাহত করে। গায়ে গায়ে অবস্থিত না হলে—ব্যবধান থাকলে এর আকর্ষণ বলবৎ হয় না। মহাকর্ষ বা তড়িৎ অথবা চুম্বক আকর্ষণ-বিকর্ষণ থেকে এ বলের এই প্রভেদ—অর্থাৎ ব্যবধানে এ বলের কোন কেরামতি নেই। অপরদিকে গায়ে গায়ে লাগা কেন্দ্রীনে এ বল মহাকর্ষ ও বৈদ্যুতিক বলের চেয়ে শতকোটি গুণ প্রবল। কেন্দ্রীন থেকে মুক্ত হলে এই বল π-মেসন কণিকারূপে হয় প্রকট। বিকল্পে বিজ্ঞানীরা মনে করেন π-মেসন পরাণুর কেন্দ্রীনে একটা নেওয়া-দেওয়া ঘটিত আকর্ষণ; Exchange force। টেনিস খেলায় টেনিস বল যেমন খেলোয়াড়দের সীমাবদ্ধ করে রাখে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতর, তেমনি প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতির পরস্পরের মধ্যে π-মেসনের প্রতিনিয়ত নেওয়া-দেওয়ার খেলায় তারা আঁট-সাঁট হয়ে পিণ্ডবৎ বাঁধা হয়ে থাকে। একটু কাব্য করে বলা চলে, যেমন প্রেমে নেওয়া-দেওয়ার কাড়াকাড়ি না থাকলে প্রেম বন্ধন হয়ে যায় ছিন্ন। নিধুবাবুর গানে আছে—“সে আসিলে জিজ্ঞাসিব সে নিলে কি আমার দিলে।” মেসনকে ডক্টর পাল পরাণুর ভগ্নাংশ বলেছেন, কিন্তু মেসনের এই সংগুপ্ত তথ্যটি ব্যক্ত করতে পারেন নি।

এরপর পরাণুতে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্য বিষয়ে লিখতে গিয়ে বলেছেন—“স্বাভাবিক অবস্থায় কিম্বা সাইক্লোট্রন বা অ্যাটমিক পাইলের দ্বারা যদি কোন নিউক্লিয়াসের প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটে, অর্থাৎ প্রোটন অপেক্ষা নিউট্রনের সংখ্যাধিক্য ঘটে তাহলে নিউক্লিয়াসের ভঙ্গুরতা দেখা দেয় ও ঐ অবস্থায় উপাদানকে তেজস্ক্রিয় উপাদান বলা হয়।” অতঃপর “নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রথমটির অপেক্ষা সংখ্যায় কম বা বেশী নিউট্রনযুক্ত অপর যে কোন পরমাণুই হোল তার আইসোটোপ।”

আইসোটোপের সংজ্ঞা ও বিবরণ দিতে গিয়ে ডক্টর পাল গণ্ডগোল পাকিয়েছেন। নিউক্লিয়াসে প্রোটনের চেয়ে নিউট্রনের সংখ্যাধিক্য হলেই তা আইসোটোপ হয় না। মৌল পদার্থের বেশীর ভাগেই—অন্ততঃ সত্তর বাহাত্তরটিতে প্রোটনের চেয়ে নিউট্রনের সংখ্যাধিক্য—যারা স্থায়ী, ভঙ্গুর বা তেজস্ক্রিয় নয়। প্রোটন—নিউট্রনে সংহত সম্বদ্ধ হয়ে থাকার নিষ্পত্তিমূলক অনেক গূঢ় তত্ত্ব আছে। যা কিছুর সঙ্গে আমরা পরিচিত তাদের সত্তার ও বর্তমানতার স্থায়িত্ব কতটুকু বা স্থায়িত্ব নিদান কি? সে আলোচনা এখানে অবান্তর। প্রোটন-নিউট্রনের সংখ্যানুপাতের সম্বন্ধে এইটুকু এখানে বলা চলে যে, প্রোটনের সংখ্যার চেয়ে নিউট্রন ১'৫—১'৬ গুণ বেশী হলেও স্থায়ী হয়। ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রীনে সমসংখ্যক প্রোটন থেকেও যখন ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক নিউট্রন থাকে তখন সেগুলি হয় আইসোটোপ। আবার আইসোটোপ হলেই তা তেজস্ক্রিয় হয় না। ডক্টর পাল এ বিষয়ে সংঘাতিক ভুল করেছেন।

আরও এক সাংঘাতিক ভুল করেছেন তিনি। লিখেছেন—"খনিগর্ভে কিম্বা মাটির নীচে নানা স্থানে এ রকম তেজস্ক্রিয় মৌলিক উপাদান দেখতে পাওয়া যায়,—যেমন রেডিয়াম, থোরিয়াম, মেসো-থোরিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম, পলোনিয়াম, প্লুটোনিয়াম প্রভৃতি।" রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি মাটিতে বা খনিগর্ভে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্লুটোনিয়াম মাটিতে বা খনিতে পাওয়া যায় না। প্লুটোনিয়াম প্রকৃতির দান নয়। এ-বস্তু পাওয়া যায় ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম চুল্লী থেকে, এ বস্তু মানুষের দান।

বাহুল্য ভয়ে ডক্টর পালের লেখা থেকে ভুলচুক ও অসাবধানতার উদাহরণ আর দিলাম না।

এবার দ্বিতীয় প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করব। মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত ডক্টর কানাইলাল গাঙ্গুলী, তাঁর "পরমাণুর শক্তি" প্রবন্ধে লিখেছেন—"পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটাতে পারলে নিম্নলিখিত ফর্মুলা অনুযায়ী শক্তি পাওয়া যাবে, $E=mc^2$।" অঙ্ক কষে তার পরিমাণও তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমার নজির দিয়েছেন।

এখানে একটা কথা আছে। সে হচ্ছে পরমাণু বিস্ফোরণে যে শক্তি মুক্ত হয়, তা ঠিক ভর (mass) ধ্বংসজাত শক্তি নয়। পরমাণুর বিস্ফোরণে হয় পরমাণুর বিভাজন; কেন্দ্রীনে প্রোটন নিউট্রন পিণ্ডে যে বল সংহত হয়ে থাকে তারই কতকটা মুক্ত হয়ে প্রলয়ঙ্কর শক্তি রূপে প্রকটিত হয়। ধনুকে টানা জ্যা আঙ্গুলের চাপ থেকে মুক্ত হয়ে বেগে শরনিক্ষেপ করে—পরমাণু বিভাজনের মুক্ত শক্তি সেই রকম। পরমাণুর বিস্ফোরণ বা বিভাজন সম্ভব শুধু মৌল-পদার্থের নির্ঘণ্টের শেষের দিকের কয়েকটিতে, যথা—থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি, কেন না এগুলিতে কেন্দ্রীন বন্ধন ক্রমেই হয় আলগা। নির্ঘণ্টের গোড়ার দিকের পরমাণুগুলি থেকে শক্তি নিষ্কাশন করতে হলে বিস্ফোরণ বা বিভাজনের বদলে সংযোজন ঘটাতে হয়। ডক্টর গাঙ্গুলী শক্তি নিষ্কাশনের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু প্রভেদটুকু—আকাশ-পাতাল প্রমাণ, উল্লেখ না করে, হয়তো না বুঝে।

বিভাজন ঘটানো হয় কেন্দ্রীনে নিউট্রনের (অথবা প্রোটনের) আঘাত দিয়ে—সেই সকল কেন্দ্রীনে, যাদের কেন্দ্রীন বল (Nuclear force) কিছুটা মন্দীভূত। ঢিল মেরে গাছ থেকে আম পাড়ার মত কতকটা। উপমাটা খুব সঠিক হোল না। আসলে যা ঘটে, তা হোল কেন্দ্রীনে নিউট্রন প্রবেশ করে বিপর্যয় ঘটায়,—কিন্তু ঠাসা—কেন্দ্রীনে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, প্রোটন নিউট্রনকে এক জোট করে রাখে একটা

কেন্দ্রীন বল বা আকর্ষণ, নয়তো প্রোটন প্রোটনের বিকর্ষণ কেন্দ্রীন কণিকাসমূহকে উৎক্ষিপ্ত করত। এই কেন্দ্রীন বল (Nuclear force) শুধু একান্ত সমীপবর্তী কণিকাদের এক জোট করে বেঁধে রাখতে পারে। ব্যবধানে এ বলের কোন জারিজুরি নেই। অপর দিকে কেন্দ্রীনের প্রোটনগুলি বিপরীত দিকে ঠেলা দেয়। মৌল পদার্থের নির্ঘন্টের গোড়ার দিকের গুলিতে কেন্দ্রীন বল প্রবল; মাঝের গুলিতে আরও প্রবল; আর থোরিয়াম প্রভৃতি—রেডিয়াম, ইউরেনিয়ামাদিতে আকর্ষণ বলের চেয়ে বিকর্ষণ বল প্রবলতর। এদের কেন্দ্রীনে নতুন করে নিউট্রন প্রোটন প্রবেশ করলে স্থায়িত্বের সীমা অতিক্রম করে যায়, ফলে হয় বিস্ফোরণ বা বিভাজন, আর খানিকটা সংহত বল মুক্ত হয়ে প্রলয়ঙ্কর শক্তিরূপে প্রকট হয়। বল খেলার মাঠে হয়েছে দর্শকদের ভিড়,—শৃঙ্খলা নষ্ট হবার যোগাড়। কর্তৃপক্ষ দিলেন সওয়ারি পুলিস চালিয়ে ভিড়ের মধ্যে; ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। কতকটা এই রকম।

বিভাজনে ভর লুপ্ত বা ধ্বংস হয় না। বরং বিভাজিত অংশগুলির সম্মিলিত ভর অগ্রিম কেন্দ্রীনের ভরের চেয়ে যৎসামান্য কিছু বেশী। অংশগুলি সংবদ্ধ হবার সময় ভরের যে লাঘব হোল, তাই কেন্দ্রীন বলে হয়েছিল রূপান্তরিত।

মৌল পদার্থের নির্ঘন্টের গোড়ার দিকের (হাইড্রোজেন, লিথিয়াম) গুলিতে সংযোজন ঘটিয়ে শক্তি নিষ্কাশন করার উপায়। সংযোজন ঘটাতে লাগে বিরাট অকল্পনীয় তাপ; বিলিয়ন ডিগ্রী। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, তারায় তারায় সংযোজন ক্রিয়ায় হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম ও তদূর্ধ্ব মৌল পদার্থ সৃষ্ট হয় ও তজ্জনিত ভর সংকোচন ফলে আইনষ্টাইন প্রদত্ত সূত্রানুসারে ($E=mc^2$) সূর্য ও তারার নির্ধারিত তাপের হয় উৎপত্তি। ডক্টর গাঙ্গুলীর লেখায় এর সামান্য উল্লেখ আছে। এর সংক্রান্ত একটা তাৎপর্যপূর্ণ কথা আছে, যার উল্লেখ নেই ডক্টর গাঙ্গুলীর লেখায়। আইনষ্টাইন প্রদত্ত ভর ও শক্তি-ঘটিত সূত্রে একটা নির্দেশনা আছে। ইতিপূর্বে বিজ্ঞানের বার্তা ছিল যে, কি পদার্থের, কি শক্তির রূপান্তর হয়, কিন্তু রূপান্তরণে ভর বা শক্তির পৃথক পরিমাণ থাকে অপরিবর্তিত, অবিনষ্ট। আইনষ্টাইনের সূত্র ও তথ্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধার্য হয়েছে যে, বিশ্বে ভর ও শক্তির সম্মিলিত পরিমাণ থাকে অপরিবর্তিত, অবিকৃত।

আর এক কথা, ডক্টর গাঙ্গুলী লিখেছেন যা সঠিক নয়। তিনি লিখেছেন যে, কাচের নল ব্যবহার করে ডক্টর রণ্টজেন এক্স-রে আবিষ্কার করেছিলেন তা ইউরেনিয়াম লবণ-ঘটিত। ইউরেনিয়াম থাকার দরুণ এক্স-রে পাতে উজ্জ্বল প্রভার উদয় হয়েছিল। জানিনে এ খবর তিনি কোথায় পেলেন। যে কোন নির্বাত কাচের নলে—ইউরেনিয়াম লবণ-ঘটিত না হলেও—বিদ্যুৎ-ক্ষরণে উজ্জ্বল প্রভা বিচ্ছুরিত হয়। কাচের নলে ইউরেনিয়াম লবণ ছিল বলে বেকেরেল ঐ লবণ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন,—ডক্টর গাঙ্গুলী প্রদত্ত এ বিবরণটি ঠিক নয়। কাচের নল ছাড়া অন্যকিছু প্রভাপ্রদ হলে এক্স-রে উৎপন্ন করে কিনা দেখবার জন্য তিনি ইউরেনিয়াম লবণ নিয়ে পরীক্ষা করেন ও হঠাৎ ঘটনাক্রমে আবিষ্কার করেন যে, আলো পড়ে প্রভাপ্রদ না হলেও—অন্ধকারে রাখলেও ইউরেনিয়াম থেকে এক্স-রে তুল্য রশ্মি নির্গত হয়।

ডক্টর গাঙ্গুলীর লেখা আর এক কথা সম্পর্কে সংশয় আছে। তিনি লিখেছেন—আঁরি বেকেরেল প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয়। কিন্তু কন্যা Eve Curie-র লেখা মাদাম কুরীর জীবনীতে আছে—Henri Becquerel made sure that these surprising properties were not caused by a preliminary exposure (of uranium

salts) to sun...For the first time a physicist had obsereved the phenomenon to which Marie Curie was later to give the name of "radioactivity".

পরিশেষে মার্চে প্রকাশিত আর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করব—অত্রি মুখোপাধ্যায় লিখিত "কোয়াসার" বিষয়ে। এগারো পৃষ্ঠা-ব্যাপী এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে একেবারে দন্তস্ফুট করা যায় না. প্রবন্ধটি এমন এক গোলক ধাঁধা বা হেঁয়ালি—"হিং-টিং-ছট"। ভাষাও সুধীন দত্তানুগ—বঙ্কিল—অবোধ্য। প্রবন্ধটি পড়তে বসে আশা করেছিলাম কোয়েসার (কোয়াসার না কোয়েসার?) সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ হবে। কিন্তু গণিত ও অঙ্কের জঞ্জালে তিলমাত্র বোধগম্য হোল না—কোয়েসার নিকটের না প্রান্তের অতি দূরের, পরিণত তারা না অপরিণত প্রজ্বলিত গ্যাসের নীহারিকা, না আর কিছু। কোন তথ্যই, কোন সংবাদই অনুমিত হোল না।

আশা করি আমার কথাগুলি বিবেচনা করে একটা বিহিত করবেন যে, লিখিত প্রবন্ধগুলি ভুলত্রুটি শূন্য ও বোধগম্য হয়।

ইতি

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

লেখকদের উত্তর

গত ৩।৫।৬৮ তারিখে লেখা একখানি পত্রসহ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়, ডিসেম্বর; ১৯৬৭ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার 'তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ' নামক প্রবন্ধের শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত একটি সমালোচনার অনুলিপি আমার নিকট পাঠিয়েছেন। প্রথমেই বলে রাখা ভাল আমি নিউক্লিয়ার পদার্থ-বিজ্ঞানী নই, রোগ নির্ণয়ে এবং রোগের চিকিৎসায় 'তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ' ব্যবহারকারী একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী মাত্র এবং সাধারণ বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে চিকিৎসা বিভার সহায়ক নতুন জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলার জন্যেই ঐ প্রবন্ধটি লেখা। যা কিছু আমি লিখেছি তার অধিকাংশই কোন না কোন বিখ্যাত মার্কিন বা সোভিয়েট বিজ্ঞানীর লিখিত গ্রন্থ থেকেই গৃহীত। সুতরাং শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের বিচারে ভুলচুক (?) যদি কিছু হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর জন্য গৌণতঃ আমি দায়ী হলেও মুখ্যতঃ দায়ী তাঁরাই। সে জন্য গ্রন্থকার, পুস্তক ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করে তাঁদের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যগুলি আমি পর পর নীচে উল্লেখ করে যাচ্ছি।

ইলেকট্রনের একটি পরমাণু থেকে অন্যটিতে স্থান পরিবর্তন সম্বন্ধে—

"Electrons from the outermost layer which are farthest from the nucleus and therefore the least strongly connected with it, can break away from the atom and be captured by other atoms taking up a position in their outer layers"—General Chemistry by N. Glenka, translated from Russian by David Sobolev, p. 119.

"It (electron) can often move from one atom to another with ease. This movement of electrons from one atom to another...is known as electric current"—Text Book of Medical Physiology, by Arther. C. Guyton, 1959, p. 976.

পরমাণুর অংশ পজিট্রন সম্বন্ধে—

"During the last 50 years it has become increasingly evident that atom is really a large particle and is made up of mainly three basic smaller particles known as neutrons, protons and electrons. Occasionally other small particles such as positrons and mesons exist in nature but these are relatively unimportant"—Text Book of Medical Physiology by A. C. Guyton, p. 976.

প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হলেই

অন্যান্য প্রাথমিক কণিকা কিংবা বিভিন্ন প্রকারের মেসনের কথা উল্লেখ করা হয় নি।

এবার Isotope এর সংজ্ঞা সম্বন্ধে—

"An isotope of an atom is an element that has the same number of electrons in the planetary space and the same number of protons in the nucleus but has more or fewer neutrons in the nucleus than the original atom" Medical Physiology, edited by Philip Bard, 1956, p. 564

"Isotopes possess equal number of protons but different number of neutrons: General Chemistry by N. Glenka p. 677

স্থায়ী এবং ভঙ্গুর বা অস্থায়ী (তেজস্ক্রিয়) পরমাণুর দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৬১১ পৃষ্ঠায় যে চিত্র দেওয়া হয়েছে, তাও Text Book of Medical Physiology by A. C. Guyton p. 977 থেকে গৃহীত এবং তার নীচে Caption আছে Stable and unstable (radioactive) atoms. আমার প্রবন্ধে চিত্রটির নীচে ঐ Caption-ই (বাংলায়) আছে।

"Whether or not a given nucleus will be stable depends upon the relative number of protons and neutrons in the nucleus"—Text Book of Medical Physiology by A. C. Guyton p. 977।

৬১৮ পৃষ্ঠার শেষের দিকে তেজস্ক্রিয় উপাদান (Radioactive element বা মৌলিক পদার্থের) পরমাণুর কথাই বলা হয়েছে, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের কথা মোটেই বলা হয় নি, যেমন চিত্রেও তাই দেখানো হয়েছে। সুতরাং এটি শ্রীভট্টাচার্যের দেখবার বা পড়বার ভুল, আমার মারাত্মক ভুল নয়।

এবার প্লুটোনিয়াম সম্বন্ধে—

মাদাম কুরীর দ্বারাই Uranium pitch blende ore থেকে সর্বপ্রথমে দুটি নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ পলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কৃত হয়। তার আগে তাদের অস্তিত্ব জানা ছিল না।

পরবর্তী কালে,

"Emitting beta particles U^{239} changes into neptunium (atomic number 93) and it was subsequently established that undergoing β-decay it changes into an element having the atomic number 94, which has been named plutonium (Pu) or P^{239}—General Chemistry by N. Glenka p. 679.

"If a method could be devised for converting some of the U^{238} to Pu^{239} a chemical separation of plutonium from uranium would avoid the difficulties of isotopic separation of U^{235} and U^{238}—Nuclear Physics by Irving Kaplan, 2nd ed. (1963), p. 638.

সুতরাং Uranium pitchblnde থেকে উৎপন্ন পলোনিয়াম ও রেডিয়ামকে যদি খনি বা মৃত্তিকাজাত বলতে বাধা না থাকে, তাহলে খনিজ ইউরেনিয়াম থেকে উৎপন্ন নেপচুনিয়াম এবং পরবর্তী স্তরে উৎপন্ন প্লুটোনিয়ামকেও সমগোত্রীয় বললে কি খুব ভুল হয়? এ স্থলে প্রকৃতির দান কি মানুষের কাজ, সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি, শুধু প্রাথমিক উপাদান অর্থাৎ ইউরেনিয়াম খনিজ বা আকরিক বলেই, তাথেকে উৎপন্ন প্লুটোনিয়ামকেও একই শ্রেণীর বলা হয়েছে।

পরিশেষে আমার অনুরোধ "বহু ভুলচুক ও অসাবধানতা" আছে এরূপ একতরফা রায় না দিয়ে শ্রীভট্টাচার্যকে আমার নজিরগুলি অনুধাবন করতে অনুরোধ জানাই। "To err is human" আমিও তার অতীত নই, তবে হয়তো বা শ্রীভট্টাচার্যের মতে যতটা দোষী, ততটা নই, কারণ আমার প্রবন্ধ মৌলিক নয়, অধিকাংশই প্রখ্যাত অনেক বড় বড় লেখকদের লেখা থেকে নেওয়া। "..."র মধ্যে সেগুলি পৃষ্ঠা ও পুস্তক

এবং গ্রন্থকারের নামসহ উল্লেখ করে দিলাম। তিনি প্রয়োজন মনে করলে তাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে পারেন।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

শ্রদ্ধেয় গোপালবাবু,

আপনার ৩১ে তারিখের চিঠি আর সেই সঙ্গে গিরিজা বাবুর লেখাটি এইমাত্র পেলাম। গিরিজা-বাবু আমার পরিচিত। আমি এই বিষয় নিয়ে গবেষণাগারে কাজ করি না। আমার বিশ্বাস, উনিও করেন না। সুতরাং তাঁর লেখার উপর আমার বক্তব্য থাকলেও এবং আমার authority Otto Hahn হলেও, তা প্রকাশ করে এ নিয়ে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি করতে চাই না, তা উনি আমাকে যতই আঘাত করুন।

বিনীত

শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পাদক সমীপেষু

মার্চ সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' আমার 'কোয়াসার ও সম্ভাব্য আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী' সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গিরিজাপতি ভট্টাচার্য মহাশয়ের সক্ষোভ মন্তব্য পড়বার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে। ভট্টাচার্য মহাশয়ের অভিযোগের লক্ষ্য এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, যদিও বুঝতে পারি লেখকই সেখানে বধ্য, বুঝতে পারি না বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার প্রতি তাঁর কতখানি নিষ্ঠা ও সতর্কতা উপস্থিত। কারণ বাংলা ভাষা ও বিজ্ঞানের কোনটাই এ দুর্ভাগ্য নিয়ে সৃষ্ট নয় যে, পাঠকের জন্য তাদের দুর্দশাগ্রস্ত হতে হবে। কখনো কখনো এ দুয়ের জন্য পাঠককে উপযুক্ত প্রস্তুতির শ্রম স্বীকার করতে হয়, অন্ততপক্ষে উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞানালোচনা বিষয়ে সাম্প্রতিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে এটা ক্রমশঃ স্বচ্ছ হয়ে আসছে। যেহেতু, আমি জানি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মূলতঃ সাধারণের জন্য তৈরি হলেও প্রত্যেক সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ অন্ততঃ একটি করে প্রামাণিক লেখা ছেপে থাকেন ও আশা করি ছাপবেন। এ আশা নিশ্চই অযৌক্তিক নয় যে, গণিতে অরুচি ও বিষয়ের জটিলতানুযায়ী বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য অপরিহার্য কিংবা বাঞ্ছনীয় সুধীজনপ্রিয় ভাষার বিরুদ্ধে অবোধ্য সংস্কার-মুক্ত পরিশ্রমী বাঙালীরাই সে সবের পাঠক হবেন।

অতিরিক্ত দুর্ভাগ্যতঃ, শিরোনামার চূড়ান্ত যৌক্তিক ব্যাপ্তি সত্ত্বেও ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রশ্নগুলি, যেগুলি অনুমিত (?) হয় নি বলে আমি, তুষ্ট, অথচ কোন সংবাদই তিনি পান নি বলে তাত, আমার বিতর্কিত প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় হবার অনুপযুক্ত, অপিচ আগামী কোন প্রবন্ধে এগুলি সে হিসেবে সম্ভাবিত ছিল, প্রবন্ধের প্রারম্ভিক বিজ্ঞাপনের এই মর্ম ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুনর্বার সতর্ক পাঠান্তে সুস্পষ্ট হবার যোগ্য।

পরিশেষে, দন্তস্ফুটনের অক্ষমতা-অভিমান সত্ত্বেও ভট্টাচার্য মহাশয় প্রবন্ধটিকে হেঁয়ালি বা গোলকধাঁধা—"হিং টিং ছট" বলে টের পেলেন, তার সম্ভাব্য উৎসে একমাত্র অকারণ রোষের অবস্থান অনুমানে বোধগম্য যে, কোয়াসার বা কোয়েসারের দ্বন্দ্বও তৎপ্রসূত; এটি আমার সে কারণে এড়িয়ে যাবার উপযুক্তও বটে। তথাপি সাধারণের উপভোগ্য হবে বলে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল যে, কোয়াসার একটি বিদেশী শব্দ, তদুপরি বিস্তৃত নামের সংক্ষেপাকার; অতএব উচ্চারণোত্তীর্ণ যে কোন বানানই ব্যবহারোপযোগী। আমি তো একজনকে জানি যিনি কোআজার (কি কোয়াজার) লিখেছিলেন। আমার মনে হয় উচ্চারণের দিক থেকে 'কোআসার'টা অপেক্ষাকৃত ঠিক, লিখেছিলামও তাই, কিন্তু যেহেতু শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় জানালেন, বাংলায় কোন শব্দের ভিতরে অ বা আ বসে না, তাই কোয়াসার হলো, কিন্তু স্বয়ং বিষ্ণু দে-কেও দেখেছি অম্লানভাবে এলিঅট লিখতে। নিবেদন ইতি

বিনীত

অত্রি মুখোপাধ্যায়

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

করে দেখ

হাত না লাগিয়ে ভাসমান বরফখণ্ড তোলবার উপায়

এক গ্লাস জলে এক খণ্ড বরফ ফেলে দিলে সেটা জলের মধ্যে ভেসে থাকবে। তোমার বন্ধুদের বল—হাত দিয়ে স্পর্শ না করে তাদের কেউ বরফ-

খণ্ডটাকে জল থেকে তুলে আনতে পারে কিনা। কৌশলটা জানা না থাকলে হাত না লাগিয়ে কেউ সেটাকে তুলে আনতে পারবে না।
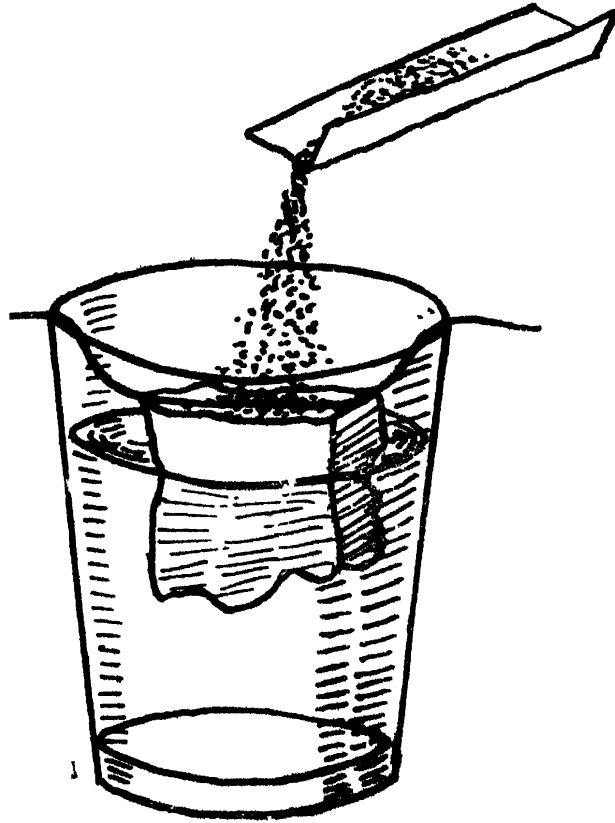
কৌশলটা খুবই সহজ। প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা এক টুকরা সুতা নাও। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি করে সুতাটাকে বরফখণ্ডের উপর রেখে দাও। এবার খানিকটা নুন এনে ঐ জায়গাতে ছড়িয়ে দাও। নুন দিলেই সুতার চারদিকের বরফ গলতে সুরু করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিকের বরফ ওই জলের তাপ টেনে নেবে। ফলে সুতাটার চারদিকের জল পুনরায় জমতে সুরু করবে এবং ২।১ মিনিটের মধ্যেই বরফখণ্ডের সঙ্গে সুতাটা শক্তভাবে এঁটে যাবে। এবার সুতাটার যে কোন একপ্রান্ত ধরে টানলেই বরফখণ্ড সুতার সঙ্গে উঠে আসবে।

—গ—

মাদাম কুরী ও তাঁর অবদান

আজ থেকে এক-শ' বছর আগে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ার-শ শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী মাদাম কুরী। রেডিয়াম আবিষ্কার করে এবং দুর্গত ও রোগক্লিষ্ট মানুষদের মুক্তি-পথের নিশানা দিয়ে সভ্যতাকে তিনি অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে গেছেন। ১৮৬৭ থেকে ১৯৬৭, সুদীর্ঘ এক শতটি বছর পরিক্রমা করেছে ইতিহাসের চাকা—আজ তাই তাঁর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে পৃথিবীর মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।

মাদাম কুরী—একটি অবিচল নিষ্ঠা, একটি ঋষিকল্প সাধনার প্রতীক; মাদাম কুরী পৃথিবীর দুর্গত ও রোগজর্জর মানুষের একান্ত আপনার। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, "পৃথিবীর যত জন বিখ্যাত মানুষের সম্বন্ধে আমি জানি, তাঁদের মধ্যে একমাত্র মাদাম কুরীই খ্যাতির অহঙ্কারে স্ফীত হন নি।" সত্যিই রাশি রাশি ফুলের মালা, লক্ষ লক্ষ মানুষের অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা মাদাম কুরীকে দম্ভ আর আত্মসচেতনার পর্বতের উপর তুলে দেয় নি, অভিনন্দন পত্রের স্তূপ তাঁর বিবেকবুদ্ধিকে সমাধিস্থ করে নি। বার বার তিনি বলেছেন, "সমস্ত মানুষের প্রয়োজনে বিজ্ঞান-বিদ্যাকে কাজে লাগাচ্ছি আমরা। ব্যক্তিবিশেষকে ধনী করবার জন্যে আমি রেডিয়াম আবিষ্কার করি নি। এই পদার্থটির উপরে সকল মানুষেরই অধিকার আছে।" মানুষের অধিকার সম্বন্ধে এই মুক্তদৃষ্টি, অপর দিকে নিজের অধিকার সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের মধ্য দিয়ে মাদাম কুরীর নিরহঙ্কার মনের এক পরিষ্কার চিত্র ফুটে উঠেছে।

পোল্যাণ্ডের মাটি জন্ম দিয়েছে ইউরোপে রেঁনেসাসের যুগে বিজ্ঞানের নবযাত্রার পথিকৃৎ কোপারনিকাসের, যিনি সাহসের সঙ্গে বিজ্ঞানের সত্যকে জনতার সামনে তুলে

ধরতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন। আর তারই বহু যুগ পরে তাঁরই স্বদেশবাসী বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরী জীবন দিয়েছেন রোগক্লিষ্ট মানুষদের আলোর নিশানা দেখাতে গিয়ে। তেজস্ক্রিয়তার বিষে তাঁর হৃৎপিণ্ড ঝাঁঝরা হওয়া অবধি গবেষণাগারে নিরলস সাধনায় মগ্ন থেকেছেন। পোল্যাণ্ডবাসীরা বললো—এমনি আর হয় না, ফরাসীরা বললো—এমন আর হয় নি কখনও, আর পৃথিবীর লোকেরা বললো—ঠিক এমনটি আর কোন দিন হবেও না।

*　　*　　*　　*

আলো চাই—কোথায় আলো? স্বাধীনতার আলো—যে আলোয় উদ্ভাসিত হবে আমার স্বদেশ। একটি ছোট্ট ফুটফুটে কিশোরীর আত্মা গুমরে মরে। কিশোরী ম্যানিয়া বিক্ষুব্ধ অন্তরে দেখে, তার পিতৃভূমি পোল্যাণ্ড রুশ-শাসনে শৃঙ্খলিত, মনে মনে অনুভব করে পরাধীনতার তীব্র জ্বালা। জারের অত্যাচারে তখন অনুক্ষণ জর্জরিত তাঁর জন্মভূমি। মাতৃহারা কিশোরী ম্যানিয়া স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা পায় পিতার কাছে। পিতা ছিলেন গণিত ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন শিক্ষাব্রতী। ম্যানিয়ার মায়ের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বয়স দশ বছরও পূর্ণ হয় নি। পিতা মিঃ স্কলোদোভস্কা মায়ের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে এগিয়ে আসেন। তাই ছোটবেলা থেকেই পিতার সস্নেহ শিক্ষার ছায়ায় ম্যানিয়া প্রতিপালিত হন। স্বদেশ প্রেমের অপরাধে পিতা চাকরী থেকে বরখাস্ত হন। তখন থেকেই তাঁদের পরিবারকে সইতে হয়েছে দারিদ্র্যের কশাঘাত। তিন বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ম্যানিয়ার লেখাপড়ায় ছিল অপরিসীম নিষ্ঠা। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণপদক পুরস্কার পেয়ে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ম্যানিয়া। এবার উদ্দেশ্য উচ্চশিক্ষা। ম্যানিয়ার বড় বোন ব্রনিয়ারও ইচ্ছা ডাক্তারী পড়বার। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থ তাঁদের ছিল না। তাই প্রথমে ব্রনিয়া প্যারিসে গেলেন ডাক্তারী পড়তে এবং তাঁর পড়ার খরচ জোগাতেন ম্যানিয়া, একটি পরিবারে গভর্ণেসের চাকরী করে। কথা ছিল ব্রনিয়ার শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর ম্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন এবং তখন তাঁকে সাহায্য করবেন ব্রনিয়া। ব্রনিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করবার পর ম্যানিয়ার সুযোগ এলো। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন তিনি।

এই সময়ে অল্প ভাড়ায় একটি আলো-বাতাসহীন ছোট কুঠুরীতে তিনি বাস করতেন। সেখানে ছিল প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ। জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলবার মত অনেক বৈশিষ্ট্যই ছিল সে ঘরটির। খেতেন যৎসামান্য। ডিম কদাচিৎ জুটতো ভাগ্যে—আর ফল খাওয়া ছিল তাঁর কাছে বিলাসিতা। শীতের সময় একটা ছোট

উনুন জ্বালিয়ে ঘর গরম রাখবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু অঙ্ক কষতে কষতে কখন যে উনুন নিবে গেছে, তা খেয়ালই থাকতো না।

এইভাবে যিনি একদিকে চালিয়েছেন পড়াশুনা ও অন্যদিকে চালিয়েছেন ক্ষুধা ও শীতের সঙ্গে সংগ্রাম—তিনি আর যাই হোন না কেন, সাধারণ মানুষ নন। অবশেষে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় প্রথম হয়ে এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মাষ্টার ডিগ্রি লাভ করলেন।

এরই কিছুদিন পর ফ্রান্সের প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম পিয়ের কুরীর সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ম্যানিয়া হলেন মাদাম কুরী। পিয়ের কুরী ছিলেন একজন প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক। Crystal সম্পর্কে তাঁর গবেষণা এবং চাপের সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর অবদান পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর আবিষ্কৃত কুরী-স্কেলের দ্বারা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ভুলত্রুটি সংশোধন করা যায়।

বিবাহের পর কুরী দম্পতি একসঙ্গে গবেষণার সাধনায় মাতলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই শেষভাগে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এক নতুন পথে মোড় নিয়েছে। ১৮৯৬ সাল—বিজ্ঞানী রন্টজেন আবিষ্কার করলেন এক বিস্ময়কর রশ্মি—যার নাম দেওয়া হলো এক্স-রে। এই আশ্চর্য রশ্মিটি যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করে পিচব্লেণ্ড নামক এক প্রকার প্রাকৃতিক পদার্থ থেকে আবিষ্কার করা যায় কি না, সেই গবেষণা করতে গিয়ে ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরি বেকেরেল ফটোপ্লেটে আর একটা অজানা অদ্ভুত রশ্মি আবিষ্কার করেন। পিচব্লেণ্ড থেকে নির্গত এই রশ্মির নির্গমন আলো বা অন্ধকার, উত্তাপ বা শৈত্য—কোন কিছুর দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। বেকেরেল সেই অবিরাম ও স্বতঃস্ফূর্ত রশ্মি নির্গমন-ক্রিয়ার নাম দেন তেজস্ক্রিয়া (Radioactivity)। পিচব্লেণ্ড থেকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেল সর্বাপেক্ষা ভারী মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়াম। এটা একটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ। পিয়ের কুরী ও মেরী কুরী বেকেরলের সাধনার পথ ধরে এগুলেন। ১৮৯৮ সালে কুরী দম্পতি দেখাতে সমর্থ হলেন যে, ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তার তুলনায় পিচব্লেণ্ডের তেজস্ক্রিয়তা অনেক গুণ বেশী। এথেকে তাঁরা ধারণা করলেন যে, পিচব্লেণ্ডে ইউরেনিয়াম অপেক্ষা আরও অধিকতর তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিদ্যমান আছে। তাঁদের এই ধারণার সত্যতা তাঁরা প্রমাণ করলেন পিচব্লেণ্ড থেকে আরও দুটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করে—যাদের নাম দেওয়া হলো পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম। পরে মাদাম কুরী ও স্মিড (Schmidt) দেখান যে, থোরিয়াম ও তার যৌগসমূহও তেজস্ক্রিয়। রেডিয়ামের বিশ্লেষণে দেখা যায়, রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়ামের চেয়ে প্রায় দশ লক্ষ গুণ বেশী এবং তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গমনের ফলে প্রচুর উত্তাপেরও সৃষ্টি হয়।

. প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি স্কুলের একটি আঙ্গিনায় ছোট্ট একটি স্যাঁতস্যাঁতে চালাঘর। ঘরের মধ্যে অপর্যাপ্ত আলো, আর যৎসামান্য কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও গবেষণার উপাদান। এই ছিল কুরী দম্পতির লেবরেটরী—আজ যা সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে পবিত্রতম তীর্থক্ষেত্র। লেবরেটরীর যন্ত্রপাতিগুলি দেখলে মনে হতো এগুলি দিয়ে আর যাই করা যাক না কেন, গবেষণার কাজ করা অসম্ভব। তাঁদের একমাত্র সম্বল ছিল অসাধারণ প্রতিভা ও ঋষিকল্প নিষ্ঠা। এক একবার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে ওঁদের, কিন্তু তবুও কিছুতেই হার মানেন নি। অন্তরের আদর্শবোধকে ধ্রুবতারা করে অবিচলিত চিত্তে পথ চলেছেন। এই পথচলার মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতার কথা মাদাম কুরী আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন, "অর্থ ছিল না আমাদের। উপযুক্ত কোন লেবরেটরী ছিল না, ছিল না কোন ব্যক্তিগত সাহায্য। বরং ঐ প্রচেষ্টার ধরণটা ছিল একেবারে শূন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি করা।"

শেষ অবধি তাঁরা সৃষ্টি করলেন। মানুষের সাধনায় অসম্ভব সম্ভব হলো। কিছু দিনের মধ্যেই পৃথিবীর অগণিত মানুষ নতুন একটি পদার্থ—রেডিয়ামের কথা জানলো। আর লক্ষ লক্ষ মুমূর্ষু জানলো, কুরী দম্পতির সেই নতুন বস্তুটি তাদের নবজীবন প্রদান করবে বলে আশ্বাস দিচ্ছে।

বিবাহের পর তুটি কন্যার জননী হলেন মাদাম কুরী। একদিকে সংসার ধর্ম, অন্যদিকে গবেষণা, অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর ভেঙ্গে পড়লো। চিকিৎসকেরা যক্ষ্মার আভাস পেয়ে বিশ্রাম নিতে বললেন। কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ না করে গবেষণায় নিমগ্ন রইলেন। ১৯০৩ সাল। অবশেষে এলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান। নোবেল পুরস্কার পেলেন কুরী দম্পতি। মাদাম কুরীই হলেন প্রথম নারী বৈজ্ঞানিক, যিনি এই সম্মান লাভ করলেন। ইংল্যাণ্ডের Royal Society of Science তাঁকে Davey পদক দিয়ে সম্মানিত করলো। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর লেখা বই 'Researches Surless Substances radioactives' প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ এক পথ তুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন পিয়ের কুরী। এই মর্মান্তিক তুঃখের আঘাতেও ভেঙ্গে পড়লেন না মাদাম কুরী। গবেষণার পথ ধরে আরও এগুলেন। Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিয়েরের শূন্যস্থান পূরণের জন্যে তাঁর কাছে প্রস্তাব এলো। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা প্রোফেসার হিসাবে নিযুক্ত হয়ে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯১০ সালে তাঁর আর একটি বিখ্যাত বই, 'Traite De radioactivite' প্রকাশিত হয়। ১৯১১ সালে আবার নোবেল পুরস্কার পেলেন। এবার তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল রেডিয়ামের সাহায্যে কি ভাবে রোগক্লিষ্ট তুর্গতদের তুঃখ দূর করা যায়। ক্যান্সার প্রতিরোধে এবং অনেক তুরারোগ্য রোগ নিরাময়ে রেডিয়ামের ক্ষমতা অসীম।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মেরী কুরী আহতদের সেবায় ও চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেন। চিকিৎসার সরঞ্জামগুলিকে অনেক সময় একাই বহন করে নিয়ে যেতেন—এমন কি, নিজের জামাকাপড় নিজেই কাচতেন।

হাসিমুখে সারাজীবন কাজ করেছেন মাদাম কুরী। তাঁকে দেখে বোঝবার উপায় ছিল না যে, ইনিই সেই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। সাংবাদিকদের তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলতেন, আত্মপ্রচার এতটুকুও পছন্দ করতেন না। তাঁর সংগৃহীত রেডিয়াম পেটেণ্ট করলে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী হতে পারতেন, কিন্তু তা না করে তিনি তাঁর আবিষ্কারকে দান করলেন মানব-কল্যাণে।

একদিন গবেষণাগার থেকে অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন—পরের দিন আর উঠলেন না। ডাক্তারেরা সিদ্ধান্ত করলেন, রেডিয়ামের বিষক্রিয়ার ফলে মৃত্যু হয়েছে কুরীর। দেহটা তাঁর তেজস্ক্রিয় হয়ে কয়েক ডজন গুলী-খাওয়া শহীদের মত ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

বিরামহীন সংগ্রাম শেষ হলো। রণক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরে গেল অক্লান্ত যোদ্ধা সকল যোদ্ধার বাঞ্ছিত ধামে।

রেখা দাস

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত "মাদাম কুরী ও তাঁর অবদান" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। জীবাণু মানুষের জীবনকে কি ভাবে প্রভাবিত করে?

কণা বসু, শ্যামল বসু, অনুশ্রী দে
হুগলী।

উঃ ১। আমাদের চারপাশে জলে, স্থলে, বাতাসে সর্বত্রই জীবাণু অবস্থান করছে। এই সব জীবাণু আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করবার ব্যাপারে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আছে। জীবাণু আকারে এত ক্ষুদ্র যে, খালি চোখে এদের দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চোখে ধরা পড়ে। কোন কোন জীবাণুর প্রভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই আবার কোন কোন জীবাণু আমাদের উপকারও করে।

আমাদের মত জীবাণুরও বেঁচে থাকবার জন্যে বায়ু, উত্তাপ, খাদ্য, জল বা আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। জীবাণু আবার বায়ু ছাড়াও বাঁচতে পারে। এই সব জীবাণুর মধ্যে কেউ কেউ জীবন্ত প্রাণীর দেহ থেকে খাদ্য আহরণ করে, আবার কেউ কেউ মৃত প্রাণীর শরীরের উপরই নির্ভর করে।

চোখ, মুখ, নাক কান অথবা দেহের কোন ক্ষত স্থানের মাধ্যমে এরা আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং দেহ থেকে প্রয়োজনমত খাদ্যদ্রব্যও গ্রহণ করে। যে সব জীবাণু দেহের মধ্যে গিয়ে রোগের সৃষ্টি করে, আজকাল টিকা ও বিভিন্ন ওষুধের সাহায্যে তাদের ধ্বংস করবার উপযুক্ত অনেক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

কোন কোন জীবাণু অধিক উত্তাপে আবার কোন কোন জীবাণু নিম্ন তাপ-মাত্রায় নষ্ট হয়ে যায়। সূর্যের তাপ জীবাণু ধ্বংস করতে সাহায্য করে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জীবাণুর ক্রিয়ার প্রভাব অনবরতই দেখতে পাই। জীবাণুর ক্রিয়াতেই দৈ, পাউরুটি ইত্যাদি তৈরি হয়। খাদ্যদ্রব্য যে পচে অথবা নষ্ট হয়ে যায়, এর মূলে আছে জীবাণুর সক্রিয়তা। আঙ্গুরের রস থেকে যে মদ তৈরি হয়, দুর্গন্ধযুক্ত রেড়ীর তেল থেকে যে সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য তৈরি হয়, সেগুলি ঘটাবার কৃতিত্ব মানুষের নয়—কৃতিত্ব জীবাণুদেহে বর্তমান এনজাইমের।

আর্দ্র আবহাওয়ায় জীবাণুর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এই কারণে খাদ্যদ্রব্যকে শুষ্ক আবহাওয়ায় রাখলে সেগুলি অধিক দিন অবিকৃত থাকে, অর্থাৎ জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ সংযত বা ধ্বংস করতে পারলেই খাদ্যদ্রব্য অনেক দিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে অবিকৃত অবস্থায় খাদ্যদ্রব্যকে দেশ-বিদেশে পাঠানো সম্ভব হয়। জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ সংযত করবার জন্যে খাদ্যদ্রব্যকে জীবাণু-মুক্ত ও বায়ুরোধক পাত্রে রাখতে হয়। শোনা যায়, ১৮৬২ সালে লুই পাস্তুর গোমাংসের ঝোল এরকম ভাবে রেখেছিলেন এবং ১৯৩৫ সালে সেই পাত্র খুলে দেখা গেল যে, ঐ পাত্রের ঝোল অবিকৃত আছে। খাবার গরম করে জীবাণুমুক্ত করে বায়ুরোধক পাত্রে রাখা হয়, ফলে জীবাণু খাবারের সংস্পর্শে আসতে পারে না।

অনেক শিল্পে উপকারী জীবাণু ব্যবহার করে বহু প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি করা হয়। কৃষিতেও জীবাণুর ক্রিয়াকলাপের সাহায্য নেওয়া হয়। খাদ্যদ্রব্যকে গরম করে হঠাৎ বেশী ঠাণ্ডা করলে বহু জীবাণু এই তাপ পরিবর্তন সহ্য করতে না পেরে মারা যায়।

দুধ ইত্যাদি তরল পদার্থকে জীবাণুমুক্ত করার জন্যে আজকাল পাস্তুরাইজ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে দুধকে ১৪৫° ফাঃ তাপমাত্রায় আধঘণ্টা গরম করে পরিষ্কার বোতলে ঢালা হয় ও বোতলের মুখ বন্ধ করে ৩২° ফাঃ তাপমাত্রায় রাখা হয়। ফলে বেশীর ভাগ জীবাণুই মারা যায় ও নিম্ন তাপমাত্রায় কিছু নিষ্ক্রিয় থাকে। তাছাড়া

কম তাপমাত্রায় জীবাণু বাড়তে পারে না। তাই আজকাল রেফ্রিজারেটর, হিমঘর প্রভৃতি তৈরি হয়েছে।

চিনির রস বা লবণ-জলে খাদ্যবস্তু অনেকটা অবিকৃত থাকে। সেই কারণে লেবুর আচার, মোরব্বা লবণাক্ত মাখন প্রভৃতি পচে যায় না। আমরা দেখি লবণ ব্যবহার করবার ফলে মাছ তাড়াতাড়ি পচে যায় না। এর কারণ, লবণ মাছের ভিতরকার জলীয় অংশ শোষণ করে। মাছের জলীয় অংশ কমে যাবার ফলে জীবাণুর সক্রিয়তা হ্রাস পায় এবং মাছকে বেশী সময় টাট্‌কা রাখা যায়।

জীবাণুর ক্রিয়াকলাপের জন্যেই জীবজন্তুর মৃতদেহ, গাছপালা বিশ্লিষ্ট হয়ে মূল পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তা না হলে সঞ্চিত মৃতদেহের জন্যে পৃথিবীতে বাস করা সম্ভব হতো না।

জৈব সার উৎপাদনের ক্ষেত্রেও জীবাণুর বেশ ভূমিকা আছে। জীবাণুর ক্রিয়াতেই আশেপাশের আবর্জনা জৈব সারে পরিণত হয়। কিছু কিছু জীবাণু বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে, যা অনেক গাছের ফলন বাড়াতে সাহায্য করে। বর্তমানে জীবাণু থেকে নানা প্রকার ওষুধ তৈরি করা হয়। মাটির মধ্যে যে সব জীবাণু থাকে, তাদের মধ্যে এক এক ধরণের জীবাণু এক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে। এই জাতীয় কিছু রাসায়নিক পদার্থ থেকে মূল্যবান ওষুধ তৈরি হয়।

যে মাটিতে ঐ বিশেষ জীবাণু দেখা যায়, তার খানিকটা জলে গুলে অ্যাগার (এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ) মাধ্যমে মেশানো হয়। এই পদ্ধতিতে হিতকারী জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং যে সব জীবাণু আমাদের ক্ষতি করে, তাদের সংখ্যা হ্রাস বা ধ্বংস করবার জন্যে এক প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক দ্রব্য উৎপাদিত হয়ে থাকে। এই অ্যান্টিবায়োটিক দ্রব্যগুলিকে রাসায়নিক পদ্ধতিকে পৃথক করে নিয়ে কাজে লাগানো হয়। এই উপায়ে পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইত্যাদি অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থ তৈরি হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জীবাণু মানুষের জীবনকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে।

শ্রীশ্যামসুন্দর দে

বিবিধ

'মাদাম কুরী ও তাঁর অবদান' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল

মাদাম কুরীর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে 'মাদাম কুরী ও তাঁর অবদান' শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল তাতে নিম্নোক্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ পুরস্কার লাভ করেছেন :—

প্রথম পুরস্কার—শ্রীরেখা দাস, মণিমালা বালিকা বিদ্যালয়, আসানসোল।

দ্বিতীয় পুরস্কার—শ্রীনীতা বসু, বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা।

বিশেষ উৎকর্ষ পুরস্কার :—

(ক) শ্রীকৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিমালা বালিকা বিদ্যালয়, আসানসোল।

(খ) শ্রীশিশিরকুমার দাস, ভারতী বয়েজ হাই স্কুল, কলিকাতা।

(গ) শ্রীপ্রদীপ ঘোষ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ।

(ঘ) শ্রীঅনিলকুমার সাহা, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ।

(ঙ) শ্রীপ্রণবকুমার ঘোষাল, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ।

প্রবন্ধগুলি বিচার করেন অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, অধ্যাপক মৃণালকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীপঙ্কজনারায়ণ রায়।

পরলোকে ডাঃ কালিদাস মিত্র

জগদীশ বসু জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিভা অনুসন্ধান প্রকল্পের প্রথম ডিরেক্টর ডাঃ কালিদাস মিত্র ১৬ই মে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৬৮ বছর বয়স হয়েছিল।

ডাঃ মিত্র প্রথম জীবনে উচ্চ সরকারী পদে আসীন ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রণালয়ে পুষ্টিবিষয়ক অধিকর্তা হন। ১৯৫২ সালে তিনি ফিলিপাইন ও ব্যাঙ্কে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক চালের ভিটামিন গবেষণা বিষয়ক চারজন সদস্যবিশিষ্ট কমিটির সভ্য হন। তিনি ১৯৬১ সালে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ডস ইনষ্টিটিউশনের ফেলো হন। ১৯৫৮ সালে ডাঃ মিত্র 'সায়েন্স ও কালচার' নামক পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর হন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ছিলেন।

পরলোকে ডক্টর দ্বিজেন্দ্রবিনোদ সিংহ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ফলিত পদার্থ-বিজ্ঞানের রীডার ডক্টর দ্বিজেন্দ্রবিনোদ সিংহ ২১শে মে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৫৬ বছর বয়স হয়েছিল।

ডক্টর সিংহের শিক্ষকতার জীবন সুরু হয় ১৯৩৫ সালে আশুতোষ কলেজের লেক্‌চারার হিসাবে। ১৯৪৫ সালে তিনি লেক্‌চারার হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

স্কুল-ফাইন্যাল থেকে বি. এস-সি. অনার্স পর্যন্ত তাঁর অনেকগুলি বই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে বিশেষ সমাদৃত।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। অরুণকুমার রায়চৌধুরী
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

২। শ্রীসত্যনারায়ণ চংদার
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

৩। পুষ্প মুখোপাধ্যায়
৩১।৬, ব্রড স্ট্রীট
কলিকাতা-১৯

৪। মিহিরকুমার কুণ্ডু
৯১।এ, ডি. জে. রোড
নন্দন কানন
পোঃ ভদ্রকালী
হুগলী

৫। শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
১।৬৮, আজাদগড়
কলিকাতা-৪০

৬। রণধীর দেবনাথ
আচার্য প্রফুল্ল নগর
পোঃ কল্যাণ গড়
২৪ পরগণা

৭। রেখা দাস
মণিমালা মহাবিদ্যালয়
আসানসোল
বর্দ্ধমান

৮। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ ;
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একবিংশ বর্ষ | জুলাই, ১৯৬৮ | সপ্তম সংখ্যা

দেহের পুষ্টিসাধনে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

দিলীপকুমার চক্রবর্তী

দেহকে সুস্থ ও সবলভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টির বিশেষ প্রয়োজন। অবিরাম ব্যবহারের ফলে দেহের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়, তাহা পূরণ করিবার জন্য, দেহে তাপ ও শক্তি সৃষ্টির জন্য এবং দেহের পুষ্টিসাধনের জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন। আমাদের ও জীবের দেহকে এক বিচিত্র রসায়নাগার বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রতিদিন আমরা যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি, দেহের রসায়নাগারে সেই খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং নানা পর্যায়ে নানারকম জৈব পদার্থ গঠিত হয়। অবশেষে আমাদের খাদ্যের (১) একাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলে পরিণত হইয়া আমাদের দেহে তাপ ও শক্তি সঞ্চার করে, (২) একাংশ দেহকোষের গঠন ও পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে, (৩) একাংশ দেহে চর্বিরূপে সঞ্চিত থাকে এবং দেহের খাদ্যের প্রয়োজন হইলে দেহ হইতেই সরবরাহ করে। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা অসার ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থ হিসাবে মলমূত্র ও ঘর্মরূপে দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়।

দেহ-রক্ষা ও পুষ্টির জন্য উদ্ভিদের দেহে জল, অঙ্গার, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও তৈল—এই সব খাদ্য পাওয়া যায়। আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় জল ও অঙ্গার খাদ্য প্রস্তুত করে। এই জল ও অঙ্গার খাদ্য হইতেই নানাবিধ রাসায়নিক উপায়ে উদ্ভিদ অন্যান্য খাদ্যগুলি প্রস্তুত করে। খাদ্য সাধারণতঃ দুই অবস্থায় উদ্ভিদের মধ্যে থাকে। প্রথম অবস্থায় খাদ্য তরলভাবে

উদ্ভিদের মধ্যে থাকে। তরল খাদ্য সহজেই উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে প্রবাহিত হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় খাদ্য কঠিনভাবে উদ্ভিদের বিবিধ কলা ও কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। এইরূপে কঠিন খাদ্যদ্রব্যগুলি উদ্ভিদের ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকে।

প্রাণীর খাদ্যদ্রব্যের মূল পদার্থরূপে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর জৈব পদার্থ, তথা যৌগের প্রয়োজন। যথা—(১) দেহের তাপ ও শক্তি সঞ্চারের জন্য খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয় জল, অঙ্গার ও স্নেহ-পদার্থ। (২) দেহবর্ধন, দেহের পুষ্টিসাধন ও দেহের ক্ষয় পূরণের জন্য প্রোটিন ও খনিজ লবণ ব্যবহার করা হয়। (৩) দেহ সংরক্ষণের সহায়করূপে ভিটামিন এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সহায়ক খাদ্য-রূপে ভিটামিন এবং (৪) রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সহায়ক খাদ্যরূপে জল ও অক্সিজেন ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর জৈব যৌগের মধ্যে জল, অঙ্গার, প্রোটিন ও স্নেহপদার্থই মূল খাদ্য-পদার্থ। প্রাণীকে তাই জৈব যৌগরূপে জল, অঙ্গার, প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ প্রতিদিন আহার্য দ্রব্যের সঙ্গে গ্রহণ করিতে হয়। আমরা যে জল ও অঙ্গার খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, তাহা প্রধানতঃ চিনি, ষ্টার্চ ও সেলুলোজ জাতীয় জল ও অঙ্গার। এই সমস্ত চিনি ও ষ্টার্চ জাতীয় জল ও অঙ্গার দেহের অভ্যন্তরে আর্দ্রবিশ্লেষিত হইয়া গ্লুকোজে পরিণত হয়। এই গ্লুকোজ বিশ্লিষ্ট হইয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল প্রস্তুত হয় এবং প্রচুর তাপ-শক্তির সৃষ্টি হয়। জল ও অঙ্গারের সেলুলোজে কোন খাদ্যমূল্য নাই। স্নেহপদার্থ-গুলির মধ্যে তেল, ঘি, মাখন, বনস্পতি, নারিকেল তেল, সরিষার তেল, কডলিভার তেল, জৈব চর্বি উল্লেখযোগ্য। স্নেহপদার্থ তাপ সৃষ্টি করে এবং সংরক্ষিত খাদ্যরূপে দেহে সঞ্চিত থাকে। খাদ্যের অভাব ঘটিলে আমরা এই সঞ্চিত স্নেহপদার্থকেই খাদ্যরূপে গ্রহণ করি। তেমনি খাদ্যদ্রব্যরূপে যে প্রোটিন আমরা গ্রহণ করি, তাহা দেহাভ্যন্তরে আর্দ্রবিশ্লেষিত হইয়া এক শ্রেণীর জৈব অ্যাসিড গঠন করে, যাহাদের নাম• অ্যামিনো অ্যাসিড। এই অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রধান কাজ প্রাণিদেহের কোষ-গঠন ও পুষ্টিসাধন। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা প্রভৃতিতে প্রাণিজ প্রোটিন এবং মুশুর, মুগ, ছোলা প্রভৃতিতে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পাওয়া যায়।

খনিজ পদার্থগুলির মধ্যে আমাদের দেহে ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাস, আয়োডিন ও লোহার বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের দেহে রক্তপাত ঘটিলে ক্যালসিয়ামের উপস্থিতিতে উহা জমাট বাঁধে। দেখা গিয়াছে যে, দেহে ক্যালসিয়াম ও সোডিয়ামের অনুপাতের দ্বারা আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের দেহে যে ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন, তাহা আমরা শাকসব্জি, গাজর, দুধ, মাছ, ডিম প্রভৃতি হইতে মিটাইতে পারি। আবার দুধ, মাছ, ডিম, বাদাম এবং কড়াইশুঁটি ইত্যাদি হইতে আমরা দেহকোষ ও স্নায়ু গঠনের উপাদান ফস্ফরাস গ্রহণ করিতে পারি। আয়োডিন খুব অল্প পরিমাণে আমাদের দেহে প্রয়োজন। আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থিতে গলগণ্ড রোগ হয়। হিমালয় অঞ্চলের খাদ্যে আয়োডিনের অভাব আছে বলিয়া সেখানে এই রোগ হইতে দেখা যায়। কডলিভার তেল, রসুন ও শালগমের মধ্যে এবং ইহা ছাড়া সাধারণ লবণেও আয়োডিন পাওয়া যায়। ডিম, বাদাম, কোকো, সবুজ সব্জি, নারিকেল হইতে আমরা খাদ্যের সঙ্গে লোহা গ্রহণ করি। লোহার অভাবে রক্ত-স্বল্পতা ঘটে, দেহ জীর্ণ হইয়া যায়।

ভিটামিনের কোন খাদ্যমূল্য নাই। কিন্তু দেহের পুষ্টিসাধনের জন্য ও রোগ-ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমাদের দেহে ভিটামিনের

প্রয়োজন হয়। নানা প্রকার ভিটামিন আছে। ইহার মধ্যে ভিটামিন-এ আমাদের দেহের পুষ্টি-সাধন এবং দেহকে বিভিন্ন ব্যাধি হইতে রক্ষা করে। এই ভিটামিনের অভাবে চক্ষুরোগ, পায়োরিয়া, চর্মরোগ, এমন কি ক্ষয়রোগ ও অন্ত্র-প্রদাহের প্রাদুর্ভাব ঘটিতে পারে। মাখন, ডিমের হলুদ অংশ, কড মাছের তেল, ইলিশ মাছের তেল, টাটকা শাকসব্জি, বাঁধাকপি, পালং, টমাটো, বেগুন প্রভৃতি ভিটামিনের অভাব পূরণ করে। ভিটামিন-বি দেহকে পুষ্ট ও সতেজ করে। ইহার অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়। আকাঁড়া চাল, অঙ্কুরিত গম, মাছ, ডাল প্রভৃতি এই ভিটামিনের সহায়ক। ভিটামিন-সি-এর অভাব স্কার্ভি রোগের কারণ। ইহার অভাবে আমাদের দাঁতের গোড়া ফোলে, মাথা ধরে, রক্তপাত হয়। এই ভিটামিনের অভাব আমরা লেবু, টোম্যাটো, অঙ্কুরিত মুগ ও ছোলা, আমলকি প্রভৃতি হইতে মিটাইতে পারি। সূর্যালোকের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি চামড়ার উপর পড়িলে ভিটামিন-ডি প্রস্তুত হয়। ইহা দেহের পুষ্টি সাধন ও অস্থি গঠনের সহায়ক। কডলিভার ও হাঙ্গরের লিভার এবং করাত মাছের লিভারের তেলে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। ভিটামিন-ই-এর অভাব ঘটিলে প্রজনন-ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়। দুধ, মাংস ও শাক-সব্জি হইতে আমরা ভিটামিন-ই গ্রহণ করি। ভিটামিন-জি পুষ্টিসাধনে সহায়তা করে এবং ভিটামিন-কে রক্তপাত ঘটিলে রক্ত জমাইয়া রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। দুধ, ডিমে ভিটামিন-জি পাওয়া যায়। শাকসব্জিতে ভিটামিন-জি ও -কে—উভয়ই পাওয়া যায়। আমাদের দেহের প্রায় ৬০% জলীয় পদার্থে গঠিত। খাদ্য, লবণ ও ভিটামিনকে সমস্ত দেহে সঞ্চালিত করিতে এবং বিক্রিয়া ঘটাইতে জল সহায়তা করে এবং সমস্ত দেহকে বিধৌত করিয়া বহু দূষিত পদার্থ ঘাম ও মূত্রের সহিত দেহ হইতে নির্গত করিয়া দেয়। বায়ুর অক্সিজেন রক্তে সঞ্চালিত হইয়া আমাদের দেহে জীবন-ক্রিয়ার সহায়তা করে এবং বহু দূষিত গ্যাস নিঃশ্বাসরূপে দেহ হইতে নির্গত করিয়া দেয়।

আমাদের কয়েকটি প্রধান খাদ্যের জল, অঙ্গার, স্নেহ পদার্থ ও প্রোটিনের শতকরা পরিমাণ এবং উহাদের শক্তি যোগাইবার ক্ষমতা নিম্নে দেওয়া হইল।

খাদ্য	জল-অঙ্গার	স্নেহ পদার্থ	প্রোটিন	খনিজ	ক্যালসিয়াম ও ফস্ফরাস	লোহা মি.গ্রা/১০০ গ্রাম	ক্যালোরী মূল্য	ক্যালোরী প্রতি ১০০ গ্রাম
কলেছাটা সিদ্ধ চাউল	৭৯'১	৪'৪	৬'০	০'৪	'০১	'১৫	২'২	৩৪৬
গম (আটা)	৭২'২	১'৭	১২'১	১'৮	০'০৪	০'৩২	৭'২	৩৫৩
ডাল—মুশুর	৫৯'৭	০'৭	২৫'১	৪	০'১৩	০'২৫	২	৩৪৬
মুগ	৫৬'৬	১'১	১৯'৭	৪'৫	০'০৭	০'৬	৪'৪	৩১৫
আলু (৭৪%জল)	২২'৯	১'১	১'৬	০'৬	০'০১	০'০৩	০'৭	৯৯
বেগুন (৯২%জল)	৬'৪	০'৩	১'৩	০'৫	০'০২	০'০৬	১'৩	৩৪
মিঠা আলু (৬৮%জল)	৩৪	০'৩	১'২	১	০'০২	০'০৫	০'৮	১৩২
কাঁচা কলা (৮৩%জল)	১৪'৭	০'২	১'৪	১'৫	০'০১	০'০২	০'৬	৬৬
কুমড়া (৯২%জল)	৫'৩	০'১	১'৪	০'৬	০'০১	০'০৩	০'৭	২৮
ফুলকপি (৮৯%জল)	৫'৩	০'৪	৩'৫	১.৪	০'০৩	০'০৬	১'৩	৩১

খাদ্য	জল-অঙ্গার	স্নেহ পদার্থ	প্রোটিন	খনিজ	ক্যালসিয়াম ও ফস্ফরাস	লোহা মি.গ্রা./১০০ গ্রাম	ক্যালোরী মূল্য	ক্যালোরী প্রতি ১০০ গ্রাম
বাঁধাকপি (৯০%জল)	৬'৩	০'১	১'৮	০'৬	০'০৩	০'৮৫	০'৪	৩৩
পেঁয়াজ (৮৪%জল)	১৩'২	০'১	১'৮	০'৬	০'০৪	০'০৬	১'২	৬১.
টোম্যাটো (৯২%জল)	৪'৫	০'১	১'৯	০'৭	০'১২	০'০৪	২'৪	২৭
নারিকেল (৩৬'৩%জল)	১'৩	৪১	৪'৫	১	০'০১	০'২৪	১'৭	৪৪৪
বাদাম (৫%জল)	১০৫	৫৮'৯	২০'৮	২'৯	০'২৩	০'৪৯	৩'৫	৬৫৫
কলা (পাকা ৬১%জল)	৩৯'৪	০'২	১'৩	০'৭	০'০১	০'০৫	০'৪	১৫৩
লেবু (৮৫%জল)	১১'১	০'৯	০'১	০'৩	০'০৭	০'১০	২'৩	৫৭
কমলা লেবু (৮৭%জল)	১০'৬	০'৩	০'৭	০'৪	০'০৫	০'০২	০.১	৪৯
হাঁসের ডিম (৭১%জল)	০'৭	১৩'৬	১৩'৫	০'১	০.০৭	০'২৬	৩	১৮০
পাঁঠার মাংস (৭১%জল)	০'৫	১৩'৩	১৮'৫	১'৩	০'১৫	০'১৫	৩'৫	১৯৪
মাঝারি মাছ (৭৮%জল)	১'২	১'৬	২১'৫	০'২	০'০৬	০'৪১	২'৩	১০০
মুরগীর মাংস (৭২%জল)	০'৩	০'৬	২৫'৬	১'৩	০'০৩	০'২৫	—	১০৯
গরুর দুধ (৮৭'৬%জল)	৪'৮	৩'৬	৩'৩	০'৭	০'১২	০'০৯	০'২	৬৫

কোন খাদ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় সেই খাদ্যের তাপ সৃষ্টির ক্ষমতার দ্বারা। খাদ্যদ্রব্যের ওজন মাপা হয় পাউণ্ড বা কিলো হিসাবে। সেরূপ খাদ্য কত পরিমাণ তাপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম, সেই তাপমাত্রা মাপা হয় ক্যালোরী হিসাবে। খাদ্যের গুরুত্ব খাদ্যের ওজনের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তাপ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতার উপর। তাই খাদ্যের মাত্রা মাপা হয় ক্যালোরী হিসাবে। খাদ্যের পরিমাণ বয়স ও বৃত্তির উপর নির্ভর করে। কোন বৃত্তির লোকের জন্য কত পরিমাণ তাপ সৃষ্টিকারী খাদ্যের প্রয়োজন, তাহার তালিকা হইতে দেখা যায়:

(১) পুরুষ ১২০ পাউণ্ড ওজন:

লঘু শ্রম	মধ্যম শ্রম	কঠোর শ্রম
২৪০০ ক্যালোরী	৩০০০ ,,	৩৬০০ ,,

(২) নারী: ১০০ পাউণ্ড ওজন:

লঘুশ্রম	মধ্যম শ্রম	কঠোর শ্রম
২১০০ ক্যালোরী	২৫০০ ,,	৩০০০ ,,

(৩) বালক: ১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়স: ২৪০০ ক্যালোরী

তরুণ: ১৫ হইতে ২১ বৎসর বয়স: ২৪০০ ,,

সুষম খাদ্যের কোন নির্দিষ্ট তালিকা রচনা করা সম্ভব নয়। এইরূপ তালিকা বিভিন্ন দেশের খাদ্যের রুচি ও খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করে।

কৃষি-বিপ্লব, না দেশের বিপর্যয় ?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত ৬ই এপ্রিল তারিখের Statesman পত্রিকায় পশ্চিম বঙ্গের কৃষি বিভাগের একটি পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল Brash Programme। এই পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম বঙ্গে অতিরিক্ত বিশ লক্ষ টন তৃণজাতীয় শস্য, দশ লক্ষ ৬৫ হাজার টন ধান এবং তিন লক্ষ ৫০ হাজার টন গম ও ভুট্টা উৎপাদন করা হইবে এবং ইহার দ্বারা দুই বৎসরের মধ্যেই পশ্চিম বঙ্গকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যাইবে।

কৃষি বিভাগের কমিশনার শ্রী এম. সি. মুখার্জি এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলেন যে, ইহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে অতিরিক্ত ৪ লক্ষ একর জমিতে সারা বৎসরব্যাপী জল সেচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সেচ এলাকায় অধিকতর ফলনশীল শস্য বপন করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন, জল সেচনের ব্যবস্থার জন্য ৪০,০০০ অগভীর নলকূপ খনন করা হইবে। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে ৪০ কোটি টাকার বেশী খরচ পড়িবে এবং ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন শাখা হইতে ৩০ কোটি টাকা ঋণস্বরূপ পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক নলকূপের সাহায্যে ১০ একর জমিতে জল সেচন করা যাইবে এবং প্রত্যেকটি নলকূপ খনন করিতে ৫,০০০ টাকা খরচ পড়িবে। যে সকল কৃষকের ন্যূনপক্ষে ৫ একর জমি আছে, তাঁহাদিগকে কৃষি সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে এই ৫ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হইবে। তিনি বলেন, খাদ্যে ঘাটতি অঞ্চলেই এই পরিকল্পনা চালু করা হইবে এবং ইতিপূর্বেই নদীয়া জেলার কৃষকদিগের নিকট হইতে ঋণের জন্য ১,৩০০ দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, কৃষকগণ ঋণ পাইলেই সরকার হইতে কূপ খননের সকল রকম ব্যবস্থা করা হইবে।

শ্রী মুখার্জি আরও বলেন যে, ১৯৬৯ সালে পশ্চিম বঙ্গের লোকসংখ্যা বাড়িয়া ৪ কোটিতে দাঁড়াইতে পারে। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক চাউল আহারের পরিমাণ ১৪.৪৩ আউন্স হইলে ১৯৬৯-৭০ সালের শেষে পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসিগণের জন্য ৬০ লক্ষ টন ধান জাতীয় শস্যের প্রয়োজন হইবে। ইহাতে বীজ অপচয় ইত্যাদির জন্য শতকরা ১০ ভাগ যোগ দিলে পশ্চিম বঙ্গের মোট প্রয়োজন হইবে ৬০ লক্ষ ৬০ হাজার টন ধানজাতীয় শস্য। তিনি হিসাবের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গে গড়পড়তা প্রত্যেক বৎসর ধান জাতীয় শস্যের উৎপাদন (ধানের) মোটামুটি ৫০ লক্ষ টন। সুতরাং অতিরিক্ত ২০ লক্ষ টন ধান উৎপাদন করিতে পারিলেই পশ্চিম বঙ্গকে চাউল সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যাইবে। পাঠকগণ দেখিবেন এই পরিকল্পনাটির মধ্যে অনেকগুলি 'যদি' আছে। এই সকল 'যদির' যদি সমাধান বা সমন্বয় করা যায় তাহা হইলেই এই পরিকল্পনা বাস্তব রূপ ধারণ করিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা গত কুড়ি বৎসর পশ্চিম বঙ্গের কৃষি বিভাগের পরিকল্পনাসমূহের সহিত উহাদের ব্যর্থতা সম্বন্ধে একটুও ওয়াকিবহাল আছেন, তাঁহাদের মনে এই পরিকল্পনাও ঘোরতর সন্দেহের সৃষ্টি করিবে। আমরা আশা করি বর্তমান কৃষি কমিশনার শ্রী মুখার্জি এই বারে এই সন্দেহের অবসান ঘটাইবেন।

পরিকল্পনাটি যে চালু হইয়া গিয়াছে, তাহার

কতকটা বিবরণ আমরা ১৪ই মে-র Statesman পত্রিকায় জানিয়াছি। বিবরণটি এইরূপ: ২৪ পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গায় অগভীর নলকূপ খনন পরিকল্পনার উদ্বোধন সভায় পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর এই পরিকল্পনাকে Agricultural revolution অর্থাৎ কৃষি-বিপ্লব আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি খাঁটি সত্য কথা বলিয়াছেন। সেই সত্য কথাটি এই যে, গত কুড়ি বৎসর কৃষিকে অবহেলা করা হইয়াছে. ইহার ফলে পশ্চিম বঙ্গকে খাদ্য সম্বন্ধে দীর্ঘকাল একেবারে ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত করা হইয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীবৃন্দকে খাওয়াইবার জন্য অন্যান্য অঞ্চলের উপরে নির্ভর করিতে হইয়াছে। তিনি আরও বলেন পাঞ্জাবে যেখানে শুষ্ক আবহাওয়া, সেখানে আবাদী জমির শতকরা ৫০ ভাগে জল সেচনের সুবিধা আছে, অথচ পশ্চিম বঙ্গে, যাহা পাঞ্জাবের মত শুষ্ক নহে, সেখানে আবাদী জমির শতকরা ২৫ ভাগেও জল সেচনের সুব্যবস্থা নাই। অনেকেই রাষ্ট্রপালের উপরিউক্ত উক্তি সমর্থন করিবেন। আবার অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই কুড়ি বৎসরে কৃষি বিভাগ কৃষির উন্নতি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে অজস্র অর্থ ব্যয় করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য আমদানীর জন্য যে রাশি রাশি টাকা খরচ হইল তাহার জন্য দায়ী কে? উত্তরে অনেকেই বলিবেন, গৌরী সেনের টাকার কোন হিসাবের দরকার নাই।

এখন শুনুন যে পরিকল্পনাকে রাষ্ট্রপাল মহাশয় Agricultural Revolution (কৃষি-বিপ্লব) আখ্যা দিয়াছেন, তাহা কিভাবে দেশকে আরও বিপর্যয়ের পথে টানিয়া লইয়া যাইবে। ইহা রাম, শ্যাম, হরির কথা নয়। ইহা Geological Survey of India-র (কেন্দ্রীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের) কথা।

গত ২৭শে মে তারিখের Statesman পত্রিকায় বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে যে, Shallow Tube Well Scheme may prove disastrous, অর্থাৎ অগভীর নলকূপ পরিকল্পনা বিপর্যয়ে পরিণত হইতে পারে! এই বিষয়ে Geological Survey of India-র (কেন্দ্রীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের) মন্তব্য এই—পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ৪০,০০০ অগভীর নলকূপ খনন পরিকল্পনা technically অর্থাৎ যান্ত্রিক দিক হইতে ধ্বংসাত্মক। Economically অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিক হইতে unfeasible, অর্থাৎ সাধ্যাতীত এবং অবশেষে disastrous অর্থাৎ বিপর্যয়সঙ্কুল হইবে। প্রথমেই এই কয়টি কথা বলিয়া তাঁহারা পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, যদি মাটির নিম্ন ভূমি হইতে নলকূপ খনন করিয়া জল উপরে আনিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক কূপ অন্ততঃ ৩০০ ফুট গভীর হওয়া দরকার। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পরিকল্পনাতে ১০০ ফুট গভীর নলকূপ খননের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা করিলে প্রথম স্তরের জল কমিয়া যাইবে এবং ইহার ফলে চতুর্দিকের পুকুর, ডোবা, কূপ ইত্যাদি সম্পূর্ণ শুকাইয়া যাইবে এবং অবশেষে স্থানীয় গাছপালার বর্ধন আক্রান্ত হইবে। বিহার ও উত্তর প্রদেশের উদাহরণ দিয়া তাঁহারা বলেন—এই দুই প্রদেশে অগভীর নলকূপের সাহায্যে জল উত্তোলন করিয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেখানে এই সকল অগভীর নলকূপ ৩৫০ ফুট গভীর করা হইবে। তাঁহাদের মতে, ইহা অধিকতর সমীচীন হইয়াছে। বিহার এবং উত্তর প্রদেশ কেন্দ্রীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অগভীর নলকূপ খনন পরিকল্পনার কাজ সম্পন্ন করিতেছেন। বিহারে ১২,০০০ নলকূপ খনন করা হইবে এবং প্রত্যেক নলকূপ অন্ততঃ ৩৫০ ফুট গভীর হইবে এবং জল তুলিবার জন্য প্রত্যেকের সহিত জেট

পাম্প থাকিবে। ইহা ছাড়া আরও উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম থাকিবে—যেমন ৪ ইঞ্চি পরিধির পাইপ ইত্যাদি।

গত ১৫ বৎসর ধরিয়া ভূতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ পশ্চিম বঙ্গের নিম্ন ভূমির জলস্তর নির্ধারণে নিযুক্ত আছেন এবং এই সম্বন্ধে তাঁহারা একটি নক্সা প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রথম অবস্থায় পশ্চিম বঙ্গে যে ১৫০০ গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছিল, তাহার সহিত ভূতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ জড়িত ছিলেন। এই ১৫০০ গভীর নলকূপের মধ্যে সকল নলকূপ এখন কেজো বা চালু নাই। ইহার জন্ম অকেজো বা অচালু নলকূপগুলি দায়ী নহে; ইহার জন্ম দায়ী পশ্চিম বঙ্গের সরকার, তাঁহারা উপযুক্ত বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিতে পারেন নাই এবং জল লইয়া যাইবার জন্ম মাঠে মাঠে চ্যানেল বা নালা খনন করিতে পারেন নাই।

পরিশেষে কেন্দ্রীয় ভূতত্ত্ব বিভাগ অতি দুঃখের সহিত বলিতেছেন, এইবারে অগভীর নলকূপ খনন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার সময় পশ্চিম বঙ্গ সরকার তাঁহাদের সহিত কোন পরামর্শ করেন নাই। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান অধিকর্তা (যিনি পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহের জন্ম দায়ী) বর্তমান অগভীর নলকূপের পরিকল্পনাটি ভূতত্ত্ব বিভাগে তাঁহাদের মন্তব্যের জন্ম পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ভূতত্ত্ব বিভাগ তাঁহাদের কঠোর বিরুদ্ধ মন্তব্যসহ উহা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদের কঠোর মন্তব্য এবং পরিকল্পনাটির আমূল পরিবর্তনের পরামর্শ পশ্চিম বঙ্গ সরকার গ্রহণ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, কৃষি বিভাগ তাঁহাদের নিজেদের বিশেষজ্ঞগণের মতামতেরও কোন মূল্য দেন নাই। উক্ত বিভাগের একজন জল সেচনের প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ার বলিয়াছেন যে, গৃহস্থদিগের বাড়ীতে নলকূপ খননের জন্ম টালিগঞ্জ এলাকার অনেক পুকুর এবং কূপ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

ভূতত্ত্ব বিভাগ পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে অতি দৃঢ়ভাবে জানাইয়াছেন যে, বিষয়টি অতি গুরুতর এবং এই অগভীর নলকূপ খনন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে ইহার যান্ত্রিক দিক এবং অর্থনৈতিক দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা একান্ত দরকার। তাঁহারা ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরের জলের অবস্থা নিরূপণ করিবার কথাও বলিয়াছেন।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে অনায়াসেই বুঝতে পারা যাইবে যে, পূর্বের মত এখনও পশ্চিম বঙ্গের কৃষি বিভাগের সহিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগসমূহের কোন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নাই। পূর্বের মত এখনও কোন সামগ্রিক বা অখণ্ড পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে না; সবই এলোমেলো ভাবে হইতেছে। গদীতে যিনি বসেন তিনি একাই সবজান্তা হন, বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শের ধার ধারেন না। পরিশেষে আবার বলিতেছি ইহাকে গৌরী সেনের টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবধান বাণী যদি সত্যে পরিণত হয়, তবে যে বিপুল অর্থের অপচয় হইবে, তাহার জন্ম দায়ী হইবে কে ?

কম্পিউটার

শ্রীতপনকুমার সরকার

কম্পিউটার আজকের যুগের একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। যেখানেই সূক্ষ্ম, জটিল, বৃহৎ আকারের কোন হিসাব করা দরকার, সেখানেই ডাক পড়ে কম্পিউটারের, আর সে তা নির্ভুলভাবে আশ্চর্য দ্রুতগতিতে করে দেয়। কম্পিউটার যন্ত্রটির এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে মনে করা স্বাভাবিক যে, তার নিজস্ব চিন্তাশক্তি বা অলৌকিক কোন শক্তি আছে। আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। মনে রাখতে হবে, কম্পিউটার একটি মানুষের আজ্ঞাবহ বৈদ্যুতিক যন্ত্র মাত্র। কম্পিউটার শুধু হিসাব করতেই ব্যবহৃত হয় না—আবহাওয়া অফিসে আবহাওয়া এবং ডাক্তারখানায় রোগ নির্ধারণ, এমন কি অনুবাদ ইত্যাদি কাজেও ব্যবহার করা হয়।

কম্পিউটারের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের আজকে হলেও এর পরিকল্পনা কিন্তু বহু দিনের। অনেক দিন আগেও যন্ত্রের সাহায্যে হিসাব করা যায় কি না, সে কথা মানুষ ভেবেছে। এমন কি, খৃষ্টপূর্ব ৪৫০ বছর আগেও এরকম একটি যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল। যন্ত্রটির নাম অ্যাবাকাস। এই সরল যন্ত্রটি আজকের দিনে শিশুরা অঙ্ক শিক্ষার জন্যে ব্যবহার করে। এটি কতকগুলি বলের সমন্বয়ে তৈরি। প্রায়ই শ্লেটের সঙ্গে যন্ত্রটিকে লাগানো দেখা যায়। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে প্যাস্কেল, লাইব্‌নিৎজ্‌ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা উন্নত ধরণের গণনা-যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন। তারও পরে চার্লস ব্যাবেজ নামে একজন ভদ্রলোক তাঁর পরিকল্পনায় গণনা-যন্ত্র সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেন। তবে তাঁর পরিকল্পনা অনেকাংশে কাগজে-কলমেই ছিল। তাঁর যন্ত্রের কিছু তৈরি হয়েছিল, কিছু তৈরি হয় নি। এটুকু মনে রাখা দরকার, এত যে সব গণনা-যন্ত্রের পরিকল্পনা আগে হয়েছিল, সেগুলির কোনটাই বিদ্যুৎ-চালিত নয়। সবগুলি অবৈদ্যুতিক। কম্পিউটারের সত্যকারের প্রকাশ কবে হয়েছে বলতে গেলে বলতে হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এর যে ব্যবহার একেবারেই হয় নি, তা নয়।

কম্পিউটার বলতে সাধারণতঃ দুই রকম বোঝায়। এক অ্যানালগ (Analogue) বা সাদৃশ্যাত্মক আর এক ডিজিটাল (Digital) বা সংখ্যাত্মক। কম্পিউটার বলতে এক্ষেত্রে আমরা ডিজিটালই বুঝবো।

আগেই বলা হয়েছে, কম্পিউটারের কাজ সূক্ষ্ম জটিল বড় বড় সব হিসাব খুব তাড়াতাড়ি নির্ভুলভাবে করে দেওয়া। তার আগে একটি ছোট অঙ্ক ধরা যাক। কোন ভদ্রলোকের ব্যাঙ্কে ২০০০ টাকা আছে। যদি বছরে শতকরা ৫ টাকা হারে সুদ হয়, তবে চক্রবৃদ্ধির নিয়ম অনুসারে ৩ বছরে ঐ টাকার সুদ কত হবে? চক্রবৃদ্ধি নিয়ম অনুসারে মূলধন প্রতি বছরের সুদের টাকার সমান বেড়ে যাবে। যেমন—প্রথম বছরের সুদ ১০০ টাকা। অতএব দ্বিতীয় বছরের মূলধন ২১০০ টাকা। এই ভাবে অঙ্কটির উত্তর বের করতে হবে। কম্পিউটারকে দিয়ে করাবার আগে দেখা যাক, ঐ অঙ্কটা আমরা কি ভাবে করি এবং করবার জন্যে কি কি প্রয়োজন।

প্রথমতঃ প্রয়োজনীয় তথ্য বা Data বা

দেওয়া আছে, সেগুলিকে জেনে নেওয়া দরকার। ঐ অঙ্কটির বেলায় সেগুলি হলো—

ব্যাঙ্কের টাকা — ২০০০
বার্ষিক সুদ — ৫%
নিয়ম — চক্রবৃদ্ধি

সঙ্গে সঙ্গে ধাপগুলি (Steps) ঠিক করে নিতে হবে অর্থাৎ কোন্ কাজটির পর কোন্টি করতে হবে। যেমন ঐ অঙ্কটিতে প্রথমে বের করতে হবে প্রথম বছরের সুদ। সেই সুদের অঙ্ককে যোগ দিতে হবে মূলধনের সঙ্গে, তারপর আবার সেই অঙ্ককে মূলধন ধরে সুদ বের ক'রতে হবে—ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ করবার ক্ষমতা, এই ক্ষমতা আমরা পাই শিশুকালে। যখন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করতে শিখি। তারপর অঙ্ক পেলে তাকে ধাপের পর ধাপ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ—যা করবার করি। এই করবার ক্ষমতা অঙ্ক কষবার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রয়োজনীয়।

তৃতীয়তঃ উত্তর প্রকাশ। যে অঙ্কই হোক না কেন, তার একটি উত্তর শেষে আসে এবং এটাই প্রশ্ন অথবা Problem-এর মূল উদ্দেশ্য।

এখন কোন একটি যন্ত্রকে যদি এই ক্ষমতাগুলি দেওয়া যায়, তবে সেও ঐ রকম অঙ্ক কষে দেবার ক্ষমতা পাবে।

অঙ্ক-কষা কম্পিউটারকেও তাই ঐ ক্ষমতাগুলি দিতে হয় এবং কম্পিউটারের ঐ ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রগুলি একের পর এক কাজ করে উত্তর বের করে দেয়। এখন তাহলে কম্পিউটারের সঙ্গে মানুষের তফাৎ কোথায়—অন্ততঃ অঙ্ক কষবার ক্ষমতার দিক দিয়ে? আছে। উদাহরণ হিসাবে যে অঙ্কটি দেওয়া হয়েছে, সেটি তো নিতান্ত সোজা ছোট একটা অঙ্ক। কিন্তু যদি কোন ভদ্রলোকের একটা বিদ্ঘুটে রকমের টাকার অঙ্ক থাকে, যেমন — ৯৫৫৩৭ টাকা ৩৯ পয়সা। আর এরকম ভদ্রলোক যদি হাজার হাজার থাকেন, তবে তাঁদের সুদের হিসাব রাখা মানুষের কাজ নয়। প্রথমতঃ ভুল হতে পারে, দ্বিতীয়তঃ এটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স অফিস, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি জায়গায় ঐ রকম হাজার হাজার বিদ্ঘুটে অঙ্ক কষতে হয়। ঐ জায়গায়ই ডাক পড়ে কম্পিউটারের—কেন না, মানুষের ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলি আছে, সেগুলি তার নেই। সে কাজ করে অসম্ভব দ্রুতগতিতে এবং নির্ভুলভাবে।

কম্পিউটারে তার অঙ্ক কষবার কাজগুলি করে, অঙ্ক কষবার জন্যে আলাদা আলাদা যন্ত্র।

প্রথমতঃ কম্পিউটারে থাকে প্রবেশ যন্ত্র—কম্পিউটারের প্রথম যন্ত্র বলতে এই প্রবেশ যন্ত্রের নাম করতে হয়।

কোন একটি অঙ্ক কষবার আগে আমরা প্রথমেই পড়ে দেখে নিই অঙ্কটা আসলে কি? তেমনি কম্পিউটারকেও অঙ্কটি কষতে দেবার আগে তাকে বোঝানো প্রয়োজন, অঙ্কটা কি বলতে চায়, আমরা না হয় পড়েই বুঝতে পারি, কিন্তু কম্পিউটার তো আর মানুষের ভাষা বোঝে না! কিন্তু মানুষের ভাষা না জানলেও সে তার নিজের ভাষাটি জানে। কাজেই আমাদের প্রথম প্রয়োজন, যে অঙ্কটা কম্পিউটারকে দেওয়া হবে সেটা কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তরিত করে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া। টেলিগ্রাফের ভাষা বলতে আমরা যেমন টরে-টক্কা বুঝি, অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দকে বিভিন্ন পরিষ্কার শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করে মানুষের বোধগম্য ভাষাতে রূপান্তরিত করা হয় টেলিগ্রাফের ভাষায়। আবার টেলিপ্রিন্টারে বিভিন্ন শব্দ যেমন রূপান্তরিত হয় ছিদ্রযুক্ত কাগজে টেলিপ্রিন্টারের ভাষায়, টেপ রেকর্ডারে যেমন বিভিন্ন শব্দ রূপান্তরিত হয় বিভিন্ন মাত্রার চৌম্বকত্বে, তেমনি মানুষের অঙ্কের ভাষাকে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয় কম্পিউটারের ভাষায়। এটাই করে প্রবেশ যন্ত্র। অতএব প্রবেশ যন্ত্র নিঃসন্দেহে একটি অনুবাদ যন্ত্র—যে মানুষের বোধগম্য

তাষাকে কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তরিত করে। সব ক্ষেত্রে না হলেও অন্যান্য যন্ত্রের মত কম্পিউটারেও অনুবাদের জন্যে সাধারণতঃ চুম্বক-ধর্মী ফিতা ব্যবহার করা হয়।

প্রবেশ যন্ত্র দিয়ে অঙ্ক দেবার আগে আর একটি কাজ করতে হয়। সোজা কথায় বলতে গেলে, যে অঙ্কটা কম্পিউটারকে দেওয়া হবে, তা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। আমরা জানি, সব অঙ্কের মূলনীতি সেই যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ। এখন যদি এমন কাউকে, যে শুধু যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ জানে, একটি বিরাট বড় অঙ্ক কষতে দেওয়া হয়, তাহলে সে তা পারবে না। কিন্তু যদি তাকে বলে দেওয়া হয় যে, শুধু এটা দিয়ে এটাকে গুণ করে যা হবে, তা দিয়ে ওটাকে ভাগ করে এটা থেকে বিয়োগ দিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি করতে হবে, তবে সে কিন্তু অঙ্কটি অতি সহজে কষে দেবে। যেমন, যে শুধু মাত্র গুণ জানে, ধরা যাক একটি শিশু, তাকে বলা হয় $(২)^{৬}$-এর মান নির্ণয় করতে এবং এও বলে দেওয়া হলো, ২-কে পর পর ৬ বার গুণ করতে হবে, তবে শিশুটি শুধু মাত্র গুণ জেনেও অঙ্কটি কষে দেবে। তবে শিশুটির ক্ষেত্রে সময় অনেক বেশী লাগবে এবং তাতে ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

অতএব দেখা যাচ্ছে, পর পর সাধারণ ধাপ-গুলি বলে দিলে অঙ্কটা নিঃসন্দেহে খুবই সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

কম্পিউটারও কিন্তু ঐ রকম শুধু যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ জানে, কাজেই কোন বিরাট অঙ্কও ভেঙ্গে দিলে সে কষে দিতে পারে। কেন না কম্পিউটার তো আর নিজে ভেঙ্গে নিতে পারে না। কারণ আগেই বলা হয়েছে, কম্পিউটারের নিজস্ব কোন চিন্তাশক্তি নেই। এই অঙ্ক দেবার আগে ভেঙ্গে দেওয়াকে বলা হয় প্রোগ্রামিং।

অতএব প্রবেশ যন্ত্রের সাহায্যে কম্পিউটার অঙ্কের তথ্য বা Data এবং ধাপ বা Step গুলি জানে।

এরপর আসে কষবার ক্ষমতার কথা। মানুষের ক্ষেত্রে এটি করে তার মস্তিষ্ক, ঠিক তেমনি কম্পিউটারে এই কাজটি করে স্মারক, নিয়ন্ত্রক ও পাটীগণিত অংশের সমন্বয়ে গঠিত তার মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্ক কম্পিউটারের দ্বিতীয় এবং সর্বপ্রধান যন্ত্র। মস্তিষ্কের সাহায্যে আমরা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করার ক্ষমতা পাই শিশুকালে, যখন আমরা যোগ, বিয়োগ করতে শিখি এবং এই পদ্ধতিগুলি মনে করে রাখে আমাদের মস্তিষ্ক। কম্পিউটার তৈরি হবার সময় শিখে নেয় কি করে যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি করতে হয় এবং তার মস্তিষ্কের পাটীগণিত অংশের সাহায্যে যে কোন সময় সে তা করতে পারে।

অঙ্ক কষবার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আমরা যেমন স্মরণ করে রাখতে পারি, কম্পিউটারের স্মারকেও তেমনি সেগুলি সঞ্চিত করে রাখা হয়, ঠিক যেমন টেপ রেকর্ডারে আমরা কথা, গান ধরে রেখে দিই, দরকার মত যা আমরা ফের পেতেও পারি।

কম্পিউটারে তার অঙ্ক কষবার ধাপগুলি যাতে পর পর ঠিকমত হয়, তা নিয়ন্ত্রণ করে তার মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রক অংশ। বলাবাহুল্য, মস্তিষ্ক কম্পিউটারের প্রধান যন্ত্র। এটি চালিত হয় ইলেকট্রনিক সার্কিটের সাহায্যে। অঙ্ক আসলে এখানেই কষা হয়। প্রোগ্রামিং অনুসারে ইলেকট্রনিক সার্কিটের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করে উত্তর তৈরি হয় এখানেই। এই যোগ, বিয়োগ করবার কাজ ইলেকট্রনিক সার্কিটের সাহায্যে হয় বলে কাজ হয় অতি দ্রুতগতিতে আর নির্ভুলভাবে।

এরপর আসে উত্তর প্রকাশের ব্যবস্থা। এটি যে যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়, তাকে প্রবেশ যন্ত্রের

মত আর একটি অনুবাদ যন্ত্র বলা যেতে পারে, যার কাজ হলো কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরিত করা।

আমরা আগেই বলেছি, কম্পিউটার দিয়ে শুধুমাত্র অঙ্ক কষাই নয়, আবহাওয়া অফিসে আবহাওয়া নির্ধারণ, ডাক্তারখানায় রোগীর কি রোগ তা বের করা, এমন কি, অনুবাদের জন্যেও ডাক পড়ে কম্পিউটারের। অঙ্ক-কষা কম্পিউটারের সঙ্গে কিন্তু এই কম্পিউটারগুলির অন্য বিশেষ কোন তফাৎ নেই। তফাৎ কেবল মস্তিষ্কে। অঙ্ক-কষা কম্পিউটারের মস্তিষ্ক যেমন কেবলমাত্র যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করে উত্তর বলে দিতে জানে, তেমনি এই কম্পিউটারগুলিকে রোগীর লক্ষণ অথবা আবহাওয়ার লক্ষণ ইত্যাদি বলে দিলে সে অনায়াসে কি রোগ এবং আবহাওয়া কি রকম হবে, তা বলে দিতে পারে। যেমন, রোগ নির্ণয়ের জন্যে যে কম্পিউটার, তার মস্তিষ্ক তৈরি করবার সময় তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে রক্তের চাপ, নাড়ীর চাপ, দেহের উত্তাপ ইত্যাদি কত কত থাকলে কি কি রোগের লক্ষণ। কাজেই যে রোগীর রোগ নির্ণয় করা প্রয়োজন, তার রক্তের চাপ, নাড়ীর চাপ, দেহের উত্তাপ ইত্যাদি বলে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে তার কি রোগ তা বের করা যাবে। অঙ্ক-কষা কম্পিউটারে উত্তর আসতো অঙ্কে—এই কম্পিউটার উত্তর দেবে কি রোগ হয়েছে, যেটা বের করা মানুষের পক্ষে ক্ষেত্রবিশেষে বেশ সময়সাপেক্ষ। ফলে হয়তো চিকিৎসার দেরী হয়ে যেতে পারে।

আবার আবহাওয়া অফিসের কম্পিউটার জানে বাতাসের চাপ, বাতাসের জলীয় বাষ্প বা বাতাসের তাপমাত্রা ইত্যাদি কত কত থাকলে আবহাওয়া কি কি রকম হবে। কাজেই শুধুমাত্র ঐ লক্ষণগুলি জেনে কম্পিউটারে দিলেই হলো। নিমেষের মধ্যে নির্ভুলভাবে আবহাওয়া কি রকম থাকবে, তা বের হয়ে যাবে। ঠিক এরকমভাবে অনুবাদের কাজেও কম্পিউটারকে লাগানো হয়েছে।

কম্পিউটার সত্যই আজকের যুগের একটি অপরিহার্য বিস্ময়কর যন্ত্র। শুধু মাত্র অঙ্ক কষা, আবহাওয়া ও রোগ নির্ণয় অথবা অনুবাদই নয়, যে কোন কঠিন প্রশ্নের জবাব যাতে কম্পিউটার দিতে পারে, তার জন্যে চেষ্টা চলছে। রাস্তার বিপজ্জনক স্থানে যদি কম্পিউটার বসিয়ে রাখা হয়, তাহলে কোন অ্যাক্সিডেন্ট হলে সেই অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে সত্যকারের দোষ কার, তা নির্ভুলভাবে বের হতে পারে। শুধু মাত্র তাই-ই নয়, মানুষের প্রত্যেকটি কাজে যেখানে ভুল হওয়া স্বাভাবিক অথবা তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার, সেখানেই যাতে কম্পিউটারকে কাজে লাগানো যায়, তার চেষ্টা চলছে। আরও একটা কথা—মহাকাশ জয়ের এত যে সব পরিকল্পনা, তার জন্যে যে সব দ্রুত ও জটিল হিসাব-নিকাশের দরকার, তা কিন্তু কম্পিউটার ছাড়া সম্ভবই হতো না।

গ্রহাণুপুঞ্জ

শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

প্রাচীনকাল থেকেই আকাশের দিকে তাকিয়ে মানুষ লক্ষ্য করেছিল, কয়েকটি বস্তু আশেপাশের তারাগুলির তুলনায় তাড়াতাড়ি স্থান পরিবর্তন করে থাকে। ওগুলিকে বলা হয় গ্রহ বা প্ল্যানেট। তখন মনে করা হয়েছিল, পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে সূর্য, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। ভারতীয়েরা এগুলির সঙ্গে রাহু ও কেতুকে যোগ করতেন এবং বলতেন নবগ্রহ। কোপারনিকাস প্রচার করলেন যে, সূর্যের চারদিকেই ঘুরছে অন্যান্য গ্রহ, চাঁদ যে পৃথিবীর চারদিকে ঘূর্ণায়মান উপগ্রহ তাও বোঝা গেল। তখন গ্রহ বলতে আমরা বুঝলাম বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। দূর-বীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর আরো তিনটি গ্রহ, যথা—ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর অস্তিত্ব জানা গেল এবং অনেক গ্রহাণু আবিষ্কৃত হলো। সূর্যের চারদিকে যে বস্তুগুলি ঘোরে আমরা সেগুলিকে বলি গ্রহ। ওগুলি যদি খুব ছোট হয় তবে বলি গ্রহাণু বা অ্যাষ্টারয়েড (Asteroid)। অ্যাষ্টারয়েড শব্দের অর্থ হচ্ছে, তারার মত। তারার মত কেন? শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলেও তারাগুলিকে বড় বড় দেখায় না, তাদের বিশাল দূরত্বের জন্যে। গ্রহাণুদলকেও বড় দেখা যায় না অন্য কারণে, সেগুলি খুব ছোট বলে। তাই সেগুলিকে বলা হলো অ্যাষ্টারয়েড। ওগুলি ছোট গ্রহ, তাই বাংলায় আমরা বলি গ্রহাণু। এই গ্রহাণুপুঞ্জের মধ্যে মাত্র একটাকেই (নাম ভেস্তা) খালি চোখে দেখা যেতে পারে, কিন্তু তাও মোটেই উজ্জ্বল নয়।

১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী জ্যোতির্বিদ পিয়াজ্জী প্রথম গ্রহাণু সিরিস (Ceres) আবিষ্কার করেন। তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করছিলেন, হঠাৎ ওটার অবস্থানের আপেক্ষিক পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। সিরিস সূর্যের যতই নিকটবর্তী হতে লাগলো, ততই বিজ্ঞানীদের ভয় হলো—ওটা হয়তো মহাকাশে হারিয়ে যাবে। এই ভয়ের হেতু ছিল এই যে, জ্যোতির্বিদেরা তখনো কক্ষপথ গণনায় সিদ্ধ হতে পারেন নি। বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ গস্ কক্ষপথ গণনার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—সিরিসকে আবার কখন দেখা যাবে। দেখা গেল, সিরিসের কক্ষপথ মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথ দুটির মাঝখানে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বোড সূর্য থেকে গ্রহগুলির দূরত্বের এক সূত্র প্রকাশ করেছিলেন। এই সূত্র অনুযায়ী মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে একটা গ্রহের অস্তিত্বের সম্ভাবনা ছিল। এখন সিরিস আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং তার কক্ষপথ মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে হওয়ায় বোডের সূত্র জোর সমর্থন পেল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আর মাত্র পাঁচটি গ্রহাণু আবিষ্কৃত হয়েছিল। জ্যোতির্বিদ্যায় ফটোগ্রাফীর প্রয়োগে কিন্তু আবিষ্কার দ্রুততর হলো। বর্তমানে কয়েক শত গ্রহাণু নিয়মিত পর্যবেক্ষণের আওতায় রয়েছে। গ্রহাণুসমূহ নক্ষত্রের তুলনায় তাড়াতাড়ি স্থান পরিবর্তন করে। নক্ষত্রের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে যদি ঘোরানো যায়, তবে অনেকক্ষণ ধরে একটা আলোকচিত্র তুললে নক্ষত্রবিন্দুর মতই দেখা যাবে, কিন্তু দ্রুত আপেক্ষিক গতির জন্যে একটা

গ্রহাণু একটা ছোট রেখার সৃষ্টি করবে। এভাবে গ্রহাণু ধরা পড়ে। কোন গ্রহাণু খুব ধীরে ধীরে স্থান পরিবর্তন করলে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে গৃহীত দুটি আলোকচিত্রে তার অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়

বড় গ্রহগুলির তুলনায় অর্থাৎ বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতির তুলনায় গ্রহাণুদল খুবই ছোট। সমগ্র গ্রহাণুপুঞ্জের ভরের সমষ্টি চাঁদের শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী হবে না।

গ্রহাণুপুঞ্জের ভৌত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সবচেয়ে ঝক্‌ঝকে, হয়তো বা সবচেয়ে বড় চারটি গ্রহাণুর ব্যাস হচ্ছে ৪৮০ মাইল (সিরিস) থেকে ১২০ মাইল (জুনো)। গ্রহাণুগুলি কি পরিমাণ সূর্যালোক প্রতিফলন করে, তার ভিত্তিতে অঙ্ক কষে ওগুলির ব্যাস নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। মোটামুটি ধারণা, প্রায় দেড়-শ' গ্রহাণুর ব্যাস ৫০ মাইলের অধিক, অধিকাংশের ব্যাস ৫০ থেকে ২০ মাইলের মধ্যে।

গ্রহাণুর আকৃতি কি রকম অর্থাৎ ওরা গোল, বা ত্রিভুজ, না চতুর্ভুজের মত দেখতে, তা বের করা বেশ কষ্টসাধ্য। এই ব্যাপারেও সূর্যালোক প্রতিফলনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সব সময়ে হয়ে ওঠে না। প্রতিফলিত আলোক নির্দিষ্ট সময়ে কম-বেশী হলে বোঝা যায়, গ্রহাণুটি নিজের অক্ষদণ্ডের চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে। প্রতিফলিত আলোকের পরিমাণ যেমন আকৃতির উপর নির্ভরশীল, তেমনি যে বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয় তার প্রকৃতির উপরও নির্ভর করে। কোন সাদা বস্তু যত আলো প্রতিফলিত করে, অন্য রঙের বস্তু ততটা করে না। ধাতব পদার্থ, যেমন—সোনা, রূপা ইত্যাদি যতটা আলো প্রতিফলিত করে, অধাতব পদার্থ ততটা নয়। অতএব গ্রহাণুর আকৃতি সঠিকভাবে বলা বেশ কঠিন। যাহোক, কয়েকটি গ্রহাণুর আকৃতি সঠিক ভাবে জানা গেছে। ইউনোমিয়া নামক গ্রহাণুর আকৃতি গোলাকার, গোলকের উপরে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদার্থের জন্যে ওটার প্রতিফলিত আলোকের হেরফের হয়। গ্রহাণু এরসের আকৃতি কিন্তু গোল নয়। ওটা ১৫ মাইল লম্বা, চওড়ায় মাত্র ৫ মাইল, অনেকটা ইটের মত। নিজ অক্ষদণ্ডের চারদিকে পাঁচ ঘণ্টা ষোল মিনিটে একবার পাক খায়। এই সময়ের মধ্যে দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র অংশ দু-বার করে দেখা যায় অর্থাৎ ওটার হ্রাস-বৃদ্ধি বেশ দ্রুত হয়।

প্রধান গ্রহগুলির মধ্যে শুক্রই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে। শুক্র থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে কম দূরত্ব হচ্ছে দু-কোটি ষাট লক্ষ মাইল। কয়েকটি গ্রহাণু কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর আরও কাছাকাছি এসে পড়ে। তখন এগুলিকে ক্ষীণ তারার মত দেখায়। ১৯৩১ সালে এরস পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে এসেছিল, আবার আসবে ১৯৭৫ সালে। এরস যখন এত নিকটে আসে, তখন ওটার দূরত্ব, আকার প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করা অনেকটা সহজ হয়।

অ্যাপোলো ও অ্যাডোনিস গ্রহাণু দুটি আরও নিকটে আসে। সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি আসবার সময় অ্যাপোলো গ্রহাণুটি শুক্র গ্রহের কক্ষপথে ঢুকে পড়ে। অ্যাডোনিস বুধ গ্রহের কাছাকাছি যায়। পৃথিবী, বুধ ও শুক্র থেকে অ্যাডোনিসের সবচেয়ে কম দূরত্ব হচ্ছে দশ লক্ষ মাইলের একটু বেশী। একটি গ্রহাণু ইকেরাস বুধ গ্রহের কক্ষপথে ঢুকে পড়ে। আর কোন গ্রহাণু বুধ গ্রহের কক্ষপথে ঢুকেছে বলে আমরা জানি না।

পৃথিবীর খুব নিকটে আসা গ্রহাণুগুলির ব্যাস প্রায় এক মাইলের মত। তাই খুব কাছাকাছি এলেও এগুলিকে অতি ক্ষীণ তারার মত দেখায়

এবং কিছু নির্ণয় করবার আগেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

১৮০১ সালে প্রথম গ্রহাণু সিরিসের আবিষ্কারের পর থেকে গ্রহাণুর কক্ষপথ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। গ্রহাণুদলের কক্ষপথ মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের মাঝে অবস্থিত। এগুলির ভর অতি সামান্য। সুতরাং মহাকর্ষের দরুণ বড় গ্রহাণুগুলির কক্ষপথের খুব পরিবর্তন হয়, অথচ বড় গ্রহগুলিতে এগুলির কোন প্রভাব নেই বললেই চলে। এই রকম প্রভাবিত কক্ষপথ গণনার বিভিন্ন নিয়ম আছে এবং সেগুলি যাচাই করবার কাজে গ্রহাণুগুলি বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

ট্রোজান যুদ্ধের নায়কদের নামানুসারে এগারোটি গ্রহাণুর নাম দেওয়া হয়েছে ট্রোজান গ্রুপ। ল্যাগর‍্যাঞ্জ অঙ্ক কষে প্রমাণ করেছিলেন, কোন বস্তু যদি সূর্য ও বৃহস্পতি থেকে সমদূরে অবস্থিত হয়, তবে ঐ বস্তুর কক্ষপথ স্থির থাকবে এবং সূর্যের চারদিকে ঐ বস্তুর ঘূর্ণনকাল বৃহস্পতির কক্ষপরিক্রমার সমান হবে। একটা সমকোণী ত্রিভুজের দুই শীর্ষবিন্দুতে রয়েছে সূর্য ও বৃহস্পতি আর একটা শীর্ষবিন্দুর কাছাকাছি রয়েছে এই গ্রহাণু গোষ্ঠী। ঐ শীর্ষবিন্দুর চারদিকে এক জটিল বক্র রেখায় ওগুলি ঘুরবে। শনি গ্রহ কাছাকাছি এলে ওটার টানে অবশ্য এগুলির অবস্থানের পরিবর্তন হবে।

একটা নতুন গ্রহাণু আবিষ্কৃত হলে তাকে আবিষ্কারের বছর দুটি অক্ষর দিয়ে পরিচিত করা হয়। একটা অক্ষরে ঐ মাসের অর্ধকাল এবং আরেকটি অক্ষর দিয়ে ঐ অর্ধকালে আবিষ্কৃত গ্রহাণুর ক্রমসংখ্যা দেওয়া হয়। যখন ঐ গ্রহাণুর কক্ষপথ জানা যায় এবং দেখা যায় যে, ওটা সত্যই নতুন, তখন আবিষ্কারের তালিকা অনুযায়ী ওটিকে একটি স্থায়ী সংখ্যা দেওয়া হয় এবং আবিষ্কারক গ্রহাণুটির নামকরণের সুযোগ পান। সাধারণতঃ ল্যাটিন ভাষার স্ত্রীলিঙ্গ শব্দই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

গ্রহাণুপুঞ্জের সৃষ্টি সম্বন্ধে দুটি মতবাদ চালু আছে। একটা মতবাদে বলা হয়, সুদূর অতীতে একটা গ্রহ জন্মলগ্নেই টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে যায়—গ্রহাণুদল তারই ধ্বংসাবশেষ। আর একটি মতবাদ হচ্ছে, একটি গ্রহ বিভিন্ন সময়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক-একটি খণ্ড হচ্ছে এক-একটি গ্রহাণু। দ্বিতীয় মতবাদটা অধিক প্রাচীন হলেও প্রমাণের সমর্থনপুষ্ট। বিজ্ঞানীরা জানেন যে, কোন একটি বিস্ফোরণের বিক্ষিপ্ত গ্রহাণুসমূহের কক্ষপথ ঐ সময়ে সূর্য ও বৃহস্পতির সংযোগ রেখায় অবস্থিত হবে। বৃহস্পতি থেকে ঐ খণ্ডগুলির গড় দূরত্ব সমান হবে আর কক্ষপথের নতি (Inclination) হবে একই পরিমাণ। যদি বিস্ফোরণে গ্রহাণুর উদ্ভব ঘটে থাকে, তবে এরকম বৈশিষ্ট্যের গ্রহাণু-পরিবার পাওয়ার কথা। এরকম পাঁচটি পরিবার পাওয়া গেছে। একটি পরিবারে গ্রহাণুর সংখ্যা ১৫ থেকে ৪৪-এর মধ্যে। অধুনা আর একটা মতবাদ প্রচারিত হচ্ছে। এই মতবাদে—ধূমকেতু ও গ্রহাণুর উদ্ভব একই কারণে হয়ে থাকে। এই মতবাদের সমর্থন জোরালো নয়।

রবার্ট অ্যাণ্ড্রুজ মিলিকান

প্রবীরকুমার গুপ্ত

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও প্রয়োগক্ষেত্রে এমন খুব কমই পথপ্রদর্শক জীবিত আছেন, যাঁদের জীবনে মিলিকানের মত বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও সক্রিয়তার সমন্বয় ঘটেছিল—বলেছিলেন লণ্ডন টাইমস পত্রিকার স্যার হেনরী ডালে। মিলিকান আজ নেই, কিন্তু বিজ্ঞানের জগতে তাঁর দানের কথা চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁর দান অপরিসীম।

আজ থেকে একশো বছর আগে ১৮৬৮ সালের ২২শে মার্চ আমেরিকায় মিলিকানের জন্ম হয়। ছোটবেলায় জীবন কেটেছে অতি সাধারণভাবে এবং সে সময় বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল খুবই কম। ছাত্রাবস্থায় গ্রীকভাষা ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মায়।

সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় কিশোর মিলিকানকে চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় নামতে হয়। সে সময় এক ডলার উপার্জন করতে তিনি প্রতিদিন দশ ঘণ্টা কারখানায় কাজ করতেন। প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি জীবিকার জন্যে সর্টহ্যাণ্ড শেখেন। মিলিকান উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে ওবেরলিন কলেজে ভর্তি হন। যখন তিনি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তখন তাঁরই গ্রীক শিক্ষক মিলিকানকে নীচের শ্রেণীতে পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষার ভার নিতে অনুরোধ করেন। এ এক অভাবনীয় অনুরোধ—যে বিষয়ের সঙ্গে তাঁর একেবারে পরিচয় নেই, সেই বিষয় তিনি শিক্ষা দেবেন কি ভাবে? কিন্তু এই অবাস্তব চিন্তা তাঁর বিজ্ঞান-পিপাসু মনের কাছে খেই হারিয়ে ফেললো। পদার্থ-বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটলো এবং খুব শীঘ্রই তিনি বিজ্ঞান-চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। গ্রীক সাহিত্যের এক জন ছাত্র হয়েও তিনি বিজ্ঞানের রহস্যময় জগতে আলোর সন্ধান পেলেন।

১৮৯১ সালে ওবেরলীন কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করে তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় লিপ্ত হন। গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল উত্তপ্ত কঠিন ও তরল পদার্থ থেকে নিঃসৃত আলোকের পোলারাইজেসনের প্রভাব। সেই সূত্রে ১৮৯৫ সালে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন এবং উচ্চশিক্ষার্থে ইউরোপে যান। জার্মেনীর গটিংগেন ও বার্লিনে তিনি এক বছর ছিলেন। তারপর ১৮৯৬ সালে মিলিকান শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। এখানেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মাইকেলসনের সাহচর্য লাভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি প্রকৃত গবেষণা-কেন্দ্রে পরিণত করেন।

১৯০২ সালে তাঁর বিবাহ হয় এবং তার ঠিক এক বছর পরেই তিনি ঘোষণা করেন, ধাতু থেকে নির্গত আলো-বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ ধাতুর উত্তাপের উপর নির্ভর করে না—এটাই তাঁর গবেষণার প্রথম অধ্যায়ের সূচনা।

কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সুরু হয় অনেক পরিণত বয়সে। তাঁর বিখ্যাত কাজ হলো ইলেকট্রনের সঠিক আধান (Charge) নিরূপণ। অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ১৯১১ সালে তিনি সক্ষম হলেন তৈলবিন্দু সংক্রান্ত পরীক্ষার (Oil drop expt.) দ্বারা ইলেকট্রনের আধান নির্ণয়ে। এই পরীক্ষায় তিনি তেলের খুব

ছোট ছোট বিন্দু দুটি ইলেকট্রোডবিশিষ্ট সমতাপ বায়ুর মধ্যে প্রসারিত করলেন। ইলেকট্রোড দুটির মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হলো এবং ফলস্বরূপ তৈলবিন্দুগুলি তড়িদ্বাহী হলো। ইলেকট্রনের নিম্নগতি তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করলেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন, তৈলবিন্দুর গতিবেগ ইলেকট্রোডের মেরুর উপর নির্ভর করে। ইলেকট্রোডের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র, তৈলবিন্দুর ব্যাসার্ধ (যা বিন্দুগুলির পতনগতি থেকে নিরূপিত হয়) এবং বায়ু ও তেলের ঘনত্ব জানা থাকলে ইলেকট্রনের আধান নিরূপণ সম্ভব। মিলিকানের পরীক্ষালব্ধ মান হলো $(4{\cdot}807 \pm {\cdot}005) \times 10^{-10}$ e. s. u.

১৯১২ সালে মিলিকান আইনষ্টাইনের আলোক-বিদ্যুৎ সূত্র পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করবার কাজে মনোনিবেশ করেন। সে সময় আইনষ্টাইন পদার্থ-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর সিদ্ধান্ত প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম সিদ্ধান্তের (Quantum theory) উপর প্রতিষ্ঠিত। তারই ভিত্তিতে মিলিকান তৈরি করলেন একটি আশ্চর্য যন্ত্র, যার নাম দিলেন 'নাপিতের বায়ুশূন্য দোকান'। এই বায়ুশূন্য আধারে তিনি একটি ঘূর্ণায়মান টেবিল স্থাপন করলেন, যার নীচে অতি রাসায়নিক ক্রিয়াশীল সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ধাতুর প্রলেপ দিলেন। চৌম্বক শক্তির দ্বারা চালিত একটি ছুরি তার মধ্যে স্থাপন করলেন, যার কাজ টেবিলের তল থেকে ধাতুগুলিকে আস্তে আস্তে চেঁচে ফেলা—ঠিক দাড়ি কামাবার মত। তিনি বিশুদ্ধ এক আলোক-তরঙ্গের দ্বারা ধাতুতলকে আঘাত করলেন—এর ফলে তল থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হলো এবং তিনি একক সময়ে বিচ্ছুরিত ইলেকট্রনের সংখ্যা এবং শক্তি নিরূপণ করলেন। এই পরীক্ষার দ্বারা তিনি আইনষ্টাইনের সিদ্ধান্ত প্রমাণিত করলেন এবং দেখালেন Plank constant বর্ণালীর সব তরঙ্গের প্রতি প্রযোজ্য।

সুদীর্ঘকাল গবেষণার পুরস্কারস্বরূপ এবার চারদিক থেকে আসে নানান সম্মান। ১৯১৩ সালে ইলেকট্রনের আধান নিরূপণের জন্তে তিনি স্থাশন্তাল অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স কর্তৃক প্রদত্ত কম্‌ষ্টক পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৭ সালের অগাষ্ট থেকে ১৯১৯ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত তিনি আবহাওয়া-বিজ্ঞান দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। বার্তাবহনকারী বেলুনের উন্নতি সাধন করে তিনি ১০০০ মাইল দূরপথ পর্যন্ত বার্তা প্রেরণ করতে সক্ষম হন এবং এই গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মহাজাগতিক রশ্মির (Cosmic rays) রহস্য সন্ধানে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯২২ সালে মিলিকান এবং তাঁর ছাত্র বোয়েন দশ মাইল উচ্চতায় সাত আউন্সের অতি সূক্ষ্ম ইলেকট্রোস্কোপ পাঠাতে সক্ষম হন। Cosmic rays নামকরণও তিনি করেন।

১৯২১ সালে মিলিকান ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজির পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার নর্মান ব্রিজ প্রয়োগশালার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। এখানে থাকাকালীন ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৫ মাইল উপরের স্তর (Stratosphere) থেকে গভীর বরফগলা সরোবরের তলের উপর পর্যন্ত মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন।

বিভিন্ন দেশ থেকে তিনি পাঁচ-শটি সম্মানসূচক উপাধি লাভ করেন। প্রায় উনিশ বছর আগে তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং কলকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

বিজ্ঞান ও ধর্মের সমতার প্রভাব ছিল তার মধ্যে অপরিসীম। এই দর্শন আমরা তাঁরই বিভিন্ন রচনায় দেখতে পাই। তাঁর বিশিষ্ট রচনার মধ্যে আছে—বিজ্ঞান ও জীবন, বিজ্ঞান ও ধর্মের

বিকাশ, বিজ্ঞান এবং নতুন সভ্যতা। তাছাড়া তিনি আত্মজীবনীও লিখে গেছেন। পদার্থ-বিজ্ঞানে অবদানের জন্যে ১৯২৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

সামান্য রোগভোগের পর মিলিকানের জীবনাবসান ঘটে ১৯৫৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর। তাঁর এই দীর্ঘ জীবনের সুদীর্ঘ ইতিহাস পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিজ্ঞান-শিক্ষা এবং উচ্চ-শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল ও শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

মাতৃভাষার সাহায্য ছাড়া কোন শিক্ষাই সার্থক হয় না। কবি বলেছেন, "নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা!" বাস্তবিক পক্ষে অন্য যে কোন ভাষার মাধ্যমে যে কোন শিক্ষা লাভ করা হোক না কেন, তা সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে মাতৃভাষার মাধ্যমে তা যদি লাভ করা যায় তবেই। পৃথিবীতে এমন আর কোন প্রগতিশীল দেশ আছে কি যেখানে কোন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে? বর্তমান কালের সব দেশের শিক্ষাবিদেরা এই বিষয়ে একমত যে, সর্বস্তরে—এমন কি, উচ্চতম স্তরেও মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান সবচেয়ে ভাল উপায়। এই মতের বশবর্তী হয়েই আমাদের দেশেও স্বদেশের ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে সর্বস্তরে যে তা এখনো সম্ভব হয় নি, তা স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য এসম্বন্ধে অনেকের অভিমত এই যে, কাজটি নাকি প্রথমতঃ একপ্রকার অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এই কাজ করতে গেলে আমরা নাকি পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ, ভাবের আদান-প্রদান প্রভৃতি নানা বিষয়ে পিছিয়ে পড়বো এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যাপারে আমাদের অগ্রগতি নাকি ব্যাহত হবে। দ্বিতীয় অভিমতটি সম্বন্ধে আমাদের বলবার কিছু নেই। তবে প্রথম অভিমতটি অর্থাৎ কাজটি যে অসম্ভব নয়, সে সম্বন্ধেই আমরা আমাদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো।

অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয়ও বিশ্বাস করতেন যে, মাতৃভাষাই হবে সর্বপ্রকার শিক্ষা-প্রদানের মাধ্যম। ১৯১১ সালে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তিনি মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার জন্যে আবেদন জানান। পরে ময়মনসিং সাহিত্য সম্মেলনে আবেদনটি কার্যকরী করবার জন্যে তিনি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, মাতৃভাষার দ্রুত উন্নতির জন্যে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বিদেশী ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি বিষয়ের পুস্তকগুলি মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে হবে।

আজ অধ্যাপক সরকারের সে স্বপ্ন অনেকটা সার্থক হয়েছে। বাংলা ভাষায় আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু বই লেখা হচ্ছে। এখন থেকে প্রায় ৬০ বছর আগে অধ্যাপক সরকারের এই বিষয়ে চিন্তাধারা বৈপ্লবিক বলে মনে করা যেতে পারে। তিনি শুধু এই বিষয়ে চিন্তা করেই যে তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি, তার প্রমাণ আমরা পাই তাঁর বাংলায় ধনবিজ্ঞান এবং অন্যান্য বহু বাংলা গ্রন্থে। বাংলার কথা বলতে গিয়ে তিনি অযথা বিদেশী শব্দের ব্যবহার তো

করতেনই না বরং একটিও বিদেশী শব্দ ব্যবহার না করে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে যেতে পারতেন। তাছাড়া বাংলা রচনার মধ্যে নিতান্ত প্রয়োজনে তিনি যে সব বিদেশী শব্দ ব্যবহার করতেন, তা করা হতো বাংলা হরফে লিখে। অধ্যাপক সরকারের এই মতটির উপরই আমি বিশেষ জোর দিচ্ছি। কারণ কি, তা পরে বলছি।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা, সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আগেই বলেছি, শিক্ষার উচ্চতম স্তরে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান এবং গ্রহণ সমীচীন কিনা, সেটা আলাদা ব্যাপার। সে সম্বন্ধে আমাদের শুধু বক্তব্য, এ করলে শিক্ষাদান এবং গ্রহণের কাজটি সহজ এবং সুষ্ঠু হবে। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে আদান-প্রদান হারিয়ে ফেলবো কিনা, সেটা বিশেষভাবে বিচারসাপেক্ষ।

শিক্ষার উচ্চতম স্তর পর্যন্ত বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করতে কয়েকটি বাধার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। এক—উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব, দুই -পরিভাষা এবং তিন—উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব।

প্রয়োজন ছাড়া কোন কাজ হয় না। সাধারণভাবে জ্ঞান অর্জনের জন্যে এতদিন আমাদের বাংলা ভাষায় রচিত বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থের প্রয়োজন ততটা হয় নি। যাঁরা উচ্চশিক্ষিত, তাঁরা শিক্ষাগ্রহণ করেছেন ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। কাজেই কোন বিষয় জানতে হলে তাঁদের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায় রচিত গ্রন্থই তাঁদের চাহিদা মিটিয়েছে। পরিভাষা কণ্টকিত বাংলা ভাষার গ্রন্থে তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবেন না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন জটিল বিষয় সম্বন্ধে কোন বিদেশী ভাষায় মাধ্যমে তা পাঠ করে তাকে হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে তাঁরাও তাঁদের মাতৃভাষায় ভেবে নেন না কি? কিন্তু সে কথা আলাদা। বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার জন্যে গ্রন্থের প্রয়োজন এতদিন ছিল না, তাই গ্রন্থও ছিল না। আজ প্রয়োজন পড়েছে। ইতিমধ্যেই গ্র্যাজুয়েট শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন প্রভৃতি বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে, কাজেই গ্রন্থের আজ অভাব নেই। এসম্বন্ধে বেশী না বলে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করছি—

"আমি জানি, তর্ক এই উঠিবে, তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও, কিন্তু বাংলা ভাষায় উচ্চস্তরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সেকথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষা-গ্রন্থ হয় কি উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, সৌখিন লোকে সখ করিয়া তার কেয়ারী করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে-ঘাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্যে বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই, তার পরে গাছের পালা এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনের তাগিদেই বাংলা গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরও হবে।

এখানে একটা প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। উচ্চশিক্ষার জন্যে যে সব বই ইতিমধ্যে রচনা করা হয়েছে, তা কি সর্বাঙ্গসুন্দর? তার ভাষা কি সরল এবং সহজবোধ্য? স্কুল-কলেজে যে সব গ্রন্থ পাঠ্য হিসাবে দেখা যায়, তার সবই যে সর্বাঙ্গসুন্দর তা অবশ্য বলা যায় না; তবে দু-একখানা ভাল বই যে চোখে পড়ে নি, তাও ঠিক নয়। বিজ্ঞান বিষয়ের এমন দু-একখানা বই চোখে পড়েছে, যা দেখে যাঁরা

বিজ্ঞান বিষয়ে একটু-আধটু জানেন তাঁদেরই কাছে গ্রীক-ল্যাটিনের মত মনে হয়েছে সে সব বই, শিক্ষার্থীর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। অথচ মূলতঃ এসব বই তাদেরই জন্যে লেখা! এসব বই যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা স্ব স্ব বিষয়ে এক একজন দিকপাল। কিন্তু এঁদের হাত থেকে এই ধরণের বই বেরোবার কারণ কি? একটি প্রধান কারণ মনে হয়েছে যে, লেখকেরা নিজ নিজ বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি ঠিকই, কিন্তু বাংলা তাঁদের মাতৃভাষা। একমাত্র এছাড়া বোধ হয় অন্য কোন কৃতিত্ব তাঁরা বাংলা ভাষার দাবী করতে পারেন না। বাঙ্গালীর ছেলে হলেই কি বাংলা ভাষাটা শুদ্ধ, সুন্দর এবং সহজভাবে সকলে লিখতে পারেন? কিছুদিন আগে এক পরিচিত বন্ধু বাংলা ভাষায় একটি গণিত বিষয়ক পত্রিকার জন্যে একটি লেখা চাইতে এসেছিলেন। চোখে পড়লো যে, পত্রিকাটির সম্পাদকীয় অংশের একটি বাক্যও শুদ্ধভাবে লিখিত হয় নি। অন্যান্য লেখার কথা আর নাই উল্লেখ করলাম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "দু'শ বছর ইংরেজের অধীনে থাকিয়া বাংলা ভাষাটা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, ইংরেজীটাও ভাল করিয়া শিখিতে পারি নাই।" দুঃখ হয়েছিল সেদিন। উক্তোক্তারা বিশিষ্ট সব পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁরা মাতৃভাষা বাংলাটাকে এতই অবহেলা করলেন হয়তো এই ভেবে যে, অঙ্কশাস্ত্রের মত এত জটিল ব্যাপার-স্যাপার আয়ত্ত করলাম, আর সামান্য একটা ভাষা বাংলা, এ তো হাতের পাঁচ! আরও মজার ব্যাপার এই যে, এই ধরণের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বাংলা লিখতে একটু-আধটু যাঁরা জানেন, তাঁদের কৃপার চোখে দেখে থাকেন। কাজেই এঁদের হাত থেকে উঁচু পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক যে এমনি ধরণের রূপ নেবে, তা বলাই বাহুল্য। তবে আশার কথা, সংখ্যায় কম হলেও দু-চারখানা সুখপাঠ্য পুস্তকের অভাব যে নেই, তা অবশ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বপরিচয়ের ভূমিকায় লিখেছেন—"এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ্য করবে—এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে, কিন্তু মাল খুব কমিয়ে দিয়ে একে হাল্কা করা কর্তব্য বোধ করি নি।"

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়েছে, যাঁরা বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা সম্ভব নয় বলেন, তাঁরা সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপরিচয়ের মত বইয়ের খবর তেমনটি রাখেন না। তাঁরা হয়তো অন্য ধরণের কিছু গ্রন্থ দেখে থাকবেন। যদি তাই হয়, তবে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। একথা জোর করেই বলা চলে যে, বাংলা ভাষার কোন অন্ধ সমর্থকও এই ধরণের দু-একখানা পুস্তক দেখলে তাঁর মত সম্বন্ধে দ্বিতীয় বার ভাববেন।

বিজ্ঞান, শিল্প, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক রচনার একটি বড় অন্তরায় হলো পরিভাষা। বাংলা পরিভাষা রচনার কাজ বহুদিন থেকেই চলছে। বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রচলন আগেকার দিনে তেমন ছিল না। সম্প্রতি এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। পরিভাষা সমিতি আলাপ-আলোচনা ও অনুসন্ধানের পর অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা রচনা করেছেন। এসব শব্দের মধ্যে কতকগুলি সহজ এবং সর্বাঙ্গসুন্দর। কিন্তু কিছু কিছু দুর্বোধ্য এবং অনাবশ্যক শব্দেরও অভাব নেই। এখানে প্রশ্ন ওঠে, এত সব কষ্টসাধ্য পরিভাষার প্রয়োজন ছিল কি?

আমাদের বাংলা ভাষা একটা জীবন্ত ভাষা। নানা দেশের বিভিন্ন শব্দসম্ভার সংগ্রহ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করাই হলো কোন জীবন্ত ভাষার লক্ষণ। পৃথিবীর যে কোন ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। আমাদের বাংলা ভাষার মধ্যেই হাজার

হাজার বিদেশী শব্দ মিলেমিশে এক সময় বাংলা ভাষাই হয়ে গেছে। এর মধ্যে কত যে আরবী, ফারসী, ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষার শব্দ মিশে গেছে, তা ভাষাবিদ্ ছাড়া খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। দোকান, কাগজ, খবর, দরকার, আদালত, টুপি, গ্রেপ্তার, জাহাজ, চেয়ার, টেবিল, ব্যাঙ্ক, আফিস, হাসপাতাল, বিস্কুট, টিন, নম্বর, লাইন প্রভৃতি শব্দ যে আসলে বাংলা নয়, তা সকলেরই জানা। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ফরাসী কিউ, ইংরেজী রেশন প্রভৃতি শব্দগুলি আমাদের বাংলা দেশে এসে বাঙ্গালীত্ব লাভ করেছে। এসব শব্দকে আমরা বাংলা ভাষার বিরাট এবং উদার বক্ষে স্থান দিয়েছি। আমাদের দেশে অপবিত্র জিনিষকে শুদ্ধি করবার রেওয়াজ আছে। বিদেশী শব্দ যদি আমাদের কাছে অপবিত্র বলে মনে করা হয়, তবে তাদের আমরা অনায়াসেই শুদ্ধি করে নিতে পারি। এতে কাজের পক্ষে কতই না সুবিধা হয়। একটি উদাহরণ নিলে মন্দ হয় না। চেয়ার শব্দটি ইংরেজী, যদি এর বাংলা করা হয় কুরসী, তবে সেখানেও বাধা আছে। কুরসী বাংলা শব্দ নয়। চেয়ারের বাংলা আসন করলে চলে কি? না, আসন বললে বহু রকমের আসনকেই বুঝায়। কাজেই চেয়ার বললে যে নির্দিষ্ট আসনটি বোঝাবে, সেটি এক কথায় বোঝানো হয়তো সম্ভব হবে না। হয়তো বাংলা ভাষার আদি যুগে চেয়ারের মত কোন জিনিষের অবস্থিতি জানা ছিল না। কাজেই ইংরেজী চেয়ার শব্দটি আমাদের বাংলা ভাষায় স্থায়ী আসন নিয়ে নিয়েছে। অতএব যে জিনিষের প্রচলন পুরনো কালে ছিল না, পরবর্তী কালে সে সব জিনিষ বিদেশী নামেই আমাদের বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে।

ঠিক একই যুক্তিতে আমরা যদি বহুল প্রচলিত বৈজ্ঞানিক, শিল্পবিষয়ক এবং অর্থনীতি বিষয়ক শব্দগুলিকে নতুন আমদানী বাংলা শব্দ বলে ধরে নিই, তাহলে কোন প্রকার অসুবিধা আছে বলে মনে করি না। বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির কথাই ধরা যাক। হাইড্রোজেনকে উদ্‌যান না বলে হাইড্রোজেন, অক্সিজেনকে অম্লজান না বলে অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইডকে অঙ্গারাম্লজান না বলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বলতে বাধা কি? পরীক্ষাগারে ছাত্র-ছাত্রীরা এবং শিক্ষকেরা টেষ্ট টিউব শব্দটিই ব্যবহার করেন, পরীক্ষা-নল ব্যবহার করেন না। তেমনি বিকার, ফ্লাস্ক, ফানেল, ডেসিকেটার প্রভৃতি শব্দগুলির সঙ্গে আমরা অধিকতর পরিচিত—অধিকন্তু এসব শব্দ উচ্চারণ করতে আমরা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। পাতন ক্রিয়াকে ডিষ্টিল করা, পরিস্রাবণ ক্রিয়াকে ফিল্টার করা, কেলাসন ক্রিয়াকে কৃষ্ট্যালাইজ করা বলতে দোষ দেখি না। প্রেসিপিটেটের পরিভাষা করা হয়েছে অধঃক্ষেপ। অধঃক্ষেপের চেয়ে প্রেসিপিটেট শব্দটি যে অনেক সহজ, তা সকলেই স্বীকার করবেন। এমনি ধরণের হাজার হাজার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

এসব বৈজ্ঞানিক শব্দ বহুল প্রচলনের ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাছাড়া এসব শব্দ আন্তর্জাতিক রূপ পেয়েছে। ফলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়লেও এসব বৈজ্ঞানিক শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটতে কোন অসুবিধা হয় না। আবার উচ্চতম স্তর পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়লেও কোন বিদেশী ভাষায় (যেমন—ইংরেজী) মোটামুটি জ্ঞান থাকলেই সে সব বুঝতে শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার মত। বাঙ্গালী ছেলেরা যখন নিজেদের মধ্যে বা বাঙ্গালী অধ্যাপকের সঙ্গে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন কিন্তু তাঁরা টেষ্ট টিউব, বিকার, ফানেল, ডিষ্টিল করা প্রভৃতি কথাগুলিই ব্যবহার করেন। ভুলেও তাঁরা পরীক্ষা-নল, কুপি, কাচ-পাত্র প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার করেন না।

প্রকৃতপক্ষে একটি বিকার বা রাউণ্ড বা ফ্ল্যাট বটম্‌ড্‌ ফ্লাস্ক বলতে যে জিনিষকে বোঝায়, বাংলায় এক কথায় তার পরিভাষা রচনা করা খুবই কষ্টকর, অসম্ভবই বলতে পারি। অবশ্য অনেক মাথা খাটিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপায়ে যে সব পরিভাষা তৈরি করা হবে, তা গবেষণা হিসাবে উচ্চ পর্যায়ের হলেও কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা শূন্যের কোঠায় বলা যেতে পারে। বইতে ছাত্রেরা যতই পরীক্ষা-নল, পড়ুক না কেন, কাজের বেলায় সে সব পরিভাষা কোন সময় ব্যবহার করবার দরকার পড়বে না। কেউ হয়তো যুক্তি দেখাতে পারেন যে, ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা যখন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা, তখন সে ভাষায় পরিভাষা তৈরি করতে না পারলে বাংলা ভাষার আর মান থাকে কোথায়? এই ধরণের যুক্তিতে গোড়ামি আছে মানি, কিন্তু সে যুক্তির মধ্যে ব্যবহারিক দিকটা যে অবহেলিত হয়েছে, তা অবশ্যই বলবো।

কাজেই আমরা মনে করি—শিল্প, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের পরিভাষা নিয়ে বিব্রত হবার কোন কারণ দেখি না। আন্তর্জাতিক শব্দগুলিকে নতুন আমদানী বাংলা শব্দ বলে ধরে নিতে হবে। তাছাড়া এতে বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার বাড়বে। কোন জীবন্ত ভাষার এটাই তো লক্ষণ, সে কথা আগেই বলেছি।

ইংরেজী ভাষা ও কত বিদেশী শব্দ নিত্য গ্রহণ করা হচ্ছে। ফরাসী, জার্মান বা রুশ শব্দের কথা না হয় বাদ দিলাম, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা থেকেও কি শব্দ ইংরেজীত্ব পাচ্ছে না? বিখ্যাত ইংরেজ লেখকদের রচনার মধ্যেও আমরা এই শব্দগুলি লক্ষ্য করছি—গুরু, যোগী, ঋষি, পাজামা, শাল, শাড়ী, কুর্তা ইত্যাদি। আধুনিকতম 'ঘেরাও' কথাটিও বহু ইংরেজের লেখায় অবিকৃত অবস্থায়ই বা সময় সময় ক্রিয়াপদ করেও ব্যবহৃত হচ্ছে দেখছি।

আরও একটা প্রশ্ন এখানে ওঠে। যাঁরা বাংলা কথা বলবার সময় অনাবশ্যক ইংরেজী কথা ব্যবহার করেন, তাঁদের সঙ্গে এই ব্যাপারটা এক হয়ে যাচ্ছে কি না? আমাদের বক্তব্য, তা হচ্ছে না। কারণ অভ্যাসের দোষে বাংলা কথার মধ্যে এমন সব ইংরেজী শব্দ ঢোকানো, যার উপযুক্ত এবং সুন্দর বাংলা প্রতিশব্দ আছে এবং প্রচুর ব্যবহারও আছে, আর অপ্রচলিত এবং অনাবশ্যক শব্দ বাদ দিয়ে বহুল প্রচলিত এবং ইতিপূর্বে গৃহীত শব্দ ব্যবহার করা নিশ্চয়ই এক কথা নয় এবং প্রথমটির মত দোষেরও নয়। কেউ যদি বলে—বেঙ্গলী আমাদের মাদার টাং, বেঙ্গল আমাদের মাদার কান্ট্রি, মাদার কান্ট্রির অনারের জন্যে আমরা প্রাণ পর্যন্ত স্যাক্রিফাইস করতে পারি—তবে নিশ্চয়ই আপত্তি করবো।

কিন্তু কোথাও যদি এরকম লেখা হয়—তরল অতি-জারিত উদজান স্ফুটনের সময় বিয়োজিত হয় বলিয়া পাতন-ক্রিয়ায় আসল তরল পদার্থটি পাওয়া যায় না। কিন্তু অনুপ্রেষ পাতন-ক্রিয়ায় উহা বিয়োজিত না করিয়াই পাতনক্রিয়া করা সম্ভব—তাতেও আপত্তি করবো। যদিও এই বাক্যটিতে যে কয়টি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তা নির্ভুল এবং ভাষাটিও শুদ্ধ বাংলা সন্দেহ নেই, কিন্তু শুনতে ভারী খটমট লাগে। অথচ পরিভাষা কয়টি বাদ দিলে বাক্যটির চেহারাই যায় পালটে, তখন বাক্যটি হয় সুখশ্রাব্য।

কাজেই দুর্বোধ্য পরিভাষা পরিহার করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। তবে যে সব পরিভাষা ইতি-মধ্যে বহুল প্রচলিত হয়েছে, সে সব শব্দের উপর অহেতুক হস্তক্ষেপ করাও কোন ক্রমেই সমীচীন হবে না। ঠাণ্ডা করাকে কুল করা, গরম করাকে হিট করা, মাপকে মেজার করা—কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। আবার জলের বদলে ওয়াটার বা অ্যাকোয়া, সাধারণ লবণের বদলে কমন সল্ট, উষ্ণতার বদলে টেম্পারেচার লেখার কোন যুক্তি নেই। অণু ও পরমাণু শব্দ দুটি বাংলা ভাষায়

বহু দিন থেকেই প্রচলিত, আবার অ্যাটম-মলিকিউলও আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। কাজেই অণু-পরমাণু এবং মলিকিউল-অ্যাটম পাশাপাশি চলতে পারে। মোট কথা, বাংলা ভাষায় উচ্চতম ক্লাশের পাঠ্যপুস্তক রচনায় পরিভাষা একটা সমস্যা নয় বলেই আমাদের মনে হয়েছে।

বাংলা ভাষায় উঁচু ক্লাশের বই লিখতে গেলে ভাষার দিকে নজর দিতে হবে সবচেয়ে বেশী। ভাষা যাতে সহজ সরল ও সাবলীল হয়, সেদিকে যেন কোন রকম অবহেলা না হয়। বিশেষজ্ঞ যাঁরা এসব বই লিখবেন, তাঁরা এমন লোকের সাহায্য ও সহযোগিতা নিতে পারেন, যাঁরা বাংলা ভাষাটা একটু জানেন, অবশ্য তাতে যদি তাঁদের শিক্ষাভিমানে ঘা না লাগে তবেই।

উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়ে'র কথা উল্লেখ না করে পারছি না। বিজ্ঞানের বই যে উঁচু স্তরের সাহিত্য হতে পারে, বিশ্বপরিচয়ের চেয়ে এর বড় প্রমাণ আর কিছু আছে কি? এর ভাষার সাবলীলতা সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করেছি।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদানের আর একটি সমস্যা সম্ভবতঃ মনে করা হয়ে থাকে—উপযুক্ত শিক্ষক। আমাদের মনে হয়, এটা একেবারেই অমূলক সমস্যা। যে কোন বাঙালী শিক্ষক (সামান্য এক-আধজন বাদে) বাংলা ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবেন। একথা ঠিক, তাঁদের যে অসুবিধাটুকু হবে, তা হলো পরিভাষা নিয়ে। পরিভাষার অরণ্যে পথ হারাবার সম্ভাবনা না থাকলে (এবং তা থাকবার সম্ভাবনা নেই যদি উপরে যে কথা বলা হয়েছে সেই মত কাজ হয়) উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব কোন দিনই হবে না।

সামান্য যা আলোচনা করা হলো, তাতে আমরা একথা বলতে চেষ্টা করেছি যে, বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষা-দান সম্ভব এবং তা সম্ভব সুষ্ঠুভাবেই।

রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' থেকে কয়েকটি ছত্র তুলে ধরছি, সার্থক বিজ্ঞান রচনায় নমুনা হিসাবে—

"যে-সকল পদার্থ রেডিয়ামের এক জাতের অর্থাৎ তেজ ছিটোনোই যাদের স্বভাব, তারা সকলেই জাত-খোয়াবার দলে। তারা কেবলই আপনার তেজের মূলধন খরচ করতে থাকে। এই অপব্যয়ের ফর্দে প্রথম যে তেজঃপদার্থ পড়ে, গ্রীক বর্ণমালার প্রথম অক্ষরে তার নাম দেওয়া হয়েছে আলফা।···এ একটা পরমাণু, পজিটিভ জাতের। রেডিয়ামের আরও একটা ছিটিয়ে ফেলা তেজের কণা আছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে বীটা। সে ইলেকট্রন, নেগেটিভ চার্জ করা, বিষম দ্রুত তার বেগ। তবু পাতলা একটি কাগজ চলার রাস্তায় পড়লে আলফা-পরমাণু দেহান্তর লাভ করে, সে হয়ে যায় হিলিয়াম গ্যাস।"

এখানেও একটি বিষয় লক্ষ্য করবার। রবীন্দ্রনাথ নিজেও অযথা পরিভাষা ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন না। উপরের ছত্র কয়টিতে তিনি পজিটিভ, নেগেটিভ, চার্জ প্রভৃতি শব্দগুলি তাদের স্বরূপেই প্রকাশ করেছেন, ধনাত্মক, ঋণাত্মক প্রভৃতি পরিভাষা ব্যবহারের ধারে-কাছেও যান নি।*

---

* বিনয় সরকার সমাজ বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল কর্তৃক পঠিত।

সঞ্চয়ন

ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ের নতুন পদ্ধতি

ভি. পনোমারেক এই সম্বন্ধে লিখেছেন—১৯৪৮ সালে সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য অধ্যাপক লেভ আলেকজাণ্ডোভিচ জিল্বার ক্যান্সার-কোষগুলি নিয়ে গবেষণা সুরু করেন। এর লক্ষ্য ছিল কোষগুলির মধ্যে সুনির্দিষ্ট পদার্থসমূহ (অ্যান্টিবডি) আবিষ্কার করা, যার সাহায্যে সুস্থ কোষগুলি থেকে ব্যাধিগ্রস্ত কোষগুলিকে পৃথক করে চেনা যাবে।

১৮ বছর ধরে গবেষণায় জিল্বার ও তাঁর সহযোগীরা অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন, যেগুলি ক্যান্সার-অনাক্রম্যতার ভিত্তি স্থাপন ও এই ব্যাধির ভাইরাস তত্ত্ব বিকাশে এক বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু এই বিজ্ঞানীর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। শেষ কয়েক বছর জিল্বারের সহযোগী ছিলেন তাঁরই ছাত্র হ্যারি আবেলেফ। ছয় বছর গবেষণার পর হ্যারি আবেলেফ, তাঁর সহকারিণী এস. ভি. পেরোভা ও এন. আই. খাস্কোভা প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, পশুদের যকৃতের ক্যান্সারগ্রস্ত কোষগুলি এমন এক ধরণের অ্যালবুমেন ক্ষরণ করে, যা পশুর ভ্রূণের মধ্যে পাওয়া যায়। এযাবৎ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এটা পাওয়া যায় নি। এই আবিষ্কারের ফলে অধ্যাপক আবেলেফ এই ধারণা করেন যে, পশুর মধ্যে যকৃতের ক্যান্সার এমন অবস্থার জন্ম দেয়, যা আক্রান্ত টিসুগুলির মধ্যে ভ্রূণীয় অ্যালবুমেনের পুনরুজ্জীবনের সহায়ক। কয়েক মাস বাদেই এই ধারণার যাথার্থ্যতা প্রমাণিত হলো। ভ্রূণের যকৃৎ-কোষগুলি রক্তের মধ্যে এক বিশেষ অ্যালবুমেন—ভ্রূণীয় আলফা-গ্লোবিউলিন ক্ষরণ করে, জন্মের পর যা পুরাপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়। আর যখন যকৃতে ক্যান্সার দেখা দেয়, তখনই মাত্র কোষগুলি আবার এই অ্যালবুমেন তৈরি করে এবং রক্তের মধ্যে তার ক্ষরণ সুরু হয়। এই তথ্য থেকে আশার আলো দেখা গেল যে, ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ের নতুন পদ্ধতি বের করা যাবে।

১৯৬২ সালের গ্রীষ্মকালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত অষ্টম আন্তর্জাতিক ক্যান্সার কংগ্রেসে অধ্যাপক আবেলেফ তাঁর গবেষণার বিবরণ পাঠ করেন এবং এক বছর বাদে অস্ত্রাখান মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ইউরি সেমেনোভিচ্ তাতারিনোফ বিভিন্ন ধরণের যকৃতের ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের রক্তদ্রব বিশ্লেষণ করে যকৃতের প্রাথমিক ক্যান্সারের একটি কেসে ভ্রূণীয় অ্যালবুমেন আবিষ্কার করেন।

কাজেই রোগীর রক্তে ভ্রূণীয় আলফা-গ্লোবিউলিনের আবির্ভাবের দ্বারা যকৃতের ক্যান্সারের অস্তিত্ব বিচার করতে সক্ষম হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। রোগ নির্ণয়ের এই পদ্ধতি অল্প সময় সাপেক্ষ, সহজ ও সম্পূর্ণ বেদনাহীন।

এপর্যন্ত এই ধরণের ক্যান্সার রোগ নির্ণয় করা খুব কঠিন এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষেও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব ছিল। কারণ যকৃতের ক্যান্সারের বাইরের লক্ষণ ও অন্য বহুবিধ রোগের মধ্যে খুব বেশী সাদৃশ্য রয়েছে। এই সব লক্ষণের উপর নির্ভর করে সার্জনেরা যখন বিশ্লেষণের জন্যে পরীক্ষামূলকভাবে যকৃতের একটা অংশ কেটে বাদ দিতেন, তখনও ক্যান্সার-

গ্রস্ত টিসু বের করবার সম্ভাব্যতা ছিল অতি সামান্ত। এখানে অবশ্য অনেকগুলি প্রশ্ন ওঠে।

যকৃতের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর রক্তে এই অ্যালবুমেন কি সব সময় দেখা দেয়? যদি তা হয়, তাহলে কোন্ পর্যায়ে? একেবারে গোড়ার পর্যায়ে যখন রোগীকে সাহায্য করবার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় না, কিংবা পরবর্তী পর্যায়ে যখন ওষুধের নিরাময়-ক্ষমতা আর থাকে না? অন্যান্ত রকমের ক্যান্সারেও কি এই অ্যালবুমেন পাওয়া যায়?

এই সব প্রশ্নের জবাব পাবার জন্তে অধ্যাপক আবেলেফ, এস. পেরোভা, অধ্যাপক তাতারিনোফ, ডাঃ এন. পেরেভোদ্‌চিকোভা, অধ্যাপক এন. ক্রায়েভস্কি ও ডাঃ আসেক্রিতোভা ও এফ. যোমুল তিন বছরের বেশী সময় ধরে কাজ করেছেন। এরই মধ্যে এখন জোর করে বলা যায়, রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই আবিষ্কারের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এই আবিষ্কার যকৃতের প্রাথমিক ক্যান্সার নির্ণয়ের পদ্ধতি আমূল বদলে দিচ্ছে।

সম্প্রতি জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্রে অধ্যক্ষ গ্রাবার-এর নেতৃত্বে একদল ফরাসী বিজ্ঞানী ফরাসী বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিকে সরকারীভাবে জানিয়েছেন যে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত যকৃতের ক্যান্সার নিরূপণের পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

এই পদ্ধতির কার্যকারিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রধান প্রশ্নটি এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। সেটি হলো—ভ্রূণীয় আলফা-গ্লোবিউ-লিন কি দেখা দেয় ক্যান্সারের একেবারে প্রথম পর্যায়ে, যখন অস্ত্রোপচার করে পুরাপুরি নিরাময় করা সম্ভব? এই প্রশ্নটির জবাব পেতে হলে গবেষণা চালানো উচিত সে সব দেশে, যেখানে যকৃতের ক্যান্সারের প্রকোপ ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশী। এসব দেশের মধ্যে আছে দক্ষিণ আফ্রিকার কোন কোন দেশ, যেখানে যকৃতের ক্যান্সারের প্রকোপ বেশী।

গত জুন মাসে আন্তর্জাতিক ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার অনুরোধ জানিয়েছে, যাতে মধ্য আফ্রিকার দেশ-গুলিতে রোগ নির্ণয়ের এই পদ্ধতির উপযোগিতা পরীক্ষা করা যায়। এই পরিকল্পনার খসড়া অনুমোদন করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই গবেষণার ব্যয়ভার (প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী ২৬,০০০ ডলার) বহনের দায়িত্ব নিয়েছে।

আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক হিগিনসনের সঙ্গে অধ্যাপক আবেলেফ (মস্কো), অধ্যাপক তাতারিনোফ (অস্ত্রাখান), অধ্যাপক গ্রাবার-এর (প্যারিস) এক চুক্তি অনুসারে ১৯৬৭ সালের ১লা জুলাই আফ্রিকার ছয়টি দেশে ক্লিনি-ক্যাল মালমশলা সংগ্রহের কাজ সুরু হয়। নাইরোবি (কেনিয়া), কাম্পালা (উগাণ্ডা), কিনশাসা (কঙ্গো), ইবাদান (নাইজিরিয়া), দাকার (সেনেগল) ও সিঙ্গাপুরে গবেষণা কেন্দ্রগুলির নেতৃত্ব করছেন পৃথিবীর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানী।

এই সব দেশে বিজ্ঞানীরা রোগীদের রক্তের রক্তদ্রব নিয়ে বিশ্লেষণের জন্তে মস্কো, অস্ত্রাখান ও প্যারিসে পাঠাবেন। ভ্রূণীয় গ্লোবিউলিনের অস্তিত্ব আছে কিনা, অর্থাৎ রোগী ক্যান্সারে ভুগছে কিনা, তা দেখা হবে লেবরেটরিতে।

এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হবার পর এই কাজে অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানীরা জেনেভায় মিলিত হয়ে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে টিসু পরীক্ষার সঙ্গে নিজেদের কাজের ফলাফলের তুলনা করবেন।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে আরও যুক্ত গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্তে অধ্যাপক আবেলেফ ও তাতারিনোফ

ঐ দেশে গেছেন। এঁরা দুজনেই মানুষের জ্রূণীয় অ্যালবুমেন নিয়েও গবেষণা চালাচ্ছেন। তাঁরা মনে করেন, অন্যান্য প্রাথমিক ক্যান্সার টিস্যুতেও অজ্ঞাত জ্রূণীয় অ্যালবুমেনের অস্তিত্ব থাকতে পারে, যা অন্যান্য প্রত্যঙ্গের ব্যাধির সম্পর্কেও অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারে।

ভূকম্পনের পূর্বাভাস

সমস্যাটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়: ভূকম্পনের তীব্রতা ও গতিপথের পূর্বাভাস এবং তার উৎপত্তির সময় সম্পর্কে পূর্বাভাস। এই সমস্যাগুলি আলোচনার আগে ভূকম্পন সম্পর্কে কিছু বলা যাক। তীব্রতার দিক থেকে বিভিন্ন ভূকম্পনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সামান্য কম্পন, যা শুধু ভূকম্পন নির্ধারক যন্ত্র সিস্মোগ্রাফেই ধরা পড়ে, তাথেকে সুরু করে পাহাড়-পর্বত ধ্বংসকারী বিরাট বিপর্যয় পর্যন্ত। অনেক সময় সমগ্র সহর, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়ে যায়। পৃথিবীর সমস্ত অংশে ভূকম্পনের তীব্রতা একই রকমের হয় না। এমন অনেক অঞ্চল আছে, যেখানে কখনও ভূমিকম্প হয় না, আবার এমন অঞ্চলও আছে, যেখানে ঘন ঘন তীব্র এবং মৃদু ভূকম্পন লেগেই আছে।

ভূকম্পন সম্পর্কিত গবেষণা বিজ্ঞান সিস-মোলজি মাত্র ৬০ বছর আগে থেকে চলছে। সারা বিশ্বে বর্তমানে যত ভূকম্পন নির্ধারক কেন্দ্র আছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। যেমন—সমুদ্রের বুকে এই ধরণের কোন কেন্দ্র নেই। তাহলেও বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভূকম্পন এলাকা নির্ধারণ করা গেছে।

প্রধানতঃ দুটি বিপজ্জনক ভূকম্পন এলাকা আছে। প্রথমটি হলো—কামচাট্কা, আলাস্কা ও ক্যালিফোর্ণিয়াসহ উত্তর আমেরিকা হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল বরাবর গিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার দিকে ঘুরেছে এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্য দিয়ে চীন ও জাপানের উপকূল হয়ে কামচাট্কা উপদ্বীপে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় এলাকাটি হলো—ভূমধ্যসাগরীয় ও এশীয় অঞ্চল—পর্তুগাল ও স্পেন থেকে সুরু করে ইটালী, বলকান উপদ্বীপ, গ্রীস, তুরস্ক, ককেসাস, এশিয়া মাইনর হয়ে সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্য দিয়ে বৈকাল হ্রদ পর্যন্ত গেছে এবং তারপর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলবর্তী প্রথম এলাকার সঙ্গে মিশে গেছে।

এই এলাকাগুলির মধ্যেও আবার নানান ধরণের ভূকম্পন হয়। তীব্র ধ্বংসাত্মক ভূকম্পন জাপানেই বেশী হয়। এই হলো সাধারণ চিত্র।

যদি কেউ এই এলাকাগুলির এক-একটি অঞ্চল ধরে গবেষণা করেন, যেমন ধরুন জাপান, তবে সেখানেও বিভিন্ন এলাকার মধ্যে ভূকম্পনের তীব্রতার রকমফের লক্ষ্য করবেন। ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিরাট অঞ্চলকে ভূকম্পন সম্পর্কিত বিপদ অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। এই ভূকম্পন আবার ১২ মাত্রায় বিভক্ত। এগারো বা বারো মাত্রা ভূকম্পনের মধ্যে আটটি হলো তীব্র কম্পন সম্পর্কে, যার ফলে ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে যায়। আর বাকী তিন বা চার রকম হলো অপেক্ষাকৃত কম ধ্বংসকারী। এক বা দুই রকমের কম্পন মাত্র যন্ত্রেই ধরা পড়ে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ভূকম্পন সম্পর্কিত গবেষণার প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে ভূকম্পনের তীব্রতা অনুযায়ী ভাগ করে এক মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া ভূকম্পন এলাকার মধ্যে যে সব বড় বড় সহর পড়েছে, যেমন আলমা-আতা, তাসখন্দ, ফ্রুঞ্জ, দুশাম্বে, আশকা-

খাদ, বাকু ইত্যাদিতে আরও বিস্তৃতভাবে এই ভূকম্পনের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আজকাল ভূকম্পন সম্পর্কে আরও সঠিক তথ্য পাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই ভূকম্পনের মানচিত্রের সাহায্যে ভবিষ্যতের ভূকম্পনের স্থান ও তার তীব্রতা সম্পর্কে পূর্বাভাস জানাবার সমস্যার সমাধান হয়েছে।

দ্বিতীয় সমস্যা অর্থাৎ ভূকম্পনের সময় নির্ধারণের সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করা যাক। ভূকম্পনের উৎসস্থল ভূপৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন গভীরতায় থাকতে পারে। এর বেশীর ভাগই ৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার নীচে থাকে, মাঝে মাঝে ৬০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার নীচেও হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ৬০০ কিলোমিটার গভীরেও হতে পারে। গভীরতা সম্পর্কে এরূপ ব্যাপক পার্থক্য থেকে অনেক সময় ভূকম্পনের সঠিক কারণ নির্ণয় করা যায় না। ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক গঠন ও গভীর স্তরের গঠনে বিরাট পার্থক্য।

পর্বত সৃষ্টি ও গঠন-প্রণালী সুরু হয় ভূগর্ভ থেকে। তার ফলে প্রস্তরের শক্তি বদলায় এবং এইভাবে ভাঙচুরের সৃষ্টি হয় ও পৃথিবীর উপরি-ভাগ ভাঙতে থাকে। তবে এই পদ্ধতি উপরের দিকেই বেশী ঘটে।

সম্প্রতি কয়েকজন বিজ্ঞানী বলেছেন যে, ভূকম্পনের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। আসলে আসন্ন ভূকম্পনের কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। ঋতু, সময়, কাল, চন্দ্রের কলা, সৌরকলঙ্ক ও আব-হাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে কি না দেখবার সমস্ত প্রচেষ্টার কোন ফল পাওয়া যায় নি। অন্যান্য প্রাকৃতিক লক্ষণ থেকে ভূকম্পনের সূচনার খোঁজ করতে হবে।

বর্তমানে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ভূকম্পন সম্পর্কিত গবেষণা থেকে এই ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, ভূমিকম্পের প্রস্তুতি চলে অনেক আগে থেকে। ভূকম্পনের উৎসের এলাকায় প্রাকৃতিক গঠনের (শক্তি, সহনশীলতা, ঘনত্ব, চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক গুণাগুণের) পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যান্ত্রিক ও ভূ-পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত পদ্ধতির উন্নতির ফলে মানুষ শীঘ্রই ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতে পারবে।

এই ভূ-পদার্থবিদ্যার কাজ সম্প্রতি সুরু হয়েছে। বিভিন্ন ভূকম্পন গবেষণা কেন্দ্র থেকে তথ্য জোগাড় করতে হবে। আশা করা যায়, পুরাতন অকেজো পদ্ধতি বাতিল করে নতুন নতুন পদ্ধতির সৃষ্টি হবে। সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলে অদূর ভবিষ্যতে ভূকম্পনের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

সামুদ্রিক সম্পদের সন্ধান

পৃথিবীর জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তাতে অনেকেই ঠাট্টা করে বলে থাকেন যে, এই সব অতিরিক্ত লোক ও তাদের ধনসম্পত্তির ভারে ধরিত্রী তার সমস্ত মহাদেশ ও দ্বীপপুঞ্জাদি নিয়ে একদিন সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাবে।

ঠাট্টা মনে হলেও কথাটি ঠিক। মহাদেশ-গুলি তলিয়ে না গেলেও মানুষ আজ বাঁচবার তাগিদেই সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরাবে, ফিরিয়েছেও এবং সেখানেই বাসা বাঁধবার মতলব আঁটছে। কারণ লোকসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তাতে পৃথিবীর স্থলসম্পদ ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছে। কিন্তু সমুদ্রে আছে প্রচুর খাদ্য, রাসায়নিক ও ধাতব পদার্থ, গ্যাস ও তৈল সম্পদ। এসব ছাড়াও জীবনযাত্রার অন্যান্য উপকরণ—এমন কি, বাস-স্থানের সন্ধানেও মানুষ যাচ্ছে আজ সমুদ্রের গভীরে, ব্যাপৃত রয়েছে নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহে।

সমুদ্রের চার-শ' ফুট, কি তারও বেশী গভীরে

গিয়ে থাকা মানুষের পক্ষে আজ আর কঠিন কিছু নয়। নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সমন্বিত একটি ইস্পাত-নির্মিত কামরায় করে মানুষ অনায়াসেই সেখানে যাচ্ছে, বাস করছে ও বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করছে। জলের নীচে খাদ্য সংগ্রহ ও উৎপাদন, বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে সমুদ্রে বিচরণশীল মাছের ঝাঁকগুলিকে সমুদ্রের কোন এক স্থানে আবদ্ধ করে রাখা এখন আর কল্পনার বিষয় নয়।

বর্তমানে সমুদ্র থেকে পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, মাছ, ম্যাগ্নেশিয়াম লবণ, বালি, পাথরের নুড়ি, গন্ধক, কয়লা, খনিজ লৌহ, হীরা প্রভৃতি সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই সংগ্রহের পরিমাণ ভবিষ্যতে প্রভূত পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে এবং এসব সম্পদ ছাড়াও প্ল্যাটিনাম, সোনা, টিন, ম্যাঙ্গানিজ এবং নতুন ওষুধপত্রের জন্যে নানা উপকরণও সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

এক কথায়, কোটি কোটি বছর আগে মানুষের আদি পূর্বপুরুষেরা যে দিন নতুন পৃথিবীর কর্দমাক্ত অগভীর সমুদ্রের পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেদিন থেকেই সমুদ্র সম্পর্কে সমীক্ষা ও তথ্যানুসন্ধান সুরু হয়েছে বলা চলে।

তথ্যানুসন্ধান, সম্পদ সন্ধানের কাজ সম্পূর্ণ করবার পথে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পথে রয়েছে নানাবিধ অন্তরায়—সমুদ্রের অভ্যন্তরে বিপুল জলের চাপ, প্রচণ্ড শৈত্য, অক্সিজেনের অভাব, গাঢ় অন্ধকার, যোগাযোগ করবার প্রচণ্ড বাধা। এছাড়া সমুদ্রের তলায় এমন সব ঘটনা ঘটে, যার কোন হিসাব নেই, বুদ্ধিতে যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না—যেমন, সেই অন্ধকার বায়ুহীন সমুদ্রের গভীরে মাঝে মাঝে দেখা যায় প্রবল স্রোতধারা। পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগেই রয়েছে সমুদ্র এবং সকল অঞ্চলেই রয়েছে এসব সমস্যা।

সমুদ্রের নীচে যে প্রচণ্ড জলের চাপ রয়েছে, তা পেরিয়ে অতল তলে তলিয়ে যাওয়া ও উপরে আসবার সমস্যা রয়েছে। সাবমেরিন যখন সমুদ্রের গভীরে যেতে থাকে, তখন প্রতি এক ফুট নীচে জলের চাপের পরিমাণ প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় আধ পাউণ্ড করে বাড়তে থাকে। ৩৫ হাজার ফুট নীচে কোন সামুদ্রিক যানকে পাঠালে ঐ যানের প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১৫০০০ পাউণ্ড চাপ পড়ে। এই চাপ সহ্য করবার জন্যেই অতি শক্ত ইস্পাতে নির্মিত কুঠুরীর সাহায্যে ইঞ্জিনীয়ারেরা সমুদ্রের গভীরে গিয়ে তথ্যানুসন্ধান করছেন। অন্যান্য উপাদান নিয়েও বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। তবে তাঁদের কার্যকারিতা এখনও পরীক্ষিত হয় নি। সমুদ্রের আরও গভীরে যাবার উপযোগী উন্নত ধরণের ইস্পাত উৎপাদনের জন্যে গবেষণা চলছে।

সমুদ্রের গভীরে মানুষ যে বেশ কিছু কাল বাস করতে পারে, তাও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। মানুষ যে পরিবেশে বসবাস করতে অভ্যস্ত, তার বাইরে এসে তাদের বেঁচে থাকা ও বসবাস করা যে সম্ভব, তাও এতে প্রমাণিত হয়েছে। মার্কিন নৌবাহিনীর সামুদ্রিক তথ্যসন্ধানী গবেষণাগারটি আবার ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূলের নিকটবর্তী সমুদ্রে পরীক্ষা চালাবে।

ডুবুরী ও বিজ্ঞানীরা ইস্পাত-নির্মিত এক প্রকার ক্ষুদ্র আধারের মধ্যে থেকে সমুদ্রে অবতরণ করে থাকেন। ফাইবার গ্লাস, ইস্পাতের নল এবং অন্যান্য উপকরণে তৈরি এই আধারটি দেখতে অনেকটা নৌকার মত। এর মধ্যে থাকে মোটর, ব্যাটারি অন্যান্য সাজসরঞ্জাম এবং নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।

বর্তমানে এই সকল ছোটখাটো সামুদ্রিক যান

নিয়েই বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের গভীরে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন। দু-জন যাত্রীবাহী এই ধরণের একটি যানের মোট ওজন হচ্ছে মাত্র দশ টন। এটি দেড় ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের চাদরে তৈরি।

অতি উচ্চশ্রেণীর ইস্পাতে তৈরি বলে এটি সমুদ্রের ২০০০ ফুট নীচে জলের প্রচণ্ড চাপও সহ্য করতে পারে। এর ব্যাস হলো ৫'৫ ফুট। এটি এক হাজার পাউণ্ড ওজন বইতে পারে এবং ঘণ্টায় এর গতি হলো ৫ নট বা ৯'৩ কিলোমিটার। এই দু-জন যাত্রী ঐখানে থেকে পর্যবেক্ষণ, সমুদ্রতল থেকে নমুনা হিসাবে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ—এমন কি, যান্ত্রিক হস্তের সাহায্যে কাজকর্মও করতে পারেন।

বর্তমানে এই ধরণের যান নানা রকম কাজে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। আজ বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে ডুবুরীরা সমুদ্রতলে নেমে কিছুক্ষণ পরেই আবার উঠে আসতে পারে। তারপর সমুদ্র-গর্ভে ঐ কামরায় তারা বিশ্রামও করতে পারে। ঐ কামরার আবহাওয়ায় থাকে হিলিয়াম গ্যাস। তারা বিশ্রাম নিয়ে আবার সমুদ্রে ফিরে যেতে পারে। এই ডুবুরীরা বহু রকমের কাজকর্ম করে থাকে। আমেরিকার বড় বড় পেট্রোলিয়াম কোম্পানী আছে। সমুদ্রে এদের নানা রকমের কাজকর্ম রয়েছে।

তবে একটা কথা এই যে, এক্ষেত্রে কি পরিমাণ কাজ হচ্ছে, তা জনসাধারণকে মহাকাশযাত্রার মত দেখাবার কোন সুবিধা নেই—দেখানো সম্ভবও নয়। কারণ এসবই ঘটছে লোকচক্ষুর অন্তরালে সমুদ্র-গর্ভে।

কূটনীতির দিক থেকে সমুদ্র প্রতিরক্ষা এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এজন্যে মার্কিন নৌবাহিনীর বহু আবিষ্কার সম্পর্কে গোপনতা রক্ষা করাই নীতি। বিজ্ঞানীরা নৌবাহিনীর প্রথম পরমাণুশক্তি-চালিত তথ্যসন্ধানী সাবমেরিনের পরিকল্পনা তৈরি করছেন। এই সব পরিকল্পনা অনুসারে সাব-মেরিনও প্রথম তৈরি করা হচ্ছে। নৌবাহিনী অন্যান্য ক্ষেত্রেও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। সামরিক ক্ষেত্রের মামুলী ধরণের কোন সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ সমুদ্র-গর্ভে অকেজো হয়ে গেলে তার যাত্রীদের উদ্ধার করবার উপযোগী "ডিপ সাবমারজেন্স রেস্কিউ ভেহিকল" নামেও এক প্রকার অভিনব সাবমেরিন তৈরি করা হচ্ছে। ঐ সব গবেষণামূলক তথ্যসন্ধানী ডুবোজাহাজ উদ্ধার-কার্যে যখন ব্যবহৃত হবে না, তখন এদের সমুদ্র সম্পর্কে গবেষণায় বিজ্ঞানী, ডুবুরী ও টেকনিশিয়ানদের সমুদ্র-গর্ভে পরিবহনের জন্যে ব্যবহার করা হবে।

"ডিপ সাবমার্জেন্স রেস্কিউ ভেহিকল" বা উদ্ধার-কারী যানটিকে প্রথম বিনা সাহায্যে নিকটবর্তী কোন পোতাশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর ঐ পোতাশ্রয়ে রক্ষিত আর একটি সাবমেরিনের সঙ্গে বেঁধে এটিকে প্রকৃত দুর্ঘটনা-স্থলে নিয়ে যাওয়া হবে। জলমগ্ন সাবমেরিনের যাত্রীদের এটিই উদ্ধার করবে, প্রচণ্ড স্রোতধারা ও প্রতিকূল আবহাওয়াও উদ্ধারকার্যে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইস্পাত দিয়ে তৈরি এই যানের প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা ১৩০০০০ থেকে ১৫০০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত।

সমুদ্র-বিজ্ঞান সম্পর্কে জনৈক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বলেছেন যে, আগামী দশ বছরের মধ্যে আমেরিকায় দ্রুতগতিসম্পন্ন এক প্রকার সাবমেরিনও তৈরি হতে পারে। এই সাবমেরিন হবে সর্বত্র গমনোপযোগী। এদের সাহায্যে সমুদ্র-গর্ভ থেকে খনিজ সম্পদ উদ্ধার, কৃমিসার সংগ্রহ, সুমেরু অঞ্চলে বরফের তলায় যে বিপুল তৈল সম্পদ রয়েছে তা পরিবহনে ব্যবহার, সামুদ্রিক জীব থেকে অ্যান্টিবায়োটিক ও হর্মোন তৈরি এবং নতুন নতুন ভেষজ উৎপাদন সম্ভব হবে। তারপর জলমগ্ন মালবাহী জাহাজ

এবং নানা জাতীয় মৎস্য ও খাদ্য সংগ্রহ করাও এর সাহায্যে সম্ভব হবে। সমুদ্র-গর্ভে ২৫০০০ বিভিন্ন নানাজাতীয় মাছ আছে। সামুদ্রিক ঝড়ের গতির মোড় ফিরিয়ে দেওয়া ও নির্মূল করবার উপায় উদ্ভাবনও এর সাহায্যে করা যাবে। তবে জলের নীচে থাকবার জন্যে যে অক্সিজেন প্রয়োজন, তা সমুদ্র থেকেই পাবার পন্থা উদ্ভাবনে কিছুটা দেরী হবে।

শব্দোত্তর তরঙ্গ

শিখা মুখোপাধ্যায়

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিচিত্র শব্দ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে। এই শব্দ—আলো, তাপ প্রভৃতি শক্তির মতই এক শক্তি। দেখা গেছে, বস্তু কম্পিত হলে তাথেকে শব্দ বের হয়। এই শব্দ জড় মাধ্যম (যেমন—বাতাস, জল বা অন্য কোন মাধ্যম) অবলম্বন করে আমাদের কানে এসে পৌঁছায়। কিন্তু মাধ্যমের ভিতর দিয়ে শব্দের বিস্তার হয় কেমন করে? কোন বস্তু যখন কম্পিত হয়, তখন তার এদিক-ওদিক আলোড়নের ফলে তার সম্মুখবর্তী মাধ্যমের প্রতি স্তরে চাপ-বন্টনের তারতম্য ঘটে; ফলে বস্তুর একবার পূর্ণকম্পনের মাধ্যমে একটি ঘনীভবন (Compression) ও একটি তনুভবন (Rarefaction) সৃষ্টি হয়। এরা তাদের পারস্পরিক অবস্থান ঠিক রেখে মাধ্যমের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয় এবং আমাদের কানে পৌঁছায় (১নং চিত্র)। একটি ঘনীভবন ও একটি তনুভবন মিলিত হয়ে একটি পূর্ণ তরঙ্গ গঠন করে। একটি ঘনীভবনের মধ্যবিন্দু থেকে অপরটির মধ্যবিন্দু পর্যন্ত দূরত্বকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলা হয়। এক সেকেণ্ডে মাধ্যমের মধ্যে যতগুলি পূর্ণ তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তাকে তরঙ্গের কম্পাঙ্ক (Frequency) বলা হয়।

১নং চিত্র
শব্দ বিস্তারের কৌশল।

দেখা গেছে, কোন উৎসের কম্পাঙ্ক তিরিশের চেয়ে কম বা ১৬০০০-এর চেয়ে বেশী হলে উৎস-নিঃসৃত সুর আর শোনা যায় না। সুতরাং শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দের কম্পাঙ্ক-সীমা ৩০—১৬০০০-এর মধ্যে। এই সীমা অবশ্য মানুষের বয়স ও শ্রবণ-যন্ত্রের কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

তিরিশের কম কম্পাঙ্কযুক্ত তরঙ্গকে বলা হয় শব্দেতর তরঙ্গ (Subsonic wave) এবং

১৬০০০-এর বেশী কম্পাঙ্কযুক্ত তরঙ্গকে বলা হয় শব্দোত্তর তরঙ্গ (Supersonic wave)।

প্রাণিজগৎ অনুভব করতে পারুক আর নাই পারুক, বিশ্ব জুড়ে অশ্রুত সুরে সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হয়েই চলেছে। এই অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে মানুষ অজ্ঞ ছিল বহুদিন, কিন্তু আজ সেই জগতের অনেক রহস্যই তার ঔৎসুক্য ও আবিষ্কারের আলোকে উদ্ভাসিত।

ইতিহাস

শব্দোত্তর তরঙ্গ সম্পর্কে মানুষ কবে যে প্রথম অবহিত হয়, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলা যায় না। তবে প্রাচীন যুগের শিকারীরা লক্ষ্য করেছিল যে, কুকুরের শ্রবণযন্ত্র অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। শুধু কুকুর নয়, অনেক পশু-পক্ষীর শ্রবণযন্ত্র মানুষের চেয়ে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন। বাদুড়ের শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রয়োগ ক্ষমতা এবং তার সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়া সত্ত্বেও চলাফেরা ও শিকার খোঁজবার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

শব্দোত্তর তরঙ্গ সম্বন্ধে মানুষের যথার্থ গবেষণা সুরু করবার কথা বেশী দিনের নয়। গত শতাব্দীর শেষের দিকে খুব সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রাকৃতি সুরশলাকার সাহায্যে সর্বোচ্চ ৯০,০০০ কম্পাঙ্ক-যুক্ত শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। বিশেষ এক ধরণের হুইসিল্ দিয়েও শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করা হতো। সৃষ্টি হলেও এর ব্যবহার কিন্তু হয়েছিল অনেক পরে। ১৯১২ সালে উত্তর আমেরিকার সমুদ্রে হিমশৈলে ধাক্কা লেগে বৃটিশ জাহাজ টাইটানিকের হাজার হাজার যাত্রীসহ ডুবে যাবার সংবাদে পৃথিবী যখন স্তব্ধ, তখন স্বভাবতঃই মনে এসেছিলো—কিভাবে এই ধরণের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মান ডুবোজাহাজের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্তে ১৯১৬ সালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক Pal Langevin প্রথম শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। উচ্চ কম্পাঙ্কযুক্ত শব্দোত্তর তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব কম হওয়ায় তা আলোর মত চলাচল করতে পারে। Langevin প্রস্তাব করেন, একগুচ্ছ শব্দোত্তর তরঙ্গকে যদি জলের মধ্য দিয়ে পাঠানো যায়, তাহলে তার সামনে কোন বাধা, যেমন—কোন ডুবোজাহাজ যদি থাকে, তবে প্রেরিত ঐ তরঙ্গ নিশ্চয়ই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসবে। ঐ প্রতিফলিত তরঙ্গ গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা পড়লেই বোঝা যাবে ডুবোজাহাজের অস্তিত্বের কথা। তার দূরত্বও বের করা যায় অনায়াসে। যদি জলে শব্দের বেগ v হয় এবং ঐ প্রেরণ ও গ্রহণ—এই দুইয়ের মধ্যে সময় ব্যবধান যদি t সেকেণ্ড হয়, তবে প্রেরক বা গ্রাহক-যন্ত্র থেকে ডুবোজাহাজের দূরত্ব হবে $\frac{vt}{2}$। সাধারণতঃ হাইড্রোফোনকে গ্রাহক-যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

এই কাজে ব্যবহৃত শব্দোত্তর তরঙ্গ খুব শক্তিশালী ছিল না। এর জন্তে অক্লান্ত গবেষণা চললো বিভিন্ন দেশে। অবশেষে শব্দোত্তর তরঙ্গ আজকের গৌরবময় যুগে এসে দাঁড়ালো।

পিজো-ইলেকট্রিক এফেক্ট ও শব্দোত্তর তরঙ্গ

বর্তমানে শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট উপায় পিজো-ইলেকট্রিক এফেক্টকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। ব্যাপারটা কি, এখন দেখা যাক।

কোয়ার্টজ্-এর নাম বোধ হয় সকলের জানা আছে। এই কৃষ্ট্যালের এক বিশেষ ধর্ম লক্ষ্য করা গেছে। কোয়ার্টজের একটা প্লেট কেটে নিয়ে যদি তার উপর চাপ প্রয়োগ করা যায়, তবে এর দুই তলে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক—এই

দুই বিপরীত বৈদ্যুতিক আধান উৎপন্ন হয়। চাপ প্রয়োগে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই ঘটনাকে বলা হয়—পিজো-ইলেকট্রিক এফেক্ট।

এথেকে বোঝা যায়, যদি পর্যায়ক্রমে ঐ প্লেটকে একবার সঙ্কুচিত ও আবার প্রসারিত করা যায়, তবে তার প্রতিটি তলের বিদ্যুৎ-আধানের পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ঘটবে।

এর বিপরীত ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে, অর্থাৎ যদি কোয়ার্টজ্ প্লেটের দুই তলের বিদ্যুৎ-আধানের প্রকৃতির ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটানো যায়, তবে প্লেটটি একবার সরু, একবার মোটা পরিবর্তনের হার এই অনুনাদ কম্পাঙ্কের সমান হয়, তবে প্লেটের কম্পন অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। একটি কোয়ার্টজ্ প্লেটকে কাগজের মত সরু করে কাটা যায়। প্লেট যত সরু হয়, তত তার অনুনাদ-কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পায়; কাজে কাজেই শব্দোত্তর তরঙ্গের কম্পাঙ্কও বৃদ্ধি পায়। ০·৫ মি. মি. বেধযুক্ত একটি প্লেটের সাহায্যে ৫·৭৬ মিলিয়ন সাইকল/সে. কম্পন সৃষ্টি করা যায়।

এখন একটি পিজো-ইলেকট্রিক সুপারসনিক জেনারেটরের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।
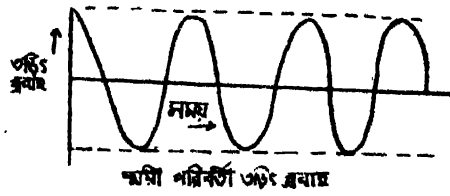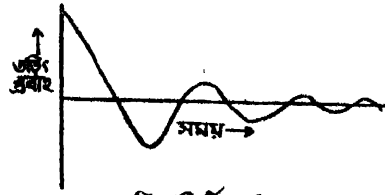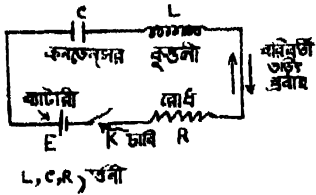
২নং চিত্র

হবে। প্লেটের এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ তার চারপাশের মাধ্যমে সঞ্চালিত হবে এবং অচিরেই প্লেটটি মাধ্যমে উৎপন্ন এক তরঙ্গের উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্লেটে প্রযুক্ত বৈদ্যুতিক আধানের পরিবর্তনের হারের উপর উৎপন্ন তরঙ্গের কম্পাঙ্ক নির্ভর করে। বৈদ্যুতিক আধানের প্রকৃতির পরিবর্তনের হার বৃদ্ধি করে উৎপন্ন তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি করা যায়। দেখা গেছে, প্রত্যেক কম্পনশীল বস্তুর নিজস্ব একটা অনুনাদ-কম্পাঙ্ক (Resonance-frequency) থাকে। যদি প্লেটে প্রযুক্ত আধান

এই যন্ত্রে পিজো-ইলেকট্রিক প্লেটের দুই তলে আধানের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো হয় ইলেকট্রনিক অসিলেটরের সাহায্যে। দেখা গেছে, একটি তারের কুণ্ডলী (L), একটি কনডেনসার (C) ও একটি রোধকযুক্ত (R) কোন বর্তনীতে (Circuit) তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে বর্তনী যদি ছিন্ন করা যায়, তবে তাতে পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহের (A. C) সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাপ শক্তির অপচয়ের জন্যে এই প্রবাহ কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় (২নং চিত্র)। ইলেকট্রনিক অসিলেটরে Feed back পদ্ধতিতে

শক্তির এই অপচয় নিবারণ করে স্থায়ী পরিবর্তী প্রবাহের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রবাহের কম্পাঙ্ক যদি f হয়, তবে,

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$ হবে P, যেখানে L, কুণ্ডলীর স্বীয় আবেশ গুণাঙ্ক (Co-efficient of self induction); C, কনডেনসারের ক্যাপাসিটি (Capacity) এবং R রোধক। পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহ পেতে গেলে $\frac{R^2}{4L^2} < \frac{1}{Lc}$ হতে হবে। এখন P, সুপারসনিক জেনারেটরের বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে প্লেটটিকে কোন অন্তরক তরল (Insulator), যেমন—ট্র্যান্সফরমার অয়েলে নিমজ্জিত রাখা হয়।

কোয়ার্টজ্ ছাড়াও অন্যান্য পদার্থ, যেমন—Rochelle salt, অ্যামোনিয়াম ডাইহাইড্রোফসফেট, লিথিয়াম সালফেট প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতিগতভাবে এই যে সব ক্রষ্টাল পাওয়া যায়, এদের একটা প্রধান অসুবিধা হলো এই যে, এদের ঠিকমত কাটা খুব কঠিন। এই অসুবিধা দূর হয়েছে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা
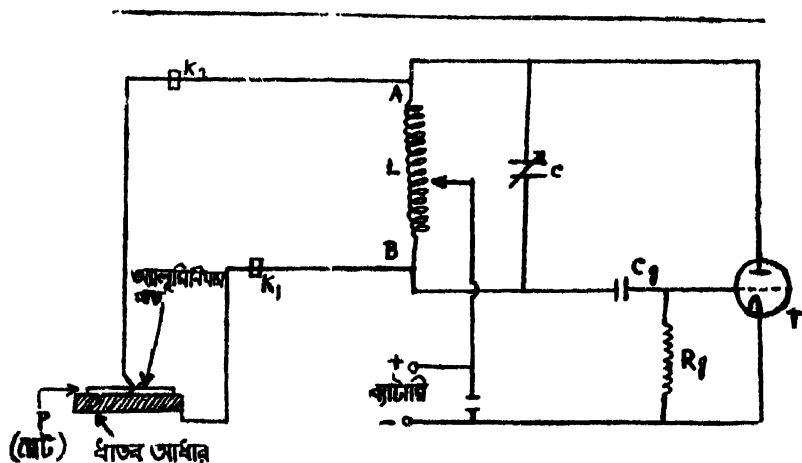
৩নং চিত্র
পিজো-ইলেকট্রিক সুপারসনিক ওয়েভ জেনারেটর।

পিজো-ইলেকট্রিক প্লেট (৩নং চিত্র), অসিলেটরের থার্মোআয়নিক টিউব T, C এবং Cg কনডেনসার, রোধক Rg, AB তারের কুণ্ডলী, B ব্যাটারী। P প্লেটটি একটি ধাতব আধারে রাখা হয়। এই আধারের সঙ্গে K_1 টার্মিনাল যুক্ত থাকে। প্লেটটি একটি অ্যালুমিনিয়াম পাত দিয়ে আবৃত থাকে, যার সঙ্গে আবার একটি হাল্কা স্প্রিং যুক্ত থাকে। এই স্প্রিং-এর সঙ্গে K_2 টার্মিনাল সংযুক্ত থাকে। উচ্চমানের বিভব প্রভেদ সৃষ্টির জন্যে প্লেটের চারধারে কখনও কখনও সম্প্রতি টিটানেট নামে একপ্রকার পদার্থ আবিষ্কার করায়, যাদের মধ্যে বেরিয়াম টিটানেটের নাম করা যেতে পারে। এই পদার্থটি তৈরি করা হয় বেরিয়াম হাইড্রক্সাইড ও টিটানিক অ্যাসিডের সহযোগে। প্রকৃতিগতভাবে এই পদার্থটি পিজো-ইলেকট্রিক এফেক্ট প্রদর্শন করে না, তবে এই বৈশিষ্ট্য তার উপর আরোপ করে দেওয়া হয় শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রভাবে। কৃত্রিমভাবে পাওয়া এই সব পদার্থকে ইচ্ছামত কেটে গোলাকার, চোঙাকৃতি,

অবতলাকৃতি, যেমনই হোক আকার দেওয়া যায়।

শব্দোত্তর তরঙ্গ উৎপাদনের আর একটি উল্লেখযোগ্য উপায়

শব্দোত্তর তরঙ্গ উৎপাদনে পদার্থের ম্যাগ্‌নেটোষ্ট্রিকশন (Magnetostriction) ধর্ম কখনও কখনও প্রয়োগ করা হয়।

প্রবাহ পাঠিয়ে যদি তার মধ্যে একটি ম্যাগ্‌নেটোষ্ট্রিকটিভ পদার্থের রড রাখা যায়, তবে রডটি একবার প্রসারিত ও একবার সঙ্কুচিত হবে ও তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। প্রবাহের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি বা হ্রাস করে যথাক্রমে শব্দোত্তর তরঙ্গ এবং শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দ উৎপন্ন করা যায়। ট্রান্সফরমারের কোর (Core) থেকে মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়, তা এই ম্যাগ্নেটোষ্ট্রিকশনের জন্যে হয়।
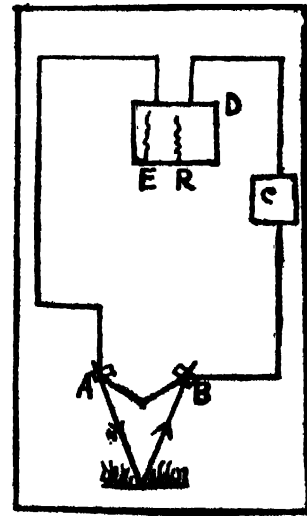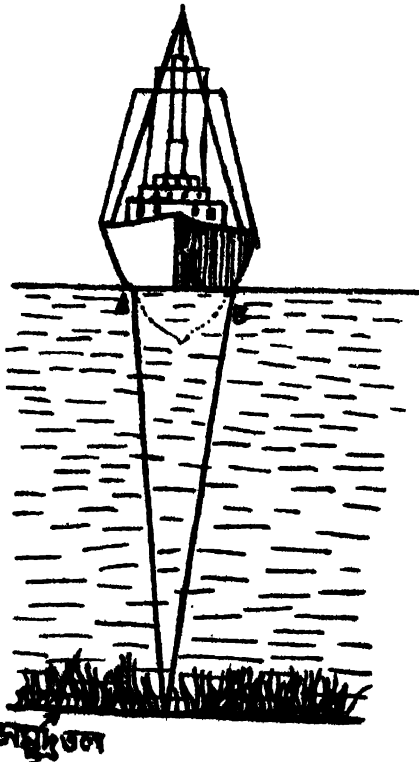
৪নং চিত্র

বাধাহীনভাবে ঝোলানো কোন কুণ্ডলীকে একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রেখে কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে যদি পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহ পাঠানো যায়, তবে কুণ্ডলীটি চুম্বকের দ্বারা একবার আকর্ষিত ও একবার বিকর্ষিত হবে ও তরঙ্গ সৃষ্টি করবে।

আবার একটি কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে পরিবর্তী

ম্যাগ্নেটোষ্ট্রিকটিভ পদার্থ হিসাবে লোহা, নিকেল প্রভৃতি ধাতু, পারমেণ্ডুর ফেরাইট প্রভৃতি সঙ্কর ধাতু ব্যবহার করা হয়।

শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার

শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রথম ব্যবহার যুদ্ধের কাজে হলেও শান্তির পথে মানব-সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে

যাবার পিছনে তার অবদান কিছু কম নয়। পদার্থ-বিজ্ঞানে, রসায়ন-বিজ্ঞানে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, জীব-বিজ্ঞানে, শিল্পে ও দৈনন্দিন প্রয়োজনে এই অদৃশ্য হাতিয়ার শব্দোত্তর তরঙ্গ অন্যতম প্রধান অবলম্বন হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

(১) সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়—একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহারের দ্বারা সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায় (৪নং চিত্র)। একটি সুপারসনিক ম্যাগ্নেটোষ্ট্রিকটিভ ভাইব্রেটর (A) জাহাজের তলদেশে আট্‌কানো থাকে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই উৎস যে সঙ্কেত পাঠায়, তা একটি বিশেষ ধরণের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে (D) লিপিবদ্ধ করা হয় (E)। এই সঙ্কেত সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ম্যাগ্নেটো-ষ্ট্রিকটিভ গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। প্রতিফলিত তরঙ্গ এরপর অ্যাম্‌প্লিফায়ারের (C) মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে (D) যায় এবং এই সঙ্কেতও সেখানে লিপিবদ্ধ হয় (R)। E এবং R রেখার দূরত্ব বেশী হলে সমুদ্রের গভীরতা সেখানে বেশী বুঝতে হবে। এদের দূরত্ব সম্বন্ধীয় বিশেষ স্কেল ব্যবহার করে প্রকৃত গভীরতা মাপা যায়। এই ধরণের যন্ত্রকে বেথোগ্র্যাম (Bathogram) বলা হয়।

(২) মৎস্য-শিকার—আধুনিক মৎস্য-শিকারী-গণ এই তরঙ্গের ব্যবহার করেন মাছ ধরবার কাজে। মাছের পেটে যে বায়ুপূর্ণ থলি থাকে, তা খুব ভালভাবে শব্দোত্তর তরঙ্গকে প্রতিফলিত করতে পারে। প্রতিফলিত ঐ তরঙ্গ হাইড্রোফোন যন্ত্রে ধরা পড়ে এবং মাছের অস্তিত্ব জানা যায়।

(৩) ধোঁয়া ও কুয়াশা দূরীকরণ—কল-কারখানায় উপস্থিতির জন্যে বাতাসে যে দূষিত ধোঁয়া দেখা যায় কিংবা শীতকালের কুয়াশা, যার জন্যে জাহাজ, এরোপ্লেন চলাচল বিঘ্নিত হয়, তা শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রয়োগে দূর করা যায়। ঐ তরঙ্গ প্রয়োগে বাতাসের দূষিত কণাগুলি অথবা শীতকালে জল-কণাগুলি পরস্পর জোট পাকিয়ে বড় আকারের হয়ে যায় এবং অবশেষে ভারী হয়ে নীচে পড়ে। শব্দোত্তর তরঙ্গের এই জোটবদ্ধ করাবার ক্ষমতা থাকবার জন্যে সালফিউরিক অ্যাসিড-শিল্পে তার বাষ্প থেকে তরল আকারে অধঃক্ষিপ্ত করাবার উদ্দেশ্যে শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়।

(৪) অন্ধের পথনির্দেশক—অন্ধ মানুষের দৃষ্টিহীনতা আজকাল আর তাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ দেয় না। তার কাছে একটি শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রেরক যন্ত্র ও একটি গ্রাহক যন্ত্র থাকলে অনায়াসেই সামনের কোন বাধা—এমন কি, একটি সুতার বাধা থাকলেও প্রেরক যন্ত্র থেকে প্রেরিত তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে এবং একটি বিশেষ ব্যবস্থাযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে তা শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দে রূপান্তরিত হয়ে অন্ধ মানুষকে পথ চলবার বিপদ থেকে রক্ষা করে।

(৫) কাপড় কাচা—ময়লা কাপড়চোপড় এই তরঙ্গের সাহায্যে খুব অল্প সময়ে ভালভাবে কাচা যায়। একটি পাত্রে গরম সাবান জল রেখে পোষাকগুলি তাতে ডুবিয়ে সাবান-গোলা জলে শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে দ্রুত কম্পন সৃষ্টি করলে কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায়। শব্দোত্তর তরঙ্গ সাবান-জলের ক্ষারীয় প্রকৃতি বিনষ্ট করে বলে সুতা বা পশমের কোন ক্ষতি হয় না।

(৬) ফাট বা ফাটল নির্ণয়—কারখানায় বড় বড় যন্ত্রপাতির মধ্যে কোথাও কোন সূক্ষ্ম ফাটল ধরেছে কি না বা কোন ঢালাইয়ের কাজের মধ্যে বাতাসের বুদ্বুদ থেকে গেছে কি না, তা এই শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। যে কোন ধাতুকে ভেদ করে বহুদূর অবধি যাবার ক্ষমতা এর আছে।

(৭) পৃথিবীর গঠন ও আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি—শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে পৃথিবীর গঠন ও আভ্যন্তরীণ বস্তু-প্রকৃতির সন্ধানের খবরও পাওয়া গেছে। তবে এই বিষয়টি এখনও গবেষণাধীন রয়েছে।

(৮) স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক নির্ণয়—স্থিতিস্থাপকতা পদার্থের একটি বিশেষ ধর্ম। ইয়ং-এর গুণাঙ্ক (Young's modulus) 'Y' যদি জানা থাকে, তবে যে কোন বল প্রয়োগের জন্যে তার বিকৃতির পরিমাণ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। কিন্তু 'Y' মাপতে গেলে পদার্থের উপর সরাসরি যে বলপ্রয়োগ করা প্রয়োজন, তা কোন কোন পদার্থ, যেমন—কৃষ্টাল, সহ্য করতে পারে না। শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রয়োগে এই সব পদার্থের 'Y' মাপা যায়। কোন পদার্থে শব্দের বেগ এবং সেই পদার্থের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক সম্বন্ধীয় যে সূত্র আছে, তা প্রয়োগ করেই সেই পদার্থের 'Y' মাপা হয়।

(৯) অন্যান্য ব্যবহার—শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রয়োগে ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাতু জোড়া দেওয়া হয়। তরল পদার্থের সান্দ্রতা বা ভিসকসিটি নির্ণয় করা হয় আলট্রাসনিক ভিস্কসিমিটারের সাহায্যে। কাচ কাটা, তার গায়ে দাগ কাটা প্রভৃতি কাজে এই তরঙ্গের ব্যবহার হয়। এছাড়া পদার্থের আভ্যন্তরীণ গঠন এবং তার রহস্য সন্ধানে বিজ্ঞানীরা এই তরঙ্গের ব্যাপক ব্যবহার করছেন। দেখা গেছে, পুরনো মদ সদ্য-প্রস্তুত মদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মদ পুরনো করা সময়-সাপেক্ষ। মদে শব্দোত্তর তরঙ্গ পাঠালে অতিক্রত তাতে পুরনো মদের গুণ উৎপন্ন হয়।

(১০) অদ্রবণীয় পদার্থকে দ্রবণীয় করা—বিভিন্ন পদার্থ জলে অদ্রবণীয়, যেমন—পারদ। একটা টেষ্ট টিউবে কিছু জল ও পারদ মিশিয়ে দিলে দেখা যাবে, পারদ তলায় এসে জমেছে আর পরিষ্কার জল উপরে রয়েছে। টেষ্ট টিউবটি ঝাঁকালে পারদ ছোট ছোট বলে ভাঙতে থাকবে এবং অবশেষে জলে মিশে যাবে। কিন্তু ঝাঁকানো বন্ধ করলেই আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। এই রকম অবস্থায় টেষ্ট টিউবটিকে শব্দোত্তর তরঙ্গের তীব্র ধারার মধ্যে রাখলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পারদের স্থায়ী অবদ্রব (Emulsion) তৈরি হবে।

এই রকম বিটুমিনাস অবদ্রব রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। খাদ্য প্রস্তুতিতে বিভিন্ন সস্ এবং ক্রীম শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রয়োগে মিশ্রিত করা হয়।

সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতিতে, বস্ত্রশিল্পে, চর্মশিল্পে, কৃষি-বিজ্ঞানে শব্দোত্তর তরঙ্গের এই ধরণের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক।

বিভিন্ন কঠিন পদার্থের দ্রবণ প্রস্তুত করবার কাজেও শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। এর সাহায্যে জিপ্‌সাম, মাইকা, সালফার প্রভৃতি অজৈব পদার্থ এবং ন্যাপথালীন, কর্পূর প্রভৃতি জৈব পদার্থের দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়।

ধাতুকে দ্রবীভূত করা কঠিন হলেও তা সম্ভব হয়েছে। সিলভার সাস্‌পেন্‌সন প্রস্তুতির একটি সহজ উপায় বর্ণনা করা যাক (৫নং চিত্র)।

একটি পাত্রে তড়িৎবিশ্লেষ্য (Electrolyte) হিসাবে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ নেওয়া হয়। অ্যানোড হিসাবে সিলভার প্লেট এবং অন্য একটি ধাতব প্লেটকে ক্যাথোড হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পাত্রটি শব্দোত্তর তরঙ্গ উৎপাদনক্ষম কোয়ার্টজ্ প্লেটের উপর থাকে। ব্যাটারীতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালে অ্যানোড থেকে বিশুদ্ধ রূপা দ্রবণে দ্রবীভূত হবে এবং সমপরিমাণ রূপা ক্যাথোডে জমা হবে। এখন কোয়ার্টজ্ প্লেট থেকে উৎপন্ন শব্দোত্তর তরঙ্গ দ্রবণে পাঠালেই দেখা যাবে, ক্যাথোডে সঞ্চিত রূপা আবার দ্রবণে দ্রবীভূত হচ্ছে এবং তার ফলে সিলভার অবদ্রব পাওয়া যাচ্ছে।

(১১) কর্পূর দ্রবীভবন—আমরা কিছু পূর্বে

কর্পূর দ্রবীভূত করবার কথা বলেছি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এই দ্রবণের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। কর্পূর জলে অদ্রবণীয় হওয়ায় জলে অবদ্রব অবস্থায় শরীরে ইনজেকসন করতে হয়। কিন্তু এর ফলে মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন বিঘ্নিত হয়। রোগীর পক্ষে তা কাম্য নয়। শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রয়োগে কর্পূরকে জলে সম্পূর্ণ-রূপে দ্রবণীয় করে ইঞ্জেকসন দিলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না।

৫নং চিত্র

আরও দেখা গেছে, সাধারণভাবে প্রস্তুত স্যালকামাইড অবদ্রব অপেক্ষা শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রয়োগে প্রস্তুত এই অবদ্রব মানবদেহে অনেক বেশী সক্রিয়।

(১২) রসায়ন-বিজ্ঞান — পলিমারিজেসন রসায়নশাস্ত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ায় কতকগুলি ছোট ছোট অণু একত্রিত হয়ে রাবার, প্লাষ্টিক প্রভৃতির বড় বড় অণু তৈরি করে। শব্দোত্তর তরঙ্গের দ্বিমুখী ক্ষমতা আছে—একদিকে সে যেমন পলিমারিজেসন করতে পারে, অন্ত দিকে ডি-পলিমারিজেশনও করতে পারে।

শিরিষের (Gelatin) জেলির মত দ্রবণ নিয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গের ধারায় রাখলে দেখা যাবে, জেলির থক্‌থকে ভাবটি কমে আসছে এবং অবশেষে দ্রবণে তা ভাসছে। অন্ত দিকে বিভিন্ন পদার্থের সংশ্লেষণও শব্দোত্তর তরঙ্গ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এবং দ্রুত করতে পারে।

(১৩) চিকিৎসা-বিজ্ঞান—শব্দোত্তর তরঙ্গ জীবদেহের কোষকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে পারে। $\frac{১}{২৮০}$ সেকেণ্ডের কম সময়ে একটি সম্পূর্ণ কোষ ধ্বংস হয়।

যক্ষ্মা, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক অসুখের জীবাণু এর সাহায্যে বিনষ্ট হতে পারে।

মাইক্রো-অরগ্যানিজমকে ধ্বংস করবার ক্ষমতা থাকায় পানীয় জল, দুধ, খাদ্যদ্রব্যাদি জীবাণুমুক্ত (Sterilize) করবার জন্তে শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

শব্দোত্তর তরঙ্গের এই ক্ষমতা থাকবার ফলে

বিভিন্ন টক্সিন, এনজাইম প্রভৃতি মাইক্রো-অরগ্যানিজম থেকে তৈরি করা হয়।

হুপিং কাশির জীবাণুর মধ্য দিয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গ পরিচালিত করে এণ্ডোটক্সিন নামে বিষাক্ত পদার্থ পাওয়া যায়। একে আবার শীতল স্থানে রেখে দিলে এর Toxic ধর্ম বিনষ্ট হয় এবং প্রাণীকে ঐ রোগ থেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা জন্মায়।

মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় গবেষণায় বা তার চিকিৎসায় এক্স-রে অপেক্ষা শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার অধিকতর উপযোগী। কারণ এক্স-রের পক্ষে মাথার খুলি ভেদ করা বেশ কষ্টসাধ্য। শব্দোত্তর তরঙ্গ তা সহজেই পারে। গুরুমস্তিষ্কের (Cerebrum) বিভিন্ন অংশে এই তরঙ্গ বিভিন্ন ভাবে শোষিত হয়। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে এথেকে জানা যায়। তবে গুরুমস্তিষ্কে শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রয়োগের কয়েকটি অসুবিধাও আছে। সেই সব অসুবিধা অবশ্য দূর করাও হচ্ছে।

বিকল স্নায়ুতন্ত্রের চিকিৎসায় শব্দোত্তর তরঙ্গ খুব ভাল কাজ করে। সায়াটিক নার্ভের বিকলতায়, নিউরোলজিয়াতে এর ব্যবহার হয়। কখনও কখনও মস্তিষ্কের তীব্র যন্ত্রণার অবসান শব্দোত্তর তরঙ্গ ঘটায়।

মানবদেহের কোন অংশে দূষিত টিউমার (Malignant tumour) হলে শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে তা জানা যায়।

দেখা গেছে, সুস্থ টিস্যু কর্তৃক প্রতিফলিত শব্দোত্তর তরঙ্গ টিউমার আক্রান্ত টিস্যু কর্তৃক প্রতিফলিত তরঙ্গ থেকে আলাদা।

একই প্রক্রিয়ায় ক্যান্সার রোগাক্রান্ত টিউমারের অস্তিত্ব জানা যায়। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রতিফলিত তরঙ্গ সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশে এই সব টিউমারের অস্তিত্ব নির্ণয়ের জন্যে পৃথক পৃথক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

(১৫) আল্ট্রাসনিক মাইক্রোস্কোপ—শব্দোত্তর তরঙ্গের অণুবীক্ষণ যন্ত্র। ভাবলেও অবাক লাগে। তাও সম্ভব হয়েছে বর্তমান যুগে। এই আশ্চর্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যা চোখে দেখা যায় না, যা আমাদের পরিচিত অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না, সেই সব অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার নির্ভুলভাবে দেখা যায়।

এই সব আলোচিত বিষয় ছাড়াও শ্রুতি-পারের এই তরঙ্গ বিজ্ঞানের আরও কত ব্যাপক শাখায় নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। শব্দোত্তর তরঙ্গ তার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতায় মানব-সভ্যতাকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার—একথা ভাবা আজ অযৌক্তিক হবে না নিশ্চয়।

আমাদের পৃথিবী

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ

আমরা পৃথিবীতে বাস করি, কিন্তু তার সম্বন্ধে কতটুকু জানি? জানবার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন। আগ্রহ থাকলেও বহুকাল পর্যন্ত মানুষের সুযোগ ছিল সীমিত। বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহু পরিমাণে এই সুযোগ এসেছে। কিন্তু এখনও বাধা আসে বহু দিক থেকে। কোন দেশের সন্ধানীরা যদি জ্ঞানের পরিধি কেবল তাদের সীমায় সীমাবদ্ধ রাখে, তাহলে অন্ততঃ আমাদের বাসস্থল পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যাবে না। এটা উপলব্ধি করে ভূগোল-বিজ্ঞানীরা মিলে এক সঙ্কল্প করেন যে, দেড় বছরের জন্যে সকল দেশের সকল বিজ্ঞানী মিলে এক গবেষণা-সূচী নিয়ে সর্বাত্মক গবেষণা চালাবেন। ১৯৫৭-৫৮ সাল এই গবেষণার সময় নির্ধারিত হয় (১লা জুলাই থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত)। এই সময়টার নাম দেওয়া হয় আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বছর (International Geo-physical Year—I. G. Y.)। এই সময়টা নির্বাচনের একটা উদ্দেশ্য ছিল। সর্বাধিক সৌর-কলঙ্ক আবির্ভাবের সময় ছিল এটা। সৌরকলঙ্কের সঙ্গে পৃথিবীর ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাওয়া যাবে এই বছরে। এই গবেষণার কাল শেষ হলে এর সার্থকতা উপলব্ধি করে এই আন্তর্জাতিক গবেষণার কাজ ১৯৬১ সালেও চলে আসছে—আরও কত কাল চলবে বলা যায় না।

৬৭টি দেশ এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছে। আমাদের ভারতবর্ষও এর অন্তর্ভুক্ত এবং বহু প্রকার গবেষণায় অংশ গ্রহণ করেছে। রাশিয়া ও আমেরিকার মত দুই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন জাতিও এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করে এগিয়ে যাচ্ছে।

মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে গবেষণার ভার নিয়েছে এই সংস্থা—(১) পৃথিবীর আকৃতি, (২) পর্বত ও পৃথিবীর বহিরাবরণের গঠন, (৩) বায়ুমণ্ডল ও আবহাওয়া, (৪) সমুদ্র ও তার তলদেশ, (৫) মেরুদেশ—বিশেষ করে দক্ষিণ মেরু, (৬) চৌম্বক শক্তি, (৭) সূর্য ও পৃথিবীর সম্বন্ধ, (৮) বহিরাগত শক্তি ও কণা। এই উদ্দেশ্যে সারা পৃথিবীতে ২০০০-এর অধিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে যে সব গবেষণা চলছে অথবা চাঁদে বা গ্রহে মানুষ পাঠাবার প্রচেষ্টা, সবই এই গবেষণার অন্তর্গত। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা সম্বন্ধে কতদূর অগ্রসর হওয়া গেছে, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে।

(১) পৃথিবীর সর্বাত্মক রূপ —

আমরা ভূগোলে পড়েছি যে, পৃথিবী একটি গোলকবিশেষ, কিন্তু তার উত্তর দক্ষিণ কমলা-লেবুর মত কিঞ্চিৎ চাপা। এর বিষুব অংশের ব্যাসার্ধ ৬৩৭৮·৩৮৮ এবং মেরু অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ৬৩৫৬·৯০৯ কিলোমিটার। সুতরাং এই দুই দিকের ব্যাসার্ধের পার্থক্য মোটে ২১·৪৭৯ কিলোমিটার। এই জ্ঞান লাভ করতে মানুষের কত যুগ লেগে গেছে—কত সন্ধানীর কত চেষ্টায় আমরা এই খবর জেনেছি। কিন্তু এই কথাই কি ঠিক? এখানে বেশ কিছু আগের এক গবেষণার কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

লোথিয়ান গ্রীন (Lothian Green) বলেন

যে, পৃথিবীর দুটি মেরুই চাপা নয়। উত্তর মেরু চাপা, কিন্তু দক্ষিণ মেরু বাইরের দিকে প্রসারিত। তিনি তিনটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—(১) পৃথিবীর মাটির অংশ মহাদেশগুলিকে মানচিত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে—মাটির অংশ উত্তর গোলার্ধে তিন অংশে বিস্তৃত এবং প্রত্যেক অংশ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত। জলের বেলায় তার বিপরীত। জলভাগ তিন অংশে উত্তর দিকে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া একইরূপে উত্তরে প্রসারিত ও দক্ষিণে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে এবং এই তিনটি ভূখণ্ডই মোটামুটি পরস্পর থেকে সমান দূরে অবস্থিত। (২) পৃথিবীপৃষ্ঠে যেখানে জমি, তাকে ফুঁড়ে উল্টো দিকে গেলে প্রতিপাদ স্থানে (Antipodes) সর্বত্রই পাওয়া যাবে জল। মাত্র $\frac{1}{২৭}$ অংশ জমির বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার নীচের একটু অংশের প্রতিপাদ স্থান এবং চীনের কিছু জমির অংশ পাওয়া যায়। (৩) গ্রীনের মতে, উত্তর মেরু অংশে জমি বেষ্টিত জল এবং দক্ষিণ মেরু অংশে স্থল পাওয়া যাবে। উত্তর মেরুতে সমুদ্রের কথা জানা ছিল, কিন্তু দক্ষিণ মেরুতে জমি পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখা গেছে, সেখানে এক মহাদেশ অবস্থিত। আর এই মহাদেশ আকারে অন্য কোন কোন মহাদেশেরই সমান হবে। এই মহাদেশ সম্বন্ধে গবেষণাও ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বছরের একটা অঙ্গ।

লোথিয়ান গ্রীন বলেন যে, নমনশীল পদার্থ নির্মিত কোন এক চতুস্তলক (Tetrahedron) তার অক্ষ (Axis) অবলম্বনে খুব জোরে ঘোরালে তার রূপ যা দাঁড়াবে, পৃথিবীর রূপও কতকটা সেই ধরণের। টেট্রাহেড্রন বা চতুস্তলকের ভূমি (Base) অংশ বাইরের দিকে ফুলে উঠবে। তল (Faces) অংশের অবস্থাও হবে তাই। কিন্তু কোণগুলি (Cones) ফুলে ভোঁতা হয়ে গেলেও তার কোণের রেশ থেকে যাবে। দক্ষিণ মেরু অংশে যে কোণ থাকবে, তার অবস্থাও হবে তাই। তবে অক্ষ অবলম্বনে তীব্র গতিতে ঘুরছে বলে ভূমির কোণগুলি থেকে দক্ষিণ দিকের অর্থাৎ চতুস্তলকের শীর্ষে এই কোণের আভাস প্রবলতর থাকবে। এখন এমনি এক নমনীয় ঘূর্ণায়মান চতুস্তলকের উপর পৃথিবীর জল ও স্থলের অনুপাতে এই দুই পদার্থ আরোপ করলে জল অংশ মাধ্যাকর্ষণের টানে সহজে সচল বলে চতুস্তলকের তল অবলম্বন করে এবং স্থল অংশ কোণ ও বাহুগুলিতে অবস্থিত থাকবে; অর্থাৎ স্থল চতুস্তলকের ভূমি সংলগ্ন কোণ ও বাহু বেষ্টন করে একটানাভাবে প্রসার লাভ করবে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দক্ষিণগামী তিনটি বাহু অবলম্বন করে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসবে। আর তাছাড়া চতুস্তলকের শীর্ষদেশেও স্থল জমা হবে। পৃথিবীর বেলায়ও হয়েছে তাই।

গোলাকৃতি স্বাভাবিক রূপ, তবে পৃথিবীর ক্ষেত্রে চতুস্তলকের আভাস এলো কেন? গ্রীন তার কারণও দেখিয়েছেন। আমাদের পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ যে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে, বৈজ্ঞানিকেরা সকলেই তা মেনে থাকেন। বিচ্ছিন্ন হবার সময় বায়বীয় ছিল পৃথিবী। সূর্য এখনও বায়বীয় অবস্থায় আছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে বায়বীয় পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে ক্রমে তরল ও কঠিন হয়েছে। কঠিন হবার সময়ে স্বাভাবিকভাবে বাইরের দিক থেকে কঠিন হতে থাকে। ফলে পৃথিবী এক সময়ে বাইরের দিকে এক কঠিন আবরণের অভ্যন্তরে তরল অবস্থায় ছিল। কিন্তু তার ঠাণ্ডা হবার বিরাম নেই। ঠাণ্ডা হবার সময় পদার্থ সাধারণভাবে সঙ্কুচিত হয়—আর সাধারণতঃ তরল পদার্থের সংকোচন কঠিন অবস্থার চেয়ে বেশী হয়। সুতরাং সেই অবস্থায় অভ্যন্তরস্থ তরল

পদার্থ যে হারে সঙ্কুচিত হয়েছে, পৃথিবীর কঠিন আবরণ তার সঙ্গে সমান তালে সঙ্কুচিত হতে পারে নি। এখন বহিরাবরণ ও অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থের মধ্যে শূন্য বা ফাঁক থাকতে পারে না। কাজেই বাইরের কঠিন আবরণ চতুস্তলকের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সমায়তনের কোন কঠিন পদার্থের তল-পরিমাণ গোলকের বেলায় সবচেয়ে কম, চতুস্তলকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী। সুতরাং পৃথিবীর বাড়্তি বহিরাবরণের জায়গা করতে গিয়ে চতুস্তলকের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছে।

এখানেই তার শেষ নয়। পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে আরও সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং তখনও কঠিন বহিরাবরণের সঙ্কোচন হার ভিতরের অংশের চেয়ে কম। ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা এসেছে, যখন কঠিন আবরণ চতুস্তলকের দিকে আর বেশী ঝুঁকতে পারে না। কিন্তু ফাঁক থাকাও তো চলবে না! তখন বহিরাবরণের দুর্বল অংশগুলি ভেঙ্গেচুড়ে আবরণকে ভিতরের গোলকের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এই আবরণ তখন গোলকের দিকে ঝোঁকে। সঙ্কোচন শেষ হয় নি। উপরিউক্ত আবরণ আবার যথাসম্ভব চতুস্তলকের দিকে ঝুঁকে আসবে। এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। আবরণ ভেঙ্গে গোলক হবার সময়ে আমরা আগ্নেয়গিরি ও ভুমিকম্পের ক্রিয়া দেখতে পাই। শুধু তাই নয়—ভূতত্ত্ববিদেরা দেখেছেন, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির ও ক্রিয়া বরাবর এক পর্যায়ে থাকে নি। সক্রিয় ও শান্ত যুগ পর্যায়ক্রমে আলাদা আলাদা দেখা যায়। সক্রিয় যুগের পরে শান্ত যুগ এসেছে। তারপরে আবার সক্রিয় যুগ। এই পর্যবেক্ষণ গ্রীনের মতবাদকে সমর্থন করে। বিচ্যুতির ক্ষেত্র দেখলেও মনে হয় যে, চতুস্তলকের কোণ ও ধারগুলি অবলম্বন করে যেন আগ্নেয়গিরির ক্রিয়া ও ভূকম্পন ঘটে থাকে। সম্ভবতঃ এগুলিই পৃথিবীর আবরণে দুর্বল অংশ।

লোথিয়ান গ্রীন ও তাঁর সমর্থকেরা আরও অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। মোটামুটিভাবে পৃথিবীর রূপ ও তার ব্যাখ্যা করে থাকলেও সূক্ষ্মতরভাবে বিচার করলে, তাঁর এই মতবাদে সব কিছুর ব্যাখ্যা হয় না। এইভাবে নানা মতের কিছু কিছু ব্যাখ্যা হলেও তা সম্পূর্ণভাবে খাপ খায় না। ফলে এক দল ভূ-বিজ্ঞানী বলেন যে, পৃথিবীর আকৃতি পৃথিবীর মতই। তাঁরা এক রকম কোন ব্যাখ্যা করাই ছেড়ে দিয়েছেন।

কোন ব্যাখ্যা না টিকবার বা নতুন কোন মতবাদ সৃষ্টিতে বাধা প্রধানতঃ দুটি—(১) স্থানীয় ভূতাত্ত্বিক গোলমাল। আমরা জানি স্থানগত বিশেষ কারণে (যেমন—ভূমিকম্প) স্থানীয় রূপের বিকৃতি ঘটে। (২) সূক্ষ্মতর মাপজোখের অভাব। রূপ নির্ধারণে স্থানবিশেষে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ পরিমাপ একটা বিশেষ পন্থা। এখন সম্যক রূপ সম্বন্ধে জানা ও ব্যাখ্যা করা হয়তো সম্ভব হবে—যদি পৃথিবীর প্রতি অংশের মাধ্যাকর্ষণ সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করা যায়। কারণ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে পৃথিবী-পৃষ্ঠের স্থানবিশেষের দূরত্ব অনুসারে অর্থাৎ সেই স্থানের ব্যাসার্ধ অনুযায়ী মাধ্যাকর্ষণের তারতম্য হবে।

আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার উৎক্ষিপ্ত কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে তার চেষ্টা হয়েছে এবং হচ্ছে। এপর্যন্ত যা জানা গেছে, তাতে লোথিয়ান গ্রীনের মতবাদের বিরুদ্ধ ফল পাওয়া যায়। কুমেরুতে তাঁর কথামত মহাদেশ পাওয়া গেছে, কিন্তু তাঁর মত অনুসারে সেখানে মাধ্যাকর্ষণ হবে সবচেয়ে কম—অন্ততঃ উত্তর মেরু থেকে তো বটেই। কারণ উত্তর মেরু পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে চাপা এবং দক্ষিণ মেরু বাইরের দিকে প্রসারিত। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহের পরীক্ষায় দেখা যায় যে, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে মাধ্যাকর্ষণ অধিক। উত্তর মেরুর ব্যাসার্ধ দক্ষিণ মেরুর ব্যাসার্ধ থেকে প্রায়

৫০ ফুট বেশী; অর্থাৎ গোলকের দক্ষিণ মেরুর অংশ চেপে ছোট হয়ে গেছে। আর তাছাড়া দক্ষিণ গোলার্ধ ২৫ ফুট আন্দাজ ফেঁপে উঠেছে বলে দেখা যায়। এ কি হলো? পৃথিবী-পৃষ্ঠের জল ও স্থলের প্রসার এবং অন্য কতকগুলি বিষয় গ্রীনের স্বপক্ষে গেলেও মাধ্যাকর্ষণজনিত ফল উল্টো হলো কেন?

ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বর্ষের গবেষণায় আর একটি বিষয় জানা গেছে—উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে জমা বরফের পরিমাণ অনেক বেশী। দক্ষিণ মেরুতে অনেক জায়গায়ই দেখা যায় যে, দুই মাইল গভীর পর্যন্ত বরফ জমে আছে, আর উত্তর মেরুতে সাধারণভাবে বলতে গেলে ১২ থেকে ১৫ ফুট। এই জমা বরফ কঠিন পৃথিবী-পৃষ্ঠের উপর জমা হয়েছে। কাজেই এই আবরণের উপর বরফের একটা চাপ পড়বে। এই চাপের ফলেই দক্ষিণ মেরুদেশের ব্যাসার্ধ ছোট হয়ে গেছে এবং তার ফলেই দক্ষিণ গোলার্ধ ২১ ফুট আন্দাজ ফুলে উঠেছে। পৃথিবী-পৃষ্ঠের গড় নমনীয়তা (Average compressibility) এবং বরফের চাপের পরিমাণ থেকে হিসাব করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, লোথিয়ান গ্রীনের চতুস্তলক মতবাদ উপেক্ষা করা চলে না।

পুষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে চাল ও ভাতের প্রস্তুতি

জিতেন্দ্রকুমার রায় ও অলোকা রায়

পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশী লোক প্রধান খাদ্যের জন্যে চালের উপরে নির্ভর করে। চাল যে সব দেশে প্রধান খাদ্য, সে সব দেশ সাধারণতঃ কৃষিপ্রধান, জনবহুল ও শিল্পবাণিজ্যে অনগ্রসর হয়ে থাকে। জমির উপরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্যে সবিশেষ চাপ পড়ায় পশুচারণের মত উপযুক্ত জমির অভাব দেখা যায়। তাই প্রাণিজ খাদ্য অর্থাৎ দুধ, মাংস ইত্যাদির উৎপাদন অত্যন্ত সীমিত হয়ে থাকে। জমির অভাব, অজ্ঞতা ইত্যাদির জন্যে শাকসব্জীর ফলনও তেমন পর্যাপ্ত হয় না। দারিদ্র্যের জন্যে অন্য দেশ থেকে পুষ্টিকর সুখাদ্য দ্রব্য আমদানী করবার সঙ্গতিও জনসাধারণের থাকে না। কাজেই দেহের পুষ্টির জন্যে জনসাধারণকে প্রধানতঃ খাদ্যশস্য, তথা চালের উপরেই নির্ভর করতে হয়। চাল যে শুধু পেট ভরাবার অর্থাৎ ক্যালরীর প্রধান উৎস তা নয়, দেহের পুষ্টিদায়ক বেশীর ভাগ খাদ্য উপাদানগুলিও অন্নভোজীরা প্রধানতঃ চাল থেকেই পেয়ে থাকে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কয়েক বছর আগে পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর অঞ্চলের কোন গ্রামে খাদ্য-সমীক্ষার কাজ চালানো হয়, যার সঙ্গে প্রথম লেখক যুক্ত ছিলেন। গ্রামের প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ দৈনিক গড়ে কতটা (গ্র্যামে) বিভিন্ন খাদ্য পেত, তা নীচের হিসাবে দেখানো হলো।

চাল (কলে-ছাঁটা সিদ্ধ)	ডাল	শাকপাতা ও তরিতরকারী	ফল	তেল	দুধ ও তজ্জাত খাদ্য	চিনি, গুড় ইত্যাদি
৬১০	৫৭	২৫০	নামমাত্র	২০	·১৫	৭

হিসাব করে দেখানো যায়, উক্ত খাদ্য থেকে যতটা ক্যালরী প্রোটিন, ফস্‌ফেট, থিয়ামিন (ভিটামিন বি$_১$), রাইবোফ্লেবিন (ভিটামিন বি$_২$), নিয়াসিন পাওয়া যায় যথাক্রমে তার ৮৫%, ৭০%, ৬৫%, ৭৫%, ৫০% এবং ৮৮% পাওয়া যায় চাল থেকে। পুষ্টির জন্যে যে চালের উপর আমরা এতটা নির্ভরশীল, সে চালের প্রকৃতিদত্ত পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলি যাতে ভাতের সঙ্গে যতটা সম্ভব বেশী মাত্রায় পেতে পারি, সে দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া সবিশেষ প্রয়োজন। কথাটা এজন্যে বলা হলো যে, কি পদ্ধতিতে চাল তৈরি করা হয়, রান্নার আগে কিভাবে চাল ধোওয়া হয় এবং কিভাবেই বা ভাত রান্না হয়, তার উপর ভাতের পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলির পরিমাণ, বিশেষ করে প্রধান প্রধান ভিটামিনগুলির পরিমাণ নির্ভর করে। চালের প্রস্তুতি, চাল ধোওয়া ও ভাত রান্নার পদ্ধতিটা এমন হতে পারে, যার ফলে চালের প্রকৃতিদত্ত থিয়ামিনের শতকরা পনেরো ভাগও আমরা ভাতের মাধ্যমে পেতে না পারি। আবার পদ্ধতিগুলি এমনও হতে পারে, যার জন্যে ভাতের মাধ্যমে চালের শতকরা ৭০।৮০ ভাগ থিয়ামিন পাওয়া সম্ভব।

চালের বিভিন্ন অংশ

ধানের তুষ বা বাইরের খোলসের মধ্যে থাকে চালের দানা। দানার নীচের দিকে অর্থাৎ বোঁটার দিকে সামান্য একটু স্থান জুড়ে থাকে বীজ বা ভ্রূণ। এই দানার উপরে থাকে দানার আবরণী আর তার নীচে থাকে অ্যালুরেন গ্রেনের কয়েকটি স্তর। অ্যালুরেন গ্রেনের নীচেই থাকে শ্বেতসার-বহুল এণ্ডোস্পার্ম। ধান ছাঁটাই করে চাল করবার সময় যে কুঁড়া পাওয়া যায়, সেই কুঁড়া, বিশেষ করে মিহি কুঁড়া হচ্ছে প্রধানতঃ ভ্রূণ, বীজ-আবরণী এবং অ্যালুরেন স্তরগুলির মিশ্রণ। বলাবাহুল্য, এণ্ডোস্পার্ম বা চালের মূল দানার ওজন ভ্রূণ, বীজ-আবরণী এবং অ্যালুরেন স্তরগুলির মোট ওজনের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু ওজনের তুলনায় বীজ, ভ্রূণ, আবরণী এবং অ্যালুরেন স্তরে বেশীর ভাগ পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলিই অধিকতর পরিমাণে থাকে। নীচের হিসাব থেকে এই বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

	প্রোটিন শতকরা যত ভাগ	ফ্যাট শতকরা যত ভাগ	খনিজ লবণ শতকরা যত ভাগ	থিয়ামিন (ভিটা বি$_১$) ১০০ গ্র্যামে যত মিলিগ্র্যাম	রাইবো-ফ্লেবিন (ভিটা বি$_২$) ১০০ গ্র্যামে যত মিলিগ্র্যাম	নিয়াসিন ১০০ গ্র্যামে যত মিলি-গ্র্যাম
বীজ, আবরণী এবং অ্যালুরেন স্তর (মিহি কুঁড়া প্রধানতঃ যাদের মিশ্রণ)	১৮ থেকে ৩২	১০ থেকে ১৮	৬	২.৫	০.২	৪০
এণ্ডোস্পার্ম বা চালের মূল দানা	৭	১	০.৫	০.০৮	০.০২	১.২

আতপ ও সিদ্ধ চাল

ধান রোদে শুকিয়ে নিয়ে কলে বা ঢেঁকীতে (অথবা অনুরূপ ব্যবস্থায়) ছেঁটে নিলে যে চাল পাওয়া যায়, তাকে বলে আতপ চাল। সিদ্ধ চাল তৈরি করতে গেলে রোদে শুকানো ধান দু-একদিন জলে ভিজিয়ে আধঘণ্টা বা ঐ রকম সময় অল্প জলে সিদ্ধ করে নিতে হয়, যাতে জলে ভিজানো ধান বাষ্পে নিষিক্ত হতে পারে। বাষ্প-নিষিক্ত করবার পর ধান রোদে শুকিয়ে ছাঁটা হয়। বাষ্প-নিষিক্ত করবার ফলে ধানের খোসা বা তুষ ফেটে যায়, কাজেই কলে বা ঢেঁকীতে খোসা ছাড়ানো সহজ হয়ে পড়ে। তার ফলে চালের দানা বহুল পরিমাণে আস্তই থেকে যায়। ধান ভিজাবার ও বাষ্প-নিষিক্ত করবার ফলে চালের রং কিছুটা ফিকে হলদে হয়ে পড়ে।

পৃথিবীতে যত চাল উৎপাদিত হয়, তার এক পঞ্চমাংশ হলো সিদ্ধ চাল। সিদ্ধ চাল খাবার রীতি প্রধানতঃ ভারতেই দেখা যায়—বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে এই রীতি চলে আসছে। কিন্তু ভারতের সর্বত্রই যে একমাত্র সিদ্ধ চাল খাওয়া হয়, তা নয়। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে অল্প বিস্তর আতপ চালও খাওয়া হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা গেছে যে, আতপ চাল থেকে সিদ্ধ চালে, বিশেষ করে কলে-ছাঁটা আতপ চালের চেয়ে কলে-ছাঁটা সিদ্ধ চালে প্রধান প্রধান ভিটামিনগুলি অধিকতর পরিমাণে থাকে। তাই বলা যায়, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্যে আতপ চাল অপেক্ষা সিদ্ধ চাল অধিকতর উপযোগী।

কলে-ছাঁটা আর ঘরে-ছাঁটা (ঢেঁকী বা উদূখলে ছাঁটা) চাল

চালের গঠন এমন যে, যন্ত্রের চাপ বেশী হলে বীজ, আবরণী ও অ্যালুরেন গ্রেনের স্তরগুলি চালের দানা থেকে সহজেই পৃথক হয়ে পড়ে। পরিমাণগতভাবে কতটা পৃথক হয়ে পড়বে, তা নির্ভর করে ছাঁটাইয়ের মাত্রার উপর। কলে যে ভাবে সাধারণতঃ চাল ছাঁটাই করা হয়, তাতে চালের উপরিউক্ত অংশগুলি বহুলাংশে দানা থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। আমরা আগেই দেখেছি, ওজনের তুলনায় বীজ, আবরণ ও অ্যালুরেনের স্তরগুলিতে পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলি, বিশেষ করে ভিটামিনগুলি অনেক বেশী পরিমাণে থাকে। তাই বীজ ও উপরের স্তরগুলি অপসারণের জন্যে চালের ওজন যে পরিমাণে কমে, পুষ্টির উপাদানগুলি কমে তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে। পরিপূর্ণ ছাঁটাইয়ের ফলে চালের পুষ্টি-মূল্য অনেক কমে যায়। থিয়ামিনের অভাবে যে বেরিবেরি রোগ হয়, এই তত্ত্ব আবিষ্কারের বহু আগেই জানা যায় যে, ক্রমাগত কলে-ছাঁটা চাল (আতপ) খেলে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। খোসা ছাড়ানো চালে (Husked rice) অর্থাৎ বীজ, আবরণী ও অ্যালুরেন স্তরগুলি পরিপূর্ণ বজায় থাকে এমন চালে থিয়ামিন, রাইবোফ্লেবিন ও নিয়াসিনের পরিমাণ যতটা থাকে, পরিপূর্ণ কলে-ছাঁটা চালে থাকে যথাক্রমে তার ২০%, ৪৫% ও ৪০%। কলে-ছাঁটা হবার ফলে প্রোটিনের ভাগও শতকরা ১৬ ভাগ কমে যায়। বলা বাহুল্য, কলে-ছাঁটা যদি পরিপূর্ণ ভাবে না হয়, তবে পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলি এতটা অপসারিত হয় না। ঢেঁকী বা উদূখলে ছাঁটাই হবার ফলে বীজ ও উপরের স্তরগুলি অনেকটা থেকে যায়, তাই ঢেঁকি-ছাঁটা চালের পুষ্টিমূল্যও তুলনায় অনেক বেশী হয়ে থাকে।

কলে-ছাঁটা হবার ফলে চালের পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলির অপসরণ হেতু যে অপচয়ের কথা আমরা বলেছি, তা শুধু আতপ চালের ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। কলে-ছাঁটা করলে সিদ্ধ চালের পুষ্টি উপাদানগুলিরও অপচয় ঘটে। কিন্তু সিদ্ধ চালের ক্ষেত্রে অপচয়ের মাত্রা অনেক কম হয়ে থাকে।

সিদ্ধ চাল তৈরি করবার প্রয়োজনে ধান যখন বাষ্প-নিষিক্ত করা হয়, তখন উপরের স্তরের জলে দ্রবণীয় পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলি (থিয়ামিন, রাইবোফ্লেবিন, নিয়াসিন) বহুলাংশে চালের দানার এণ্ডোস্পার্মের অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্তরে চলে যায়। ভিটামিনগুলি বিশেষভাবে বীজ ও উপরের স্তরগুলিতে না থেকে সব দানার ভিতরেই সমভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাই কলে পরিপূর্ণ ছাঁটাই হবার ফলে উক্ত অংশগুলি বিশেষভাবে অপসারিত হলেও জলে দ্রবণীয় পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলির অপসারণ তেমন হয় না। কলে-ছাঁটা ও ঘরে-ছাঁটা সিদ্ধ ও আতপ চালের থিয়ামিনের পরিমাণ নীচে দেখানো হলো (প্রতি ১০০ গ্রাম চালে যত মাইক্রোগ্রাম থিয়ামিন আছে)।

ঘরে-ছাঁটা আতপ	ঘরে-ছাঁটা সিদ্ধ	কলে-ছাঁটা আতপ	কলে-ছাঁটা সিদ্ধ
১৮০	২৭০	৬০	২১০

কোন পূর্ণবয়স্ক লোক যদি দৈনিক আধ কেজি কলে-ছাঁটা সিদ্ধ চালের ভাত খায়, তবে সে দৈনিক প্রয়োজনীয় থিয়ামিনের প্রায় ৭০% চাল থেকে পাবে, কিন্তু সমপরিমাণ আতপ চাল গ্রহণ করলে পাবে মাত্র দৈনিক প্রয়োজনের ২০%—২৫%। শুধু ভিটামিনগুলির পরিমাণ বেশী আছে বলেই পুষ্টির বিচারে সিদ্ধ চাল আতপ চাল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নয়। ভাত রান্নার আগে যে চাল ধোওয়ার রীতি আছে, তাতে জলে দ্রবণীয় পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলির বহুল অপচয় ঘটে থাকে। আমরা দেখতে পাব যে, অপচয়ের পরিমাণ সিদ্ধ চাল অপেক্ষা আতপ চালে অনেক বেশী পরিমাণে ঘটে থাকে।

চাল ধোওয়া ও রান্না

ধুলাবালি, ধানের খোসা, খড়কুটা ইত্যাদি দূর করবার জন্যে রান্নার আগে চাল ধোওয়া হয়। চাল ধোওয়ার আর এক উদ্দেশ্য হচ্ছে, চালের গায়ে ষ্টার্চের যে মিহি গুঁড়া লেগে থাকে, তা দূর করা—তা না হলে রান্না ভাত কিছুটা এটেল হয়ে পড়ে। চাল ধোওয়ার জন্যে চালের জলে দ্রবণীয় উপাদানগুলির, বিশেষ করে ভিটামিন-গুলির সবিশেষ অপচয় বটে। চাল ধোওয়া জলের সঙ্গে দ্রবণীয় পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলি চাল থেকে বহুল পরিমাণে বের হয়ে যায়। চালটা কেমন করে কতটা সময় ধরে ধোওয়া হবে, তার উপরে এই পুষ্টিদায়ক উপাদানের অপচয় অনেকটা নির্ভর করে। ধোওয়ার ফলে পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলির অপচয় বেশী ঘটে আতপ চালে। দ্রবণীয় পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলি সিদ্ধ চালের উপরিভাগে বেশী পরিমাণে না থাকাতে সেগুলি সহজে জলের সঙ্গে গলে বের হয়ে যেতে পারে না, তাই ধোওয়ার ফলে পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলির ততটা অপচয় ঘটে না। ভাল করে ধোওয়ার ফলে আতপ ও সিদ্ধ চাল থেকে ভিটামিনগুলি জলের সঙ্গে গলে শতকরা হিসাবে কতটা বের হতে পারে, তা নীচে দেখানো হলো।

	থিয়ামিন (বি$_১$)	রাইবোফ্লেবিন (বি$_২$)	নিয়াসিন
কলে-ছাঁটা আতপ	৫০	২৫	২৩
কলে-ছাঁটা সিদ্ধ	১০	১২	১০

ধোওয়ার জন্যে চালের পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলির যতটা অপচয় ঘটে, সে তুলনায় রান্না করবার দরুণ অপচয়ের পরিমাণ অনেক কম। রান্নার জন্যে চালের পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলির যে অপচয় ঘটে, তা প্রধানতঃ ঘটে ফেন ফেলে ভাত রান্না করবার জন্যে। শুধু উত্তাপের জন্যে ভিটামিনগুলির যে বিনষ্টি ঘটে, তা যৎসামান্য। সচরাচর আমাদের দেশে

ফেন ফেলেই ভাত রান্না করা হয়, যদিও চালে অল্প জল দিয়ে অল্প আঁচে ফেন না ফেলেও ভাত রান্না করা যায়। ফেন গেলে আর না গেলে ভাত রান্না করলে উপরিউক্ত ভিটামিনগুলি ভাতে কি পরিমাণে পাওয়া যায়, তা নীচে দেখানো হলো।

ধোওয়ার পরে চালে যে পরিমাণ বিভিন্ন ভিটামিন থাকে, রান্নার পরে ভাতের ভিতর শতকরা হিসাবে তার যতটা পাওয়া যায়:—

		থিয়ামিন	রাইবোফ্লেবিন	নিয়াসিন
আতপ ও সিদ্ধ চালের গড় হিসাব	ফেন না ফেলে	৯৫% থেকে ৯৮%	৯২% থেকে ৯৫%	৯৫%
	ফেন ফেলে	৫০% থেকে ৬০%	৫০% থেকে ৭০%	৫৫% থেকে ৬৫%

কলে-ছাটা আতপ চাল হলে ধোওয়া ও ফেন গেলে রান্নার ফলে চালের ৮০% থিয়ামিন, প্রায় ৭০% রাইবোফ্লেবিন ও নিয়াসিনের অপচয় ঘটতে পারে। গবেষণায় জানা গেছে যে, ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে চাল ধোওয়া ও রান্নার যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়, তাতে চালের ১৫% ক্যালরী, ১০% প্রোটিন, ৭৫% লৌহ, ৫০% ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের অপচয় ঘটতে পারে।

রান্নার জলে দ্রবীভূত উপাদান ও থিয়ামিনের বিনষ্টি

বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত জলের দ্রবীভূত খনিজ লবণের পরিমাণ সাধারণতঃ বিভিন্ন হয়ে থাকে। কোন জলে মোট দ্রবীভূত খনিজ লবণের পরিমাণ একলক্ষ ভাগে ১৫০ ভাগ হতে পারে, আবার কোন জলে এর পরিমাণ ২০ ভাগেরও কম হতে পারে। কোন জলে মোট কাঠিন্য প্রতি লক্ষ ভাগ ৮০ হতে পারে আবার কোন জলে হতে পারে ১৫। প্রথম লেখক দেখিয়েছেন যে, অনেক সময় রান্নার জলের গলিত উপাদানগুলির ধরণ-ধারণ ও পরিমাণের উপর চালের থিয়ামিনের স্থায়িত্ব নির্ভর করতে পারে। রান্নার জলের দ্রবীভূত উপাদানগুলি এমন হতে পারে, যার জন্যে চালের থিয়ামিন বহু পরিমাণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। লেখকের গবেষণালব্ধ তথ্য দুটি বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।* পরিবেশিত তথ্যের মূলকথা হচ্ছে রান্নার জলের ক্ষারত্ব যদি বেশী হয় (সাধারণতঃ জলের ক্ষারত্বের মাত্রা নির্ভর করে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট +ম্যাগ্‌নেসিয়াম বাইকার্বনেট অথবা ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট + ম্যাগ্নেসিয়াম বাইকার্বনেট + সোডিয়াম বাইকার্বনেটের পরিমাণের উপর) এবং সেই ক্ষারত্বের জন্যে যদি আংশিকভাবে সোডিয়াম বাইকার্বনেট দায়ী থাকে, অর্থাৎ বেশী পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম বাই-কার্বনেট ও কিছুটা সোডিয়াম বাইকার্বনেট রয়েছে, এমন জল যদি রান্নার জন্যে ব্যবহার করা হয়, তবে জলের এই উপাদানগুলির জন্যে চালের থিয়া-মিনের বেশ খানিকটা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। কেন বিনষ্ট হয়, বর্তমান প্রবন্ধে তার আলোচনা করা সম্ভব নয়। সে আলোচনা না করে

*1. Effect of cooking on thiamin stability J. K. Roy (1953)
Jour. Ind. Chem. Soc. Ind. & News edition 16 : 50-56.

2. Alkalinity of cooking water and stability of thiamin of rice.
J. K. Roy and R. K. Rao (1963)
Ind. Journ. Med. Res. 51 : 533-540

আমরা বলতে পারি এরকম দ্রবীভূত উপাদানের জল যে কালেভদ্রে মেলে তা নয়। বাংলা দেশের, বিশেষতঃ নিম্ন বঙ্গের বহু নলকূপ, কুঁয়া ইত্যাদির জল এই ধরণের। দেখা গেছে, রান্নার জন্যে চালের তুলনায় এই ধরণের জল যত বেশী নেওয়া হয়, থিয়ামিনের বিনষ্টি ঘটবার সম্ভাবনা তত বেশী থাকে। আমরা যে ভাবে সাধারণতঃ ভাত রান্না করি তাতে জলের পরিমাণ চালের পরিমাণের পাঁচ-ছয় গুণ নেওয়া হয়ে থাকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই অনুপাতে উপরিউক্ত ধরণের জলে রান্না করলে চাল ধোওয়ার ফলে চালে যতটা থিয়ামিন থাকে, তার ২৫-৩৫% নষ্ট হয়ে যায়। অথচ বিশুদ্ধ জলে রান্না করলে বিনষ্টির পরিমাণ যা হয়, তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

মধ্য প্রদেশের বহু উপজাতীয় অঞ্চলে পেজ বা ভাতের লেই (Gruel) খাওয়ার রীতি আছে। চালে দশ পনেরো গুণ জল দিয়ে তা বহুক্ষণ ফোটালে পেজ তৈরি হয়। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলেও কাঞ্জী নামে ভাতের লেই খাওয়া হয়। পেজ বা কাঞ্জী তৈরি করতে যদি উপরিউক্ত ধরণের ক্ষারধর্মী জল ব্যবহার করা হয়, তবে দ্রবীভূত উপাদানগুলির জন্যে চালের ৭৫% থেকে ৮৪% থিয়ামিন নষ্ট হয়ে যায়।

উপসংহার

চালের প্রস্তুতি থেকে সুরু করে ভাত রাধা পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে কি ভাবে চালের পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলির অপচয় বা বিনষ্টি ঘটতে পারে, তা আমরা আলোচনা করেছি। এই অপচয় ও বিনষ্টির অন্ততঃ খানিকটা রোধ করা যায় কি ?

কলে-ছাটা চালের পরিবর্তে ঢেঁকি-ছাটা অথবা অনুরূপভাবে গৃহে প্রস্তুত চাল গ্রহণ করা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। ভারতের সুদূর গ্রাম্য অঞ্চলে এখনও ঘরে-ছাটা চালের ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু এই যন্ত্রযুগে চাল-কলের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবেই। তাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কলে-ছাঁটা চালের ব্যাপক প্রসার রোধ করা সম্ভব নয়। সুতরাং দেখতে হবে, কলের ব্যবহার করেও কি উপায়ে পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলির যতদূর সম্ভব সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। ফলে ছাঁটবার আগে ধান সিদ্ধ ও বাষ্পে নিষিক্ত করে নিলে অর্থাৎ সিদ্ধ চাল তৈরি করবার পদ্ধতিতে যে ভিটামিনগুলি বহুল পরিমাণে সংরক্ষিত হয় এবং রান্নার আগে ধোওয়ার ফলেও যে ভিটামিনগুলি খুব বেশী পরিমাণে ধৌত হয়ে যায় না, তা আমরা দেখেছি। কাজেই খাদ্য হিসাবে সিদ্ধ চাল গ্রহণ করাই শ্রেয়—কলে-ছাঁটা আতপ চাল তৈরি করা এবং তা প্রধান খাদ্যরূপে গ্রহণ করা কোন রকমেই সমীচীন নয়। আগেই বলা হয়েছে, আমাদের দেশে কলে-ছাঁটা আতপ চালের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কিন্তু ভারতের বাইরে মূলতঃ আতপ চালই খাওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ বাংলা দেশের তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাদের বিশেষ এক খাদ্যনীতির কথা বলা যায়। খাদ্যের বাধা-নিষেধ অনুযায়ী তারা সিদ্ধ চাল খেতে পারেন না। আতপ চাল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিলে-ছাঁটা আতপচালই তাদের খেতে হয়। বলা যায় ক্রমাগত মিলে-ছাঁটা আতপ-চাল খাওয়ার ফলে তাদের থিয়ামিনের অভাব-জনিত অপুষ্টির রোগে ভোগবার সম্ভাবনা থাকে। খাদ্যের বাধানিষেধ ও সংস্কার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দেহের পুষ্টির উপর কেমন অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে—প্রধান খাদ্য হিসাবে বাঙালী হিন্দু বিধবাদের সিদ্ধ চাল বর্জন ও আতপ চাল গ্রহণ তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চাল ধোওয়ার ফলে বিশেষ বিশেষ পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলির যে অপচয় ঘটে, তা একেবারে বন্ধ করবার উপায় নেই। কারণ শত উপদেশ দিলেও কেউ চাল না ধুয়ে রান্না করবে না—তা হয় তো বাঞ্ছনীয় নয়। তবে ধোওয়ার আগে চাল যতদূর

সম্ভব পরিষ্কার করে নিলে চালটা বেশীক্ষণ ধরে কচ্‌লে কচ্‌লে ধোওয়ার প্রয়োজন হবে না। চাল তৈরি ও সরবরাহের সময় যদি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখা যায়—চালে ধুলা, বালি, কাঁকর, ধান ইত্যাদি না থাকে, তবে রান্নার আগে একবার আল্‌গাভাবে ধুয়ে নিলেও সে চালের ভাত খাওয়া চলে।

ভাতের ফেনের সঙ্গে যে চালের পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলি খানিকটা চলে যায়, তা আমরা দেখেছি। চালে অল্প জল দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করলে ফেন ফেলে দেবার প্রয়োজন হবে না। যদি জলের পরিমাণ অল্প হয়, তবে সোডিয়াম বাই কার্বনেটবাহী ক্ষারত্বের উচ্চমানবিশিষ্ট জলে ভাত রান্না করলেও থিয়ামিনের বিনষ্টির সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।

খাদ্যের সংস্কার ও রীতিনীতি মানুষের মজ্জায় মজ্জায় মিশে থাকে, তা বদ্‌লানো সহজ নয়—বিশেষ করে আমাদের দেশে, যেখানে শতকরা আশিজন লোক নিরক্ষর, সেখানে খাদ্যাভ্যাস আংশিকভাবে বদ্‌লানোও সহজ নয়। যারা আতপ চাল খেতে অভ্যস্ত, তাদের কাছে সিদ্ধ চালের স্বাদ ও গন্ধ রুচিকর নয়। চাল ভাল করে না ধুয়ে রান্না করলে ভাতের ভিতর যে একটু চট্‌চটে ভাব থেকে যায়, তা হয়তো অনেকেই বরদাস্ত করতে পারবে না। অল্প আঁচে ফেন না গেলে ভাত রান্নায় যে একটু ধৈর্য ও সময়ের প্রয়োজন হয়, তা হয়তো অনেক গৃহিণীর কাছেই উৎপাত বলে মনে হবে। তবু বলা চলে সর্বস্তরের মানুষই নিজের ও তার প্রিয়জনের স্বাস্থ্যরক্ষায় আগ্রহী। বক্তৃতা, প্রদর্শনী ও অন্যান্য উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি ব্যবহারিক পুষ্টি-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করা যায়, যদি চালের পুষ্টিদায়ক উপাদানগুলির সংরক্ষণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাদের বোঝানো যায়, তবে তারা খাদ্যাভ্যাসের রীতিনীতি কিছুটা পরিবর্তন করে ভাতের পুষ্টিমূল্য বর্ধনে নিশ্চয়ই উৎসাহিত হবেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

চালের বিকল্প উদ্ভাবিত

খাদ্যাভাবগ্রস্ত দেশগুলিতে জনসাধারণের খাদ্যের অনুপূরক হিসাবে চালের যে বিকল্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভাবন করা হয়েছে, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ছাত্রেরা তা আস্বাদন করেছে এবং চালের বিকল্পরূপে তা অনুমোদন করেছে। এই বিকল্প খাদ্যবস্তুটির নাম দেওয়া হয়েছে 'বাতিনা সীড'। দেখতে চালের খুব কাছাকাছি। ডালজাতীয় শস্যের গুঁড়া, শিমজাতীয় বীজের গুঁড়া, গমের অঙ্কুর, জলশূন্য ঈষ্ট, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে এই কৃত্রিম চাল প্রস্তুত করা হয়েছে। এই কৃত্রিম চাল উদ্ভাবন করেছেন অধ্যাপক লয়েড ব্রাউনেল। তাঁর ধারণা, এই নতুন খাদ্য গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল-সমূহে অপুষ্টিজনিত সমস্যার সমাধানে বিশেষ সহায়ক হবে।

তুলাবীজ থেকে ময়দা

মার্কিন বিজ্ঞানীরা তুলাবীজ থেকে মানুষের আহারের উপযোগী উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ ময়দা উৎপাদনের একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছেন। ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাউরুটি, বিস্কুট ও

অন্যান্য খাদ্য প্রভৃতিতে এই তুলাবীজের ময়দা ব্যবহার করা হচ্ছে। যে সকল স্বল্পোন্নত দেশে প্রচুর পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হয়, সেই সব দেশে এই জাতীয় ময়দা প্রোটিনের অভাব মেটাতে অনেকখানি সহায়তা করবে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ১০০ টন তুলাবীজ থেকে ৩৬ হাজার পাউণ্ড ময়দা প্রস্তুত হবে। এতে শতকরা ৬৫ ভাগ প্রোটিন থাকবে।

জলের আগাছা দূরীকরণে শামুক

জলের আগাছা দূর করবার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র দুই জাতীয় শামুককে কাজে লাগাবে। বড় জাতের এই শামুকগুলি দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়। মেরিসা করহুয়ারিয়েটিস শ্রেণীর শামুকগুলি দেখা যায় অরিনোকো ও ম্যাগডালেনা নদী দুটিতে এবং পোমাসিয়া অস্ট্রেলিস শ্রেণীর শামুকগুলি আসে ব্রেজিল থেকে। মার্কিন কৃষি গবেষণা বিভাগের বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, ঐ দুই জাতের শামুকই বহু প্রকারের জলজ আগাছা প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে। ১৯৬৫ সালে দক্ষিণ ফ্লোরিডায় তিনটি ছোট হ্রদে একত্র প্রতি ৮ হাজার মেরিসা জাতের শামুক ছাড়া হয়। এক বছর পরে দেখা গেল, ঐ হ্রদগুলিতে আর কোন আগাছা নেই এবং সেই থেকে হ্রদগুলির জল স্বচ্ছ রয়ে গেছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী চুম্বক

সম্প্রতি বৃটেনে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী চুম্বক তৈরি হয়েছে। নির্মাতারা দাবী করেছেন যে, এর শক্তি হবে ৫০,০০০ গাউস। ৩০,০০০ গাউস শক্তিসম্পন্ন চুম্বককেই আগে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সীমা মনে করা হতো।

চৌম্বক শক্তি পরিমাপক যন্ত্রের ক্ষেত্র ছাড়াও এই চুম্বক গবেষণার ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বীম বাঁকাতে, পারমাণবিক ও অন্যান্য গবেষণার কাজে প্রয়োগ করা চলবে।

এই নতুন চুম্বক এর দেড় গুণ মূল্যের সুপার কণ্ডাকটিং চুম্বক বা তার দ্বিগুণ মূল্যের একটি ইলেকট্রো-ম্যাগ্‌নেটের সমান কাজ দেবে। এই চুম্বকে কোন চলতি ব্যয়ও হবে না।

চুম্বকটির ওজন হবে ১½ টন এবং এর শক্তি ৩০,০০০ গাউস থেকে ৫০,০০০ গাউসের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করা যাবে। ৩½ ফুট উঁচু এবং ৪ ফুট দীর্ঘ একটি ঘূর্ণনক্ষম ট্রলির উপর এটি স্থাপিত।

মাছ অবিকৃত রাখবার অভিনব আধার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দপ্তরের ব্যুরো অব কমার্শিয়াল ফিশারিজ তাঁদের ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর গ্ল্‌চেষ্টারস্থিত গবেষণাগারে মাছ স্থানান্তরে প্রেরণকালে টাট্‌কা রাখবার এক প্রকার অভিনব আধার নির্মাণ করেছেন। এই সব ছিদ্রহীন ও বিদ্যুৎ-অপরিবাহী আধারে করে মৎস্যাদি স্থানান্তরে প্রেরণ করা যেতে পারে। এগুলিকে নাড়াচাড়া করা খুব সহজ। এই ব্যবস্থায় মাছ আট দিন পর্যন্ত অবিকৃত থাকে। বোস্টন থেকে শিকাগো পর্যন্ত মাছ পাঠিয়ে এই ব্যবস্থায় কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সাধারণতঃ যে সব পদ্ধতিতে মাছ স্থানান্তরে প্রেরণ করা হয়ে থাকে, তাতে মাছ চার দিনের বেশী অবিকৃত থাকে না।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই—১৯৬৮

২১শ বর্ষ, ঃ ৭ম সংখ্যা

ক্যাম্বোডিয়া থেকে এই দুর্লভ ডোরাকাটা ভাম জাতীয় প্রাণীটিকে পশ্চিম জার্মেনীর একটি চিড়িয়াখানায় পাঠানো হয়েছে। এরা গাছে থাকে এবং কলা খেতে খুব ভালবাসে।

করে দেখ

ডাকটিকেট অদৃশ্যকরণ

উপরের দিকে মুখ করে টেবিলের উপর একটা ডাকটিকিট রেখে তার উপরে একটা জল-ভর্তি কাচের গ্লাস বসিয়ে দাও। উপর থেকে জলের মধ্য দিয়ে টিকিটটাকে দেখা যাবে। এবার ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সেভাবে গ্লাসটার মুখে একখানা পিরিচ বসিয়ে দিলেই দেখবে, ডাকটিকেটটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। গ্লাসটার চারদিক দিয়ে যে কোন ভাবেই চেষ্টা কর না কেন, ডাকটিকেটটাকে আর দেখা যাবে না।
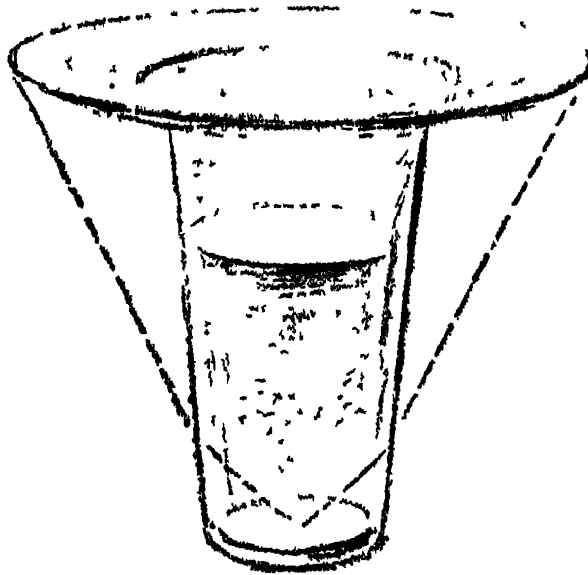
কেন এমন হয়, বলতে পার? আলোর প্রতিসরণের ফলেই এরূপ ব্যাপার ঘটে; অর্থাৎ এক রকমের মাধ্যম থেকে কৌণিকভাবে অন্য রকম মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যাবার সময় আলোকরশ্মি বেঁকে যায়। ছবিতে কাটা কাটা লাইনে দেখানো হয়েছে—আলোক-রশ্মি জলের মধ্য দিয়ে বাতাসের মধ্যে প্রবেশ করবার সময় কেমন করে উপরের দিকে বেঁকে গিয়ে গ্লাসের মুখে বসানো পিরিচখানার নীচের দিকটায় পড়েছে। প্রতিফলিত আলো পিরিচের তলার দিকটায় বাধাপ্রাপ্ত হবার ফলে গ্লাসের কোন দিক থেকেই ডাকটিকেটটাকে দেখা যায় না।

—গ্রী—

মাদাম কুরী ও তাঁর অবদান

বিংশ শতকের একেবারে প্রথম দিকেই পদার্থ-বিজ্ঞানের এক বৈপ্লবিক যুগের সূত্রপাত ঘটলো—যেদিন মাদাম কুরী তাঁর স্বামীর সহযোগিতায় আবিষ্কার করলেন এক নতুন মৌল—রেডিয়াম। পদার্থবিদ্যায় সংযোজিত হলো এক নতুন অধ্যায়—রেডিও-অ্যাকটিভিটি। ১৮৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর রুশ-শাসিত পোল্যাণ্ডের ওয়ার-শ সহরে জন্ম হয়েছিল মানিয়া স্কলোদায়স্কার—ভবিষ্যতে জগৎ যাঁকে চিনেছিল মাদাম কুরী নামে। পিতা পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, মাতাও শিক্ষিকা। দাদা জোসেফ, দিদি ব্রনিয়া হেলা সকলেই উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী। অসংখ্য প্রতিভার সমাবেশে আকীর্ণ এই বুদ্ধিজীবী পরিবারে ছোট্ট মানিয়ার অনন্যসাধারণ প্রতিভা সেদিন তেমন করে চোখে পড়ে নি। জার-অধিকৃত পোল্যাণ্ডে তখন পোল ভাষা, পোল সংস্কৃতির চর্চা নিষিদ্ধ। এমনি নানা অসুবিধার মধ্য দিয়েই মানিয়া একদিন সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে স্কুলজীবন শেষ করলো। কিন্তু পরাধীন দেশের মেয়ের সেদিন ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার। কখনও শিক্ষিকা, কখনও বা গভর্ণেসের কাজ করে ব্রনিয়াকে পারীতে পড়বার খরচ যোগায় মানিয়া, "ভাসমান বিশ্ববিদ্যালয়ে" গোপনে বিজ্ঞান-চর্চা করে আর স্বপ্ন দেখে কবে ব্রনিয়া পাশ করবে ডাক্তারী, আসবে তার পারী যাওয়ার সুযোগ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর স্বপ্ন সফল হলো ১৮৯১ সালে। মানিয়া নয়, চব্বিশ বছরের তরুণী মারী স্কলোদায়স্কা এসে প্রবেশ করলেন পারীর ঐতিহাসিক সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে লাতিন কোয়ার্টারে, কখনও বা কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারের চিলে কোঠার ঘর—মাসে চল্লিশ রুবল মাত্র সম্বল। প্রচণ্ড শীতে আগুন জ্বালাবার কয়লা জোটে না। খাবার যদি বা জোটে, রান্নায় নষ্ট করার মত সময় কোথায় মারীর! কাঁচা মুলো চিবিয়ে অর্ধেক দিন কাটে। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে পোল্যাণ্ডের মেয়ে মানিয়া বিশ্ববন্দিতা মাদাম কুরী হবার পথে এগিয়ে চলে। ১৮৯৩ সালে নিল পদার্থ-বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, '৯৪ সালে গণিতে।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ মারীর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। বিভিন্ন স্তরের ইস্পাতের চৌম্বকত্ব নিয়ে তিনি তখন গবেষণায় রত। যন্ত্রপাতির স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা তাঁকে চিন্তান্বিত করে তুলেছে। সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে পুরনো পোল বন্ধু কোভালস্কি আলাপ করিয়ে দিলেন এক তরুণ ফরাসী বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে—পিয়ের কুরী তাঁর নাম। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক এই বিজ্ঞানী তখনই চৌম্বক বিজ্ঞান ও কোয়ার্টজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে সুপরিচিত। মারীর মধ্যে পিয়ের দেখতে পেলেন তাঁরই

সমগোত্রীয় এক প্রতিভাকে। ১৮৯৫ সালে এই দুই অসাধারণ প্রতিভাবান উৎসর্গ-প্রাণ বৈজ্ঞানিক পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন।

মারী সে সময়ে তাঁর স্বাধীন গবেষণার বিষয়বস্তু সন্ধান করছেন। এর কিছুদিন আগে ফরাসী বিজ্ঞানী বেকেরেল লক্ষ্য করেছিলেন যে, ইউরেনিয়ামঘটিত যৌগ এক আশ্চর্য রশ্মি বিকিরণ করতে সক্ষম। এই রশ্মি কালো কাগজ-মোড়া ফটোগ্রাফিক প্লেটেও ছাপ ফেলতে পারে। X-রশ্মির চেয়েও অনেক তীব্রতর এর ভেদ করার ক্ষমতা। ইউরেনিয়ামের এই অদ্ভুত ধর্ম মারীকে আকৃষ্ট করলো। মাদাম কুরীর কাজ সুরু হলো স্কুল-অব-ফিজিক্স-এর নীচের তলায় ছোট একটি ঘরে, অতি সামান্য সংখ্যক যন্ত্রপাতি নিয়ে।

মারী লক্ষ্য করলেন, একা ইউরেনিয়াম নয়, থোরিয়ামও এই আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। তিনি এই প্রকার বিকিরণের নাম দিলেন রেডিও-অ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা। যে সব পদার্থের এই বিশেষ ধর্ম আছে তাদের বলা হলো তেজস্ক্রিয় পদার্থ। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে, ইউরেনিয়ামের আকর পিচ্‌ব্লেণ্ডের তেজস্ক্রিয়তা বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের চেয়ে বেশী। নির্ভুল যুক্তিবাদী মারী পিচ্‌ব্লেণ্ডের মধ্যে নতুন কোন মৌলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলেন। তাঁর পরীক্ষার আগ্রহোদ্দীপক ফলাফল দেখে পিয়ের তাঁর নিজের স্ফটিক তত্ত্বের গবেষণা স্থগিত রেখে এই নতুন পদার্থের আবিষ্কারে সাহায্য করতে এলেন মারীর পাশে। সেদিন থেকে দুই মস্তিষ্ক, চারটি হাত একতালে একই লক্ষ্যের সন্ধানে কাজ করে চললো। বিজ্ঞান-জগতে এঁদের একজনের অবদান অপরজনের চেয়ে কম নয়। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখলেন পিচ্‌ব্লেণ্ডে নতুন মৌল রয়েছে দুটি। প্রথমটি আবিষ্কৃত হলো '৯৮-এর জুলাই মাসে। ফেলে আসা জন্মভূমির নামে মারী তার নাম রাখলেন পোলোনিয়াম। এরপর দ্বিতীয়টির অনুসন্ধানে সেই ভাঙা চালার নীচে চরম অস্বাচ্ছন্দ্যে তাঁরা কাজ করে চললেন। বৃষ্টি হলে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরতো, বৈজ্ঞানিক দু-জন দাগ দিয়ে রাখতেন, পাছে কোন যন্ত্রের উপর জল পড়ে তা নষ্ট হয়ে যায়। এর উপরে ছিল মারীর গৃহস্থালীর কাজকর্ম। তিনি যে শুধু বৈজ্ঞানিক নন, তিনি নারী, একথা মারীর ভোলবার উপায় ছিল না—প্রথম কন্যা আইরিনের তখন জন্ম হয়েছে। চার বছর ধরে মারী ও পিয়ের অসীম ধৈর্য সহকারে পিচ্‌ব্লেণ্ডর গাদ শোধন করে অতিরিক্ত রেডিও-অ্যাক্টিভ তরল মিশ্রণ থেকে আংশিক কেলাসন প্রক্রিয়ায় এক গ্র্যাম মৌল পৃথক করে তার আণবিক ওজন নির্ণয় করলেন—২২৫। নতুন মৌল—রেডিয়ামের অস্তিত্ব স্বীকৃত হলো।

রেডিয়ামের আবিষ্কার মাদাম কুরীর সবচেয়ে বড় অবদান। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের নানান নতুন শাখার দ্বার খুলে গেল।

১৯০২ থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে কুরী দম্পতি কখনও একত্রে, কখনও বিচ্ছিন্ন

ভাবে রেডিয়াম ও রেডিও-অ্যাকটিভিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। দেখা গেল রেডিও-অ্যাকটিভ বিকিরণের মূলতঃ তিনটি অংশ—α-কণা, β-কণা ও γ-রশ্মি। α-কণাগুলি ধনাত্মক আধানসম্পন্ন হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীন এবং β-কণা ঋণাত্মক আধানসম্পন্ন ইলেকট্রন। আর γ-রশ্মি এক আশ্চর্য অদৃশ্য রশ্মি যাকে একমাত্র মোটা সীসার পাত ছাড়া আর কিছু দিয়েই থামানো চলে না। প্রাণীদেহের উপর এর প্রভাব অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, কিন্তু এই রশ্মির কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ মানুষের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ এক সম্পূর্ণ নতুন জগতের সন্ধান দিল। এই প্রথম জানা গেল পরমাণু কেন্দ্রীনেরও বিভাজন সম্ভব এবং α ও β-কণা নির্গমনের ফলে এক মৌল অপর মৌলে রূপান্তরিত হয়ে থাকে; যথা—ইউরেনিয়াম থেকে থোরিয়াম তা থেকে রেডিয়াম, ক্রমে রেডন, পোলোনিয়াম ও অবশেষে সীসা। সীসা তেজস্ক্রিয় নয় বলে তার আর বিশ্লেষণ হয় না অর্থাৎ সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে এই প্রক্রিয়ার প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। এই জন্তেই পরবর্তীকালে জন্ম নিল নিউক্লিয়ার ফিজিক্স শুধু তেজস্ক্রিয়তা নয়, রেডিয়ামের আরও একটি অপূর্ব ধর্ম পরিলক্ষিত হলো—দুরারোগ্য ক্যান্সারের জীবাণু বিনাশ করা।

রেডিয়াম আবিষ্কারের পর থেকেই কুরী দম্পতির খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। ইংল্যাণ্ডের রয়াল সোসাইটি তাঁদের সম্মানিত করলে 'ডেভি' পদক দিয়ে। সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় পিয়ের কুরীর জন্যে একটি বিশেষ বিভাগ সৃষ্টি করলো—মারী পেলেন তাঁর স্বামীর সহকারীর পদ। ১৯০৩ সালে সুইডিস অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স তাঁদের ভূষিত করলো নোবেল পুরস্কারে (হেনরি বেকেরেলের সঙ্গে)। আমেরিকা থেকে এলো রেডিয়াম পেটেন্ট নেবার প্রস্তাব। কুরী দম্পতি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। খ্যাতি-যশের প্রলোভন এড়িয়ে তাঁদের বিজ্ঞান-তপস্যা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চললো।

কিন্তু সে তপস্যায় ছেদ টানতে চাইল ১৯০৬ সালের ১৯শে এপ্রিল। আকস্মিক দুর্ঘটনায় পিয়েরের মৃত্যু হলো। শিশু কন্যা ইভার বয়স তখন মাত্র দুই।

শুধু স্বামী নয়, কর্মসাধনায় সর্বক্ষণের সঙ্গীকে হারিয়ে মারী শোকে মুহ্যমান, কিন্তু উপেক্ষা করতে পারলেন না স্বামীর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করবার ডাক। বহুদিনের ঐতিহ্য ভেঙ্গে সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রথম একজন মহিলাকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করলো।

পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের সহায়তায় ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো রেডিয়াম ইনষ্টিটিউট। পিয়েরের একমাত্র আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক রূপ দিতে ইনষ্টিটিউটের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মাদাম কুরী। তাঁরা দু-জনে যে নতুন বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছিলেন, সেই তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করতে এলেন নানা দেশের তরুণ বিজ্ঞানীর দল। ইনষ্টিটিউটের অপর বিভাগে সুরু হলো ক্যান্সারের বিরুদ্ধে 'কুরী থেরাপি'র গবেষণা অধ্যাপক রেগোর

তত্ত্বাবধানে। মারীর নিজস্ব গবেষণাও থেমে রইলো না। এতদিন রেডিয়াম পাওয়া গিয়েছিল শুধুমাত্র হ্যালাইড লবণ হিসাবে। এবার মারী ধাতব রেডিয়াম পৃথক করলেন। তেজস্ক্রিয় রশ্মি পরিমাপের পদ্ধতি উদ্ভাবন ও রেডিয়ামের আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণের কৃতিত্বও তাঁর। এই বিষয়ে তাঁর আরও অনেক গবেষণা আছে এবং তাঁর নির্দেশে যে সব গবেষণা ও অনুসন্ধান পরিচালিত হয়েছিল, তার সংখ্যাও কম নয়। এই সব অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯১১ সালে দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো মাদাম কুরীকে—এবার রসায়ন-বিজ্ঞানে। তাঁর আর এক উল্লেখযোগ্য অবদান তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে প্রথম তথ্যমূলক গ্রন্থ—'ট্রীটিস্ অন রেডিও-অ্যাকটিভিটি' ও মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'রেডিও-অ্যাকটিভিটি'।

মাদাম কুরী পৃথিবীর মানুষকে দিয়ে গেছেন অনেক কিছু। শুধু তাঁর ব্যক্তিগত আবিষ্কারই নয়, যে সব কৃতী বৈজ্ঞানিককে তিনি নিজের হাতে গড়ে গেছেন, তাঁদের জন্যেও বিজ্ঞান-জগৎ তাঁর কাছে কম ঋণী নয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মাদাম কুরীর কন্যা আইরিন কুরী, তাঁর স্বামী ফ্রেডরিক জোলিও, মরিস কুরী এবং জর্জ ফোর্নিয়ের। আধুনিক পদার্থবিদ্যা এঁদের দান ভুলতে পারবে না। মাদাম কুরীর অবদান শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ মাদাম কুরীর পরিচয় আমরা পাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে। অসংখ্য রেডিও-চিকিৎসা কেন্দ্রের ভার তিনি তুলে নিয়েছিলেন, X-রে যন্ত্র যুগিয়েছেন, রেডিও-শক্তি সমন্বিত যান নিয়ে ছুটে গেছেন আহত সৈনিকদের সেবায়।

খ্যাতি, যশ, অর্থ, সম্মান দিয়ে জগৎবাসী তাঁর ঋণ শুধতে চেয়েছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের প্রতি কোন মোহই তাঁর ছিল না। আমেরিকা তাঁকে উপহার দিয়েছিল বহুমূল্য এক গ্র্যাম রেডিয়াম—সে রেডিয়াম তিনি তাঁর লেবরেটরীকেই দান করে যান। যে রেডিয়ামের আবিষ্কারে তিনি বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন, তারই বিষাক্ত প্রভাব অবশেষে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো। ১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই সঁসেলমো স্যানাটোরিয়ামে মাদাম কুরীর দেহাবসান ঘটে। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক। ওয়ার-শ সহরের কিশোরী মানিয়ার মনে বিজ্ঞানের প্রতি যে অনুরাগ জেগেছিল, তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা অটুট ছিল। তাঁরই বন্ধুস্থানীয় মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন বলেছেন—'সম্ভবতঃ মাদাম কুরীই একমাত্র মনীষী, খ্যাতি যাঁকে প্রভাবিত করতে পারে নি'। মানুষ মাদাম কুরী সম্পর্কে এর চেয়ে যথার্থ আর কিছু বোধ হয় বলা যায় না।

নীতা বসু

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত "মাদাম কুরী ও তাঁর অবদান" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত।

ভয়ঙ্কর বিষধর প্রাণী

বিষধর প্রাণী বলতে সাধারণতঃ আমরা বিষধর সাপের কথাই জানি। সম্প্রতি জীব-বিজ্ঞানীরা এমন দুটি প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন, যাদের ভয়ঙ্কর বিষের সঙ্গে কোন বিষধর সাপের বিষের তুলনাই হয় না। এই দুটি প্রাণী হলো যথাক্রমে টারিচা টোরোসা (এক শ্রেণীর গোসাপ) এবং পাফার মাছ। উল্লিখিত প্রাণী দুটি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত এবং তাদের আকৃতিগত কোনরূপ সাদৃশ্য না থাকলেও জীব-বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, উভয় প্রাণীর দেহেই রয়েছে টেট্রোডোটক্সিন নামক একই সাংঘাতিক বিষ। বৈজ্ঞানিকদের মতে, এই টেট্রোডোটক্সিনই প্রকৃতিতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও মারাত্মক বিষ।

পাফার মাছকে জাপানে ফুগু মাছ বলে। অতীতে এই মাছের বিষক্রিয়ায় জাপানে বহুলোকের প্রাণহানি ঘটেছে। ১৯৫৭ সালে জাপানে এরূপ একটি মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটেছিল। এই ফুগু মাছের বিষক্রিয়ায় নব্বই জন মৃত্যুবরণ করে এবং আশী জন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়। খাদ্যোপযোগী মাছ ভেবে ফুগু বা পাফার মাছকে রান্নার ফলেই উক্ত দুর্ঘটনা ঘটে। এই মাছের যকৃৎ ও গর্ভাশয়ে টেট্রোডোটক্সিন বিষ ঘনীভূত হয়ে থাকে। এছাড়া কিছু পরিমাণ বিষ এদের ত্বক ও অন্ত্রনালীতেও থাকে। পৃথিবীর প্রায় সকল উষ্ণ সাগরেই এই পাফার মাছ দেখা যায়। পাফার মাছ কোন কারণে রাগান্বিত হলে তার দেহকে বাতাসের সাহায্যে ফুলিয়ে তুলতে পারে। এই কারণেই তাদের পাফার নামকরণ করা হয়েছে।

উক্ত সাংঘাতিক বিষের আর একটি বাহক হলো টারিচা টোরোসা নামক গোসাপ। আলাস্কা থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রশান্ত উপকূলে এই গোসাপের বাস। টেট্রোডোটক্সিন এদের ত্বক, মাংসপেশী এবং রক্তে মিশে থাকে।

বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী আত্মরক্ষার জন্যে প্রকৃতির কাছ থেকে বিভিন্ন উপকরণ পেয়েছে। কিছু সংখ্যক প্রাণী ও উদ্ভিদ আত্মরক্ষার উপকরণ হিসেবে মারাত্মক বিষ পেয়েছে। উল্লিখিত প্রাণী দুটিও প্রকৃতিতে তাদের শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে উক্ত মারাত্মক বিষ টেট্রোডোটক্সিন পেয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের নিকট যা বিস্ময়কর, তা হলো টারিচা টোরোসা গোসাপ এবং পাফার মাছ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন-গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণী হয়েও কেমন করে একই বিষের বাহক হয়েছে।

বৈজ্ঞানিকেরা টেট্রোডোটক্সিনের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, এর একটি অণু অঙ্গার বা কার্বনের এগারোটি পরমাণু, হাইড্রোজেনের সতেরোটি পরমাণু,

নাইট্রোজেনের তিনটি পরমাণু এবং অক্সিজেনের আটটি পরমাণুর দ্বারা গঠিত ($C_{11}H_{17}N_3O_8$)। টেট্রোডোটক্সিনের স্ফটিকগুলি বর্ণহীন এবং অল্প অ্যাসিড মিশ্রিত জলে দ্রবীভূত হয়।

খাদ্যরূপে ফুগু মাছ গ্রহণ করবার দশ মিনিটের মধ্যে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, ঠোঁট ও জিভ অসহ্য যন্ত্রণায় কাঁপতে থাকে এবং সারা শরীর অবশ হয়ে আসতে থাকে, রক্তের চাপ হ্রাস পায় ও হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততর হয়। আধ ঘণ্টার মধ্যে সুস্থ সবল মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ ফ্রেডারিক ফারমান টেট্রোডোটক্সিনের রাসায়নিক গঠন ও মানুষের শরীরে এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। ডাঃ ফারমান বলেছেন, এই বিষের ক্রিয়ায় প্রাণিদেহের মধ্যে স্নায়ুর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ স্নায়ুগুলি কোন অনুভূতির স্পন্দন মস্তিষ্কে পাঠাতে পারে না। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, টেট্রোডোটক্সিন বহুল প্রচলিত সংজ্ঞালোপকারী ওষুধ কোকেন অপেক্ষা ১৫০,০০০ গুণ বেশী শক্তিশালী।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এই মারাত্মক বিষকে অতি সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করে সংজ্ঞালোপকারী ওষুধের কাজ করানো যায় কিনা, সে সম্পর্কে গবেষণা করছেন।

শ্রীজ্যোতির্ময় দুই

আঁদ্রে ম্যারী অ্যাম্পিয়ার

তোমরা যারা বিজ্ঞানের ছাত্র, অ্যাম্পিয়ার কথাটির সঙ্গে নিশ্চয় তাদের পরিচয় আছে। এটি তড়িৎ-প্রবাহের একটি একক। বিজ্ঞানের অনেক শব্দের মত এটিও একজন বিজ্ঞানীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে। এঁর পুরা নাম আঁদ্রে ম্যারী অ্যাম্পিয়ার; ফরাসী দেশের লোক। বড় বিচিত্র জীবন এই অ্যাম্পিয়ারের। পরবর্তী জীবনে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হলেও বাল্যকালে বিজ্ঞান শিক্ষার তেমন কোন সুযোগ তিনি পান নি বললেও চলে। তীব্র মানসিক অশান্তি, প্রবল দারিদ্র্য এবং নানা-প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও অটুট আত্মবিশ্বাস, প্রচণ্ড অধ্যবসায়,. সর্বোপরি একাগ্র সাধনার দ্বারা সব বাধাই যে মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারে, অ্যাম্পিয়ারের জীবন তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৭৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে ফ্রান্সের লিয়ঁ সহরে আঁদ্রে অ্যাম্পিয়ার জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন দরিদ্র দড়ি-ব্যবসায়ী। গরীব হলেও আঁদ্রের

বাবার ছিল উচ্চ আকাঙ্খা। তাই তিনি তাঁর ছেলেকে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু গণিতের প্রতি ছেলের আগ্রহ দেখে কয়েক দিন পরে তাকে বিজ্ঞান ক্লাসে ভর্তি করে দিলেন। গণিতের প্রতি জন্ম থেকেই আগ্রহ ছিল অ্যাম্পিয়ারের। শুনতে পাওয়া যায় ছেলেবেলায় ছোট ছোট নুড়ি ও বিস্কুটের টুক্রা নিয়ে আপন মনে তিনি অঙ্কের সমাধান করতেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তখন পর্যন্ত তাঁর অক্ষর জ্ঞানও হয় নি। ১৮ বছর বয়সে অ্যাম্পিয়ার গভীর মনোযোগের সঙ্গে এনসাইক্লোপিডিয়া পড়েন। তাঁর স্মৃতিশক্তি এত প্রবল ছিল যে, এর পঞ্চাশ বছর পরেও বইটির একাধিক অধ্যায় তিনি মুখস্থ বলতে পারতেন।

এই সময় অ্যাম্পিয়ারের জীবনে এলো এক প্রচণ্ড পরিবর্তন। তাঁর বয়স যখন মাত্র ১৮, তখনই দেখা দিল ফরাসী বিপ্লব। সে এক বীভৎস ব্যাপার—নানা অপরাধে দলে দলে লোককে গিলোটিনে চাপিয়ে হত্যা করা সুরু হলো। অ্যাম্পিয়ারের বাবাও রেহাই পেলেন না। কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁকে বেঁধে নিয়ে আসা হলো বধ্যভূমিতে। তারপর সেই রাক্ষসাকৃতি ঝকঝকে গিলোটিনের নীচে দু-টুক্রা হয়ে গেল তাঁর দেহ। আঠারো বছরের কিশোর অ্যাম্পিয়ারকে জোর করে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা হলো।

বলা বাহুল্য, এই ঘটনা তরুণ অ্যাম্পিয়ারের কোমল মনে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এক বছর পথে পথে তিনি ঘুরে বেড়ালেন উন্মাদের মত। তখন তাঁর আর্থিক অবস্থাও শোচনীয়—কারণ বিপ্লবীরা তাঁর পিতাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি। ঘরবাড়ী, নগদ টাকা, জমিজমা সব কিছুই বাজেয়াপ্ত করে তাঁদের সমস্ত পরিবারকে পথের ভিখারী করে ছেড়েছিল। বাড়ীর বড় ছেলে বলে সংসারের সব দায়িত্ব অ্যাম্পিয়ারকেই গ্রহণ করতে হলো। বেশী শিক্ষালাভের সুযোগ তখনো তাঁর হয় নি। তাই সংসার চালাবার জন্যে তিনি শিক্ষকতা সুরু করলেন এবং নানা অসুবিধা সত্ত্বেও কঠোর পরিশ্রম করে নিজে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই সময় পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের উপর লিখিত তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ সে দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। বিশেষ করে তাঁর 'গেম্‌স্ অব চান্স' প্রবন্ধটি বিজ্ঞানী মহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বলা চলে। অ্যাম্পিয়ারের এই সব জ্ঞানগর্ভ মৌলিক প্রবন্ধে আকৃষ্ট হয়ে স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডেকে পাঠালেন সেখানে কাজ করবার জন্যে। বিদ্যালয়ে বছর পাঁচেক শিক্ষকতা করবার পর ১৮০১ সালে বোর্গ-এর এক কলেজে অধ্যাপক হিসাবে কাজ করবার সুযোগ পেলেন সেখানে। বছর চারেক কাটলো। তারপর প্যারিসের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পলিটেকনিক কলেজে যোগদান করে ১৮০৯ সালে তিনি সেখানকার পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। এখানে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে

তাঁর নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছিল পুরোদমে। পদার্থবিদ্যায় মৌলিক গবেষণা চালিয়ে তিনি সর্বপ্রথম তড়িৎ ও চুম্বকের মধ্যে সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন। অ্যামপিয়ার বিজ্ঞানের এই নতুন শাখার নামকরণ করেন ইলেকট্রো-ডায়নামিক্স।

এই সময়কার একটি ঘটনা অ্যামপিয়ারের গবেষণার মোড় ঘুরিয়ে দিল। ১৮২০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. সি. ওয়ারষ্টেড তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে এক বক্তৃতায় প্রমাণ করলেন, তড়িৎ-প্রবাহের চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। পরীক্ষাস্বরূপ তিনি দেখালেন, কোন তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালিত করলে চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ হয় এবং শলাকাটিও তারের সঙ্গে লম্বভাবে থাকে। তারটি শলাকার তলা দিয়ে গেলে বা তড়িৎ বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত হলে শলাকাটির বিক্ষেপও উল্টোদিকে হয়ে থাকে।

ওয়ারষ্টেডের এই আবিষ্কার শুধু তড়িৎ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই যে প্রবল আলোড়ন জাগালো তা নয়, তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো অ্যামপিয়ারের মনেও। ওয়ারষ্টেডের এই আবিষ্কারের মধ্যে অ্যামপিয়ার যেন এক নতুন তথ্যের সূত্র খুঁজে পেলেন। তারপরই সুরু হলো তাঁর পরিশ্রম ও গবেষণা। পরীক্ষাগারের বদ্ধ দরজার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন চললো তাঁর নিরলস সাধনা। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদেরও জানবার উপায় ছিল না, তিনি কি নিয়ে এত মগ্ন। লোকচক্ষুর আড়ালে অ্যামপিয়ারের এই সাধনার মধ্যে যে কত গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল, তার প্রমাণ পেতে দেরী হলো না। ১৮২০ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ওয়ারষ্টেডের বক্তৃতার মাত্র এক সপ্তাহ পরে পলিটেকনিকে আহুত বিজ্ঞানীদের এক সভায় অ্যামপিয়ার শোনালেন তাঁর নবলব্ধ গবেষণার কথা। তিনি প্রমাণ করলেন, চৌম্বকত্ব সৃষ্টির জন্যে সব সময় যে চুম্বকের প্রয়োজন, তা নয়, তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যেও চৌম্বকত্ব সৃষ্টি করা চলে। চুম্বকের চতুর্দিকে উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রের মত তড়িৎ-প্রবাহের চারদিকেও একটি নির্দিষ্ট স্থান জুড়ে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়ে থাকে। তিনি দেখালেন, ব্যাটারীর দুই প্রান্তে সংযুক্ত দুটি তারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের প্রকৃতি নির্ভর করে তার দিকের উপর, অর্থাৎ তড়িৎ একই দিকে প্রবাহিত হলে তার দুটি পরস্পরকে আকর্ষণ করবে এবং তড়িৎ-প্রবাহের দিক বিপরীত হলে তাদের মধ্যে বিকর্ষণের সৃষ্টি হবে। অ্যামপিয়ারের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান—তড়িৎ-প্রবাহের আণবিক তত্ত্বের আবিষ্কার। স্থায়ী চুম্বকের চৌম্বকত্বের মূলে যে এই রহস্য কাজ করছে, তিনিই প্রথম তা প্রমাণ করেন। নিউক্লিয়াসের চারদিকে প্রচণ্ড গতিতে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনগুলির মধ্যে তড়িৎ-শক্তি রয়েছে, বর্তমান বিজ্ঞানের এই সাম্প্রতিক তত্ত্ব অ্যামপিয়ারের গবেষণাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তাছাড়া বিদ্যুৎ-বাহিত তারের মধ্য দিয়ে খবর পাঠানো, অর্থাৎ আধুনিক টেলিগ্রাফের

প্রাথমিক ধারণা অ্যামপিয়ারের মনেই প্রথম জেগেছিল। ১৮২১ সালে তিনি এমন একটি যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন, যাতে ইংরেজী বর্ণমালার ২৬টি অক্ষরের প্রত্যেকটির জন্যে একটি পৃথক তার থাকবে। নানা অসুবিধায় অবশ্য অ্যামপিয়ার এই বিষয়ে আর বেশী অগ্রসর হতে পারেন নি।

১৮৩৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

মিনতি সেন

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। ভিটামিন-বি$_{12}$ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

অলোক ভট্টাচার্য
পশ্চিম দিনাজপুর।
কল্যাণী দত্ত
কাঁচড়াপাড়া।

প্রঃ ২। আইসোটোপ ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কি কাজে লাগে?

জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়
ডায়মণ্ড হারবার

উঃ ১। মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র ও শরীরের মাংসপেশীর পুষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন হচ্ছে ভিটামিন-বি। ভিটামিন-বি প্রায় পনেরোটি বিভিন্ন ভিটামিনের সমন্বয়ে গঠিত। এই কারণে একে ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স বলা হয়। ভিটামিন-বি গোষ্ঠীর এই পনেরোটির মধ্যে আছে ভিটামিন-বি$_1$ বা থিয়ামিন (Thiamine), ভিটামিন-বি$_2$ বা রাইবোফ্ল্যাবিন (Riboflabin), নিকোটিনিক অ্যাসিড বা নিয়াসিন (Niacin), ভিটামিন-বি$_{12}$ বা রুব্রামিন (Rubramine) ইত্যাদি।

আজকাল রক্তাল্পতা রোগের কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় ভিটামিন-বি$_{12}$ প্রয়োগ অপরিহার্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে পার্নিসাস রক্তাল্পতায় বি$_{12}$ খুবই প্রয়োজনীয়। এই ভিটামিন-বি$_{12}$ স্বাভাবিকভাবে যকৃতে থাকলে লোহিত কণিকা গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করে। সাধারণতঃ ভিটামিন-বি$_{12}$ যকৃৎ ও বৃক্কের নিষ্কাশন থেকে পাওয়া যায়। তবে ঈষ্ট, দুধ ইত্যাদি থেকেও কিছু পাওয়া যায়। ভিটামিন-বি$_{12}$-এর অভাব হলে স্নায়ুতন্ত্রে বিভিন্ন রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। পার্নিসাস রক্তাল্পতায় বি$_{12}$-এর অভাবই প্রভাব বিস্তার করে।

অনেকে মনে করেন যে, ভিটামিন-বি$_{12}$ অন্ত্রে তৈরি হয়। অন্ত্রে তৈরি হবার পর তা যকৃতে সঞ্চালিত হয় এবং রক্তের লোহিত কণিকা গঠনে সহায়তা করে। তবে কয়েক ক্ষেত্রে যদি ভিটামিন-বি$_{12}$ অন্ত্রে ঠিকমত তৈরি না হয় অথবা অন্ত্রে তৈরি হবার পর যকৃতে সঞ্চিত না হয়, তবে রক্তাল্পতা দেখা যায়। এই কারণে রক্তাল্পতার ক্ষেত্রে ভিটামিন-বি$_{12}$ ও ফোলিক অ্যাসিডের মিশ্রণ প্রয়োগ করায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

উঃ ২। 'আইসো' কথাটার মানে সমান এবং 'টোপোস মানে স্থান। এ থেকেই আইসোটোপ কথাটার অর্থ দাঁড়ায়—যারা একই স্থান অধিকার করে। পর্যায়-সারণীতে (Periodic Table) এরা একই ঘর অধিকার করে থাকে বলে এদের আইসোটোপ বা সমঘর বলা হয়। এদের পারমাণবিক ভার (Atomic weight) আলাদা, কিন্তু রাসায়নিক গুণাগুণ একই। পদার্থের রাসায়নিক গুণ, বর্ণালী ইত্যাদি পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণুর বাইরের কক্ষস্থিত ইলেকট্রনের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। আইসোটোপগুলি অনুরূপ মৌলিক পদার্থের তুলনায় একই সংখ্যক ইলেকট্রন বহন করে বলে পর্যায়-সারণীতে এদের ঘর একই। আইসোটোপগুলি অনুরূপ মৌলিক পদার্থের তুলনায় সাধারণতঃ ওজনে ভারী এবং আচার-ব্যবহারে এদের কিছু বিশেষত্ব আছে। সাধারণভাবে প্রাপ্ত আইসোটোপ ছাড়াও আজকাল নানা প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের আইসোটোপ আহরণ করা হচ্ছে।

স্থায়ী আইসোটোপ এবং অস্থায়ী আইসোটোপ—দুই-ই পাওয়া যায়। যে সকল আইসোটোপ অস্থায়ী, তারা তেজস্ক্রিয় (Radio-active) এবং এক প্রকার রশ্মি বিকিরণ করে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। গাইগার-মূলার কাউন্টারের সাহায্যে এই তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়ে। আইসোটোপের রশ্মি মানুষ ও জীবজন্তুর মাংসপেশীর উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন কাজে আজকাল আইসোটোপের প্রচুর ব্যবহার চলছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এর প্রয়োগ বর্তমানে প্রচুর। মানবদেহের রাসায়নিক উপাদানগুলির মধ্যে অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, সালফার ইত্যাদিই প্রধান। এই সকল মৌলিক পদার্থের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নিয়ে গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে; কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ শরীরে প্রবেশের পর সোজা কোন নির্দিষ্ট অংশে চলে যায়। আয়োডিনঘটিত পদার্থগুলি শরীরে প্রবেশের পর গলার কাছে অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থির কাছে এসে জমা হয়। যদি এই গ্রন্থি বৃদ্ধি পেয়ে কারও গলগণ্ড হয়, তবে এই আয়োডিনের আইসোটোপ থেকে নির্গত রশ্মি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গ্রন্থিকে ক্রমাগত আঘাতের ফলে ধ্বংস করে রোগের উপশম করে। এই কারণে গলগণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে বর্তমানে আক্রান্ত রোগীদের তেজস্ক্রিয় আয়োডিন খাওয়ানো হয়। রক্তে লোহিত কণিকার পরিমাণ বেড়ে গেলে ফস্‌ফরাসের আইসোটোপ ব্যবহার করা

হয়। ফস্‌ফরাস শরীরে প্রবেশের পর সোজা রক্ত-উৎপাদক গ্রন্থিগুলিতে চলে যায় এবং এই আইসোটোপ থেকে নির্গত রশ্মি লোহিত কণিকাগুলিকে ধ্বংস করে। ক্যান্সার রোগে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে কোষগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা হয়।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানেও বর্তমানে আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। টোম্যাটো গাছের উপর পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, ফলের পরিপুষ্ট ফলনের জন্যে দস্তা (Zinc) আবশ্যক। বিজ্ঞানীরা টোম্যাটোর চারাগাছে দস্তার আইসোটোপ প্রবেশ করিয়ে ভাল ফল পেয়েছেন।

উপরের আলোচনার ক্ষেত্র ছাড়া আরও বহুবিধ কাজে আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে এর বহু প্রয়োগ রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে বিভিন্ন পদার্থের গুণাগুণ বিচার করবার জন্যে আইসোটোপ ব্যবহার করেন। বিজ্ঞানীরা দূরদৃষ্টি নিয়ে গবেষণাগারে আইসোটোপ সংক্রান্ত যে কাজ চালিযে যাচ্ছেন, তা হয়তো অদূর ভবিষ্যতের এক মহৎ আবিষ্কারের ভিত্তি। লী ও ইয়াং আবিষ্কৃত আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রে দর্পণসাম্য সূত্রের (Parity) অখণ্ডতার অভাবের প্রমাণ বিজ্ঞানী উইলিয়াম বু আইসোটোপ Co_{60} দিয়েই করেন। এই রকম বহু কাজেই আইসোটোপ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর ব্যবহারের সীমা নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিতভাবে প্রসারিত হবে।

শ্রীশ্যামসুন্দর দে

বিবিধ

তৈলানুসন্ধান ও উৎপাদনের ব্যাপক পরিকল্পনা

তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন এই বছর ব্যাপকভাবে তৈলানুসন্ধান ও তৈল উৎপাদনের পরিকল্পনা করেছেন। গত বছরের তুলনায় এই বছর ২৩ শতাংশ বেশী তৈল উৎপাদন এবং গত বছরের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশী ড্রিলিং করবার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কমিশন আশা করছেন, আসামে ৫টি, গুজরাটে ২২টি, পশ্চিম বাংলা, রাজস্থান জম্মু ও কাশ্মীরে ১টি করে, ত্রিপুরায় ৫টি তৈল ভাণ্ডারে তৈল উৎপাদন সুরু হবে।

গত ৫ মাসে তৈলানুসন্ধানের ব্যাপারে একটা রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। দেরাদুনের হেড কোয়ার্টার থেকে সুনিয়ন্ত্রণের ফলেই তৈলানুসন্ধানে এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে।

দেরাদুনের কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয় ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে। তারপর অনেকগুলি আঞ্চলিক কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।

কমিশন বর্তমানে দৈনিক ৮ হাজার টন অশোধিত তৈল এবং প্রতিদিন ৭ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস উৎপাদন করছেন। ১৯৭১ সালের মধ্যে তৈল ও গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ হবে দ্বিগুণ।

লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন নরকঙ্কাল

সিমলা থেকে প্রায় ৭০ মাইল দূরে শিওয়ালিকের পাদদেশে কয়েকটি বিরাট নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐসব কঙ্কাল লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন বলে মনে হয়। শির্ষা নদীর তীরে কঙ্কালগুলি পাওয়া গেছে। এক-একটি কঙ্কালের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৩ ফুট হবে। বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ১১ ফুট এবং এক-একটি দাঁতের ওজন প্রায় দেড় কিলো।

১৯৪২ সালে জনৈক জার্মান নৃতত্ত্ববিদ্ ঐ এলাকা পরিদর্শন করেন এবং এই ধরণের কয়েকটি নরকঙ্কাল সংগ্রহ করে জার্মেনিতে নিয়ে যান। সেই থেকে কয়েকজন বিদেশী নৃতত্ত্ববিদ্ এই বিষয়ে আরও তথ্য সন্ধানের উদ্দেশ্যে ঐ এলাকায় ঘুরে গেছেন।

মৎস্য-প্রায় শিশু

লা পাজ (বোলিভিয়া) থেকে এ. এফ. পি. কর্তৃক প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ—চাষী ঘরের ২৬ বছরের একজন মহিলা মাছের আকারের একটি শিশুর জন্ম দিয়েছে। ক্যাথলিক কাগজ 'প্রি এনসিয়া' খবরটি দিয়েছে।

মৎস্য-প্রায় শিশুটির জন্ম হয়েছে সান জুয়ান শহরে। সান জুয়ান রাজধানী থেকে ৭০০ কিলোমিটার দূরে।

শিশুটির গায়ে আঁশ, হাতের জায়গায় দুটি পাখ্না এবং পায়ের বদলে দ্বিখণ্ডিত লেজ রয়েছে। ছোট গোল চোখের শিশুটি মাছের মত মুখ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

নেফায় কোবাল্ট আবিষ্কার

গৌহাটি থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—নেফার সুবর্ণশ্রী অঞ্চলে বাক্সা নদীর উত্তরে ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা কোবাল্ট ও গন্ধক আবিষ্কার করেছে। ভারতে এই প্রথম কোবাল্ট পাওয়া গেল। ভারতে বর্তমানে বছরে ৫০ টন কোবাল্ট আমদানী করা হচ্ছে। এই নতুন আবিষ্কারের ফলে দেশের চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে কোবাল্ট রপ্তানী করা যাবে।

প্রতি ৫০ টন কোবাল্ট আমদানীর জন্যে দেশকে ২০ হাজার টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রয়োগ করা ছাড়াও এই বস্তুটি ইস্পাত ও লৌহজাত দ্রব্যাদি শক্ত করবার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশ্বে এর বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ২০ হাজার টন।

ক্যানিং তৈলকূপে শীঘ্রই কেরোসিন তোলা সুরু হবার সম্ভাবনা

ক্যানিং তৈলকূপ থেকে ব্যাপকভাবে তেল আহরণের কাজ আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝি সুরু হবে বলে আশা করা যায়।

সম্প্রতি ভূগর্ভে ৩১৯১ মিটার নীচে যে ধরণের কেরোসিনের সন্ধান পাওয়া গেছে, বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক পরীক্ষায় তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বলে গণ্য হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন এই অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। কমিশনের দেরাদুনের সদর দপ্তরে এই তেলের নমুনা পাঠানো হয়েছে। সেখানে বিশেষজ্ঞেরা আরও পরীক্ষা করে দেখেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫০ সালে এক মার্কিন বিশেষজ্ঞ দলের পক্ষ থেকে ক্যানিংয়ে প্রথম তৈল সন্ধান সুরু করা হয়। প্রায় তিন বছর ধরে চেষ্টা চলে। চার হাজার মিটার পর্যন্ত খননের পরেও

তৈলের সন্ধান না পেয়ে বহু অর্থ ব্যয়ের পর পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। তারপর এক রুশ বিশেষজ্ঞ দল ওই অঞ্চল ঘুরে দেখেন এবং ঐ অঞ্চলে বিপুল তৈল সম্পদ সম্পর্কে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে আগের তৈল কূপ থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে বোধরায় নতুন করে কূপ খনন সুরু করেন। এবার ওই কূপেই কেরোসিনের সন্ধান পাওয়া গেছে।

অগ্নিকাণ্ড নির্ণয়ে লেসার রশ্মি

শিল্পসংস্থা, জনহীন কারখানা বা অফিসে কেমন করে লেসার রশ্মির সাহায্যে অগ্নিকাণ্ড নির্ণয় করা যেতে পারে, তাই নিয়ে এখন গবেষণা চলছে, লণ্ডনের নিকটবর্তী বোরহামে অবস্থিত বৃটেনের ফায়ার রিসার্চ ষ্টেশনে।

এই সম্বন্ধে ঐ গবেষণা কেন্দ্রে সদ্য প্রদর্শিত পদ্ধতিটি এই রকম—ছাদের কিছু তলা দিয়ে লেসার রশ্মি ফেলে উল্টো দিকের দেয়ালে বসানো আয়নার সাহায্যে তাকে প্রতিফলিত করে ফটোসেলের উপর ফেলা হয়। এই প্রতিফলিত রশ্মিস্তরের নীচে যদি কোন অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তাহলে তা থেকে যে উত্তপ্ত বায়ু উঠবে, তা রশ্মিস্তরের দিক পরিবর্তন করে দেবে এবং তা ফটোসেল থেকে দূরে সরে যাবে। তাছাড়া অগ্নি থেকে উত্থিত ধোঁয়ায় আলোক-রশ্মির প্রখরতাও হ্রাস পাবে।

এই দুটি পরিবর্তনকে অগ্নিকাণ্ডের আলোক বা ধ্বনি সঙ্কেত হিসাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। রশ্মিগুলিকে আঁকাবাঁকা পথে প্রতিফলিত করে এই পদ্ধতিকে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

ব্যয়ের দিক থেকেও এই পদ্ধতি সুবিধাজনক ও সম্ভাবনাপূর্ণ। ইনফ্রারেড রশ্মিভিত্তিক বর্তমান ধূমনির্ণয় পদ্ধতিগুলিতে খরচ পড়ে প্রতি বর্গফুট এলাকার জন্যে ১ থেকে ৭ শিলিং।

ফায়ার রিসার্চ ষ্টেশন দাবী করেছেন, লেসার রশ্মির মূল্যের হিসাবে নতুন পদ্ধতিতে কম খরচে অনেক বেশী এলাকা নিরাপদ রাখা যাবে।

এপর্যন্ত যে সব পরীক্ষা চালানো হয়েছে, তাতে দেখা যায়, বর্তমানে অনুসৃত পদ্ধতির চেয়ে নতুন পদ্ধতি কম দ্রুতগতিসম্পন্ন নয় এবং বহু ক্ষেত্রে দ্রুততর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

শোক-সংবাদ

কবিরাজ অতুলবিহারী দত্ত

মানসিক রোগ-বিশেষজ্ঞ এবং বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য কবিরাজ অতুলবিহারী দত্ত তাঁহার দত্তনগরস্থ বাসভবনে গত ২২শে জুন, ১৯৬৮ তারিখে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন।

কবিরাজ অতুলবিহারী দত্ত ১৮৯৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর, ফরিদপুর জেলার (পূর্ব পাকিস্তান) তেলিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্কটিস চার্চ কলেজ হইতে আই. এস-সি. এবং সিটি কলেজ হইতে বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং কবিরত্ন উপাধি লাভ করেন।

ছাত্রাবস্থায় তিনি বিপ্লবীদলে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যুগান্তর ও সহযোগী

বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ, শ্রীনিখিলরঞ্জন গুহ, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি তাঁহার সহকর্মী ও বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন।

১৯৩৫ সালে তিনি একক প্রচেষ্টায় লিলুয়ায় বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিতে মানসিক রোগ চিকিৎসার ইহাই প্রথম

কবিরাজ অতুলবিহারী দত্ত

প্রতিষ্ঠান। ১৯৪০ সালে তিনি দত্তনগরে (দমদম) এই উন্মাদ আশ্রম স্থানান্তরিত করেন।

১৯৫৬ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েসন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্সের অধিবেশনে যোগদান করেন এবং ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী, সুইজারল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের মানসিক হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করেন।

তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, ভারতীয় আয়ুর্বেদ কংগ্রেস, ভারতীয় মানসিক চিকিৎসক সমিতি ও বহু সমাজ সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বহু বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।

কবিরাজ দত্ত তাঁহার স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই কন্যা, এক ভগ্নী, এক পুত্রবধূ ও এক দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র ডাঃ অনিলভূষণ দত্ত মানসিক রোগ-বিশেষজ্ঞ এবং জামাতা চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। দিলীপকুমার চক্রবর্তী
৩৬৪।২২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড
নাকতলা
কলিকাতা-৪৭

২। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র
১৭৫।এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

৩। শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
অল ইণ্ডিয়া রেডিও, আগরতলা

৪। শ্রীতপনকুমার সরকার
Street No. 6
Quarter No. 6/B
P. O. Chittaranjan
Dist. Burdwan

৫। প্রবীরকুমার গুপ্ত
১০৪, বাবুবাগান লেন, কলিকাতা-৩১

৬। শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
১২২, নিউ টালীগঞ্জ
পোঃ পূর্বপুটিয়ারী, কলিকাতা-৩৩

৭। শিখা মুখোপাধ্যায়
শিশুবাবু রোড
পোঃ গোন্দলপাড়া
চন্দননগর, হুগলী

৮। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ
220, Outer Circle Road
Jamshedpur-1.

৯। জিতেন্দ্রকুমার রায়
ও
অলোকা রায়
১১।৭, কালিচরন ঘোষ রোড
কলিকাতা-৫০

১০। মিনতি সেন
মণ্ডলপাড়া, ব্যারাকপুর
২৪ পরগণা

১১। নীতা বসু
একাদশ শ্রেণী
বেথুন কলেজিয়েট স্কুল
কলিকাতা-৬

১২। জ্যোতির্ময় হুই
পোঃ বুনিয়াদপুর,
জেলা—পশ্চিম দিনাজপুর

১৩। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স; বিজ্ঞান কলেজ;
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একবিংশ বর্ষ | অগাষ্ট, ১৯৬৮ | অষ্টম সংখ্যা

উদ্ভিদের ব্যাধি ও ছত্রাক

শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরী

উদ্ভিদের ব্যাধি—কথাটা শুনিলে অনেকে বিস্মিত হন, উদ্ভিদের আবার রোগ হয় নাকি! সব্জীবাগানের একটি উদ্ভিদকে হঠাৎ মরিয়া যাইতে দেখিয়া বা ইহার পাতায় বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোন পচন বা ক্ষত দেখিয়া সাধারণতঃ আমাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, কিন্তু উদ্ভিদের মৃত্যু বা পচন আমাদের দুর্ভাবনার কারণ হওয়া উচিত। কেন না, ইহাতেই সমগ্র ফসলের সর্বনাশের কারণ নিহিত থাকিতে পারে। উদ্ভিদ নানাভাবে রোগাক্রান্ত হইতে পারে, তবে অধিকাংশ স্থলে ইহার জন্ত দায়ী ছত্রাক (Fungi)।

ছত্রাকের মধ্যে কেহ আবার মানুষের দেহ আক্রমণ করিয়া দক্র রোগের সৃষ্টি করে। বর্ষা-কালে বা ইহার অব্যবহিত পরেই ভিজা চামড়া, ফল শাকসব্জী, গোময় বা রুটি ইত্যাদির উপরে যে ছাতা (Mould) ধরিতে দেখা যায়, ইহারাই ছত্রাক। বলিয়া না দিলে ইহারা যে উদ্ভিদ তাহা ভাবা কঠিন, কারণ সাধারণ উদ্ভিদের মত ইহাদের ডাল, পাতা, মূল ও ফুল, ফল কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদের মধ্যে আদিমতম, যদিও নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ পর্যায়ভুক্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য কাল পর্যন্ত গ্রীক ও রোমান দার্শনিকদের ধারণা ছিল, নিম্নশ্রেণীর প্রাণী এবং ছত্রাকের মত নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদেরাও স্বয়ম্ভু (Theory of Spontaneous generation)। ইহার পূর্ববর্তী ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তৎকালীন বৈজ্ঞানিকগণ, যেমন পোর্টা, মেলপিজি, জাক, টুর্নেফোর্ট এবং জুসে প্রত্যক্ষ প্রমাণভাবে স্বয়ম্ভুতত্ত্ব বিশ্বাস্য বলিয়া গণ্য করিতেন না। তবে হুক এবং সিয়েলপিনোর মত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা ইহার অনুকূলেই মত পোষণ করিতেন। জন্মে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার পরেও সেই যুগে সকলে তাহা স্বীকার করেন নাই। ১৭৪৮ সালে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক নিড্‌হাম স্বয়ম্ভু তত্ত্বকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। এই নিরীক্ষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটি ফ্লাস্কে রান্না-করা মাংস রাখিয়া ভালভাবে
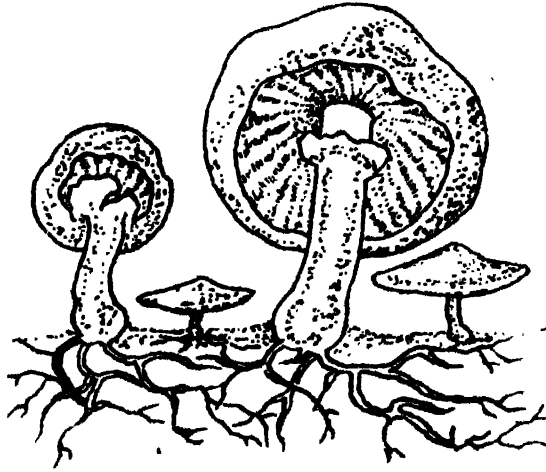
১নং চিত্র
ব্যাঙের ছাতা (মোল্ড)

এই ধারণার কিছুটা পরিবর্তন হয় ১৬৮৩ সালে ডাচ বৈজ্ঞানিক ড্রেপার লুয়েনহুকের জীবাণু (ব্যাক্টিরিয়া) আবিষ্কারের ফলে। ১৭২৯ সালে ইটালির বৈজ্ঞানিক মাইকেলী ছত্রাক বিষয়ে সর্বপ্রথমে আলোকপাত করেন 'Nova plantarum genera' নামক বইয়ে ছত্রাকের নব নব জাতি-গোষ্ঠী এবং ইহাদের জনন অংশের বর্ণনা করিয়া। ছত্রাকের বীজরেণু বা স্পোর তিনিই প্রথম সংগ্রহ করিয়া জৈব পদার্থের উপর বপন করিয়া বীজাধারসহ অণুসূত্র বা মাইসিলিয়ামের বৃদ্ধি ও বিভিন্ন প্রজাতির বীজরেণুর পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করেন। শুধু ছত্রাকের বীজরেণু হইতেই যে ছত্রাকের উৎপত্তি, সেই বিষয়ে সেই যুগে তাঁহার মনেই সুস্পষ্ট ধারণা মুখ বন্ধ করিবার কয়েক দিন পরেও লক্ষ্য করিলেন যে, ইহা পচিতেছে। কিন্তু ১৭৭৫ সালে ইটালীয় বৈজ্ঞানিক স্প্যালানজেনি নিড্‌হামের প্রতিষ্ঠিত সূত্রকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। ফ্লাস্কের মাংসকে বাতাসের সংস্পর্শে না আনিয়া বন্ধ অবস্থায় তাপ দিবার পর দেখা যায় যে, মাংস অনেক দিন পর্যন্ত অবিকৃত থাকে। স্প্যালানজেনির এই আবিষ্কারে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক সমাজে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই প্রমাণের বিরুদ্ধে তৎকালীন বৈজ্ঞানিকদের কেহ কোন প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হন নাই। বিজ্ঞানের সেই বিচিত্র ও বহুমুখী উদ্ভাবনীয় যুগে এই প্রামাণ্য সূত্রটির প্রতিষ্ঠা লাভ যথেষ্ট মূল্যবান—কেন না, বহু চিন্তাধারার

সংমিশ্রণে নিত্য নূতন সত্যের প্রকাশ হয় এই সময়েই।

ছত্রাক অন্য সকল উদ্ভিদ হইতে আঙ্গিক গঠনে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে পৃথক। প্রথমতঃ নিজেদের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করিতে পারে না বলিয়া ইহারা হয় পরজীবী (Parasite) আর না হয় মৃতজীবী রূপে (Saprophytes) জীবনধারণ করে। পরজীবী ছত্রাক নিজের
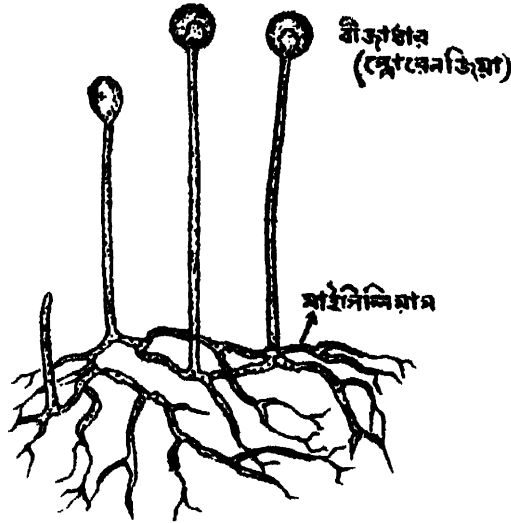
২নং চিত্র

ইহাদের দেহে সবুজকণা বা ক্লোরোফিল না থাকিবার জন্য ইহারা অন্যান্য উদ্ভিদের মত নিজেদের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করিতে পারে না বলিয়া খাদ্যের জন্য অন্য কোন জৈব পদার্থের উপর নির্ভর করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ বংশরক্ষা করিবার জন্য অন্যান্য উন্নত ধরণের উদ্ভিদের মত ফল বা বীজ না থাকায় এক প্রকার বীজরেণু মারফৎ নিজেদের বংশবিস্তার করে। বীজরেণু-গুলি এত ক্ষুদ্র যে, খালি চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না—দেখিবার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন। বায়ুপ্রবাহে সর্বদাই ইহারা ভাসিয়া বেড়ায়—সুযোগ ও উপযুক্ত পরিবেশ পাইলে বংশবিস্তার করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এক টুকরা রুটি ভিজাইয়া রাখিলেই দুই-তিন দিন পর সাদা সাদা তুলার মত আবরণ দেখা যায় ও কয়েক দিন পরে এই আবরণটি কালো হইয়া যায়।

খাদ্য উদ্ভিদ বা প্রাণীর (যাহার উপর পরজীবী অবস্থায় থাকে) জীবন্ত কলা (Tissue) হইতে সংগ্রহ করে এবং ক্রমশঃ শিকড়, কাণ্ড বা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পাতার ভিতর দিয়া উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুর কারণ হয়। এই রকম আক্রান্ত উদ্ভিদের পাতার উপরে প্রথমে নানা প্রকারের দাগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পাতার ক্রমশঃ বর্ণান্তর ঘটে। তারপর উদ্ভিদের দেহ আক্রান্ত হয়। ফুল বাগান, সব্জীবাগানের মাটিতে এমন কোন উদ্ভিদ নাই, যাহা কোন না কোন রকমের ছত্রাকের পোষক উদ্ভিদ (Host plant) রূপে দেখা না যায়।

মৃতজীবী ছত্রাক মৃত জৈব পদার্থের উপর দেখা যায়। যেখানে কোন জৈব পদার্থ আছে, সেখানেই ইহাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

মাটির উপরের মৃত জৈব পদার্থ এই জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণে অবশেষে মাটিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়, তাই দূষিত আবহাওয়া হইতে মানব-সমাজকে রক্ষা করিবার পক্ষে ইহাদের অবদান কম নহে। মাটিতে গোবর সার বা অন্য যে কোন জৈব সার প্রয়োগ করি না কেন, ইহাদের মাটির সঙ্গে মিশাইয়া গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আনিয়া উবরতা বৃদ্ধির জন্যও মৃতজীবী ছত্রাকের দরকার।

দেহের গঠন সংক্রান্ত জটিলতার হিসাবে ছত্রাক গোষ্ঠীকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা—

(১) ফাইকোমাইসিটিস (Phycomycetes)—শাকসব্জীর মহাশত্রু এবং ভিজা রুটির উপর ছাতারূপে জন্মায়। আলুকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারাই পচাইয়া থাকে।

(২) অ্যাসকোমাইসিটিস (Ascomycetes)—এই শ্রেণীর অন্তর্গত ঈস্টের (Yeast) সহিত আমাদের প্রায় প্রত্যেকের পরিচয় আছে। তালের রস গাঁজাইয়া তাড়ি প্রস্তুত করিতে ঈস্টের প্রয়োজন। পাউরুটি ঈস্ট ছাড়া করা যায় না এবং ঈস্টে প্রচুর ভিটামিন থাকিবার দরুণ বটিকা আকারেও আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি।

(৩) ব্যাসিডিওমাইসিটিস (Basidiomycetes)—ব্যাঙের ছাতা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা কাঠের মহাশত্রু।

(৪) ফাঞ্জি ইমপারফেক্টি (Fungi imperfecti)—ইহাদের বংশবিস্তার সম্বন্ধে বিশেষভাবে এখনও জানা যায় নাই। ধান, আলু প্রভৃতি মূল্যবান ফসলও ইহাদের আক্রমণে নষ্ট হইয়া যায়।

স্বাভাবিক জীবনধারা হইতে ভিন্ন পথে চালিত হইলেই আমরা ব্যাধি বলিয়া মানিয়া থাকি। বহিরাগত কোন জৈব বস্তু (Organism) হইতে বা উদ্ভিদের জীবনধারণের পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশের ফলে উদ্ভিদও ব্যধিগ্রস্ত হইতে পারে।

ছত্রাকের বংশবিস্তারের পক্ষে উপযোগী পরিবেশ হইতে উদ্ভিদকে রক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার—

(১) মাটিতে প্রয়োগের উপযোগী হইবার আগে জৈব সার প্রয়োগ না করা এবং প্রয়োগের পরিমাণ যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়।

(২) মাটিতে জল যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়।

(৩) ছত্রাক-রোগাক্রান্ত গাছের বীজ হইতেই ছত্রাক রোগ ছড়ায় ও সেই জন্য বীজ নীরোগ, পুষ্ট ও সুপক্ব হওয়া চাই। বপনের আগে বীজ শোধন করা ও সম্ভবস্থলে রোগ প্রতিরোধক বীজ ব্যবহার করা উচিত।

(৪) সূর্যের আলো ও সেই সঙ্গে নিড়ানির দ্বারা মাটি সর্বদা ওলট-পালট করা এবং আগাছা পরিষ্কার করা দরকার।

(৫) উদ্ভিদের কোন অংশে ক্ষত থাকিলে অথবা মৃত ও রোগাক্রান্ত অংশ বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।

(৬) উদ্ভিদের জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য, যাহা তাহার বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা সর্বদা সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা। সুস্থ সবল মানব যেমন সহসা অসুস্থ হয় না, তেমনি রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতার প্রাবল্যের জন্য সুস্থ সবল উদ্ভিদও হঠাৎ অসুস্থ হয় না।

ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত উদ্ভিদের উপসর্গ দেখিয়া সব সময় রোগ নির্ণয় করা সহজ নয়। প্রথমে রোগ দেখিয়া কিভাবে রোগ হইল ও তাহা কোন বহিরাগত জৈব বস্তুর জন্য কিনা ও কি উপায় অবলম্বন করিলে উদ্ভিদের রোগের প্রতিরোধ করা যাইবে, তাহা চিন্তা করা দরকার।

কোন কোন ছত্রাক উদ্ভিদের চারাকে আক্রান্ত করে, কেহ আবার উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল-ফলকে আক্রমণ করে। অনেক সময় ইহাও পরিলক্ষিত হয় যে, একই ছত্রাক উদ্ভিদের চারা প্রতিরোধ করিতে হইবে। একটি রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ হইতে ছত্রাকের বীজরেণু অতি সহজে কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত ফসলে ছড়াইয়া রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে।
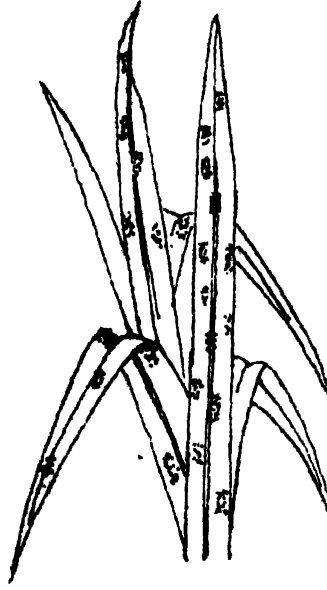
৩নং চিত্র
চিটে রোগ

ও পূর্ণ অবস্থায় আক্রমণ করে—যেমন ধানের চিটে রোগ (Helminthosporium oryzœ) ধানের চারা অবস্থায় ও পরে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় আক্রমণ করে। ইহার ফলে পাতার চোকাকৃতি বাদামী রঙের দাগ দেখা যায় ও ফলন কম হয়।

সময় মত আক্রমণ লক্ষ্য করিয়া রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিলে রোগের আক্রমণ কিছুটা প্রতিরোধ করা যায়। লক্ষ্য করা উচিত যে, উদ্ভিদ যে সকল পরিবেশে সাধারণতঃ রোগাক্রান্ত হয়, সেই পরিবেশ হইতে উদ্ভিদকে সব সময় দূরে রাখিতে হইবে। ফসলের একটি উদ্ভিদে সামান্যতম রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করিলে সমস্ত ফসলে ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা রোগ

কয়েক ধরণের রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ, যাহা প্রত্যহ আমাদের সব্জী ও ফুল বাগানে সাধারণতঃ লক্ষ্য করি এবং ইহার সহজতম প্রতিকারের পদ্ধতি সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা গেল।

(১) পচন—পচিয়া যাওয়া বীজ ভিজা জমিতে বপন করিলে এই রোগের আশঙ্কা থাকে। ছত্রাকের বীজরেণু বীজে বা জমির মাটিতে থাকিতে পারে এবং বেশী স্যাঁতসেঁতে মাটির জন্য অতি সহজেই বীজকে আক্রমণ করিতে পারে। আক্রমণ বেশী হইলে বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না। উদ্ভিদের যে কোন অংশে আক্রমণ হেতু পচন লক্ষ্য করা যায় এবং মাটির নীচের

ফসলের মধ্যে প্রধানতঃ আলু এবং অন্যান্য শাকসব্জী ও ফলের অঙ্গে পচন লক্ষ্য করা যায়। উদ্ভিদের শরীরে পচন লক্ষ্য করিয়া উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ না করিলে এই পচা অংশের মাধ্যমে অন্য কোন জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। যেমন আমাদের হাত-পায়ের কোন অংশ কাটিয়া পুঁজ জমিলে ইহার মাধ্যমে অন্য কোন শক্ত রোগ উৎপত্তির আশঙ্কা থাকে, অনেকটা সেই ধরণের।

মটর, টোম্যাটো, বাঁধাকপি, মূলা, আলু ইত্যাদিতে এই রোগের আক্রমণ খুব দেখা যায়—উদ্ভিদের বৃদ্ধি বন্ধ হয় এবং মূল পচিয়া বর্ণহীন হয়। ইহার ফলে ক্রমশঃ তাহার মৃত্যু ঘটে।

প্রতিকার হেতু এক জমিতে বার বার এক জাতীয় ফসলের চাষ করা উচিত নয় ও উপরিউক্ত আক্রমণ দেখিলে কমপক্ষে চার বৎসর এই জমিতে অন্য ফসলের চাষ করিতে হইবে। জমিতে যাহাতে জল না জমে এবং বাতাস, আলো এবং জল সহজে মাটির ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জমি প্রস্তুতের সময় মাটির সহিত প্রচুর পরিমাণে পাতা-পোড়া ছাই মিশাইলে মাটির সচ্ছিদ্রতা বাড়িবে এবং পটাস যোগ হইবার ফলে ছত্রাক আক্রমণের আশঙ্কা কম হইবে। মাটিতে গাছের উপযোগী খাদ্যের যাহাতে অভাব না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ছত্রাক-রোগ প্রতিরোধক বীজ ব্যবহার করিলে আক্রমণের আশঙ্কা কম থাকে। বপনের আগে বীজ অবশ্যই শোধন করা উচিত।

বীজ শোধন পদ্ধতি—ছত্রাক রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের বীজের গায়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বীজের ভিতরেও ছত্রাকের রেণু থাকে। সেই জন্য রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের বীজ বপন করিলে উদ্ভিদ পুনরায় রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়া যায়।

বীজের বহির্গাত্রে যখন ছত্রাকের বীজরেণু থাকে, তখন বীজকে শোধন করিতে হইলে রাসায়নিক পদার্থ, যেমন—ফরম্যালিন ও পারা-ঘটিত ঔষধ এগ্রোসেন জি, এন, সেরেসান ইত্যাদির দ্বারা বীজ শোধন করা উচিত। ফরম্যালিন ছাড়া অন্যগুলি গুঁড়া অবস্থায় পাওয়া যায় এবং প্রয়োগের পরিমাণ বীজের আকৃতির উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ এক কেজি বীজে দুই গ্র্যাম হইতে ছয় গ্র্যাম ঔষধ মিশ্রিত করা হয়। ঔষধ ভালভাবে বীজে মিশাইবার জন্য বীজ-শোধনকারী যন্ত্র পাওয়া যায়। তাহা না পাইলেও একটি কাচের পাত্রে বা অন্য কোন পাত্রে বীজ ও ঔষধ ঢুকাইয়া মুখ বন্ধ করিয়া ভালভাবে নাড়িয়া নিলেও চলে। ফরম্যালিনের দ্বারা শোধন করিতে হইলে ফরম্যালিন সম-পরিমাণ জলের সঙ্গে মিশাইয়া বীজের পাতলা স্তরে ছিটাইয়া দিতে হইবে ও পরে একত্র করিয়া ২৪ ঘণ্টা ক্যানভাস বা কোন মোটা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

বীজের ভিতরে যখন ছত্রাকের বীজরেণু আশ্রয় লাভ করে, তখন অন্য উপায়ে বীজ শোধন করিতে হইবে। বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতির মধ্যে সহজতম পদ্ধতি হইতেছে—সূর্যের আলোর দ্বারা শোধন করা। বীজ সংগ্রহ করিয়া ভোরে ৪।৫ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর প্রখর সূর্যের আলোতে শুকাইতে হইবে।

ফুল বা সব্জী বাগানে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, কোন বীজ বপন কিংবা চারা রোপণ করিলেও কোন উদ্ভিদ বাঁচে না। বীজতলা বিষয়েও ইহা লক্ষ্য করা যায়। বীজ বপন করিলেও বীজ পচিয়া যায় ও কিছু বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইলেও শেষ পর্যন্ত পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার আগেই মরিয়া যায়। এই অবস্থায় প্রায় ক্ষেত্রে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে যে, উদ্ভিদের অপকারী ছত্রাক মাটিতে থাকিবার দরুণ

সেই স্থানের মাটিতে কোন উদ্ভিদ জন্মাইতে পারে না।

সেই জন্য ছত্রাক আক্রান্তকারী মাটিকে শোধন করিতে হইলে প্রতি এক পাউণ্ড ফরম্যালিন ও ৬ গ্যালন জল এই হিসাবে মিশাইয়া মাটিকে ভিজাইতে হইবে। মাটি ভিজাইবার পর একখানি কাগজ ও তাহা না পাইলে ক্যানভাস বা মোটা কোন কাপড় দিয়া ৪৮ ঘণ্টা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। ২০ দিন পরে এই মাটি বীজ বপন বা চারা রোপণের উপযোগী হইবে।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উদ্ভিদের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পচন লক্ষ্য করিলে যাহাতে রোগ ফসলের অন্য কোন সুস্থ উদ্ভিদকে আক্রমণ করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত ফসলে তাম্রঘটিত বোর্দো মিকশ্চার (Bordeaux Mixture) ছিটান উচিত। বোর্দো মিকশ্চার ইচ্ছা করিলে বাড়ীতে তৈয়ার করিতে পারা যায়। বোর্দো মিকশ্চার তুঁতে, গুঁড়া চুন ও জল সহযোগে তৈয়ারী হয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই ছত্রাক রোগে ইহার ব্যবহার হয়। সাধারণতঃ ৪ পাউণ্ড তুঁতে একটি মাটির কিংবা কাঠের পাত্রে ২৫ গ্যালন জলে গুলিয়া নিতে হইবে এবং অন্য আর একটি মাটি কিংবা কাঠের পাত্রে ৪ পাউণ্ড গুঁড়া চুন ২৫ গ্যালন জলে গুলিতে হইবে। তুঁতে কাপড়ে বাঁধিয়া জলে ঝুলাইয়া রাখিলে তাড়াতাড়ি গুলিয়া যাইবে এবং চুন প্রথমে অল্প জলে গুলিয়া পরে বেশী জল দিতে হইবে। তৈয়ারী জিনিষ দুইটি তখন একটি বড় মাটি কিংবা কাঠের পাত্রে এক সঙ্গে ঢালিতে হইবে এবং মোট ৫০ গ্যালন ঔষধ এই ভাবে প্রস্তুত হইবে। ঔষধ ঠিক ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য একটি ছুরির ফলা ঔষধে প্রবেশ করাইলে যদি কোন দাগ দেখা না যায়, তবে ঔষধ ভালভাবে প্রস্তুত হইয়াছে বোঝা যাইবে। তৈয়ারীর ১২ ঘণ্টার ভিতর বোর্দো মিকশ্চার ব্যবহার করা উচিত। কারণ দেরীতে ঔষধের প্রয়োগ ক্ষমতা কমিয়া যায়, তবে প্রতি ৫০ গ্যালন বোর্দো মিকশ্চারে ৬০ গ্র্যাম চিনি কিংবা গুড় মিশ্রিত করিলে কিছু বেশী দিন ইহার প্রয়োগ ক্ষমতা বজায় থাকে।

২। বীজতলার রোগ—সাধারণতঃ মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন জাতের মৃতজীবী ছত্রাকের বীজরেণু লক্ষ্য করা যায়, যদিও তাহা আবার অনেক সময় কয়েকটি কারণের উপর নির্ভর করে। আক্রমণ বেশী হইলে বীজতলায় বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না ও অনেক চারা বাহির হইলেও শিকড় দুর্বল থাকায় মরিয়া যাইতে দেখা যায়। কৃষির পক্ষে এই জাতীয় রোগ খুবই ক্ষতি-কারক এবং মরিচ, তামাক, টোম্যাটো, পেঁপে, তুলা ইত্যাদির বীজতলায় এই রোগের আক্রমণ বেশী লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিকারের জন্য নিম্নে কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হইল :—

(ক) পূর্বোক্ত উপায়ে বীজ বপনের আগে বীজ শোধন করিতে হইবে, কারণ ছত্রাক-রোগ বীজবাহিত হইয়া আসিতে পারে।

(খ) বীজতলার মাটিতে যেন জল না জমে, কারণ স্যাঁতসেঁতে মাটিতে ছত্রাকের আক্রমণ বেশী হয়।

(গ) বীজতলার মাটিতে পূর্বে রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করিলে পূর্বোক্ত উপায়ে বীজ-তলার মাটি শোধন করা উচিত।

(ঘ) সপ্তাহে একবার বীজতলার জন্য বিশেষভাবে তৈয়ারী তাম্রঘটিত নার্শারী স্প্রে ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়। ইহা প্রতি গ্যালন জলে ৪ গ্র্যাম হিসাবে মিশাইতে হয়। নার্শারী স্প্রে না পাইলে বোর্দো মিকশ্চার ৩ পাঃ তুঁতে, ৩ পাঃ চুন ও ৫০ গ্যালন জল হিসাবে তৈয়ার করিয়া প্রয়োগ করা যায়। ঔষধ প্রয়োগের পর বীজতলার মাটিতে নিড়ানী দিতে হইবে। লাউ, কুমড়াজাতীয় উদ্ভিদ এবং

প্যান্সি ফুলে নার্শারী স্প্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

৩। পাতার চিহ্নজনিত রোগ—অন্যান্য ছত্রাক রোগের মত যদিও ততটা মারাত্মক নয়, তথাপি সময়মত ঔষধ প্রয়োগ না করিলে অতি সহজে ফসলে ছড়াইয়া পড়ে। আক্রমণের লক্ষণ অংশে মধ্যে মধ্যে স্ফীতি দেখা যায়, যাহা গল নামে পরিচিত—ইহাও অনেক সময় এই জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণহেতুই হইয়া থাকে।

রোগের প্রতিরোধহেতু এই সব চিহ্ন পাতায় দেখিলে ১৫ দিন অন্তর পূর্ববর্ণিত উপায়ে বোর্দো মিকশ্চার তৈয়ারী করিয়া পাতায় ছিটাইয়া
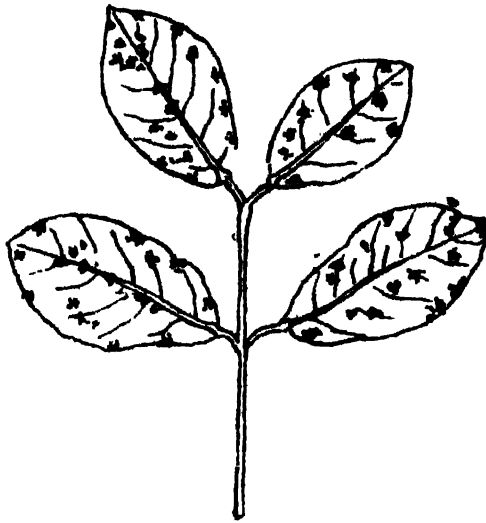
৪নং চিত্র
পাতায় চিহ্নজনিত রোগ

হিসাবে পাতায় কমলা, বাদামী, হলুদ বা কালো রঙের দাগ দেখা যায়। পাতায় চিহ্নের রং ও আকৃতি দেখিয়া কোন্ জাতীয় ছত্রাকের দ্বারা উদ্ভিদ আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা বোঝা যায়। আক্রমণ বেশী হইলে পাতায় সবুজ কণার অভাব-হেতু উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না বলিয়া বৃদ্ধি ও ফলন ব্যাহত হয়। সাধারণতঃ গম ও বাঁধাকপিতে এই জাতীয় রোগ খুবই দেখা যায়। অনেক সময় পাতায় চিহ্নযুক্ত স্থানের কোষ মরিয়া যাওয়ায় গর্ত দেখা যায় বা পাতায় লম্বা লম্বা কালো দাগও দেখা যায়। পাতা কুঁড়িয়া বা কুঁকড়াইয়া যাইতে দেখা যায়, এই জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণে। পাতার দিতে হইবে যন্ত্রের দ্বারা। বোর্দো মিকশ্চার ছাড়াও আরও অনেক ছত্রাক-নাশক ঔষধ আছে; যেমন —বারগেণ্ডি মিকশ্চার, প্রস্তুতের প্রণালী বোর্দো মিকশ্চারের ন্যায়, তবে ৪ পাঃ চুনের স্থলে ৬½ পাঃ সোডা। সংক্ষেপে বলা যায়—৪ পাঃ তুঁতে, ৬½ পাঃ সোডা ও জল ৫০ গ্যালন। পূর্বোক্ত ঔষধ ছাড়া ও তৈয়ারী ঔষধ হিসাবে পেরেনক্স, পেরেলিন, ব্লাইটক্স, কুপ্রোমান, কাইটোজেম ইত্যাদি ঔষধ বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। রোগের আক্রমণের চিহ্ন লক্ষ্য করিলে জল নির্দিষ্ট পরিমাণে গুলিয়া ফসলে যন্ত্রের দ্বারা ছিটাইতে হইবে। ঔষধের পরিমাণ ও তাহার প্রয়োগ ব্যবস্থা আক্রমণের তীব্রতার উপর নির্ভর করিবে।

সালফার বা গন্ধকজাতীয় গুঁড়া ঔষধও ছত্রাক-আক্রান্ত উদ্ভিদে ছিটাইয়া দিলে রোগ আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

ক্যাংকার (Canker)—এই জাতীয় রোগের আক্রমণে উদ্ভিদের পাতা, ডাল এবং ফলের দেহে ছোট ছোট গোল গোল বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। ফলের বাগানে, যেমন—নারিকেল, সুপারী ইত্যাদি এবং বিশেষভাবে লেবু জাতীয় উদ্ভিদে ইহার আক্রমণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। উদ্ভিদের ছালের উপর আক্রমণ করিয়া কলার মৃত্যু ঘটায়। এইভাবে কলার মৃত্যু হেতু কলার চারিপাশের কোষগুলি বাড়িয়া গেলে টিউমারের মত মনে হয়। এইভাবে পরজীবী ছত্রাক বাড়িতে বাড়িতে পোষক উদ্ভিদের খাদ্য শোষণ করিয়া মৃত্যু ঘটায়। পাতার উপর ক্ষত হইলে ক্ষতস্থানের চারিদিকে হলদে রঙের বৃত্তাকার চিহ্ন হইয়া থাকে। ক্ষতস্থানগুলি খুব খসখসে লাগে ও পরস্পর মিশিয়া যায়। আক্রমণের ফলে পাতা ঝরিয়া পড়ে ও ডগা শুকাইয়া যায় এবং ফলের বাজার দর থাকে না। সাধারণতঃ আর্দ্র আবহাওয়ায় এই রোগ বেশী হয়। রোগের আক্রমণ প্রায় ক্ষেত্রে উদ্ভিদের উপরের অংশেই প্রথমে পরিলক্ষিত হয়।

৫নং চিত্র
পাতার কোঁকড়ানো রোগ

কোন উদ্ভিদে পূর্বোক্ত লক্ষণ অল্পও প্রকাশ পাইলে সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত অংশ মূল উদ্ভিদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে এবং ফসলের প্রত্যেকটি উদ্ভিদে ১৫ দিন অন্তর বোর্দো মিকশ্চার ছিটাইতে হইবে। নারিকেল বা সুপারী এই জাতীয় রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে আক্রান্ত অংশ ধারালো কিছু দ্বারা কাটিয়া তুলিয়া তুঁতে ও চুন জলের দ্বারা একত্রিত করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে। শীতের সময় আক্রান্ত উদ্ভিদের সমস্ত পাতা ও ডাল কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। পুনরায় নূতন পাতা ও ডাল দেখা দিলে ১৫ দিন অন্তর বোর্দো মিকশ্চার ছিটাইলে সুফল পাওয়া যায়।

(৫) ডাইব্যাক—এই জাতীয় রোগের সহিত ক্যাংকারের লক্ষণের অনেকটা মিল লক্ষ্য

করা যায়। ইহার আক্রমণে লেবু ও গোলাপ প্রায়ই মরিয়া যাইতে দেখা যায়। কাণ্ডের অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ নীচের দিকে শুকাইতে দেখা যায় বলিয়া এই রোগের নাম ডাইব্যাক।

৬নং চিত্র
ক্যাংকার

আক্রান্ত কাণ্ডের রং ক্রমশঃ হলুদ হয় এবং বৃদ্ধি বন্ধ হওয়ায় উদ্ভিদ মরিয়া যায়। এই রোগও একপ্রকার পরজীবী ছত্রাকের আক্রমণের জন্য হয়। এই জাতীয় রোগে অনেক সময় উদ্ভিদের দেহ ফাটিয়া আঠালো পদার্থ বাহির হয়। কাণ্ডগুলির অগ্রভাগে প্রথমে ছিটাফোঁটা দাগ লক্ষ্য করা যায় এবং ফলগুলির গা ফাটিয়া যায় এবং ফলের গায়ে বাদামী রঙের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়।

উদ্ভিদে সামান্যতম রোগের লক্ষণ কোন অংশে প্রকাশ পাইলে সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত অংশ মূল উদ্ভিদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত এবং রোগ প্রতিরোধ হিসাবে ১৫ দিন অন্তর বোর্দো মিকশ্চার যন্ত্রের দ্বারা ফসলে ছিটাইতে হইবে।

(৬) শিকড় পচন—এই রোগের আক্রমণে উদ্ভিদের বায়বীয় অংশে কোন লক্ষণ বা বিকৃতি লক্ষ্য করা যায় না, শুধু মাটির নীচের উদ্ভিদের অংশকে আক্রমণ করে। সুস্থ সবল ফলন্ত উদ্ভিদকে হঠাৎ মরিয়া যাইতে দেখিলে সচরাচর এই রোগের আক্রমণের হেতু মৃত্যু হইয়াছে জানিতে হইবে। রোগের আক্রমণ মাটির নীচের অংশে সংঘটিত হইবার জন্য উদ্ভিদ মাটি হইতে শিকড়ের দ্বারা শোষণ-ক্রিয়ার মারফৎ খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম, সেই জন্য মৃত্যু ঘটে।

তামাক, আদা, তুলা, টোম্যাটো, বেগুন, ধান জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় পচন বেশী লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিরোধ হিসাবে বীজ শোধন করিয়া বপন করা উচিত এবং বীজতলার মাটিতে ছত্রাক থাকিবার আশঙ্কা থাকিলে মাটিও শোধন করা উচিত। বীজতলার মাটি শোধন করিতে না পারিলে চারা বীজতলা হইতে তুলিয়া এক টিন জলে ১২৫ গ্র্যাঃ হিসাবে ব্লাইটক্স মিশ্রিত

করিয়া এই জলে চারার শিকড় ধৌত করিতে হইবে। উন্নত ধরণের অধিক ফলনযুক্ত ধানের ফসলে এই পদ্ধতিতে খুব সুফল পাওয়া যায়। এই জাতীয় রোগের আক্রমণে আদা ফসলের খুব ক্ষতি লক্ষ্য করা যায়। সেই জন্য এক বৎসর আদার ফসলে শিকড় পচন রোগ লক্ষ্য করিলে পরের বৎসর এই মাটিতে আদার চাষ করা উচিত নয়।

(৭) উইল্ট—প্রধানতঃ চারার মূলেই এই জাতীয় রোগের আক্রমণের জন্য প্রভূত ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। শিকড় পচন রোগের লক্ষণের সঙ্গে ইহার অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। এই রোগের লক্ষণ উদ্ভিদে ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। পাতা প্রথমে ঝুলিয়া যাইতে দেখা যায় এবং কাণ্ডের নমিতভাব পরিলক্ষিত হয়। আক্রমণ বেশী হইলে খাদ্য সংগ্রহ-প্রণালী অকেজো হইবার দরুণ উদ্ভিদের খাদ্য সংগ্রহে অক্ষমতা হেতু মৃত্যু ঘটে। এক জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণে এই জাতীয় রোগ উদ্ভিদে প্রকাশ পায়। ইহার নিজের দেহ হইতে এক রকম বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হয়, যাহা উদ্ভিদের খাদ্য চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে এবং সেই জন্য উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটে।

৭নং চিত্র
ডাইব্যাক

শিকড় পচন রোগ যে সকল উদ্ভিদকে আক্রমণ করে, এই রোগও সেই সকল উদ্ভিদকে প্রধানতঃ আক্রমণ করে। রোগ আক্রমণের প্রতিরোধ এই রোগের ক্ষেত্রেও শিকড় পচন রোগের মতই করিতে হইবে।

উপরিউক্ত রোগের লক্ষণ ছাড়াও আরও বিভিন্ন জাতীয় ছত্রাকের দ্বারা উদ্ভিদ আক্রান্ত হয়। অনেক সময় ইক্ষুর পুষ্প বিন্যাস সম্পূর্ণ একটি কালো দড়ির আকারে পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়। আবার হঠাৎ উদ্ভিদের বৃদ্ধি বন্ধ বা কোন বিকৃতির মূলেও যে ছত্রাকের

আক্রমণ, তাহাও জানা গিয়াছে। সরিষা-জাতীয় উদ্ভিদে ছত্রাক আক্রমণে পুষ্প-বিন্যাসের বৃদ্ধি রহিত হেতু ফলন কমিয়া যাইতে দেখা যায়।

যে কোন ছত্রাকের আক্রমণ হউক না কেন, রোগ প্রতিরোধ সময়মত করিতে পারিলে এবং পরিচর্যা-পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে হইলে রোগ নিরাময় হয় ও ফসলে রোগ আক্রমণের আশঙ্কা নিশ্চয়ই কম দেখা যায়।

৮নং চিত্র
ইক্ষুর রোগ

উদ্ভিদের রোগের ঔষধ থাকিলেও ব্যবহার ও তাহার পরিমাণ সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। রাসায়নিক কোন কোন ঔষধ ব্যবহারের ফলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে। বর্তমানে উদ্ভিদে ঔষধ প্রয়োগের ফলে উদ্ভিদের উপর কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় কিনা, এই বিষয়ে গবেষণা হইতেছে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এলড্ লিওপোল্ড স্বাস্থ্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন "জৈব বস্তুর পক্ষে আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বারা আত্ম পুনরুজ্জীবনের যোগ্যতা"। আবার দুইজন ইংরেজ গবেষক বলিয়াছেন "জৈব বস্তু ও পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান"।

সুতরাং রোগ হইল জীবনের চলিবার জন্য শক্তি সংগ্রহে কোন বাধা।

বর্তমানে গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, মৃত্তিকাস্থিত অনেক উপকারী জীবাণু বর্ধনশীল উদ্ভিদকে খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করে এবং অক্সিমন অথবা অক্সিন সরবরাহ করে। উদ্ভিদের নানাবিধ রোগ প্রতিরোধক হিসাবে প্রাণীদের পক্ষে ভিটামিনের মতই ইহার অপরিহার্যতা স্বীকার করা যায়। রথামষ্টেডের পরীক্ষায় ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। হিউমাস একটি জৈব পদার্থ ও যে মাটিতে হিউমাস উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, সেই মাটিতে উদ্ভিদের উপকারী জীবাণুকে যথেষ্ট পরিমাণে বাস করিতে দেখা যায়। জৈব সার ছাড়া একক ও

অপরিমিত পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহারে মাটিতে হিউমাস কমিয়া যাইতে দেখা যায়।

সুতরাং বলা যায় যে, উদ্ভিদের উপযোগী খাদ্য, পরিবেশ, উন্নত কৃষি পদ্ধতি, রোগ প্রতিরোধক শক্তিসম্পন্ন বীজ প্রভৃতির উপরই বেশী দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এই সকল পদ্ধতি অনুসরণ করিবার পরেও যদি উদ্ভিদ রোগাক্রান্ত হয়, তবে লক্ষণ বুঝিয়া রোগ প্রতিরোধের জন্ম যে পরিমাণ ঔষধের প্রয়োজন, সেই পরিমাণেই ব্যবহার করিতে হইবে। ঔষধের মাত্রা রোগ উপশম না হইলে ক্রমশঃ বাড়াইতে হইবে। ইহাও মনে রাখা উচিত, রোগের সামান্যতম কোন লক্ষণ উদ্ভিদ-দেহে প্রকাশ পাইলেই সঙ্গে সঙ্গে রোগ প্রতিরোধের জন্ম উপযোগী ঔষধ আক্রান্ত ফসলে প্রয়োগ না করিলে সমূহ ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় এবং বিভিন্ন ফসলের উদ্ভিদে রোগ সংক্রামিত হইবার দরুণ রোগ প্রতিরোধ করা তখন শক্ত হইয়া পড়ে। সেই জন্ম উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, রোগ নিরাময় অপেক্ষা রোগ প্রতিরোধ উদ্ভিদের পক্ষেও বেশী প্রয়োজনীয়।

আকাশ-ছবি

সুবিমল সিংহ রায়

আমরা অনেক ধরণের ছবির কথা জানি, কিন্তু আকাশ-ছবি নামটা হয়তো অনেকের কাছেই নতুন বলে মনে হবে। আকাশ-ছবি (Aerial photograph) হচ্ছে বিমান থেকে তোলা পৃথিবী-পৃষ্ঠের ছবি। আজকাল উপগ্রহের সাহায্যে অনেক উঁচু থেকে পৃথিবীর যে সব ছবি তোলা হচ্ছে, সেগুলি যদিও আকাশ-ছবির পর্যায়ে পড়ে, তবু তাদের প্রয়োগক্ষেত্র ভিন্ন। বিমান থেকে তোলা ছবি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগে; কিন্তু সামরিক প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। কেন না, যে সব অঞ্চল দিয়ে সৈন্যবাহিনী এবং তাদের রসদ যাবে, যে সব জায়গায় তারা ঘাঁটি স্থাপন করবে এবং বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের জন্যে প্রাথমিক সমীক্ষার কাজ এই সব ছবির সাহায্যে খুব ভালভাবে এবং কম সময়ে করা যায়। তাছাড়া অন্য দেশের (যারা যে কোন সময় যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে) সামরিক ঘাঁটি, রাস্তা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির অবস্থান জানবার জন্যে এই সব ছবির অত্যন্ত প্রয়োজন। সে জন্যে অনেক সময় আকাশপথে গুপ্তচর বৃত্তির প্রয়োজন হয়। আকাশ-সীমা লঙ্ঘনকে তাই গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ এবং দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর বলে গণ্য করা হয়।

সামরিক প্রয়োজন ছাড়াও এই ধরণের ছবি বাঁধ, নদী উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন সংরক্ষণ এবং কৃষি উন্নয়ন ইত্যাদি প্রকল্পের প্রাথমিক সমীক্ষার জন্যে এবং ভূতাত্ত্বিক জরীপের একটি মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগে। কি ভাবে এই ছবি তোলা হয় এবং বিশেষ করে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

ছবি তোলবার জন্যে বিমানের নীচে একটি ছিদ্রে ক্যামেরা বসানো থাকে। পৃথিবী-পৃষ্ঠের বিভিন্ন বস্তু ও মাটির রঙের তারতম্য ধরা এবং স্পষ্ট ছবি তোলবার জন্যে উপযুক্ত ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। বিমানটি পূর্বনির্দিষ্ট দিকে (সাধারণতঃ

উঃ-দঃ) এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় উড়ে যায়। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে পর পর ছবি ওঠে। তবে পর পর দুটি ছবি ওঠবার সময়ের মধ্যে ব্যবধান এমনভাবে ঠিক করা থাকে যে, প্রত্যেকটি ছবির ৬০ শতাংশ তৎসংলগ্ন অপরটির দ্বারা ঢাকা পড়ে; অর্থাৎ পর পর দুটি ছবির শতকরা ৬০ ভাগ পৃথিবী-পৃষ্ঠের একটি জায়গার ছবি ধরে রাখে। একটি নির্দিষ্ট রেখা ধরে পর পর ছবি তোলবার পর সেই রেখার সমান্তরাল আর একটি রেখায় একই ভাবে ছবি তোলা হয়। এই সমান্তরাল রেখাগুলির ব্যবধান এমনভাবে ঠিক করা হয় যে, দুটি সংলগ্ন রেখার তোলা ছবিগুলি পরস্পরকে ৩০ শতাংশ ঢেকে রাখে। এইভাবে প্রয়োজনীয় সমস্ত অঞ্চলটি পরিক্রমা করা হয়। যেহেতু ছবিগুলি নিজেদের ৬০ এবং ৩০ শতাংশ ঢেকে রাখে, এটা সহজেই অনুমেয় যে, ছোট একটি অঞ্চলের জন্যে অনেকগুলি ছবি তুলতে হয়।

ছবি তোলবার সময় কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং এই সব অসুবিধাগুলি দূর না করতে পারলে প্রয়োজনানুরূপ ছবি তোলা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ বিমানটিকে সোজা-পথে অর্থাৎ দিক পরিবর্তন না করে চালাতে হবে। তা না হলে ছবিগুলি উল্টাপাল্টা উঠবে এবং কোন কাজেই লাগবে না। দ্বিতীয়তঃ বায়ুর চাপ, গতি ও দিক পরিবর্তনের জন্যে সমতল থেকে বিমানটির কিছুটা হেলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সে ক্ষেত্রে ছবিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে বৈসাদৃশ্য ও অসাম্য দেখা দেবে। এই সম্ভাবনা পৃথিবী-পৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি অত্যন্ত বেশী বলে ছবি তোলবার বিমানটি সাধারণতঃ ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ ফুট উপর দিয়ে উড়ে যায় এবং আকাশ-ছবি কখনই ৭৫০০ ফুটের নীচ থেকে তোলা হয় না। এত উঁচু দিয়ে উড়ে যাওয়া সত্ত্বেও এবং সকল রকম সাবধানতা অবলম্বন করবার পরেও বিমানটি অনেক সময় কিছুটা হেলে পড়ে। যদি এই হেলে পড়া ১° ডিগ্রী থেকে ৩° ডিগ্রীর মধ্যে থাকে, তাহলে ঐ অবস্থায় তোলা ছবিগুলি কার্যক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে না।

ছবি তোলবার পদ্ধতি অনুসারে আকাশ-ছবিকে সাধারণতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—১। লম্ব ছবি (Vertical photograph)—এই ক্ষেত্রে ক্যামেরাটি সরাসরি লম্বভাবে পৃথিবী-পৃষ্ঠের ছবি তোলে। এই সব ছবির সমস্ত অংশই সমান স্পষ্ট হয়। ২। তির্যক ছবি (Oblique photograph)—এই ক্ষেত্রে ক্যামেরাটি একটু বাঁকিয়ে বসানো হয় এবং সেটা মাটির তির্যক ছবি তোলে। এভাবে স্বভাবতঃই একটি ছবিতে বিস্তৃত অঞ্চলের ছবি তোলা যায়। উঁচু পাহাড় থেকে দেখা বিস্তৃত অঞ্চলের সঙ্গে এই ধরণের ছবির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তবে লম্ব ছবির মত এই সব ছবিতে সমস্ত অঞ্চলই সমান স্পষ্ট হয় না। দূরের জিনিষগুলি ক্রমশঃই ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। ছবি তোলবার সময় সাধারণতঃ দুটি ক্যামেরা দিয়ে লম্ব এবং তির্যক এই—দুই ধরণের ছবিই এক সঙ্গে তোলা হয়।

আকাশ-ছবি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে এই ছবিগুলি দেখবার একটি বিশেষ রীতি আছে। আগেই বলা হয়েছে যে, ছবিগুলি পরস্পরকে ৬০ ও ৩০ শতাংশ ঢেকে রাখে। সুতরাং ছবিগুলি পর পর সাজাবার সময় ঐ পরিমাণ জায়গা ঢেকে ঢেকে বিমান পরিক্রমার রেখা এবং দিক ঠিক রেখে সাজাতে হয়। সাধারণতঃ মেসোনাইট অথবা কাঠের বোর্ডে ছবিগুলি আঠা দিয়ে লাগানো হয়। এই বিন্যাসকে মোজেইক বলা হয়। এই বিন্যাস খালি চোখে সাধারণ ছবির সারির মতই দেখায়, কিন্তু আকাশ-ছবি দেখবার নিয়ম হচ্ছে Stereoscope দিয়ে।

যেহেতু ছবিগুলি ৬০ ও ৩০ শতাংশ পরস্পরকে ঢেকে রাখে, সেহেতু Stereoscope দিয়ে দেখলে ছবিগুলির ত্রিমাত্রিক (Three dimensional) দৃশ্য ফুটে উঠে। মনে হয় যেন বিমান থেকে নীচের দৃশ্য চোখে পড়ছে, অথচ খুব কাছে এবং স্পষ্ট।

আকাশ ছবি থেকে নদী-নালা এবং পাহাড়ের বিন্যাস সহজেই অনুশীলন করা যায়। ছবি থেকে বিভিন্ন ধরণের জঙ্গল ও মাটি আলাদা করা যায়—কেন না, ছবিতে তাদের রঙের কিছুটা পার্থক্য থাকে।

ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার প্রথম এবং প্রধান অঙ্গ হচ্ছে বিভিন্ন পাথরের বিন্যাসের নক্সা বানানো। প্রত্যেক পাথরেরই কিছু না কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, বিশেষ করে তখন জল-হাওয়ার সংস্পর্শে এসে সেগুলি অসংলগ্ন হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন রঙের মাটিতে পরিণত হয়। আকাশ-ছবিতে এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই ধরা যায় এবং বিভিন্ন ধরণের পাথর আলাদা করা যায়। দু-এক জায়গায় একবার পাথরগুলি মিলিয়ে দেখে আকাশ-ছবি থেকে গবেষণাগারে বসেই সহজে এবং তাড়াতাড়ি পাথরের বিন্যাসের নক্সা প্রস্তুত করা যায়। তাছাড়া পাথরে বিচিত্র ধরণের ফাঁটল, চ্যুতি এবং ভাঁজ (Fold) থাকে এবং এগুলির নক্সা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন—কেন না, এগুলিতেই অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের ধাতুর সমাবেশ হয়ে থাকে। নদী-নালার বিন্যাস থেকে পাথরের ফাটল ও চ্যুতি সম্পর্কে বেশ ভাল ধারণা করা সম্ভব, কারণ জলের ধারা সাধারণতঃ পাথরের কোন না কোন দুর্বল অঞ্চল দিয়েই বইতে সুরু করে এবং ফাটল ও চ্যুতিই হচ্ছে সেই সব অঞ্চল। পাহাড়ের বিন্যাস থেকে পাথরের বড় বড় ভাঁজ ধরা যায়, কারণ পাথরের বিচিত্র ভাঁজের জন্যেই সাধারণতঃ পাহাড় এঁকে-বেঁকে ঘুরে যায়।

আকাশ-ছবি অনুশীলন করবার পর কোথায় কোথায় ধাতুর জন্যে সুসংহত ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালাতে হবে, তার একটি সুস্পষ্ট ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই করা সম্ভব। সর্বাত্মক ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার স্থানগুলি এভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ায় খরচ এবং পরিশ্রম দুই-ই অনেকটা বাঁচে। তবে সব ক্ষেত্রেই যে আকাশ-ছবি অনুশীলনের ফলাফল নির্ভুল হবে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তবে এরূপ অনুশীলনের প্রয়োজনীয় দিক থাকায় আকাশ-ছবির উপর নির্ভর করে পৃথিবীর অনেক জায়গায়ই, বিশেষ করে দুর্গম বন ও মরুভূমিতে প্রাথমিক ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালানো হয়ে থাকে। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজে আকাশ-ছবির অনুশীলন একটি আধুনিক পদ্ধতির পর্যায়ে পড়ে এবং এই পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে ক্রমশঃই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষও এই বিষয়ে পিছিয়ে নেই। ভারতবর্ষে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় আকাশ-ছবির অনুশীলন আধুনিক কালে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্যজনক-ভাবে এর ব্যবহার হচ্ছে।

শরীর-পুষ্টিতে ডাবের জল

সমীরকুমার রায়

প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশের সামাজিক আচার-ব্যবহারে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে ডাবের জলের বহুল প্রচলন। প্রকৃতি-দত্ত এই ডাবের জল শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত পথিকের কাছে অমৃতস্বরূপ। বিশ্ববিখ্যাত চার্লস ডারউইন একবার কিলিং দ্বীপে গাছের শীতল ছায়ায় বসে ডাবের জল পান করে বলেছিলেন—"Those alone who have tried it, know how delicious it is to be seated in such a shade and drink the cool pleasant fluid of the coconut".

জীবাণু-শূন্য এবং পাইরোজেন-মুক্ত প্রকৃতি-দত্ত জল আমরা একমাত্র ডাবের মধ্যেই পাই। ডাবের জল শরীরের অবসাদ দূর করে এবং শরীরকে সুস্থ রাখে। এক কথায় বলতে গেলে, স্বাস্থ্যকর পানীয় হিসাবে এর জুড়ি নেই। তাই বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ডাবের জল সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানবার জন্যে নানাবিধ পরীক্ষা সুরু করেন। শরীরের পুষ্টি-সাধনের অর্থ হলো, শরীরকে সুস্থ-সবল রাখবার পক্ষে অপরিহার্য উপাদানগুলির সুষম যোগান দেওয়া। ডাবের জলের মধ্যে যদি এই অপরিহার্য উপাদানগুলির অস্তিত্ব থাকে, তবেই শরীর-পুষ্টির পক্ষে ডাবের জলের উপকারিতার বিষয় প্রমাণিত হবে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ থেকে ডাবের জলের উপাদান সম্পর্কে জানতে পারা যায়। প্রতি ১০০ মিলিলিটার ডাবের জলে নিম্নোক্ত উপাদানগুলি বর্তমান।

সোডিয়াম—	১৫'০	মিলিগ্র্যাম
পটাসিয়াম—	৩১২'০	"
ক্যালসিয়াম—	২৯'০	"
ম্যাগ্নেসিয়াম—	৩০'০	মিলিগ্র্যাম
লৌহ—	০'১০	"
তামা—	০'৪০	"
ফস্ফরাস—	৩৭'০	"
গন্ধক—	২৪'০	"
ক্লোরিন	১৮৩'০	"

এছাড়া প্রোটিন, শর্করা, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং খাদ্যপ্রাণ উপযুক্ত পরিমাণে বর্তমান।

শরীর-গঠনে ধাতব লবণের দান অপরিসীম। খাদ্য গ্রহণ না করেও আমরা বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু দেহের ধাতব লবণের অভাব ঘটলে অনেক আগেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। আমাদের দেহের প্রায় $\frac{১}{২৫}$ অংশ ধাতব লবণের দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন প্রকারের ধাতব লবণের মধ্যে প্রায় ২০টি মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব আছে। তার মধ্যে প্রধান হলো, (১) ক্যালসিয়াম, (২) পটাসিয়াম, (৩) সোডিয়াম, (৪) লৌহ, (৫) ম্যাগ্নেসিয়াম, (৬) ম্যাঙ্গানিজ, (৭) জিঙ্ক, (৮) তাম্র, (৯) লিথিয়াম, (১০) বেরিয়াম, (১১) ফস্ফরাস, (১২) গন্ধক, (১৩) ক্লোরিন, (১৪) আয়োডিন, (১৫) সিলিকন, (১৬) ক্লোরিন। এই মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে প্রথম দশটি ক্ষারজাতীয় এবং শেষের ছয়টি অম্ল-উৎপাদক পদার্থ। খাদ্যে যদি ক্ষার এবং অম্ল-উৎপাদক পদার্থ উপযুক্ত অনুপাতে থাকে, তবেই আমাদের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। যদিও এই ধাতব লবণ শরীরে কোন শক্তির সঞ্চার করে না, তথাপি এই সকল পদার্থ আমাদের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য। রাসায়নিক বিশ্লেষণ থেকে

আরও জানা যায়, এই সব ধাতব পদার্থের অনেকগুলিই ডাবের জলে বর্তমান। ধাতব পদার্থগুলি শরীরে কি প্রকারে কাজ করে, সে বিষয়ে কিছুটা না জানলে ডাবের জল এবং ধাতব লবণের উপকারিতার বিষয় বোঝা যাবে না। সুতরাং ধাতব লবণের কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

সোডিয়াম দেহের কোষগুলির স্বাভাবিক কার্য পরিচালনার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। পাকস্থলীর পাচক রসে (Gastric juice) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপাদনে সহায়তা করে এবং অস্মোটিক প্রেসার (Osmotic pressure) বজায় রাখে। এসব ছাড়া রক্ত ও প্রস্রাবের বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। পটাসিয়ামের দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ। পেশীর সঙ্কোচন প্রতিরোধ করে রক্তে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন করে। স্নায়ুসমূহের কার্য পরিচালনার উপর পটাসিয়াম নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। অস্থি ও দাঁত গঠন, রক্ত জমাট বাঁধা, হৃৎপিণ্ডের পেশীর সঙ্কোচন এবং সর্বোপরি হৃদ্‌স্পন্দনে ক্যালসিয়াম সহায়তা করে থাকে। ক্যালসিয়ামের মত ম্যাগ্‌নেসিয়ামও অস্থি এবং দাঁত গঠনে সাহায্য করে এবং তাছাড়া এন্‌জাইমের ক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়। রক্তের লোহিত কণিকা ও হিমোগ্লোবিন সৃষ্টির জন্যে লোহের প্রয়োজন। রক্তে অক্সিজেন পরিবহন করা এবং প্রতিটি পেশীর মধ্যে যোগান দেওয়া ছাড়া আরও বিভিন্ন প্রকারের কাজ লোহের দ্বারা সম্পন্ন হয়। তামার দানও কম নয়। হিমোগ্লোবিন প্রস্তুতিতে তামা অনুঘটকের কাজ করে। ফস্‌ফরাসের কার্যপ্রণালী বহুমুখী—দাঁত ও অস্থি গঠন, কোষসমূহের কার্য পরিচালনা, রক্ত জমাট বাঁধবার ব্যাপারে এটি অপরিহার্য; বাফার (Buffer) হিসাবে দেহের হাইড্রোজেন আয়নের সংহতি (Concentration) নিয়ন্ত্রণ করে, পাকস্থলীর পাচক রসে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করতে সাহায্য করে। এসব ছাড়াও ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সের কার্য সম্পাদনে প্রভূত সহায়তা করে। আমাদের চুল, নখ প্রভৃতিতে গন্ধকের অস্তিত্ব আছে। ইন্‌সুলিনের একটি উপাদান হলো গন্ধক। সর্বশেষ যেটি, সেটি হলো ক্লোরিন। ক্লোরিন শরীরের প্রধান অ্যানায়ন (Anion) এবং সকল প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রধান সূত্র।

সুতরাং আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, ধাতব পদার্থ আমাদের শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে কিভাবে সাহায্য করছে। দেহে ধাতব পদার্থের প্রভাব সম্পর্কে বর্তমানে গভীরভাবে অনুসন্ধান চলছে। কিন্তু দেহে শুধুমাত্র ধাতব পদার্থ পরিমিত মাত্রায় থাকলেই চলবে না—স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার জন্যে চাই শর্করা অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট, স্নেহজাতীয় পদার্থ, প্রোটিন এবং বিভিন্ন প্রকারের ভিটামিন। এই সকল উপাদানগুলিই আমরা ডাবের জলে পাই। যে সব খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ডাবের জলে বর্তমান, তার একটি তালিকা দেওয়া হলো।

১। ভিটামিন-সি

২। নিকোটিনিক অ্যাসিড

৩। প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড বা ভিটামিন-বি-৩

৪। রিবোফ্ল্যাভিন বা ভিটামিন বি-২

৫। ফোলিক অ্যাসিড

৬। থিয়ামিন বা ভিটামিন বি-১

৭। পিরিডক্সিন বা ভিটামিন বি-৬

৮। বায়োটিন

অ্যামিনো অ্যাসিডের দ্বারা গঠিত প্রোটিন, জীবন্ত কোষসমূহের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রোটিন আমাদের দেহতন্ত্রর ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে, হরমোন এবং এন্‌জাইম তৈরি করে। স্নেহজাতীয় পদার্থ আমাদের শক্তির উৎস এবং দেহের

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। শর্করার দহন ক্রিয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণে শক্তির উদ্ভব হয়। এই শক্তি আমাদের কর্মক্ষম রাখে।

থিয়ামিন দেহের অভ্যন্তরে একপ্রকার এন্‌জাইমের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, শর্করার মেটাবলিজমে সাহায্য করে এবং হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য স্বাভাবিক-ভাবে চলাচলে সহায়তা করে। রিবোফ্ল্যাভিন ত্বকের সজীবতা, সুষ্ঠু পরিপাক ক্রিয়া এবং স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির জন্যে প্রয়োজন। এই খাদ্যপ্রাণ পরোক্ষভাবে প্রোটিন ও শর্করা মেটাবলিজমে সহায়তা করে। নিকোটিনিক অ্যাসিডও পরোক্ষভাবে শর্করা মেটাবলিজমে সাহায্য করে। ভিটামিন-সি দাঁত ও অস্থির পুষ্টিসাধন করে, পাকস্থলী সুস্থ রাখে এবং জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে। এছাড়া রক্তের বিশুদ্ধতা ও স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখবার জন্যে ভিটামিন-সি-এর প্রয়োজন। ফোলিক অ্যাসিড ও পিরিডক্সিন রক্তের লোহিত কণিকা গঠনে সহায়তা করে এবং প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড সম্ভবতঃ দেহতন্তুর দহনকার্য ও শর্করা মেটাবলিজমে অংশগ্রহণ করে থাকে। বায়োটিন সম্ভবতঃ রিবোফ্ল্যাভিন এবং অন্যান্য বি ভিটা-মিনের সঙ্গে কার্যে অংশগ্রহণ করে থাকে।

ধাতব লবণ, শর্করা, প্রোটিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং খাদ্যপ্রাণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এই মূল তথ্যটি উপলব্ধি করা যায় যে, ডাবের জলের মধ্যে শরীর-পুষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সঞ্চিত আছে। শরীরে জলের প্রয়োজন অপরিসীম। সব রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দ্রাবকের প্রয়োজন। দেহের কোষ-সমূহে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় পদার্থ যোগা-নের জন্যে এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নিষ্কাশনের পক্ষে দ্রাবক হিসাবে জল অপরিহার্য। মানুষের তৃষ্ণা পরিতৃপ্তি এবং সেই সঙ্গে শরীর-পুষ্টি ও অন্যান্য কাজের জন্যে বিভিন্ন উপাদান ডাবের মধ্যে সঞ্চিত আছে।

ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে জল, শর্করা ও ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়। এর পর থেকে জলের পরিমাণ কমতে থাকে এবং ত্রয়োদশ মাসে জলের পরিমাণ অনেকটা কমে যায়। ডাবের পরিপক্ক হওয়া এবং জলের পরিমাণ কমে যাওয়া—এই দুইয়ের সম্বন্ধের যোগসূত্র অনুসন্ধানে দেখা যায়—জলের pH যত বাড়তে থাকে, শাঁসও তত পুরু হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে জলের পরিমাণও কমতে সুরু করে।

ডাবের প্রকার	জলের পরিমাণ মিলিলিটার	pH
শাঁসবিহীন কচি ডাব	২৯৫	৪.৮০
০.৪ মিলিমিটার পুরু শাঁসের ডাব	২৩০	৪.৯০
১০-১২ মিলিমিটার পুরু শাঁসের ডাব	২১০	৫.৩০

Non-reducing sugar ছয়-সাত মাসের ডাবের মধ্যেই প্রথম পাওয়া যায় এবং ক্রমে বাড়তে বাড়তে নারকেল অবস্থায় ১.০% পর্যন্ত হয়ে থাকে। Dextrose, Laevulose, Sucrose নারকেলের জলে পাওয়া যায়—কিন্তু Reducing sugar কচি অবস্থায় ১—১.৫% পর্যন্ত পাওয়া যায় এবং সপ্তম মাসে ৫.০% দেখা যায়। সপ্তম মাসের পর থেকেই Reducing sugar কমতে আরম্ভ করে এবং ত্রয়োদশ মাসে ১.০% পাওয়া যায়। পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, ডাবের জলের প্রোটিনে Arginine, Alanine, Cystine এবং Serine প্রভৃতি অ্যামিনো অ্যাসিড বর্তমান। এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি গরুর দুধে যে পরিমাণে আছে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ডাবের জলে বর্তমান।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিতে আন্ত্রিক গোলযোগ উপশম করবার জন্যে ডাবের জলের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ডাবের জলে পুষ্টিকারক পদার্থের সন্ধান পেয়ে শরীরের পুষ্টিসাধনকল্পেও প্রয়োগের চেষ্টা করছেন—বিশেষ করে অপুষ্টিজনিত স্ফীতি (Nutritional oedema) এবং পুষ্টির অভাবে (Under-nutrition) ডাবের জল Intravenous injection দিয়ে বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট উপকার পেয়েছেন। Dehydration এবং Prostration-এর ক্ষেত্রে ৫০% Glucose-saline দেহে প্রবেশ করাতে হয়। এই ক্ষেত্রেও ডাবের জল প্রয়োগ করে যথেষ্ট উপকার পাওয়া গেছে। কিন্তু ডাবের জলের পরিমাণ ও উপাদানের মাত্রা বিভিন্ন স্থানের মাটির উপর নির্ভরশীল হতে পারে। সম্ভবতঃ তাই বিজ্ঞানীরা (Seth G. S Medical College এবং K. E. M. Hospital, Bombay) সংশ্লেষিত (Synthetic) ডাবের জলের কথা চিন্তা করছেন। সংশ্লেষিত ডাবের জলের প্রতি লিটারে থাকবে—

গ্লুকোজ—	৫'০%
সোডিয়াম ক্লোরাইড—	১১'০%
পটাসিয়াম ক্লোরাইড—	০'৫৫%

তুলনামূলকভাবে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, Dehydration এবং Prostration উপশমে প্রকৃতি-দত্ত ডাবের জলের প্রয়োজন—

৪৩১'২ মিলিলিটার,

গ্লুকোজ-স্যালাইন—১১১০'৭ মিলিলিটার,

সিন্‌থেটিক ডাবের জল—৬১২'৫ মিলিলিটার।

উপরের সমস্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পুষ্টিকর পানীয় হিসাবে ডাবের জল অন্যতম। ভবিষ্যতের গবেষণা থেকে আমরা আরও অনেক মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাব। এই আলোচনা শেষ করবার পূর্বে ডাবের শাঁস সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নারকেলের দুধের রাসায়নিক পরীক্ষা থেকে জানা যায়, এতে আছে—

স্নেহজাতীয় পদার্থ—	৭'১০%
শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট—	১'৭৫%
প্রোটিন—	০৮০%
ধাতব পদার্থ—	০'৫৫%

নারকেলের দুধও আন্ত্রিক গোলযোগ উপশমের পক্ষে যথেষ্ট কার্যকরী।

দেয়াল-পঞ্জী

রুবিকা কর

দেয়াল-পঞ্জীর নাম ক্যালেণ্ডার বা আলমানাক। ইহা আবালবৃদ্ধবণিতার নিকট প্রিয়। নববর্ষে সকলেই সাগ্রহে সুন্দর সুন্দর নূতন ক্যালেণ্ডার সংগ্রহ করেন। রঙীন ছবির ক্যালেণ্ডার পাইলে বালকদের কি আনন্দ! ইহাতে থাকে বার, তিথি, ছুটির কথা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়। অনেক সময় ক্যালেণ্ডারে দৈনিক তারিখের নীচে বিখ্যাত লেখকদের নীতিগর্ভ উক্তিসমূহও ছাপা থাকে। এই রকম শিক্ষামূলক ক্যালেণ্ডারের যথেষ্ট মূল্য আছে। চারু শিল্পের বিকাশ, ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন, গ্রহাদির গতিবিধি নিরূপণ, গৃহের শ্রীবর্ধন, আবশ্যকীয় তথ্য পরিবেশন ইত্যাদি সব কিছুই ইহার দ্বারা সম্পন্ন হয়। বর্তমান কালে সর্বদেশে সর্বভাষায় দেয়াল-পঞ্জীর বহুল প্রচলন হইয়াছে।

দেয়াল-পঞ্জী পঞ্জিকার সংক্ষিপ্ত আকার। ইহাতে বার, মাস, বর্ষ, তিথি, নক্ষত্রের রাশিযোগের বিশদ বিবরণ থাকে। স্মরণীয় কোন ঘটনা অবলম্বনে সাল, অব্দ গণনার রীতি আছে। যীশু খৃষ্টের জন্মকাল হইতে খৃষ্টাব্দ প্রচলিত হয়। ধর্মগুরু (পোপ) ত্রয়োদশ গ্রেগরী ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে পঞ্জিকার যে ধারা প্রবর্তন করেন, তাহাই গ্রেগরীয়ান ক্যালেণ্ডার নামে প্রচলিত ইংরেজী দেয়াল-পঞ্জী। হিজরী অব্দ হজরত মহম্মদের সময় হইতে প্রচলিত। শক রাজার আমল হইতে শকাব্দের সূত্রপাত। এইরূপে বঙ্গাব্দ, বিক্রমাব্দ (সংবৎ), গৌরাব্দ প্রভৃতির উদ্ভব। ১৮৮১ শকাব্দ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ একই বর্ষকে নির্দেশ করে।

ভারতীয়, মিশরীয়, ব্যবলনীয় সভ্যতা সুপ্রাচীন। বৎসরান্তে নীল নদে চিরকাল নিয়মিত সময়ে বন্যা হইয়া থাকে। অনেকে মনে করেন যে, এই বন্যাই পঞ্জিকার চেতনা আনিয়াছে। মানব জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে বার, তিথির উল্লেখ লক্ষণীয়। ইহাতে বার মাসের নাম—

বৈদিক নাম	বর্তমান নাম
শুক্র	বৈশাখ
সহস	কার্তিক
শুচি	জ্যৈষ্ঠ
সহস্য	অগ্রহায়ণ
নভস	আষাঢ়
তপস	পৌষ
নভস্য	শ্রাবণ
তপস্য	মাঘ
ঈশা	ভাদ্র
মধু	ফাল্গুন
ঊর্জ	আশ্বিন
মাধব	চৈত্র

গীতায় দেখা যায়—মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত—"মাসানাং মার্গশীর্ষোৎ ঋতুনাং কুসুমাকরঃ।"

বাইবেলে—"যীশু খৃষ্টের জন্ম হইলে পূর্ব দেশ হইতে কয়েকজন পণ্ডিত যিরূশালেমে আসিয়া কহিলেন, যিহূদীদের যে রাজা জন্মিয়াছেন, তিনি কোথায়? কারণ আমরা পূর্ব দেশে তাঁহার তারা দেখিয়াছি ও তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি।" পুরাণবিশেষে পরীক্ষিতের জন্মকাল এক শ্লোকে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাহা মহাভারতীয় যুগের

কাল নিরূপণে আলোকপাত করে। বঙ্গ সাহিত্যের বিকাশের যুগে চর্যাপদে দেখি—

"ভাদর মাসের তিথি চতুর্দ্দির রাতি।
জালমাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী॥"

সৌর, চান্দ্রমাসে তিথি নক্ষত্রানুসারে পূজা-পার্বণাদি অনুষ্ঠিত হয়। তাহার প্রয়োজনে জ্যোতিষ শাস্ত্র সৃষ্ট।

যাগ-যজ্ঞে বেদী গঠন সূত্রে এমনভাবে একদা জ্যামিতির বিকাশ ঘটে।

আমাদের দেশে মাস, অব্দ—এমন কি, নববর্ষের প্রভেদে অন্ততঃ ত্রিশ রকমের পঞ্জিকার প্রচলন দেখা যায়। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যার মধ্যে আছে—সূর্যসিদ্ধান্ত (৪৪০ খৃঃ অঃ), জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত (৫০০—৬০০) মুঙহল (৯৩২), শ্রীপতি (১০৩৯), ভাস্করাচার্য (১১৫০ খৃঃ অঃ)। ইঁহাদের মতে বৎসর-কাল ৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা, ১২.৬ মিনিট।

কিন্তু অধুনা বিজ্ঞানসম্মত সময় ৩৬৫ দিন, ৫ ঘণ্টা, ৪৮.৮ মিনিট। সুতরাং ভারতীয় পঞ্জিকার সময় ঠিক নয়। অয়ন, দোলন ইত্যাদি সিদ্ধান্ত হইতে দেখা যায় যে, এদিকেও তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। এত কালে তেইশ দিনের প্রভেদ ইহারই জন্য দাঁড়াইয়াছে। পঞ্জিকার মতে যে সময়ের যা, সে সময়ে রাশিচক্র পড়ে না। গুড ফ্রাই ডে, মহরম ইত্যাদি পর্ব সর্বদেশে একই দিনে পালিত হয়। কিন্তু আমাদের দেখা যায় এই ক্ষেত্রে তারতম্য। তাহার কারণ—প্রায় ত্রিশ রকমের পঞ্জিকা প্রচলিত। এইগুলির সমন্বয়ে বিজ্ঞানসম্মত একটি বিশুদ্ধ রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকার প্রয়োজন।

ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা গঠনের ভার ডাঃ মেঘনাদ সাহার উপর অর্পিত হয়। এই বৎসরে জুন-জুলাই মাসে জেনিভায় অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মন্ত্রণা সভায় তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে নূতন সুষম দেয়াল-পঞ্জী সংকলনের প্রস্তাব করেন। আমাদের রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ (পঞ্জিকা) ১৮৭৯ শকাব্দে মহাবিষুব সংক্রান্তির পরদিন ১লা চৈত্র (২২ মার্চ, ১৯৫৭) প্রথম প্রকাশ করেন দিল্লী মানমন্দিরের অধিকর্তা এস. বসু। ঐ সংক্রান্ত গণনাদি কলিকাতার আলিপুর আবহাওয়া অফিসে এন. সি. লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল। মধ্য প্রদেশের উজ্জয়িনীর (৮২.৩০ পূর্ব অক্ষাংশ, ২৩.১১ উত্তর দ্রাঘিমাংশ) সময় রাত্রি ১২টা হইতে দিন গণনা হইয়াছে।

ভারতীয় ও গ্রেগরীয়ান পঞ্জিকার তুলনা এইরূপ:—

ভারতীয় পঞ্জিকার	গ্রেগরীয়ান পঞ্জিকার
১লা চৈত্র (৩০ দিনে, লিপ ইয়ারে ৩১)	২২ মার্চ (লিপ ইয়ারে ২১ মার্চ
১লা বৈশাখ (৩১)	২১ এপ্রিল
„ জ্যৈষ্ঠ („)	২২ মে
„ আষাঢ় („)	২২ জুন
„ শ্রাবণ („)	২৩ জুলাই
„ ভাদ্র („)	২৩ অগাষ্ট
„ আশ্বিন (৩০ দিন)	২৩ সেপ্টেম্বর
„ কার্তিক („)	২৩ অক্টোবর
„ অগ্রহায়ণ („)	২২ নভেম্বর
„ পৌষ („)	২২ ডিসেম্বর
„ মাঘ („)	২১ জানুয়ারী
„ ফাল্গুন („)	২০ ফেব্রুয়ারী

সময়ের পূর্ণমান "গ্রীনউইচ টাইম"। ভারতীয় পঞ্জিকা ও গ্রেগরীয়ান ক্যালেণ্ডারের সময় যথাক্রমে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ও গ্রীনউইচ টাইমে। প্রথমটি দ্বিতীয়টির সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা অগ্রগামী।

দেয়াল-পঞ্জীতে আজ যাহা নববর্ষ, নূতন মাস, দেখিতে দেখিতে তাহা বিগত হয়। ইহা চির প্রবীণ এবং চির নবীনও বটে।

জেনার ও বসন্তের টিকা

আব্দুল হক খন্দকার

বসন্ত একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগে আক্রান্ত হলে অনেক ক্ষেত্রেই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী ভাগ্যক্রমে ভাল হলেও এই রোগের চিহ্ন থাকে তার সারা গায়ে—কারো কারো বা চোখ অথবা কোন কোন অঙ্গ চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায়। এই রোগের কোন জাত বিচার নেই—কেউ এই রোগের হাত থেকে রেহাই পায় না। ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের রাণী মেরী ১৬৯৪ সালে এই রোগে মারা যান। রাজাও এই রোগে আক্রান্ত হন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে জীবনে রক্ষা পেলেও চিরদিনের জন্যে পঙ্গু হয়ে পড়েন।

বসন্ত রোগ আবির্ভাবের সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। তবে যীশু খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্বে প্রাচ্যের দেশগুলিতে, বিশেষ করে চীন দেশে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। এই প্রাচ্য দেশ-গুলি থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে বসন্ত রোগের এরূপ বিস্তৃতি ঘটে যে, মানুষের কাছে তা এক বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায়। এই শতাব্দীতে একমাত্র ইউরোপেই ছয় কোটি লোকের মৃত্যু ঘটে। প্রতি দশজন মৃতের মধ্যে একজন থাকতো বসন্ত রোগাক্রান্ত। একবার কোন দেশে এই রোগ সুরু হলে লোকেরা দেশ ছেড়ে পালাতো, কিন্তু পালিয়ে নিস্তার ছিল না। তাদের অগোচরে এই রোগও তাদের সঙ্গী হতো এবং সেখানের লোকেরও সর্বনাশ ডেকে আনতো।

যাঁর অক্লান্ত সাধনা ও সাহসিকতার ফলে বসন্ত রোগকে আজ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে, তিনি হলেন ইংল্যাণ্ডের এক গ্রাম্য চিকিৎসক ও বসন্তের টিকা আবিষ্কারক—এডওয়ার্ড জেনার। তাঁর অমূল্য আবিষ্কার শুধু যে বসন্তের মত মারাত্মক ব্যাধিকেই প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে তা নয়, অন্যান্য রোগকেও প্রতিরোধ করবার এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। জেনারের টিকা আবিষ্কারের ফলে মানুষ আজ এক ভয়ঙ্কর ব্যাধির কবল থেকে বহুলাংশে মুক্তি পেয়েছে। বসন্ত রোগ আজ আর মানুষের তেমন ভীতির সঞ্চার করে না। সময় মত টিকা নিলে এই রোগ আর হয় না কিংবা হলেও তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায় না। অনেক সভ্যদেশে এই রোগের কথা আজকাল কদাচিৎ শোনা যায়। সে সব দেশ থেকে এই রোগটি ধরতে গেলে নির্মূল হয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে শিক্ষার অভাব ও কুসংস্কারের প্রভাবে আজও আমরা এই প্রাণঘাতী ব্যাধিকে পোষণ করছি। সরকারের চেষ্টা সত্ত্বে আজও আমরা টিকা নেবার প্রতি চরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে যেমন সর্বনাশ করি, অন্যের সর্বনাশও তেমনি ডেকে আনি।

যাহোক, যে মানবহিতৈষী চিকিৎসক বসন্তের প্রতিরোধক পন্থা আবিষ্কার করে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করে গেছেন—পূর্বেই বলেছি তাঁর নাম এডওয়ার্ড জেনার। জেনার ১৭৪৯ সালে ১৭ই মে ইংল্যাণ্ডের গ্লুচেস্টার-শায়ারের অন্তর্গত ছোট্ট শহর, বার্কলীতে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রেভারেণ্ড ষ্টিফেন ছিলেন একজন অবস্থাপন্ন ধর্মযাজক। জেনারের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন তাঁর পিতা মারা গেলে জেনারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁকে পিতার মতই প্রতিপালন করেন।

গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি জেনারের স্বাভাবিক এক আকর্ষণ ছিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি গাছপালা, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সেই কোন পাখীর ডাক শুনে পাখীটিকে তিনি চিনতে পারতেন। পথের ধারের প্রত্যেকটি গাছের নাম বলতে পারতেন—এমন কি, প্রকৃতিকে নিয়ে কবিতা লিখতেন।

গ্লচেস্টারশায়ারের অদূরবর্তী সডবরিতে ডাঃ ড্যানিয়েল লুডলোর নামে এক চিকিৎসকের কাছে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে সুরু করেন। এই সময়ে একদিন তিনি এক গ্রাম্য মহিলাকে বলতে শোনলেন যে—গ্রামে বসন্ত সুরু হলেও তাঁর কোন ভয় নেই—কেন না, তাঁর গো-বসন্ত হয়ে গেছে, জীবনে তাঁর আর বসন্ত হবে না। মহিলাটির কথা শুনে জেনার কৌতূহলী হলেন। কেন না, বসন্ত একটি মারাত্মক ব্যাধি এবং এর কোন চিকিৎসাও নেই, অথচ গো-বসন্ত অনেকটা আসল বসন্তের মত হলেও তা তেমন মারাত্মক নয়। গ্রাম্য লোকদের কাছেও তিনি এই বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, প্রায় সবারই সেই ধারণা—গো-বসন্ত হলে আর আসল বসন্ত হয় না।

এরপর একুশ বছর বয়সে জেনার লণ্ডনে এসে তদানীন্তন বিখ্যাত সার্জন ও অ্যানাটমির শিক্ষক জন হাণ্টারের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। সে সময়ে তিনি অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন, যাঁর মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কও ছিলেন। স্যার জোসেফ ব্যাঙ্ক তখন ক্যাপ্টেন কুকের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়া অভিযান শেষ করে ফিরেছেন। এই অভিযানে যে সকল গাছপালার নমুনা সংগ্রহ করে এনেছিলেন, তার কতকগুলি তিনি জেনারকে শ্রেণী-বিভাগ করতে দেন। জেনার এই কাজ এমন দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন যে, ক্যাপ্টেন কুকের পরবর্তী অভিযানে তাঁকে নেবার কথা হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আর যাওয়া হয় নি।

জেনার অবশ্য অনায়াসে লণ্ডনে হাণ্টারের সঙ্গে থেকে ডাক্তারী করে নাম করতে পারতেন। হাণ্টার জেনারকে খুব স্নেহ করতেন—কিন্তু লণ্ডনের আড়ম্বরপূর্ণ চিকিৎসা-প্রণালী তাঁর মনঃপূত ছিল না। তাছাড়া হাণ্টারের প্রিয়পাত্র হলেও তিনি তাঁকে ভয় করতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি নিরিবিলি থাকতে ভালবাসতেন।

তাই তাঁর গ্রামেই তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় সুরু করেন। তারপর দীর্ঘ পঁচিশ বছর তাঁর এই গ্রামেই কেটে গেল। গ্রাম ছেড়ে কোথাও তিনি গেলেন না। জেনার যখন নিজ গ্রামে ডাক্তারী ব্যবসায় সুরু করেন, তখন তাঁর রোগীদের মধ্যে অনেকেই থাকতো বসন্তরোগাক্রান্ত। তাই তিনি সব সময়েই ভাবতেন, এমন কোন পন্থা কি উদ্ভাবন করা যায় না, যার ফলে লোকে মোটেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হবে না? কিন্তু ভেবে ভেবে তিনি সমাধানের কোন পথ খুঁজে পেতেন না। তিনি যখন প্রখ্যাত হাণ্টারের ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি সেই গ্রাম্য মহিলার কথা, গ্রাম্য লোকদের বিশ্বাসের কথা তাঁর গোচরে এনেছিলেন। কিন্তু হাণ্টার তাঁর কথায় তেমন আমল দেন নি।

অবশ্য জেনার বসন্তের টিকা আবিষ্কার করবার আগেও এই রোগ প্রতিরোধের এক প্রকার ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু তা তেমন সুবিধাজনক ছিল না। ইউরোপে যখন এই রোগ মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছিল, তখন প্রাচ্যে এই প্রথার প্রচলন ছিল এবং এই কারণে সেখানে বসন্তের প্রকোপ তখন ততটা ছিল না। সাধারণতঃ দেখা যায়, যারা বসন্তে আক্রান্ত হবার পর সুস্থ হয়, বহুদিন পর্যন্ত তাদের এই রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে না। যদিও বা আক্রান্ত হয়, তবু তা মারাত্মক হয় না। আবার

কারো কারো একবার বসন্ত হলে সারা জীবন সে আর এই রোগে আক্রান্ত হয় না। প্রাচ্যে এই অভিজ্ঞতাকে তখন বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করবার কাজে লাগানো হতো। এই প্রথায় কোন বসন্ত রোগীর গুটি থেকে খানিকটা পুঁজ এনে সুস্থ লোকের দেহে সামান্ত ক্ষত করে লাগিয়ে দেওয়া হতো, যাতে তাদের শরীরে প্রতিরোধ-শক্তি সৃষ্টি হতে পারে। সুস্থ ও সবল লোকেরা অনেক সময় স্বেচ্ছায় অন্ত লোকের বসন্তের বীজ নিজের দেহে সংক্রামিত করতো। অনেক সময় আবার পুঁজের বদলে বসন্তের গুটির খোসার শুষ্ক গুঁড়া ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বসন্ত প্রতিরোধ করা মোটেই নিরাপদ ছিল না। কেন না, সুস্থ দেহে বসন্তের বীজ ঢোকাবার ফলে রোগের আক্রমণ সামান্ত হবে, কি তীব্র হবে, তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। আক্রমণ সামান্ত হলে ভাল কথা, কিন্তু তীব্র হলে জীবন-মরণ সমস্তা। এই পদ্ধতির সাফল্য তাই ছিল খুবই অনিশ্চিত—ধরতে গেলে, টিকা গ্রহণকারীদের ভাগ্যের উপরই নির্ভর করতে হতো।

আসলে এই পদ্ধতিকে বসন্তের সত্যিকার কোন প্রতিবিধান বলা যায় না। সুস্থ লোকের দেহে রোগের কৃত্রিম প্রতিরোধক শক্তি উৎপাদন করাই ছিল এর উদ্দেশ্য—যার ফলে পরে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা তেমন আর থাকতো না। প্রথমটির মধ্যে এটুকুই পার্থক্য বা অভিনবত্ব ছিল যে, স্বাভাবিকভাবে বসন্তে আক্রান্ত না হয়ে, স্বেচ্ছায় বসন্তকে নিজ দেহে সংক্রামিত করা। টিকা দেবার ফলে উদ্ভূত গুটি আর স্বাভাবিক বসন্তের গুটি—দুই-ই সমান ছোঁয়াচে—তফাৎ শুধু এই যে, স্বাভাবিকভাবে রোগ হলে এই রোগের প্রকোপ হয় ভীষণ এবং একশো জনের মধ্যে দশ থেকে পঁচাত্তর জনই বাঁচে না। যারা বাঁচে, তাদের গায়ে ও মুখে দাগ থাকে—কেউ বা বিকলাঙ্গ হয়, কেউ বা অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু স্বেচ্ছায় টিকা নিলে গুটির কোন দাগ থাকে না এবং শতকরা এক থেকে তিনজন মাত্র মারা যায়। তবে আগেই বলেছি, টিকার বসন্ত এবং স্বাভাবিক বসন্ত সমান ছোঁয়াচে। কাজেই টিকায় যার বসন্ত হয়েছে, সেও স্বাভাবিক বসন্ত রোগীর মত রোগ ছড়াতে পারে। কিন্তু এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও প্রাচ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, কারণ এই রোগের কোন ওষুধ ছিল না এবং এর চেয়ে ভাল কোন প্রতিরোধক ব্যবস্থাও ছিল না।

প্রাচ্যের এই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কথা ইংল্যাণ্ডের লোকেরা কিন্তু জানতো না। মিস সারা রিজওয়েলকে লিখিত লেডী মেরী ওরলী মণ্টেগুর এক চিঠির সূত্রে ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম এই খবর পৌঁছায় ১৭১৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে। লেডী মণ্টেগু তখন তুরস্কে থাকতেন। তিনি ছিলেন সেখানকার বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের পত্নী। তুরস্ক থেকে তিনি তাঁর বিলাতের বন্ধুদের কাছে সুলতান পরিবারের ঐশ্বর্য আচার-ব্যবহার প্রভৃতির কথাও বর্ণনা দিয়ে মজার মজার চিঠি লিখতেন। কিন্তু মিস সারাকে এবার যে চিঠি দিলেন, তাতে এক ভিন্ন সংবাদ তিনি পরিবেশন করলেন। তিনি লিখলেন—প্রাচ্যের দেশগুলি একদিক থেকে ইংল্যাণ্ডের চেয়ে অনেক উন্নত। বসন্ত রোগ ইংল্যাণ্ডে যেমন ভয়াবহ, তুরস্কে তেমন নয়। এখানে প্রতি বছর শরৎকালে ভ্রাম্যমান একদল বৃদ্ধা বাদামের খোসায় ভর্তি বসন্তের শুকনো বিষ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এদের পয়সা দিয়ে মায়েরা তাদের বাচ্চাদের গায়ে বসন্তের বিষ লাগিয়ে নেয়। একটি সূচের মাথায় তারা বাদামের খোসা থেকে বসন্তের বিষ নিয়ে বাচ্চাদের হাতে কিংবা পায়ের চার-পাঁচ জায়গায় আঁচড় কেটে লাগিয়ে দেয়। তারপর বাদামের শূন্য খোসা ঐ

ক্ষতের উপর বেঁধে দেয়। সাত-আট দিন পর এই বাচ্চাদের জ্বর হয় এবং বড় জোর তিন দিন তারা বিছানায় শুয়ে থাকে। মুখে তাদের দু-তিনটির বেশী গুটি ওঠে না, আর সাত আট দিনেই তা শুকিয়ে যায়। শুকনো খোসা যখন উঠে যায়, তখন মুখে কোন দাগ থাকে না। এমনি করে প্রতি বছর হাজার হাজার ছেলে-মেয়েদের শরীরে বসন্তের বিষ দেওয়া হয়, কিন্তু এতে কেউ মরে না—জীবনে তাদের আর বসন্তও হয় না। সম্ভ্রান্ত চিকিৎসকেরাও এমনিভাবে বিষ দেবার কাজ করে থাকেন।

এই চিঠি লেখার কিছুদিন পর তিনি নিজের বাচ্চাকেও এই প্রথায় বসন্তের বিষ দিয়ে নেন।

লেডী মন্টেগু নিজেও ছিলেন ভুক্তভোগী, অল্প বয়সে তাঁর একবার বসন্ত হয়। ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গেলেও তাঁর চোখের পাতার সব লোম উঠে যায়। তাঁর মা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। কাজেই প্রাচ্যে এই মারাত্মক রোগের এমন কার্যকরী প্রতিরোধ-ব্যবস্থা লক্ষ্য করে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। চেনা জানা সকলের কাছেই তিনি এই বিষয়ে চিঠি লিখতে সুরু করলেন এবং দেশে ফিরে এসে নিজের দেশে এই প্রথা চালু করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। অভিজাত মহলেও লেডী মন্টেগুর বেশ আধিপত্য ছিল, কাজেই তাঁর চেষ্টা বৃথা গেল না—এমন কি, তাঁর উপরোধে পড়ে প্রিন্সেস ওয়েল্‌স্‌ তাঁর দুই মেয়েকে প্রাচ্যের প্রথায় বসন্তের টিকা দিতে রাজি হয়েছিলেন। অবশ্য প্রিন্সেসের কন্যাদ্বয়কে টিকা দেবার আগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ছয়জন আসামীর উপর এবং পরে ছয় জন ভিখারী ও পাঁচ জন শিশুর উপর এই টিকার ফলাফল পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই সকল পরীক্ষায় কোন অনর্থ বা অঘটন যখন ঘটলো না, তখন প্রিন্সেসের দুই কন্যাকে এই টিকা দেওয়া হলো এবং রাজপ্রাসাদের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথমে অভিজাত মহলে ও পরে সমগ্র দেশে টিকা নেওয়া এক চলতি ফ্যাসানে দাঁড়িয়ে গেল—প্রাচ্যের প্রচলিত পদ্ধতি বসন্ত রোগের ঠিক প্রতিরোধক নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এর ফল মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতো। তাছাড়া বসন্তের গুটির মত এই টিকাজনিত গুটি ছিল সমান সংক্রামক। কাজেই কিছুদিনের মধ্যে এই টিকার জন্যেই বসন্ত রোগ ছড়াতে লাগলো। রাশিয়ায় প্রতি সাত জন শিশুর মধ্যে এক জন মারা যেতে লাগলো। ফ্রান্সেও এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, বিপ্লবের আগেই এই টিকা নেওয়া বে-আইনী বলে ঘোষিত হলো।

আমেরিকার বোষ্টন শহরের ডাক্তার বয়েল-ষ্টোন ১৭২১-১৭২২ সালে বসন্তের মহামারীর সময় বসন্তের এই টিকা লোককে দিয়েছিলেন বলে অন্যান্যেরা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে যান এবং নানা ভাবে তাঁকে অপদস্থ করেন—এমন কি, লোকে তাঁর পরিবারবর্গের জীবননাশের চেষ্টাও করে। ডাক্তার ও সংবাদপত্রের তীব্র বিরোধিতার ফলে শেষ পর্যন্ত আমেরিকাতেও এই টিকা দেবার বিরুদ্ধে আদেশ জারি হলো। শুধুমাত্র ইংল্যাণ্ডে আরও কিছুদিন এই প্রথা চালু ছিল।

জেনার যখন নিজ গ্রামে ডাক্তারী করতেন, তখন এই টিকা দেবার জন্যে মাঝে মাঝে তাঁর ডাক পড়তো। তিনি লক্ষ্য করলেন—এই টিকা দিলে সকলেরই গুটি ওঠে না। খোঁজ নিয়ে জানলেন, যাদের টিকায় গুটি ওঠে না, তারা আগে গো-বসন্তে ভুগেছিল। গো-বসন্তে গরুর চামড়ার উপর ছোট ছোট গুটি হয়। যারা গরুর পরিচর্যা করে, তাদের হাতে মাঝে মাঝে এই গুটি ওঠে। গ্রামের লোকেরা বলতো, যাদের গো-বসন্ত হয়, তাদের আর আসল বসন্ত হয় হয় না। জেনার এই বিষয়ে—আরও তথ্য

সংগ্রহ করতে লাগলেন। জেনার অবশ্য বিষয়টিকে নিছক সংস্কার বলে ধরে নিতে পারলেন না, বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে তিনি মনস্থির করলেন। কিন্তু কিভাবে তিনি তা পরীক্ষা করবেন? এই সত্য যাচাইয়ের একমাত্র পথ হলো, কোন সুস্থ ব্যক্তিকে গো-বসন্তের টিকা দিয়ে দেখা যে, সত্য সত্যই পরে সে বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় কিনা। কিন্তু কার উপর তিনি এই সাংঘাতিক পরীক্ষা করবেন? কে এই বিপজ্জনক পরীক্ষায় রাজি হবে? শেষ পর্যন্ত এক ভদ্রমহিলা তাঁর ছেলের উপর এই পরীক্ষা চালাতে রাজি হলেন। এই ভদ্রমহিলার সাহসিকতা জেনারের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইতিহাস সেই সাহসী মহিলার নাম মনে রাখে নি।

১৭৯৬ সালের ১৪ই মে চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। ঐ দিনে জেনার এক দুঃসাহসিক কাণ্ড করলেন। জেম্‌স্ ফিপ্‌স্ নামে আট বছরের এক বালকের উপর তিনি গো-বসন্তের বীজ প্রথম প্রয়োগ করলেন। সেবার জেনারের গ্রামের এক গোশালায় গো-বসন্ত হয় এবং তাথেকে সারা নেলমেস নামে এক গোয়ালিনীকে এই রোগে আক্রমণ করে। সারার গো-বসন্তের গুটি থেকে একটু পুঁজ হাঁসের পালকের দাঁড় কেটে তার মুখে নিয়ে জেনার জেম্‌স্ ফিপ্‌সের হাতে আঁচড় কেটে লাগিয়ে দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই ফিপ্‌সের হাতের সেই জায়গাতে ছোট্ট একটি গো-বসন্তের গুটি উঠলো। দিন কয়েক পরেই গুটিটি শুকিয়ে গেল—শুধু সেখানে থাকলো সামান্য একটু দাগ। এরপর জেনার যখনই বসন্ত রোগীর চিকিৎসা করতে যেতেন, তখনই ফিপ্‌স্‌কে সঙ্গে নিতেন—কিন্তু এতেও সে বসন্তে আক্রান্ত হলো না। এমনিভাবে একমাস কেটে গেল।

এরপর জেনার আসল পরীক্ষা সুরু করলেন। এবারে বসন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গুটি থেকে কিছুটা পুঁজ এনে তিনি ফিপ্‌সের দেহে আঁচড় কেটে লাগিয়ে দিলেন। দেখা গেল, এতেও ফিপ্‌সের দেহে বসন্তের গুটি উঠলো না। কয়েক মাস পরে জেনার আবার ফিপ্‌সের দেহে বসন্তের বীজ আগের মত করে লাগালেন। এবারও ফিপসের কিছু হলো না। গ্রামের লোকের কথা যে ঠিক, সে সম্পর্কে জেনার নিঃসন্দেহ হলেন। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে, গো-বসন্ত সত্যই আসল বসন্ত প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

শীঘ্রই জেনার এই পরীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ লিখে রয়াল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশের জন্যে পাঠালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর লেখা ফেরৎ এলো। সোসাইটি দুঃখ প্রকাশ করে জানালেন —জেনারের মতবাদ চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই, তবে তাঁর তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়—ছেলেটার যে বসন্ত হয় নি—তা নেহাৎই তার ভাগ্য। জেনার এতে দুঃখিত হলেন, কিন্তু নিরাশ হলেন না।

জেনারের সিদ্ধান্তে কোন সংশয় ছিল না—তাই রয়াল সোসাইটির বিরূপ সমালোচনায় তাঁর বিশ্বাস শিথিল হলো না। জন হাণ্টারের কাছ থেকেও তিনি উৎসাহ পেলেন। তিনি জানালেন—নিরাশ হয়ো না, তুমি আরও পরীক্ষা কর—তোমার তত্ত্বের স্বপক্ষে আরও প্রমাণ সংগ্রহ কর।

কিন্তু বিধি বাদ সাধলো। জেনার কিছুকাল কোন পরীক্ষা করবার সুযোগই পেলেন না। যে গো-বসন্তের উপর নির্ভর করে তিনি আরও পরীক্ষা চালাবেন স্থির করলেন—হঠাৎ তাঁর গ্রাম থেকে তা লোপ পেল। অনেক খুঁজেও তিনি গো-বসন্তের বীজ আর যোগাড় করতে পারলেন না। জেনারের পরীক্ষা তাই আপাততঃ বন্ধ থাকলো।

যাহোক, ছু-বছরের চেষ্টায় জেনার মাত্র সাত জনের উপর গো-বসন্তের টিকা দিতে সক্ষম হলেন। ফল সব ক্ষেত্রে একই দাঁড়ালো—গো-বসন্তের টিকা আসল বসন্তকে প্রতিরোধ করলো।

১৭৯৮ সালে জেনার তার গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ফলাফল—গো-বসন্তের কারণ এবং তার পরিণাম অনুসন্ধান (অ্যান ইনকোয়ারী ইনটু দি কজেস্ অ্যাণ্ড এফেক্টস্ অফ ভ্যারিওয়ালা ভ্যাকসিনি) নামক ৭৫ পৃষ্ঠার এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করলেন। এতে তিনি ২৩টি গো-বসন্তের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এই ২৩টির মধ্যে ১৬টির রোগ হয় গরু থেকে, বাকী ৭টি জেনারের টিকা দিয়ে। লেডী মণ্টেগুর প্রচলিত টিকা এর সব কয়টি ক্ষেত্রেই নিষ্ফল হয়েছে। এই সামান্য তথ্য সম্বল করে গো-বসন্তের টিকা দিয়ে বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করবার এক দুঃসাহসিক অভিযানে জেনার এতদিনে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। কয়েক কপি এই প্রকাশিত বই নিয়ে তিনি সস্ত্রীক লণ্ডনে এলেন। কিন্তু সেবারের মত তাঁর অভিযান ব্যর্থ হলো। আড়াই মাস ধরে চেষ্টা করেও তিনি বিফল হলেন, একটি লোকও তাঁর টিকা নিতে রাজি হলো না। জেনার নিরাশ হয়ে মনের দুঃখে গ্রামে ফিরে গেলেন।

জেনারের লণ্ডন যাওয়া অবশ্য একেবারে বিফল হলো না। গ্রামে ফিরে আসবার সময় তিনি হাঁসের পালকের এক দাঁড় ভর্তি গো-বসন্তের বীজ লণ্ডনে রেখে এসেছিলেন এবং তা দিয়ে ক্লাইন নামে একজন ডাক্তার একটি ছেলের হাতে টিকা দেন। ছেলেটি পরে বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করে। ডাঃ ক্লাইন জেনারের টিকার কার্যকারিতা উপলব্ধি করে তাঁকে লণ্ডনে এসে ডাক্তারী করবার জন্যে পরামর্শ দিয়ে চিঠি দিলেন। জেনার অবশ্য গ্রাম ছেড়ে সেবার আসলেন না। কিন্তু লণ্ডনের উডভিল নামক এক চতুর ডাক্তার যখন নিজের খুসীমত গো-বসন্তের টিকা ব্যবহার করে কৌশলে নিজের নাম জাহির করবার অভিসন্ধি করলেন এবং তার এক বন্ধু পিয়ারসনের সঙ্গে জেনারের আবিষ্কার দিয়ে প্রভূত বিত্তশালী হবার এক বিরাট পরিকল্পনা ফেঁদে বসলেন, তখন তিনি বাধ্য হয়ে আবার লণ্ডনে এলেন এবং বহু চেষ্টায় এই দুই বন্ধুর দুরভিসন্ধি বানচাল করে দিলেন।

এবার জেনার নিজেই এক প্রতিষ্ঠান গঠন করে লণ্ডনের এক বাড়ীতে প্রধান অফিস খোললেন এবং সেখান থেকে তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে টিকার বীজ বাইরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন। এতদিনে জেনারের ভাগ্য যেন কিছুটা প্রসন্ন হলো। তাঁর 'এনকোয়ারীর' দ্বিতীয় সংস্করণ রাজা তৃতীয় জর্জের নামে উৎসর্গ করবার অনুমতি পেলেন। আর্ল অফ বার্কলী তাঁকে তাঁর নিজ গ্রামে সম্বর্ধনা জানাবার ও চাঁদা তুলে একটা উপহার দেবার বন্দোবস্ত করলেন। জেনারের পছন্দমত তাঁকে একটি সোনার ঝাঁপি উপহার দেওয়া হলো। সেই ঝাঁপিতে খোদাই করা ছিল—একটি গরু চাঁদের উপর লাফিয়ে যাচ্ছে।

যাহোক, জেনারের প্রচেষ্টা এভাবে কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও সম্পূর্ণ সাফল্য তখনও আসে নি। তাঁর আবিষ্কার নিয়ে দেশে-বিদেশে বিরাট চাঞ্চল্য দেখা দিল। অনেকে তাঁর পদ্ধতির প্রশংসা করলেন বটে, কিন্তু অনেকে আবার প্রতিবাদও করলেন—তবে প্রতিবাদীর সংখ্যাই দাঁড়ালো বেশী। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জেনার বিব্রত হয়ে ওঠলেন—এমন কি, তাঁর গো-বসন্তের টিকা দেবার পরিণতি সম্পর্কে নানা আজগুবি সংবাদও প্রচারিত হতে লাগলো। একজন মহিলা এমনও গুজব ছড়ালো যে—টিকা দেবার পর থেকেই তার মেয়ে গরুর মত কাশছে, সারা গায়ে তার গরুর মত লোম গজিয়েছে। আর একজন সগর্বে প্রচার করলো—তাদের দেশে টিকা নেওয়া

একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে—কেন না, টিকা যারা নিয়েছে, তাদের স্বভাবও ঠিক ষাঁড়ের মত হয়েছে। কিন্তু জেনার এই সব বিরূপ প্রচার ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও নিরুৎসাহিত হন নি। 'এনকোয়ারী' প্রকাশের পর আরও দুটি পুস্তক প্রকাশ করে তিনি বিরুদ্ধবাদীদের জবাব দেন এবং তাঁর আবিষ্কারের যাথার্থ্য প্রমাণ করেন।

শেষ পর্যন্ত জেনারের টিকা সর্বত্রই সমাদৃত হতে লাগলো এবং তাঁর খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই সাফল্য অর্জন করতে জেনারকে কুড়ি বছরেরও বেশী প্রাণান্ত পরিশ্রমে কাজ চালাতে হয়েছিল।

অবশ্য, জেনারের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারে তাঁর আর্থিক সমস্যার কোন সমাধান হলো না, অধিকন্তু টিকা দিবার পদ্ধতি প্রচলন করতে গিয়ে তাঁর ডাক্তারী ব্যবসায়ে প্রভূত ক্ষতি হবার ফলে তিনি নিদারুণ অর্থসঙ্কটে পড়লেন। এই আর্থিক সঙ্কটকালে বন্ধুদের চেষ্টায় বৃটিশ পার্লামেন্ট জেনারকে দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু এই ব্যাপারেও বিপত্তি দেখা দিল। বেঞ্জামিন জেসটি নামে এক ধনী কৃষক গো-বসন্তের টিকা প্রথম আবিষ্কার করেছেন বলে দাবী করে বসলেন এবং পুরস্কারের টাকা তারই প্রাপ্য বলে আর্জি পেশ করলেন।

জেনার ফিপ্‌সকে টিকা দেবার বাইশ বছর আগে এই বেঞ্জামিন জেসটি যখন এক বড় ডায়রী ফার্মের মালিক ছিলেন, তখন মোজা সেলাইয়ের সূচ দিয়ে একদিন তিনি তাঁর গোশালা থেকে গো-বসন্তের বীজ সংগ্রহ করে তাঁর দুটি বাচ্চাকে টিকা দেন। পরে তিনি ও তাঁর পত্নী এই টিকা নেন। কিছুদিন পরে তিনি তাঁর বাচ্চা দুটিকে আসল বসন্তের বীজের টিকা দিয়ে যখন দেখলেন যে, তাদের দেহে বসন্তের গুটি উঠলো না, তখন তিনি তাঁর গয়লানীদেরও গো-বসন্তের বীজ দিয়ে টিকা দেন।

এই ঘটনার পঁচিশ বছর পরে যখন জেনারকে টিকা আবিষ্কারের জন্যে দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করা হলো, তখন জেসটি গো-বসন্তের টিকার সর্বপ্রথম আবিষ্কারক বলে দাবী করে বসবেন বৈ কি। যাহোক জেসটির এই দাবী কিছুটা টিকলো এবং শেষ পর্যন্ত জেনারিয়ান সোসাইটি জেসটিকে গো-বসন্তের প্রথম টিকাদার বলে স্বীকার করলেন ও তাঁর সাহসের প্রশংসা করে তাঁকে একটি সোনার ছুরি উপহার দিলেন। এছাড়া আর্থিক কোন পুরস্কার জেসটি পেলেন না। বেঞ্জামিন জেসটি শুধু নিজের পরিবারকে বসন্ত রোগ থেকে রক্ষা করেছিলেন—কিন্তু জেনার সুদীর্ঘকাল কাজ করে এর কার্যকারিতা প্রমাণ করেন এবং দেশ-বিদেশে এই প্রথা চালু করবার জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা চালান। জেনারের বিশেষ কৃতিত্ব হলো এইখানেই যে, একটি পরিবার মাত্র নয়—সমগ্র মানবজাতিকে বসন্ত রোগ থেকে তিনি রক্ষা করেছেন।

জেনার যদিও পার্লামেন্ট থেকে দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পেলেন, তবু তাঁর অর্থকষ্ট ঘুচলো না। ডাক্তারীতে পুনরায় মনোযোগ দিয়েও সুবিধা কিছু করতে পারলেন না—এমন কি, টিকা দিতেও লোকে তাঁর কাছে আসতো না। অন্য ডাক্তার দিয়ে কম খরচায় তারা টিকা নিত। পুরনো রোগীরা বলতো—এই সামান্য কাজের জন্যে অত বড় ডাক্তারকে আর কষ্ট দেওয়া কেন। দশ বছর চেষ্টা করেও যখন কোন সুবিধা হলো না, তখন তিনি ডাক্তারী ছেড়ে দিলেন।

যাহোক, আর্থিক বিড়ম্বনায় তাঁকে আর বেশী দিন বিব্রত হতে হলো না, পার্লামেন্ট তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আবার কুড়ি হাজার পাউণ্ড সাহায্য মঞ্জুর করলেন এবং ১৮০৩ সালে রয়াল জেনারিয়ান ইনষ্টিটিউশন যখন ন্যাশন্যাল ভ্যাক্সিন এষ্টাব্লিশমেন্টে পরিণত হলো, তখন তিনি তার প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন।

বিদেশ থেকেও জেনার প্রচুর সম্মান লাভ করেছিলেন। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একটি চিঠি ও সেই সঙ্গে একটি হীরার আংটি উপহার পাঠান। জেনার তাঁর টিকা-বীজের নাম দিয়েছিলেন 'ভ্যাক্সিন'—তাই রাশিয়ায় যে শিশুটিকে সর্বপ্রথম প্রাথমিক টিকা দেওয়া হয়, তার নাম রাখা হয়েছিল ভ্যাক্সিনফ। ১৮০৩ সালে স্পেনের অধিকৃত দেশসমূহে টিকা দেবার জন্যে বিশেষ একটি নৌবাহিনী পাঠানো হয়। ইউরোপের সমস্ত সুধী জন সঙ্ঘ তাঁকে সম্মানিত সভ্য নির্বাচিত করেন। মেরাভিয়ার ব্রুনে একটি মন্দির জেনারের নামে উৎসর্গ করা হয়—এমন কি, আমেরিকার একদল রেড ইণ্ডিয়ান জেনারের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ একটি কোমরবন্ধ ও কড়ির মালা উপহার পাঠায়। প্রুসিয়ায় প্রথম টিকা দেবার দিনটি বহুদিন যাবৎ জাতীয় উৎসবের দিন হিসাবে পালিত হতো। জার্মেনীতে জেনারের জন্মদিনটি ছিল অনেক দিন পর্যন্ত একটি জাতীয় আনন্দের দিন। নেপোলিয়ন জেনারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি নিজে টিকা নেন এবং সমস্ত সেনাবাহিনীকে টিকা নেবার হুকুম দেন। নেপোলিয়ন যখন ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, তখন দু-জন ইংরেজ বন্দীকে তিনি শুধু জেনারের অনুরোধক্রমেই মুক্তি দিয়েছিলেন। জেনারের চিঠি পড়ে নেপোলিয়ন সম্রাজ্ঞী জোসেফিনকে আবেগভরে বলেছিলেন—'জানো জোসেফিন, এই লোকটির কোন আবেদনকেই আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।" স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযানে অভিযুক্ত একজন ক্যানাডিয়ান বন্দীকে স্পেনের সম্রাট শুধু জেনারের অনুরোধেই মুক্তি দেন।

কিন্তু বিদেশে প্রভূত সম্মান লাভ করলেও জেনার নিজের দেশ ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন অনেক পরে। অবশ্য বৃটিশ পার্লামেন্ট জেনারের আবিষ্কারের জন্যে সর্বমোট ৩০ হাজার পাউণ্ড মঞ্জুর করেছিলেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারেরী ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, কিন্তু রয়েল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান জেনারকে এই সমিতির সদস্যভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। জেনারের অপরাধ, তিনি ল্যাটিন জানতেন না—অতএব ল্যাটিনে পরীক্ষা দিয়ে তাঁকে পাশ করতে হবে। জেনার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—"পরীক্ষা দেব? না, কিছুতেই নয়—এমন কি, রাজ মুকুটের বিনিময়েও নয়।"

বিদেশে যিনি প্রভূত সম্মানে সম্মানিত হলেন—বিদেশের গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা, সুধীসমাজ যেখানে তাঁকে অসীম শ্রদ্ধা জানালেন, সেখানে লণ্ডনের রয়েল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান জেনারকে সম্মান না দেখানোয় তাঁর এমন কিছু ক্ষতি হয় নি—বরং তাঁরা উগ্র সংরক্ষণশীল নিয়মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে নিজেদের গৌরবকেই ক্ষুণ্ণ করেছিলেন।

জেনার একদিকে যেমন দৃঢ়চিত্ত ছিলেন, তেমনি দুস্থ মানুষের জন্যে তাঁর মমতার অন্ত ছিল না। বালক ফিপ্‌স্, যার উপর তিনি সর্বপ্রথম গো-বসন্তের টিকার পরীক্ষা চালান, তাঁকে তিনি আজীবন লালন-পালন করেন। তার থাকবার জন্যে একটি সুন্দর কুটির নির্মাণ করেন এবং সেই কুটির সংলগ্ন বাগানে নিজ হাতে গোলাপ গাছ রোপণ করেন।

জেনারের শেষ জীবন খুবই দুঃখে, শোকে কাটে। ১৮১০ সালে তাঁর বড় ছেলে এবং এর পাঁচ বছর পরে তাঁর স্ত্রী যক্ষ্মারোগে মারা যান। মৃত্যুর আগের দিন সকাল বেলায় জেনার তাঁর গ্রন্থাগারের মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান এবং পরের দিন, ১৮২৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী তিনি দেহত্যাগ করেন।

জেনার যদিও বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করতে

সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁর এই আবিষ্কারের পথ ধরে যদিও ডিপথিরিয়া, জলাতঙ্ক, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধক ভ্যাক্সিন আবিষ্কৃত হয়—কিন্তু বসন্ত রোগ কেন হয়, তখন জেনার কেন, কারোরই জানা ছিল না। জেনার যতদিন বেঁচে ছিলেন তখন জীবাণু আবিষ্কৃত হয় নি। জীবাণু কি, অনেক রোগের কারণ যে জীবাণু, জীবাণু কি করে জীবদেহে প্রবেশ করে, তা জানা যায় জেনারের মৃত্যুর অনেক পরে।

জেনারের সময়ে টিকার বীজ এক জনের বাহু থেকে অন্য জনের বাহুতে লাগানো হতো এই বীজে অনেক সময় অন্য রোগের জীবাণু মিশে থাকতো, ফলে একজনের দেহ থেকে অন্য জনের দেহে সেই জীবাণু সংক্রামিত হতে পারতো। কিন্তু এখন তা আর হয় না। টিকার বীজ আজকাল বাছুরের দেহ থেকে নেওয়া হয় এবং পর পর কয়েকটি বাছুরের দেহে সংক্রামিত করে এর উগ্রতা কমানো হয়। জীবাণুশূন্য পরিবেশে এবং জীবাণুহীন পদ্ধতিতে এই বীজ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে আমরা যে দুধ খাই, এই বীজ তার চেয়েও শতগুণে নির্মল ও অন্যান্য জীবাণু-শূন্য।

জেনারের মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে, অনেক রোগের প্রতিরোধক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু জেনারের আবিষ্কৃত গো-বসন্তের টিকা বসন্ত রোগের একমাত্র সুষ্ঠু প্রতিরোধক হিসাবে আজও পরিগণিত। জেনারের আবিষ্কৃত এই টিকা নেওয়া বাধ্যতা-মূলক করে অনেক সভ্যদেশ বসন্ত রোগকে নির্মূল করেছে। আমাদের দেশেও প্রাথমিক টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক, টিকা না নিলে আদালতে দণ্ডিত হবার কথা। বিনামূল্যে টিকা দেবার বন্দোবস্ত বৃটিশ আমল থেকেই সরকার করে আসছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা নিজেদের স্বাধীন দেশের নাগরিক ও সভ্য বলে জাহির করি, গর্ব বোধ করি অথচ স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক প্রতিষ্ঠিত বিধি পালন করবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করি। বসন্ত রোগের সুষ্ঠু প্রতিষেধক থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে প্রতি বছর এই রোগ হয়—এমন কি, এখনও মহামারী পর্যন্ত হয়ে থাকে।

সঞ্চয়ন

পৃথিবীর বয়স

এই সম্বন্ধে এ. তুগারিনভ লিখেছেন—আমাদের পৃথিবীর বয়স জানবার প্রয়োজনটা আজ আর নেহাৎ কৌতূহল চরিতার্থ করবার ব্যাপার নয়। বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস যদি অজানা থেকে যেত, তাহলে যে ভূতত্ত্ববিদ্যা মানুষের সামনে পৃথিবীর খনিজসম্পদ উদ্ঘাটন করছে, তার অগ্রগতি অসম্ভব হতো।

দুটি শিলার কোন্‌টি বেশী প্রাচীন, এই প্রশ্নের জবাব সাধারণ ভূতাত্ত্বিক পন্থায় সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের সাহায্যে দেওয়া যায়। যেমন ধরুন, ভূতত্ত্ববিদেরা ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরের কাল নির্ণয় এবং একটি স্তরের সঙ্গে অন্য একটি স্তরের পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারেন। যে কোন দুটি শিলার মধ্যে কোন্‌টি নবীন, তাও তিনি বলে দিতে পারেন। কিন্তু তাদের সঠিক বয়স গতানুগতিক পন্থায় নির্ধারণ করা যায় না।

এক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যা ভূতত্ত্বকে সহায়তা করে। ১৯০২ সালে পিয়ের কুরী বলেছিলেন যে, বাইরের অবস্থা যেমনই হোক না কেন, তেজস্ক্রিয় ক্ষয় একই হারে হয়। কাজেই এই প্রক্রিয়া ভূতাত্ত্বিক সময়ের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। পৃথিবী গড়ে ওঠবার অনেক আগে যখন রাসায়নিক মৌলগুলি গঠিত হচ্ছিল, তখনই তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সুরু হয়েছিল বলে মনে হয়। আজও এই ক্ষয়ের প্রক্রিয়া চলছে; অর্থাৎ পৃথিবীতে অবিরাম অণুসমূহের ক্রমবিকাশ ঘটছে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলি লয় পাচ্ছে এবং তাদের ক্ষয়ের ফলে উদ্ভূত সুস্থির মৌলগুলি সঞ্চিত হচ্ছে।

যদি বিশেষ কোন খনিজ পদার্থে তেজস্ক্রিয় মৌল থাকে, তাহলে যথাসময়ে তার কতকাংশের ক্ষয়প্রাপ্তির ফলে উদ্ভূত পদার্থ সেই অংশের স্থান গ্রহণ করবে। ঐ খনিজ পদার্থের বয়স নির্ধারণ করতে হলে আমাদের তখনও ঐ খনিজের মধ্যে যতটা গোড়ার দিকের তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি বর্তমান, তা এবং তার ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থের পরিমাণ স্থির করতে হবে।

এই শতাব্দীর প্রারম্ভে পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসকে পর পর দশটি যুগে ভাগ করা হতো। প্রত্যেকটি যুগে ছিল বিশেষ বিশেষ ধরণের উদ্ভিদাদি ও প্রাণীসমূহ। কিন্তু এই যুগগুলির স্থায়িত্বকাল নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ এ. হোম্‌স্‌ পৃথিবীর জীবনের বিগত ষাট কোটি বছরের প্রথম ভূ-কালানুক্রমিক পরিমাণ নির্ধারণ করেন। এই সময় বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক স্তরের কয়েকটি খনিজের সঠিক বয়সের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন হিসাব পাওয়া যায়। হোম্‌স্‌ ঐ সকল তথ্য তাঁর পরিমাপের ভিত্তি স্বরূপ ব্যবহার করেন। পরে বিপুল অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা এই পরিমাপকে সুসংস্কৃত করা হয়।

সোভিয়েট ভূতত্ত্ববিদ ও ভূ-কালানুক্রমবিদ্‌ বি. কেল্লার, এন. পেলেতায়া, জি. কাঝাকভ, আই. ক্রিশভ আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, এই পৃথিবীতে নীল-সবুজ শ্যাওলার প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে ১১০ কোটি বছর আগে। এই শ্যাওলার জীবাশ্ম অনুশীলন করে বিশ্বের আদিম অবয়বীয় জটিল ক্রমবিকাশের কাহিনী মানুষ জানতে পেরেছে। এই ক্রমবিকাশ সম্পর্কে গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের অর্থাৎ প্রায় ১০০ কোটি

বছরের অন্তর্বর্তী কালকে বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করতে পেরেছেন। এই যুগগুলির বয়স পরে স্থির করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা পটাসিয়াম-আর্গন পদ্ধতির সাহায্যে এই বয়স স্থির করেছেন। তাঁরা পটাসিয়াম ও তার ক্ষয়প্রাপ্ত আর্গনে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ হিসেব করেছেন বিভিন্ন যুগের পাললিক প্রস্তরের অভ্রাংশ থেকে। এই ভাবে প্রত্যেক যুগের অভ্রের বয়স এবং নীল-সবুজ শ্যাওলার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর স্থির করা হয়েছে।

এমন কি, আমাদের গ্রহের আরও পূর্বেকার ইতিহাসেরও অংশবিশেষ উন্মোচন করেছেন এ. ভিনোগ্রাদভ, এন. সেমেনেঙ্কো. এ. পোলকানোভ এবং অধ্যাপক ই. গেরলিং। মধ্য ইউক্রেইনের কোলা উপদ্বীপে ভিভিম ও ওলেকমা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে কতকগুলি প্রস্তর আবিষ্কৃত হয়েছে, যার বয়স ৩০০ কোটি বছরেরও বেশী। অন্যান্য দেশের ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীন প্রস্তরগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সমস্ত বিরাট ভূতাত্ত্বিক ঘটনাবলী সমস্ত মহাদেশে একই সঙ্গে ঘটেছে।

ভূ-কালানুক্রমিক অনুসন্ধানের ফলে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটেছে, তা হলো বিশ্বের লৌহ ভাণ্ডারের ৭০ শতাংশই খনিজ লোহার আকারে রয়েছে। এই খনিজ লোহা ও বিরাট ইউরেনিয়াম স্তর ২০০ বা ২৫০ কোটি বছর আগে মহাদেশগুলির বিভিন্ন স্থানে একই সঙ্গে জমেছে। এই খনিজ পদার্থগুলি আবিষ্কারের জন্যে প্রস্তর, বিশেষ করে প্রাক-ক্যাম্বিয়ান যুগের প্রস্তরের হিসাব করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরও বেশী প্রাচীন প্রস্তর আবিষ্কার বহুদিন ধরে সম্ভব হয় নি। পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস ৪০০ কোটি বছরের আগে আর অনুসরণ করা যায় নি। মাত্র কয়েক বছর আগে ই. গেরলিং কোলা উপদ্বীপের মোল্ডি-তুন্দ্রা অঞ্চলে কিছু খনিজ গঠনের সন্ধান পেয়েছেন, যার বয়স হবে ১০০০ কোটি বছর। ভূগর্ভের বহু নিম্নতল থেকে প্রাচীন প্রস্তরের সঙ্গে সেগুলি পাওয়া গেছে। এই আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বহু বিজ্ঞানীই অবশ্য বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীর বয়স ৫০০ কোটি বছরের বেশী নয়। ই. গেরলিং-এর আবিষ্কার তার বিপরীত কথা বলে: পূর্বে যা ভাবা গিয়েছিল, পৃথিবীর বয়স অন্ততঃপক্ষে তার দ্বিগুণ।

এই বিষয়গুলি নিয়ে খুব সাবধানতার সঙ্গে গবেষণা করা হচ্ছে। পটাসিয়াম-আর্গন পদ্ধতিতে তা করা হচ্ছে। এটাও সম্ভব যে, পটাসিয়াম ছাড়াও অন্য কোন তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকেও এই সমস্ত প্রস্তরে আর্গন জমা হতে পারে।

পৃথিবীর অতল থেকে উত্থিত এই প্রস্তরগুলি থেকে বহু বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, পৃথিবীর ত্বকের বয়স ৪৫০ থেকে ৫০০ কোটি বছর, কিন্তু ভূগর্ভের বয়স আরও বেশী। অর্থাৎ অন্য কথায় বলতে হয়, আমাদের পৃথিবী হঠাৎ তৈরি হয় নি।

এটাও আশা করা যায় যে, পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির সাহায্যে পৃথিবীর অস্তিত্বের জটিল ইতিহাসের গবেষণা সম্ভব হবে।

কাচের ভবিষ্যৎ

আর. ডব্লু. ডগলাস এই সম্বন্ধে লিখেছেন—সাধারণের কাছে কাচ একটি স্বচ্ছ, কঠিন ও ভঙ্গুর পদার্থ, যা হীরা বা ইস্পাত ছাড়া আর কিছু দিয়ে কাটা যায় না এবং আবহাওয়াও যার কোন ক্ষতি করতে পারে না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কাচ একটি তরল পদার্থ বা দ্রব পদার্থ, যার কেলাসন (স্ফটিকায়ন) হয় না। অতি শীতল করবার পর কাচ কঠিন পদার্থের গুণ পায়।

এই স্বচ্ছ পদার্থটিকে আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই জানলার শার্সি, বোতল ও অন্যান্য পাত্রের আকারে। কাচের এই আকার দেওয়া হয় ১,৪০০° সেঃ তাপমাত্রায়। এই তাপমাত্রায় কাচ সিরাপের মত তরল ও আঠালো হয়ে যায়। তাপ যত কমতে থাকে, কাচের আঠালো ভাব তত হ্রাস পায়। এই সুযোগ নিয়ে কাচের ইচ্ছামত আকার দেওয়া হয়। ব্লোইং পাইপের সাহায্যে তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, ঘুরিয়ে নানা আকার দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির শেষের দিকে কাচ এত আঠালো হয়ে ওঠে যে, তা স্থায়ী আকার ধারণ করে। বর্তমানে সমতল কাচ, বোতল, জ্যাম জার, টিউব, বাল্ব ইত্যাদি সকল রকম কাচই মেসিনের সাহায্যে তৈরি হয়।

আধুনিক বোতল তৈরির কারখানায় কাচ তৈরির উপাদানগুলি—প্রধানতঃ বালি, চুন ও সোডা অ্যাশ প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক অনুপাতে মিশ্রিত হয়ে ফারনেসে গিয়ে পড়ে। সেখানে উপাদানগুলি তরল কাচে পরিণত হয় এবং সেখান থেকে তরল কাচ নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে বোতল তৈরির মেসিনে গিয়ে পড়ে। মেসিনটি তরল কাচকে বোতলের আকার দেয়। কাচের চাদর তৈরি করতে হলে আরও বড় ফারনেসের দরকার হয়—কমপক্ষে ২,০০০ টন মাল ধরে এমন হওয়া চাই। কাচ তৈরির পদ্ধতি অবশ্য একই এবং ফারনেস থেকে গলিত কাচ অবিচ্ছিন্ন ভাবেই বের হয়ে আসে।

কাচশিল্পের এই উন্নতি গত ৫০ বছরের ব্যাপার। এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে বড় ধরণের ট্যাঙ্ক ফারনেস আবিষ্কারের ফলে। এই ট্যাঙ্ক অনেকটা ইস্পাত তৈরির সিমেন্স-উদ্ভাবিত ওপনহার্থ ফারনেসের মতই। বৈদ্যুতিক ফারনেস যাতে কাচের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করা হয়ে থাকে, তাও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বোতল ও জানালার কাচ যদিও সস্তা এক মিশ্রণ থেকে তৈরি করা হয় তবু তা মোটামুটি স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য এবং স্থায়ী। গত ৫০ বছরে এই মিশ্রণের খুব অল্পই পরিবর্তন করা হয়েছে কিন্তু যেটুকু পরিবর্তন করা হয়েছে, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখনকার ফারনেসগুলি অধিক তাপ সহ্য করতে সক্ষম হওয়ায় মিশ্রণে সোডা অ্যাশের পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছে এবং চুন ও বালির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর সঙ্গে সামান্য অ্যালুমিনা যোগ করায় কাচ আরও বেশী ঘাতসহ হয়েছে।

কাচের আরও অনেক রকমের উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে। মার্কারি ল্যাম্প যে কাচে তৈরি, তাতে সোডা অ্যাশ দেওয়া হয় না। টিউব লাইটে (Sodium vapour resistant glass) সিলিকা বা বালি ব্যবহার করা হয় না, বোরিক অক্সাইড দেওয়া হয়।

কাচের চাদর তৈরির ব্যাপারে সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বৃটেনে উদ্ভাবিত ফ্লোট প্রোসেস (Float process) পৃথিবীর সর্বত্র পুরনো পদ্ধতিকে বাতিল করে দিয়েছে। ফ্লোট প্রোসেস আবিষ্কার করতে শুধু গবেষণার জন্যেই ব্যয় হয়েছে ৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১ লক্ষ টন কাচ পরীক্ষার কাজে নষ্ট হয়েছে।

কাচের শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি করা যায়, এই তথ্য আমাদের জানা আছে, কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই জ্ঞানকে কাজে লাগানো আজও সম্ভব হয় নি। সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করলে ৫০০,০০০ পাউণ্ড/ইঞ্চি শক্তিবিশিষ্ট (সাধারণ ষ্টীলের শক্তি ৮০,০০০ পাউণ্ড/ইঞ্চি) কাচ পাওয়া যেতে পারে।

বর্তমানে গবেষণাগারগুলিতে কাচের শক্তি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। কাচ থেকে উদ্ভূত অন্যান্য দ্রব্য সম্পর্কে অধিকতর মনযোগ দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার আবিষ্কারগুলি কাচের উপর

প্রয়োগ করে দেখা হচ্ছে। যেমন, কাচের রং সম্পর্কিত বিষয়টি 'আয়ন'-এর শক্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করা চলছে এবং সংযোগ তারের উপযোগী স্বচ্ছ কাচ তৈরি করা যায় কিনা, তা নিয়ে পরীক্ষা চলছে। অন্যদিকে কাচের উপর জলের প্রতিক্রিয়া এবং বিশেষ কাচের উপরিভাগ নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে—কেন না, কাচের শক্তির অনেকখানিই নির্ভর করে তার উপরিভাগের উপর।

এক কথায় কাচশিল্পের উন্নয়নে পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র হাত মিলিয়েছে এবং বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক পদ্ধতি ও আবিষ্কারগুলি কাচের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে।

লিউকেমিয়া কি নিরাময় করা যাবে ?

উইলিয়াম মোইসেয়েভিচ বের্গোলৎস্ এই সম্বন্ধে লিখেছেন—সবাই জানেন লিউকেমিয়া, লিউকোমাইটোসিস বা যাকে বলা হয় ক্ষতিকর রক্তশূন্যতা, এক গুরুতর ব্যাধি—এখনও পর্যন্ত নিরাময় করা যায় না। প্রায়ই শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত হয়। যক্ষ্মা, শিশু-পক্ষাঘাত ও অন্যান্য বহু রোগ বিজ্ঞানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, কিন্তু তাদের পর্যায়ে এখনও লিউকেমিয়াকে ফেলা যায় না। যাহোক, আমরা বলতে পারি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই রোগের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ চালানো হচ্ছে, তা যথেষ্ট তীব্রতর হয়েছে।

ইঁদুরের লিউকেমিয়া ও মানুষের লিউকেমিয়ার মধ্যে অনেক দিক দিয়ে সাদৃশ্য আছে। ব্যাধির জন্ম ও বিকাশের কারণ নির্ণয়, প্রতিষেধক ও চিকিৎসার ব্যাপারে এর বিরাট গুরুত্ব আছে। ইঁদুরের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয়, এদের টিউমারও যথেষ্ট দ্রুত বেড়ে যায়; সে জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলও বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই পাওয়া যায়।

পশু থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে ম্যালিগ্-ন্যান্ট নিওপ্লাজমের বিরুদ্ধে লড়বার পদ্ধতিসমূহ গড়ে তোলা যাবে। টিউমারসমূহের ভাইরাস-ঘটিত চরিত্র অনুশীলনের দিকে এখন বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। মানুষের ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা করবার সময় পশুর ক্যান্সারের ভাইরাসসমূহের কার্যকলাপ অনুশীলনের ফলে এই বিষয়ে নতুন পন্থার সন্ধান মিলতে পারে।

পৃথিবী জুড়ে ক্যান্সার-বিজ্ঞানীরা লিউ-কেমিয়াকে গবেষণার অন্যতম প্রধান বিষয় করছেন। সে জন্যেই সব রকমের ক্যান্সারের মধ্যে ভাইরাস-ঘটিত লিউকেমিয়া নিয়েই সবচেয়ে বেশী গবেষণা হচ্ছে।

ইঁদুরের লিউকোসিসের পনেরোটিরও বেশী বিভিন্ন ভাইরাসের কথা জানা আছে। এর কতকগুলির উৎপত্তির বিষয় নির্দেশ করেছেন সোভিয়েট বিজ্ঞানী এম. পি. মাজুরেঙ্কো, ওয়াই. এল, ব্রিগোঝিনা, এল. এ. জিল্‌বার, জেড. এ. পোস্তনিকোভা। লেবরেটরীতে এক নতুন জাতের ভাইরাসঘটিত লিউকোসিস বের করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, মানুষের লিউকেমিয়াগ্রস্ত টিস্যুর নিষ্কাশিত বস্তুর দ্বারাই প্রথমে ইঁদুরের নিওপ্লাজম ঘটানো হয়েছিল।

ভাইরাস থেকেই যদি লিউকেমিয়া হয়, তাহলে এর প্রতিষেধক টিকাও সম্ভবতঃ তৈরি করা যাবে ?

একথা বললে খুব বেশী বলা হবে না যে, লিউকোসিসের বিরুদ্ধে টিকার সমস্যাটি মূলনীতির দিক থেকে ১৯৫৮-১৯৫৯ সালে সমাধান হয়েছিল পশুর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে। তারও আগে জানা ছিল যে, সুনির্দিষ্ট অ্যান্টি-সিরাম দিয়ে ইঁদুরের লিউকেমিয়ার ভাইরাসকে

নিষ্ক্রিয় করা যায়। রোগের চিকিৎসার পক্ষে এটি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শুধুমাত্র টিকার সাহায্যেই লিউকেমিয়া নিবারণ করা যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো, বিজ্ঞানীরা মানুষের লিউকেমিয়ার ভাইরাস নির্ধারণ করতে না পারলে প্রয়োজনীয় টিকা কি তৈরি করা যাবে?

অসুবিধা হলো দ্রুত পরীক্ষা, টেষ্ট টিউব প্রতিক্রিয়া বা অন্য পদ্ধতিতে এখনও নির্ভরযোগ্য ভাবে লিউকেমিয়ার ভাইরাস নির্ণয় করা যায় না। শুধুমাত্র পশুদের সংক্রমণ ও তাদের মধ্যে নিওপ্লাজমের বংশবৃদ্ধিই (এতে কয়েক মাস লাগে) লিওকোমোজেনিক ভাইরাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত করতে পারে এবং তাহলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, পশুদেহের সুপ্ত ভাইরাস থেকে ব্যাধি দেখা দিয়েছে।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে আমরা রোগীর দেহে পশুদেহের জ্ঞাত ভাইরাসের মত ভাইরাসের কণা আবিষ্কার করতে পারি। তবে একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, সেগুলিই লিউকেমিয়ার কারণ।

প্রতিকারের পথ কি? আমার মনে হয়, যদি আমরা রোগীর দেহ থেকে ভাইরাস-কণিকা বিচ্ছিন্ন করে সেগুলিকে দীর্ঘকাল ধরে কালচার মিডিয়ামে রেখে, মূল কণা ও রোগীর রক্তদ্রবে প্রাপ্ত অ্যান্টিবডিগুলির পরবর্তী তৎপরতা নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে পশুর মধ্যে (বানরের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হয়) লিউকেমিয়ার প্রকোপ ঘটাতে সক্ষম হই, তাহলে এটা ধরে নেওয়া সম্ভব হবে যে, মানুষের লিউকেমিয়ার ভাইরাস বের করা গেছে।

এবার প্রশ্ন আসছে, মানুষের লিউকেমিয়ার ভাইরাসের অস্তিত্বের প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত টিকা তৈরি সম্পর্কে কাজ করা কি সম্ভব?

আমাদের মনে হয় তা করা সম্ভব। অবশ্য এর জন্যে যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন। শিশুপক্ষাঘাত প্রতিষেধক টিকা উৎপাদন থেকে দেখা যায়, এই বিরাট সমস্যা সমধানে সক্ষম কর্মীদল আমাদের আছে।

ধরে নিতে হবে যে, টিকা (যদি বের করা যায়) ক্ষতিকর নয়। এই ব্যাপারে একবার স্থিরপ্রত্যয় হলে বিজ্ঞানীরা ব্যাপক আকারে মানুষের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন, যার ফলে দশ বা কুড়ি বছর বাদে প্রাথমিক ফলাফলগুলি থেকে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যাবে। যদি দেখা যায়, যাদের টিকা দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে লিউ-কেমিয়া অনেক বিরল হয়ে গেছে তার অর্থ দাঁড়াবে এই টিকা ফলপ্রদ। তখন এমন সময় আসবে যখন লিউকেমিয়া নির্মূল হয়ে যাবে। যেমন—নির্মূল হচ্ছে শিশু-পক্ষাঘাত।

অবশ্য বহুলোক জন্ম থেকে লিউকেমিয়ার ভাইরাস বহন করতে পারে। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদিতে দেখা যায় এরূপ ঘটনা সবসময়েই যে টিকার ফল ব্যাহত করে তা নয়।

এইসব যদিও আশাপূর্ণ গবেষণার হিসাব, কিন্তু এথেকেও বহু প্রশ্নের জবাব মেলে না। বাঞ্ছিত টিকা আবিষ্কারের আগে যাদের লিউকেমিয়া হতে পারে তাদের নিরাময় করে তোলবার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি নি।

যে সব গবেষকে কাছে লিউকেমিয়ার উৎপত্তি কম-বেশী পরিষ্কার ও টিকা আবিষ্কার অতিশয় জটিল বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কাজ হলেও করা সম্ভব, তাঁরা লিউকেমিয়ার চিকিৎসার উপর ক্রমেই বেশী করে মনোযোগ দিচ্ছেন। বর্তমানে যে রাসায়নিক ও বিকিরণ চিকিৎসা-পদ্ধতি রোগীদের আয়ু যথেষ্ট বাড়িয়ে দিচ্ছে, তার সঙ্গে ইমিউনোথেরাপিকে যোগ করতে হবে। যখন

সঠিক ও ঘনীভূত লিউকেমিক অ্যান্টিজেন ও তার ফলস্বরূপ অ্যান্টিবডি পাওয়া যাবে, তখন লিউ-কেমিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হবে লিউকেমিয়াধ্বংসী রক্তদ্রব।

অদৃশ্য রশ্মির বিবিধ ব্যবহার

আর্থার উডফিল্ড এই সম্বন্ধে লিখেছেন—কবে থেকে সূর্য পৃথিবীকে আলো ও তাপ দিয়ে আসছে, কেউ তা বলতে পারে না।

সূর্য থেকে আলো ও তাপ পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় রশ্মির আকারে। রশ্মিগুলির কিছু আমরা চোখে দেখতে পাই, কিছু পাই না; কিন্তু অনুভব করতে পারি। এরকম একটি রশ্মি হলো ইনফ্রারেড রে। এই রশ্মি চোখে দেখা যায় না।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ইনফ্রারেড রশ্মির বিবিধ ব্যবহার খুঁজে পেয়েছেন। জানা গেছে, এই রশ্মি মেঘের আবরণ ভেদ করতে সক্ষম। সে জন্যে মেঘ, কুয়াশা ভেদ করে যাতে ছবি তোলা যায়, এরূপ বিশেষ ধরণের ক্যামেরা ও ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ইনফ্রারেড রশ্মি তৈরি করতে সক্ষম।

আরও দেখা গেছে, এই রশ্মির তাপ দেবারও শক্তি আছে। ঘর গরম রাখা ও দ্রুত রন্ধন করবার কাজে এই রশ্মি ব্যবহার করা হচ্ছে। কম সময়ের মধ্যে রং শুকাবার কাজে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ইনফ্রারেড ল্যাম্প ব্যবহার সুরু করেছেন।

ক্রমশঃ এর আরও ব্যবহার দেখা চোর ধরতে একে ব্যবহার করা হচ্ছে। দরজা বা জানালার মধ্য দিয়ে এই রশ্মি ফেলা হয়। এমন কি, তারের একটি হাতেও যদি এই অদৃশ্য রশ্মি মুহূর্তের জন্যে পড়ে, তাহলে সঙ্কেত-ধ্বনি বেজে ওঠে। বিশেষ ধরণের আয়না ব্যবহার করে এই রশ্মির দরকার মত মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়।

এই রশ্মি তাপও টের পায়। সে জন্যে আগুনের বিপদ-বার্তা অনেক আগেই দিতে পারে।

ইনফ্রারেড রশ্মি নিয়ে বৃটেনে সব সময়েই কাজ হচ্ছে। রয়াল রেডার এষ্টাব্লিসমেন্ট এই কাজের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। মানবদেহে টিউমারের অবস্থান নির্ণয়ে এখানে হিট ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়।

পারমাণবিক শক্তি কর্তৃপক্ষ দেখিয়েছেন, ইনফ্রারেড রশ্মির বিকিরণের সাহায্যে মানব-দেহের বিভিন্ন অংশের উত্তাপের ছবি তোলা যায় এবং একটি বৃটিশ ইলেকট্রনিক্স ফার্ম এমন একটি ইনফ্রারেড পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যাতে স্পর্শ করিয়ে যে কোন বস্তুর তাপমাত্রা বলে দেওয়া যাবে।

নীল-সবুজ শৈবাল

প্রীতিসাধন বসু

উদ্ভিদ-জগতের সবচেয়ে নিম্নস্তরের বাসিন্দা হচ্ছে শৈবাল (Algae) এবং ছত্রাক (Fungi)। শৈবালের মধ্যে আবার নীল-সবুজ শৈবাল (Blue-green algae) সবচেয়ে নিম্নস্তরের। অন্যান্য শৈবালের চেয়ে ব্যাক্টিরিয়া বা জীবাণুর সঙ্গেই এদের সাদৃশ্য বেশী দেখা যায়। বর্তমান যুগে এদের অর্থনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের মত গরীব দেশে এই শৈবালের চাষ প্রবর্তিত হলে একদিকে যেমন খাদ্য-সমস্যা সমাধানের একটা ব্যবস্থা হবে, অন্যদিকে তেমনি কোটি কোটি টাকার ব্যয়রোধ করাও সম্ভব হবে।

নীল-সবুজ শৈবালের মধ্যে প্রায় দু-হাজার প্রজাতি আছে। ১৮৪৯ সালে ভারতে আসাম থেকে পাওয়া সর্বপ্রথম নীল-সবুজ শৈবালের কথা জানা যায়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ৭৫০টি প্রজাতি দেখতে পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ১১০টি প্রজাতি সর্বপ্রথম ভারতেই দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন নীল-সবুজ শৈবাল একটি মাত্র কোষে গঠিত, কাজেই খালি চোখে এগুলিকে দেখা যায় না। সাধারণতঃ এককোষী শৈবাল অনেকে একসঙ্গে একটা উপনিবেশ গড়ে তোলে। তবে এদের বেশীর ভাগই সূতার মত লম্বা হয়ে থাকে এবং সেগুলিকে খালি চোখে দেখা যায়। এরাও অনেকে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে। এদের শরীরের চারদিকে একটা পিচ্ছিল পদার্থের আবরণ থাকে। প্রত্যেক কোষেই থাকে একটা কোষ-প্রাচীর, তার ভিতরে সাইটো-প্লাজম আর রঞ্জক কণিকা। এদের সুগঠিত নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক থাকে না, তবে কোষের মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এদের নিউক্লিক অ্যাসিডের রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডক্টর বি. বি. বিশ্বাস। সূতার মত লম্বা প্রজাতির মধ্যে কয়েকটা কোষের পরে একটা করে বর্ণহীন কোষ দেখা যায়। এগুলিকে বলে Heterocyst। অবশ্য Oscillatoriaceae পরিবারে হেটারোসিষ্ট দেখা যায় না।

নীল-সবুজ শৈবালের বংশবিস্তারের পদ্ধতি অতি সরল। এককোষী শৈবালের কোষটি ভেঙ্গে দুটি হয়ে বড় হতে থাকে। আর সূতার মত লম্বা প্রজাতির ফিলামেণ্টটি ভেঙ্গে দু-খণ্ড হয়ে বড় হতে থাকে। এছাড়া কিছু প্রজাতির অবশ্য বংশবিস্তারের জন্যে স্পোর বা বীজরেণুর সৃষ্টি হয়।

কিছু কিছু নীল-সবুজ শৈবালের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। কিন্তু এরা যে নীল-সবুজ শৈবাল, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এদের মধ্যে কোন হেটারোসিষ্ট দেখা যায় নি, কেবল নলের মত বাইরের আবরণটা পাওয়া গেছে। ভারতেও এই ধরণের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। ডক্টর এস. নারায়ণরাও ১৯৪৪ সালে ত্রিচিনাপল্লী থেকে ১৫ কোটি বছরের পুরাতন Symploca jurassica-এর জীবাশ্মটি পান। এছাড়া তিনি ১৯৫৭ সালে পাঁচ কোটি বছরের পুরাতন Synechocystis-এর জীবাশ্ম পান। দক্ষিণ রেওয়া থেকে ডক্টর মেহেতা Aphanocapsa-এর যে জীবাশ্মটি পান, তার বয়স প্রায় ২৬ কোটি বছর। তবে এই সব জীবাশ্ম থেকে এদের ক্রমোন্নতির যে ইতিহাস রচনা করা হয়েছে, সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে।

আলোক-সংশ্লেষণকারী উদ্ভিদের মধ্যে ক্লোরোফিল, ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল নামক তিনটি রঞ্জক পদার্থ থাকে। নীল-সবুজ শৈবালের মধ্যে এছাড়াও ফাইকোসায়ানিন নামে একটি নীল এবং ফাইকোএরিথ্রিন নামে একটি লাল রঞ্জক পদার্থ থাকে। এই ছুটি রঞ্জক পদার্থ আছে, এমন শৈবাল বাহ্যতঃ অন্য রঙের হলেও তাদের নীল-সবুজ শৈবাল বলা হয়। নীল-সবুজ শৈবাল নানা রঙের হয়ে থাকে। ছুটি কারণে এরূপ হতে পারে। তাদের কোষের বাইরের আবরণটা রঙীন হতে পারে, আবার রংটা কোষের ভিতর থেকেও আসতে পারে। যেগুলি মাটিতে জন্মায়, সেগুলির রং সাধারণতঃ বাইরের আবরণের জন্মেই হয়। হল্‌দে, বাদামী, লাল্‌চে, ফিকে বেগুনী ইত্যাদি অনেক রকম রং দেখা যায়। এই রং অবশ্য সূর্যের আলো, জমির অম্লত্ব প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। অবশ্য বর্ণহীন শৈবালও অনেক আছে। এগুলি হ্রদের নীচে, মানুষের মুখের মধ্যে অথবা জীবজন্তুর পাকস্থলীতে জন্মায়।

নীল-সবুজ শৈবালের কেউ কেউ আবার এক এক রকম আলোতে এক এক রঙের হয়ে থাকে। Oscillatoria sancta লাল আলোতে সবুজ, সবুজ আলোতে লাল, নীল আলোতে হলদে রঙের হয়। নীল-সবুজ শৈবাল যে আলোই পাক না কেন, তাকেই তাদের আলোক-সংশ্লেষণের কাজে লাগাতে পারে। এরা যে সব রকম আবহাওয়াতেই বাঁচতে পারে, এটাও তার একটা কারণ। এরা পূর্ণ সূর্যালোক থেকে প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকারেও বাঁচতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ার জেনোলান গুহাগুলিতে চুনাপাথরের উপর যে শৈবাল জন্মায়, সেগুলি পর্যটকেরা যে আলো নিয়ে এই গুহা দেখতে আসেন, সেই আলোতেই বেঁচে থাকতে পারে। এরা এই আলো পায় সপ্তাহে মাত্র ছয় ঘণ্টা।

নীল-সবুজ শৈবাল জলে-স্থলে সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে অন্য কোন উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না, সেখানেও এগুলিকে জন্মাতে দেখা যায়। এদের নোনা ও মিঠা জল, গরম ও ঠাণ্ডা জলের ঝরণা, লবণ হ্রদ এবং ভিজা মাটিতেও দেখা যায়। কোথাও আবার এরা পরজীবী হয়ে অন্য গাছের উপরেও জন্মায়। এছাড়া কোথাও অন্য গাছের উপর মিথোজীবী হিসাবেও থাকে। কেউ কেউ স্থির জলে আবার কেউ কেউ স্রোত জলে জন্মায়।

সাধারণভাবে আমরা জানি যে, উদ্ভিদেরা নিশ্চল, কিন্তু জলজ এই নীল-সবুজ শৈবাল এর এক ব্যতিক্রম। সূত্রাকৃতি শৈবাল সামনে এবং পিছনে সাঁতার দিতে পারে—যদিও এর জন্যে এদের সিলিয়া বা ঐ ধরণের কোন অঙ্গ নেই। এককোষীরাও সাঁতার দিতে পারে, তবে এদের গতি অনেক শ্লথ। এই চলৎ-শক্তির কারণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। বর্তমানে বিশ্বাস করা হয় যে, রকেটের জেটের মত কায়দায় শরীর থেকে একটা পিচ্ছিল পদার্থ বের করে এরা চলাফেরা করে। অবশ্য এদের গতি ঘণ্টায় মাত্র ছুই সেন্টিমিটারের মত। চলাফেরা করবার সময় এরা আলোর দিকেই এগিয়ে যায় এবং আলোতে গতিও বৃদ্ধি পায়। তেমনি ৩০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের গতি বৃদ্ধি পায়।

নীল-সবুজ শৈবালের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, এরা খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডাতেও জন্মায়, যেখানে সাধারণতঃ অন্য কোন উদ্ভিদ জন্মায় না। মেরুপ্রদেশের পাহাড়ে এদের অনেককে জন্মাতে দেখা যায়, যেখানে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রী থেকে প্রায় ষাট ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত নেমে যায়। এরা গরমও সহ্য করতে পারে অনেক। অনেকে মনে করেন, এরা ৬০°-৬৫°, এমন কি ৮৫° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত গরম সহ্য করতে

পারে। ১৮৮৬ সালে ডক্টর কীর্তিকার ভারতে সর্বপ্রথম এই ধরণের যে শৈবাল দেখতে পান, তার নাম Conferva thermalis।

পৃথিবীতে যত নীল-সবুজ শৈবাল আছে, তাদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জন্মায় নোনা জলে। এদের লবণ সহ্য করবার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রে সাধারণতঃ লবণের পরিমাণ শতকরা তিন ভাগ। দক্ষিণ ফ্রান্স এবং ক্যালিফোর্ণিয়ার এদের দু-একটিকে (Revularia) নোনা জলে বাস করতে দেখা যায়, যেখানে লবণের পরিমাণ শতকরা ২৭ ভাগ। লবণ তৈরি করবার বাঁধানো চৌবাচ্চার নীচে এদের অনেকে একটা শৈবালের স্তরের সৃষ্টি করে। এককোষী Gomphosphaeria-এর মধ্যে এই ক্ষমতাটি সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। ভারতে মোট ৩৫ রকমের নীল-সবুজ শৈবাল পাওয়া যায়, যেগুলি নোনা জলে জন্মায়।

উদ্ভিদ-জগতের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে নীল-সবুজ শৈবালের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। বিভিন্ন প্রমাণ থেকে পৃথিবীর আদিম উদ্ভিদ যেমন ছিল বলে মনে হয়, তার সঙ্গে নীল-সবুজ শৈবালের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি ব্যাক্টিরিয়ার সঙ্গেও এই শৈবালের যথেষ্ট মিল আছে। অবশ্য এই দুই দলের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট আছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর বিভিন্ন রকমের পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হয়, নীল-সবুজ শৈবাল এবং ব্যাক্টিরিয়া একই "পূর্বপুরুষ" থেকে উদ্ভূত হয়েছে। মনে হয় এদের অমিলগুলি ক্রমোন্নতির পরের দিকে সৃষ্টি হয়েছে।

আগেই বলেছি, যেখানে কোন উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না, সেখানেও এদের জন্মাতে দেখা যায়। এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাটোয়ায়—১৮৮৩ সালে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যেখানে জীবনের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গিয়েছিল। তার বহুদিন পরে সেখানকার ছাই আর পাথরের উপর নীল-সবুজ শৈবালকেই প্রথম জন্মাতে দেখা যায়। এরা একটা পুরু আস্তরণের সৃষ্টি করে সেখানকার জমিকে অন্যান্য উদ্ভিদ জন্মাবার উপযোগী করে তোলে। এই শৈবালই পাথর থেকে আবার মাটি সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। দাবানলে ভস্মীভূত বনভূমিতেও এদের প্রথম জন্মাতে দেখা যায়।

অনেক সময় নীল-সবুজ শৈবাল অন্যান্য উদ্ভিদের সঙ্গে মিথোজীবী হিসাবে থাকে। লাইকেন হচ্ছে এমন একটি উদ্ভিদ, যেখানে এই শৈবাল কোন একটি ছত্রাকের সঙ্গে মিথোজীবী হিসাবে বাস করে। নীল-সবুজ শৈবালের মত লাইকেনও খোলা পাথর বা অন্যত্র জন্মাতে পারে, যেখানে অন্যান্য উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। অনেক সময় এগুলিকে অন্যান্য গাছ বা ব্যাক্টি-রিয়ার উপর পরজীবী হয়েও বাস করতে দেখা যায়। আবার এগুলি জীবজন্তুর শরীরেও বাস করে। এই শৈবাল সাধারণতঃ খাদ্যের সঙ্গে জীবজন্তুর পেটে চলে গিয়ে সেখানে হজম হয়ে যাওয়া থেকে এড়িয়ে যেতে পারে। পরে প্রয়োজন মত সংখ্যা বৃদ্ধি করে বসবাস করে।

নীল-সবুজ শৈবাল মানুষের কি উপকারে আসে, সে কথা বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় চাষের কাজে এদের উপকারিতার কথা। এই শৈবাল জমিতে থাকলে জমির উর্বরাশক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়, কারণ এগুলি জমির মধ্যে নাইট্রোজেন ধরে রাখে। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আর. এন. সিং দেখিয়েছেন, উত্তর প্রদেশের নোনা এবং ক্ষারীয় জমিতে নীল-সবুজ শৈবালের চাষ করে জমির নাইট্রোজেনের ভাগ, অন্যান্য জৈব পদার্থ এবং জমির জল ধরে রাখবার শক্তি অনেক বৃদ্ধি করা গেছে। এই শৈবাল চাষ করবার পর একেবারে অনুর্বর জমিতেও ফসল ফলানো সম্ভব হয়েছে। এরা এত নাইট্রোজেন ধরে রাখে যে, প্রচুর ধান ফলনের

পরেও প্রতি জমিতে একরে প্রায় ৭০ পাউণ্ড করে নাইট্রোজেন থেকে যায়। এছাড়া এর ফলে জমির ক্ষয়ও রোধ হয়। অবশ্য জমিতে এদের চাষ না করলেও চলে। ডক্টর সিং দেখিয়েছেন, জমিতে সার দেবার মত মাঝে মাঝে নীল-সবুজ শৈবাল ছড়িয়ে তার উপর আখের চাষ করে যথেষ্ট ফলন বৃদ্ধি করা যায়।

জমিতে ফলন বৃদ্ধি করবার জন্যে অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া প্রভৃতি নাইট্রোজেনঘটিত সার দেওয়া হয়। কতকগুলি নীল-সবুজ শৈবাল বাতাসের নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে তাথেকে এই ধরণের সার তৈরি করতে পারে। তাই ধানের জমিতে এগুলি চাষ করলে বছরের পর বছর কোন সার না দিয়েই যথেষ্ট ফলন পাওয়া যায়। ধান চাষের সময় জমিতে যে প্রচুর জল থাকে, সেটাই শৈবাল জন্মাবার পক্ষে উপযুক্ত, অর্থাৎ এগুলির চাষ করবারও কোন অসুবিধা নেই। দেখা গেছে জমিতে Cylindrospermum licheniforme চাষ করে মাত্র আড়াই মাসে প্রতি একরে ৮০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। Tolypothrix tenuis এক বছরে জমির প্রতি একরে ১·২৫ টন নাইট্রোজেন ধরে রাখে। তবে এর মধ্যে Alusira fertilissima-এর মধ্যে এই ক্ষমতাটি সবচেয়ে বেশী আছে। শুধু ধান কেন, এই ভাবে নীল-সবুজ শৈবালের চাষ করে আখ, ভুট্টা এবং রবিশস্যেরও যথেষ্ট ফলন পাওয়া যায়। এই ব্যাপারে Cylindrospermum licheniforme-ই সবচেয়ে বেশী কাজ দেয়।

ক্ষার বেশী থাকবার জন্যে পতিত হয়ে পড়ে আছে, এমন জমি ভারতে প্রচুর। অথচ আমাদের ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটাবার জন্যে এই সব পতিত জমিতে চাষ করা একান্ত প্রয়োজন। এই ক্ষারীয় জমিকে পুনরুদ্ধার করবার একটা অতি সহজ উপায় হচ্ছে, জমিতে এই নীল-সবুজ শৈবালের চাষ করা। এই ভাবে উত্তর প্রদেশের জমিতে চাষ করে দেখা গেছে, পতিত জমিতে পর পর চার বছর শৈবালের চাষ করবার পরেই জমি যথেষ্ট উর্বর হয়ে ওঠে। আগেই বলেছি, এরা শুধু জমিতে নাইট্রোজেন প্রভৃতির সংস্থানই করে না, জমিতে জল ধরে রাখবার কাজেও যথেষ্ট সাহায্য করে।

ভারতে তৃণভোজী গৃহপালিত পশুর অভাব নেই অথচ এখানে তাদের প্রয়োজনীয় চারণ ভূমির যথেষ্ট অভাব। এই নীল-সবুজ শৈবালের সাহায্যে চাষের জমির মত চারণ ভূমিরও যথেষ্ট উন্নতি করা যেতে পারে। বম্বে এবং কাথিয়াবাড়ের সমুদ্রতীরবর্তী ঘাস-জমির ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে যথেষ্ট উপকার পাওয়া গেছে। ঘাস জমির মাটি একটু ঝরঝরে এবং বেলেমাটির হয়, তাই জমির ক্ষয় রোধ করবার জন্যে কিছু ব্যবস্থার দরকার। এই কাজেও নীল সবুজ শৈবাল যথেষ্ট সাহায্য করে।

ধানের জমিতে নানা রকমের মাছ দেখা যায়। ভারতে মাছের চাহিদা প্রচুর, তাই ধানের জমিতে মাছের চাষ করলে যথেষ্ট উপকারে আসে। নীল-সবুজ শৈবাল মাছের খুব প্রিয় খাদ্য। তাই ধানের জমিতে এই শৈবালের চাষ করলে একদিকে যেমন জমির ফলন বেশী হবে, তেমনি নীল-সবুজ শৈবাল এবং এগুলির মধ্যে জন্মানো পোকামাকড় মাছের খাদ্য হতে পারে।

ছোট ছোট পুকুর, ডোবা ইত্যাদিতে বর্ষাকালে লক্ষ লক্ষ মশা জন্মায়। ডক্টর এস. আর. দাশগুপ্ত এবং ভারতের আরও অনেকে দেখেছেন, নীল-সবুজ শৈবাল থাকলে সেই জলে অ্যানোফিলিস মশার শূককীট বাঁচতে পারে না। তাই এই সব ডোবা, পুকুর ইত্যাদিতে বা ধান জমিতে এই শৈবালের চাষ করলে একদিকে যেমন মশার উপদ্রব কমবে, আর একদিকে মাছের চাষ করলে তাদের খাদ্যের অভাব হবে না। উত্তর

প্রদেশের বালিয়া জেলার সুরাহাতালে এই সবগুলিকে একসঙ্গে কাজে লাগানো হয়েছে।

এতক্ষণ নীল-সবুজ শৈবাল আমাদের কি কি উপকারে আসতে পারে তার কথা বলা হলো। এরা মানুষের যথেষ্ট ক্ষতিও করে। সব চেয়ে ক্ষতি করে পুকুর ইত্যাদির জল নষ্ট করে। এরা কিছুদিনের মধ্যেই জলটা একেবারে ছেয়ে ফেলে, সমস্ত জলটা সবুজ হয়ে যায় এবং দুর্গন্ধ ছাড়তে থাকে। আমরা বলি জলটা পচে গেছে। এই অবস্থাকে বলে "Water blooms"। এরকম অবস্থা সবচেয়ে বেশী হয় Microcystis নামে এককোষী শৈবালের জন্যে। এগুলি জলের সমস্ত অক্সিজেন টেনে নেয় বলে মাছ অক্সিজেনের অভাবে মরে যায়।

নীল-সবুজ শৈবালের মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত বিষাক্ত। সাধারণতঃ Oscillospira, Anabaenolium ইত্যাদি মানুষের পাকস্থলীতে বাস করে। এগুলি মোটেই বিষাক্ত নয়। কিন্তু Microcystis, Aphanizomenon, Anabaena ইত্যাদি মানুষ বা অন্যান্য জীবজন্তুর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এগুলি পেটে গেলে পেটের গোলমাল, নিশ্বাসের সঙ্গে গেলে শ্বাসকার্যের গোলমাল হয়। এমন কি, চামড়ার উপরেও রোগের সৃষ্টি করে। বিষাক্ত Microcystis জন্মেছে, এমন জল খেয়ে ১৯৪৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে হাজার হাজার গরু-মোষ মারা গিয়েছিল। পরে দেখা যায়, ঐ শৈবাল থেকে একটা উপক্ষার বা অ্যালকালয়েড বের হয়ে জলে মিশে যায়। সেটা যকৃৎ এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর উপর কাজ করে।

নীল-সবুজ শৈবাল আমাদের যেটুকু ক্ষতি করে, তার তুলনায় উপকারের পরিমাণ অনেক বেশী। অবশ্য এখনও মানুষের খাদ্য হিসাবে এগুলির ব্যবহার বেশী দেখা যায় না। Nostoc নামে এর একটি প্রজাতি "Water plums" নামে একরকম গুটির মত পদার্থ সৃষ্টি করে। দক্ষিণ আমেরিকা এবং চীনের লোকেরা এগুলি খেতে খুব ভালবাসে। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন এবং তেল থাকে। অন্যান্য নীল-সবুজ শৈবাল অবশ্য খেতে খারাপ, কিন্তু সুগন্ধ যোগ করে খাওয়ার চেষ্টা চলেছে। তাছাড়া মাছ, গরু, মোষ, হাঁস এবং মুরগীদেরও খাওয়ানো যেতে পারে।

ভেলোর ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

দক্ষিণ ভারতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, মাদুরা, ত্রিচিনাপল্লী, তাঞ্জোর, মহাবলীপুরম প্রভৃতির মতই বর্তমান কালের আর একটি দর্শনীয় তীর্থস্থান মাদ্রাজ নগরী থেকে প্রায় নব্বই মাইল দূরবর্তী একটি ছোট সহর ভেলোর। সাধারণ তীর্থস্থানগুলিতে ধর্মবিশ্বাসী পুণ্যার্থীরা যায় দেব দর্শনের পুণ্যের ফলে সময়োচিত আনন্দ ও পরিণামে দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য, অর্থ ও সাংসারিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে, কিন্তু শেষোক্ত তীর্থস্থানটির মন্দিরে ছুটে যায় শুধু ভারতবর্ষের সকল স্থান থেকেই নয়, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, হংকং, ইষ্ট আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, পাকিস্থান, সিংহল প্রভৃতি নানা দেশ-দেশান্তরেরও চিকিৎসা-বিজ্ঞান পিপাসু বহু ছাত্র-ছাত্রী, অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী এবং নিরাময় প্রার্থী বহু রোগক্লিষ্ট ও স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি। তাদের সকলের কাছে ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ ও তৎসংলগ্ন হাসপাতাল শুধু দ্রষ্টব্য তীর্থস্থানই নয়, নিরাশার অন্ধকারে আশার জ্যোতির্ময় আলোক-স্তম্ভ। এই বিখ্যাত কলেজটিতে শুধু মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক শ্রেণীর শিক্ষা ছাড়া চিকিৎসাবিদ্যার অন্তর্গত প্রতিটি শাখায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং চিকিৎসার আনুষঙ্গিক বহু বিষয়ে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা দেবার জন্যেও শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। আর আছে প্রতিটি বিষয়ে উন্নত গবেষণার সুযোগ। সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে আছে প্রায় এক হাজারটি শয্যা। আর হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রত্যহ প্রায় দু-হাজারের মত রোগী চিকিৎসিত হয়। এই হাসপাতালটির নিউরোসার্জিক্যাল বিভাগের উৎকর্ষের খ্যাতি, ভারতবর্ষের সর্বত্র তো বটেই, এমন কি, পাশ্চাত্য দেশেও সর্বজনস্বীকৃত। অন্যান্য সকল বিভাগের ক্রিয়াকলাপও অনুরূপ প্রশংসার দাবী রাখে।

একটি ছোট বীজ থেকেই যেমন একটি মহীরুহের উদ্ভব হয়, যেমন একটি ছোট ভিত্তি-প্রস্তর থেকেই গড়ে ওঠে তাজমহলের মত মহাসৌধ, ঠিক তেমনি ভেলোরের বিরাট এবং আকাশচুম্বী কীর্তিস্তম্ভের মূলেও আছেন একজন একনিষ্ঠ সাধিকা আর তার এক শয্যাবিশিষ্ট ছোট একখানি ঘর (হাসপাতাল), যার ডাক্তার, নার্স এবং পরিচারিকা 'এক এবং অদ্বিতীয়' তিনি। তাঁর প্রাতঃস্মরণীয় নাম ডাক্তার ইডা সোফিয়া স্কুডার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নর্থফিল্ডের অধিবাসী ডক্টর জন স্কুডারের ছোট সন্তানের কনিষ্ঠতম ইডা—তিনিই একমাত্র কন্যা। তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন ভারতে আগত মার্কিন ধর্মযাজকদের মধ্যে সর্বপ্রথম এবং পিতাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মিশনারী রূপে ভারতবর্ষকেও তাঁর কর্মস্থল-রূপে বেছে নেন। ১৮৭০ সালে তাঁর জন্মকাল থেকেই তিনি ছিলেন পরিবারের সকলের আদরের দুলালী। বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনের প্রারম্ভেও পারিবারিক ধর্মযাজকের পেশা ও সেবাব্রতের দিকে তাঁর কোন ঝোঁকই ছিল না, বরং মার্কিন দেশের শতকরা নিরানব্বই জন কিশোরী ও যুবতী যেমন আরামের মধ্যে জীবনযাপন করে, তাঁরও প্রথম জীবনে তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি।

১৮৯৪ সালে তাঁর ডাক পড়লো ভারত-

বর্ষে তাঁর পীড়িতা মার কাছ থেকে, সেবা-শুশ্রূষার জন্যে। নেহাৎ দায়ে পড়েই তাঁকে এই ডাকে সাড়া দিতে হয়েছিল এবং তাঁর মনে ছিল যে, যত শীঘ্র পারেন তিনি আবার স্বস্থানে তাঁর আনন্দময় জীবনে ফিরে যাবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক কিন্তু হয় আর। একদা মাদ্রাজের তিন্দিবানম নামক গ্রামে পীড়িতা জননীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা ইডার জীবনস্রোতের মোড় হঠাৎ একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা একেবারে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিল। ঐ রাত্রিতে পর পর তিনজন লোক হন্যে হয়ে তাঁকে লেডী ডাক্তার ভেবে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁদের আসন্নপ্রসবা পত্নীদের সন্তান প্রসবে সাহায্যের জন্যে। তারা কাঁদতে কাঁদতে বললো, সে অঞ্চলে আর কোন লেডী ডাক্তার নেই, আর রোগীণীরা মরে গেলেও এই অবস্থায় তারা কোন পুরুষ ডাক্তারের সাহায্য নেবে না। ইডা দুঃখিত হয়ে বসে রইলেন, কারণ তাঁর করবার মত কিছুই ছিল না তখন। সারারাত্রি তিনি ঘুমুতে পারলেন না, কারণ তিনি শুনতে পেলেন যে, তিনটি মেয়েই অকালে প্রাণত্যাগ করেছে, আর সমস্ত পাড়াটিই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে শোকার্ত পরিজনদের কান্নার রোলে। ঐ ঘটনায় তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল এবং মিশনের বাংলোতে তিনি পিতা-মাতাকে বললেন—আমি আমেরিকায় ফিরে গিয়েই ডাক্তারী শিখবো, যাতে এই ভারতবর্ষেই ফিরে এসে এরূপ অসহায়া নারীদের সাহায্য করতে পারি।

রুগ্না মাতা কিছুটা সুস্থ বোধ করলে তিনি দেশে ফিরে গিয়ে পেন্সিল্ভ্যানিয়ার উইমেন্স মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রী হিসাবে ভর্তি হলেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় পঁচিশ। ১লা জানুয়ারী, (১৯০০) যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল মেডিক্যাল স্কুলের স্নাতক প্রথম মেয়েদের দলের অন্যতমা ডাক্তার ইডা সোফিয়া স্কুডার ভারতবর্ষে ফিরে এলেন তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে। তাঁর আগেই তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিঠিপত্র লিখেছিলেন ভারতবর্ষের ওলন্দাজ রিফর্মড্ চার্চের মিশন বোর্ডের কাছে। তাঁরা সম্মতি জানিয়ে লিখলেন যে, মাদ্রাজ থেকে প্রায় নব্বই মাইল দূরবর্তী ভেলোর নামক স্থানকেই তারা তাঁর কার্যস্থলরূপে মনোনীত করেছেন এবং সেখানে একটি হাসপাতাল স্থাপনের জন্যে তাঁরা ঐ উদ্দেশ্যে আমেরিকায় আট হাজার ডলার মুদ্রা দানরূপে সংগ্রহের জন্যে অনুমতি দিচ্ছেন। সৎকাজের জন্যে কখনো টাকার অভাব হয় না। অতি অপ্রত্যাশিতভাবে ভারতে যাত্রার আগেই ইডা তাঁর অভীপ্সিত টাকাও হাতে পেয়ে গেলেন।

ভারতে রওনা হবার কয়েক দিন আগে ইডা তাঁর বন্ধু মিস হ্যারিয়েট টেবারের সঙ্গে ভারতবর্ষের মেয়েদের অবস্থা বর্ণনা করে তাদের সাহায্যের জন্যে একটি সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করছিলেন। পাশের ঘরেই বসেছিলেন মিস টেবারের ছিয়াশী বছর বয়স্ক ভগ্নীপতি, নিউইয়র্কের মেট্রোপোলিস ব্যাঙ্কের সভাপতি মিঃ রবার্ট শেল। তিনি উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন ইডার কণ্ঠের আবেদন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইডার আবেদনে সাড়া দিতে এগিয়ে এলেন তাঁর প্রার্থিত শুধু আট হাজারই নয়, ততোধিক আরো দু-হাজার অর্থাৎ দশ হাজার ডলারের চেক হাতে নিয়ে। টাকা হাতে এল এবং ইডাও এসে পৌঁছালেন তাঁর কর্মস্থল—ভারতবর্ষে।

ত্রিশ বছর বয়সে ইডা এলেন ভারতের মাটিতে, এই দেশের রোগ, শোক ও অনগ্রসরতা দূর করতে। কিন্তু সকল বিষয়ে সমস্তরে নেমে আসবার জন্যে পাঁচ মাসের মধ্যেই তারও দুর্ভাগ্য সুরু হয়ে গেল তাঁর পিতা ডক্টর

জন স্কুডারের আকস্মিক মৃত্যুতে। উপদেষ্টারূপে যে পিতার উপর নির্ভর করে তিনি এসেছিলেন, এভাবে তাঁকে হারিয়ে নিজেকে শিশুর মত নিরুপায় বলে বোধ করলেন। দুর্ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাতে নিঃসহায়ভাবে তিনি একান্ত নিজের উপর নির্ভরশীল হতে চেষ্টা করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর মনে তখন মাত্র এক লক্ষ্য, মহিলা-চিকিৎসকের অভাবে একজন ভারতীয় মেয়েকেও যেন মরতে না হয়।

ভেলোরের উপকণ্ঠে পিতার মিশন-বাংলোর ১২ ফুট লম্বা এবং ৮ ফুট চওড়া একখানি ছোট্ট ঘরে তিনি তাঁর কাজ আরম্ভ করলেন। কোন সহায়-সম্বল নেই, নিজেও শোকাহত এবং দুর্বল, কিন্তু একমাত্র নির্ভরতা—নিষ্ঠা। কি হবে? পারবো কি পারবো না, এই সংশয় মনে দোলা দিত। লোকেরও বিশ্বাস নেই—এমন কি, মেয়ে রোগীরা পর্যন্ত 'মিসি' বাবার কাছে চিকিৎসার জন্যে আসে না। রোগীর অভাবে ছোট ঘরখানিই প্রশস্ত বলে বোধ হয়। এমনি সময়ে একদিন হঠাৎ এলো এক চোখ-ওঠার রোগী। সেই থেকে শুধু 'মিসি'র সুচিকিৎসার গুণেই নয়, তাঁর সহানুভূতি ও সমবেদনার জন্যেও একটি, দুটি করে রোগী আসতে আরম্ভ করলো। তখন আর ঐ ছোট কামরাটিতে স্থান সঙ্কুলান হয় না, সুতরাং তার সঙ্গে আরও দুটি শয্যাসহ বাংলোর অতিথি কক্ষটিকেও যুক্ত করতে হলো। আর সাহায্যের জন্যে নার্সিং-এর কাজে অশিক্ষিতা আয়া সালোমে বেঞ্জামিনকে নিয়ে দু-বছর ধরে তাঁকে একাই পাঁচ হাজার রোগীর চিকিৎসা করতে হয়েছিল।

রোগীর সংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রবার্ট শেলের প্রদত্ত টাকায় একটি ছোট হাসপাতালের জন্যে গৃহনির্মাণের প্রয়োজন হয়ে পড়লো এবং ১৯০২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর ভেলোরের জেলা কালেক্টর মিঃ জন কর্তৃক মেরি টেবার শেল মেমোরিয়াল হাসপাতালের দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব সম্পন্ন হলো। লাল রঙের ঐ বাড়ীতে প্রতিটি ওয়ার্ডে কুড়িটি করে শয্যাযুক্ত দুটি ওয়ার্ডের হাসপাতাল চালু হলো। আর অস্ত্রোপচারের কক্ষে উপযুক্ত টেবিল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে অস্ত্রোপচারের যথাযথ ব্যবস্থাও করা হলো। উৎসবটি শেষ হওয়া মাত্র ইডা মুহূর্ত মাত্র বিশ্রাম না করে যথানিয়মে আবার হাসপাতালের দৈনন্দিন কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

কথা ছিল রাণীপেটের ডাক্তার লুইসা হার্ট এই হাসপাতালের কাজে ইডার সঙ্গে যোগ দেবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে আমেরিকায় ফিরে যেতে হলো। এদিকে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল এবং শুধু নিকটেরই নয়, বহু দূরাগত রোগীও শুধু 'ডাক্তার আম্মার' দ্বারা চিকিৎসিত হবার অপেক্ষায় শয্যার অকুলান সত্ত্বেও ওয়ার্ডের মেঝেতে কিংবা শয্যার স্প্রীং-এর খাটের নীচে একটু স্থান লাভের জন্যে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। প্রথম বছরে একজন মাত্র পরিচারিকা সালোমের সাহায্যে তিনি হাসপাতালে ১২৩৫৯ জন রোগীর চিকিৎসা করেন, তার মধ্যে ২১টি বড় রকমের এবং ৫২৮টি ছোটখাটো অস্ত্রোপচারও তাঁকে করতে হয়েছিল এবং সবগুলিই সাফল্যের সঙ্গে। ফলে অল্পকালের মধ্যেই হাসপাতালটির সুনাম দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন কি M. T. Schell হাসপাতালের বদলে তাঁর নামের ধ্বনি সাদৃশ্যহেতু 'Empty shell' হাসপাতালের নামেও বহু চিঠিপত্র আসতো। এতেই বুঝা যায়, হাসপাতালটি কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

শুধু যে রোগীরাই হাসপাতালে আসতো এমন নয়, হাসপাতালকেও তিনি রোগীদের নিকটে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন। একটি ভ্যানে

চলমান হাসপাতালকে সপ্তাহে দুদিন করে ভেলোরের আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে নিয়ে যেতেন কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত এবং হাসপাতালে যেতে অশক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্যে। সেই থেকে আজও একই ব্যবস্থা চলছে। কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থানে হাটে বাজারে, চা-বাগানের নীচে, মুক্ত আকাশ তলে প্রতি সপ্তাহে বুধ এবং শুক্রবারে এই চলমান হাসপাতালটি কখন গিয়ে পৌঁছাবে, তারই প্রতীক্ষায় অসংখ্য রুগ্ন লোক বহুক্ষণ আগে থেকেই সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং যথাসময়ে চিকিৎসিত হয়। ১৯৬৬ সালে, মাত্র একটি বছরের হিসাবেই দেখা যায় যে, ঐ ব্যবস্থাতে ৬১,৮৯৫ জন রোগী চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছিল। ঐ সঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, পুষ্টিকর খাদ্যের আবশ্যকতার জন্যে উপদেশ এবং রোগ প্রতিষেধের টিকা ও অন্যান্য ব্যবস্থাও ঐ চলমান হাসপাতালের কর্মীদের কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হাসপাতালটির সুষ্ঠু পরিচালনায় দিনরাত্রি অসংখ্য কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অন্যদিকে তার কাজের প্রসারের কথা ইডা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিলেন। ঐ সঙ্গে ভারতীয় মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের কথা তিনি ভাবছিলেন। কিন্তু কি করে তার জন্যে টাকার সংস্থান করা যায়, তাই তাঁর অহর্নিশ চিন্তার বিষয় ছিল।

সুদীর্ঘ ছয়টি বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে দেশে গেলেন। ভেলোরের হাসপাতালের সঙ্গে মেয়েদের জন্যে একটি নার্সিং-এর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত অর্থ লাভের জন্যে তিনি শুধু তার দেশ আমেরিকাই নয়, ক্যানাডায় পর্যন্ত নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে আবেদন জানাতে আরম্ভ করলেন। তারই ফলে কুমারী ডি. এম. হাউটনের সহায়তায় ১৯০৯ সালে মাত্র পনেরোটি ছাত্রী নিয়ে ভারতবর্ষের প্রথম নার্সিং শিক্ষার স্কুলটি স্থাপিত হলো। পরে ১৯৩১ সালে সেটি উন্নীত হলো উচ্চতর নার্সিং শিক্ষার কেন্দ্ররূপে এবং ১৯৪৬ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্সিং-এ বি. এস-সি. ডিগ্রীর জন্যে চার বছরের পাঠ্যক্রম যুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী কলেজরূপে। এখন প্রতি বছর সেখান থেকে ষাট জন করে নার্স ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা নিয়ে সেবাব্রতী হন।

আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চাশার নিবৃত্তি নেই। অক্লান্ত কর্মী ইডার মন ঐটুকু সাফল্যেও সন্তুষ্ট নয়, প্রতিক্ষণ তাঁর মনে জাগছে—আরো চাই। ১৯১৩ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত তিনি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ালেন দেশের এবং বিদেশের বহু স্থানে, ভেলোরে মেয়েদের জন্যে একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রয়াসে। মাদ্রাজের তৎকালীন সার্জন জেনারেল ব্রাইসন মোটেই আশাবাদী ছিলেন না, তাই বললেন, বৃথা শ্রম, তিন জনও ছাত্রী আসে কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁর ধারণা যে ভুল, তা প্রমাণিত হলো ভর্তি হবার জন্যে দেড়-শতেরও অধিক আবেদন-পত্র এলো। স্থানাভাবে তাথেকে বেছে মোটে সতেরো জনকে নেওয়া সম্ভব হলো। অফিসার্স লাইনে একটি ভাড়া করা বাংলোয় তাদের থাকতে দেওয়া হলো। ১৯১৮ সালের ১২ই অগাষ্ট একটি ভাড়াটে বাড়ীর এক কক্ষে শবব্যবচ্ছেদ ও আর এক কক্ষে লেক্‌চারের ব্যবস্থা—কয়েকখানি বই, একটি কঙ্কাল ও মাত্র একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে ভেলোরে এল. এম পি. ডিপ্লোমা দেবার জন্যে ইউনিয়ন মিশনারী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হলো। আরও কয়েক-জন ডাক্তারের উপর বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেবার ভার দেওয়া হলেও ইডা অসংখ্য কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও শারীরসংস্থানবিদ্যা (Anatomy) শিক্ষণের ভার নিজের হাতে নিলেন। চার বছর পরে যে চৌদ্দ জন ছাত্রী প্রথম দলে স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিল, তাদের

সকলেই যে শুধু পাশ করলো তা নয়, অধিকন্তু চার জন প্রথম শ্রেণীতে এবং একজন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ধাত্রীবিদ্যা এবং স্ত্রীরোগবিদ্যায় প্রথম স্থান লাভ করে ইডার প্রচেষ্টাকে আশাতিরিক্তভাবে সাফল্যমণ্ডিত করলো।

পরবর্তী বছরগুলিতে ঐরূপ সাফল্যের পুনরাবৃত্তি হতে লাগলো। সুতরাং ইডার যশ শুধু আর ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ রইলো না, দেশ-বিদেশে, বিশেষতঃ তাঁর নিজের দেশ আমেরিকায়ও পৌঁছুলো। তাঁর কর্মকুশলতার স্বীকৃতি স্বরূপ অযাচিতভাবে নগদ টাকা এবং অন্য ভাবেও সাহায্য আসতে লাগলো। জার্ট্রুড ডড নামে একজন বদান্য মহিলা তাঁর নিউইয়র্কের বিপুল ঐশ্বর্য ছেড়ে তাঁর সকল অর্থ ও সামর্থ্য ভেলোরের এই জনহিতকর কাজে নিয়োগ করেন। পলিন জেফারি নামে আর একজন মহিলা ইডার অসামান্য ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে ত্রিশ বছর বয়সে শিক্ষিকার পেশা ছেড়ে চলে গেলেন আমেরিকায় ডাক্তারী শিখতে এবং কুমারী ডডের অর্থানুকূল্যে সেখানে শিক্ষা সমাপ্ত করে ভেলোরে ফিরে এলেন ইডাকে সাহায্য করতে। লুসী পিবডি নামে আর একজন মহিলা এর জন্যে কুড়ি লক্ষ ডলারের আবেদন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র ঘুরে জোগাড় করলেন এবং রক্‌ফেলার অর্থ ভাণ্ডার থেকেও দশ লক্ষ ডলার পাওয়া গেল। সাধারণ লোকেরাও দান করলো, যেমন—একজন খবরের কাগজের ফেরীওয়ালা দিলে তার এক সকালের লভ্য কমিশন তিনটি সেন্ট এবং একজন রাঁধুনীও ঐ উদ্দেশ্যে একটি ষ্ট্রবেরী কেক তৈরি করে তার বিক্রয়লব্ধ যা কিছু সবই দিয়ে দিলে ঐ ভাণ্ডারে।

এভাবে ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগুলির আনুকূল্যে অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থ সংস্থানের পর ভেলোর শহরের থোটাপালায়াম নামক পাড়ায় কুড়ি একর জমি কিনে সেখানে বর্তমানে শুধু ভারত বিখ্যাতই নয়, বিশ্ববিখ্যাত হাসপাতালসহ শিক্ষাকেন্দ্রটি স্থাপনে উদ্যোগী হলেন ইডা। ম্যাসাচুসেট্‌সে এলেন কোল নামক একজন মহিলার দানে হাসপাতাল সংলগ্ন বিখ্যাত কোল ডিস্‌পেন্‌সারিটিও সংযুক্ত হলো। ১৯৩২ সালের ২রা ডিসেম্বর চার মাইল দূরবর্তী দু-শ' একর মালভূমিতে কলেজ হিল নামক কলেজ ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করলেন মাদ্রাজের তৎকালীন গভর্ণর সার জর্জ ষ্ট্যানলী ও তদীয় পত্নী লেডী বিয়াট্রিক্‌স্‌। দেখতে দেখতে সেখানে চিকিৎসার কেন্দ্ররূপে একটি স্বতন্ত্র টাউনশিপ গড়ে উঠলো।

১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কাজকর্ম উন্নতির পথেই এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি কালো মেঘ আকাশে দেখা দিল। মাদ্রাজ সরকারের আদেশে মেডিক্যাল স্কুলগুলিতে ডিপ্লোমার জন্যে শিক্ষার পরিবর্তে ডিগ্রীর জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থার নির্দেশ এলো। ইডা এত তাড়াতাড়ি তাঁর সামর্থ্যের অতিরিক্ত পরিবর্তন সাধনের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, কেন না এম. বি. বি. এস. পাঠক্রম প্রবর্তনের জন্যে তাঁর না ছিল উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক, হাসপাতালে পাঁচ-শটির পরিবর্তে তাঁর ছিল মাত্র ২৬৮টি শয্যা আর ছিল হাসপাতালের পর্যাপ্ত সাজসরঞ্জাম। যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষের তিনটি পরিচালক সংস্থাও একমতাবলম্বী ছিলেন না। এদেশের সংস্থা বললেন, ছেলে-মেয়েদের সহশিক্ষা প্রবর্তনের ফলেই এই বাধা দূর করা সম্ভব, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে লুসী পিবডি ও তাঁর সমর্থকেরা তা সমর্থন করলেন না। সুতরাং ইডা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যে পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে, সুতরাং টাকা জোগাড়ের আশা বৃথা তা সত্ত্বেও ইডা পরাজয় স্বীকার করতে রাজি হলেন না। তিনি ১৯৪১ সালে কুমারী ডডের সঙ্গে আবার আরো দশ লক্ষ

ডলার সংগ্রহের জন্যে আমেরিকায় পাড়ি দিলেন। তখন সে দেশের কাগজে শুধু যুদ্ধেরই সংবাদ এবং তার জন্যেই বড় বড় শিরোনামা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইডার সাহায্যের আবেদনও কিছু কিছু স্থান পেলো। একখানা কাগজে সম্পাদকীয় মন্তব্য বেরোলো—কোন একটি মেয়ে, কোন এক বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে দশ লক্ষ ডলারের জন্যে আবেদন জানাচ্ছে। এ তো প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু বিশেষ একজন মেয়ে আগে বিশ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করে আরো দশ লক্ষের জন্যে আবেদন জানাচ্ছেন, এটাই হলো এর বিশেষত্ব।

মেয়েদের বিপন্ন ইউনিয়ন মিশনারী মেডিক্যাল স্কুলের অস্তিত্ব রক্ষা পেল, আমেরিকার পরামর্শ সংস্থার একবাক্যে সহশিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাবের অনুমোদনে এবং ইডাও পরিবর্তনশীল ভারতের প্রয়োজনে তা মেনে নিলেন। কিন্তু এভাবে মত পরিবর্তনের খেসারতও কম দিতে হলো না। এরূপ মতান্তরের ফলে তাঁর একজন অকৃত্রিম বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলো। কেন না, লুসী পিবডি ঐ বোর্ড থেকে সরে দাঁড়ালেন। এখানেই দুর্ভাগ্যের শেষ নয়। ১৯৫৪ সালের ৯ই জানুয়ারী রবিবারে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর কাছে লিখলেন—আজ আমার জীবনের গভীরতম দুঃখের দিন, কারণ আজ একটার দশ মিনিট আগে জার্ট্রুডের মৃত্যুতে আমার বুক ভেঙ্গে গেল। কিন্তু এত দুর্যোগ সত্ত্বেও তাঁর অদম্য মনের বল কিছুমাত্র হ্রাস পেলো না। তিনি তাঁর স্বগৃহে ফিরে এলেন এবং ২৫ জন মেয়েকে ভর্তি করে এম. বি. বি. এস. পাঠক্রমযুক্ত মেডিক্যাল কলেজে কাজ আরম্ভ করলেন।

১৯০১ সালে তিনি যে ছোট একটি বীজ পুঁতেছিলেন ভেলোরের মাটিতে, ধীরে ধীরে তার কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়ে ক্রমশঃ একটি বিরাট মহীরূপে পরিণত হয়েছিল। ১৯৬০ সালে প্রায় ৯০ বছর বয়সে এই মহীয়সী কর্মযোগী মহিলার মৃত্যু হলেও তাঁর গড়া এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই তিনি অমর হয়ে আছেন।

২৩শে অক্টোবর (১৯৬৭) ভেলোর মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চবিংশতিতম সমাবর্তন উৎসব পালিত হয়েছে আর ঐ সঙ্গে মেডিক্যাল স্কুল এবং নার্সিং শিক্ষা কেন্দ্রের পঞ্চাশত্তম উৎসবও। ঐ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর চন্দ্রশেখর প্রমুখ বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠাত্রীর অন্যান্য সাধারণ গুণাবলী ও কর্মকুশলতার প্রশংসা করে তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আমরা আশা করি আর ঠিক দু-বছর পরে অর্থাৎ ১৯৭০ সালে ভারতবাসী শ্রদ্ধাবনত চিত্তে দেশের সর্বত্র এই মহীয়সী মহিলার জন্মশতবার্ষিকী পালন করে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করবেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

কাচের মত পরিচ্ছন্ন ইস্পাত

বৃটেনের সাউথ ওয়েল্‌স্‌-এর একটি ইস্পাত কারখানার নতুন খোলা লাইন থেকে এখন কাচের মত পরিচ্ছন্ন ইস্পাতের চাদর বের হয়ে আসছে। এর জন্যে অতিরিক্ত শোধন-ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না।

এই ধরণের ইস্পাত বৃটেনে এই প্রথম তৈরি হলো। ৪৮ ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া ইস্পাতের চাদর এই পদ্ধতিতে পাওয়া যেতে পারে।

নতুন লাইনটি খোলবার আগে পর্যন্ত অতি মসৃণ প্রশস্ত ইস্পাতের চাদরের প্রয়োজন হলে সাধারণ মরিচাশূন্য ইস্পাতকে সংশোধিত করে প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্নতা আনা হতো।

ধোলাই যন্ত্র, রেফ্রিজারেটর, তৈজসপত্র, চিম্‌নি, মদ তৈরি ও রাসায়নিক শিল্পের কাজে অতি মসৃণ ইস্পাতের প্রয়োজন হয়।

রক্তের শ্রেণী-বিন্যাসে শামুকের ডিম

সুস্থ মানুষের রক্ত দিয়ে রোগীর জীবন রক্ষা এখন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পদ্ধতিতে হাজার হাজার লোকের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

বিভিন্ন রকমের রোগীকে নতুন রক্ত দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু সব মানুষের রক্ত এক শ্রেণীর নয়। মানুষের রক্তে প্রধান চারটি শ্রেণী রয়েছে। রক্তের শ্রেণী-বিন্যাস খুবই প্রয়োজনীয়—কেন না, সমশ্রেণীর রক্ত না হলে রোগীর দেহ সে রক্ত গ্রহণ করে না।

রক্তের শ্রেণী-বিন্যাসের জন্যে হাসপাতাল ও লেবরেটরীগুলিতে অ্যান্টি-এ এবং অ্যান্টি-বি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই উপাদানও মানুষের রক্তেই পাওয়া যায় এবং রক্তদাতাদের রক্ত থেকেই সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

কিন্তু কয়েক বছর আগে বার্লিনের অধ্যাপক প্রোকপ আবিষ্কার করেন যে, বাগানের সাধারণ শামুকের গা থেকে এক ধরণের উপাদান পাওয়া যায়, যা অ্যান্টি-এ-এর অনুরূপ। দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের বৃষ্টল সহরের সবচেয়ে বড় হাসপাতালের বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কারের কথা শুনে গবেষণা সুরু করেন।

অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাঁরা আবিষ্কার করেন যে, এই পদার্থটির আসল উৎস হলো শামুকের ডিম। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেন যে, পাঁচ জন রক্তদাতার দেওয়া দু-কাপ রক্ত থেকে যে পরিমাণ অ্যান্টি-এ পাওয়া যায়, শামুকের একটি মাত্র ডিমেই সে পরিমাণ অ্যান্টি-এ থাকে।

এই আবিষ্কারের অর্থ হলো, এখন থেকে রক্তের শ্রেণী-বিন্যাসের জন্যে সহজলভ্য শামুকের ডিম ব্যবহার করা যাবে এবং রক্তদাতার মূল্যবান রক্ত শুধু রোগীর দেহে সঞ্চারিত করবার জন্যে রাখা হবে। বৃষ্টলের সাউথমিড হাসপাতালের ডাঃ জিওফ্রে চৌভে বলেন—এই আবিষ্কারের ফলে সময়, অর্থ, শ্রম এবং সরঞ্জাম বাঁচবে।

রক্তের শ্রেণী-বিন্যাসে শামুকের ডিমের ব্যবহার এতই সহজ যে, পৃথিবীর সব জায়গায় এই পদ্ধতি অনুসরণ না করবার কোন কারণ নেই। অবশ্য স্থানীয় শামুকের ডিমে প্রয়োজনীয় উপাদান অ্যান্টি-এ আছে কিনা, দেখে নিতে হবে।

রেডারের সাহায্যে পঙ্গপালের গতিপথ নির্ণয়

পঙ্গপালের গতিপথ নির্ণয়ের গবেষণা প্রকল্পে রেডার ব্যবহার করা হবে। লণ্ডনের অ্যান্টি-লোকাষ্ট রিসার্চ সেন্টার নাইজিরিয়া প্রজাতন্ত্রে আগামী সেপ্টেম্বরে এই গবেষণা চালাবেন।

এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে বৃটেনের বৈদেশিক উন্নয়ন দপ্তর থেকে বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ সাহারার বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ পঙ্গপালের আচরণ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে রেডার ব্যবহার করা হবে। আশা করা যায়, এই পর্যবেক্ষণের ফলে পঙ্গপালের দেশান্তর-যাত্রা সম্পর্কে আরও সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে।

এই গবেষণা প্রকল্পটি কার্যকরী করা হবে অ্যান্টি-লোকাষ্ট রিসার্চ সেন্টার ও লাফবরো কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীদের যৌথ প্রচেষ্টায়। লাফবরো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ডাঃ জে. এম. গ্রেন স্যাক্কার রেডারের পরীক্ষাগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যুদ্ধের সময় উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলিকেই তিনি পঙ্গপাল পর্যবেক্ষণের কাজে লাগাবেন।

প্রকল্প কার্যকরী করবার স্থান হিসাবে সাহারা মরুভূমিকে বেছে নেবার কারণ—সেখানে লক্ষ লক্ষ পঙ্গপালের বাস। সাধারণতঃ এরা বিচ্ছিন্নভাবেই থাকে, কিন্তু অনুকূল পরিবেশ পেলে দলবদ্ধ হয়, বংশবৃদ্ধি করে এবং নতুন বিপদের সৃষ্টি করে।

রেডার পরীক্ষায় পঙ্গপালের আচরণ, গতি, যাত্রার দিক প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে। এই তথ্যের সঙ্গে তাদের জীবতত্ত্বগত আচরণ পর্যালোচনা করে তাদের দলবদ্ধ অবস্থার আচরণ জানা যাবে। বিচ্ছিন্ন পঙ্গপালকে পর্যবেক্ষণ করবার পক্ষে একটা বাধা ছিল এই যে, তারা নিশাচর, কিন্তু রেডারের পক্ষে এটা কোন বাধা নয়।

রেডারে পঙ্গপালের আচরণ পর্যবেক্ষণের কাজ সুরু হবে সেপ্টেম্বরে এবং তা প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে চলবে। এই রেডারের পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিধি হবে দেড় মাইল এবং এটি একটি ল্যাণ্ড রোভার গাড়ীর উপর সংস্থাপিত থাকবে।

উন্নত ধরণের হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌

হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ ইউনিটের পরীক্ষার ফলে হোভারক্র্যাফ্‌টের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার নাটকীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে।

নতুন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এবারই প্রথম হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌কে বিশেষভাবে টার্মিন্যাল এলাকাগুলিতে সম্পূর্ণ নিখুঁৎভাবে পরিচালনা করবার সুযোগ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পরীক্ষামূলক একটি যানে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে এখনও অনুসন্ধান চলছে।

পরীক্ষামূলক এই যানটিকে বলা হয় এইচ. ডি-২। পাঁচ টনের এই যানটি ভবিষ্যতের ৯০ টনের হোভারক্র্যাফ্‌টেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। এটি তিনটি গ্যাস-টার্বাইন ইঞ্জিনের দ্বারা চালিত হয়। ইঞ্জিনগুলির প্রত্যেকটি আবার ১৫০ অশ্বশক্তি-সম্পন্ন। এইচ. ডি-২ যানটিকে ইচ্ছা করেই একটু বেশী রকমের শক্তিসম্পন্ন করা হয়েছে, যাতে এটি বড় রকমের যানের মডেল হিসাবে কাজ করতে পারে।

এইচ. ডি-২ এপর্যন্ত জলে ও স্থলে ১০০ ঘন্টারও বেশী যাত্রা সম্পূর্ণ করেছে।

অতিশক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র

আমেরিকায় এক প্রকার অতিশক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি পরমাণুকেও রাসায়নিক দিক থেকে এই যন্ত্রের সাহায্যে সনাক্ত করা সম্ভব হবে। এর নামকরণ করা হয়েছে পরমাণু-সন্ধানী ফিল্ড আয়ন মাইক্রোস্কোপ। ধাতু ও মিশ্র ধাতুর পর্যালোচনায় এবং ধাতুর

ক্ষেত্রে ভেজালের বিশ্লেষণে এই যন্ত্রটি খুবই কাজে লাগবে। এই নতুন যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ পরমাণুর মধ্যে একটি পরমাণুর পরিচয় পৃথকভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে। ধাতু-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, অনুঘটক উৎপাদনের ব্যাপারে এই যন্ত্রটি বিশেষ সহায়ক হতে পারে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া, শিল্প বা কেমিক্যাল প্রোসেস ইণ্ডাষ্ট্রীতে এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই যন্ত্রটি কাজে লাগতে পারে।

রকেটের মোটরে ব্যবহৃত বিশেষ উপকরণে তৈরি জলের পাইপ

ক্যালিফোর্ণিয়ায় টেকাইট নামে একটি বিশেষ ধরণের উপকরণ দিয়ে রকেটের মোটরের মাথার দিকটা তৈরি হয়ে থাকে। এই পদার্থটির সাহায্যে বর্তমানে জলের নর্দমা ও জলসেচের পাইপ তৈরিরও ব্যবস্থা হয়েছে। এই জিনিষটি তৈরি করাও খুব সহজ। তাছাড়া জিনিষটি খুবই হাল্কা এবং শক্ত। অন্যান্য উপকরণে তৈরি পাইপ এর তুলনায় পাঁচ-ছয় গুণ ভারী। ১৯৬৬ সালেই প্রথম এই উপকরণ দিয়ে নর্দমার পাইপ তৈরি হয় এবং এই সকল পাইপ ভূগর্ভেও বসানো হয়। ১৯৬৭ সালে জলসেচের জন্যেও এই সকল পাইপ ব্যবহৃত হয়েছিল।

ক্যান্সার চিকিৎসায় বহনযোগ্য যন্ত্র

ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ ক্যান্সার চিকিৎসার কাজে ব্যবহারের জন্যে একটি স্বল্প মূল্যের বহনযোগ্য যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। এটি একটি ক্ষুদ্রাকৃতির পাম্প—এর কাজ হবে দেহের আক্রান্ত অংশের চিকিৎসায় সাহায্য করা।

চিকিৎসাধীন রোগী এই যন্ত্র পরে থাকতে পারবেন এবং যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন। সাধারণতঃ হাস-পাতালে এক মাস ধরে রোগীর চিকিৎসা চলে এবং সে সময়ে রোগী টিউবসংযুক্ত হয়ে থাকবার দরুণ নড়াচড়া করতে পারে না।

ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার অঙ্গ হলো মেথোট্রেক্সেট (Methotrexate) নামে একটি ওষুধ ধমনীতে সঞ্চারিত করে দেওয়া। উদ্ভাবিত যন্ত্রটি নির্ভুলভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণে (প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ সি. সি. হারে) এবং যথাযোগ্যভাবে কাজ করতে সক্ষম।

পূর্ববর্তী ব্যাটারী বা গ্যাসচালিত যন্ত্রগুলি রোগীর বহু অসুবিধার সৃষ্টি করতো। নতুন যন্ত্রটি হবে হাল্কা ও হাতব্যাগের আকারের। রোগীর দেহের সঙ্গে ফিতা দিয়ে বেঁধে দেওয়া যাবে অথবা কোটের বড় পকেটে পুরে রাখা চলবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অগাষ্ট—১৯৬৮

২১শ বর্ষ, ঃ ৮ম সংখ্যা

পশ্চিম জার্মেনীতে দূর-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে লেসার রশ্মির সাহায্যে গাড়ী চালাবার পরীক্ষা চলছে। বিজ্ঞানীরা একটি খেলনা গাড়ী লেসার রশ্মির সাহায্যে চালাতে পেরেছেন। গাড়ীটিতে একটি "ফটো-ডিটেক্টর ইনটেন্‌সিফায়ার" ছিল। লেসার রশ্মি সোজাসুজি ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটিও সোজা চলছিল এবং লেসার রশ্মির গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটিও গতি পরিবর্তন করছিল।

করে দেখ

তিন গ্লাসের খেলা

তিনটি গ্লাসের সাহায্যে গাণিতিক কৌশলের একটি খেলা দেখিয়ে তোমার বন্ধুদের অবাক করে দিতে পার।

টেবিলের উপর একসারে তিনটি খালি গ্লাস রাখ—মধ্যের গ্লাসটির মুখ থাকবে উপরের দিকে আর পাশের গ্লাস দুটিকে বসাবে উবুড় করে অর্থাৎ সে দুটির মুখ থাকবে নীচের দিকে। ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে—কেমন করে বসাতে হবে। এবার এক সঙ্গে দু-হাতে দুটি করে গ্লাস তুলে নিয়ে উল্টো করে বসিয়ে ঠিক তিন বারে এমন অবস্থায় আনতে হবে, যাতে তিনটি গ্লাসের মুখই উপরের দিকে থাকে। কেমন করে করা যায়, বলে দিচ্ছি। প্রথমে A B গ্লাস দুটিকে দু-হাতে ধরে এক সঙ্গে উল্টে বসিয়ে দাও। দ্বিতীয় বারে A C গ্লাস দুটিকে উল্টে বসাও। তৃতীয় বারে A B গ্লাস দুটিকে উল্টে বসালেই দেখবে—তিনটি গ্লাসের মুখই উপরের দিকে হয়েছে।
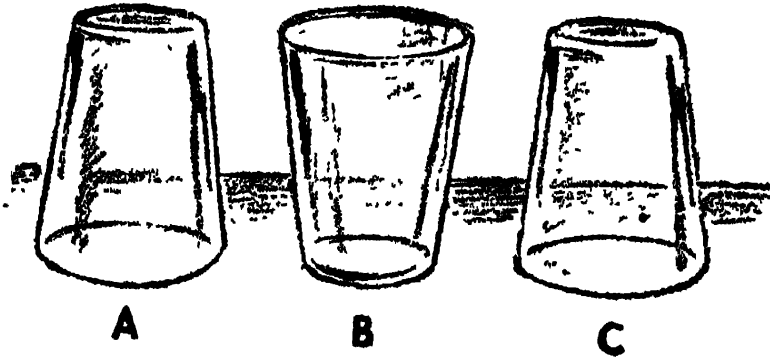
এবার কথা বলবার ফাঁকে, অন্যের অলক্ষ্যে মাঝের গ্লাসটাকে নীচের দিকে মুখ করে বসিয়ে দাও এবং বন্ধুদের বল—তাদের মধ্যে কেউ তোমার মত করে ঠিক তিন বারে একসঙ্গে দুটি করে গ্লাস উল্টে দিয়ে সবগুলি গ্লাসের মুখ উপরের দিকে আনতে পারে কিনা।

তুমি প্রথম আরম্ভ করেছিলে দুটি গ্লাসের মুখ নীচের দিকে এবং একটি গ্লাসের মুখ উপরের দিকে রেখে। কিন্তু এবার সাজাবার ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্তনের ফলে এক সঙ্গে দুটি করে গ্লাস তিন বার বা যতবারই উল্টে দিক না কেন, কিছুতেই সবগুলি গ্লাসের মুখ এক সঙ্গে উপরের দিকে আনতে পারবে না।

—গ—

মুক্তার কথা

মুক্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুদের ধারণা ছিল—স্বাতী নক্ষত্রে শিশিরকণা অথবা বৃষ্টিবিন্দু ঝিনুকের উন্মুক্ত খোলার মধ্যে পড়লে তা রূপান্তরিত হয় মুক্তা-কণায়। মুক্তার উৎপত্তি হয় তখনই, যখন কোন এক শ্রেণীর ঝিনুকের (সাধারণতঃ Pinctada sp) খোলের ভিতরের বিশেষ বিশেষ স্থান সুক্ষ্ম পরভোজী অথবা বালিকণার দ্বারা আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত ঝিনুক তার দেহ-নিঃসৃত রসের সাহায্যে আক্রমণজনিত অস্বস্তি প্রশমনের চেষ্টা করে। এই দেহ-নিঃসৃত রসের শুষ্ক স্তর ক্রমাগত জমা হতে থাকে বালিকণা অথবা পরভোজীকে ঘিরে। এর ফলেই উৎপত্তি হয় মুক্তার। আক্রান্ত ঝিনুকের দেহে আমৃত্যু এই রসের ক্ষরণ হবার ফলে ঝিনুকের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহাভ্যন্তরস্থ মুক্তাও আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাধারণভাবে এই হলো মুক্তার জন্মের ইতিকথা।

মুক্তা-উৎপাদক ঝিনুক সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সমুদ্রে অথবা প্রবাল দ্বীপের সন্নিকটে দলে দলে বসবাস করে। ভারতবর্ষে প্যামবিয়ান থেকে তুতিকোরিনের মধ্যবর্তী স্থানে এবং মন্নারু উপসাগরে এরা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, যেমন—মেক্সিকোর সমুদ্রোপকূল, পারস্য উপসাগর, চীন, জাপান ও সিংহলে এদের অবস্থান উল্লেখযোগ্য।

সমুদ্রে এদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো তারা-মাছ বা ষ্টার-ফিস। ঝিনুকের খোলের ভিতরের নরম থলথলে দেহটাকে খাবার জন্যে এদের আগ্রহ যেমন প্রবল, ধৈর্যও তেমনি অপরিসীম। তারা-মাছ ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন অপেক্ষা করে উন্মুক্ত অবস্থায় ঝিনুক ধরবার জন্যে। নিরীহ ঝিনুক খোলা উন্মুক্ত করলেই তাকে আক্রমণ করে এবং তার নরম দেহ উদরসাৎ করে।

মুক্তার ব্যবহার প্রথমে চীনদেশে সুরু হলেও বর্তমানে জাপানই হলো এর প্রধান ব্যবসায়ী। ভারতবর্ষে বহুদিন বিরতির পরে ১৯৫৭ সাল থেকে মন্নারু উপসাগরে মুক্তা উত্তোলন সুরু হয়েছে। কয়েকটি পূর্বনির্ধারিত স্থানে বছরের এক নির্দিষ্ট সময়ে সরকার-নিযুক্ত ডুবুরীর দ্বারা উদ্ধার করা হয় ঝিনুকরাশি। মোট পরিমাণের তিন ভাগের এক ভাগ পায় ডুবুরীরা। সরকারের অংশ সর্বদাই নীলামে সাবেকি ক্রেতার কাছে বিক্রীত হয়। ক্রেতা এই সামগ্রী নৌকার মধ্যে বিশেষভাবে নির্মিত গহ্বরে সতর্ক প্রহরাধীনে ফেলে রাখে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে। কিছু দিনের মধ্যে ঝিনুকগুলির মৃত্যু ঘটে এবং ভিতরের মাংস পচে যাবার পর জলস্রোতের সহায়তায় তা ধৌত এবং পরিষ্কার করা হয়। এইভাবে ক্রমাগত ধুইয়ে ফেলবার শেষ স্তরে আসল মুক্তা পাত্রের জলের নীচে থিতিয়ে পড়ে।

বিভিন্ন দেশে বর্তমানে ব্যাপকভাবে মুক্তার চাষ সুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় কিছু সংখ্যক ঝিনুকের খোলার সূক্ষ্ম টুক্‌রা তাদেরই দেহত্বক দিয়ে মুড়ে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে প্রবেশ করানো হয় অন্যান্য কিছুসংখ্যক ঝিনুকের দেহত্বক ও দেহ আবরণীর মধ্যবর্তী স্থানে। এই অবস্থায় ওদের এক বিশেষ শ্রেণীর খাঁচায় বন্দী করে ছেড়ে দেওয়া হয় সমুদ্রের জলের নীচে। পরে এই সব ঝিনুকের দেহ থেকে পূর্ববর্ণিত উপায়ে মুক্তা বের করে নেওয়া হয়।

রাসায়নিক দিক থেকে বিচার করতে গেলে মুক্তা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও অন্যান্য জৈব পদার্থের সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ঝিনুকদেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান অনুযায়ী এর বর্ণ ও আকৃতির পরিবর্তন হয়। সাধারণতঃ এদের বর্ণ ঘোলাটে সাদা, খয়েরী অথবা কালো। তথাপি গোলাপী মুক্তাই সর্বাধিক প্রচলিত ও প্রিয়। এরা সাধারণতঃ ডিম্বাকার অথবা গোলাকার হলেও সময়ে সময়ে কোন কোন প্রাণীদেহের অনুরূপও হয়ে থাকে; এগুলি বোরাক পার্ল বলে পরিচিত। বৃহৎ আকারের মুক্তাকে বলা হয় প্যারাগন এবং এদের মূল্যও হয় অসাধারণ।

আসল মুক্তার অত্যধিক মূল্যের জন্যেই বোধ হয় অন্যান্য অনেক জিনিষের মত কৃত্রিম মুক্তাও আজকাল বহুল প্রচলিত। কৃত্রিম মুক্তা উৎপাদনের উপাদান কিন্তু সামান্যই। মাছের আঁশের উপরের রূপালী চক্‌চকে অংশ অথবা ঝিনুকের খোলার ভিতরের উজ্জ্বল অংশ (মাদার অব পার্ল) চেঁচে নিয়ে তা সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত ছাঁক্‌নীর সাহায্যে ছেঁকে পরিস্রুত করা হয় অ্যামোনিয়ার সাহায্যে। বিভিন্ন আকারের কাচের টুক্‌রার উপর এই পরিস্রুত অত্যুজ্জ্বল পদার্থ বা পার্ল এসেন্সের আচ্ছাদন দিয়ে তৈরি করা হয় নকল মুক্তা।

শ্রীসমর চক্রবর্তী

আলো আর রং

আকাশে রামধনু সকলেই দেখেছ নিশ্চয়। কেমন সুন্দর সাত রঙের দৃশ্য, আকাশের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। তাছাড়া আজকাল কত রকমের বিজ্ঞাপন রাতের অন্ধকারে ঝলমল করে। আবার যারা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যায়, তারা নিশ্চয়ই ভুলতে পারে না সেখানকার সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের দৃশ্য। আকাশ লাল দেখে মনে হয়, কে যেন ঘড়া ঘড়া আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। এই রকমের আরো অনেক দৃশ্য নজরে পড়ে। কেন এমন হয়? উত্তর অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে দেবে—এর জন্যে দায়ী আলো। আলোই রঙের জনক। জগতে যত রঙের খেলা সবই এই আলোর ম্যাজিক। তোমরা সকলেই জান সূর্য হচ্ছে আলোর উৎস। এই সূর্য থেকে আলো আসছে ক্রমাগত—এক রকম আলো নয়, সাত রকমের আলো। এটা অবশ্য সূর্যরশ্মির বর্ণালী বিশ্লেষণ করে জানা গেছে। একটি প্রিজমের মধ্য দিয়ে সূর্যরশ্মি চালিত করে প্রিজমটির অপর দিকে পর্দার উপর যে বর্ণালী পাওয়া যায়, তাতে সাতটি দৃশ্যমান রং থাকে। এই সাতটি রং হলো—যথাক্রমে বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল—এক কথায় যাকে ইংরজীতে বলে VIBGYOR। যাই হোক, এই সাতটি আলোক-রশ্মির সংমিশ্রণে সাদা আলোর উৎপত্তি এবং এই আলোক-রশ্মিগুলি হচ্ছে সাত রঙের সৃষ্টিকর্তা। কথাটা উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে; যেমন—ধরা যাক, একটি লাল গোলাপ ফুলের কথা। সূর্যের আলোতে গোলাপটিকে লাল দেখাবে। কেন না, সূর্যের আলোতে আছে সাতটা রং। এখন এই সাত রঙের মধ্যে কেবল মাত্র লাল রং ছাডা বাকী রংগুলিকে ফুল শোষণ করে নেবে—তাই ফুলকে আমরা লাল দেখি। অন্য রঙের বস্তুকেও একই কারণে ঠিক সেই রকম দেখাবে, রঙের কোন পরিবর্তন হবে না। তবে যদি ঐ ফুলটিকে নীল রঙের আলোর মধ্যে রাখা যায়, তাহলে সম্পূর্ণ কালো দেখাবে আর লাল রঙের আলোয় রাখলে আরও লাল অর্থাৎ ঘোর লাল দেখাবে।

এখন বর্ণালীর কথায় আসা যাক। বর্ণালীতে যে সাত রঙের আলোর ছটা থাকে, তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক নয়। কারও বেশী, আবার কারও কম। এদের মধ্যে লালের সবচেয়ে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং বেগুনীর সবচেয়ে কম। সে জন্যে সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের সময় আমরা আকাশ লাল দেখি। লাল আলোর তরঙ্গ বড় বড়। তাই সহজে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর ঠিক একই কারণে আকাশের রং নীল দেখায়। আসলে কিন্তু আকাশ মোটেই নীল নয়। নীল রঙের

আলো বাতাসের অসংখ্য ছোট ছোট ধূলিকণার উপর ধাক্কা খেয়ে চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হয়। সেই আলোক-তরঙ্গগুলি আমাদের চোখে এসে পড়ে। তাই আমরা আকাশকে নীল দেখি।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে, রাতের বেলার বিজ্ঞাপনের জন্যে যে সব আলো ঝলমল করে, তা ঐ রকম রং-বেরঙের হয় কি করে? ঐগুলি সব গ্যাসের আলো। বাঁকানো টিউবগুলির ভিতরে থাকে অল্প চাপের বিভিন্ন রকমের হাল্কা গ্যাস। এই গ্যাসগুলি বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে তড়িৎস্পৃষ্ট হয়ে জ্বলতে থাকে। এক এক প্রকার গ্যাস এক একটি রঙের আলো বিচ্ছুরিত করে; যেমন—ধরা যাক, হিলিয়াম গ্যাসের কথা। হিলিয়াম গ্যাস বিদ্যুৎস্পর্শে—নীল বা বেগুনী রং সৃষ্টি করে, নিয়ন গ্যাস লাল রঙের আলো আর হাইড্রোজেন গ্যাস লাল, সবুজ, নীল, বেগুনী ইত্যাদি যে কোন একটা রঙের আলো সৃষ্টি করে। এটা নির্ভর করে গ্যাসের প্রকৃতি, ঘনত্ব ও চাপের উপর।

প্রসঙ্গতঃ রঙের সংমিশ্রণ-প্রণালীর কথা জানা দরকার। এই সংমিশ্রণ হয় দুই প্রকারের: (১) বর্ণালীর যে কোন দুই বা ততোধিক রঙের আলোর সংমিশ্রণ, (২) একইভাবে দুই বা ততোধিক পিগ্‌মেন্টের সংমিশ্রণ। প্রথম ক্ষেত্রের ফলাফল সংযোজনমূলক; যেমন—নীল আর হলুদ রঙের আলোর সংমিশ্রণের পর যে আলো দেখা যাবে, তাতে দুটি রঙেরই অস্তিত্ব থাকবে। যদি দুটি রং না হয়ে সাদা রঙের আলো দেখা যেত, তবে ঐ রং দুটিকে বলা হতো একটি আর একটির সম্পূরক রং (Complementary colour)। যেমন হলুদ এবং নীল উভয়েই সম্পূরক রং। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিন্তু ফলাফল ঠিক উল্টো অর্থাৎ বিয়োজনমূলক। যেমন সাদা আলো যদি হলুদে পিগ্‌মেন্টের উপর পড়ে, তবে বস্তুটিকে কেবল হলুদে দেখাবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাতে কিছু পরিমাণ লাল এবং সবুজ রঙের অস্তিত্বও থাকবে। কেন না সাদা আলো ঐ পিগ্‌মেন্টে পড়ে তার রংটি ছাড়া আরও কয়েকটি রঙের আলো বিচ্ছুরিত করবে।

সব রঙের খেলার নীরব দর্শক আমাদের এই চোখ, তার কাজ সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। পৃথিবীর সব রকম রং চোখের ভিতরের তিন রকম স্নায়ুর ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই তিন প্রকার স্নায়ুর উত্তেজনাই সব রকম রং দেখবার সহায়ক। সকলেই তোমরা জান, প্রাথমিক রং হিসাবে তিনটি রং ধরা হয়—লাল, নীল ও সবুজ। বর্ণালী এই তিন প্রকার রঙের উপযুক্ত সংমিশ্রণ সমস্ত রকম রং তৈরির সহায়ক। উপরিউক্ত তিন প্রকার স্নায়ু যদি একই সঙ্গে সমপরিমাণে উত্তেজিত হয়, তবে সাদা আলো এবং যদি স্নায়ুগুলি বিভিন্ন পরিমাণে উত্তেজিত হয় তবে রং-যুক্ত আলোর অনুভূতি হয়। এই তত্ত্বটি প্রথম আবিষ্কার করেন ইয়ং এবং পরে

ঐ বিষয়ে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন হেল্‌মহোল্‌ট্‌জ্‌। সে জন্যে তত্ত্বটি ইয়ং-হেল্‌মহোল্‌ট্‌জ্‌ তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই স্নায়ুগুলি মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কেন না, কোন জিনিষের দিকে বেশীক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার পর যদি সাদা দেয়ালের দিকে চোখ রাখা যায়, তবে বস্তুটির একটি সাময়িক চিত্র দেখা যাবে। চিত্রের আকৃতির কোন পরিবর্তন হবে না, তবে রঙের পরিবর্তন হবে। বস্তুটি যদি ঘোর লাল রঙের হয়, তবে ছবিটি সবুজ এবং কিছুটা নীল রংবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ চিত্রের রং সব সময় বস্তুর রঙের সম্পূরক হবে।

এছাড়া আধুনিক কালে আলোর ক্ষেত্রে আরও দুটি অত্যাশ্চর্য জিনিষের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রথমটি রঙীন আলোক চিত্র এবং দ্বিতীয়টি রঙীন টেলিভিসন চিত্র। এর মধ্যে রঙীন টেলিভিসন চিত্র নিয়ে এখনও বেশ গবেষণা চলছে। সম্প্রতি ফ্রান্স এই ব্যাপারে বেশ কিছু এগিয়ে গেছে। এই অগ্রগতির নায়ক হলেন ফ্রান্সের একজন বিজ্ঞানী, নাম তাঁর হাঁরি দ্য ফ্রান্স। তাঁর চেষ্টায় এই চিত্রে রঙীন কাজগুলি ইলেকট্রনিক পদ্ধতির দ্বারা আরও স্পষ্ট এবং নিখুঁত করা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে মনের কাছে আলো আর রঙের আবেদন খুবই চমকপ্রদ। তোমাদের কাছে এক এক সময় এক এক রঙের আলো ভাল লাগে। শিশুদের লাল রং বেশ ভাল লাগে। কিন্তু বড় হলে সাধারণভাবে তার আকর্ষণ কমে আসে বরং কোন কোন সময় ভীতির সঞ্চার করে। মৃদু আলোয় মন বেশ স্থির এবং প্রফুল্ল থাকে। তীব্র আলোয় আমরা সাধারণতঃ বিরক্ত বোধ করি এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। প্রকৃতির সবুজ রঙের দিকে তাকালে বেশ সুন্দর লাগে। মনস্তত্ত্ববিদেরা রঙের এই পছন্দ-অপছন্দ থেকে কোন্ মানুষ কি রকম, তা সহজে বলে দিতে পারেন। পতঙ্গেরাও কিন্তু রং-বেরঙের আলো অল্প-বিস্তর পছন্দ করে—তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ।

আলো আর রঙের বিষয়ে আর একটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করবো। কোন কোন সময় আমরা কিছু লোকের মধ্যে রং-কানা হবার কথা শুনে থাকি। এই রং-কানা ব্যাপারটি কি জান? এই সব লোকেরা রং মেলানো বিষয়ে একেবারে অক্ষম। অক্ষমতার কারণ, তাদের চোখের ভিতরের গঠনের দোষ অর্থাৎ উপরিউক্ত তিন প্রকার স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে যে কোন এক প্রকার স্নায়ুর অনুপস্থিতি অথবা পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা। এই জাতীয় মানুষের কাছে লাল রঙের বস্তু একেবারে কালো বলে প্রতীয়মান হবে।

সুতরাং রঙের রাজ্যে আলোর প্রভাব খুবই ব্যাপক এবং রহস্যময়ও বটে। এই রহস্যের মাত্র কয়েকটি দিকের কথা আলোচনা করা হলো। এছাড়া আরও অনেক দিক আছে, যা তোমরা পরে ক্রমে ক্রমে জানবে।*

শ্রীবিশ্বনাথ বড়াল

---

* কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। দাঁত ক্ষয়ে যায় কেন ?

মণিভূষণ মিত্র, হুগলী।
সফিয়া রহমান মল্লিক, বহরমপুর।

প্রঃ ২। আলোকচিত্রের অবদ্রব কি ভাবে তৈরি হয় ও কাজে লাগাবার উপযুক্ত করা হয় ?

অমল ভট্টাচার্য, যৌবনা দাশগুপ্তা
বাঁকুড়া।
কবিতা সেন, ডলি পাল
২৪ পরগণা।
অনিল গঙ্গোপাধ্যায়, টুটু ঢ্যাঁক
জলপাইগুড়ি।

প্রঃ ৩। পেনিসিলিন সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

বলাই রায়, বাগুইহাটি।
কেতকী সেনগুপ্ত, দার্জিলিং।

উঃ ১। দাঁত ক্ষয়ে যায় কেন ? প্রশ্নটার যথাযথ উত্তর দেবার আগে দাঁতের গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সাধারণভাবে আমরা দাঁতের যে অংশ দেখতে পাই, তাকে বলা হয় ক্রাউন। দাঁতের যে অংশ মাড়ির ভিতর প্রোথিত, তাকে রুট বলা হয়। দাঁতের ক্রাউন অংশ খুব শক্ত। ক্রাউন ও রুটের মধ্যবর্তী অংশকে বলা হয় নেক বা গলদেশ। এনামেল নামক একপ্রকার কঠিন ও মসৃণ আচ্ছাদনে ক্রাউন আবৃত থাকে। নেক ও রুটের আবরণকে বলা হয় সিমেণ্টাম। দাঁতের ডেণ্টিন নামক অপেক্ষাকৃত নরম ও পুরু স্তরকে এই সিমেণ্টাম রক্ষা করে। মাড়ির ভিতরে দাঁত যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কতকগুলি নার্ভ ও রক্তবাহী নালী আছে। এগুলির সাহায্যে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে থাকে। দাঁতের প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট ও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড।

পূর্বে মনে করা হতো যে, দাঁতের এনামেল অ্যাসিডে (খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যে সকল অ্যাসিড পাওয়া যায়) দ্রবীভূত হবার ফলে দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। আমরা যে সব শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি, সেগুলির যে অংশ দাঁতের গায়ে লেগে

থাকে—সেগুলির পচনের ফলে জীবাণুর ক্রিয়ায় বিভিন্ন অ্যাসিড তৈরি হয়। কিন্তু এই জীবাণুগুলি এনামেলের শক্ত আবরণের দ্বারা সুরক্ষিত দাঁতকে কিভাবে আক্রমণ করে? বোডেকার নামক একজন দন্ত-চিকিৎসক সর্বপ্রথম এ-বিষয়ে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর মতানুযায়ী দাঁতের এনামেল ও ডেন্টিন অংশের মধ্যে সংযোগকারী একপ্রকার নল বা জৈব রজ্জু থাকে। এর মাধ্যমেই জীবাণু দাঁতের ভিতরে প্রবেশ করে। যদি আগেকার মতবাদ অনুযায়ী অ্যাসিডের ক্রিয়ায় দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হতো, তাহলে ক্ষয়ের কাজ দাঁতের উপরিভাগ থেকেই সুরু হতো। কারণ এই অংশই প্রথম অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু দেখা গেছে যে, ডেন্টিনের ভিতরেই প্রথম ক্ষয়ের কাজ আরম্ভ হয় এবং ভিতরে ক্ষয়ে-যাওয়া অবস্থাতেও উপরের এনামেল অটুট থাকে। এনামেল খুবই শক্ত। এই কারণে জীবাণু এনামেলের ক্ষতি করতে না পেরে অপেক্ষাকৃত নরম ডেন্টিনের উপর আক্রমণ চালায়। এই রজ্জু মতবাদকেই বর্তমানে অভ্রান্ত বলে ধরা হয়। পরীক্ষার সাহায্যে দেখানো গেছে যে, ক্ষয়প্রাপ্ত এনামেলের তুলনায় অক্ষত এনামেলের অ্যাসিডে দ্রবীভূত হবার ক্ষমতা বেশী। ক্ষয়প্রাপ্ত এনামেলগুলি জীবাণুদেহের সংস্পর্শে আসে। জীবাণুর দেহ যে প্রোটিন জাতীয় উপাদানে তৈরি, তা অ্যাসিডের ক্রিয়াকে নষ্ট করে দেয়। এই কারণেই ক্ষয়প্রাপ্ত এনামেল অ্যাসিডের সংস্পর্শে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমাদের প্রত্যেকের দাঁতেই এই রকম জীবাণু প্রবেশ করবার পথ হিসাবে দন্তরজ্জু বা ল্যামেলি আছে। কাজেই আমাদের সকলেরই দাঁত ক্ষয়ে যাবার কথা। মনে করা হয় যে, মুখনিঃসৃত লালা এই জীবাণুগুলির প্রবেশ পথের সামনে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম লবণের একটা জমাট আবরণ তৈরি করে। এর ফলে দাঁতের ভিতরে জীবাণুর প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে যায়। মুখনিঃসৃত লালার এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফলে যাদের এই আবরণ তৈরি হয় না, তারা দন্তরোগে আক্রান্ত হয়। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে এই ধরণের আবরণ তৈরি করে দন্ত রোগের চিকিৎসা করা হচ্ছে।

উঃ ২। কোন বস্তুর উপর আলোর সাহায্যে প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলবার জন্যে একটা মাধ্যমের দরকার হয়। সাধারণতঃ এই সকল মাধ্যম বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে তৈরি। আলোকচিত্রে ব্যবহৃত মাধ্যমকে অবদ্রব বা ইমালসন বলা হয়।

অবদ্রব হচ্ছে বিভিন্ন এমন তরলের মিশ্রণ, যাতে ঐ তরলগুলির পৃথক সত্তাও বজায় থাকে। আলোকচিত্র গ্রহণে যে অবদ্রব ব্যবহার করা হয়, সেটা কিন্তু বিভিন্ন তরলের মিশ্রণ নয়। এই অবদ্রব কঠিন ও তরল পদার্থের মিশ্রণ। কাজেই অবদ্রবের সংজ্ঞা থেকে আমরা দেখি, বিজ্ঞান-সম্মতভাবে আলোকচিত্র গ্রহণে ব্যবহৃত মাধ্যমকে অবদ্রব আখ্যা দেওয়া ঠিক হয় নি। কিন্তু প্রথম থেকে চলে আসছে বলে এই নামই থেকে গেছে।

ধাতুর সঙ্গে ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিনের সংযোগে যে সকল যৌগিক পদার্থ গঠিত হয়, তাদের ধাতব হ্যালাইড বলা হয়। সিলভার হ্যালাইড অর্থাৎ সিলভার ক্লোরাইড, সিলভার ফ্লোরাইড, সিলভার ব্রোমাইড ও সিলভার আয়োডাইড আলোর সংস্পর্শে এলে এদের স্বাভাবিক রং (যেমন—সিলভার ব্রোমাইড হাল্কা হলুদ, সিলভার আয়োডাইড গাঢ় হলুদ ইত্যাদি) পাল্টে গিয়ে ক্রমশঃ কালো রঙে পরিবর্তিত হয়।

আলোকচিত্র আবিষ্কারের প্রথম যুগে সিলভারের সঙ্গে সাধারণ প্রক্রিয়ায় হ্যালোজেন সংযুক্ত করা যেত না। পরে অবশ্য পরীক্ষার সাহায্য জানা গেল যে, অ্যাসিড মাধ্যমে এরা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে সিলভার হ্যালাইড গঠন করে। নাইট্রিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় উত্তপ্ত সিলভার, সিলভার নাইট্রেটে পরিণত হয়। এই সিলভার নাইট্রেটই আলোকচিত্র গঠনের প্রধান রাসায়নিক উপাদান। এর সঙ্গে পটাসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি ক্ষারধর্মী হ্যালোজেনের যৌগিক মিশ্রণে আলোক-অনুভূতিসম্পন্ন সিলভার হ্যালাইড্‌স্‌ তৈরি হয়। এই যৌগিকের হ্যালাইড অংশ জলে অদ্রবণীয় বলে এর সাহায্যে মসৃণ প্রলেপ দেওয়া আগে সম্ভব হতো না। কোন বস্তুর উপর অ্যালবুমেন মাখিয়ে পরে সিলভার হ্যালাইডের প্রলেপ দিয়ে কোন রকমে আলোক-চিত্রের কাজে লাগানো হতো। জিলাটিনের ব্যবহার আবিষ্কারের পর এই অসুবিধা দূর হয়ে যায়। জিলাটিন প্রয়োগে সিলভার লবণের আলোর প্রবণতাও বেড়ে গেল। ময়দার লেই তৈরি করবার মত জিলাটিনকে জল দিয়ে গরম করলে আঠালো হয়। এই অবস্থাতে হ্যালাইড অংশ যোগ করলে জিলাটিন ও হ্যালাইড পরস্পর মিশে যায়। এবার জিলাটিন হ্যালাইড দ্রবণের সঙ্গে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণকে এক জায়গায় রেখে গরম করা হয়। দ্রাবক হিসাবে থাকে জল। কিছুক্ষণ নির্দিষ্ট তাপে গরম করলে এরা মিশে যায়। এই প্রক্রিয়ায় দ্রবণের আলোক-অনুভূতি শক্তি বেশ বেড়ে যায়। তাই নিরাপদ আলোতে এই সব প্রক্রিয়া চালানো হয়। যে পরিমাণ জিলাটিনে দ্রবণটা ঠাণ্ডা হলে শক্ত হয়ে যায়, ঠিক ততখানি জিলাটিন প্রথমে এই প্রক্রিয়াতে নেওয়া হয়। এই শক্ত পদার্থটার মধ্যে ক্ষারধর্মী কিছু অপ্রয়োজনীয় পদার্থ থাকে। এগুলিকে তাড়াবার জন্যে শক্ত পদার্থটাকে কাপড়ের থলিতে ভরে জলের স্রোতে ধোওয়া হয়। এর পর পদার্থটাকে গরম করে আলোক-গ্রহণের শক্তির মাত্রা ঠিক করা হয়। এটাই হচ্ছে আলোকচিত্রের প্রধান অবদ্রব বা ইমালশন। বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ মিশিয়ে এই অবদ্রবে নির্দিষ্ট রঙের আলো-গ্রহণ ক্ষমতার মাত্রাও ঠিক করা হয়। নানা ধরণের ও বিভিন্ন শক্তির অবদ্রব তৈরি করবার সময় বিভিন্ন উপাদান ও তাপমাত্রা নির্দিষ্ট থাকে। তৈরির পর অবদ্রবকে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা হয় এবং পরে ব্যবহারের সময় গলিয়ে নেওয়া হয়।

যখন কোন বস্তুর উপর অবদ্রব মাখানো হয়, তখন ফেনা হয়। এই ফেনা বন্ধ করবার জন্যে অবদ্রবে অ্যালকোহল মেশানো হয়। কখনও কখনও নরম কাগজে অবদ্রবের প্রলেপ লাগাবার পর উঁচু-নীচু হয়ে যায়। এই কারণে প্রথমে জিলাটিন ও বেরিয়াম সালফেট দ্রবণের সাহায্যে কাগজকে শক্ত করে নেওয়া হয়। সাধারণতঃ কাচ, কাগজ ও সেলুলয়েডের উপর অবদ্রবের প্রলেপ মাখিয়ে যথাক্রমে আলোক-চিত্রের প্লেট, পেপার ও ফিল্ম তৈরি হয়। এদের মধ্যে কাচ ও সেলুলয়েড স্বচ্ছ। আলোকরশ্মি এদের উপরকার অবদ্রবের স্তর ভেদ করে অপর পৃষ্ঠে যায় এবং সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় অবদ্রবের মধ্যে দিয়ে ফিরে আসে। এতে নানা ধরণের অনাবশ্যক ক্রিয়া হয়। তাই এই প্রতিফলন বন্ধ করবার জন্যে অবদ্রবের অপর পৃষ্ঠে বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থের প্রলেপ দেওয়া হয়। একে বলা হয় ব্যাকিং।

অবদ্রবের প্রলেপ শুষ্ক হয়ে গেলে পাতলা সেলুলয়েড একদিকে বেঁকে গুটিয়ে যায়। এই বেঁকে-যাওয়া সেলুলয়েড বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের অসুবিধার সৃষ্টি করে। দু-দিকের সমতা ঠিক রাখবার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এক্স-রে ফিল্মে দু-দিকে একই রকম অবদ্রব লাগানো হয়, ফলে প্রলেপ মাখাবার পর শুকনো হলে বেঁকে যায় না।

উঃ ৩। দৈনন্দিন জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিষের মত পেনিসিলিনও আমাদের নিকট খুবই পরিচিত। ১৯২৯ সালে লণ্ডনে সেণ্ট মেরী হাসপাতালে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং এই ওষুধ আবিষ্কার করেন। ঐ সময় ফ্লেমিং জেলিজাতীয় কৃত্রিম মাধ্যমে স্ট্যাফাইলোকক্কাস রোগ-জীবাণুর জন্ম ও পরিণতি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি দেখেন যে, পরীক্ষা-পাত্রে রোগ-জীবাণু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছু ছত্রাকও জন্মেছে। শুধু তাই নয়, যেখানে যেখানে ছত্রাক জন্মেছে, তার চারদিকে জীবাণুর বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে তিনি জানলেন যে, ছত্রাকটির বৈজ্ঞানিক নাম পেনিসিলিয়াম নোটাটাম এবং বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় ছত্রাক নিজ দেহ থেকে একপ্রকার বিষ নিঃসৃত করে, যা স্ট্যাফাইলোকক্কাস ইত্যাদি বহু রোগ জীবাণুর বৃদ্ধি দমন করে। ফ্লেমিং এই নিঃসৃত বস্তুটির নাম দেন পেনিসিলিন। এর পর থেকেই বিভিন্ন গবেষণাগারে পেনিসিলিন উৎপাদন, পেনিসিলিনের জীবাণু ধ্বংসী গুণাগুণ বিচার, ছত্রাক থেকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পেনিসিলিন পৃথক করবার উপায় আবিষ্কৃত হবার ফলে বিরাট সাড়া পড়ে গেল এবং তাতে খুব শীঘ্রই আশাপ্রদ সাফল্য লাভ করা গেল।

সাধারণতঃ জীবাণুকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়, গ্র্যাম-পজিটিভ ও গ্র্যাম-নেগেটিভ। যে সকল জীবাণুর গায়ে প্রাথমিক রং ধরিয়ে আয়োডিন মাখাবার পর অ্যালকোহলের সংস্পর্শে আনলে রং অবিকৃত থাকে, তাদের বলা হয় গ্র্যাম-পজিটিভ। বিপরীতক্রমে

যাদের রং বিকৃত হয়, তাদের বলা হয় গ্র্যাম-নেগেটিভ। দেখা গেছে যে, গ্র্যাম-পজিটিভ জীবাণুর উপর পেনিসিলিনের প্রভাব সক্রিয়, কিন্তু গ্র্যাম-নেগেটিভ জীবাণুর উপর এর কোন প্রভাব নেই। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও আছে।

হৃৎপিণ্ডের রোগে, যেমন—এণ্ডোকারডাইটিস, পেরিকারডাইটিস, ব্যাক্টিরিমিয়া ইত্যাদি রোগে পেনিসিলিন ব্যবহার বিশেষ উপকারী। স্নায়ুচক্রের রোগে, যেমন—ম্যানিনজাইটিস এবং মস্তিষ্কের আঘাত বা ফোড়া, শরীরের কোন নালীপথের ঘা, চর্মরোগ, মূত্রযন্ত্র ও মূত্রাশয়ের রোগ এবং আরও বহুবিধ রোগের ক্ষেত্রে পেনিসিলিন মহৌষধ। এছাড়াও সোজাসুজি পেনিসিলিন প্রয়োগে যে সকল রোগের উপশম হয় না, সে সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ওষুধ পেনিসিলিনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়।

পেনিসিলিন ব্যবহারের চেয়ে উৎপাদন সমস্যাই জটিল। পৃথিবীতে এর ব্যবহার খুবই বেশী, তাই সে তুলনায় উৎপাদনের সমতার দিকটাও লক্ষ্য রাখা দরকার। বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পেনিসিলিয়াম নোটাটাম ছত্রাকের চাষ করা হচ্ছে এবং ছত্রাক থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে পেনিসিলিন সংগ্রহ করা হচ্ছে।

বিভিন্ন পশু-পক্ষীর চিকিৎসাতেও আজকাল পেনিসিলিনের ব্যবহার খুবই প্রচলিত। ইনজেকসন, বড়ি, ক্যাপসুল, মলম—এমন কি, গ্যাসীয় আকারেও পেনিসিলিনের ব্যবহার চলছে। হিলিয়ামের সঙ্গে পেনিসিলিন মিশিয়ে বিজ্ঞানীরা এক নতুন রকমের গ্যাসীয় পেনিসিলিন আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন, যার সাহায্যে নানা দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা হচ্ছে। পেনিসিলিন প্রয়োগ পূর্ণমাত্রায় করে জীবাণুকে একেবারে নির্মূল না করলে অনেক রোগ-জীবাণু ক্রমশঃ পেনিসিলিন প্রতিরোধ শক্তি লাভ করে, তখন বেশী প্রয়োগেও ফল পাওয়া যায় না।

পেনিসিলিন বহু জটিল রোগের চিকিৎসায় যুগান্তর এনে দিয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই অজস্র রোগী আজ এর ব্যবহারের ফলে রোগমুক্ত হচ্ছে।

শ্রীশ্যামসুন্দর দে

বিবিধ

চন্দ্রপুরা তাপ-বিদ্যুৎ কারখানা

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ৭ই জুলাই (১৯৬৮) চন্দ্রপুরায় অবস্থিত ভারতের বৃহত্তম তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তৃতীয় জেনারেটরটির উদ্বোধন করেছেন।

পূর্ব ভারতে চন্দ্রপুরার একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। ৪ লক্ষ ২০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ এখানে উৎপন্ন হয়।

ভারতের তিনটি বৃহত্তম টারবো-জেনারেটরই রয়েছে চন্দ্রপুরায়। প্রত্যেকটি জেনারেটরই ১ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। প্রথম জেনারেটরটি কাজ আরম্ভ করেছিল ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে এবং দ্বিতীয়টি ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে।

বিহারের হাজারীবাগ জেলায় চন্দ্রপুরা রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণে দামোদর নদের উত্তর তীরে ১৮০০ একর জমির উপর এই তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত। মার্কিন সরকার চন্দ্রপুরায় বিদেশী মুদ্রার খরচ বাবদ ৪ কোটি ১৩ লক্ষ ডলার বা ৩০ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছেন।

চন্দ্রপুরার বিদ্যুৎ উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অনেকগুলি কারখানা তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। অনেকগুলি কয়লা খনির যান্ত্রিকীকরণ সম্ভব হয়েছে।

চন্দ্রপুরায় উৎপন্ন বিদ্যুতের সাহায্যে কলিকাতা থেকে মোগলসরাই পর্যন্ত রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ সম্ভব হয়েছে।

চন্দ্রপুরায় তিনটি জেনারেটর পুরাদমে কাজ সুরু করলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে, তাতে প্রায় এক কোটি বাড়ীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে অথবা এক লক্ষ পাম্প সেট চালু করতে পারবে এবং প্রতিটি পাম্প ১০ একর জমিতে জলসেচন করতে পারবে।

পরলোকে অটো হান

এ. এফ. পি. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পরমাণু-বিজ্ঞানীদের অন্যতম অধ্যাপক অটো হান নিউমোনিয়ায় ভুগে গোয়েটিঙ্গেনে (দক্ষিণ স্যাকসনি) ২৮শে জুলাই পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

অধ্যাপক হানের জন্ম হয়েছিল ফ্রাঙ্কফুর্টে। মন্ট্রিলে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের অধীনে তিনি পড়াশুনা ও গবেষণা করেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি নতুন এক তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করে খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৩৮ সালে হান পরমাণুর বিভাজন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, কিন্তু জার্মেনী তখন পরমাণু বোমা তৈরি করতে পারে নি, কারণ অর্থাভাবে ১৯৪২ সালে এই সম্পর্কে গবেষণা বন্ধ রাখা হয়। এদিকে অধ্যাপক হান নতুন নতুন কণিকা আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেন।

১৯৪৫ সালে তাঁকে রসায়নের ক্ষেত্রে মূল্যবান আবিষ্কারের জন্যে ১৯৪৪ সালের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

অধ্যাপক হান ছিলেন মনেপ্রাণে শান্তিবাদী। ১৯৫৭ সালে তিনি এবং আরও ১৭ জন পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানী পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধকরণের আহ্বান জানান।

শোক-সংবাদ

ডক্টর হরিদাস বাগচি

গত ৩রা মে খ্যাতনামা গণিতবিদ ডক্টর হরিদাস বাগচি ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই রাজসাহী সহরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ছিলেন ৺ব্রজগোপাল বাগচি মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। তিনি মাত্র নয় বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া ১৯০৬ সালে রাজসাহী কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে গণিতের অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ঐ একই বৎসরে তিনি গণিতে (গ্রুপ-এ) এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন (এই গণিত গ্রুপ-এ পরবর্তী-কালে বিশুদ্ধ গণিত নামে পরিচিত হয়)। ছয় মাস পরে গণিতে (গ্রুপ-বি) এম. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় সেইবার তিনিই ছিলেন একমাত্র সফলকাম পরীক্ষার্থী। এই গণিত (গ্রুপ-বি) পরবর্তী কালে মিশ্র গণিত এবং অধুনা ফলিত গণিত নামে পরিচিত।

১৯১০ সালে তিনি শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অস্থায়ী গণিত অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ঐ বৎসরই তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন এবং গৌহাটি কটন কলেজে গণিতের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৯১২ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি পান। ১৯১২ সালে জুলাই মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বিশুদ্ধ গণিতের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা করে উদ্যোগী সার আশুতোষের আহ্বানে ডক্টর বাগচি গৌহাটির সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ গণিত বিভাগে লেকচারাররূপে যোগদান করেন। দীর্ঘকাল এই পদে থাকিয়া ১৯৫১ সালে তিনি উচ্চতর গণিতের হার্ডিঞ্জ অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালের শেষে তিনি এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি ছাত্রদের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতিশীল অধ্যাপক ছিলেন এবং ছাত্রদের কাছে সবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহার ছিল খুব বিনীত এবং অমায়িক।

তিনি গণিতের বিভিন্ন শাখায় বহু গবেষণা-পত্র প্রকাশ করিয়া স্বীয় মেধার পরিচয় প্রদান করেন। ১৯২৬ সালে তাঁহার 'Course of Geometrical Analysis' নামক বইখানি প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুকালে তিনি সহধর্মিণী, চারি পুত্র, চারি কন্যা, গুণমুগ্ধ অগণিত ছাত্র ও বন্ধু রাখিয়া গিয়াছেন।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরী
বুনিয়াদী কৃষি বিভাগ
স্নাতকোত্তর শিক্ষণ বিদ্যালয়
আগরতলা, ত্রিপুরা

২। শ্রীসুবিমল সিংহরায়
২, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড
বেহালা, কলিকাতা-৩৪

৩। আব্দুল হক খন্দকার
East Regional Labs.
P. C. S. I. R.
Dhanmandi
Dacca-2
East Pakistan

৪। কৃবিকা কর
৮, বৃন্দাবন বসু লেন
কলিকাতা-৬

৫। শ্রীসমীরকুমার রায়
১০৮।৬, নগেন্দ্রনাথ রোড
কলিকাতা-২৮

৬। রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৫।৪, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা-১৯

৭। শ্রীতিসাধন বসু
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

৮। শ্রীবিশ্বনাথ বড়াল
(ধারাপাড়া)
পোঃ চন্দননগর, হুগলী

৯। শ্রীসমর চক্রবর্তী
(জীববিজ্ঞান বিভাগ)
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া

১০। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ ;
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একবিংশ বর্ষ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৬৮ নবম-দশম সংখ্যা

নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র গত দুই বৎসরের শারদীয় সংখ্যা সরকার ও জনসাধারণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইবার ফলে এবারও আমরা পত্রিকাটির শারদীয় সংখ্যা প্রকাশে অনুপ্রাণিত হইয়াছি। অধিকন্তু সম্প্রতি পরলোকগত বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক অটো হান এবং লেভ ল্যাণ্ডাউ-এর অবিস্মরণীয় স্মৃতির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা নিবেদনও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

পত্রিকার নিয়মিত সংখ্যাগুলির মধ্যে এইরূপ একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট আর্থিক দায়িত্ব বহন করিতে হইবে, ইহা জানিয়াও অন্যান্য বারের মত সরকার এবং বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের সাহায্য এবং সহানুভূতি লাভের ভরসা করিয়াই বর্তমান বৎসরের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যা দুইটিকে একত্রে শারদীয় সংখ্যারূপে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে সাহসী হইয়াছি।

এই সংখ্যাটিতে অধ্যাপক অটো হান এবং ল্যাণ্ডাউ-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ব্যতীতও পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, কৃষিবিদ্যা, চিকিৎসা-বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এবং সহর কলিকাতার জল-নিষ্কাশন সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে কিশোর বিজ্ঞানীদের জন্য আকর্ষণীয় প্রবন্ধাদি এবং ধাঁধা প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে।

এই সংখ্যাটি বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

অটো হান স্মরণে

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সন্ধ্যার রেডিওতে খবর শুনেছি—২৮শে জুলাই সকালে অটো হান মারা গেছেন, জার্মেনীতে গোটিংগেন সহরের এক হাসপাতালে।

নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণু দু-টুকরা হয়ে ভেঙ্গে যায়, ১৯৩৯ সালে পাঁচ বছর গবেষণার পর এটি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করলেন হান ও ষ্ট্রাস্‌মান। অল্পপরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হলো। জার্মেনীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ মিত্রশক্তি। শেষে জার্মেনীর হার হলো। তবে পরমাণু বিভাজনে বোমা তৈরি হলো কিন্তু আমেরিকায়। শেষ অবধি এই বোমা পড়লো জাপানে, নিরস্ত্র নিরীহ লক্ষ লোক প্রাণ হারালো হিরোশিমা ও নাগাসাকীতে। সারা জগতে আতঙ্ক ও বিভীষিকার শিহরণ জাগিয়ে সভ্যতার ইতিহাসের নবযুগের সূচনা হলো ১৯৪৫ সালের অগাষ্ট মাসে।

* * *

বহুদিন আগের পুরনো কথা মনে পড়ছে। '২৫ সালে জার্মেনী পৌঁচেছি। ঢাকা থেকে পারী ঘুরে বার্লিন। এদিকে দেশ থেকে পাঠানো আমার বিজ্ঞানের প্রবন্ধ জার্মান ভাষায় তর্জমা হয়ে সবে ছাপা হয়েছে। বিজ্ঞানীমহলে আলোচনা সুরু হয়েছে সেই নিয়ে। প্রোফেসর আইনষ্টাইন ভাল বলেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর সুপারিশ পত্রের দৌলতে সর্বত্র সব গবেষণাগারেই প্রবেশের অনুমতি সহজেই মিলছে।

কয়েক বছর আগে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম সারা দেশের শিল্পপতিদের কাছে অর্থসাহায্য নিয়ে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে গবেষণাকেন্দ্র খুলেছিলেন।

বার্লিনের উপকণ্ঠে ডাহলেম। কাইজার উইলিয়াম-সংস্থা এখানে পাশাপাশি কয়েকটি বিখ্যাত গবেষণাগার স্থাপন করেছিলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে সেগুলি প্রসিদ্ধ ও দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে রয়েছে সব বিজ্ঞানীর কাছে। প্রোফে. হাবর (Haber) এখানেই নাইট্রোজেন গ্যাসকে অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত করে ধরে রাখবার উপায় উদ্ভাবন করে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। জার্মেনীর কারখানায় এইভাবে প্রচুর অ্যামোনিয়া তৈরি হতো প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই। অ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রিক অ্যাসিড, তাথেকে নানা বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি হবার সম্ভাবনা। লোকে বলে, এর উপর ভরসা রেখেই প্রবল নৌবহরের মালিক ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মেনী যুদ্ধে এগিয়েছিল।

হাবরের ভৌতরাসায়নিক কেন্দ্রের পাশে দেখলাম প্রকাণ্ড অট্টালিকা, এখানে তেজস্ক্রিয়তা ও পরমাণুর বিকিরণ সম্পর্কে নানারূপ পরীক্ষা চালাচ্ছেন হান ও মাইটনার। মাত্র ২ বছরে নবতম বিজ্ঞানের যা কিছু শেখা যায়—পরে তা দেশে প্রচার করা যাবে—এই মৎলবেই নানা দেশ ঘোরা ও বিজ্ঞানের লেবরেটরীতে কাজ করবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমার। তাই কয়েকবার হান ও মাইটনারের পরীক্ষাগারেও ঢুকেছিলাম।

হান তখনই নানা নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলিকের আবিষ্কার করে যশস্বী হয়েছিলেন। আরম্ভ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব রসায়ন নিয়ে গবেষণা। এতে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। কিছু দিন অধ্যাপকের সহকারী হিসাবে কাজ করে তাঁরই পরামর্শে ইংল্যাণ্ডে যান ১৯০৫ সালে। তখন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভাষা শিক্ষা, পরে
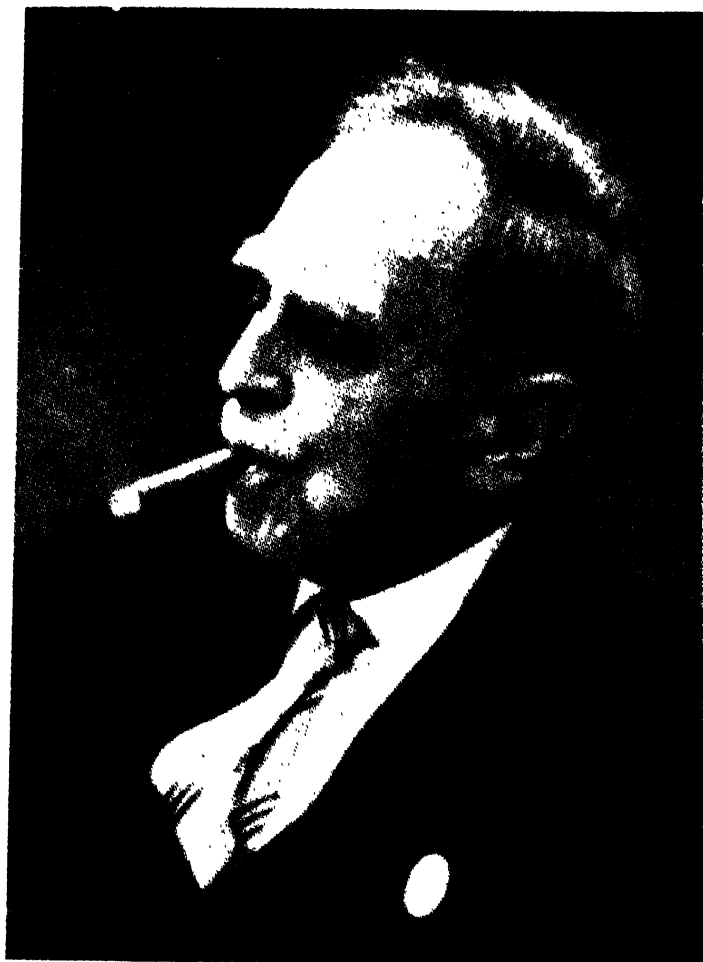
অটো হান

জন্ম—৮ই মার্চ, ১৮৭৯ — মৃত্যু—২৮শে জুলাই, ১৯৬৮

(ফ্রাঙ্কফুর্ট) — (গোটিংগেন)

কোন রাসায়নিক শিল্পসংস্থায় ঢুকবেন। তখন জার্মেনীতে নানাদিকে দ্রুত কলকারখানা গড়ে উঠছে, তবে ইংল্যাণ্ড তখন আদর্শ ও সব বিষয়ে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চায় জার্মেনী। তাই ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দরকার বিজ্ঞানীর। হান গিয়েছিলেন র‍্যামজের (Ramsay) কাছে। এদিকে জোয়াকিমস্থালের (Joachim-sthal) আকর থেকে ম্যাডাম কুরীর রেডিয়াম আবিষ্কারের ফলে ১৯০৩ সালের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কুরী দম্পতী। তাই সব দেশেই রেডিয়াম নিয়ে কাজ চলেছিল তখন।

সিংহলদেশের আকরে পাওয়া থোরিয়ানাইট—তাথেকে নিষ্কাশিত তেজস্ক্রিয় মিশ্র পদার্থ ছিল র‍্যামজের কাছে। হানের উপর ভার পড়েছিল—তাথেকে বিশুদ্ধ অবস্থায় রেডিয়ামের যৌগিক বের করা। হান কিন্তু পেয়ে গেলেন রেডিয়াম ছাড়া সম্পূর্ণ নতুন একটি তেজস্ক্রিয় মৌলিকের সন্ধান—রেডিও-থোরিয়াম আবিষ্কার করলেন। এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যে হানের জীবনের গতি পরিবর্তিত হলো। শিল্পচর্চার পরিবর্তে তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণা করে সারা-জীবন কাটাবেন ঠিক করলেন। র‍্যামজের প্রশংসা—সুযশ ও সুপারিশ নিয়ে গেলেন ক্যানাডায় রাদারফোর্ডের কাছে। অল্পবয়স্ক বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড নতুন কথা বলে বিস্মিত করেছেন, তেজস্ক্রিয়তার ধর্ম সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা বলছেন, α-β-γ রশ্মির কথা। এর মধ্যে আবার প্রথম দুটি যে বিদ্যুৎ-আহিত জড় কণার বিকিরণ, চুম্বকের সাহায্যে তাও প্রমাণ করেছেন রাদারফোর্ড। এইখান থেকে উৎসাহ পেয়ে হান ফিরে এলেন দেশে। জার্মেনীতে তখনও তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজ আরম্ভ হয় নি। তবে বিখ্যাত বিজ্ঞানী এমিল ফিসার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন রসায়নের প্রধান অধ্যাপক। হানের অসামান্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রকাণ্ড ইনস্টিটিউটের নীচের ঘরে এক কোণে তাঁরই খোদ সহকারী হিসাবে কাজ দিলেন। এই ঘরে এক সময়ে কাঠের কাজ হতো, কোন আসবাব ছিল না। তবে অল্পে অল্পে গড়ে উঠলো সব। হান নিজের হাতে Electroscope তৈরি করলেন, গন্ধকের ছিপির পরিবর্তে অ্যাম্বারের গুলি চালালেন। এই সামান্য পরিবেশ থেকে কিছুদিন বাদেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন মেসোথোরিয়াম আবিষ্কার করে—২।৩ বছরের মধ্যে নতুন দুটি মৌলিক তেজস্ক্রিয় উপাদান। এবার বার্লিনে তেজস্ক্রিয়তা শিক্ষার চলন হলো—হান বক্তৃতা দেবার অনুমতি পেলেন, প্রিভাট-ডোৎ-সেন্ট-বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ অধ্যাপকের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা হলো। ১৯০৭-'০৮ সালেই বিজ্ঞান চর্চায় উপযুক্ত সঙ্গিনী পেয়েছিলেন লিজে মাইটনারকে। একবয়সী ইনি, ভিয়েনার ইহুদী পরিবারে জন্ম। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী পেয়ে বার্লিনে এসেছিলেন প্লাঙ্কের কাছে নব্যবিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে। তেজস্ক্রিয়তা তাঁকে আকর্ষণ করলো।

আলাপ-পরিচয় হবার পর হানের গবেষণাগারে কাজ করবার মনস্থ করলেন মাইটনার। সে যুগে ১৯০৭-'০৮ সালে জার্মেনীর, বিশেষ করে প্রশিয়ার সামাজিক আবহাওয়া নিতান্ত প্রাচীন কেতার ছিল। প্রোফেসর ফিসার এই মহিলার সহযোগিতায় আপত্তি করলেন না—তবে তাঁর নির্দেশ মত ইনস্টিটিউটের যে সব ঘরে ছাত্রেরা কাজ করছে, সেখানে মিস মাইটনার কখনও যেতেন না। নীচের তলায় অল্পপরিসর ঘরের মধ্যে কাজ সুরু করেছিলেন—তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে নানা গবেষণা এই খানেই সুরু। মাইটনার ছিলেন অদ্ভুত প্রতিভা-শালিনী মহিলা—দু-জনের নিবিড় সাহচর্যে জার্মেনীতে তেজস্ক্রিয়-বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হলো। আমি যখন গিয়ে পৌঁচেছি '২৫ সালের শীতকালে, তখন স্বল্প পরিবেশের পরিবর্তে হান ও মাইটনার

চলে এসেছেন ডাহলেমের প্রকাণ্ড রাসায়নিক গবেষণা-কেন্দ্রে, দু-জনে মিলে আরও একটি তেজস্ক্রিয় আদিম উপাদান আবিষ্কার করেছেন—প্রোটো-অ্যাক্টিনিয়াম। হান পরিহাস করে বলতেন, তিনি একজন কিমিয়াবিদ মাত্র, জগৎ তো এখন পদার্থ-বিজ্ঞানীর আয়ত্তে। প্লাঙ্ক ও আইনষ্টাইন জার্মেনীর গগনে তখন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, তাছাড়া লাউয়ে, হার্ৎসগ, হাবর। ডাহলেম তখন বিজ্ঞানতীর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার ঝোঁক পড়লো, X-রশ্মির সাহায্যে কেলাসিত জড়ের গঠন-বৈচিত্র্য কি ভাবে উদ্ঘাটিত হচ্ছে, তারই রহস্য আয়ত্ত করবো। জুটে গেলাম তাই ডাহলেমের অন্য বিজ্ঞানাগারে—সেখানে পোলানির সঙ্গে সাহচর্য রেখে X-রশ্মি দিয়ে গঠন বিশ্লেষণের কাজ চলছিল। তাই প্রত্যহ ডাহলেমে যেতাম, মাঝে মাঝে মাইটনার-হানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো। বিদেশী ভারতীয় তখন সকলের পরিচিত, হানের ছোট ছেলের সঙ্গে বোসখুড়োর পরিচয় করে দিয়েছেন মাইটনার।

* * *

জনাব জাকির হোসেন আজকে ভারতের রাষ্ট্রপতি। সেই সময় ডক্টরেট উপাধি পেয়ে তিনি বার্লিন ছাড়বার উদ্যোগ করছেন—দেশে ফিরে আসবেন। ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে বিদায় ভোজের আয়োজন করেছে Unter-den Linden-এর বিখ্যাত এক ভোজনাগারে। বহু বিখ্যাত অধ্যাপক ও রাজনীতিবিদেরা এসেছিলেন—তাঁদের মধ্যে হান, মাইটনার, হাবর, ল্যাডরস আরও অনেকে—বীরেন চট্টোপাধ্যায়, তারক দাস ও আরও কত ভারতীয়ের নাম করবো! অনেকেই আর ইহজগতে নেই—তবে সেই সময়ের তোলা ছবি একখানা দেখে পুরনো অনেক কথা মনে পড়ে।

* * *

দেশে ফিরেছি ১৯২৬ এর শেষ দিকে। পেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ। ওদেশে শেখা X-ray দিয়ে বিশ্লেষণের কাজ চালু করেছি ঢাকায়। সেই সময় থেকে এই বিশেষ বিদ্যার চল হলো ভারতে। এখন নানা প্রদেশেও ওই বিশেষভাবে কেলাসিত নানা যৌগিকের গঠন-বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ চলেছে। এই বিষয়ে ভারতীয়েরা কিছু সাফল্যও অর্জন করেছে।

* * *

দেশে ফিরে এসে নিজের কাজ ও বিজ্ঞানের খবর পাই দেশ-বিদেশের। ১৯৩৩ সালে জার্মেনীতে নাৎসী-অভ্যুত্থান, সুরু হলো ইহুদীদের উপর নানা অত্যাচার। হিন্‌ডেনবার্গ প্রেসিডেন্ট, হিটলার দেশনায়ক। বিকট আর্যামি সুরু হয়ে গেল। আমার জানাশোনা বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী, সেমেটিক-রক্তের মিশ্রণ ধমনীতে আছে বলে স্বদেশ ছেড়ে গেলেন। ফ্রাঙ্ক, আইনষ্টাইন, বর্‌ণ্‌, এ-ভাল্‌ড, ৎ-সিলার, মার্ক—এঁদের সকলের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা ছিল আমার। আর্যামি জার্মেনীকে পেয়ে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে সারা জার্মেনীতে কালো কামিজপরা স্বেচ্ছাসেবীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সারা জায়গার শাসনযন্ত্র কেড়ে নিয়ে আঁকড়ে রইলেন। এই ঢেউ জার্মেনী ছাপিয়ে গেল—১৯৩৮ সালে অষ্ট্রিয়াও এলো নাৎসীদের দখলে। বিদেশ থেকে চিঠিপত্র আসা বন্ধ হয়ে গেল। ইউরোপের খবর সব রহস্যময় যবনিকার আড়ালে ঢাকা পড়লো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল।

* * *

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে রুদ্রের তাণ্ডবলীলা চললো কিছু কাল। বাংলা দেশেও এর ঢেউ লেগেছিল। পরে এলো শান্তি। ১৯৪৫ সালে ঢাকা ছেড়ে চলে এসেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভারত স্বাধীন হয়েছে। তার পরে ১৯৫১ সালে ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে প্রথম ইউরোপ যাবার সুযোগ ঘটলো।

সেবার পারী ও ইংল্যাণ্ড ঘুরে ফিরে এলাম, সুখ-দুঃখ মেশানো নানা স্মৃতি নিয়ে। জার্মেনী যাওয়া ঘটে উঠলো না। পরের বছর ফরাসী দেশের কেন্দ্রীয় গবেষণা-সংস্থার কল্যাণে আবার ইউরোপে যাবার সুযোগ ঘটলো। পারীর কাজ সেরে বেরিয়ে পড়লাম দেশভ্রমণে—জার্মেনীর হাইডেলবার্গ সহরে পৌঁছলাম। সেখানে প্রোফেসর বো-তে-র কাছে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে কাজ করতেন শ্রীশ্যামাদাস। ১৯২৫ সালে বো-তের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তখন তিনি প্রোফেসর গাইগারের সঙ্গে বার্লিনে Reichs-anstalt-এ কাজ করতেন। সেই প্রথম পরিচয় পরে বন্ধুত্বে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে কলকাতায় সায়েন্স কংগ্রেসে বো-তে (Bothe) জার্মেনী থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। একসঙ্গে কয়েক দিন ঘুরে দ্রষ্টব্য অনেক স্থানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। ১৯৫২ সালে জার্মেনীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে—বো-তে হাইডেলবার্গে ফিজিক্সের দুটি গবেষণা-কেন্দ্রের পরিচালনা করছেন। গবেষণাগারে কিন্তু অধ্যাপক বো-তের সাক্ষাৎ মিললো না। সম্প্রতি বো-তের স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। কিছুদিন সব কাজ থেকে অবসর নিয়ে বিশ্রাম করছেন দূরে বাভেরিয়ার ছোট এক গ্রামে। তবে তাঁর দু-জন যোগ্য সহকর্মী ডাঃ হানসেন ও ডাঃ হাক্কেল সঙ্গে করে ঘুরে সব দেখালেন। শেষে প্রস্তাব করলেন, আমি যদি সত্যই বো-তের সঙ্গে দেখা করতে চাই, তবে সংস্থার গাড়ীতে আমরা সকলেই বাভেরিয়ায় যেতে পারি। তাই হলো, প্রোফেসর হানসেন হলেন চালক। আমরা অর্থাৎ শ্যামাদাস, ৺বাসুদেব (ইনি তখন মারবুর্গে কাজ করছিলেন, আমার পৌঁছানোর খবর পেয়ে সঙ্গী হলেন এই যাত্রায়) আমি ও হানসেনের এক বান্ধবী। দূর পাল্লা—শান-বাঁধানো সিগক্রিড সড়ক দিয়ে Black Forest-এর ভিতর দিয়ে নানা সহর দেখতে দেখতে সন্ধ্যায় পৌঁছলাম কিম্‌সে-র ধারে বাভেরিয়ার ছোট্ট একটি গ্রামে। বন্ধু খুব খুসী—ওখানে একটি ছোট হোটেলে রাত্রিবাস হলো। পরের দিন পাহাড়ে রাস্তার ভিতর দিয়ে বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম অনেক ঘণ্টা। হিটলারের বেরেক্‌স্ গার্ডেন তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পার্বত্য ছোট সড়কে নানাভাবে মিত্রশক্তির অভিযানকে মরিয়া হয়ে বাধা দিতে চেয়েছিল নাৎসীরা। মাঝে মাঝে সাঁকো, গিরিপথ উড়িয়ে দিয়েছিল, তার চিহ্ন এখনো বর্তমান। দেখলাম সর্বত্র এখনো জার্মান দেশবাসীরা অবাধে যাতায়াত করতে পারেন না—এদিকে জিপে করে মনের আনন্দে আমেরিকানরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফিরে এলাম পূর্বের গ্রামে। রাত্রিশেষে বন্ধুর সৌজন্যে আবার সংস্থার মোটর গাড়ী চড়ে বেড়াবার অনুমতি পেলাম। ফিরে এসে হাই-ডেলবার্গ হয়ে আবার পৌঁছলাম গোটিংগেন সহরে। পুরনো গোটিংগেনের উপর মিত্রশক্তি বোমা বর্ষণ করে নি। সব অট্টালিকাই অটুট রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানশালায় হাজির হলাম। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে এসেছিলাম প্রথমে এই সহরে। মাক্‌স্ বর্ণ্ তখন নতুন কোয়াণ্টাম বিজ্ঞান নিয়ে নিজের গবেষণার উপরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ফ্রাঙ্ক চালাচ্ছিলেন ইলেকট্রন নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। জরডান হাইসেনবার্গ তখন তরুণ যুবা, তাঁদের অভিনব প্রচারে সারা জগৎকে চমৎকৃত করেছেন।

* * *

১৯৫২ সালে প্রোফেসর পোলের পুরনো লেবরেটরীতে কাজ চলছে, ঘুরে দেখলাম আগের মত সর্বত্রই অবাধে প্রবেশ করতে পারছি। হাইসেনবার্গ এখনো বক্তৃতা দিচ্ছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

* * *

কাইজার উইলিয়াম সংস্থার নাম আজ

মাক্স্ প্লাঙ্ক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। প্রথম যুদ্ধের পরে কাইজার চলে গেলেন। সংস্থাটি টিঁকে ছিল। আমরা গিয়ে ডাহলেমে কাইজার উইলিয়াম সংস্থার পরীক্ষাগারে কাজ করেছি। সেবার হাবর অনেক চেষ্টা করে সংস্থাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন—নামেরও বদল হয় নি। নাৎসীদের দৌরাত্ম্যে হাবরকে ডিরেক্টরের কাজে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়ে যেতে হয়েছিল। ভগ্ন-হৃদয়ে হাবর মারা যান ১৯৩৪ সালে, সুইজার-ল্যাণ্ডে। তাঁর শোকসভায় সরকারী কর্মচারীদের যাওয়া নিষেধ করে দিয়েছিলেন নাৎসী শিক্ষামন্ত্রী। প্রোফেসর লাউয়ে পুরনো বন্ধুর অন্তিমে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন বলে তাঁকে ভৎর্সনা শুনতে হয়েছিল। এবার যুদ্ধের শেষে নামের বদল হয়েছে—কাইজারের পরিবর্তে সর্বত্র মাক্স্ প্লাঙ্ক। সংস্থাটির আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, তবু টিঁকে আছে এটি। গোটিংগেনে সংস্থার প্রেসিডেন্ট অটো হান। মাক্স্ প্লাঙ্ক সংস্থার গাড়ীতেই চলাফেরা করছিলাম বো-তের সৌজন্যে, তবু ফটকের সামনে দাঁড়াতে হলো, দ্বাররক্ষীর ঘর থেকে টেলিফোনে প্রবেশের অনুমতি নিতে হলো। দোতলায় উঠে গেলাম প্রেসিডেন্টের কামরায়। ছোট ঘর, আসবাব প্রায় নেই বললেই চলে। একদিকে প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিয়েট টেবিল, সামনে দেয়াল-জোড়া প্রতিকৃতি—মাক্স্ প্লাঙ্ক অস্থিচর্মসার নব্বুই বছরের বৃদ্ধ। এঁরই কাছে কাছে ঘোরবার সুযোগ হয়েছিল '২৬ সালে ডাহলেমে। সাদরে আপ্যায়িত করলেন প্রেসি-ডেন্ট হান। পুরনো দিনের সব কথা—হঠাৎ সামনের টেবিলে অ্যালবাম খুলে বললেন—তোমার আমার সাধের ডাহলেমের যুদ্ধের মধ্যে কি শোচনীয় অবস্থা। এই রসায়নাগারে হান নিজের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন পরমাণু বিভাজনের সম্পর্কে, যুদ্ধের মধ্যেও। ১৯৪৪ সালে একদিন শত্রুর বোমার আঘাতে সব ভেঙ্গে-চুরে শেষ হয়ে গেল, হান সে শোক ভুলতে পারেন নি। জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর একমাত্র পুত্রের কথা, ডাহলেমে চলতে-ফিরতে দেখেছি, তখন হয়তো ৪।৫ বছরের বালক। ছেলের তখনও ডিগ্রী নেওয়া হয় নি। অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যে বেচারীকে পড়াশুনো চালাতে হয়ে-ছিল। ১৯৪৫ সালে পরমাণু-বিভাজনে সফল হয়ে-ছিলেন বলে হান নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। দেয়ালে একখানি ছোট ছবি, হান বিজয়মাল্যে ভূষিত হয়ে ফিরেছেন, প্লাঙ্ক তাঁকে অভ্যর্থনা করছেন। ছবিটি আমার ভাল লেগেছিল। অনেক অনুরোধের পর তার একটি ফটো-কপি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি।

হানের কাছে বিদায় নিয়ে প্রোফেসর ভাই-সেনবার্গের সঙ্গে দেখা হলো। আগের থেকে জানা-শোনা ছিল, বললেন এখানে কি আর দেখবে—শুধু খালি দেয়াল আর টেবিল। জায়গা পেয়েছি বটে, তবে এখনো যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কিছু হয় নি। সেখানে যুবক বিজ্ঞানী আইগেন ও ভিকের সঙ্গে দেখা হলো। সন্ধ্যায় বিজ্ঞানের আলোচনায় ছিল আমার নিমন্ত্রণ। উপস্থিত হয়ে দেখি, নিরাভরণ এক হলে ছেলেরাই কোনক্রমে একটা জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করে বাতি জ্বালিয়েছে। যবনিকার উপর ছোট ছোট রেখাচিত্র। বিজ্ঞানের নতুন কাজের আলোচনা চলছে। তার পরের দিন জার্মেনী ছেড়ে পারীতে ফিরে এলাম।

* * *

১৯৩৪ সাল থেকে হানের পাঁচ বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে নিউট্রনের আঘাতে যে ইউরেনিয়াম ধাতু থেকে বেরিয়াম উৎপন্ন হয়েছে, তা প্রমাণিত হলো। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরের শেষে কাজ শেষ। তার মাত্র কয়েক মাস আগে মাইটনারকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। অষ্ট্রিয়া নাৎসী-কবলিত হবার পর তাঁকে আর

নাৎসীদের হাত থেকে বাঁচানোর কোন রাস্তা ছিল না।

তাড়াতাড়ি হানের পরীক্ষার বিবরণী প্রকাশিত হলো। ইতিমধ্যেই হান নানা বাধা সত্ত্বেও এতদিনের সহকর্মী মাইটনারকে জানিয়েছিলেন পরীক্ষার ফল। মাইটনারই প্রথমে সন্তোষজনকভাবে সুযুক্তি দিয়ে দেখালেন, এতে ইউরেনিয়াম দু-ভাগে ভেঙে যাচ্ছে। রাসায়নিক ভাষায় বলতে নিউট্রন+ইউরেনিয়াম = বেরিয়াম + ক্রিপ্টন।

* * *

সে কয় বছরের ইতিহাস, যা অটো হানের নামকে বিজ্ঞান-জগতে অমর করে রেখেছে, তা জানতে অটো হানের লেখা আত্মচরিত পড়তে হয়—রেডিও-থোরিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম বিভাজন—ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে।

* * *

সুযোগ্য হস্তে গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন হান আশি বছর বয়স পর্যন্ত। পরে সম্মানিত নায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন শেষদিন অবধি। অল্প কয়েকদিন আগে সংস্থার গেটের সামনে মোটর থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যান। অল্প আঘাত পেয়েছিলেন শিরদাঁড়ায় ও পিঠে, ডাক্তারেরা ভেবেছিলেন বেশী কিছু নয়। শেষে আবার বিপদ ঘনিয়ে এলো। কয়দিন অঘোরে কাটিয়ে ২৮শে জুলাই সকালে মারা গেলেন। সারা দেশ শোকে মুহ্যমান হয়ে রয়েছে। স্ত্রী এখনো রয়েছেন, তবে দুঃখের বিষয়—একমাত্র ছেলে '৬১ সালে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে। নাতি আছে শুনেছি, ভগবান তাকে বাঁচিয়ে রাখুন।

"আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা কি নূতন করিয়া বলিতে হইবে? প্রয়োজনীয় বলিলে বরং কম বলা হয়। বিজ্ঞান ব্যতীত আমাদের গতি নাই, রক্ষা নাই। * * * মনে করিও না, বিজ্ঞান হইতে কেবল অর্থলাভই হয়। সংসারে মানুষের চেয়ে বড় কে? মানুষের মনের চেয়ে বড় কি আছে? মানবমন বিজ্ঞান বলে মার্জিত, উন্নত ও শক্তিশালী হয়। সমাজনীতি, ধর্মনীতি সমস্তই নানাপ্রকারে বিজ্ঞানের নিকট ঋণী। তাই বলি, যদি বাঁচিতে চাও, সভ্য মানবমণ্ডলীর মধ্যে মুখ দেখাইতে চাও, বিজ্ঞানের সেবা কর।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

মৌলিক কণা

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বরহস্যের সার বুঝিতে হইলে জানিতে হইবে, কি কি মূল উপাদান পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া জড় ও জীবাদি নানা প্রকার বস্তু উৎপন্ন করে ও কি নিয়মে চালিত হইয়া নানা প্রকার প্রাকৃতিক ও যন্ত্রদৃষ্ট ঘটনার সৃষ্টি করে। এই প্রশ্নের সন্ধানে অগ্রসর হইতে হইতে পদার্থ-বিজ্ঞানীরা আজ মৌলিক কণা ও তাহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নে উপস্থিত হইয়াছেন। এই প্রবন্ধে ইহারই যৎসামান্য আভাস দিতে চেষ্টা করা হইবে।

উক্ত প্রশ্নের মীমাংসার পথে প্রথম পঞ্চভূতের অবতারণা ও পরে বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক প্রমাণিত হওয়া যে জগতের সমস্ত বস্তুর মূল নানা প্রকার পরমাণু (Atom), ইহা বহুজনেরই অবিদিত নহে। এই পরমাণুগুলিকে মৌল (Element) ও তাহাদের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অণুগুলির (Molecule) যৌগ বা যৌগিক (Compound) বলে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু মূল উপাদান সন্ধান করাই মানুষের উদ্দেশ্য ছিল না—আরও প্রশ্ন ছিল, কি নিয়মে ইহারা যুক্ত ও চালিত, কি ভাবে ইহারা নানা ঘটনা ও ধারণার জনক। এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা কিন্তু নিতান্তই আংশিক হইয়াছিল। একদিকে রাসায়নিকেরা মৌলগুলির গুণাগুণ ও তাহাদের দ্বারা যৌগিক উৎপন্ন হইবার সম্বন্ধে মোটামুটি যেটুকু নিয়ম লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা হইতে শুধু যে সঠিক কিছু বলা যাইত না তাহাই নহে, সঠিক কিছু বলিবার মত ভিত্তির কোন আভাসও তাহাতে ছিল না। অপর দিকে পদার্থ-বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক রূপ নিরপেক্ষে বস্তুর গতিবিধি ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক গুণাগুণের যে সমস্ত নিয়মাবলী পাইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি, তাপচাপাদি ধারণার মূল, বেতারাদির সম্ভাবনা প্রভৃতি সুন্দররূপে বুঝিতে বা জানিতে পারা গিয়াছিল, কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কোনও কারণই ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় নাই। আরও যাহা বুঝিতে পারা যায় নাই, তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল বর্ণালী (Spectrum)।

বিজ্ঞানের উপরিউক্ত আংশিক সাফল্য বৃহত্তর সাফল্যের পথে পদার্পণ করে, যখন জানিতে পারা যায় যে, মৌলগুলি মাত্র অল্প কয়েকটি উপাদানে গঠিত। এই উপাদানগুলি হইতেই 'মৌলিক কণা' ধারণাটির সূত্রপাত। এই উপাদানগুলি, তথা কণাগুলির নাম ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। যে প্রক্রিয়ায় যুক্ত হইয়া ইহারা মৌলের সৃষ্টি করে, তাহাকে আদৌ রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলা যায় না। এই প্রক্রিয়া রসায়নোত্তর উচ্চাঙ্গের পদার্থ—বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলা যায়। কেন এইরূপ বলা যায়, তাহা নিম্নের বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে।

যে কোনও মৌলের মধ্যভাগে কয়েকটি প্রোটন ও কয়েকটি নিউট্রন অবস্থিত আছে। প্রোটনগুলি ধনাত্মক বৈদ্যুতিক মান বা আধান-সম্পন্ন, ইলেকট্রনগুলি ঋণাত্মক আধানসম্পন্ন ও নিউট্রনগুলি আধানশূন্য। এই প্রোটন, নিউট্রনের চতুষ্পার্শ্বে প্রোটনের সমসংখ্যক ইলেকট্রন সৌর-জগতের গ্রহগুলির ন্যায় ঘুরিয়া একটি বৈদ্যুতিক আধানশূন্য মৌলের সৃষ্টি করে। মধ্যে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যাই নিরূপিত করে—মৌলটি কি?

অত্র ইলেকট্রনগুলি ঘুরিবার কারণ প্রোটন ও ইলেকট্রনের মধ্যস্থ বৈদ্যুতিক আকর্ষণ—ইহা পরমাণুগুলির পরস্পর আকর্ষণ—যদ্দ্বারা অণুর সৃষ্টি—হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অনেক অধিক শক্তিশালী। এই জন্যই ইহাকে আমরা রসায়নোত্তর পদার্থ-বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলিয়াছি।

প্রসঙ্গতঃ এই কণাগুলির ভর কত বলা যাইতে পারে। অন্যান্য মৌলিক কণার ভর পরে আলোচিত হইবে। ইলেকট্রনের ভর ৯.১০৮ × ১০$^{-২৮}$ গ্র্যাম। প্রোটন ইলেকট্রনের ১৮৩৬ গুণ ভরবিশিষ্ট, সংক্ষেপে প্রোটনের ভর ১৮৩৬। নিউট্রনের ভর ১৮৩৮।

ইলকট্রন ও প্রোটনের পরস্পর আকর্ষণে যে গতির উৎপত্তি হয়, তাহা মোটামুটিভাবে সৌর-জগতের গ্রহ ও সূর্যের গতির সহিত তুলনীয় হইলেও এই গতির স্বরূপ ভিন্ন প্রকারের। এই গতির বর্ণনায় নিউটনীয় বহু ধারণার রূপান্তর প্রয়োজন; যথা—কোনও বস্তুর 'বিভিন্ন ভরবেগের একত্র সমাবেশ' (Superposition)। এই অকল্পনীয় ও অদ্ভুত ধারণাটি কণাতমতত্ত্বে, তথা মৌলিক কণাগুলির গতির আলোচনায় প্রয়োজন। এই গতিবিদ্যা বা কণাতমতত্ত্বের (Quantum mechanics) দ্বারা বর্ণালীর বিশদ ব্যাখ্যা—যাহা পূর্বে হয় নাই—পরমাণু সংযোগে অণুর সৃষ্টির ব্যাখ্যা ইত্যাদি নানা ব্যাখ্যা সম্ভব হইয়াছে। পদার্থ-বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, যে সকল স্থলে যৌগিক সৃষ্টির বল বা বর্ণালীর সম্যক বিশ্লেষণ গণনা করা সম্ভব হয় নাই, তাহা শুধু আমাদের গণিতের বা গণনা-পদ্ধতির জ্ঞানের অভাবে মাত্র। সেই জন্য পদার্থবিদ্‌গণ আর এই সকল গণনার চেষ্টা করেন না—বর্ণালীবিদ্ (Spectroscopist) ও রাসায়নিক পদার্থবিদ্ (Chemical physicist) এইগুলির গবেষণায় ব্যাপৃত।

পদার্থবিদের চিন্তা আরও গভীর প্রশ্নে চলিয়া গিয়াছে। পরমাণুর মধ্যস্থিত প্রোটনগুলি কেমন করিয়া একত্র থাকে—এই প্রশ্নটি পদার্থ-বিজ্ঞানীদের প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি। এই ধরণের প্রশ্ন সমাধানের জন্য ও মহাজগতের আরও কয়েকটি বিস্ময় প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন নানা প্রকার পরীক্ষা উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং এই সকল পরীক্ষা ও অন্যান্য অনুমানের ফলে পূর্বোক্ত তিনটি ছাড়া আরও অনেক মৌলিক কণা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কণাগুলির স্বরূপ ও পারস্পরিক ক্রিয়া নির্ভুল বুঝিতে পারিলে প্রকৃতির নিয়মের অবশিষ্ট গভীরতর দিকটা বুঝা যাইবে—এই বিশ্বাসে বহু পদার্থ-বিজ্ঞানী মৌলিক কণার গবেষণায় অনুরাগী। যে অজানিত বল প্রোটন-গুলিকে একত্রিত রাখে, সেই বলের সহিত নবাবিষ্কৃত কণাগুলির বিশেষ সম্বন্ধ থাকা এইরূপ বিশ্বাসের অন্যতম কারণ।

পূর্বোক্ত তিনটি কণা ভিন্ন অন্য মৌলিক কণারও অনুমান করা হয় ত্রিশ বৎসরেরও পূর্বে। পাউলি তেজস্ক্রিয় পদার্থের সম্বন্ধে কিছু তথ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিউট্রিনো (Neutrino) নামক অতি অল্প ভরযুক্ত বা ভরশূন্য একটি কণার কল্পনা করেন। এই কল্পনার দ্বারা বহু তথ্যের ব্যাখ্যা হইলেও ইহাকে প্রায় প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে মাত্র গত দশকে। নিউট্রিনোর অনুমানের অল্প পরেই প্রোটনাদির পরস্পরের আকর্ষণ ব্যাখ্যা করিবার জন্য জাপানী বৈজ্ঞানিক ইউকাওয়া (Yukawa) প্রায় ৩০০ ভরযুক্ত একটি কণার কল্পনা করেন। আলোচনা আরও অগ্রসর হইবার পূর্বে বলিয়া লওয়া প্রয়োজন যে, কি ভাবে বলের কারণ ভাবিতে গিয়া কণার কল্পনা উপস্থিত হয়।

কোনও বস্তুর ভর ও গতিবেগের গুণফলকে ভরবেগ বলে। নিউটনীয় বিধি অনুসারে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমতা হেতু পরস্পর আকৃষ্ট বস্তুদিগের

ভরবেগের যোগফল অপরিবর্তিত থাকে, যদিও তাহাদের একটির ভরবেগ বাড়ে ও অন্যটির কমিয়া যায়। সুতরাং আকর্ষণ অর্থে ভরবেগের আদান-প্রদান। কণাতমতত্ত্বের বা আরও সঠিক বলিতে হইলে কণাতম ক্ষেত্রতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে কণার আদান-প্রদানের দ্বারাই এই ভরবেগের আদান-প্রদান ঘটিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কণার দ্বারা আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি সম্ভব।

এইবার পূর্ব আলোচনায় ফিরিয়া আসা যাইতে পারে। ইউকাওয়া বলেন যে, একটি নূতন কণাই প্রোটনাদির আকর্ষণের কারণ। এই কণা আজ আর অজানা নহে। ইহার নাম পাই-মেসন। ধনাত্মক, ঋণাত্মক ও আধানশূন্য তিন প্রকার পাই-মেসন আছে। প্রথম দুইটির যথার্থ ভর ২৭৩ এবং শেষেরটির ২৬৪। এই কণা খুঁজিতে গিয়া প্রথমে ২০৭ ভরযুক্ত একটি কণা ধরা পড়ে। ইহা শুধু ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হইয়া থাকে মাত্র —আধানশূন্য হয় না। ইহার নাম মিউ-মেসন।

প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে শুধু যে কয়টি কণা বর্ণিত হইয়াছে সেই কয়টি ও পজিট্রন মাত্র জানা ছিল। বর্তমানে অনেক অধিক সংখ্যক মৌলিক কণার কথা জানা গিয়াছে। বর্তমানে মৌলিক কণার যে বৃহৎ তালিকা তাহাকে নানা অংশে ভাগ করিয়া অধ্যয়ন করিতে সুবিধা হয়। প্রথম ইহাদের দুইটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামানুসারে একটি শ্রেণীর নাম বোসন (Boson)। ইহারা অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু আবিষ্কৃত একটি বিশেষ সংখ্যায়ন মানিয়া চলে (সংখ্যায়নের বর্ণনা এই প্রবন্ধে করা হইবে না)। অধ্যাপক বসুর আবিষ্কারের পর তাঁহার চিন্তাধারার অনুকরণে অন্য সংখ্যায়ন আবিষ্কৃত হয় এবং এই সংখ্যায়ন মানিয়া চলে, এইরূপ কণাগুলিকে অধ্যাপক এনরিকো ফের্মির (Enrico Fermi) নামানুসারে ফের্মিয়ন (Fermion) বলে। সমস্ত কণাগুলিরই বৈদ্যুতিক আধানের মান হয় ইলেকট্রনের সমান অথবা আধানশূন্য। ইহা বেশ আশ্চর্যের কথা, কারণ ভরের বেলায় এইরূপ কোনও সমতাই দৃষ্ট হয় না। আরও আশ্চর্য এই যে, কোনও ধনাত্মক মানবিশিষ্ট কণার সমভরসম্পন্ন ঋণাত্মক কণাও থাকিবেই। মাত্র গত দশকে প্রোটনের অনুরূপ ঋণাত্মক কণা আবিষ্কারের পর ইহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছে, যদিও ডিরাকের সূত্র ও ইলেকট্রনের সমভরযুক্ত পজিট্রন আবিষ্কারে ইহার আভাস ছিল। ইহাকে আমরা কোনও কণার 'বিপরীত' কণা বলিয়া অভিহিত করিব। আধানশূন্য কণারও বিপরীত কণা আছে—আধান না থাকিলেও অন্য বিদ্যুৎ-চৌম্বক গুণের দ্বারা এই বিপরীতভাব প্রমাণিত হয়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ জানিবার কথা এই যে, কণাগুলির মধ্যে যে সকল বল কার্যকরী, তাহা প্রধানতঃ তিন প্রকার: প্রথম দৃঢ়বল বা দৃঢ় ক্রিয়া (Strong interaction), যদ্দারা প্রোটন, নিউট্রনাদি একত্র থাকে। দ্বিতীয় বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল বা ক্রিয়া (Electromagnetic interaction), যদ্দারা বিপরীত আধানযুক্ত কণাগুলি আকৃষ্ট হয়—ইত্যাদি। তৃতীয় শিথিল বল বা ক্রিয়া (Weak interaction) যদ্দারা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটিয়া থাকে। এই তিনটি ভিন্ন মাধ্যাকর্ষণকে চতুর্থ প্রকার বল বলা যাইতে পারে। কিন্তু যেহেতু ইহা শিথিল বল অপেক্ষাও ক্ষীণ, ইহার প্রভাব মৌলিক কণা বা অল্প ভরযুক্ত কোনও কণার উপরই পরিলক্ষিত হয় না, সেহেতু মৌলিক কণার আলোচনায় ইহার স্থান প্রায় নাই, যদিও গ্র্যাভিট্রন কণার কল্পনা কিয়ৎ পরিমাণে চলিত আছে।

উপরিউক্ত কাজটি ছাড়াও দৃঢ় ক্রিয়া অন্য কাজও করিয়া থাকে। দুইটি কণার পরস্পর বিচ্ছুরণ কালে নূতন কণার সৃষ্টিও দৃঢ় ক্রিয়ার দ্বারা সংঘটিত হয়। অপর পক্ষে অস্থায়ী কণাগুলির ক্ষয় অর্থাৎ

রূপান্তর শিথিল ক্রিয়ায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। দৃঢ় ক্রিয়ার কাজগুলি সত্বর ও শিথিল ক্রিয়ার কাজগুলি অপেক্ষাকৃত ধীরে সম্পন্ন হয়। এইরূপ না হইলে দৃঢ় ক্রিয়াজাত কণাগুলি অতি শীঘ্র রূপান্তরিত হইত এবং তার ফলে তাহাদের কোন সংবাদই আমরা পাইতাম না।

মৌলিক কণার প্রধানগুলি এক্ষণে বর্ণনা করা যায়। ইহাদের মধ্যে ফের্মিয়নগুলির বর্ণনা প্রথমে করা যাউক। ইহারা দুই প্রকার—অল্প ভরযুক্ত (কেহ বা ভরশূন্য) লেপটন (Lepton) ও অধিক ভরযুক্ত বেরিয়ন (Baryon)। ইলেকট্রন, মিউ-মেসন, নিউট্রিনো ও ইহাদের বিপরীত কণা লইয়া লেপটন গোষ্ঠী। ইহাদের ভরের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বেরিয়ন গোষ্ঠী সুবৃহৎ। তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানীদের মতাবলম্বনে ইহাদের মধ্যে একটি বেরিয়নবিশিষ্ট সিংগ্লেট (Singlet), আটটি বেরিয়নবিশিষ্ট অকটেট (Octet), দশটি বেরিয়নবিশিষ্ট ডেসিমেট (Decimet) আছে এবং আরও অনেকগুলির তালিকা ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছে। শুধুমাত্র অকটেটের কথাই আমরা বলিব। অকটেটের মধ্যে একটি একক (Singlet) একটি ত্রয়ী (Triplet) ও দুইটি জোড়া (Doublet) আছে। জোড়ার একটি প্রোটন ও নিউট্রন লইয়া অন্যটি ২৫৮০ ভরযুক্ত ঋণাত্মক ক্যাসকেড (Cascade) ও ২৫৬৫ ভরযুক্ত আধানশূন্য ক্যাসকেড লইয়া গঠিত। এককটির নাম (Lambda) ল্যাম্বডা—ইহা আধানশূন্য ও ভর ২১৮৩। ত্রয়ীটির নাম সিগ্‌মা—ধনাত্মক সিগ্‌মার ভর ২৩২৭, আধানশূন্যটির ২৩৩২ এবং ঋণাত্মকটির ২৩৪১। ইহাদের প্রত্যেকেরই বিপরীত কণা আছে। যদি লেপটনগুলিকে ১ ও ইহাদের বিপরীতকে (-১) অর্থাৎ ঋণাত্মক এক বলিয়া গণনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, কোনও ঘটনার আগে ও পরে ঐ সংখ্যা-গুলির যোগফল অপরিবর্তিত থাকে। ইহাকে 'লেপটন সংখ্যা অপরিবর্তন বিধি' (Lepton conservation law) বলা হয়। অনুরূপভাবে 'বেরিয়ন অপরিবর্তন বিধি'ও অতি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

এইবার বোসনের কথায় আসা যাইতে পারে। যদিও কেহ কেহ ফোটনকে লেপটনের মধ্যে গণনা করেন, তথাপি ফের্মিয়ন না হওয়ায় ইহাকে বোসনের মধ্যে লেপটনের অনুরূপ একমাত্র কণা মনে করিয়া বাকীগুলিকে বেরিয়নের অনুরূপ কণা মনে করা যায়। এই শেষোক্তের মধ্যেও অকটেট আছে—তাহাদের অকটেট মেসন বলা যায়। ইহাদের কথাই প্রধানতঃ বলা হইবে। ইহাদের মধ্যেও একটি একক, দুইটি জোড়া ও একটি ত্রয়ী আছে। বেরিয়ন অকটেটদের সহিত একটা প্রধান পার্থক্য অত্র প্রতিটি কণার সমভরযুক্ত বিপরীত বিদ্যুৎ-ধর্মী কণাগুলি পরস্পরের বিপরীত কণা। সুতরাং বিপরীতগুলি লইয়া আরও একটি অকটেট বেরিয়নে গঠিত বটে, কিন্তু মেসনে নহে। মেসনের একটি জোড়া ধনাত্মক কে (K) ও আধানশূন্য কে। ইহাদের ভর যথাক্রমে ৯৬৬ এবং ৯৭৪। অন্য জোড়াটি ইহাদের বিপরীত কণা—সুতরাং সম-ভরযুক্ত কণা। মেসনের ত্রয়ী পূর্ববর্ণিত পাই-মেসন। মেসন অকটেটের এককটি কিন্তু একটু অদ্ভুত—ইহা অকটেট বহিস্থ একটি কণা ও অকটেট মধ্যস্থ একটি কণার একত্র সমাবেশ। পূর্বে বিভিন্ন ভরবেগের একত্র সমাবেশের কথা বলা হইয়াছে—অনুরূপভাবে বিভিন্ন কণারও একত্র সমাবেশ কণাতত্ত্বের একটি আধুনিক নতুন ধারণা।

উপরিউক্ত তথ্যগুলির উপর ভিত্তি করিয়া কিছু তত্ত্ব এক্ষণে বলা যায়। বেরিয়ন ও লেপটন সংখ্যার অপরিবর্তন বিধির কথা বলা হইয়াছে। অনুরূপ আরও একটি অপরিবর্তন বিধি আছে, যাহা শুধু দৃঢ় ক্রিয়ায় কার্যকরী। ইহার নাম 'অপরিচিতি সংখ্যা (Strangeness number) অপরিবর্তন

বিধি'। সিগ্‌মা ও ল্যাম্‌ডার অপরিচিতি সংখ্যা −১, ক্যাসকেডের −২, ধনাত্মক ও আধানশূন্য কে-র ১। যে কোনও কণার বিপরীত কণার অপরিচিতি সংখ্যা, পূর্বের কণাটির অপরিচিতি সংখ্যাকে −১ দিয়া গুণ করিয়া পাওয়া যাইবে। অকটেটস্থ অন্য কণাগুলির অর্থাৎ পাই-মেসন, প্রোটন ও নিউট্রনের অপরিচিতি সংখ্যা 0। অপরিচিতি সংখ্যা ভিন্ন আরও দুইটি সংখ্যা কণাগুলির সহিত যুক্ত আছে। তাহাদের নাম আইসোস্পিন ও থার্ড কম্পোনেন্ট অফ আইসোস্পিন। জোড়, ত্রয়ী ইত্যাদি প্রত্যেকটির আইসোস্পিন সমান, কিন্তু থার্ড কম্পোনেন্টটি ভিন্ন। আইসোস্পিন ১ হইলে থার্ড কম্পোনেন্টটি ১, 0 বা −১ হয়। আইসোস্পিন 0 হইলে থার্ড কম্পোনেন্ট 0 হইতে পারে। অর্ধসংখ্যা আইসোস্পিনও সম্ভব—ইহা $\frac{1}{2}$ হইলে থার্ড কম্পোনেন্ট $\frac{1}{2}$ বা $-\frac{1}{2}$ হইতে পারে। সুতরাং অকটেটস্থ ত্রয়ীর আইসোস্পিন ১, জোড়ার $\frac{1}{2}$ ও এককের 0। আইসোস্পিনদের পরস্পর যুক্তির নিয়ম একটু জটিল।

মৌলিক কণার তত্ত্বীয় গবেষণায় প্রধানতঃ দুই ধরণের তত্ত্বের অবতারণা হইয়াছে। একটির নাম S-matrix and analyticity, অন্যটির নাম Unitary symmetry। ইহাদের বিশেষ বর্ণনা করা হইবে না। অতি অল্প কিছু ইহাদের সম্বন্ধে বলা হইবে মাত্র।

S-matrix-এর পথে অগ্রসর হইতে হইতে মৌলিক কণাবিদ্‌গণ Bootsrap formalism তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। এই সম্বন্ধে ইংরেজিতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল: "The bootsrap idea that all particles are merely bound states of each other produced by the forces coming from the exchange of particles themselves has been a natural outgrowth of the dispersion theory".

Unitary symmetry-র একটি চমকপ্রদ দান এই যে, অপরিচিতি সংখ্যা ও আইসোস্পিন জানিলে একটি সূত্রের সাহায্যে কণার ভর বলিয়া দেওয়া যায়। কথাটা অবশ্য খুবই মোটামুটি বলা হইল—অনেক সূক্ষ্ম কথা ও বিশদ আলোচনা বাকী রহিয়া গেল।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বৈদ্যুতিক মানের সমতা, তিন বা চার প্রকার ক্রিয়া ইত্যাদি মূল প্রশ্নগুলি কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানীরা স্পর্শ করেন নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস—এত গভীর প্রশ্নের মীমাংসার সময় এখনও আসে নাই। বর্তমানে রাগিণীর আলাপ চলিতেছে মাত্র, মূল রাগ এখনও আরম্ভ হয় নাই।

শস্যোৎপাদন সম্পর্কে সাম্প্রতিক অনুশীলন ও সম্ভাব্য নির্দেশ

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

'কৃষিবিপ্লব' কথাটি সম্প্রতি প্রচলিত হয়েছে। এটি কেবলমাত্র অভিলাষসঞ্জাত চিন্তা নয়, বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে বলা যেতে পারে। বিগত কুড়ি বছরের অধিক কাল যাবৎ আমরা খাদ্য-সমস্যা নিয়ে বিপর্যস্ত হয়েছি। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের প্রতিশ্রুতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যবস্তু আমদানী করেছি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আশাহত হন নি। প্রত্যেক বিপ্লবের পশ্চাতে বিবর্তনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে বিবর্তনের হার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেলেই তাকে বিপ্লব বলা যায়। বহু বছরের সঞ্চিত গবেষণালব্ধ জ্ঞান রয়েছে এই কৃষিবিপ্লবের পশ্চাতে। তাই নতুন ভাবে আমরা কৃষি বিষয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছি। এই ভাবনার ধরণ কি এবং তার ভবিষ্যৎ নির্দেশই বা কোন দিকে, সেই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা জানি যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্যশস্য উৎপাদন ধীরগতিতে চলছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই গতি বৃদ্ধি না করতে পারলে বিপজ্জনক অবস্থায় উপনীত হবো। এই তথ্যটি কেবলমাত্র ভারত কিম্বা পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির বেলায় প্রযোজ্য নয়, বিশ্বের সর্বত্র কম-বেশী খাদ্য ঘাট্‌তির আতঙ্ক বিরাজ করছে। কৃষিযোগ্য ভূমি সীমিত, অতএব প্রতি একরে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধিই ঘাট্‌তি পূরণের একমাত্র উপায়। এই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কি কি করণীয়, তা মোটামুটি স্পষ্ট। পর্যাপ্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ, উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার, উপযুক্ত জলের ব্যবস্থা, কীটঘ্ন ঔষধাদির প্রয়োগ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা গবেষণার দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু বিশদভাবে বিচার করতে গিয়ে দেখা গেল, আমাদের শস্যোৎপাদনের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ছিল। বিগত ত্রিশ বছরের অধিক কাল যাবৎ আমরা সার প্রয়োগে যে আশানুরূপ ফল পাই নি, তার কারণ আমরা যে জাতের বীজ শস্যোৎপাদনের কার্যে ব্যবহার করেছি, তার মধ্যে অধিকাংশই সার প্রয়োগে উপযুক্ত সাড়া দেয় না। অথচ অন্যান্য দেশে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে আশাতীত সাড়া পাওয়া গেছে।

উন্নত জাতের বীজ প্রস্তুত সম্পর্কে গবেষণা আমাদের দেশেও চলছিল, কিন্তু বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল যাবৎ উপযুক্ত বীজের সন্ধান করে উঠতে পারেন নি। সম্প্রতি বীজ-প্রজনন গবেষণার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে অল্প-কালের মধ্যেই উন্নত জাতের বীজ প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। যাতে গবেষণার ফল সত্বর বিস্তার লাভ করতে পারে এবং অন্যান্য দেশ এর সুযোগ নিতে পারে তজ্জন্য বিভিন্ন শস্যের ভিত্তিতে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সংস্থাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহায়তার যোগাযোগ থাকবার জন্যে অতি দ্রুতগতিতে নানাবিধ জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন সব উন্নত জাতের বীজ প্রজনন সম্ভব হবে, যার সাহায্যে অনায়াসে শস্যোৎপাদন প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণের সীমা অতিক্রম করবে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সার প্রয়োগের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির পরীক্ষাদি আশানুরূপ কৃতকার্যতা

লাভ করে নি, কারণ আমরা যে সব জাতের বীজ ব্যবহার করেছিলাম, সেগুলি সার প্রয়োগে উপযুক্ত সাড়া দেয় না। উন্নত জাতের বীজের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সাড়া পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তার জন্যে প্রচুর সারেরও প্রয়োজন। অতএব উপযুক্ত পরিমাণ সারের ব্যবস্থা না করতে পারলে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে আশানুরূপ ফললাভ করতে পারবো না। এর জন্যে সার প্রস্তুতের কারখানা বাড়াতে হবে। যে পর্যন্ত না যথেষ্ট পরিমাণ সার পাচ্ছি, ততদিন সার আমদানী করতে হবে অথবা যতটুকু প্রস্তুত হচ্ছে, তারই সাহায্যে উৎপাদন ক্ষমতা যথাসাধ্য চরম হারে বাড়াতে হবে।

গম

খাদ্যশস্যের মধ্যে গম, ধান, ভুট্টা, জোয়ার ও বজরার ফলন বৃদ্ধি সম্পর্কে আমাদের কৃতকার্যতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় শস্যের ফলন বৃদ্ধির জন্যে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা বহু বছর যাবৎ করা হয়েছে, তাকে প্রধানতঃ চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। গমের বিষয় ধরা যাক। প্রথম পর্যায়ে দেখতে পাই, কেবল মাত্র উত্তম ফলনশীল ও গুণসম্পন্ন গমের বীজ সাধারণ পন্থায় বাছাই করবার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার ফলে বিখ্যাত পুসা-৪ জাতের গম সারা বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এতে ফলন অতি মাত্রায় বাড়ানো সম্ভব হলো না। দ্বিতীয় পর্যায়ে সাধারণ বাছাইয়ের পরিবর্তে সঙ্কর জাতীয় গমের সন্ধান চললো। এই গবেষণার ফলে পাওয়া গেল পুসা-৫২ জাতের গম। এই ভাবে প্রাপ্ত পাঞ্জাবের সি. ৫৯১ জাতীয় গমের খ্যাতিও প্রচুর এবং বহুদিন যাবৎ এদের চাষ সাফল্যের সঙ্গে চলেছিল। অনেক সময় ফলন-ক্ষমতা হ্রাস পায়, যদি শস্য হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়। বিভিন্ন ধরণের মরচে ধরা (Wheat rust) রোগ গমের বিস্তর ক্ষতি সাধন করে থাকে। এদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে সময়মত কীটঘ্ন ঔষধাদি প্রয়োগ করা দরকার। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ পদ্ধতি সাধারণ কৃষকদের আর্থিক সঙ্গতির বাইরে। সুতরাং বিজ্ঞানীরা গবেষণায় রত হলেন রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতাসম্পন্ন গমের সন্ধানে। বহু বছরের গবেষণার ফলে নতুন দিল্লীস্থ ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এন. পি. ৮০৯ জাতের গম উদ্ভব করা সম্ভব হলো। কিন্তু সর্বাধিক চমকপ্রদ সাফল্য লাভ হলো সম্পূর্ণ অন্য ভাবে। এটি হলো চতুর্থ পর্যায়।

যে সব জাতের গম এতদিন ব্যবহৃত হচ্ছিল, তাদের দিয়ে অত্যধিক ফলন সম্ভব না হবার কারণ প্রধানতঃ এই যে, অধিকমাত্রায় সার প্রয়োগে (বিশেষতঃ নাইট্রোজেন সার) গমের গাছ ভূশায়ী হয়ে যায়, অতএব তারা প্রদত্ত সার বা জল গ্রহণে অসমর্থ হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, হেক্টর প্রতি ৫০ কেজির বেশী সার দিলেই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ জাতের গমের গাছ শস্য ভারে ভূশায়ী হয়ে পড়ে। অতএব অধিক সার প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধি করতে হলে খর্বাকৃতি জাতের গম বাঞ্ছনীয়। সৌভাগ্যবশতঃ জাপানের নোরিন-১০ জাতের গমের মধ্যে খর্বকারী, ভূশয়ন প্রতিরোধ-ক্ষমতা এবং মোটা দানা—এই তিন প্রকার বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় পাওয়া গেল। নতুন দিল্লীস্থ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ভারতে উপযোগী চাষের জন্যে এই প্রকার খর্বাকৃতি গমের বীজ পরীক্ষা চলে মাত্র বিগত ৫ বছর থেকে। এই জাতের বীজ আনা হয়েছিল মেক্সিকো থেকে। সেখানকার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র গমের বীজ চাষ করবার গবেষণায় বিশ্ববিখ্যাত। নানা দেশের প্রজননবিদ্‌গণের সাহায্যে এই কেন্দ্রটি গম সম্পর্কিত পরীক্ষা কার্যে বহুমূল্য তথ্যাদি সংগ্রহ করেছে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে সেখানে হাতে-কলমে শিক্ষালাভের জন্যে প্রতি বছর গবেষণা-

কারীরা সমবেত হন। অধিকন্তু এঁদের সৌজন্যে নানা গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওখানকার উন্নত জাতের গমের বীজ পেয়ে থাকে। এই ভাবে ১৯৬৩ সালে ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানও খর্ব জাতের চার প্রকার গমের বীজ নিয়ে আসে। দুই বছর ধরে বিভিন্ন রাজ্যে রবিখন্দে এই বীজ চাষের ফলে ঐ প্রতিষ্ঠান সকল কৃষকদের ব্যবহারের জন্যে লারমা রোহো-৬৪ এ এবং সোনোরা-৬৪ (দেশীয় নাম সরবতী সোনোরা) নামক দুই জাতের গম অনুমোদন করে। লারমা রোহো মরচে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে। সোনোরা দ্রুত ফলনের জন্যে প্রসিদ্ধ, কিন্তু কোন কোন প্রকার মরচে রোগ প্রতিরোধে অক্ষম। উভয়েই অভূশায়ী বটে, কিন্তু সোনোরা দৃঢ়তর। এই জাতের সার ও জলের প্রয়োজনীয়তা, চাষ পদ্ধতি ও পরিচর্যা রীতি ইত্যাদি বিশদভাবে পরীক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। নিয়মিত চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৬৪ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। এই জাতের গমের বীজ অনধিক ২" ইঞ্চি গভীরে বুনলেই চলে, কিন্তু বীজ বোনবার অন্ততঃ ৩০-৩২ দিন পূর্বে এবং দানা পুষ্টির সময় জলসেচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফলন বৃদ্ধির জন্যে হেক্টর প্রতি ১২০ কে জি নাইট্রোজেন দিলেও ভূশয়নের কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং নিশ্চিন্ত হয়ে সার প্রয়োগ করা যায়।

পরবর্তী কালে খর্বজাতের গমের প্রজনন-নীতি অনুশীলন করে আমাদের দেশের গবেষণাগারে নতুন নতুন বিভিন্ন গুণসম্পন্ন গমের বীজ পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে পাঞ্জাবের সি. ৩০৬ ও পি. ভি. ৩১৮, মধ্যপ্রদেশের সঙ্কর ৬৩৩, মহারাষ্ট্রের এন. আই. ১৪১-১৯, দিল্লীর এন. পি-৮৩৯, এন. পি-৮৫২, এন. পি-৪০৪ এবং মহীশূরের বিজাগা-হলদে ও লাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের সকলেই ভারতীয় জাতের সঙ্গে সঙ্কর পদ্ধতির দ্বারা উদ্ভূত। এদের মধ্যে কোন কোনটি বিভিন্ন রকমের রোগ প্রতিরোধক, অভূশায়ী, খাদ্যপ্রাণ বা প্রোটিনসহ পুষ্টিপ্রদ, চাপাটি বা রুটি তৈরির উপযোগী ইত্যাদি। আবার এদের মধ্যে কোন কোনটি বিভিন্ন আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিকে বোনবার পক্ষেও উপযুক্ত। সুতরাং প্রয়োজনানু-সারে উপযুক্ত গমের নির্বাচন করে যে কোন অবস্থায়ই হোক সুফল লাভ করা সম্ভব। বর্তমান পরীক্ষাদির পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা যায় যে, আগামী ৫ বছরে গমের ফলন দ্বিগুণ হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যতই এই জাতের গমের চাষ বৃদ্ধি পাবে, সার ও জলের প্রয়োজন সেই পরিমাণে বাড়বে। অতএব সার প্রস্তুতের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে এবং জলের সর্বপ্রকার উৎসগুলিকে (অর্থাৎ নলকূপ, পুষ্করিণী, বাঁধ ইত্যাদি) উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগাতে হবে। অধিক ফলনশীল গম সাধারণতঃ রোগ প্রতিরোধে অক্ষম। সুতরাং রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা আনয়ন করবার জন্যে নানাভাবে প্রজনন সম্পর্কে গবেষণা ও অনুশীলন করা হচ্ছে। নির্বাচন কার্যের জন্যে এই বীজ ভারতের বিভিন্ন জল ও বাতাস, নানাপ্রকার রোগ, আর্দ্রতা বা শুষ্কতা-সম্পন্ন জায়গায় একই সময়ে বোনা হয়। সুতরাং অল্প সময়ে উপযুক্ত জাতের বীজ নির্বাচন করা সম্ভব। এই পদ্ধতিটির সাহায্যে বর্তমানে ১।২ বছরের মধ্যেই ৪-৫ হাজার রকম বীজের মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতের বীজ অনায়াসে বেছে নেওয়া যায়।

ধান

গমের মত ধানের বেলায়ও খর্বজাতের ধানের প্রাধান্য ও উৎকর্ষ স্বীকৃত হয়েছে। দীর্ঘাকৃতি ধানের ফলন বৃদ্ধির জন্যে অধিক পরিমাণ নাইট্রো-জেন সার দিলে কোন প্রকার সাড়া পাওয়া যায় না। পরন্তু দৈর্ঘ্যহেতু শস্য পূর্ণতা প্রাপ্তির

পূর্বেই গাছসমেত ভূতলশায়ী হয়ে পড়ে। পর্যাপ্ত জলের সুবিধার জন্যে বর্ষাকালে ধান রোপণই আমাদের দেশে প্রচলিত। অথচ ঐ সময়েই সর্বাধিক দিন আকাশ মেঘাবৃত থাকে এবং শর্করা সংশ্লেষণের পক্ষে প্রয়োজনীয় আলোক খুবই কম পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত লাটি সাইল ইত্যাদি আমন ধানকে যদি বোরো ঋতুতে বপন করা যায় এবং প্রয়োজনীয় জল পেতে অসুবিধা না হয়, তাহলে অনায়াসে বিনা সার প্রয়োগেই ফলন দ্বিগুণ করা সম্ভব। সৌভাগ্যের বিষয়, দেশীয় জাতের ধান অধিকাংশ ক্ষেত্রে কীট-প্রতিরোধক। কিন্তু দেশীয় ধানের পল্লবের গঠন এমনি যে, অধিকাংশ পল্লবই আলোকের প্রভাব থেকে বঞ্চিত হয়, নিম্নদিকের পল্লবগুলি সর্বদাই উপরের বিস্তৃত পল্লবগুলি দ্বারা আবৃত থাকে। সুতরাং দানা পুষ্টির কাজ বহুলাংশে ব্যাহত হয়। এছাড়া নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে দানার অনুপাত এত বেড়ে যায় যে, ফলন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অতএব গমের মত ধানের ক্ষেত্রেও যদি খর্বজাতের বীজ পাওয়া যায়, যার পল্লবের গঠন আলোক আহরণে সাহায্য করবে এবং খড়, দানার অনুপাত ক্ষতিজনকভাবে বাড়িয়ে দেবে না, তাহলে ফলন বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

গমের মত ধানের ক্ষেত্রেও চার পর্যায়ে উপযুক্ত জাতের বীজ উদ্ভব করা হয়েছে। প্রথমতঃ সাধারণ বাছাই পদ্ধতি, দ্বিতীয়তঃ মিশ্র প্রজনন-প্রক্রিয়ায় সঙ্কর জাতের ধানের বীজ সৃষ্টি। এই পর্যায়ে জাপানী জাতের সঙ্গে ভারতীয় জাতের ধানের সঙ্কর ধান অনেক আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় নি। তৃতীয় পর্যায়ে নানাবিধ রোগ ও কীট-প্রতিরোধক ধানের উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু ফলন-ক্ষমতা আশানুরূপ ছিল না। ফলন বৃদ্ধির কাজে প্রকৃত বাধা দূরীভূত হয় তাইওয়ান ও ফিলিপাইন থেকে খর্বজাতের বীজ আমদানী করবার সঙ্গে সঙ্গে। সর্বপ্রথমে ব্যবহৃত তাইচুং নেটিভ ১ ফলন বৃদ্ধি করলেও রোগ-প্রতিরোধক নয় (সহজেই এক প্রকার পত্র-ছত্রাক বা লীফ ব্লাইটের দ্বারা আক্রান্ত হয়) বলে পরিত্যক্ত হয়। ফিলিপাইনের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আই. আর-৮, তাইচুং-১-এর তুলনায় অধিকতর ফলনশীল এবং বহুলাংশে রোগ-প্রতিরোধক। আই. আর-৮ যে দুটি বীজের মিশ্র প্রজননে জাত, তার একটির নাম হলো পেতা—এটি ভারতীয় জাতের, যদিও ইন্দো-নেশিয়াতে এর উদ্ভব। কিন্তু পেতা-র তুলনায় আই. আর-৮-এর ফলনশীলতা বহুগুণ বেশী। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে স্থানীয় রোগ-প্রতিরোধক জাতের ধানের সঙ্গে নানাবিধ জাতের ধানের মিশ্র প্রজনন-কার্য চলছে। এক্ষেত্রেও একই বছরে দেশের নানাপ্রকার উপযুক্ত জায়গায় নিজস্ব পন্থায় উদ্ভাবিত সঙ্কর জাতের ধান বপন করে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই (৩।৪ বছর) প্রজনন-কার্য দ্রুততর করা সম্ভব হয়েছে। নতুন খর্ব জাতের ধানের মধ্যে অনেকগুলি সুবিধাজনক গুণ বর্তমান। এগুলি অধিক পরিমাণ সার আহরণে সক্ষম, খর্বাকৃতিহেতু শেষ পর্যন্ত খাড়া থাকতে পারে এবং কখনই ভূশায়ী হয় না। তাছাড়া পাতা-গুলি সবুজ থাকে এবং খাড়া গঠনের ফলে সব-গুলি পাতাই শেষ পর্যন্ত আলোক-আহরণে অংশ-গ্রহণ করতে পারে। সঙ্কর জাতের এমন কতক-গুলি ধান পাওয়া গেছে, যেগুলি রোগ প্রতিরোধ করতেও সক্ষম। এছাড়া বপনের পূর্বে বীজ যদি উপযুক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদির দ্বারা ধৌত করা হয়, তাহলে মারাত্মক জীবাণুঘটিত লীফ ব্লাইটের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। কাণ্ড ছিদ্রকারী বা ষ্টেম বোরার জাতীয় কীট ধানের প্রধান শত্রু। কিন্তু গামা-বি. এইচ. সি. অর্থাৎ গামা-বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড জলে মিশ্রিত অবস্থায় প্রয়োগ করলে শূক বা লার্ভা দশাতেই

কীটগুলি মরে যায়। এমন কি, প্রজাপতি দশায় গামা-বি. এচ. সি ধূম্রাকারে ছড়িয়ে দিলে কীটগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। এই সব জাতের আর একটি মস্ত সুবিধা এই যে, অল্প সময়ে (৯০--১১০ দিন) দানা পুষ্টি সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং শস্য আবর্তন পদ্ধতিতে চাষ-কার্যে এই জাতীয় ধানের ব্যবহার অনায়াসে অনুমোদন করা যায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এমন কয়েক জাতের ধান উৎপন্ন করা হয়েছে, যাদের শর্করা সংশ্লেষণ কার্য আলোকপাতের উপর নির্ভর করে না। অতএব বছরের যে কোন সময়ে এইগুলি বপন করা চলে। ফিলিপাইনের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে অনুশীলন করে দেখা হয়েছে যে, এই জাতীয় ধান বছরে তিনবার উৎপন্ন করা যেতে পারে এবং এইভাবে কমপক্ষে হেক্টর প্রতি ২০ টন পর্যন্ত ফলন লাভ করা সম্ভব। উপযুক্ত পরিমাণ সার সংগ্রহ করতে পারলে এবং যদি কীটঘ্ন ঔষধাদি ব্যবহারের সুযোগ থাকে, তাহলে ভারতের ১৩০ লক্ষ হেক্টর সেচযুক্ত ধানের জমি থেকে অনায়াসে বাড়তি ১০০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাওয়া যেতে পারে।

এশিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে সাধারণতঃ বছরে একটিমাত্র ধান ফসল উৎপন্ন করা হয়। এটি বর্ষারম্ভে বপন করা হয় এবং বর্ষান্তে ফসল তোলা হয়। অথচ অপেক্ষাকৃত অনার্দ্র ঋতুতে ধান বপন করে সার প্রয়োগে অধিকতর সাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ সময়ে উপযুক্ত সুযোগের অভাবে জমি অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকে। বর্তমানে আলোক-অসংবেদনশীল জাতের ধান-বীজ পাওয়া গেছে। বছরের যে কোন সময়েই এগুলি বপন করা সম্ভব। জল সরবরাহ ও জমির প্রস্তুতি যেখানে সহজসাধ্য, সেখানেই এই জাতের বীজ কার্যকরী হবে। বস্তুতঃ অনার্দ্র ঋতুতে জমি প্রস্তুতির কার্য যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত অসম্ভব। বছরের সব সময় যাতে যন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়, তার উপযোগী যন্ত্র উদ্ভাবন করবার প্রয়োজন আছে। অপেক্ষকৃত হাল্কা এবং সহজচালিত যন্ত্রাদি আমাদের জমির পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হবে। এই দিকে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত।

আমাদের দেশে প্রধান জাতীয়, যথা—জোয়ার এবং বাজরা খাদ্যশস্য হিসাবে প্রায় তিন কোটি হেক্টরে উৎপন্ন করা হয়। সাধারণতঃ অল্প উর্বর জমিতে এদের বপন করা হয়। এজন্যে এদের ফলন অতিশয় কম অর্থাৎ মাত্র ৩৮০ কেজি / হেক্টর-এর কাছাকাছি। এরাই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কৃষক, মজুরদের এবং গবাদিপশুর খাদ্যের যোগান দিচ্ছে। হয়তো সে জন্যেই এতদিন এই জাতের শস্যবীজের উন্নতির কথা বিজ্ঞানীদের চিন্তায় আসে নি। সম্প্রতি নিউ দিল্লীস্থ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে মিশ্র প্রজনন-পদ্ধতিতে উদ্ভূত কয়েকটি জোয়ার জাতের বীজ ফলনশীলতার দিক থেকে প্রচুর সাফল্য এনে দিয়েছে। সি. এস. এইচ-১ জাতের জোয়ার ৯০--১০০ দিনে পূর্ণতা লাভ করে এবং স্থানীয় জাতের তুলনায় ৬০--৮০% দানা ও খড় বেশী পাওয়া যায়। সি. এস. এইচ-২ নামক আর একটি অধিকতর ফলনশীল জোয়ার পাওয়া গেছে, কিন্তু এটি প্রায় ২০ দিন দেরীতে পূর্ণতা লাভ করে। সঙ্কর জাতের শস্যের অসুবিধা এই যে, উৎপন্ন বীজ ভবিষ্যৎ কালে বার বার ব্যবহার করে ফলন-ক্ষমতা সংরক্ষণ করা যায় না। এজন্যে বর্তমানে নতুন ধরণের বীজের সন্ধান করা হচ্ছে, যা বার বার ব্যবহারযোগ্য হতে পারে, অথচ ফলনশীলতা হ্রাস পাবে না।

আমেরিকা কিম্বা অন্যান্য উন্নত দেশের মত ভুট্টা আমরা পশ্বাদির খাদ্যরূপে ব্যবহার করি না। দরিদ্র ও মজুরদের খাদ্যের ঘাটতি পূর্ণ করবার কাজে ভুট্টা একটি মূল্যবান অংশ গ্রহণ করে। দেশের মৃত্তিকা এবং আবহাওয়ার উপর

নির্ভর করে ৬১৭টি বিভিন্ন জাতের সঙ্কর ভুট্টা বর্তমানে প্রচলিত আছে। গত পাঁচ বছরের অনুশীলনলব্ধ ফল থেকে জানা যায় যে, এদের ফলন গড়ে ৪৫০০-৬৫০০ কেজি / হেক্টর এবং প্রধান প্রধান কীট ও ছত্রাকের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। গাছ সবুজ থাকতেই শস্য পূর্ণতা লাভ করে, সুতরাং ভুট্টার খড় গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবে বিশেষ কার্যকরী হয়।

উল্লিখিত বিবরণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্রমশঃ উন্নত থেকে উন্নতর ফলনক্ষম, রোগ-প্রতিরোধকারী এবং সার প্রয়োগে অনুকূল প্রতিক্রিয়াশীল বীজ উৎপাদন করা। প্রজনন-প্রক্রিয়ায় এখন আর দীর্ঘমেয়াদী অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং অল্পকালের মধ্যেই নতুন বীজের সন্ধান পাওয়া যায়। নতুন বীজের সুবিধা যেমন, অসুবিধাও কিছু রয়েছে। এদের প্রকৃতি, গুণাগুণ, পরিচর্যা-রীতি জানবার জন্যে সতত সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার প্রয়োজন হয়। তা না হলে এদের চরম ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করা যায় না। এদের ক্ষেত্রে বীজ সংরক্ষণের কাজও কঠিন, সুতরাং নিত্য নতুন বীজের সন্ধানের জন্যে সর্বদা গবেষণার প্রয়োজন হয়।

পশ্চিম বাংলার কৃষি সম্পর্কিত অনুশীলন *

পশ্চিম বাংলায় ধানই প্রধান খাদ্যশস্য। ক্রমশঃ গম ও ভুট্টা উৎপাদনের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় অধিক ফলন-ক্ষম জাতের শস্যাদি অধিকতর স্থান পাচ্ছে। গত বছর ১১৮ লক্ষ একর ধান্যোৎপাদক জমির মধ্যে মাত্র ২.৫ লক্ষ একরে নতুন বীজ বপন করা হয়েছিল। এই বছর চতুর্গুণ বাড়িয়ে ১০ লক্ষ একর করা হয়েছে। প্রকল্পানুসারে আগামী ১৯৭৩-'৭৪ সালে এই ক্ষেত্র ৪৫ লক্ষ একর পর্যন্ত বাড়ানো হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নতুন ধানের বীজ যত অধিক ফলনশীল হবে, তত অধিক রোগ-প্রতিরোধে অক্ষম হতে থাকবে, অতএব কীটঘ্ন ঔষধাদির প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, স্থানীয় বীজের সঙ্গে মিশ্র প্রজনন-প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত বীজ অপেক্ষাকৃত রোগ-প্রতিরোধক্ষম। ক্রমশঃ এই প্রকার সঙ্কর জাতীয় ধান্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে এবং সর্বভারতীয় প্রকল্প হিসাবে প্রতি বছর নতুন নতুন উপযুক্ত সঙ্কর ধানের অনুসন্ধান ও অনুশীলন চলছে। এছাড়া আলোক-সংবেদনশীল স্থানীয় আমন জাতীয় ধান বোরো ঋতুতে বপন করে প্রচুর ফলন বৃদ্ধি (৬০-৭০ মণ একর) হয়েছে। অর্থাৎ বপনের সময় পরিবর্তন করেই ফলন বৃদ্ধি সম্ভব। এই সহজ অথচ কার্যকরী বৈজ্ঞানিক তথ্যটি ক্রমশঃ কাজে লাগানো হচ্ছে এবং ক্রমাগত অনুশীলনের সাহায্যে অধিকতর ফলনক্ষম স্থানীয় ধান-বীজের সন্ধান পাওয়া গেছে। পশ্চিম বঙ্গ কৃষি বিভাগে এই সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে এবং আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে কৃষি-পদ্ধতির সামান্য পরিবর্তন সাধন করে ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। শস্য আবর্তনের সাহায্যে কোন কোন জমিতে পাটসহ তিনটি ধান ফসল পাওয়া যেতে পারে। কৃষি বিভাগের চাকদহস্থিত কৃষিকেন্দ্রের অনুশীলনে দেখা গেছে যে, প্রয়োজনমত জল, সার এবং কীটঘ্ন ঔষধ প্রয়োগে উপযুক্ত শস্য আবর্তন গ্রহণ করে সর্বসাকুল্যে ১২০ মণ একর পর্যন্ত ফসল লাভ করা যায়।

পশ্চিম বঙ্গে আরও কয়েকটি পদ্ধতি নতুন

---

* পশ্চিম বাংলার কৃষি অধিকর্তা শ্রীআশুতোষ সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে এই বিষয়গুলি আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলাম। তজ্জন্যে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃষি ব্যবস্থায় সংযোজিত হচ্ছে। এইগুলি নিয়ে বর্তমানে অনুশীলনের ক্ষেত্র ক্রমশঃ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকদের জমিতেও এই পদ্ধতিগুলি গৃহীত হয়েছে।

খরিফ খন্দে যে সব ধানের বীজ লবণসহ, বোরো ঋতুতে তাদের বপন করে অপ্রত্যাশিতরূপে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। চারা অবস্থায় স্বল্প পরিসর জমির প্রয়োজন। সুতরাং এই অবস্থায় লবণহীন জলের ব্যবস্থা করা কঠিন নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রোপণ করার পূর্বে চারা অবস্থানের কাল কিছু বাড়িয়ে দিলে গাছ পরবর্তী কালে লবণের আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে পারে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ধানের জমিতে সার একই সঙ্গে না দিয়ে যদি ⅔ অংশ মাটি কাদা করবার সময় দেওয়া যায় এবং বাকী ⅓ অংশ শস্যোদ্গমের অব্যবহিত পূর্বে দেওয়া হয়, তাহলে সর্বাধিক ফলন পাওয়া যায়।

সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে ধান চারা অবস্থা থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। প্রথম রোপিত গাছকে যদি পুনরায় দু-ভাগ করে অন্যত্র রোপণ করা হয়, তাহলে ফলন অপ্রত্যাশিতভাবে দেড় থেকে দু-গুণ বেড়ে যায়। ক্রমশঃ দীর্ঘ মেয়াদী শস্যের পরিবর্তে অল্প মেয়াদী শস্যের প্রচলন বাড়ানো হয়েছে। এই ব্যবস্থায় ফলনও যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, জমিও পরবর্তী শস্যের জন্যে শীঘ্র মুক্ত করা যায়। অনেক সময় চারা অবস্থার কাল ২০-২১ দিন পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে রোপণ করলে জমি ততদিন পূর্বেই মুক্ত হতে পারে। বলা বাহুল্য, একই জমিতে একাধিক ফসল পেতে হলে সার, জল ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির সঙ্গে অধিকতর শ্রমদানেরও প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ অনেক সময় অল্পকালের মধ্যে জমি প্রস্তুত, শস্য আহরণ, শুষ্ককরণ, মাড়াই, সংরক্ষণ ইত্যাদি যথেষ্ট দ্রুতগতিতে না করতে পারলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। ত্বরান্বিত করবার একমাত্র উপায় উপযুক্ত যন্ত্র ব্যবহার। এজন্যে অল্পশক্তি-সম্পন্ন সহজচালিত যন্ত্রাদির প্রয়োজন। এই বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

শস্যোৎপাদন নানা উপকরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তন্মধ্যে সার, বীজের জাত, জল ও আবহাওয়ার বিষয় অল্পবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু যে মৃত্তিকার সাহায্যে বা মাধ্যমে গাছ পুষ্টি আহরণ করবে, তার প্রতি আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে, আপাত দৃষ্টিতে একই রকম জমিতে সমপরিমাণ সার, জল ইত্যাদি দিয়েও ফলন প্রচুর বিভিন্ন হয়। এরকম ধারণা হয়েছে যে, প্রত্যেক মৃত্তিকার একটি স্বতন্ত্র বা নিজস্ব উর্বরতার ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষমতা যদি কম থাকে, তাহলে অধিক মাত্রায় সার, জল ও উন্নত জাতের বীজ দিয়েও আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে না। মনে হয় যে, সুপরিচর্যার ফলে মৃত্তিকার এই নিজস্ব উর্বরতার ক্ষমতা ক্রমশঃ চরম পর্যায়ে উপনীত করা সম্ভব। এই বিষয়ে খুব সম্ভবতঃ জৈব ও অজৈব সারের উপযুক্ত অনুপাত একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এইরূপ চিন্তাধারার পশ্চাতে কিছু গবেষণালব্ধ জ্ঞান রয়েছে বটে, কিন্তু অধিকতর দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণার নির্দেশ দিচ্ছে।

পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করতে হয়েছে যে, আমাদের বিশেষ করে বাংলা দেশে উপযুক্ত পরিমাণ সার, জলসরবরাহ, উন্নতজাতের বীজ, উর্বর জমি পর্যাপ্ত নয়। এই সবগুলি অভাব দূরীভূত হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এক্ষেত্রে কৃষি-বিজ্ঞানীরা একটি নতুন কৃষিব্যবস্থার প্রতি মনঃসংযোগ করেছেন। নাম দেওয়া হয়েছে নিবিড় চাষ পদ্ধতি। যে প্রকল্প অনুসারে এই পদ্ধতি প্রচলিত করা হয়েছে, তাকে সংক্ষেপে প্যাকেজ প্রোগ্রাম বলা হয়। পশ্চিম বাংলার বর্ধমানে ১৯৬২-৬৩ সালে ১২ই অগাষ্ট এই কার্যক্রম গৃহীত হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালের হিসাবে দেখা যায় যে,

এই কার্যক্রম ২২২৮টি গ্রামে ১ লক্ষ ৫২ হাজার হেক্টরে সম্প্রসারিত হয়। ঐ জেলার প্রায় ৩০ শতাংশ আবাদী জমি এই কার্যক্রমের আয়ত্তে আসে। এই কার্যক্রম অনুসারে কৃষকদের জমিতে অনুশীলনের ফলে আমন ধান, আউস ধান, পাট, গম, আলু, আখ যথাক্রমে ২৫, ২৫, ৩০, ৩৩, ৩১, ও ৩১% অধিক ফলন দেয়। ঐ সময়ের মধ্যে নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস সারের ব্যবহার যথাক্রমে ৩ ও ৬ গুণ বেড়ে ২৩,৫০০ ও ১২,৪০০ টনে দাঁড়ায়। উন্নত জাতের বীজের ব্যবহারও প্রায় ৬ গুণ বেড়ে ২০০০ টনে পৌঁছায়। এছাড়া বীজ পরীক্ষা ও নির্বাচন কার্যের জন্যে কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে। কীটঘ্ন ঔষধাদির ব্যবহারও এই অনুপাতে বেড়ে গেছে। মৃত্তিকা পরীক্ষা এই কার্যক্রমের একটি প্রধান অঙ্গ। তদনুসারে ১৯৬৬-৬৭ সালে প্রায় ১০,০০০ নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ৮২০০ নমুনা পরীক্ষা করে জমির উপযুক্ততা বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তিন বছরের অনুশীলনের ফল আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ফলন কিছু বেড়েছে, কিন্তু তেমন চমকপ্রদ কিছু আশা করা যাচ্ছে না। কৃষিযন্ত্রাদি মেরামত ও প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন, কৃষি সম্পর্কে সাম্প্রতিক তথ্যাদির প্রচার সমবায় ঋণ, বিপনন ও সংরক্ষণ ইত্যাদি নানা বিষয়েও প্যাকেজ প্রোগ্রাম কেন্দ্রগুলি কৃষকদের সহায়তা দান করে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্যাকেজ প্রোগ্রামের সাফল্য আশা করা যায়। ফলন আশানুরূপ না হলেও বিরুদ্ধ মত প্রকাশের সময় হয় নি। অবশ্য এই কার্যক্রম পরিচালনা ব্যয়বহুল হলে আশা ভঙ্গের যথেষ্ট কারণ থাকবে। এই সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট তথ্য জানা নেই।

"বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে, সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ, স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধান কার্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্রনির্মাণও এদেশে কোনদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে-ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

পশু-পক্ষীর কি মন আছে ?

রমেশ দাশ

পরিবেশ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল অপরিসীম ও চিরন্তন। অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে মানুষ তার পরিবেশকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছে। তার এই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসেরই পরিণাম হলো বিবিধ বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি। মানুষের সমুহ সৃষ্টির মধ্যেই তার পরিবেশের প্রতিফলন ঘটেছে।

বিচিত্র পশু-পক্ষী আমাদের পরিবেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটিও অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট নিবিড় ও অন্তরঙ্গ। শুধু যে বিবিধ প্রয়োজনেই আমরা পশু-পক্ষীদের কাজে লাগাই তাই নয়, আমাদের সৌন্দর্যবোধ ও অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকাটি নিতান্ত তুচ্ছ নয়—সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রকলায় পশু-পক্ষী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আমাদের মত পশু-পক্ষীদেরও প্রাণ আছে। তাই অস্পষ্ট হলেও তাদের সঙ্গে স্বভাবতঃই আমাদের একটা আত্মীয়তা বা একাত্মতার বোধও যেন আমরা অনুভব করে থাকি।

পশু-পক্ষীদের যে প্রাণ আছে, এই কথাটা কেউই হয়তো অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাদের মন আছে কি? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অনেকেই যেন দ্বিধা বোধ করেন। এখানে মন বলতে কি বোঝাচ্ছে, সেটা পরিষ্কার করে বলা দরকার। মন বলতে আমরা সাধারণতঃ চেতনাকেই (Consciousness) বুঝে থাকি। চেতনার সরলতম অবস্থা হলো অনুভূতি। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের অনুভূতি লাভ করে থাকি। দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন অবস্থায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আরাম ও যন্ত্রণার অনুভূতি ঘটে। পেশীর অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের স্থিতি ও গতির অনুভূতি। চেতনার উন্নততর প্রকাশ আমরা দেখতে পাই রাগ, দ্বেষ, ভয়, ভালবাসা, ঈর্ষা, ঘৃণা, বিস্ময় ইত্যাদি আমাদের বহু বিচিত্র আবেগ ও প্রক্ষোভের মধ্যে। আরও উন্নততর স্তরে স্মৃতি, কল্পনা ও চিন্তারূপে চেতনার প্রকাশ ঘটে। উন্নততম স্তরে চেতনা উৎসারিত হয় সৃজনশীল চিন্তা, বিশ্বানুভূতি ও অধ্যাত্ম উপলব্ধির রূপ নিয়ে।

মনের সম্বন্ধে আমাদের এই যে ধারণা, তারই আলোকে বিচার করে দেখতে হবে, পশু-পক্ষীর মন আছে কিনা। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী Lloyd Morgan তাঁর Law of parsimony-তে এই বলে প্রাণী-বিজ্ঞানীদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে—"...In interpreting the behaviour of an animal, the simplest interpretation, i.e. the interpretation in terms of the lower, rather than the higher level, must always be preferred," (A Dictionary of Psychology—J. Drever); অর্থাৎ নিতান্ত বাধ্য না হলে প্রাণীর মধ্যে উন্নততর ক্ষমতার অস্তিত্ব কল্পনা করা অসঙ্গত। শুধু প্রাণীর ক্ষেত্রেই নয়, বস্তুতঃ সর্বক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীদের নীতি হলো জটিলতা পরিহার করে যথাসম্ভব সরলভাবে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করা। এই নীতি অনুসরণ করে অনেকেই পশু-পক্ষীর আচরণকে যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার সামিল করে দেখেছেন। তাঁদের বক্তব্য, পশু-পক্ষীর মধ্যে চেতনার অস্তিত্ব কল্পনা না করেও যদি তাদের আচরণের ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে তাদের চেতনা আছে, এরকম

ধারণা করাটা অবৈজ্ঞানিক ও অসঙ্গত। রসনার সঙ্গে খাদ্যবস্তুর সংস্পর্শ ঘটলে লালা নিঃসৃত হওয়াটা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাপার, একটা দৈহিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাঁদের মতে, পশু-পক্ষীর আচরণগুলিও নিতান্তই দেহগত। যার যে রকম দৈহিক সংগঠন, সে প্রাণী বস্তুজগতের এবং তার দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন অবস্থার প্রভাবে সেই রকম প্রতিক্রিয়া করে—তার জন্যে চেতনা বা মনের প্রয়োজন কি? পশু-পক্ষীদের মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করবার যে প্রবণতাটি মানুষের মধ্যে দেখা যায়, তার মূল হয়তো বা তার আপন শ্রেষ্ঠত্ববোধের মধ্যেই নিহিত আছে। মানুষ তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এত বেশী সচেতন যে, অপরাপর প্রাণীদের সে যেন নিতান্ত করুণার পাত্র বলেই মনে করে—তার মত তাদেরও যে মন থাকতে পারে, এই কথা সে ভাবতেও নারাজ। বিখ্যাত দার্শনিক Decartes তো স্পষ্টই বলেছেন, মনের অধিকারী আত্মা শুধু মানুষেরই আছে, অন্য কোন প্রাণীর নেই, অন্যান্য প্রাণীগুলি এক একটি যন্ত্রবিশেষ।

মনুষ্যেতর প্রাণীদের মন আছে কিনা, এই সম্বন্ধে যথাযথ উত্তর পাবার আগে আর একটা বিষয় আমাদের আলোচনা করা দরকার। আমার নিজের যে একটা মন আছে, সেটা আমি সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু আমি ছাড়া আর যে সব মানুষ, তাদেরও যে মন আছে, সেটা আমি ধরে নিই কেন? আমি তো আর কারও মনকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না! অথচ অন্য মানুষেরও যে মন আছে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আপন অভিজ্ঞতার আলোকে অন্যের আচরণকে বিশ্লেষণ করেই এই সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি। আমার মনের বিভিন্ন অবস্থায় আমি বিশেষ বিশেষ আচরণ করে থাকি। অন্যকেও যখন অনুরূপ আচরণ করতে দেখি, তখন স্বভাবতঃই অনুমান করে নিই যে, তার এই আচরণের পশ্চাতেও উক্ত মানসিক অবস্থাটি বর্তমান। তাছাড়া আমি আমার মনের অবস্থাকে ভাষা, অঙ্গভঙ্গী, অঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। অন্য আর একজন মানুষও যখন এই সব মাধ্যম ব্যবহার করে, তখন স্বভাবতঃই সেও যে মনের অধিকারী, এই প্রত্যয় আমার জন্মে। অবশ্য Watson-প্রমুখ চরমপন্থী আচরণবাদীরা (Behaviourists) মানুষের মধ্যেও মনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করবার পক্ষপাতী। তাঁরা মানুষকে একটি অত্যন্ত জটিল যন্ত্ররূপে গণ্য করেছেন এবং তার সমূহ আচরণের (মানসিক আচরণেরও) শারীরিক ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। এটি Law of parsimony-র চূড়ান্ত প্রয়োগের (বস্তুতঃ অপপ্রয়োগের) একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। যে মনের অস্তিত্ব আমাদের নিজের কাছে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট, তাকে অস্বীকার করতে চাইলেই তার অস্তিত্ব ঘুচে যায় না। আচরণবাদীরা মনকে যে অস্বীকার করেছেন তাঁদের সেই অস্বীকৃতিটা তো তাঁদের মনেরই কাজ। দেহের সঙ্গে মনের সম্বন্ধটা যে অচ্ছেদ্য, সে কথা নিশ্চয় আমরা অস্বীকার করছি না। এমনও হতে পারে যে, মন বা চেতনা দেহের একটা উন্নত অবস্থারই পরিণাম (Product) বা প্রতিক্রিয়া। বেহালার তারে ছড়ির ঘর্ষণে যেমন সুরের মূর্ছনার সৃষ্টি হয়, হয়তো বা দেহেরই একটি বিশেষ অবস্থায় তেমনি করে চেতনারও উদ্ভব ঘটে। কিন্তু সুরের মূর্ছনাটা যেমন বেহালার তার নয়, চেতনাটাও সেই রকম দৈহিক অবস্থা নয়। দেহ এবং চেতনা দুই-ই সত্য, সুতরাং দুটিকেই মেনে নিতে হবে।

মানুষ প্রাণী-জগতেরই অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ হলেও মূলতঃ সেও একটি প্রাণী। বিবর্তনের অবিচ্ছিন্ন ধারাটি অতিক্রম করে সরলতম প্রাণ-কোষটি বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে করতে পরিশেষে মানুষের রূপে

রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সুতরাং মানুষের মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, সেগুলির উদ্ভব আকস্মিক নয়, বিবর্তনের বিশেষ বিশেষ স্তরে তাদের উন্মেষ ঘটেছে, ক্রমে ক্রমে সেই সব বৈশিষ্ট্য উন্নততর এবং জটিলতর হয়েছে এবং পরিশেষে মানুষের মধ্যে তাদের চরমতম বিকাশ ঘটেছে। মানুষের মধ্যে চেতনার যে রূপটির পরিচয় আমরা পাই, মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে সেই ধরণের উন্নত চেতনা না থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সরলতররূপে তাদের মধ্যেও যে চেতনা বর্তমান, তার অজস্র নিদর্শন মেলে।

অন্য একটি মানুষের আচরণ দেখে যদি আমি বিশ্বাস করি, তার মন আছে (এবং আমার এই বিশ্বাস যদি গৃহীত হয়), তাহলে মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে অনুরূপ আচরণ দেখে তাদেরও মন আছে, এরকম সিদ্ধান্তে আসতে বাধা কোথায় ?

পশু-পক্ষীদের যে অনুভূতি আছে, সেটা তো সুস্পষ্ট। যার চোখ আছে তার দেখবার অনুভূতিও আছে, যার কান আছে তার শোনবার অনুভূতিও আছে—এটাই তো অনিবার্য সিদ্ধান্ত। তাছাড়া পশু-পক্ষীরা যে তাদের পরিবেশের অন্তর্গত বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে প্রভেদ বুঝতে পারে, সেটা তো তাদের আচরণ থেকেই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। পাখী বহু সামগ্রীর মধ্য থেকে খাদ্যশস্যের কণাগুলি খুঁটে খুঁটে খায়, নীড় রচনা করবার সময় সমুপস্থিত হলে বিশেষ বিশেষ বস্তু সংগ্রহ করে আনে। তু-তু করে ডাকলে কুকুর কাছে ছুটে আসে, দূর দূর করে চেঁচিয়ে উঠলে ছুটে পালায়। তাদের যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আরাম, যন্ত্রণার অনুভূতি আছে, সে সম্বন্ধেও সন্দেহের কিছু অবকাশ থাকতে পারে না। তৃষ্ণার বোধ না থাকলে জলের পাশে ছুটে যায় কেন ? ক্ষুধার অনুভূতিই যদি না থাকবে, তাহলে খাবার অন্বেষণ করে কেন বেড়াবে ? পরিতৃপ্ত পশু-পক্ষীর অঙ্গ-সঞ্চালন ও কণ্ঠ-নিঃসৃত ধ্বনির মধ্যেই তাদের আরামবোধটি প্রকটিত হয়ে ওঠে। পরিতৃপ্ত কুকুর বা পায়রার পরিচিত ছবিটি কার না জানা আছে ? যন্ত্রণায় কাতর প্রাণীর দেহসঞ্চালন ও আর্তনাদের সঙ্গে অনুরূপ অবস্থায় মানুষের আচরণের কি যথেষ্ট সাদৃশ্য নেই ? পশু-পক্ষীর মধ্যে বিবিধ আবেগ ও প্রক্ষোভের পরিচয়ও তো আমরা অহরহ পেয়ে থাকি। ষাঁড়ের লড়াই, মোষের লড়াই, ভেড়ায় ভেড়ায় যুদ্ধ, শালিকের ঝগড়া, মোরগের লড়াই, কাকের ঝগড়া যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা এই সব পশু-পক্ষীর প্রচণ্ড রোষ ও আক্রোশের সুস্পষ্ট পরিচয় পেয়েছেন। পাখী যখন তার বাচ্চাদের খাওয়ায়, গাভী যখন তার বৎসের অঙ্গ লেহন করে, কপোত-কপোতী যখন বিচিত্র লীলায় মত্ত হয়ে ওঠে, তা দেখে কি বুঝতে কষ্ট হয় যে, তাদেরও স্নেহ-ভালবাসার বোধ আছে ? পশু-পক্ষীর মধ্যে সৌন্দর্যবোধের সন্ধানও অনেকেই পেয়েছেন। ময়ূর তার কলাপ বিস্তার করে নৃত্য প্রদর্শন করে ময়ূরীর সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করে। সিংহ তার কেশর বিস্ফারিত করে নিজেকে আরও সুন্দর করে তোলে সিংহীর মনোহরণ করবার উদ্দেশ্যে। বিহঙ্গকুলের মিলিত কূজনের মধ্যে তাদের সঙ্গীতপ্রীতির ইঙ্গিতটি কি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না ? পশু-পক্ষীর অকারণ নৃত্যের মধ্যেও কি আমরা তাদের সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ দেখতে পাই না ? পশু-পক্ষী যে অতীতের অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে পারে এবং সাধ্যমত সমস্যারও সমাধান করতে পারে, তারও বহু পরিচয় পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের সাহায্যে পাওয়া গেছে। যে লোকটি নিয়মিত খাবার দেয়, তাকে দেখলেই পায়রার দল ভিড় করে আসে, যে লোকটি তাদের দেখলেই তাড়া করে, তাকে দেখা মাত্রই তারা উড়ে পালায়। অতীতের অভিজ্ঞতা মনে না পড়লে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে এরকম ভিন্ন ভিন্ন

আচরণ সম্ভব হতো না। শিম্পাঞ্জী, বানর, হাতী, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদি প্রাণীর বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বহু ঘটনার কথা অনেকেরই জানা আছে। পশু-পক্ষীর সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা আছে কি না, বৈজ্ঞানিকেরা তার উপর বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং দেখেছেন—যে প্রাণী যত উন্নত, সে তত সহজে অধিকতর জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। জার্মান মনোবিদ্ কোহলার একটি খাঁচার মধ্যে একটি শিম্পাঞ্জীকে আবদ্ধ করে রাখলেন। খাঁচার বাইরে কিছু দূরে এক কাঁদি কলা রাখা হলো। খাঁচার মধ্যে দুটি লাঠি ছিল—একটি নিরেট, অপরটি ফাঁপা। অনেকক্ষণ ধরে কিছু না খেয়ে শিম্পাঞ্জীটি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল। সে প্রথমে একটি লাঠির সাহায্যে কলার কাঁদিটি নিজের কাছে টেনে আনতে চেষ্টা করলো, কিন্তু নাগাল পেলো না। তারপর অপর লাঠিটির সাহায্য নিল, কিন্তু এবারও নাগাল পেলো না। অসহায় হয়ে তখন সে লাঠি দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। আকস্মিকভাবে এক সময়ে নিরেট লাঠিটার কিছুটা অংশ ঢুকে গেল ফাঁপা লাঠিটার মধ্যে। এই ভাবে একটা লম্বা লাঠি পেয়ে তার সাহায্যে সে কলার কাঁদিটা নিজের কাছে টেনে আনলো। তার এবম্বিধ আচরণের মধ্যেই কি তার সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, কল্পনা ও চিন্তাশক্তি—এক কথায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না? বস্তুতঃ এই শিম্পাঞ্জীটি পরে অধিকতর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল। এবারে খাঁচার মধ্যে কোন লাঠিই ছিল না। কিন্তু শিম্পাঞ্জীটি হাল ছেড়ে না দিয়ে তার শয়নকক্ষ থেকে একটি কম্বল নিয়ে এসেছিল এবং তার একটি প্রান্ত হাতের মুঠোয় ধরে বাকী অংশটাকে খাঁচার বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে তারই সাহায্যে কলার কাঁদিটি নিজের কাছে টেনে এনেছিল।

পশু-পক্ষীর মধ্যে বিশ্বানুভূতি ও অধ্যাত্ম উপলব্ধি আশা করাটা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু তাদের যে দলপ্রীতি আছে, দলের পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি ও সহানুভূতি আছে, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে। একটা কাককে যদি জখম করা যায়, তাহলে চকিতের মধ্যে কোথা থেকে হাজার হাজার কাক এসে সম্মিলিতভাবে তারস্বরে আর্তনাদ সুরু করে দেবে। তাদের বেদনাবোধ তখন তীব্র হয়ে ওঠে এবং আততায়ীর বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশ এমন প্রবল আকার ধারণ করে যে, ভয় দেখালেও তখন তারা পালিয়ে যায় না, বরং মরিয়া হয়ে আক্রমণ প্রতিহত করে। হাতী, বানর, বেবুন প্রভৃতি প্রাণীর সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনেকেই লাভ করেছেন।

আমাদের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, পশু-পক্ষীরও মন আছে, যদিও তাদের মনটি মানুষের মনের মত উন্নত নয়। বিবর্তনের স্তরভেদে পশু-পক্ষীর মধ্যেও মানসিক গঠন ও ক্ষমতার তারতম্য আছে। যে প্রাণী যত উন্নত, তার মনটিও তত উন্নত।

প্রবন্ধ শেষ করবার আগে আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রয়োজন বোধ করছি। মানুষ ভাষার সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে বলেই তাদের প্রত্যেকেরই যে একটা মন আছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পশু-পক্ষীর সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারি না, তাই তাদের মন আছে কিনা, সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি না। কথাটা বহুলাংশে সত্য। কিন্তু পশু-পক্ষীর সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারি না বলেই যে তাদের কোন ভাষা

নাই, এ রকম মনে করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। পৃথিবী-জোড়া মানুষের মধ্যেই অজস্র রকমের ভাষা দেখতে পাওয়া যায়। আমরা কটা ভাষাই বা জানি? কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষেরই যে একটি মন আছে, মনেপ্রাণে আমরা সেটা বিশ্বাস করি। অবশ্য চেষ্টা করলেই মানুষের বিভিন্ন ভাষা আমরা শিখতে পারি। কিন্তু ভাষা আয়ত্ত করবার পূর্বে প্রত্যেক মানবশিশুই বিচিত্র অনির্দিষ্ট ধ্বনির মাধ্যমে নিজের মনের অবস্থা প্রকাশ করতে প্রয়াস পায়। আমরা সাধারণতঃ তাকে আবোল-তাবোল কথা বলে থাকি। শিশুর এই আবোল-তাবোল কথা অন্য কেউ বুঝতে না পারলেও তার বেশ কিছুটা কিন্তু তার মা বুঝতে পারেন, কারণ দরদ দিয়ে তিনি তাঁর শিশুকে বুঝতে চেষ্টা করেন, কোন্ শব্দ উচ্চারণ করে শিশু কি বোঝাতে চেষ্টা করছে, মন দিয়ে তা অনুধাবন করেন। কেউ যদি ঠিক এমনি দরদ দিয়ে পশু-পক্ষীর ভাষা বুঝতে চেষ্টা করেন, তাহলে তিনিও হয়তো অনেকটাই সফল হবেন। এর জন্যে চাই পশু-পক্ষীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, তাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেলামেশা, অবিরাম অনলস চেষ্টা ও সাধনা। অল্প চেষ্টাতেই পশু-পক্ষীর কণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দের কয়েকটির অর্থ বোঝা তো সম্ভব বলে মনে হয়; যেমন—যন্ত্রণাসূচক ও আনন্দসূচক ধ্বনি। কারণ প্রক্ষোভ প্রকাশের শাব্দিক ধরণটা পশু-পক্ষী ও মানুষ, সকলের ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম। এর নামই বৈজ্ঞানিকেরা দিয়েছেন প্রক্ষোভ-ভাষণ। দরদ ও ভালবাসা দিয়ে পশু-পক্ষীর সঙ্গে মিশলে, যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাদের বিভিন্ন অবস্থার ছবি ও শব্দ তুলে নিয়ে বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে তার বিশ্লেষণ করলে রূপকথার রাজপুত্রের মত ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কথাবার্তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে না পারলেও পশু-পক্ষীর ভাষা হয়তো অনেকটাই আয়ত্ত করা সম্ভব হবে।

"অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের অংশ বংশপরম্পরা ধরিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ যে পুষ্প-কলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, প্রতি জীবের সম্মুখেও বংশপরম্পরাগত অনন্ত জীবন প্রসারিত। সুতরাং বর্তমানকালের জীব অনন্তের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে যুগযুগান্তরব্যাপী ইতিহাস ও সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

লেভ দাভিদোভিচ্ লান্দাউ

পরিমলকান্তি ঘোষ

লেভ দাভিদোভিচ্ লান্দাউ (Lev Davidovich Landau) ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী বাকুতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন বাকুতে পেট্রোলিয়াম শিল্পে কর্মরত একজন বড় পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনীয়ার ও তাঁহার মা ছিলেন একজন ডাক্তার।

লান্দাউ তের বৎসর বয়সে (১৯২১ সালে) স্কুলের পড়া শেষ করেন। সেই সময়েই তাঁহার বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের দিকে আগ্রহ জন্মিয়াছিল। ঐ অতি অল্প বয়সেই তিনি উচ্চতর গণিতের গোড়ার কথার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন। বয়স অল্প বলিয়া তাঁহার পিতা-মাতা তখনই তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করেন নাই। তিনি এক বৎসর বাকুর অর্থনৈতিক-টেক্‌নিক্যাল স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৯২২ সালে তিনি বাকু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং একই সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, গণিত বিভাগ ও রসায়ন বিভাগে পড়িতে থাকেন। পরে রসায়ন বিভাগে পড়া বন্ধ করেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার সারা জীবন রসায়ন শাস্ত্রে আগ্রহ ছিল।

১৯২৪ সালে লান্দাউ লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হন। সেই সময় লেনিনগ্রাদ সোভিয়েত রুশিয়ার বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রস্থল ছিল ও সেখানে তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উপর সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইত। শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের নবতম সাফল্যগুলির সহিত পরিচিত হইত এবং তাহারা সেগুলির আরও বিকাশ সাধনে চেষ্টিত হইত। এই পরিবেশের প্রভাব লান্দাউ-এর পরবর্তী জীবনের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সময় তাঁহার হাইজেনবার্গ, শ্রোয়েডিংগার এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাদের কার্যের সহিত পরিচয় ঘটে এবং এই নূতন বিষয়ে তাঁহার পারদর্শিতাও জন্মে।

১৯২৭ সালে তিনি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া লেনিনগ্রাদের ফিজিকো-টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটে গবেষণা করিতে থাকেন—এইখানে তিনি ১৯২৬ সাল হইতে গবেষক-ছাত্র ছিলেন। এই সময়েই তাঁহার ঘনত্বম্যাট্রিক্স (সাংখ্যায়নিক অপারেটর)-এর ধারণার প্রবর্তন করেন। এই ধারণাটি পরবর্তী কালে কোয়ান্টাম সংখ্যায়ন ও কিনেটিক্সে (Kinetics) বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়।

১৯২৯ সালে লান্দাউকে সোভিয়েত সরকার বিদেশে পাঠান। এই তাঁহার প্রথম বিদেশ যাত্রা এবং এই যাত্রায় তিনি দেড় বৎসর বিদেশে ছিলেন। এই সময়ে তিনি জার্মেনী, সুইটসারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ডেনমার্কে যান। তিনি এই সময়ে নীলস্ বোর (Niels Bohr), পাউলি (Pauli), এরেনফেষ্ট (Ehrenfest), হাইজেনবার্গ (Heisenberg), ভিগনার (Wigner), ব্লখ (Bloch), পাইয়ার্লস (Peierls) ও অন্যান্য ইউরোপীয় তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহিত পরিচয় লাভ করেন।

লান্দাউ যখন ৎসুরিখে (সুইটসারল্যাণ্ড) পাউলির সান্নিধ্যে ছিলেন, তখন তিনি পাউলির সহায়ক আর. পাইয়ার্লস (R. Peierls)-এর সহিত কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রোডিনামিক্সে একটি পরবর্তী কালে খ্যাত কাজ সম্পন্ন করেন।

পরিণত বয়সে লেভ লান্দাউ

লান্দাউ, (১৯২৯)

কোপেনহাগেনের কাজই লান্দাউ-এর পক্ষে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। সেই সময়ে সেখানে ইউরোপের তাত্ত্বিক পদার্থবিদেরা নীলস্ বোরের নিকট সব একত্রিত হইতেন এবং আলোচনা সভা বসিত, যাহার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান ও শিক্ষালাভ হইত। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সৃষ্টির সহিত বোর এবং হাইজেনবার্গের নেতৃত্বাধীন এই কোপেনহাগেন গোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। কোপেনহাগেনে অবস্থিতি এবং বোরের আলোচনা সভাগুলিতে অংশগ্রহণ লান্দাউকে তাত্ত্বিক পদার্থবিদরূপে গড়িয়া তুলিতে বিশেষ ভূমিকা লইয়াছিল। পরবর্তী কালে লান্দাউ ও বোরের সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। বোরকে লান্দাউ তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলিয়া মনে করিতেন। বোরের সুপারিশে তাঁহার প্রবাসের শেষ বৎসর রকফেলার ফাউণ্ডেশন হইতে বৃত্তি পান।

বিদেশে থাকিবার সময়ে লান্দাউ তাঁহার ধাতুর ডায়াম্যাগ্‌নেটিজম (Diamagnetism) সম্পর্কে ইলেকট্রনের ডায়াম্যাগ্‌নেটিজম-এর তত্ত্ব গড়িয়া তোলেন। ইহাই পরে লান্দাউ ডায়াম্যাগ্‌নেটিজম নামে খ্যাত হয়।

১৯৩১ সালে লেনিনগ্রাদে ফিরিয়া আসিয়া তিনি লেনিনগ্রাদ ফিজিকো-টেক্‌নিক্যাল ইন-ষ্টিটিউটে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৩২ সালে তিনি খারকভে যান এবং সেখানে ইউক্রাইনীয় ফিজিকো-টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে তাত্ত্বিক দলের বৈজ্ঞানিক নায়ক হন। সেই একই সময়ে তিনি খারকভের বলবিদ্যা-যন্ত্রনির্মাণ ইনষ্টিটিউটের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ১৯৩৫ সাল হইতে খারকভ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

কিয়েভে নীপার নদে নৌকা-ভ্রমণে (১৯৫৫) লিফশিৎস, লান্দাউ (বামদিক হইতে) ও অন্যান্য পদার্থবিদ্‌গণ।

১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে বোরের আমন্ত্রণে তিনি কোপেনহাগেনে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ডক্টর অব সায়েন্স (পদার্থবিদ্যা—গণিত বিভাগে) উপাধি পান—ইহার জন্য তাঁহাকে কোন থিসিস্ সমর্থন করিতে হয় নাই। ১৯৩৫ সালে তিনি অধ্যাপকের (Professor) পদ পান।

খারকভে অবস্থান লান্দাউয়ের বৈজ্ঞানিক

ও শিক্ষক জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ধাপ। সেখানেই তিনি প্রথম একটি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্দের গোষ্ঠী গঠন করেন, যাহা পরবর্তী কালে সোভিয়েত দেশে ও তাহার বাহিরে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এইখানে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছিল বহুমুখী। তিনি দৃঢ় বস্তুর পদার্থবিদ্যা, আণবিক সংঘাত তত্ত্ব, নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ্কের পদার্থবিদ্যা (Astrophysics), তাপগতি বিজ্ঞান, কোয়ান্টাম ইলেক্‌ট্রোডিনামিক্স (Quantum electrodynamics), গ্যাসের কিনেটিক তত্ত্ব ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমস্যা-সমূহে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে কিনেটিক সমীকরণ (কুলম্ব্ বলের জন্য) ফেরো-ম্যাগ্‌নেটিক বস্তুর ডোমেন স্ট্রাকচার (Domain structure of ferro-magnetic substances) এবং ফেরো-ম্যাগ্‌নেটিক অনুনাদ (Ferro-magnetic resonance), অ্যান্টি ফেরোম্যাগ্‌-নেটিক (Antiferromagnetic) পরিবর্তন, নিউক্লিয়াসের সাংখ্যায়নিক তত্ত্ব ও দ্বিতীয় স্তরের দশান্তর (Second-order phase transition)-এর সুবিখ্যাত তত্ত্ব সংক্রান্ত কার্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৭ সালে লান্দাউ মস্কোয় সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্যাল প্রব্লেমস-এ চলিয়া আসেন এবং কর্মজীবনের শেষ পর্যন্ত সেখানে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা বিভাগ পরি-চালনা করেন। এই সময়ে তিনি লিফশিৎস্ (Lifshits)-এর সহযোগিতায় তাঁহার সুবিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার পাঠক্রমের বইগুলি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১৯৩৮ সালে এই পাঠক্রমের প্রথম বই 'সাংখ্যায়নিক পদার্থবিদ্যা' (Statistical Physics) প্রকাশিত হয়—তাহার পর বলবিদ্যা (Mechanics) ও ক্ষেত্রতত্ত্ব (Theory of Fields) প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী গঠনের কাজ করিয়া যাইতে থাকেন—তাঁহার ছাত্রেরাও ক্রমশঃ স্বীকৃতি পাইতে থাকেন। এই স্থানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের কাজের মধ্যে মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণের ক্যাসকেড তত্ত্ব (Cascade theory of showers, ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত) এবং অতি পরিবাহীর অন্তর্বর্তী অবস্থা (Inter-mediate states of superconductors) সংক্রান্ত গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময় হইতে লান্দাউ-এর গবেষণার সর্বাপেক্ষা অধিক অংশ হইল মৌলিক কণা ও নিউক্লীয় পারস্পরিক ক্রিয়ার পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত।

১৯৪১ সালে তিনি হিলিয়াম-২-এর অতি-প্রবাহিতা তত্ত্বের গোড়াপত্তন করেন—হিলিয়াম-২-এর এই আশ্চর্যজনক ধর্মটি আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন সোভিয়েত আকাদেমিসিয়ান পি. এল. কাপিৎসা (P. L. Kapitsa) ১৯৩৮ সালে। এই গবেষণায় লান্দাউ আর একটি ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন—তাহা হইল হিলিয়াম-২-তে দ্বিতীয় শব্দ। ইহা ১৯৪৪ সালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা আবিষ্কৃত হয়।

১৯৪১-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্যাল প্রব্লেম্‌স্ যুদ্ধের জন্য কাজানে স্থানান্তরিত হয়—লান্দাউ তখন সেখানে ছিলেন।

১৯৪৩ সালে লান্দাউ মস্কোয় ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার অধ্যাপনা কার্য আবার আরম্ভ করেন। ১৯৪৩ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নতাপমাত্রার পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করেন এবং ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মস্কো ফিজিকো-টেক্‌নিক্যাল ইন-ষ্টিটিউটে সাধারণ পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। এই কাজের সূত্রেই তিনি ১৯৪৪ সালে লিফশিৎস-এর সাহচর্যে 'নিরবচ্ছিন্ন মাধ্যমসমূহের বলবিদ্যা' (Mechanics of continuous media) বইখানা প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি তরল পদার্থের গতিবিদ্যার চর্চা, বিশেষতঃ

বিচ্ছিন্নতা, বিস্ফোরণ ও উদ্দামতা (Turbulence) সম্পর্কে অতিশয় মনোনিবেশ করেন।

তাঁহার ১৯৪৪-৪৫ সালের গবেষণার মধ্যে গ্যাসের দহনের পদার্থবিদ্যা, বিস্ফোরণ-তত্ত্ব এবং প্রোটন কর্তৃক প্রোটন বিচ্ছুরণ ও কোন মাধ্যমে আয়নীকরণের জন্য শক্তিক্ষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬ সালে তিনি ইলেক্ট্রন প্লাজ্মার দোলন তত্ত্বের অবতারণা করেন, পরে ইহাই লান্দাউ-ড্যাম্পিং (Landau damping) নামে খ্যাত হয়।

১৯৪৬ সালে লান্দাউ সোভিয়েত সভ্য (আকাদেমিশিয়ান) নির্বাচিত হন। তিনি বইখানা প্রকাশিত হয়—স্মরদিনস্কির (Smorodinski) সহযোগিতায়।

তাঁহার ১৯৪৯-১৯৫৩ সালের কাজের মধ্যে ইলেক্ট্রোডিনামিক্সের বিভিন্ন সমস্যা, হিলিয়াম-৪এর সান্দ্রতার (Viscosity) তত্ত্ব, অতিপরিবাহিতার ঘটনানুপূর্বিক নূতন তত্ত্ব (New Phenomenological theory of superconductivity) এবং মহাজাগতিক রশ্মির পদার্থবিদ্যায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার—দুইটি দ্রুত ধাবমান কণার সংঘর্ষে কণাসমূহের বহুগুণ উৎপত্তি সংক্রান্ত কার্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মার্কিন বিজ্ঞানী গেল-ম্যান ও লান্দাউ (মস্কো, ১৯৫৬)

তাঁহার দশান্তর তত্ত্ব ও অতিপরিবাহিতা তত্ত্বের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পান।

পরবর্তী কালে লিফশিৎসের সহযোগিতায় তাঁহার তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার পাঠক্রমে বই প্রকাশের কাজ করিয়া যাইতে থাকেন—১৯৪৮ সালে তাঁহাদের কোয়ান্টাম বলবিদ্যা (Quantum Mechanics) প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে তাঁহার মস্কো ফিজিকো-টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটে প্রদত্ত বক্তৃতা (সাধারণ পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে) প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ সালে 'পারমাণবিক নিউক্লিয়াস তত্ত্ব'

১৯৫৪ সালে লান্দাউ কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্বের মূল নীতিগত সমস্যার বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করেন এবং পমেরাঞ্চুক (Pomeranchuk)-এর সহযোগিতায় ১৯৫৫ সালে দেখান যে, কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্ব ও বিন্দুস্থ পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে মূল নীতিগত বিরোধ আছে।

১৯৫৬-৫৮ সালে লান্দাউ তথাকথিত ফের্মি তরল পদার্থের (Fermi liquid) সাধারণ তত্ত্বে গোড়াপত্তন করেন—ইহা তরল হিলিয়াম-৩ ও ধাতুর মধ্যস্থ ইলেকট্রন সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ১৯৫৭

সালে তিনি একত্রিত (বা সম্মিলিত) যুগ্মতার সংরক্ষণ (Conservation of combined parity) সূত্রের প্রস্তাবনা করেন ও এই সম্পর্কে দুই অংশক বিশিষ্ট নিউট্রিনোর (Two-component neutrino) আলোচনাও করেন।

১৯৫৫ সালে লাণ্ডাউ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপকরূপে নূতন অধ্যায় লক্ষ্য করা যায়—তাহা হইল মৌলিক কণার তত্ত্বের দিকে পুনরায় তাঁহার মনোনিবেশ। ১৯৫৯ সালে তিনি কিয়েভ (Kiev) উচ্চ শক্তির পদার্থবিদ্যার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মৌলিক কণার তত্ত্বের গঠন সম্পর্কে নূতন মূলনীতির প্রস্তাবনা করেন। ইহা লইয়া নানা দেশে বহু বিজ্ঞানী গবেষণা করিতে থাকেন। তিনি নিজে

লাণ্ডাউ ও বোর (মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৬১)

প্রত্যাবর্তন করেন এবং অধ্যাপনা ও গবেষণা পরিচালনে রত থাকেন। এই সময়ে তিনি লিফশিৎসের সহযোগিতায় 'নিরবচ্ছিন্ন মাধ্যম-সমূহের ইলেকট্রোডিনামিক্স' (Electro-dynamics of continuous media) বইখানি প্রকাশ করেন।

পরবর্তী কালে লাণ্ডাউ-এর গবেষণার এক

১৯৫৯ সালে কণার পারস্পরিক ক্রিয়ার বিস্তা (Amplitude)-এর মৌলিক ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া একটি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। ১৯৬০ সালে তাঁহার কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্বের কিছু গবেষণা প্রকাশিত হয় এবং কিয়েভ সম্মেলনের প্রস্তাব পাউলির স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

একটি বিষাদময় ঘটনায় তাঁহার গবেষণার এই

নূতন অধ্যায়ে ছেদ পড়ে—১৯৬২ সালে ৭ই জানুয়ারী তিনি মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন এবং তাঁহার সংজ্ঞালোপ হয়। কয়েক মাস জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম চলে। তাঁহার জীবন রক্ষা হয়—কিন্তু তিনি আর কার্যে যোগদানে সক্ষম হন নাই। ১৯৬৮ সালে ১লা এপ্রিল তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

লান্দাউ তাঁহার উচ্চকোটির গবেষণার জন্য দেশে ও বিদেশে প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন—বহু বিদেশী পণ্ডিত সভা তাঁহাকে সম্মানসূচক সভ্যপদে বরণ করিয়াছিল। ১৯৬২ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান, তাঁহার হিলিয়ামের সম্পর্কে গবেষণার জন্য।

বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অনির্বাণ আগ্রহ ও উদ্দীপনা, তীক্ষ্ণ সমালোচনা, বুদ্ধিমত্তা এবং পরিষ্কার চিন্তাধারা বহু তরুণ বিজ্ঞানীকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল।

পরামর্শ ও সমালোচনার জন্য কি তরুণ, কি প্রবীণ, বহু বিজ্ঞানী 'দাউ'-এর নিকট আসিতেন (তাঁহার ছাত্র এবং সহকর্মিরা তাঁহাকে 'দাউ' বলিয়া ডাকিতেন)। তাঁহার সমালোচনা ছিল নির্মম ও কঠোর, কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি কোমল হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। যে কোন ছাত্র তাঁহার কাছে আসিয়া নিজের বৈজ্ঞানিক সমস্যা আলোচনা করিতে পারিত কিন্তু ছাত্রটিকে নিজেকেই সমস্যাটি বিশ্লেষণ করিতে হইত—সে যাহা নিজে চেষ্টা করিলে করিতে পারে—তাহা লান্দাউকে দিয়া করাইয়া লওয়া চলিত না।

লান্দাউ নিজের উচ্চকোটি গবেষণার ফল ব্যতীত বৈজ্ঞানিক জগতের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন—ছাত্রদের জন্য তাঁহার লিখিত বইগুলি এবং কৃতী ছাত্রদের ও সহকর্মীদের লইয়া গঠিত বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী।

এই প্রবন্ধে লিখিবার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকা হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

১। A. A. Abrikosov—Akademik L. D. Landau (Nauka, Moskva, 1965);

২। Zhurnal Eksperimentalnoi Teorekicheskoi Fiziki, Volume 34 (1958), p. 3;

৩। Colleced Papers of L. D. Landau, edited and with an introduction by D. ter Haar (Pergamon Press, London, 1965)

হৃদ্‌সংযোজন, কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যোজনা ও প্লাষ্টিক সার্জারি

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

চিকিৎসাশাস্ত্রে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ অগ্রগতি হয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বিগত কয়েকটি বছরে। এই হিসেবে শল্যচিকিৎসায় হৃৎপিণ্ড পরিবর্তন, প্লাষ্টিক সার্জারি এবং কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতিতে—এমন কি, ঋগ্বেদেও এমন কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে, যেগুলি নেহাৎই যদি কাল্পনিক না হয়, তাহলে মনে করা যেতে পারে যে, হয়তো বা প্রাচীন ভারতেও অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা একেবারে নগণ্য ছিল না। খণ্ডিতমুণ্ড গণেশ ও দক্ষের কবন্ধে যথাক্রমে হাতী ও ছাগমুণ্ডের সংযোজন, গৌতমের শাপে পুরুষত্বহীন ইন্দ্রের দেহে পাঁঠার শুক্রাশয়-সংযোজনে তাঁর নপুংসকত্ব দূরীকরণ এবং ঋগ্বেদে বর্ণিত দধ্যঙ্কের কবন্ধে অশ্বমুণ্ড সংযোজন, বিশপাল ও ভদ্রীমতীর পুত্র হিরণ্যহস্তের পায়ে এবং হাতে যথাক্রমে লৌহময় কৃত্রিম পদ ও স্বর্ণময় কৃত্রিম হস্তের সংযোজনার উল্লেখ আছে। এসব কল্পনা বা বাস্তব যাই হোক না কেন, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী কিংবা মহেন্‌জোদাড়োর যুগের কোন রমণীর সোনার গহনার প্যাটার্ণ যদি আবার আরো উৎকর্ষ লাভ করে বর্তমান যুগোপযোগী ফ্যাশনেবল অলঙ্কাররূপে চালু হয়, তাতে তার মূল্য কিংবা উৎকর্ষকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

মোটর গাড়ী বা অন্যান্য যান্ত্রিক উপাদানের খুচরা অংশগুলি কিনতে পাওয়া যায়। প্রয়োজন-মত তাদের কিনে এনে বিগড়ানো যন্ত্রাংশকে বদ্‌লে আবার যন্ত্রগুলিকে চালু করা যায়। কিন্তু মানুষের দেহযন্ত্রের পক্ষে এরূপ মেরা-মতি আগে একেবারেই সম্ভব ছিল না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ধাপে ধাপে উন্নতির ফলে সে অসম্ভব ব্যাপারও আজ কতকটা সম্ভব হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রো-পচারের কথাই ধরা যাক। সময়-সাপেক্ষতা হেতু প্রথম বাঁধা ছিল, যথোপযুক্ত সংজ্ঞালোপের ব্যবস্থা। সাধারণ সংজ্ঞালোপক গ্যাস-প্রয়োগসহ কোন কৃত্রিম উপায়ে (যেমন—রোগীকে শৈত্যবিধায়ক গদীর উপর শুইয়ে কিংবা রক্তকে দেহের বাইরে কোন আধারের মধ্যে ঠাণ্ডা করে তাই তার দেহে চালিয়ে দিতে দিতে) হিমশীতল অবস্থায় (Hypothermia) প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত দেহের রক্তস্রোতকে সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ করে রাখা সম্ভব হবার ফলে হৃৎপিণ্ডের উপর সরাসরি অস্ত্রোপচার কতকটা সহজতর হয়। এর পরের স্তরে, হৃৎ-পিণ্ডকে রক্তশূন্য করেও ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা (Superior and inferior vena cavæ) থেকে অপরিশোধিত রক্তপ্রবাহকে একটি বিশেষ শোধন যন্ত্রের মধ্যে চালিত করে তাথেকে প্রথমে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বহিষ্কার ও পরে অক্সিজেনের সংযোগ ঘটিয়ে ঐ পরিশুদ্ধ রক্তকে (হৃৎক্রিয়ার মতই) পাম্প করে দেহের সর্বাংশে তাকে চালিত করবার সাফল্যজনক পদ্ধতি আর একটি দুরূহ বাঁধাকে দূর করতে সক্ষম হয়। এভাবে যথা-যথভাবে অনুকূল ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের রক্তশূন্য অবস্থায়, উজ্জ্বল আলোক সম্পাতে চোখে দেখে,

শুধু হৃৎপিণ্ডের মধ্যেকার অসম্পূর্ণ, অক্ষম কিংবা ক্ষত ভাল্‌ব্‌ বা কপাটিকাগুলির মেরামত কিংবা তাদের বদলে দেওয়াও সম্ভব হয়েছে। আগে ধারণা ছিল মানবেতর দেহের কোন টিস্থ মাহুষের দেহে কলম করবার যোগ্য নয়। কিন্তু অধুনা সে ধারণা আর নেই; কারণ, শল্য-চিকিৎসকেরা ইতিমধ্যে মাহুষের হৃৎপিণ্ডে ভাল্‌ব্‌-গুলির মেরামতি কিংবা তাদের বদলে বাছুর কিংবা শূকরের বাচ্চার হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ব্‌-সংযোজনের দ্বারা অনেক হৃদ্‌রোগীকে সুস্থ ও নিরাময় করতে সক্ষম হয়েছেন।

বর্তমান প্রগতির যুগে বিয়ের আগে এবং সময়েও বর-কনের মধ্যে হৃদয় বিনিময়ের ব্যাপার চালু আছে এবং বিয়ের মন্ত্রেও আছে "তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক" ইত্যাদি। আর রক্ষণশীল সমাজে কনের বাবা বরকে কন্যা সম্প্রদান করেন। বর্তমান প্রগতিশীল অস্ত্রোপচারের যুগে পিতার বদলে শল্যচিকিৎসক রোগীকে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের অপর কোন ব্যক্তির হৃদয় দান করেন (তার সম্মতি বা অসম্মতির কোন তোয়াক্কা না রেখেই) আর রোগীও এক তরফা ইচ্ছা করে "তোমার হৃদয় আমার হউক,...(আমার হৃদয়ের বিনিময়ে নয়, দধীচির মত পরার্থে তোমার প্রাণের বিনিময়ে)।"

কিছুকাল আগেও এরূপ হৃদ্‌সংযোজন অসম্ভব বা ধারণাতীত ছিল, কিন্তু মাহুষ অধ্যবসায়ের ফলে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলে। পৃথিবীর কয়েকজন একনিষ্ঠ ও অধ্যবসায়ী শল্য-চিকিৎসকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আজ মোটর গাড়ীতে "Spare parts" বদলে তাকে চালু রাখবার মতই মরণাপন্ন অক্ষম হৃৎ-পিণ্ডের স্থলে সদ্য দুর্ঘটনায় মৃত অপর কোন অল্পবয়স্ক লোকের হৃৎপিণ্ড বসিয়ে তাকে আবার সুস্থ ও কর্মক্ষম করে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ তখন সবে মাত্র শেষ হয়েছে—মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ শল্য-চিকিৎসক হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর নাম ডাঃ ওয়েন ওয়ানগেন্‌স্টিন। ঐ সময়ে পরপর দু-জন তরুণ শিক্ষার্থী ক্যালিফোর্ণিয়ার নরম্যান এডওয়ার্ড শুমওয়ে (১৯৪৯-৫০) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনের ক্রিশ্চিয়ান বার্ণার্ড (১৯৫৬-৫৮) তাঁর কাছ থেকে হৃদ্‌শল্যচিকিৎসার জ্ঞান আয়ত্ত করে নিজ নিজ দেশে ফিরে যান। এঁরাই হলেন হৃদ্‌সংযোজন অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। ১৯৫৯ সালে ডাঃ শুমওয়ে ও তাঁর সহযোগী ডাঃ রিচার্ড লোয়ার একটি কুকুরের দেহে অন্য কুকুরের হৃৎপিণ্ড সংযোজন করে তাকে আট দিন বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হন। একটি বিশেষ পদ্ধতিতে ডাঃ শুমওয়ে পরপর আরও অনেকগুলি কুকুরের দেহে অনুরূপ হৃদ্‌সংযোজন-অস্ত্রোপচার করেন। এই পদ্ধতিতে তিনি প্রথম হৃৎপিণ্ডটি অপসারণের সময়ে দুটি মহাশিরাযুক্ত অলিন্দকে (হৃৎপিণ্ডের উপরকার কক্ষ) অক্ষত রেখে নতুন হৃৎপিণ্ড বসাবার সময়ে এই দুটিকে এমনভাবে জুড়ে দেন, যাতে শুধু টিস্থ ও ধমনীগুলিকে সেলাই করে দিলেই অস্ত্রোপচারটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ১৯৬৭ সালের ২০শে নভেম্বরের Journal of the American Medical Association-এ তিনি এই সম্বন্ধে তাঁর দশ বছরের গবেষণার ফল ও অস্ত্রোপচারের পদ্ধতির বিশেষ বিবরণ দেন।

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ বার্ণার্ড লুই ওয়াস্কানাস্ক নামক রোগীর দেহে হৃৎসংযো-জনে সফলকাম হন। যদিও ১৮ দিন পরেই রোগীর মৃত্যু হয়, কিন্তু তা ঘটে অন্য কারণে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ততদিন ভালভাবেই চলেছিল। পরবর্তী জানুয়ারী মাসে (১৯৬৮) ডাঃ শুমওয়ে ৫৪ বছর বয়স্ক ইস্পাত-শ্রমিক মাইক কাস্‌পেরাকের

দেহে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে মৃত ৪৩ বছর বয়স্কা ভার্জিনিয়া হোয়াইট নামক একটি মহিলার হৃৎপিণ্ড প্রায় চার ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে সংযোজন করেন। প্রায় ঐ একই সময়ে ডাঃ বার্ণার্ড ও আর একটি রোগীর দেহে অনুরূপ অস্ত্রোপচার করেন। ডাঃ ক্রিস বার্ণার্ডের নাম সুদক্ষ হৃৎসংযোজনকারী শল্যচিকিৎসকরূপে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে মাত্র কয়েক মাস আগে ডাঃ ব্লেইবার্গ নামক একজন দন্তচিকিৎসকের দেহে একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তির দেহ থেকে গৃহীত হৃৎপিণ্ড সাফল্যের সঙ্গে সংযোজনের পর থেকেই। ঐ রোগী প্রায় দুই মাস হাসপাতালে থেকে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বহু টাল সামলে আবার নিজগৃহে ফিরে যান এবং এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ ভাবে না হলেও কয়েক মাস ধরে বেঁচে আছেন। জুলাই মাসের প্রথম ভাগে পুনরায় অসুস্থতার জন্যে তিনি হাসপাতালে ফিরে আসেন। তখন ডাঃ বার্ণার্ড ভাবছিলেন যে, হয়তো বা তাঁর দেহে অন্য নতুন হৃৎপিণ্ড সংযোজনের আবশ্যক হবে। কিন্তু ৩০শে জুলাইয়ের খবরে দেখা যায় যে, ফুসফুস ও যকৃতের রোগ নিরাময়ের পর আবার রোগী হাসপাতালের ওয়ার্ডের মধ্যেই চলাফেরা করছেন এবং ডাক্তারদের নির্দেশমত প্রতিদিন প্রায় এক ঘণ্টা করে ধীরে ধীরে পায়চারি করেন। বর্তমানে ডাঃ বার্ণার্ড একই সঙ্গে হৃৎপিণ্ড এবং ফুস্‌ফুস বদলের জন্যে বেনি স্মিথ নামক ১৬ বছরের একটি শ্বেতাঙ্গ বালককে রোগী হিসাবে অস্ত্রোপচারের জন্যে ঠিক করে রেখেছেন।

ডাঃ বার্ণার্ডের আশাতিরিক্ত সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমেরিকার টেক্সাসের হাউস্টোনে ডাঃ ডেন্টন কুলী পাঁচ দিনের মধ্যে পর পর তিনটি হৃৎসংযোজন অস্ত্রোপচার করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে—যথাক্রমে ৩১, ৪২ এবং ৩০ মিনিটে। এদের মধ্যে প্রথমটি এক সপ্তাহ পরে বেশ ভাল হয়ে ওঠে, দ্বিতীয়টি সপ্তাহান্ত পর্যন্ত বাঁচবার জন্যে যুঝছিল, কিন্তু তৃতীয়টি অস্ত্রোপচারের আড়াই দিন পরে মারা যায়। সর্বশেষ মিসেস ব্ল্যাঙ্ক স্মিথ নামক ৪৯ বছর বয়স্কা রোগীর দেহে তিনি সর্বপ্রথম অন্য একটি মেয়ের হৃদয় সংযোজন করেন এবং তাঁর এরূপ ৮টি হৃৎসংযোজিত রোগীর মধ্যে এখন পর্যন্ত পাঁচজন বেঁচে আছেন এবং তাদের দু-জন সুস্থভাবে হাস-পাতাল থেকে গৃহে ফিরে গেছেন।

ক্যানাডার মণ্টিলেও দুটি হৃৎসংযোজিত রোগীর মধ্যে ৪৯ বছর বয়স্ক গায়েতান প্যারিস নামক রোগীটি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করছেন। আমাদের দেশেও বোম্বাইয়ের ডাঃ পি. কে. সেন এরূপ একটি হৃৎসংযোজনের অস্ত্রোপচার করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় রোগীটি কয়েক ঘণ্টা পরেই মারা যায়। শল্যচিকিৎসার বহুক্ষেত্রে অগ্রণী হলেও কমিউনিস্ট পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি এখনো অনুরূপ অস্ত্রোপচারের পথে বেশী এগিয়ে আসে নি। শুধু ব্র্যাটিস্লাভার কোন হাসপাতালে ১০ই জুলাই পঞ্চাশ বছর বয়সের একটি চেক রমণীর দেহে অনুরূপ অস্ত্রোপচার (২৩ তম) হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই রাত্রিতেই তার মৃত্যু ঘটে। আজ পর্যন্ত সর্বসাকুল্যে ২৫ জন হৃৎসংযোজিত রোগীর মধ্যে মাত্র সাত জন বেঁচে থাকলেও তা এরূপ দুরূহ অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে কম সাফল্যের পরিচায়ক নয়।

হৃৎপিণ্ডের আভ্যন্তরীণ ভাল্‌ব্‌ বদল অস্ত্রো-পচারের কথা আগেই বলা হয়েছে। মস্কোতে সোভিয়েট শল্যচিকিৎসকেরা একটি বাছুরের হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ব্‌ দিয়ে এক বিদেশী মহিলার হৃৎপিণ্ডের দুটি ভাল্‌ব্‌ বদলে দেবার পর তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে নিজের দেশে চলে গিয়েছেন। ডাঃ মিথালোভিচ সোলোভিয়ফ সম্প্রতি একটি কৃত্রিম ভাল্‌ব্‌ দিয়ে একজন মহিলার

হৃৎপিণ্ডের দ্বিতীয় ভাল্‌ব্‌টিও সাফল্যের সঙ্গে বদ্‌লে দিয়েছেন। অন্যান্য দেশেও অনুরূপ অস্ত্রোপচার হামেশাই করা হচ্ছে। আমাদের দেশও পিছিয়ে নেই। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের নায়ার হাসপাতালে দুর্ঘটনায় মৃত এক ব্যক্তির মহাধমনী-মূলে অবস্থিত ভাল্‌ব্‌টিকে (Aortic valve) কেটে নিয়ে ত্রিশ বছর বয়স্ক একজন কারখানা শ্রমিকের ঐ অক্ষম ভাল্‌ব্‌টিকে সরিয়ে তার স্থানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হৃদ্‌সংযোজনের মতই পৃথিবীর নানা দেশে রোগীর যকৃৎ ও বৃক্ক সংযোজনের অস্ত্রোপচারও অনেকটা সাফল্যের পথে এগিয়ে গেছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ শল্যচিকিৎসক মানব-দেহে বানরের যকৃৎসংযোজনের চেষ্টা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে অস্ত্রোপচার সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। কেম্ব্রিজে অধ্যাপক কেইনও মানুষের প্রায় সমশ্রেণীর প্রাণী বেবুনের দেহে সাতবার শূকরের যকৃৎসংযোজনের চেষ্টা করেন, কিন্তু তার কোনটিই সফল হয় নি। অধুনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোর (ডেনভার) একটি হাসপাতালে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সময়ে নিউইয়র্কের একটি মেয়ের যকৃৎকে কেটে বাদ দিয়ে সেখানে সদ্যঃমৃত একটি যুবকের যকৃৎ-সংযোজনা সফল হয়েছে এবং মেয়েটি ভালই আছে। গত এক বছরে ঐ হাসপাতালে এই ধরণের বারোটি অস্ত্রোপচার হয়েছে এবং তার মধ্যে আটজন এখনো বেঁচে আছে। ৩১শে জুলাইয়ের খবর—টেক্সাস হার্ডষ্টোনের হৃৎসংযোজন বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডেন্টন কুলীর নেতৃত্বে শল্যচিকিৎসকগণ ষোল মাস বয়স্ক একটি মেয়ের যকৃৎ কেটে বাদ দিয়ে সে স্থানে সদ্যমৃত অপর একটি শিশুর যকৃৎ স্থাপন করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মেয়েটিকে বাঁচানো যায় নি।

বৃক্ক (Kidney) সংযোজনের চেষ্টাও একই সঙ্গে চলছে। সাধারণতঃ রোগীর দেহ অপরের বৃক্ককে বহিরাগত পদার্থরূপে (Foreign body) সহজে গ্রহণ করতে চায় না। মিউনিকের ডাঃ ওয়াল্টার থাইমারের মতে, রোগীর দেহের লিম্ফোসাইট জাতীয় সেলগুলি এরকম অস্ত্রোপচারের সাফল্যের প্রধান অন্তরায়। যে প্রণালীতে দেহে টিটেনাস বা ডিপ্‌থেরিয়া প্রতিষেধক সিরাম তৈরি সম্ভব, ঠিক সেই ভাবে লিম্ফোসাইট বিরোধী সিরাম প্রস্তুত করে মিউনিকের অধ্যাপক ব্রেনডেল কয়েকটি কুকুরের শরীরে তা ইঞ্জেকসন করে যখন তাদের দেহে যথেষ্ট প্রতিরোধ শক্তি জন্মায়, তখন তাদের বৃক্ক সংযোজনার ক্ষেত্রে খুব সাফল্য অর্জন করেন। এভাবে ঐরূপ প্রাক্-চিকিৎসার পর মানব-দেহেও বৃক্ক সংযোজনার চেষ্টা চলছে, একটি যন্ত্রের সাহায্যে অক্সিজেনযুক্ত রক্তকে অল্প তাপমাত্রায় (১৫° সেন্টিগ্রেড), যাতে কিড্‌নির পুষ্টিমান ঠিক থাকে সেভাবে চালিত করা হয় জীবাণু-শূন্য প্লাস্টিক ব্যাগে পরিস্রুত জলের মধ্যে বিশেষভাবে উত্তাপ-নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখা দাতার কিড্‌নিতে এবং তার সঙ্গে ধমনী, শিরা ও মূত্রনলিকার সংযোগ সাধন করা হয়। এরূপে বৃক্কসংযোজন অনেকটা সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে গ্লাসগোর ষ্ট্যাথক্লাইড বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃত্রিম সক্রিয় মেম্‌ব্রেনযুক্ত ক্ষুদ্রাকৃতি নকল বৃক্ক যন্ত্রও প্রস্তুতির পথে। তার সাহায্যে রক্তকে গ্লুকোজ বা পটাসিয়াম শূন্য না করেও তার অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলির অতি সহজেই নিষ্কাশন সম্ভব হবে। পূর্বে ব্যবহৃত সেলুলোজ মেম্‌ব্রেনের চেয়েও তার কার্যকারিতার দ্রুততা অন্যূন তিন গুণ বেশী হবে।

বিগত দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের কাল থেকেই যুদ্ধে বা দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যথাযথ অস্ত্রোপচার কিংবা কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের দ্বারা তাদের কর্মক্ষম রাখবার চেষ্টা আশাতিরিক্ত সাফল্যলাভ করেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ১১ মাস আগে ক্যালিফোর্ণিয়ার

শ্রীমতী জর্জিয়া অ্যান হোয়াইটের মোটর গাড়ী দুর্ঘটনার ফলে হাতখানি দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। লস্ এঞ্জেলেসের কাউন্টি জেনারেল হাসপাতালের শল্যচিকিৎসকগণ তৎক্ষণাৎ তা দেহের সঙ্গে জুড়ে দেন, প্রায় ৮ ঘন্টাব্যাপী অস্ত্রোপচারের দ্বারা। দ্বিতীয়বার তিন ঘন্টার পরিশ্রমে হাতের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নার্ভগুলিকে জোড়া লাগানো হয়। বর্তমানে তিনি ঐ জোড়ালাগা ছিন্ন হাত দিয়ে বাসন ধোওয়া প্রভৃতি রান্নাঘরের কিছু কিছু কাজও করতে পারছেন।

লণ্ডনের হ্যামারস্মিথ হাসপাতালের শল্য-চিকিৎসা-গবেষকদের একটি নতুন অবদান, প্লাষ্টিকের তৈরি আঙুলের ছোট ছোট অস্থি সংযোজন। হাতের আঙুল কাটা গেছে কিংবা অস্থি-সন্ধিপ্রদাহে (Arthritis) সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে, এরূপ ১৫ জন রোগীর হাতে এরই মধ্যে এরকম সুলভ (দাম মাত্র দু-শিলিং করে) প্লাষ্টিকের কৃত্রিম অস্থি সংযোজন করা হয়েছে। এরূপ অস্থি-সংযোজনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন জটিলতা নেই এবং মনে হয় তার সক্রিয়তা সারা জীবনই থাকবে।

আগে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সাধারণতঃ কাঠ ও লোহা দিয়েই তৈরি করা হতো। বর্তমানে যতদূর কম লোহার সঙ্গে, অ্যালুমিনাম কিংবা প্লাষ্টিক দিয়ে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তৈরী হওয়াতে একদিকে যেমন হাল্কা ও সুদৃশ্য হয়েছে আবার অন্য দিকে অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং অধিকতর কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে প্লাষ্টিক সার্জারি বা দেহের কোন অংশের অস্বাভাবিক গঠন অথবা যুদ্ধ বা দুর্ঘটনার ফলে বিকৃত ও দৃষ্টিকটু হলে অস্ত্রোপচারের দ্বারা তাদের উপযুক্ত মেরামতি করে স্বাভাবিক অবস্থায় আনবার ব্যাপারে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের শল্যচিকিৎসকগণও এরূপ চিকিৎসায় যে কতকটা পারদর্শী ছিলেন না, এমন নয়, কারণ শুশ্রুত সংহিতায় অস্ত্রোপচারের দ্বারা বিকৃত নাকের পুনর্গঠনের পদ্ধতিরও উল্লেখ আছে। বর্তমান যুগে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ঐরূপ অস্ত্রোপচারের ফলে বহুলোকের বিকৃত বা কদর্য মুখাবয়ব (অস্বাভাবিক গঠন বা দুর্ঘটনা-জনিত) রূপান্তরিত হতে পারে, সুদক্ষ বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসকের হাতে সুন্দর মুখশ্রীতে। আগে এরূপ অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেও বহু বাধা ছিল, যেমন ত্বক বা অন্য কোন টিস্যুর কলম অন্য জাতীয় (অর্থাৎ অন্য প্রাণীর কিংবা সমশ্রেণীর অন্যের দেহ থেকে গৃহীত হলেও) গ্রহীতা তাকে সম্পূর্ণ আপনার নিজের দেহে গ্রহণ করতে পারতো না। ফলে নিজ দেহ থেকে গৃহীত না হলে অনেক স্থলেই অস্ত্রোপচার বিফল হয়ে যেত। সুতরাং উপযুক্ত দাতার অভাবে অনেক সময়েই যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্ভব হয়ে উঠতো না। শুধু প্লাষ্টিক সার্জারিই নয়, হৃৎপিণ্ড বৃক, যকৃৎ, ফুসফুস প্রভৃতি সংযোজনের ক্ষেত্রেও ঐ একই কারণে বাধাপ্রাপ্ত ও বিলম্বিত হতো। কিন্তু সম্প্রতি অধ্যাপক সার পিটার মেডাওয়ার লণ্ডন এবং কেম্ব্রিজের কয়েকটি হাসপাতালে প্রথমে আগেই উল্লিখিত লিম্ফোসাইট-প্রতিরোধী সিরাম (ALS) ইঞ্জেকশন করে নেংটি ইঁদুরের দেহে ভিন্ন জাতীয় প্রাণীর (গিনিপিগ, খরগোশ ও মানুষের) ত্বক কলম করে দেখেছেন যে, ঐরূপ কলম শুধু যথাযথভাবে গৃহীতই হয় না, বহুকাল ধরে অটুটও থাকে। সুতরাং মনে হয় এর সাহায্যে অদূর ভবিষ্যতে "বিষম" টিস্যু কলম অস্ত্রোপচার সফল হওয়াতে প্লাষ্টিক সার্জারির সাফল্যের পথে এই বিশেষ বাধাটি দূর হবে।

যদিও কোন কোন জাতীয় বিষম কলম' যেমন —মানবদেহে বানরের (প্রায় সমজাতীয়) টেষ্টিসের কলম (ভরোনোফ পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচারে)

আগেও সফল হয়েছে, তবুও স্বদেহের কোন নিকটবর্তী স্থান থেকে অব্যাহত রক্ত চলাচল সমন্বিত সবৃন্ত টিস্যু কলমের দ্বারাই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা সুফল লাভ সম্ভব। দৃষ্টান্ত হিসেবে নাক মেরামতির কাজে ঐরূপ সবৃন্ত ত্বককে কপালের নীচের অংশ থেকে তুলে এনে ক্ষত বা বিকৃত নাককে অতি সুষ্ঠুভাবে পুনর্গঠন করা সম্ভব হয়। ভগ্ন বা বিকৃত চোয়াল প্রভৃতির জন্যে পেল্‌ভিসের ইলিয়াক অস্থির শীর্ষ থেকে হাড়ের টুক্‌রো কেটে এনে মেরামতির কাজে নিয়োগ করা হয়। মুখের কাটাক্ষত বা শয্যাক্ষত ঢাকবার জন্যে প্রায়ই উরুদেশের ত্বক থেকে উপরকার স্তর, অতি ধারালো ক্ষুরের সাহায্যে পাত্‌লা কাগজের মত উঠিয়ে নিয়ে মেরামতির স্থানকে চেঁছে যখন তার উপর সূক্ষ্ম বিন্দুর আকারে রক্ত দেখা দিতে থাকে, তখন তাকে নিভাঁজ অবস্থায় দক্ষতার সঙ্গে বিছিয়ে দিলেই নিজ ত্বকের সুষ্ঠু কলম সেখানে লেগে যায়।

এরকম ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, যকৃত প্রভৃতি সংযোজন, কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন এবং প্লাষ্টিক সার্জারি সম্বন্ধে সব কিছু বলা সম্ভব নয়। সুতরাং মানব-কল্যাণে বর্তমান সময়ে শল্যচিকিৎসার অভূতপূর্ব সাফল্য এবং ভবিষ্যতে আরো অগ্রগতির আভাস মাত্র দিয়েই এখানে প্রবন্ধটি শেষ করছি।

"* * * বিজ্ঞানের কূটতত্ত্ব ও কঠিন সমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই যে উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ে, তাহা নহে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, ভাল করিয়া দেখিতে শেখাই বিজ্ঞান-সাধকের মুখ্য সম্বল, বিজ্ঞানপাণ্ডিত্যে যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা যে বিদ্যালয়ে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিয়া বড় হইয়াছেন, তাহা নহে।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

কলকাতার জল-নিষ্কাশন সমস্যা ও তার সমাধান

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের বৃহত্তম মহানগরী কলকাতার নাগরিক জীবন প্রতি বছর বর্ষাকালে কিছুদিন বিপর্যস্ত ও বিড়ম্বিত হয়। জল-নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্তের অভাবে বস্তি ও নাবাল অঞ্চলের অধিবাসীদের অশেষ দুর্গতি ও অচিন্তনীয় দুর্দশার অন্ত থাকে না। জলে ডুবে রাস্তাঘাট ভেঙেচুরে খানা-খন্দে পরিণত হয়। ফলে যান চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। যানবাহনের অপরিসীম লোকসান ও নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকবার জন্যে রোগ আক্রমণের ও দৈব দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। কোন কোন দিন অত্যধিক প্লাবনের ফলে যান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় শিল্প, বাণিজ্য ও প্রশাসনের বিশেষ ক্ষতি হয়। এই ক্ষতির পরিমাণ দিনে কয়েক কোটি টাকা অনুমিত হয়।

কলকাতার জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থা

পৌর অঞ্চলে বাড়ীর উঠান, ছাদ প্রভৃতি থেকে বর্ষার দিনে বর্ষার জল ও সেই সঙ্গে গৃহের পরিত্যক্ত ময়লা জল রাস্তার ভূগর্ভস্থ নালায় এসে পড়ে; যেমন—স্নানের ঘরের ব্যবহৃত জল, ঘর-ধোওয়া জল, তরকারী কোটা জল, ভাতের ফেন, মলমূত্র, শৌচের জল, থুতু, কফ প্রভৃতি। শিল্পের পরিত্যক্ত জলও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। অন্য সময় যখন বৃষ্টির জল পড়ে না, তখন কেবল মাত্র কলের জল নাগরিক ব্যবহারের পর তার বর্জিত অংশ (যেটি সাধারণতঃ পানীয় জল সরবরাহের ৭৫ থেকে ৮০%) ভূগর্ভস্থ নালা দিয়ে কলকাতার নানা পাম্পিং ষ্টেশনে চলে যায়। পাম্প করবার পর সেখান থেকে বিরাট খোলা নিকাশী ড্রেন বেয়ে কুলটি নদীতে পড়ে। আগে কলকাতার ময়লা জল পড়তো বিদ্যাধরী নদীতে। বিদ্যাধরী ময়লা জলের তলানী পড়ে বুজে যাওয়ায় এখন পড়ে ডাঃ বি. এন. দের পরিকল্পিত নতুন কাটা খাল বেয়ে কুলটি গাঙে। কলকাতার বর্ষার জল ও ময়লা জল একই ভূনল (Sewer) দিয়ে বেরিয়ে যায়। তাই একে যুক্ত প্রথা বা Combined system বলে। বর্ষার জলের তুলনায় পরিস্রুত জল, জনগণ ও শিল্পের ব্যবহারের পর বর্জিত ময়লা জল বর্ষার জলের অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। তাই বর্ষা ছাড়া অন্য ঋতুতে রাস্তায় জল জমার সমস্যাই নেই, যদি না কোন নরগহ্বর (Manhole) বুঁজে জল আটকে উপচে না পড়ে।

প্রাচীন কলকাতার দুরবস্থা

প্রতি বছরই দীর্ঘস্থায়ী ঘন বর্ষা হলে রাস্তাঘাট, নাবাল জমির ঘরের মেঝে ডুবে সারা সহর এক নরককুণ্ডে পরিণত হয়। অনেকের ধারণা—আগে তো এমন ছিল না তা আজ এমন কেন? আগে ছিল না বললে বোধ হয় সত্যের কিছু অপলাপের সম্ভাবনা। তার প্রমাণ Dr. W. Graham-এর শতাধিক বর্ষ পূর্বের উক্তি: "After a heavy fall of rain, a canoe was the 'preferable mode of transit' in Chitpore Road and being asked to point to some healthy situation in Calcutta, and draw a moral for its peculiarities, he stated that he had never found

amidst the wilderness the green spot on which the philanthropist would repose and exclaim hicsanitas".

হয়তো জব চার্ণকের ভুল হয়েছিল এখানে তাঁর মালপত্রের কুঠি নির্মাণ করা, তবে একথা সত্য যে, এত বৃহৎ কলেবর নিয়ে এই সামান্য বাণিজ্যকেন্দ্র মহানগরীতে রূপান্তরিত হবে, এই ধারণা নিশ্চয়ই তাঁর ছিল না।

এখন দেখা যাক, কেন রাস্তাঘাটে বর্ষার সময় এত জল জমে? যদি কেউ আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়া লক্ষ্য করে থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই দেখবেন যে, কোন কোন দিন খুব মুষলধারে ঘন্টার পর ঘন্টা বৃষ্টি হয়ে চলেছে। মাঝে সামান্য সময় থামছে, আবার জোরে বৃষ্টি পড়ছে। কোন দিন আবার দেখবেন, ঝির ঝির করে ইল্‌শেগুঁড়ির মত বৃষ্টি পড়ছে। শরৎকালে কখনও হঠাৎ মুষলধারে মিনিট দশেক বৃষ্টি হলো আবার নির্মল নীলাকাশ। জল যখন মাটিতে পড়ে মাটি সে জল কিছুটা শুঁষে নেয় ও বাকী 'নক্র-শার্দুল সেবিত পল্বল সমাবৃত' যে রাজধানী কলকাতা, তার বহু পল্বল অর্থাৎ পচা পুকুর, ডোবা ও নাবাল জমি বেয়ে বৃষ্টির জল নিকাশী ড্রেন দিয়ে খাল, বিল ভরিয়ে নদীতে চলে যায়। লেভেল নিয়ে দেখা গেছে, ভাগীরথীর দুই কূল উঁচু। জমির ঢাল নদীর তীর থেকে দূরে নেমে গেছে। যেহেতু এই অঞ্চলের জমি গঙ্গার অব-বাহিকার সহস্র সহস্র বছরের পলি জমে তৈরি, সেহেতু নদীর মরাখাত বর্ষার জল চলে খানা তৈরি হয়েছে। সেই জল আগে কলকাতার লবণ হ্রদের দিকে চলে যেতো। আজকের মত আগেকার দিনে এত পাকা বাড়ী ও পাকা রাস্তা হয় নি, যেখানে আগে খালি জমিতে বৃষ্টির জল কিছুটা শুঁষে নিত। পুকুর, খানা ও ডোবা শিল্প ও বস্তির জন্যে বোজানো হয় নি, যেখানে বৃষ্টির জল খানিকটা জমা থাকতো। এখন গৃহ ও কল-কারখানা বৃদ্ধির ফলে সমস্যা হয়েছে কিছু কঠিন। এই জল নিকাশের সমস্যার কথা সিপাহী বিদ্রোহের পঞ্চাশ বছর আগেও তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বর্ষার জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত না থাকায় লোকের বহু অসুবিধার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর ধারণা, যদি জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত ও আবর্জনা পরিষ্কারের সুব্যবস্থা হয়, তাহলেই নগরবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতির সম্ভাবনা, নতুবা নয়। তার জন্যে তিনি বিশেষ নির্দেশও দেন। যার ফলে অবশেষে কিছু বড় বড় ড্রেন তৈরি হয়। তখন কলকাতা বলতে মারাঠা খাল দিয়ে ঘেরা ও টালীর নালা ঘেরা মৌল কলকাতাকেই বোঝাতো। মুখ্য কলকাতার সঙ্গে কাশীপুর-চীৎপুর পৌরাঞ্চল, মানিকতলা পৌরাঞ্চল, টালিগঞ্জ ও বেহালা পৌরাঞ্চল যুক্ত হয়ে সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে গুরুতর করে তুলেছে। উপরন্তু যে সব নাবাল জমি স্থানীয় লোকেদের কাছে বসবাসের অনুপযোগী ছিল, পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল বিতাড়িত অধিবাসীরা এসে জবর দখল করে বহুস্থানে সাধারণ নিকাশী বৃষ্টির জল বেরুবার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। এই রকম নানা সম্মিলিত গৌণ ক্ষতিকারক মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ মানুষের কার্যাবলী জন মানুষেরই সমূহ ক্ষতি সাধন করে চলেছে, অতীতেও করে এসেছে। এই সব স্বার্থান্ধতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা ও বিধিসম্মতভাবে ঐ সব নাশকতা-মূলক ক্ষতিকারক কাজ প্রতিরোধ ব্যতিরেকে এই সমস্যার সমাধান নেই। প্রয়োগ-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যদিও এর সমাধান করা যায়, কিন্তু এর রূপায়ণ সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থার উপর বিশেষ নির্ভরশীল। বর্তমান রাজনৈতিক ও সমাজ-তান্ত্রিক পরিস্থিতিতে এটির দৈন্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন।

জল প্লাবনের কারণ

কলকাতায় জলপ্লাবনের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, নিম্নোক্ত মুখ্য সাতটি কারণে পৌরবাসীকে দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে।

১। রাস্তার ধারে যে ঢালাই লোহার ঝাঁঝরি দিয়ে বৃষ্টির জল ভূ-নালায় প্রবেশ করে, তাদের সংখ্যার স্বল্পতা ও রাস্তার জল প্রবেশ করাবার ঝাঁঝরির আকৃতির ত্রুটি।

২। উপভূ-নালার ঔদক ক্ষমতার ন্যূনতা (Hydraulic capacity)

৩। মুখ্য ভূ-নালার ঔদক ও পরিবহন ক্ষমতার হ্রস্বতা

৪। ভারী আবর্জনার পলিতে ভূ-নালার নিম্নাংশ ভরে থাকায় ক্ষমতা অনুযায়ী জল পরিবহনের অক্ষমতা।

৫। পাম্পিং ষ্টেশনের পাম্প করবার ক্ষমতা যথেষ্ট না থাকা।

৬। মুখ্য নিকাশী খালের কলেবরের ক্ষুদ্রতা।

৭। ভূ-নালার নিয়মিত পলি উদ্ধার ও তলানী পরিষ্করণের অভাব।

প্রাচীন কলকাতার জল-নিকাশের ব্যবস্থা

শতাধিক বর্ষ পূর্বে যখন কলকাতার জল নিকাশের ব্যবস্থাপনা ভুগর্ভস্থ নল দিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখন তার সমাধানের বহু প্রস্তাব আলোচনা ও সমালোচনার পর স্থির হয় যে, আদি কলকাতার জন্যে গঙ্গার ধার থেকে সুরু করে তিনটি বৃহদাকারের ভূপ্রোথিত নালা এসে মিশবে সার্কুলার রোডের Intercepting ভূ-নলের মধ্যে। প্রথমটি হলো ইডেন গার্ডেনের গা থেকে সুরু করে ধর্মতলা দিয়ে, দ্বিতীয়টি গঙ্গার ধার থেকে কলুটোলা দিয়ে, তৃতীয়টি নিমতলা ও বিডন ষ্ট্রীট দিয়ে গিয়ে সার্কুলার রোড ভূ-নলে পড়েছে। Intercepting ভূ-নল সুরু হচ্ছে গঙ্গার ধারে শোভাবাজার থেকে পূর্বমুখী গিয়ে সার্কুলার রোড ধরে দক্ষিণমুখে প্রথম বিডন ষ্ট্রীট ভূ-নল, দ্বিতীয় কলুটোলা ভূ-নল ও অবশেষে ধর্মতলা ষ্ট্রীটের ভূ-নলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আবার চিড়িয়াখানার কাছে জীরাট সেতুর কাছ থেকে একটি বিরাট ভূ-নল লোয়ার সার্কুলার রোড হয়ে ধর্মতলা ষ্ট্রীটের মোড়ে আসছে। সব মিলিত জল আর একটি বৃহৎ ভূ-নল দিয়ে পামার ব্রীজ পাম্পিং ষ্টেশনে আসছে। সেখান থেকে পাম্প করে একটু উঁচুতে তুলে উঁচু লেভেলের ভূ-নল দিয়ে তপসিয়া পয়েন্টে এসে আগে বিদ্যাধরী দিয়ে যা বয়ে যেতো, আজ তা নতুন কাটা খাল দিয়ে কুলটি গাঙে এসে পড়ছে। এই মূল ভূ-নল পরিকল্পনার পর ক্রমশঃ সমস্ত রাস্তার আরও বহু ক্রমশঃ ছোট ছোট ভূ-নল দিয়ে বাড়ীর জল এসে মুখ্য ভূ-নলে পড়বার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এরপর বাগবাজার থেকে ভূপেন বোস এভিনিউ থেকে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের মোড় থেকে সুরু করে বিবেকানন্দ রোড, কৈলাশ বসু ষ্ট্রীট, কেশব সেন ষ্ট্রীটের ভূ-নল পূর্বমুখে গিয়ে সার্কুলার রোড ভূ-নলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সেচ বিভাগ সার্কুলার খালে জল ফেলতে দেবে না বলায় ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড দিয়ে একটি ভূ-নালা একেবারে পামার ব্রিজ পাম্পিং ষ্টেশনে যুক্ত হয়েছে। রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট থেকে ভূ-নালা এসে মানিকতলা পাম্পিং ষ্টেশনে আসে। সেখান থেকে ময়লা জল পাম্প করে পামার ব্রীজ পাম্পিং ষ্টেশনে পাঠানো হয়। নতুন কালীকৃষ্ণ ঠাকুর রাস্তার ভূ-নলের ঢাল পশ্চিম দিকে দেওয়া হয়। পাঁচটি মুখ্য ভূ-নালা অর্থাৎ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, নিমতলা ষ্ট্রীট ও শোভাবাজার ষ্ট্রীটের ভূ-নালার মুখে স্লুইস গেট লাগানো আছে। সহরের মাঝে বেশী বৃষ্টির জল হলে এবং নদীতে জলের লেভেল কম থাকলে যাতে মিশ্র জল ভাগীরথীতে বেরিয়ে যেতে পারে, তারও একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই হলো জল-নিকাশের Town system, অর্থাৎ

লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে ধর্মতলা পর্যন্ত এসে পূর্বমুখে খানিকটা গিয়ে পামার ব্রীজ পাম্পিং ষ্টেশন ধরে সার্কুলার খাল হয়ে চীৎপুর গঙ্গার ধার পর্যন্ত হলো Town system। এর মধ্য থেকে গড়ের মাঠ ও ফোর্ট উইলিয়াম বাদ। ওরা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করেছে।

আগে এই ভূ-নালাগুলির পরিমাপ স্থির করা হয়েছিল ঘন্টায় সিকি ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের ভিত্তিতে। যখন বাড়ী-ঘরদোর এত হয় নি তখন কোন গতিকে চলে যেতো। আজ তা চলছে না।

প্লাবন প্রতিকারের ব্যবস্থা

সামগ্রিক প্রচেষ্টার ফলে এই প্লাবন প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্লাবন প্রতিবিধানকল্পে এর জন্যে বিশদ হিসাব-নিকাশ ও ভূমির উচ্চতা ও নিম্নতার মান নির্ণয় করা হয়েছে এবং পরিশেষে প্রতিটি ভূ-নালার বহন ক্ষমতা নির্ধারণ করে আর্থিক সামর্থ্য অনুপাতে একটি সুপারিশও করা হয়েছে। সেটির মূল তত্ত্ব হলো আরও কয়েকটি নতুন বড় বড় ভূ-নালা দিয়ে বর্তমান ভূ-নালার ধারণ ক্ষমতার অধিক জল এর মধ্যে টেনে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া। আর সেই সঙ্গে কয়েকটি পাম্পিং ষ্টেশন স্থাপন করা। যেমন—চওড়া বিবেকানন্দ রোড দিয়ে বৃহদাকারের নতুন ভূ-নালা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে গ্রে ষ্ট্রীট পর্যন্ত অঞ্চলের জল নিয়ে এসে নদীতে ফেলা, যেখানে নদীর মুখে একটি পাম্পিং ষ্টেশনও থাকবে। তেমনি কলুটোলা থেকে চীৎপুর রোড (রবীন্দ্র সরণি) ধরে বৌবাজার ষ্ট্রীট অঞ্চলের খানিকটা জল নিয়ে সুরেন ব্যানার্জি রোডের খানিকটা রাস্তা দিয়ে পশ্চিম মুখে অক্ল্যাণ্ড রোড ধরে চাঁদপাল ঘাটের সামনে ফেলে দেওয়া এবং সেখানেও একটি পাম্পিং ষ্টেশনের বন্দোবস্ত রাখা। তেমনি কেশব সেন ষ্ট্রীট (অর্থাৎ ঠনঠনে কালী-তলা, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট অঞ্চলের জলের জন্যে) ধরে এবার পূর্বমুখে ভূ-নালা এসে একটি পাম্পিং ষ্টেশনে শেষ হবে ও সেখান থেকে যুগল ৭২" পাইপে করে ক্যানেল ওয়েষ্ট রোডের উপস্থিত ভূ-নালায় ফেলা হবে, যা অবশেষে পামার ব্রীজ পাম্পিং ষ্টেশনে আসবে। রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের ভূ-নালার কলেবর বৃদ্ধি করতে হবে নতুন ভূ-নালা বসিয়ে, যেটি এসে মানিকতলা পাম্পিং ষ্টেশনে পড়বে। বাগবাজার ষ্ট্রীট, ভূপেন বসু এভিনিউও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের অন্তিম উত্তরাংশের জন্যে একটি পাম্পিং ষ্টেশনেরও বন্দোবস্ত হবে।

উপনগরীর জল-নিকাশের সমস্যা

এই অঞ্চল বর্তমানে পৌর এলাকাভুক্ত। উপনগরীর ময়লা জল নিকাশের অঞ্চল হলো, লোয়ার সার্কুলার রোডের দক্ষিণে শিয়ালদহ বজবজ রেললাইন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। দক্ষিণে রেললাইন ধরে ডায়মণ্ড হারবার রোড আবার পশ্চিম মুখে এসে উত্তর মুখে ফিরে টালীর নালার মুখ পর্যন্ত। পশ্চিমে গড়ের মাঠ ও ফোর্ট উইলিয়াম বাদ, উত্তরে Town System-এর দক্ষিণ সীমানা। এর মধ্যে আছে খিদিরপুর, ওয়াটগঞ্জ, মোমিনপুর, আলিপুর, নিউ আলিপুর, ভবানীপুর, কালীঘাট, পুরাতন ও নতুন বালিগঞ্জ এবং ইন্টালী অঞ্চল প্রভৃতি।

উত্তর দিক থেকে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, একটি ভূ-নালা মিডল রোড, সি. আই. টি. রোড ও দর্গা রোড হয়ে বালিগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশনে, আর একটি পদ্মপুকুর, চক্রবেড়িয়া রাস্তা হয়ে বালিগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশনে; পার্ক ষ্ট্রীটের খানিকটা অংশ সি. আই. টি. রাস্তা ধরে এসে মিশে চলে গেছে বালিগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশনে এবং তিলজলা ও ডিহি শ্রীরামপুর রোড হয়ে পার্ক ষ্ট্রীট ভূ-নালার সঙ্গে মিশেছে। আর একটি ভূ-নল পশ্চিম দিক থেকে জজেস কোর্ট রোড, হাজরা

রোড ও ব্রড ষ্ট্রীট হয়ে বালিগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশনে এসেছে। চেতলা পাম্পিং ষ্টেশন থেকে সুরু করে টালিগঞ্জ রোড, রাসবিহারী এভিনিউ ধরে রেললাইনের তলা দিয়ে পার হয়ে উত্তর মুখে রেললাইনের সমান্তরালে গিয়ে আবার বালিগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশনে পৌছলে বালিগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশন থেকে পাম্প করে উপস্থিত ময়লা জলের ভূ-নালা দিয়ে গিয়ে তপসিয়া পয়েন্টে মিশছে। তারপর নগর ও উপনগর অঞ্চলে ময়লা জল একই যুক্তবেণীতে বয়ে চলেছে কুলটি গাঙের দিকে সাগরের সঙ্গে মিশতে। উপনগরী অঞ্চলে ভূ-নালা পরিকল্পনায় প্রথমে হিউজ সাহেবের পরিকল্পনায় ঘণ্টায় ১/৪" বৃষ্টিপাত ধরা হয় ও সেই ভিত্তিতেই ভূ-নালা পরিকল্পিত হয়েছিল। তদানীন্তন বিখ্যাত বৃটিশ স্যানিটারী ইঞ্জিনিয়ার বলডুইন ল্যাথাম হিউজ সাহেবের পরিকল্পনার বিশেষ সমালোচনা করে বলেন, ঘণ্টায় ১/৬" বৃষ্টিপাত অনুপাতে পরিকল্পনা করাই যথেষ্ট। যে ক্ষতি অতীতে বলডুইন ল্যাথাম করে গেছেন, তার ফল ভোগ উপনগরীবাসীদের আজও করতে হচ্ছে। তখন এই কাজ আজকের তুলনায় অতি অল্প ব্যয়েই করা সম্ভব হতো, আজ তা সুদূর-পরাহত বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

উপনগরী-প্রণালীর উন্নয়নের পরিকল্পনা

পার্ক ষ্ট্রীটের বড় ভূ-নালা স্থাপন করা, যার সঙ্গে সি. আই. টি. রাস্তা থেকে একটি ভূ-নালা এসে মিশবে ও বালিগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশনে যাবে। গড়িয়াহাট রোড দিয়ে এক বৃহদাকারের ভূ-নালা গড়িয়াহাটার সেতুর কাছ থেকে গড়িয়াহাটা রাস্তা ধরে উত্তর মুখে এসে বালিগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশনে পড়বে। তাছাড়া ভূকৈলাস রোড দিয়ে দক্ষিণ মুখে এসে বোট ক্যানেলে পড়বে। পশ্চিম দিক থেকে বীরেন রায় রোড দিয়ে ভূ-নালা এসে টালীর নালায় পড়বে। তেমনি মধ্যস্থিত অঞ্চলে কতকগুলি জায়গায় নতুন ভূ-নল বসানো হবে; যেমন—ঢাকুরিয়া হ্রদ অঞ্চল, মনোহর পুকুর রোড, রমেশ মিত্তির রোড, দেবেন ঘোষ রোড, গড়িয়াহাটা রোড। তেমনি তারাতলা রাস্তা, গরগাছা রাস্তা, ডায়মণ্ড হারবার রাস্তা, বজবজ রাস্তা, বীরেন রায় রাস্তা, শিবতলা রাস্তা, নলিনীরঞ্জন এভিনিউ, A. C. Ray রাস্তা।

উপনগরী অঞ্চলের বহু নিম্নাঞ্চলে নতুন ভূ-নালা বসিয়ে হয় নতুন ভূ-নালায় বা বর্তমান ভূ-নালায় যোগ দিয়ে মুখ্যতঃ বালিগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশনে আনতে হবে; অর্থাৎ বালিগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশনের পাম্প করবার ক্ষমতা বাড়াতে হবে। তেমনি ভাবে পামার ব্রীজ পাম্পিং ষ্টেশনের ক্ষমতাও বাড়াতে হবে। রাস্তা থেকে জল যাতে সহজে তাড়াতাড়ি ঢোকে, তার জন্যেও নতুন ডিজাইনের প্রবেশ-মুখ তৈরি করতে হবে।

কলকাতার পরবর্তী সংযুক্ত অঞ্চল

কলকাতায় পরবর্তী কালে মানিকতলা, কাশী-পুর-চীৎপুর, বেহালা ও টালিগঞ্জ পৌর অঞ্চল যোগ হয়েছে। সেখানে ভূগর্ভস্থ নল স্থাপিত হয় নি। বর্তমান পরিকল্পনায় সে সব অঞ্চলের জন্যে ময়লা জল পরিবহন ছাড়া বৃষ্টির জন্যে পৃথক নল স্থাপন করা হবে, তারও এক বিশদ পরি-কল্পনা প্রস্তুত হয়েছে। বর্তমানে টালিগঞ্জের প্লাবিত অঞ্চল ও কাশীপুর-চীৎপুর অঞ্চলের বর্ষার জল নিষ্কাশনের জন্যে CMPO-র পরিকল্পনা ভারত সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমোদনের পর CMWSA (কলকাতা মেট্রোপলিটান ওয়াটার অ্যাণ্ড স্যানিটেশন অথরিটি) রূপায়ণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

বৃহত্তর কলকাতার জল-নিষ্কাশনের কথা সময়ান্তরে বলা যাবে।

সুসঙ্গত বিকিরণ : মেসার ও লেসার

সূর্যেন্দুবিকাশ কর

শক্তির বিকিরণ

সৃষ্টির আদি থেকেই আলোর সঙ্গে মানুষের পরিচয়। পৃথিবীর জনয়িতা সূর্য প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূর থেকে যে আলো বিকিরণ করে, তাছাড়াও দূরদূরান্তের জ্যোতিষ্কগুলির আলো আমরা চোখে অনুভব করি। এই আলো বিপুল মহাশূন্যের বাধা অতিক্রম করে পৃথিবীতে পৌঁছায়। কাছের একটি প্রদীপ থেকেও আমরা আলো পাই। প্রদীপটি জ্বলবার সঙ্গে সঙ্গেই দূরের মানুষও আলোর বিকিরণ অনুভব করে। থেকে সৃষ্টি হয় আলো ও আঁধারের বর্ণালী। এই পরীক্ষা থেকে পাওয়া গেল তরঙ্গ-ধর্মী আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ (λ)। এই দৈর্ঘ্য বিভিন্ন রঙের আলোর বেলায় বিভিন্ন। কিন্তু এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আকার ছোট—যেমন লাল আলোর মাঝামাঝি জায়গায় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাত্র ·০০০০৭১ সে. মি. অর্থাৎ এক সেণ্টিমিটারের প্রায় কয়েক কোটি ভাগের এক ভাগ। ভায়োলেট আলোর দিকে এই দৈর্ঘ্য কমতে থাকে ক্রমশঃ। আলো বা তরঙ্গ-ধর্মী যে কোন বিকিরণকে পরিমাপ করা যায় তরঙ্গ-
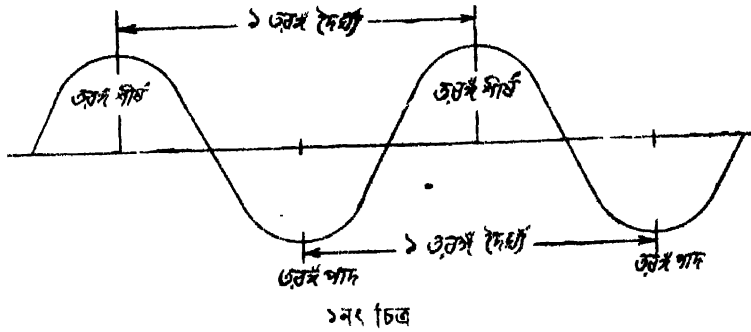
১নং চিত্র
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিমাপ।

তার কারণ আলোর বিকিরণ স্থির নয়। প্রায় ৩×১০⁸ মিটার/সেকেণ্ড গতিবেগ নিয়ে যে কোন উৎস থেকে আলোর বিকিরণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যের আলো আপাতদৃষ্টিতে বর্ণহীন মনে হলেও তা আসলে কয়েকটি রঙের আলোর মিশ্রণ। বিভিন্ন রঙের আলোর গতিবেগ সমান হলেও তাদের পার্থক্য আমাদের চোখে ধরা পড়ে। ইয়ং-এর (Young) পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হলো যে, আলোর ব্যতিচারের (Interference) ফলে একই রঙের আলো দৈর্ঘ্য (λ), কম্পন-সংখ্যা (f) ও গতিবেগ (v)—এই তিনটির সাহায্যে। এদের দুটি জানা থাকলে তৃতীয়টি জানা যায় নিম্নোক্ত সম্বন্ধ থেকে :

$f \times \lambda = v$.

এথেকে হিসেব করা সহজ যে, ·০০০০৭১ সেঃ মিঃ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের লাল আলোর কম্পন-সংখ্যা ৪·২৩×১০¹⁴ সাইক্লস্/সেকেণ্ড, অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে এই আলো ৪·২৩×১০¹⁴ বার পূর্ণ তরঙ্গাকারে কম্পিত হয়।

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিমাপে দৃশ্য আলোর মোটামুটি

বিস্তার প্রায় ৪০০০Å—হ্রস্বতম বেগুনী ৩৯০০Å থেকে দীর্ঘতম লাল ৭৬০০Å। প্রত্যেক রঙের আলোর ক্ষেত্রে এই সীমা গড় ৬০০Å-এর
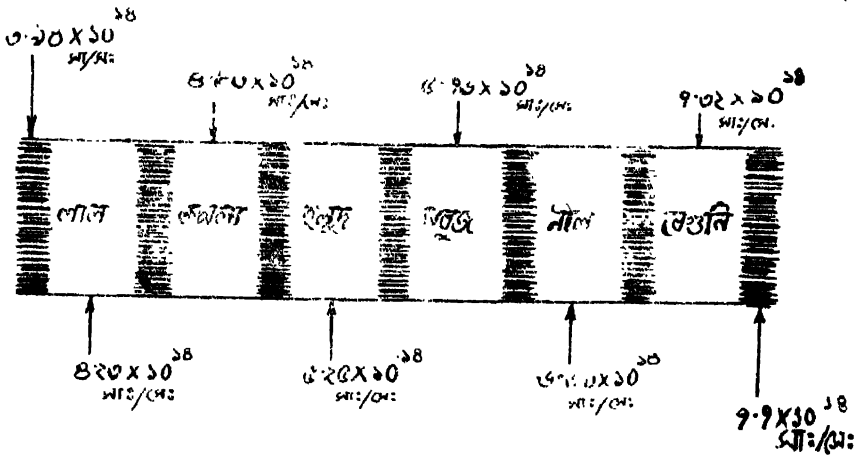
২নং চিত্র
দৃশ্য আলোর বিভিন্ন রঙের মোটামুটি সীমারেখার মাঝামাঝি কম্পন-সংখ্যার পরিমাণ।

মধ্যে। কম্পন-সংখ্যার পরিমাপে দীর্ঘতম ও হ্রস্বতম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কম্পন-সংখ্যার তফাৎ প্রায় ৩.৭ × ১০^১৪ সাঃ/সে।

৩নং চিত্র
দৃশ্য আলোর বিভিন্ন রঙের মোটামুটি সীমারেখার মাঝামাঝি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিমাণ। (১Å অ্যাংষ্ট্রম ≡ ১০^{-১০} মিঃ)

দীর্ঘতম লাল আলোর চেয়েও দীর্ঘতর তরঙ্গ আমরা চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু এই সব লাল উজানী (Infra red) তরঙ্গের অনুভূতি আমরা পাই তাপরূপে। এই অংশের কম্পন-সংখ্যার বিস্তার প্রায় ৪.৪ × ১০^১৪ সাঃ/সেঃ। বেগুনীর চেয়ে হ্রস্বতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অতি-বেগুনী (Ultra violet) তরঙ্গও অদৃশ্য। কিন্তু ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর এর ক্রিয়া দৃশ্য আলোর চেয়ে ভিন্নতর। বেগুনী থেকে উচ্চ কম্পন-সংখ্যার ২ × ১০^১৭ সাঃ / সে পর্যন্ত অতি-বেগুনী বিকিরণের মোটামুটি বিস্তার। ইলেকট্রিক আর্ক পারদ বাষ্পের আলো এই বিকিরণের উৎস।

লাল উজানী বিকিরণের চেয়ে নীচু কম্পন-সংখ্যার তরঙ্গ ৩×১০^১১ সাঃ / সেঃ অথবা ১ মিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ পর্যন্ত অণুতরঙ্গের (Microwave) পর্যায়ে পড়ে। Microwave কথাটির প্রথম অক্ষর M থেকেই Maser বা মেসার শব্দটি তৈরি হয়েছে।

বিকিরণের ধর্ম

অণুতরঙ্গের চেয়ে নীচু কম্পন-সংখ্যার তরঙ্গগুলি বেতার-তরঙ্গ (Radiowave)। বেতার-বিজ্ঞানে সংবাদ বা ছবির আদান-প্রদান এই তরঙ্গের মাধ্যমেই সম্ভব হয়।

অতিবেগুনী থেকে উচ্চতর কম্পন-সংখ্যার বিকিরণ এক্স-রশ্মি, গামা-রশ্মি প্রভৃতির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যেমন ছোট, তাদের শক্তির মাত্রাও ক্রমশঃ হয় বেশী। শক্তি (E) ও কম্পন-সংখ্যার (f) সম্বন্ধ জানা যায় প্ল্যাঙ্কের নিত্য সংখ্যার (h) মাধ্যমে।

(১) এই সব বিকিরণই সেকেণ্ডে ৩×১০^৮ মিটার গতিবেগে চলে।

(২) ৫০ সাঃ / সেঃ থেকে ১০^১৯ সাঃ / সেঃ কম্পন সংখ্যার যে মোটামুটি সীমারেখা টেনে আমরা দৃশ্য আলো ও অদৃশ্য বিকিরণের পার্থক্য বুঝি, তাদের মধ্যে কিন্তু কোন বিরতি নেই; অর্থাৎ দৃশ্য আলোর পর হঠাৎ একটা বিশেষ কম্পন-সংখ্যার বিকিরণকে অতিবেগুনী বলা হলেও এই দুয়ের মধ্যে বাস্তবিক কোন ছেদ নেই।

(৩) কোন বিশেষ বিকিরণের ধর্ম পদার্থ ও পরিবেশ ভেদে পরিবর্তনশীল নয়। নীল্‌স্ বোরের ভাষায় বিকিরণ দূরবর্তী দুই পদার্থের মধ্যে শক্তির পরিবহন (Transmission) মাত্র। শক্তি হলো কাজ করবার ক্ষমতা—তাই বিকিরণ ও শক্তি অভেদ্য।

(৪) বিকিরণ বস্তু-নিরপেক্ষ শক্তির পরি-
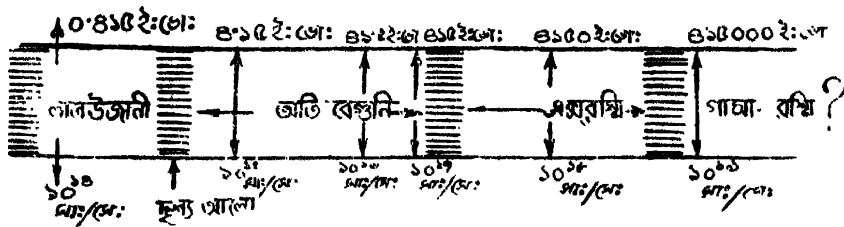
৪নং চিত্র

লাল উজানী থেকে উচ্চতর কম্পন-সংখ্যার বিকিরণ ও তাদের শক্তির পরিমাপ।

E=hf। h=৬.৬২৫×১০^-৩৪ জুল-সেকেণ্ড। অতি অল্প মাত্রার শক্তিসম্পন্ন বিকিরণ হলো আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি, যার কম্পন-সংখ্যা ৫০ সাঃ / সে; তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৭২০ মাইল। উল্লিখিত বিপুল পার্থক্যের শক্তি ও কম্পন-সংখ্যার বিকিরণ কিন্তু একই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের বিভিন্ন রূপ। তাদের কতকগুলি ধর্ম সম্পূর্ণ সমান; যেমন—

বাহক এবং সেই বিকিরণ চলে আলোর গতি-বেগের মত।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের মতে বস্তুর গতিবেগ আলোর সমান হতে পারে না। এই সত্য পরীক্ষিত।

(৫) বিকিরণের উৎস হলো বস্তু (Matter)। বস্তু শক্তি হারায় বলেই আমরা বিকিরণের মাধ্যমে শক্তি পাই।

(৬) বিকিরণ বস্তুর মধ্যে যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে, তখনই বস্তুতে বাড়্তি শক্তিটুকু সঞ্চারিত হয়।

(৭) একমাত্র সংস্পর্শ (Cantact) ছাড়া বিকিরণই হলো শক্তি পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম।

কোন বস্তু তা পরমাণু, অণু, কঠিন, তরল বা বায়ব পদার্থ—যাই হোক না কেন, বিকিরণ ধরবার যোগ্য হলে সেই বিকিরণ তাতে ধরা পড়বে। চোখ সে রকম একটি বিকিরণ গ্রাহক-যন্ত্র। দৃশ্য আলো ছাড়া আর কোন বিকিরণ গ্রহণ করবার ক্ষমতা তার নেই।

বেতারবহ বিকিরণের স্বরূপ

এক শতাব্দী আগেও অণুতরঙ্গ সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। এখন বহির্বিশ্ব থেকে অণুতরঙ্গের বিকিরণ ধরা সম্ভব হচ্ছে। কার্যতঃ ৩×১০^{১১} সাঃ/সেঃ কম্পন-সংখ্যা পর্যন্ত বিকিরণকে বেতার আদান-প্রদানের বাহকরূপে ব্যবহার করা হলো—উচ্চতর কম্পন-সংখ্যার অণুতরঙ্গ বা আলো-তরঙ্গকে বেতার আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। তার কারণ, এই কম্পন-সংখ্যার শুদ্ধ, শক্তিসম্পন্ন ও সুসঙ্গত তরঙ্গ সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। মেসার ও লেসার আবিষ্কারের আগে যে বেতার-তরঙ্গ ব্যবহৃত হতো, তার গুণাবলী খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

(১) এই সব বেতার প্রেরক-যন্ত্র বিভিন্ন কম্পন-সংখ্যার ১০ থেকে ১৫ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন বেতার-তরঙ্গ উৎপাদন করতে পারে।

(২) এই সব বেতার প্রেরক-যন্ত্রে যে সব তরঙ্গ উৎপাদিত হয়, তারা সুষম (Uniform), অবিরাম (Continuous) ও পরিবর্তনহীন (Steady)। এক কথায় এই সব গুণাবলীকে আখ্যা দেওয়া হয় সুসঙ্গত বিকিরণ (Coherent radiation)। এই সম্পর্কে আমরা পরে আরো বিশদ ব্যাখ্যা করবো। এখন আর একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, এই বেতার প্রেরক-যন্ত্রে প্রায় ১×১০^{৬} সাঃ/সেঃ কম্পন-সংখ্যার মধ্যে উৎপাদিত শক্তির কেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন; অর্থাৎ যদি কেন্দ্রীয় কম্পন-সংখ্যা ৬×১০^{৭} সাঃ/সেঃ হয়, তবে উৎপাদিত তরঙ্গগুলি $৫·৫৪১৮^{৭}$ থেকে $৬·৫ \times ১০^{৭}$ সাঃ/সেঃ হওয়া প্রয়োজন। নতুবা সংবাদ আদান-প্রদানের খুঁটিনাটির পরিবহন সম্ভব হয় না। আবার টেলিভিশনের বেলায় এই পরিধি আরো বেশী রাখতে হয়। ফলে পৃথিবীর অসংখ্য বেতার প্রেরক-যন্ত্রের জন্যে যে সব আলাদা আলাদা কম্পন-সংখ্যার তরঙ্গ প্রয়োজন ৩×১০^{১১} সাঃ/সেঃ কম্পন-সংখ্যার মধ্যে তা কুলিয়ে ওঠে না। কিন্তু যদি দৃশ্য আলো বেতার-তরঙ্গের মত সুসঙ্গত ও শক্তিসম্পন্ন অবস্থায় উৎপাদন করা যায়, তবে ৪২৩×১০^{১২} সাঃ/সেঃ থেকে ৪৮৩×১০^{১২} সাঃ/সেঃ-এর মধ্যে প্রায় ১·৫ কোটি টেলিভিশন চ্যানেল পাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু সুসঙ্গত শক্তিসম্পন্ন আলো সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। সূর্যের কথাই ধরা যাক। আমাদের কাছে সূর্যই হলো আলোর প্রধান উৎস। সূর্যের আলোতে অতি-বেগুনী থেকে লাল উজানী পর্যন্ত সব বিকিরণই রয়েছে। এখন সূর্যালোক থেকে ৬২৫×১০^{১২} সাঃ/সেঃ $\pm ০·৫ \times ১০^{৬}$ সাঃ/সেঃ কম্পন-সংখ্যার বিকিরণ আমরা ফিল্টার করে নিতে পারি। সেই বিকিরণ সুসঙ্গত হলেও তার শক্তি হবে খুব কম। সূর্যের পৃষ্ঠদেশের ১০ বর্গমিটার আয়তনের শক্তি এভাবে সংগ্রহ করলে ঐ কম্পন-সংখ্যায় ১ ওয়াট শক্তিও সংগ্রহ করা যাবে কিনা সন্দেহ। অথচ একটি টেলিভিশন প্রেরক-যন্ত্রে তরঙ্গের যে শক্তি প্রয়োজন, তা প্রায় ৬০০০° সেঃ তাপমাত্রার সূর্যপৃষ্ঠের ১ লক্ষ বর্গমিটার আয়তনে উৎপাদিত শক্তির সমান। সূর্যালোক বিপুল শক্তি নিয়ে পৃথিবীতে

নেমে আসে—কিন্তু বেতার প্রেরণে তার ক্ষমতা এই জন্যেই অতি অল্প আর এই ব্যপ্তালোক (Diffused light) বেতার প্রেরণের জন্যে মোটেই উপযুক্ত নয়। মানুষের তৈরি আলোর উৎসগুলিও কোন না কোন কারণে সুসঙ্গত বিকিরণের উপযুক্ত নয়। দুটি তরঙ্গ সুসঙ্গত হয়, যখনই তাদের বিকিরণের দিক (Direction), কম্পন-সংখ্যা (Frequency), দশা (Phase) ও সমবর্তন (Polarisation) হয় হুবহু এক।

সাধারণ ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভে ইলেকট্রনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে আমরা সাধারণতঃ বেতার-তরঙ্গ উৎপাদন করি। অণুতরঙ্গের জন্যে বিশেষ ভালভ্‌, যথা—ম্যাগনেট্রন, ক্লাইষ্ট্রন (Klystron) ইত্যাদিও আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ থেকেই আরো ক্ষুদ্রতর দৈর্ঘ্যের অণুতরঙ্গ এই ব্যবস্থায় উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছিলো না। এভাবে আলো-তরঙ্গের উৎপাদন তো সম্ভবই নয়। হয়তো আরো ছোট আকারের ভালভ্‌ তৈরি করলে ক্ষুদ্রতর এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সব উৎপাদন করা যাবে। কিন্তু যত ছোট ভালভ্‌ হবে—বিকিরণের শক্তিও তাতে হবে কম। ফলে বেতার প্রেরণের জন্যে শক্তিশালী এই সব অণু-তরঙ্গ ও আলো উৎপাদন করা যাবে না। ফলে এদের বাদ দিয়ে নিম্নতর কম্পন-সংখ্যার বেতার-তরঙ্গ দিয়েই কাজ চালানো হচ্ছিলো—কারণ এই উৎপাদিত বিকিরণ সুসঙ্গত ও শক্তিশালী।

কোয়ান্টামবাদ ও বিকিরণ

এখন অণুতরঙ্গ ও আলোর সুসঙ্গত ও শক্তিশালী বিকিরণ কিভাবে উৎপাদন সম্ভব হয়েছে—ফলে মেসার ও লেসার (Maser=Microwave Amplification of Stimulated Emission of Radiation; Laser=Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation) আবিষ্কারের দ্বারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, আমরা সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করবো।

তরঙ্গ-ধর্মী বিকিরণের যে দ্বৈতরূপ রয়েছে—তা ধরা পড়লো আলোক-তড়িৎ (Photoelectric) পরীক্ষা থেকে। এই পরীক্ষার ফলাফল প্রমাণ করলো যে, বিকিরণ কণাধর্মীও বটে। আইন-ষ্টাইন বিকিরণের এই কণিকার (Quantum) নামকরণ করেন ফোটন। কৃষ্ণ দেহ বিকিরণের (Blackbody radiation) সমস্যাও বিকি-রণের ফোটন ধর্ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। শক্তির পরিমাণ অর্থে কোয়ান্টাম কথাটি ব্যবহৃত হয়। পূর্ববর্ণিত E=hf সূত্রটি দিয়ে বিকিরণের কোয়ান্টাম প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়। কোয়ান্টামবাদের পূর্বের যুগে জানা ছিল যে, তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ আলো উৎস থেকে উৎপাদিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লে দূরত্বের বর্গ অনুযায়ী তীব্রতা হারিয়ে ফেলে। উদাহরণ-স্বরূপ লাল আলোর কথা ধরা যাক। উৎস থেকে এক মিটার দূরে এক বর্গ সেন্টিমিটার আয়তনে প্রতি সেকেণ্ডে আমরা যদি এক একক লাল আলোর শক্তি পাই, তবে ১০ মিটার দূরে ০.০১ একক শক্তি পাব। ১০০ মিটার দূরে পাব ০.০০০১ একক শক্তি। আরো আরো দূরে শক্তি কমতেই থাকবে। কিন্তু কোয়ান্টাম-বাদ-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হলো যে, লাল আলোর কম্পন-সংখ্যা (f) অনুযায়ী h×f এই পরিমাণ শক্তির কম শক্তি কখনও পাওয়া যাবে না—অর্থাৎ হয় আমরা এই আলোর কোন কোয়ান্টাম পাব না অথবা এক, দুই প্রভৃতি পূর্ণ-সংখ্যক কোয়ান্টা পাব, ভগ্নাংশ কখনই নয়। কোয়ান্টাম বা ফোটন শক্তির অবিভাজ্য পরমাণুর মত। কম্পন-সংখ্যানুযায়ী তাদের আকার নির্দিষ্ট। একটি এক্স-রে-র কোয়ান্টাম লাল আলোর চেয়ে প্রায় ১০০০০০ গুণ শক্তি বহন করে।

আগেই বলেছি শক্তির পরিমাণ কোয়ান্টামকে আইনষ্টাইন নামকরণ করেন ফোটন। ইলেকট্রনের আধান আছে—কিন্তু ফোটন অর্থাৎ বিকিরণ কণিকার আধান নেই। গতিশীল ইলেকট্রনের গতি অনুযায়ী শক্তি আছে, কিন্তু ফোটনের গতিবেগ সর্বদাই C ($\approx$ ৩×১০^৮ মিঃ / সেঃ)। ফোটনের শক্তি গতিবেগের উপর নয়, কম্পন-সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। আবার আইনষ্টাইনের বিখ্যাত সূত্র $E = mc^2$ থেকে পাই ফোটনের ভর। এই ভর $m = \frac{hf}{c^2}$। ফোটনের ভরবেগও (Momentum) তাই কম্পন-সংখ্যার অনুপাতী। বস্তুদেহে বিকিরণের শোষণ (Absorption) বা বস্তুদেহ থেকে তার বিকিরণ (Emission) ফোটন কণিকার সংঘাত থেকেই সম্ভব হয়। বস্তুদেহের একটি পরমাণু যখন একটি বিশিষ্ট বিকিরণের ফোটন শোষণ করে, তখন সেই ফোটনের শক্তিটুকু নিয়েই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তার কম বা বেশী নয়। বিকিরণের বেলায়ও ঠিক সেই পরিমাণ শক্তির ফোটনই বিকিরণ করতে পারে। বিপরীত পক্ষে বলা যায় যে, একটি বিশেষ শক্তির ফোটন কোন পরমাণু থেকে বিকিরিত হবার অর্থ হলো এই যে, সেই পরমাণুটি দুটি শক্তি-স্তরে (Energy level) থাকতে পারে—যে স্তর দুটির শক্তির বিয়োগ ফল হলো, বিকিরিত ফোটনের শক্তির সমান। ঐ শক্তির ফোটন শোষিত হলে পরমাণুর ইলেকট্রন নিম্নের শক্তি-স্তর থেকে উপরের শক্তি-স্তরে লাফিয়ে ওঠে। আবার নীচের স্তরে নেমে এলে আমরা পাই ঐ ফোটনেরই বিকিরণ। পরমাণুটিকে একটি সিঁড়িতে ওঠা মানুষের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মানুষটি সিঁড়ির ১নং ধাপ থেকে ২নং ধাপেই যেতে পারে—তার মাঝামাঝি কোন জায়গায় নয়। ১ থেকে ৩ বা ৪ ইত্যাদি ধাপেও বেশী শক্তি খরচ করলে যেতে পারে, কিন্তু মাঝামাঝি কোন জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। পরমাণুর ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। অবশ্য পরমাণুর জায়গায় আমরা অণু নিলেও দেখতে পাব—পরমাণু থেকে তার গঠন একটু জটিল হলেও সে একই নিয়ম মেনে চলে।

বস্তু ও বিকিরণের সংঘাতজনিত ক্রিয়া

কৃষ্ণদেহ বিকিরণের বেলায় দেখা যায় যে, তাপীয় সাম্যাবস্থায় (Thermal equilibrium) বস্তুদেহ একটি কম্পন-সংখ্যার যতগুলি প্রোটন শোষণ করে, ঠিক ততগুলিই বিকিরণ করে। ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আইনষ্টাইনের শোষণ বিকিরণ সম্পর্কিত মতবাদ প্রকাশিত হবার আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, ফোটন বস্তুদেহে শোষিত হবার পর, উত্তেজিত অণু-পরমাণু স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সেই ফোটন বিকিরণ করে। এই স্বতঃ-বিকিরণের (Spontaneous emission) কথাই তখন শুধু ভাবা হয়েছিল। স্বতঃবিকিরণের স্বরূপ কি? ধরা যাক ১০০টি একই রকমের ফোটন একটি বস্তুদেহে শোষিত হয়েছে। তার থেকে ৫০টি ফোটন বিকিরণ হবার সময়টুকুকে এই বিকিরণের অর্ধজীবন (Half life) বলা হয়। এই অর্ধজীবন বিশেষ পরমাণুর বিশেষ তেজস্তরের উপর নির্ভর করে। আবার কোন প্রতিবেশী পরমাণুর বিকিরণের সঙ্গেও তার কোন সম্পর্ক নেই। এই শোষণ বিকিরণ পরমাণুর ইলেকট্রনের বিভিন্ন তেজস্তরে ওঠানামা থেকে সম্ভব হয়। এখন স্বতঃবিকিরণ হলো পরমাণুর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। স্বতঃবিকিরণের অর্ধজীবন কালের মধ্যে কোন্ পরমাণুটি বিকিরণ করবে না করবে, তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। যত ক্ষুদ্র সময়ই হোক না কেন, উচ্চ কম্পন-সংখ্যার বিকিরণের ক্ষেত্রে তাই স্বতঃবিকিরিত তরঙ্গগুলি একটি অপরটি থেকে পিছিয়ে পড়ে—ফলে আমরা সুসঙ্গত বিকিরণের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করছি, স্বতঃ-বিকিরণ থেকে সে রকম তরঙ্গ পাই না।

১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে আইনষ্টাইন প্রমাণ করেন যে, স্বতঃবিকিরণ ছাড়াও আর এক রকমের বিকিরণ আছে, তা হলো উত্তেজিত বিকিরণ (Stimulated emission)। কেউ কেউ এই বিকিরণকে আবিষ্ট বিকিরণও (Induced emission) বলে থাকেন। কৃষ্ণদেহ বিকিরণের বেলায় দেখা গেল যে, উচ্চ তাপমাত্রায় শোষিত ফোটন-সংখ্যার অতি অল্প ফোটনই স্বতঃবিকিরণের ফলে বিকিরিত হয় আর বাকীগুলি, বিশেষতঃ নিম্ন কম্পন-সংখ্যার বিকিরণ সম্ভব হয় এই উত্তেজিত বিকিরণের দ্বারা।

এখন বস্তুর সঙ্গে বিকিরণের প্রতিক্রিয়াগুলির একটি মোটামুটি চিত্র আমরা পাই।

১। শোষণ: উপযুক্ত আকারের ফোটন অনুত্তেজিত পরমাণুর উপর বর্ষিত হলে ফোটনগুলি লোপ পায় এবং শোষিত ফোটনের শক্তি পরমাণুর এক শক্তি-স্তর থেকে অন্য শক্তি-স্তরে ইলেকট্রনের দ্বারা বাহিত হয়। শোষণের সম্ভাবনাকে আমরা P বলি, তাহলে উদাহরণস্বরূপ P যদি ০.১ হয় তবে ১০ লক্ষ ফোটনের মধ্যে এক সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ফোটনের শোষিত হবার সম্ভাবনা আছে, ধরতে হবে।

৫নং চিত্র
পরমাণুর দ্বারা ফোটনের শোষণ।

২। স্বতঃবিকিরণ: উত্তেজিত পরমাণু শোষিত ফোটন বিকিরণ করে। ফলে উচ্চতর শক্তি-স্তর থেকে নিম্নতর শক্তি-স্তরে ইলেকট্রন নেমে এলে পরমাণু যে শক্তি হারায়, স্বতঃবিকিরিত ফোটন সেই শক্তি বাইরে বয়ে নিয়ে আসে।

৬নং চিত্র
ফোটনের স্বতঃবিকিরণ।

৩। উত্তেজিত বিকিরণ: উপযুক্ত আকারের ফোটন উত্তেজিত পরমাণুর উপর বর্ষিত হলে এই

ফোটন ও তৎসহ একই পরিমাপের ফোটন পরমাণু থেকে নির্গত হয়। উত্তেজক ও উত্তেজিত দুটি ফোটনই একই দিকে নির্গত হয়। উত্তেজিত বিকিরণের সম্ভাবনাকে আমরা আবার যদি P ধরি এবং উদাহরণস্বরূপ P যদি ০'১ হয়, তাহলেও পরিমাণ হবে খুব কম। বিপুল উত্তেজিত বিকিরণ উৎপাদন করবার এই পরিকল্পনা কেন, তার উত্তর পেতে হলে আমরা ডির‍্যাকের তত্ত্বের কথা স্মরণ করবো। আইনষ্টাইনের শোষণ বিকিরণ তত্ত্বের প্রায় দশ বছর পরে ডির‍্যাক বলেন যে,
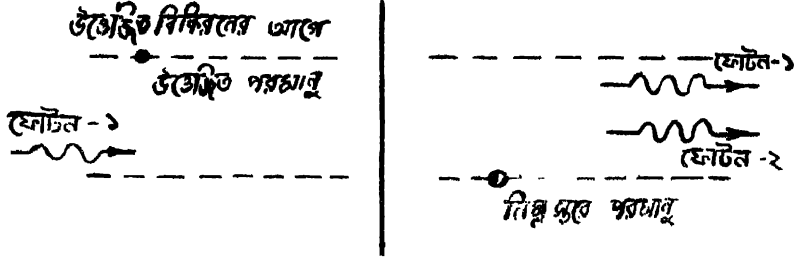
৭নং চিত্র
উত্তেজিত বিকিরণ।

শোষণের মত ১০ লক্ষ পরমাণুর মধ্যে আমরা ১ লক্ষ থেকে উত্তেজিত বিকিরণ পাব।

উত্তেজিত বিকিরণের সুসঙ্গতি

এখন বিকিরণ ও বস্তুর এই তিনটি প্রতিক্রিয়া যদি আমরা খতিয়ে দেখি, তাহলে বোঝা যাবে যে, ফোটন বর্ষণের ফলে এই তিনটি ক্রিয়াই বস্তুদেহে পাশাপাশি চলবে। তার মধ্যে স্বতঃ-বিকিরণ ক্রিয়াটি বর্ষিত ফোটনের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু শোষণ ও উত্তেজিত বিকিরণ দুটিই ফোটনের উপর নির্ভর করে। এখন শোষণ থেকে উত্তেজিত বিকিরণের পরিমাণ যদি বাড়াতে হয়, তবে প্রথমেই আমাদের এমন একটি ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে পরমাণুগুলি উপযুক্তভাবে উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। তখন তো তাদের নতুন ফোটন শোষণ করবার সম্ভাবনা থাকবে না! এরকম উত্তেজিত পরমাণু যদি উপযুক্ত ফোটনের সংস্পর্শে আসে, তবে আমরা অধিক পরিমাণে উত্তেজিত বিকিরণই পাব। অবশ্য স্বতঃবিকিরণ কিছু থাকলেও তাদের উত্তেজিত বিকিরণের দিক, কম্পন-সংখ্যা, দশা ও সমবর্তন হুবহু এক। স্বতঃবিকিরণের তরঙ্গগুলি বড় খামখেয়ালী—দিক বা সময়ের জ্ঞান তাদের একেবারে নেই। উত্তেজিত পরমাণু থেকে তারা কে যে কখন বেরিয়ে আসছে, তার ঠিক নেই। ফলে স্বতঃবিকিরণের তরঙ্গ মোটেই সুসঙ্গত নয়। অথচ উত্তেজিত বিকিরণে আমরা পাই পুরাপুরি সুসঙ্গত বিকিরণ। ফলে বিকিরণের তীব্রতা বাড়িয়ে তাকে বেতার প্রেরণের কাজে লাগাতে হলে এরকম উত্তেজিত বিকিরণই কার্যকর হবে। তাই যে সব অণুতরঙ্গ বা আলো সুসঙ্গত অবস্থায় সাধারণতঃ পাওয়া যায় না, তাদের তীব্রতা বাড়াবার জন্মে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করাই তো যুক্তিসঙ্গত!

তবে উত্তেজিত বিকিরণের প্রধান সর্ত হলো এই যে, প্রথমেই উত্তেজিত পরমাণু নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে। একটি বিশেষ তাপমাত্রায় কতকগুলি পরমাণু কতটা উত্তেজিত অবস্থায় থাকবে তাপীয় সাম্যাবস্থায়, তা প্রায় নির্ধারিত। কিন্তু ঐ

তাপমাত্রায় নির্ধারিত পরিমাণ থেকে বেশী পরমাণু উত্তেজিত না করতে পারলে আমাদের ঈপ্সিত উত্তেজিত বিকিরণ তো বাড়ানো যাবে না! বস্তুকে এই অবস্থায় আনবার অর্থ হলো, সাম্যাবস্থা থেকে অসাম্য অবস্থায় আসা। এই রকম অসাম্য অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা বলেন নেগেটিভ তাপমাত্রা—এরকম অবস্থায় আসা কার্যতঃ সম্ভব কিনা, তার উপরই নির্ভর করছে উত্তেজিত বিকিরণকে কাজে লাগাবার সম্ভাবনা।

বিজ্ঞানীরা বলেন, ফোটনের শোষণ ও উত্তেজিত বিকিরণ—এই দুটি বিপরীত প্রক্রিয়া হলেও অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে এদের মিল আছে—তা হলো উভয়েই বাইরের ফোটনের সংস্পর্শের উপর নির্ভরশীল। অথচ স্বতঃবিকিরণ উত্তেজিত পরমাণুর আন্তর অবস্থার উপর নির্ভর করে—বাইরের ফোটনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

উত্তেজিত বিকিরণ ও অ্যামোনিয়া মেসার

পরমাণুর কতকগুলি নির্দিষ্ট শক্তি-স্তর আছে—নিম্নতম থেকে উচ্চতম এই নির্দিষ্ট স্তরগুলির মধ্যবর্তী কোন অবস্থা নেই, একথা আগেই বলা হয়েছে। উচ্চতম স্তরের উপরও যদি পরমাণুর ইলেকট্রন উত্তেজনার ফলে চলে যায়, তবে পরমাণুটি ইলেকট্রন হারিয়ে আয়নিত (Ionised) হয়ে পড়ে। একই রকম পরমাণুর সমাবেশে কোন বস্তুর কথা ধরা যাক, যার প্রত্যেকটি পরমাণুর চারটি শক্তি-স্তর আছে। 0 স্তরটি নিম্নতম ১,২,৩, পর পর উপরের স্তর (৮নং চিত্র)। খুব নিম্ন তাপমাত্রায় দেখা যাবে যে, অধিক সংখ্যক পরমাণু 0 শক্তি-স্তরে রয়েছে, ১,২,৩ স্তরে পরমাণুর সমষ্টি ক্রমশঃ হ্রাসমান। এখন বস্তুটির তাপমাত্রা বাড়লে শক্তি-স্তরে আগের চেয়ে পরমাণুর সমষ্টি কমবে আর ১,২,৩ স্তরে ক্রমশঃ আগের চেয়ে পরমাণুর সমষ্টি কিছুটা বাড়বে। আরও অধিক তাপমাত্রায় বিভিন্ন শক্তি-স্তরে পরমাণুর সমষ্টির তারতম্য আরও কমবে। কিন্তু ঐ সব অবস্থায় উত্তেজিত বিকিরণের সম্ভাবনা যেমন বাড়বে, শোষণের সম্ভাবনাও তেমনি বাড়বে। কারণ তাপমাত্রা বাড়িয়ে 0 শক্তি-স্তরে পরমাণুর সমষ্টি থেকে ১, ২ বা ৩নং শক্তি-স্তরের

৮নং চিত্র
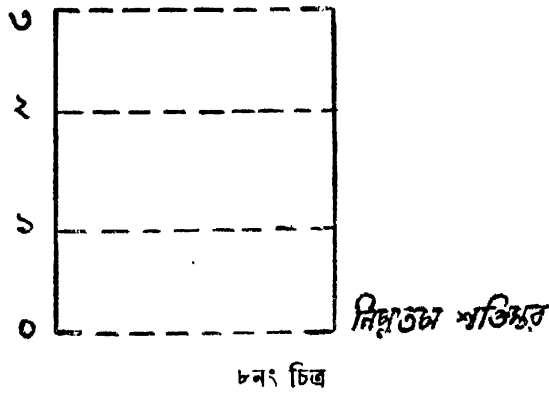
একটি কাল্পনিক পরমাণুর শক্তি-স্তরের চিত্র। শক্তি-স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্ব শক্তি ও কম্পন-সংখ্যার অনুপাতী। ঐ তেজ ও কম্পন-সংখ্যার ফোটন দুটি শক্তি-স্তরের মধ্যে ইলেকট্রনের আনাগোনায় শোষিত বা বিকিরিত হতে পারে।

পরমাণুর সমষ্টি তো উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব নয়! যদি 0 স্তরের পরমাণুর সমষ্টি থেকে ৩নং স্তরের সমষ্টি কোন রকমে চারগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়—তাহলে দেখা যাবে যে, উত্তেজিত বিকিরণের একটি ভাবতে হয়। সেই ভাবনার ফল পাওয়া গেল ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে। বিজ্ঞানী টাউনেস (Charles H. Townes) উত্তেজিত বিকিরণের সাহায্যে অণুতরঙ্গের তীব্রতা বাড়াবার জন্যে যে পরীক্ষায় সফল হলেন, তাথেকে সৃষ্টি হলো মেসার
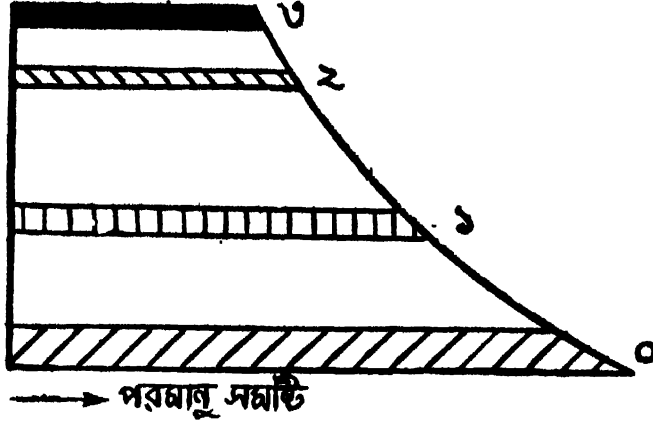
৯নং চিত্র
নিম্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন শক্তি-স্তরে কতকগুলি পরমাণু থাকবে, তার একটি কাল্পনিক পরিমাপ।

শৃঙ্খলক্রিয়ায় অজস্র সুসঙ্গত বিকিরণ পাওয়া যাবে। কারণ ৩নং স্তর থেকে ধরা যাক কয়েকটি পরমাণু স্বতঃবিকিরণের ফলে যে, ফোটন উৎপাদন করলো, সেই ফোটনগুলির শোষণের চেয়ে উত্তেজিত বিকিরণের সম্ভাবনাও চারগুণ বেশী। 0 স্তরই তো শোষণ করতে পারে—সে স্তরে পরমাণুর সমষ্টি চারগুণ কম বলে শোষণের সম্ভাবনাও হবে কম। খালি উচ্চতম তাপমাত্রা দিয়ে 0 স্তর থেকে উচ্চতর স্তরের পরমাণুর সমষ্টি কিছুটা বাড়ানো যায় বটে, কিন্তু তখনও 0 স্তরে পরমাণু থাকে বেশী। তাই তাপীয় সাম্যাবস্থায় পরমাণু সমষ্টিকে উল্টানো (Population inversion) সম্ভব নয়—অর্থাৎ উচ্চতর স্তরে নিম্নতর স্তর থেকে পরমাণু সমষ্টি বাড়ানো যায় না। তাই অন্য উপায়ের কথা

(Maser)। টাউনেস মেসারের জন্যে বেছে নিলেন অ্যামোনিয়ার অণু (Molecule)। পরমাণুর চেয়ে অণুর শক্তি-স্তর একটু বেশী জটিল—কারণ অণুর কম্পন (Vibration) ও ঘূর্ণন (Rotation) ইত্যাদির জন্যেও কতকগুলি শক্তি-স্তর আছে। যেমন—অ্যামোনিয়া NH_3 অণুতে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু একই সমতলে থাকে আর নাইট্রোজেন পরমাণু এই সমতলের উভয় দিকেই চলাফেরা করতে পারে। নাইট্রোজেন পরমাণুর এই কম্পন হয় ধাপে ধাপে। ফলে কতকগুলি শক্তি-স্তর পাওয়া যায়। আবার সমগ্র অণুটি হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির সমতলের সমান্তরালে একটি অক্ষে ও তার লম্ব অন্য একটি অক্ষে ঘূর্ণিত হয়। এই ঘূর্ণনও অবিরাম নয়, ফলে কম্পনজনিত প্রত্যেকটি শক্তি-স্তর ঘূর্ণনের জন্যে সূক্ষ্মতর শক্তি-স্তরে বিভক্ত

হয়ে পড়ে। অ্যামোনিয়া অণুর এরকম দুটি শক্তি স্তর বেছে নেওয়া হলো, যাদের ব্যবধান ২.৪ × ১০¹⁰ সাঃ / সে অর্থাৎ এই শক্তি-স্তর ০.০১২৫ মিঃ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ফোটন শোষণ বা বিকিরণ করতে পারে। এই তরঙ্গটি অণুতরঙ্গ পর্যায়ে পড়ে।

এখন কার্যতঃ অ্যামোনিয়া মেসার কিভাবে তৈরি হয়, তা দেখা যাক। প্রথমে একটি পাত্রের মধ্যে অ্যামোনিয়া বায়বকে তাপ দেওয়া হলো। ফলে কিছু অ্যামোনিয়া অণু ২.৪ × ১০¹⁰ সাঃ/সেঃ-কম্পন-সংখ্যার অণুতরঙ্গ হলো সম্পূর্ণ সুসঙ্গত নিম্ন তীব্রতার (Intensity) এই কম্পন-সংখ্যার কোন অণুতরঙ্গ এই কক্ষে বাইরে থেকে ঢুকিয়ে তার তীব্রতাও বাড়ানো (Amplification) এই পদ্ধতিতে সম্ভব হলো।

কঠিন পদার্থে মেসার ক্রিয়া

কিন্তু অ্যামোনিয়া মেসারে উৎপাদিত তরঙ্গ আশানুরূপ তীব্র হলো না। তাই কোন বায়বের
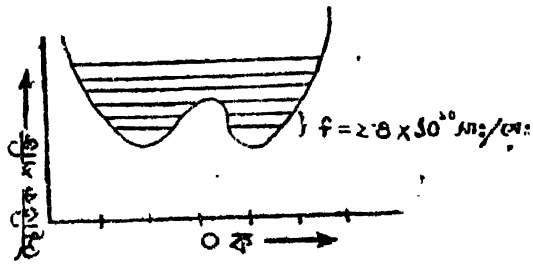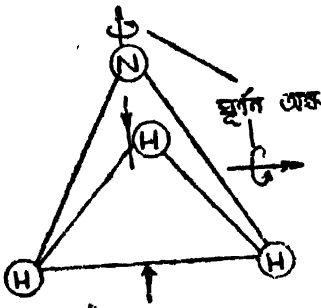
১০নং চিত্র

অ্যামোনিয়া অণু ও তার শক্তি-স্তর। ক—হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির সমতল থেকে নাইট্রোজেন পরমাণুর দূরত্ব।

এর উচ্চতর শক্তি-স্তরে উত্তেজিত হলো। এই পাত্রের একটি ছিদ্রের ভিতর দিয়ে সমস্ত অণুগুলিকে বাইরে নিয়ে এসে কয়েকটি আধানযুক্ত ধাতব দণ্ডের সমন্বয়ে নির্মিত বেলনাকৃতি অসম বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে চালিত করা হলো। এই বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের ধর্ম হলো, অনুত্তেজিত অণুগুলিকে ধাতব দণ্ডের দেয়ালের দিকে আকর্ষণ করা। ফলে উত্তেজিত অণুগুলি সোজাসুজি বেরিয়ে গিয়ে একটি কক্ষে সঞ্চিত হলো। এখন এই কক্ষের সব অণুই উত্তেজিত। এদের কয়েকটি স্বতঃ-বিকিরণের ফলে যে ফোটন সৃষ্টি করলো, সেই ফোটনগুলিই আবার অন্যান্য উত্তেজিত অণুর উপর আঘাত করে উত্তেজিত বিকিরণের সৃষ্টি করলো। এই উৎপাদিত ২.৪ × ১০¹⁰ সাঃ / সেঃ পরিবর্তে কঠিন পদার্থে (Solid) মেসার তৈরি করবার সম্ভাবনা আছে কিনা—তার খোঁজ চললো। গবেষণায় দেখা গেল কঠিন পদার্থ রুবি (Ruby) কৃষ্টালে মেসারের ক্রিয়া সম্ভব। রুবি হলো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3)—যার প্রায় ১০০০টি অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর মধ্যে ১টি ক্রোমিয়াম (Chromium) পরমাণু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে—একটি অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর জায়গায়। ক্রোমিয়াম পরমাণুর সংখ্যা রুবিতে যতই কম হবে, মেসারের ক্রিয়াও হবে তত ভাল—অথচ এই ক্রোমিয়াম পরমাণুই মেসার ক্রিয়ার জন্যে দায়ী। ক্রোমিয়াম পরমাণুতে প্যারাচুম্বকীয় (Paramagnetic) ধর্ম বর্তমান। বাইরের চৌম্বক ক্ষেত্রে এই পরমাণু বিভিন্ন শক্তি-স্তরে বিশ্লিষ্ট হয়—

অর্থাৎ কিছু পরমাণু যদি 0 শক্তি-স্তরে থাকে, তবে আর কিছু সংখ্যক উত্তেজিত ১নং শক্তি-স্তরে উন্নত হয়। প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের মানের উপর এই শক্তি-স্তর দুটির ব্যবধান, তথা শক্তির পার্থক্য নির্ভর করে। এই অবস্থায় 0 স্তর থেকে ১ স্তরের পরমাণুর সংখ্যা যে বেশী হয়, তা নয়। এখন রুবি ক্রষ্ট্যালকে তরল নাইট্রোজেনের তাপ-মাত্রায় ঠাণ্ডা করা হয়। ফলে 0 স্তরের পরমাণু সমষ্টি বরং বেড়ে যায়। কিন্তু আমরা চাই ১ স্তরের পরমাণু সমষ্টি বাড়াতে—অথচ এখন বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি। তাই এর পরের ধাপটি ক্রষ্ট্যালে প্রয়োগ করা। এরকম পরিবর্তনশীল কম্পন-সংখ্যার তরঙ্গ প্রয়োগ করে দেখা গেল যে, ক্রোমিয়ামের নির্দিষ্ট কম্পন-সংখ্যার তরঙ্গ প্রযুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে রুবি থেকে বেরিয়ে এলো এক ঝলক তীব্র সুসঙ্গত অণুতরঙ্গ—যার কম্পন-সংখ্যা ক্রোমিয়ামের দুটি শক্তি-স্তরের পার্থক্যজনিত কম্পন-সংখ্যার সমান। আসলে প্রযুক্ত অবিরাম অণুতরঙ্গ-গুলির মধ্যে নির্দিষ্ট কম্পন-সংখ্যা রুবির মধ্যে হঠাৎ 0 স্তরের পরমাণু সমষ্টিকে ১ স্তরে ও ১ স্তরের সমষ্টিকে 0 স্তরে নিয়ে এসে সুসঙ্গত বিকিরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। রুবিতে বার বার এরকম
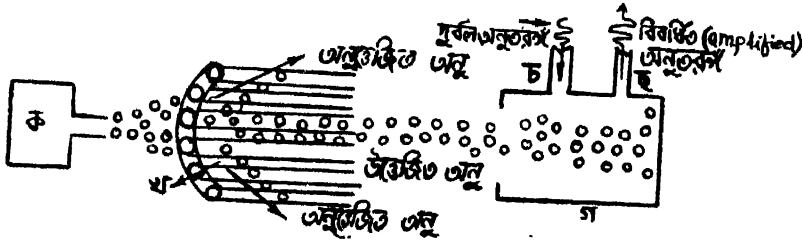
১১নং চিত্র

অ্যামোনিয়া মেসার। ২.৪×১০^{১০} সাঃ / সেঃ কম্পন-সংখ্যার দুর্বল অণুতরঙ্গের বিবর্ধন দেখানো হয়েছে।

ক অ্যামোনিয়া অণু উত্তেজিত করবার জন্যে চুল্লী

খ আধানযুক্ত ধাতবদণ্ডের বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র—উত্তেজিত অণুগুলিকে পৃথক করে দেয়।

গ অনুনাদ কক্ষ (Resonant cavity)। এর যথাযথ আকারের জন্যে নির্দিষ্ট কম্পন-সংখ্যার অণুতরঙ্গ অনুনাদের ফলে যথাযথ ভাবে ধরে রাখে।

চ প্রবিষ্ট দুর্বল অণুতরঙ্গের বাহক (Wave guide)

ছ নির্গত বিবর্ধিত অণুতরঙ্গের বাহক (Wave guide)

হলো যে কোন রকমে 0 স্তরের পরমাণু সমষ্টিকে ১ স্তরে নিয়ে যাওয়া ও ১ স্তরের সমষ্টিকে 0 স্তরে নিয়ে আসা। সমষ্টিকে উল্টে দেবার (Population inversion) একটি পদ্ধতি হলো—ক্রোমিয়ামের দুটি শক্তি-স্তরের পার্থক্যজনিত কম্পন-সংখ্যার ভিতর দিয়ে আরো কিছু বেশী ও কম কম্পন-সংখ্যার তরঙ্গ অবিরামভাবে রুবি পরিবর্তনশীল অণুতরঙ্গ প্রয়োগ করে পাওয়া যাবে ক্ষণস্থায়ী অণুতরঙ্গের সুতীব্র ঝলক। এই তরঙ্গ তীব্র হলেও অবিরাম নয়।

ব্লোম্‌বার্জেন (Nicolas Bloembergen) প্রথম কঠিন পদার্থে অবিরাম মেসার ক্রিয়ার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেন। উল্লিখিত রুবি ক্রষ্ট্যালে চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে যে কয়েকটি শক্তি-স্তর

উৎপন্ন হয়—তার দুটির প্রয়োগে যে মেসার হয় সে কথা বলা হয়েছে। এখন ঐ কৃষ্ট্যালে আগের প্রক্রিয়ায় আমরা তিনটি শক্তি-স্তর বেছে নিতে পারি ; যথা—0, ১, ২। বলাবাহুল্য যে, এক্ষেত্রেও 0 স্তরে পরমাণু সমষ্টি থাকবে বেশী, ১ স্তরে তার থেকে কিছু কম, ২ স্তরে আরো কম। এখন 0 ও ২ স্তরের পার্থক্যের নির্দিষ্ট কম্পন-সংখ্যার অণুতরঙ্গ যদি রুবিতে প্রয়োগ করা হয়, তবে তার ফোটনগুলি শোষিত হয়ে 0 স্তরের অনেক পরমাণুকে ২ স্তরে তুলে দেবে। তখন দেখা যাবে যে, ১ স্তরের পরমাণু সমষ্টি 0 স্তরের সমষ্টির চেয়ে অনেক বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ১ ও 0 স্তরের মধ্যে নির্দিষ্ট কম্পন-সংখ্যার অণুতরঙ্গ উত্তেজিত বিকিরণরূপে সুসঙ্গত ও তীব্র অণুতরঙ্গ উৎপাদন করবে। প্রযুক্ত অণুতরঙ্গ অবিরাম প্রয়োগ করা যেতে পারে, তাই নির্গত অণুতরঙ্গও হবে অবিরাম।

মেসার (Optical maser) বা লেসার (Laser) নামে পরিচিত, আধুনিক বিজ্ঞানে এক নবযুগের সূচনা করেছে। আগে আমরা যে সব বস্তু দিয়ে মেসার উৎপাদনের কথা বলেছি, সে সব ছাড়া আরও অনেক পদার্থ মেসারের কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু প্রথম লেসার তৈরিতে আমাদের পরিচিত সেই রুবি কৃষ্ট্যালটিই আবার কাজে লাগলো। আলোর বেলায় কম্পন-সংখ্যা অণুতরঙ্গ থেকে অনেক বেশী, তাই ক্রোমিয়ামের প্যারাচুম্বকীয় ধর্ম নয়—প্রতিপ্রভা (Flouroscence) ধর্মকে লেসারের কাজে লাগানো হলো। ফলে এখানে আর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োজন নেই। শুধু রুবিতে ক্রোমিয়াম পরমাণুর সংখ্যা আরো কমিয়ে দেওয়া হলো। ক্রোমিয়ামের স্বাভাবিক শক্তি-স্তর তিনটি ; যেমন—0, ১, ২। ১ ও ২নং স্তরগুলি সাধারণ পরমাণুর মত নয়—বরং পটির মত চওড়া। একটি ফ্ল্যাস প্রদীপের আলোয়

ক খ

১২নং চিত্র

ক ক্রোমিয়ামের স্বাভাবিক শক্তি-স্তর। খ উত্তেজিত ক্রোমিয়াম পরমাণু দু-ধাপে 0 স্তরে ফিরে আসে।

অণুতরঙ্গের তীব্রতা বৃদ্ধির (Amplification) সুযোগ নিয়ে নক্ষত্র-জগতের ক্ষীণ অণুতরঙ্গের বিকিরণ ধরা সম্ভব হয়েছে। তাতে বিশ্বের নতুন নতুন তথ্য ধরা পড়ছে। রেডার, কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে বেতার প্রেরণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে মেসারের প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে।

আলোকীয় মেসার বা লেসার

অণুতরঙ্গের চেয়ে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো-তরঙ্গ দিয়ে এই মেসার ক্রিয়া, যা আলোকীয়

রুবি কৃষ্ট্যাল উত্তেজিত হলে অধিকাংশ ক্রোমিয়াম পরমাণু সমষ্টি 0 স্তর থেকে ১ ও ২ স্তরে লাফিয়ে উঠবে। এখন ১ স্তরের নীচে দুটি আধাস্থায়ী (Metastable) ক, খ শক্তি স্তর আছে। ১ ও ২ স্তর থেকে 0 স্তরে পরমাণু সমষ্টি নেমে আসবার আগে এই ক ও খ স্তরে প্রথমে জমা হবে—কিন্তু এই স্তর দুটি আধাস্থায়ী বলে কোন বিকিরণ হবে না। সংশ্লিষ্ট শক্তিটুকু তাপের আকারে গোটা কৃষ্ট্যালে ছড়িয়ে পড়বে। এই

অবস্থায় 0 স্তর থেকে ক ও খ স্তরের পরমাণু-সমষ্টি অধিক। তাই তারা 0 স্তরে নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে লাল আলোর সুসঙ্গত বিকিরণ। ক ও খ দুটি শক্তির জন্যে ৬৯৪৩Å ও ৬৯২৯Å দুটি দৈর্ঘ্যের সুসঙ্গত লাল আলোর তরঙ্গ পাওয়া যাবে। প্রযুক্ত ফ্ল্যাস প্রদীপের আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৫৬০০Å সবুজ রঙের পর্যায়ে পড়ে। কয়েক সেঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের ০.৫ সেঃ ব্যাসের একটি রুবি দণ্ড দিয়ে যে প্রথম লেসার তৈরি হলো—তা অবিরাম নয়। ফ্ল্যাস প্রদীপের ঝলকের সঙ্গে সঙ্গে লাল লেসার রশ্মি ক্ষণিকের জন্যে ঝলকে ওঠে। তবু পারলে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ১০ কোটি ওয়াট শক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। সূর্যের আলো তো ১ বর্গ সেঃ মিঃ আয়তনে ৫০০ ওয়াটও ফোকাস করা যায় না। এথেকে লেসারের ক্ষমতা কিছুটা বোঝা যাবে। আজকাল আরো উন্নততর লেসার দিয়ে যে শক্তিশালী আলো পাওয়া যাচ্ছে —এই শক্তিও তার কাছে নগণ্য।

ফোকাসিত লেসার রশ্মির সাহায্যে হীরকে বা কঠিনতম বস্তুতে ফুটা করা যায়, প্রায় $\frac{১}{১০০০}$ সেকেণ্ডে প্রায় ১০০০০° ফারেনহাইট তাপ উৎপাদন করাও সম্ভব। ঐ লেসার রশ্মি এক মাইল দূরেও কাঠ পুড়িয়ে ফেলতে পারে।
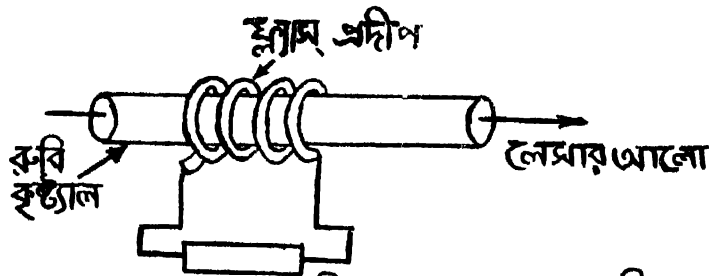
১৩নং চিত্র
কুণ্ডলীকৃত ফ্ল্যাস প্রদীপ দিয়ে রুবি লেসার রশ্মির উৎপাদন।

$৪\cdot৩ \times ১০^{১৪}$ সাঃ / সেঃ কম্পন-সংখ্যার এই আলো প্রায় ৫০ জুল শক্তিশালী। তাহলে প্রায় ২×১০^{২০}টি ফোটন এই ঝলকের মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে বেরোয় প্রায় $\frac{১}{১০০০}$ সেকেণ্ডের মধ্যে। এই শক্তির মান এক সেকেণ্ডে ১৫০ পাউণ্ড ওজন ৫০০ ফুট উর্ধ্বে তুলতে পারে। এই বিপুল শক্তির ঝলক সুসঙ্গত বিকিরণের ফলেই সম্ভব হলো। এখন উপযুক্ত ব্যবস্থায় এই আলোকে ফোকাস করতে পারা যায়, লেন্স ও বক্র দর্পণের সাহায্যে। এক বর্গ সেঃ মিঃ-এর $\frac{১}{১০০০}$ ভাগের চেয়েও কম আয়তনে এই রশ্মিকে ফোকাস করতে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ৯ই মে এই রকম একটি লেসার রশ্মি ২৫০০০০ মাইল দূরে চন্দ্রপৃষ্ঠে পাঠানো হয়েছিল। এতদূর পথ অতিক্রম করেও তার ব্যাপ্তি দাঁড়িয়েছিল দু-মাইলের মত। এই রশ্মির প্রতিটি ঝলকের অস্তিত্ব ছিল মাত্র $\frac{১}{১০০০}$ সেকেণ্ড। এই আলো চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসে টেলিস্কোপে ধরা পড়লো। প্রতিটি ঝলকে ছিল প্রায় ২×১০^{20}টি ফোটন। এদের অধিকাংশই হারিয়ে গিয়েছিল। যে কয়টি ফিরে এসেছিল—বিশেষ ব্যবস্থায় তাদের বিবর্ধন করে নিশ্চিতই জানা গেল যে, লেসার সাধারণ আলো নয়।

কারণ সাধারণ আলোর পক্ষে এই দূরত্ব থেকে ফিরে আসা একেবারে অসম্ভব। আজ এ কথা চিন্তা করা অসম্ভব নয় যে, সুসঙ্গত আলোর বিকিরণকে আমরা অদূর ভবিষ্যতে বেতার-তরঙ্গের মত সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে ব্যবহার করতে পারবো।

বায়ব ও কঠিন পদার্থে লেসার ক্রিয়া

অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের পরিবর্তে ক্যাল-সিয়াম ফ্লোরাইড ও ক্রোমিয়ামের পরিবর্তে ইউরেনিয়াম বা সামারিয়াম (Samarium) ব্যবহার করে খুব নিম্ন তাপমাত্রায় অবিরাম লেসার রশ্মি পাওয়া যায়। রুবিতে ক্রোমিয়ামের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে নিম্ন তাপমাত্রায় অবিরাম লেসার রশ্মিও পাওয়া সম্ভব হলো।

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে জাভন (Javan) ও তাঁর সহ-বিজ্ঞানীরা বায়ব পদার্থ দিয়ে অবিরাম লেসার রশ্মি উৎপাদন করেন। তাঁরা একটি কোয়ার্টস্ নলে হিলিয়াম ও নিওনের মিশ্রণ নিলেন। প্রায় ২৮ মেগাসাইক্‌ল্ কম্পন-সংখ্যার বেতার-তরঙ্গ দিয়ে এই মিশ্রণটিকে উত্তেজিত করা হলো। সেই উত্তেজনা হিলিয়াম পরমাণুকে ২০ ইলেকট্রন ভোল্ট-এর শক্তি-স্তরে উন্নীত করে। হিলিয়াম পরমাণুর এই উত্তেজনা নিওন পরমাণু কেড়ে নেয় সংঘাতের দ্বারা। নিওনের উচ্চতম শক্তি-স্তরে এভাবে অনেক পরমাণু সমষ্টি জমে যায়। নীচের স্তরগুলিতে পরমাণু সমষ্টি অল্প। তাই ওই স্তর থেকে ঠিক নীচে ঐ সমষ্টি নেমে এলে আমরা পাই লাল উজানী আলোর ($2\cdot6\times10^{14}$ সাঃ/সেঃ) আবার সেখান থেকে 0 স্তরে নেমে এলে পাই লাল আলোর ($4\cdot7\times10^{14}$) সুসঙ্গত বিকিরণ।

বিভিন্ন বায়বের মিশ্রণে এরকম অবিরাম লেসার রশ্মি উৎপাদন করা যায়।

অর্ধপরিবাহী পদার্থে লেসারের ক্রিয়া

অর্ধপরিবাহী (Semiconductor) গ্যালি-য়াম আর্সেনাইড (GaAs) দিয়েও লেসার রশ্মি উৎপাদন করা হয়। ঐ পদার্থে কিছু টেলুরিয়াম পরমাণু আর্সেনিক-এর পরিবর্তে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। টেলুরিয়ামের ইলেকট্রন বেশী বলে N শ্রেণীর অর্থাৎ বাড়তি ইলেকট্রন নিয়ে দাতা (Donor) আখ্যা দেওয়া যায়। আবার গ্যালিয়াম আর্সেনাইডে কয়েকটি গ্যালিয়াম পরমাণুর জায়গায় জিঙ্ক পরমাণু ঢুকিয়ে দিলে সেটি হলো P শ্রেণীর অর্থাৎ কমতি ইলেকট্রন নিয়ে ছিদ্রের (Hole) মত তার ভূমিকা গ্রহীতার (Acceptor)। এখন এই দুটি N ও P শ্রেণীর পদার্থকে জুড়ে দিয়ে বাইরে থেকে উপযুক্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রয়োগ করলে N-এর পরিবহন পটি (Conduction

১৪নং চিত্র
অর্ধপরিবাহী লেসার।

band) থেকে ইলেকট্রনগুলি P-র যোজ্যপটির (Valence band) ছিদ্রে (Hole) সংযুক্ত হবে। যোজ্যপটির ১/১০০০০ ইঞ্চির মত ক্ষুদ্র অঞ্চলে এর ফলে পাওয়া যাবে সুসঙ্গত আলোর বিকিরণ। তড়িৎপ্রভ (Electro-luminescent) বস্তুর কথা জানা ছিল—বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রয়োগে যারা আলো বিকিরণ করে। উল্লিখিত অর্ধপরিবাহী লেসারে দেখা গেল যে, উচ্চতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রয়োগে তীব্র সুসঙ্গত বিকিরণ পাওয়া যায়—যা আগে জানা ছিল না।

সাধারণ কঠিন পদার্থ, বায়ব, অর্ধপরিবাহী পদার্থ—এমন কি, প্লাষ্টিক, তরল পদার্থ থেকেও লেসার উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন পদার্থে শুধু কোথায় কি শক্তি-স্তর আছে খুঁজে দেখা আর উর্ধ্বতর স্তরে অধিকাংশ পরমাণু সমষ্টিকে কোন রকমে তুলে দেওয়া—এর উপরই নির্ভর করছে লেসারের ক্রিয়া।

অদূর ভবিষ্যতে মনে হয় লেসার খুব সহজলভ্য হয়ে দাঁড়াবে। ফলে লেসারের বিপুল শক্তিকে সংবাদ আদান-প্রদান থেকে শিল্পে ওয়েল্ডিং (Welding) বা কাটাকুটিতে সহজেই ব্যবহার করা যাবে। ক্যান্সার প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায়ও লেসার কার্যকরী হবে। বিজ্ঞান ও শিল্পে সুসঙ্গত বিকিরণ মেসার ও লেসারের মাধ্যমে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে—তাতে কোন সন্দেহ নাই।

"***এইরূপ খাপছাড়া ব্যাপার নিত্যনূতন আবিষ্কার করিতেছেন বলিয়াই বৈজ্ঞানিকের এতটা বাহাদুরি। অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, বৈজ্ঞানিক তাহা দেখিতে পান, ইহাতেই তাঁহার এতটা দর্প। অথচ সেই বৈজ্ঞানিকেরাই বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত একটা নূতন তথ্যের সংবাদ পাইলে তাহাতে বিশ্বাস করিতে চান না এবং সহসা উহাকে মিথ্যা বলিয়া ফেলেন, তাহাই অবৈজ্ঞানিকদের পক্ষে ক্ষোভের হেতু হয়। আপাততঃ ইহা একটা সামান্য ব্যাপার বলিয়া ঠেকে। কিন্তু একটু ধীরভাবে আলোচনা করিলে ইহা বুঝা যায়। খাপছাড়া নূতন তথ্য লইয়া বৈজ্ঞানিকের কারবার বটে; কিন্তু যতক্ষণ তিনি খাপছাড়াকে খাপে পুরিতে না পারেন, যতক্ষণ অসমঞ্জসকে সমঞ্জস করিতে না পারেন, যতক্ষণ অপরিচিত নূতন সত্যকে পুরাতন পূর্বপরিচিত সত্যের সঙ্গে মিলাইয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া তাহার কোঠায় না ফেলিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহার তৃপ্তি হয় না। চেষ্টার বলে ও বুদ্ধির বলে তিনি কালে সেই সম্বন্ধের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন; তখন তাহা আর অসমঞ্জস বা খাপছাড়া থাকে না। বিজ্ঞান-বিস্তার ইতিহাসই তা-ই, যাহা এককালে খাপছাড়া ছিল, তাহা কালে খাপের মধ্যে আসে***"

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর

সমুদ্র-জলের বিশোধন

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

সমুদ্র-জলে বহু লবণজাতীয় পদার্থ দ্রবিত থাকে। তার মধ্যে আমাদের নিত্যব্যবহার্য সাধারণ লবণ (Common salt) বা সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে সবচেয়ে বেশী। এই কারণে সমুদ্রের জল মুখে দিলে লোনা লাগে। সাধারণতঃ ওজনে হাজার ভাগ সমুদ্র-জলে থাকে :

সোডিয়াম	আয়ন	১০.৭২২ ভাগ
ম্যাগ্নেসিয়াম	,,	১.২৯৭
ক্যালসিয়াম	,,	০.৪১৭
পটাশিয়াম	,,	০.৩৮২
ক্লোরাইড	,,	১৯.৩৩৭
সালফেট	,,	২.৭০৫
বাইকার্বোনেট	,,	০.০৯৭
কার্বোনেট	,,	০.০০৭
ব্রোমাইড	,,	০.০৬৬

এত অধিক পরিমাণে লবণজাতীয় পদার্থ বর্তমান থাকে বলে সমুদ্রের জল পানের অযোগ্য এবং রান্নাবান্না, কাপড়কাচা, ঘরবাড়ী ধোয়া, কলকারখানার কাজ ও ষ্টীম বয়লারে এই জল ব্যবহার করা যায় না। কৃষির কাজে সমুদ্রের জল সম্পূর্ণ অনুপযোগী। শস্যক্ষেত্রে সমুদ্রের জল প্রবেশ করলে সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

সমুদ্রগামী জাহাজে তাই সাধারণতঃ দেখা যায়, বন্দরে বন্দরে নির্মল জল পানের ও রান্নার কাজের জন্যে সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। সমুদ্রের তীরবর্তী জমিতে কোন ফসল ফলতে পারে না, সমুদ্রের জলে অধিক লবণ থাকবার জন্যে। সমুদ্র-জলের লবণাক্ততা দূরীকরণের জন্যে গত কয়েক বছরব্যাপী বহু গবেষণা ও চেষ্টা চলেছে। তারই কিছু পরিচয় দেওয়া হচ্ছে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কারণ এসব প্রচেষ্টা সফল হলে বহু অনুর্বর জমিতে বিশোধিত সমুদ্র-জলের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। বর্তমানে বহু ব্যয়সাধ্য নদীর বাঁধ ইত্যাদি ব্যবস্থার আবশ্যকতা তখন কমে যাবে। বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন এবং ফসল-বৃদ্ধির উপায়ও মিলবে।

যে সব পদ্ধতিতে সমুদ্র-জল বিশোধনের ব্যবস্থায় কিছু ফল পাওয়া গেছে, এখানে সংক্ষেপে তার বর্ণনা করছি।

(১) পৌনঃপুনিক পাতন-পদ্ধতি
(Multi-effect distillation)

এই পদ্ধতিতে কোন বয়লার থেকে উত্থিত বাষ্প কয়েকটি পর পর সাজানো সমুদ্র-জলের ভাণ্ডের মধ্যে পর্যায়ক্রমে পরিচালিত করা হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং তার পরবর্তী ভাণ্ড থেকে এর ফলে যে বাষ্প সৃষ্টি হয়, তাকে শৈত্য প্রয়োগে পুনরায় তরল পদার্থে পরিণত করা হয়। সমুদ্র-জলকে বাষ্পীভবনের জন্যে যে তাপের প্রয়োজন হয়, তা আসে পরিচালিত বাষ্পের লীন তাপ (Latent heat) থেকে। সাধারণতঃ তিনটি কিংবা ছয়টি সমুদ্র-জলের ভাণ্ডের ব্যবস্থা আছে। এই পদ্ধতিতে যে তরল জল পাওয়া যায়, তা প্রায় বিশুদ্ধ পাতিত জল। খরচের দিক থেকে এই ব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী নয়। তাই অনেকে প্রস্তাব করেন যে, ডিজেল ইঞ্জিনের অব্যবহার্য তাপের সাহায্যে এই পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে সমুদ্র-জলের বিশোধন হতে পারে।

(২) সংনমিত বাষ্প থেকে উৎপন্ন তাপের সাহায্যে সমুদ্র-জলের পাতন

(Vapour compression distillation)

এই পদ্ধতিতে কোন সমুদ্র-জলের ভাণ্ড থেকে উত্থিত বাষ্প সংনমিত করে তার তাপমাত্রা বাড়িয়ে নেওয়া হয়। এই সংনমিত অধিক উত্তপ্ত বাষ্পকে ভাণ্ডের জলে পুনরায় পরিচালিত করে আরও অধিক পরিমাণে বাষ্প সৃষ্টি করা হয়। এই-ভাবে বাষ্পকে বার বার সংনমিত ও ভাণ্ডের জলে পরিচালিত করে পরিশেষে তাকে তরলীভূত করলে বিশুদ্ধ পাতিত জল পাওয়া যায়।

এই পদ্ধতির সুবিধা হচ্ছে এই যে, জলকে বাষ্পীভূত করবার জন্যে যে তাপের আবশ্যক হয়, তার অধিকাংশ আসে সংনমন প্রক্রিয়া থেকে। আর এর প্রধান অসুবিধা হচ্ছে যে, সমুদ্র-জলের ভাণ্ডে ক্রমশঃ বহুল পরিমাণে লবণ জাতীয় পদার্থ জমতে থাকে। এই কারণে সময় সময় পাতন-ক্রিয়া স্থগিত রেখে ভাণ্ড পরিষ্কার করে নিতে হয়।

(৩) উষ্ণতার তারতম্যে সমুদ্র-জলের পাতন

(Temperature difference power plant)

এই পদ্ধতিতে সমুদ্রের উপরিভাগের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জল বাষ্পীভূত অবস্থায় ভ্যাকুয়াম পাম্পের সংযোগে একটি টারবাইনের ভিতর দিয়ে সমুদ্রের তলদেশের অপেক্ষাকৃত শীতল জলে নিমজ্জিত ঘনীকারকের (Condenser) মধ্যে পরিচালিত করা হয়।

এই পদ্ধতিতে সমুদ্রের তলদেশ থেকে শীতল জল উত্তোলন করতে প্রচুর শক্তি ব্যয়িত হয়। এটাই এর বিশেষ অসুবিধা।
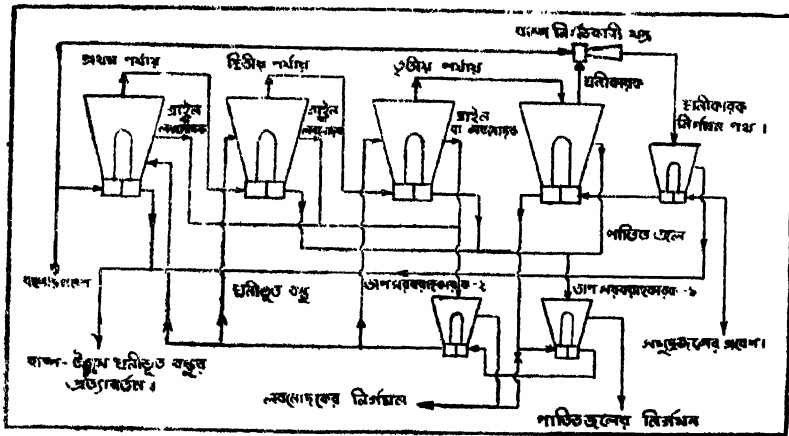
১নং চিত্র
পৌনঃপুনিক পাতন-পদ্ধতির (তিন পর্যায়ের) রেখাচিত্র।

(৪) সৌর-তাপের সাহায্যে সমুদ্র-জলের পাতন

(Solar distillation)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া শহরে সৌর-তাপের সাহায্যে সমুদ্র-জল পাতিত করে বিশুদ্ধ

নির্মল জল প্রস্তুতের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্তমানে পরীক্ষা চলেছে। এই পদ্ধতিতে কালো রঙের আস্তরণ দেওয়া কাষ্ঠনির্মিত বড় বড় খাটো জল-পাত্রের উপর দোচালা ঘরের মত (Inverted V-shaped) কাচের চালা চারদিকে কাচের বাইরের সংগ্রাহী পাত্রে গড়িয়ে পড়ে। অব-শেষে সংগ্রাহী পাত্র থেকে ঐ জল নির্মল জলের আধারে সঞ্চিত হয়।

এই ব্যবস্থায় সূর্যকিরণের তাপের অতি অল্প অংশই কাজে লাগে, বেশীর ভাগ তাপই
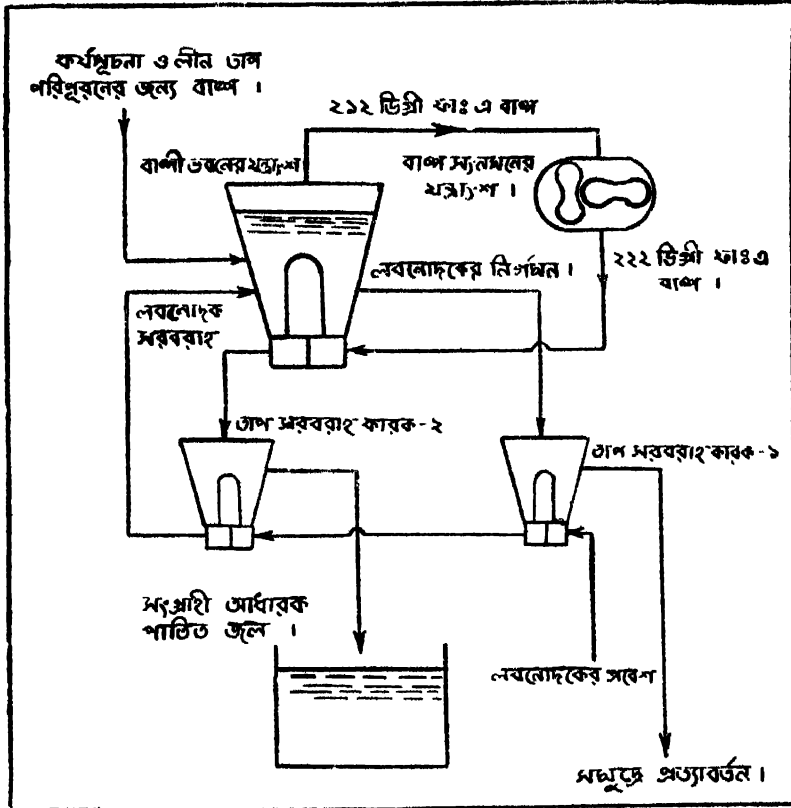
২নং চিত্র

সংনমিত বাষ্প থেকে উত্থিত তাপের সাহায্যে সমুদ্র-জলের পাতন-পদ্ধতির রেখাচিত্র।

শার্সি দিয়ে আটকানো থাকে। এই কাচের প্রকোষ্ঠগুলি এমন জায়গায় নির্মাণ করা হয়, যাতে সূর্যের কিরণ দিনের অধিকাংশ ভাগে সমুদ্র-জলপূর্ণ পাত্রের উপর পড়তে পারে। সমুদ্র-জল থেকে উত্থিত জলীয় বাষ্প উপরিস্থিত কাচের চালার তলায় তরল জলবিন্দুরূপে জমে প্রতিফলিত, বিকিরিত ও অশোষিত অবস্থায় ব্যয়িত হয়। এসত্ত্বেও যে সব প্রদেশে সূর্যকিরণ দীর্ঘদিনব্যাপী থাকে, সে সব ক্ষেত্রে এরূপ পদ্ধতিতে সমুদ্র-জলের বিশোধন কার্যকরী হতে পারে—পরীক্ষার ফলে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই ব্যবস্থায় বহু অসুবিধার মধ্যে

কালো আস্তরণ নির্বাচন একটি প্রধান সমস্যা। সম্শোধিত সমুদ্র-জলে এই আস্তরণের কোন বৈকল্য ঘটলে তাপ শোষণে ব্যাঘাত ঘটে।

(৫) রাসায়নিক পদ্ধতি
(Chemical processes)

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমুদ্র-জলের শোধন-পদ্ধতির মধ্যে আয়ন-বিনিময়কারী পদ্ধতি (Ion-exchange process) হচ্ছে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী। অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে এই পদ্ধতিতে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে জলে দ্রবিত আয়ন (Na^+, Ca^{++}, Mg^{++} ইত্যাদি) কোন বিশিষ্ট রাসায়নিক অধঃক্ষেপ-আস্তরণে ঢাকা ছাকনি স্তরের সংস্পর্শে এলে সে পদার্থের আয়নের সঙ্গে বিনিময় ঘটে। ফলে সমুদ্র-জল থেকে এসব দ্রবিত আয়ন ছাকনি স্তরের রাসায়নিক আস্তরণের দ্বারা শোষিত হয়। কিন্তু জলে রাসায়নিক পদার্থের আস্তরণের আয়ন বিনিময়ে প্রবেশ লাভ করে।

এই পদ্ধতিতে সমুদ্র-জল বিশোধন করবার জন্যে যে সব রাসায়নিক পদার্থের আস্তরণ ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জিওলাইট (Zeolite) জাতীয় পদার্থ প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সোডিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট (Sodium-Aluminium silicate) কিংবা সালফোনেটেড কোল বা সালফোনেটেড জাতীয় রেজিন পদার্থ। জিওলাইট স্তরের ভিতর দিয়ে বিশুদ্ধ জলে HCl দ্রবিত করে অম্লজল পরিচালিত করলে ঐ স্তরের যোগাত্মক Na^+ আয়নের সঙ্গে অম্লজলের যোগাত্মক H^+ আয়নের বিনিময় ঘটে। ফলে হাইড্রোজেন জিওলাইট পৃথক হয়ে আসে।

এখন হাইড্রোজেন জিওলাইট স্তরের ভিতর দিয়ে সমুদ্র-জল পরিচালিত করলে স্তরের হাইড্রোজেন আয়নের সঙ্গে সমুদ্র-জলের যোগাত্মক Na^+, Ca^{++} এবং Mg^{++} আয়নের বিনিময় হয় এবং এসব আয়ন স্তরে অবশোষিত হয়ে দূরীভূত হয়। কিন্তু সমুদ্র-জলের ক্লোরাইড ও সালফেট আয়ন অপরিবর্তিত অবস্থায় HCl এবং H_2SO_4 রূপে বর্তমান থাকে। এই আংশিক বিশোধিত সমুদ্র-জল সিলভার জিওলাইট এবং বেরিয়াম জিওলাইট স্তরের মধ্য দিয়ে পরম্পর পরিচালিত করলে ক্লোরাইড ও সালফেট আয়ন অদ্রবণীয় AgCl এবং $BaSO_4$ রূপে দূরীভূত হয়। এই ভাবে সমুদ্র-জলের পরিশোধন ঘটে। সিলভার জিওলাইট স্তর থেকে সিলভার আয়নকে পুনরুদ্ধার করা যায়। এজন্যে এই স্তরের ভিতর দিয়ে বিশুদ্ধ জলে সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবিত করে পরিচালিত করলে হাইড্রোজেন-জিওলাইট পুনর্গঠিত হয় এবং সিলভার আয়ন সিলভার সালফেট (Ag_2SO_4) রূপে জলে দ্রবিত হয়ে বেরিয়ে আসে। বেরিয়াম জিওলাইটকে এরূপ প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন-জিওলাইটে পুনরায় পরিবর্তিত করা যায়। এর জন্যে বিশুদ্ধ জলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবিত করে বেরিয়াম-জিওলাইট স্তরের ভিতর দিয়ে পরিচালিত করতে হয়। বেরিয়াম আয়ন মুক্ত হয়ে বেরিয়াম ক্লোরাইড ($BaCl_2$) রূপে বেরিয়ে আসে।

$$Na-Z+HCl = H-Z+NaCl$$

সোডিয়াম-জিওলাইট হাইড্রোজেন-জিওলাইট

$$H-Z+Na^+, Ca^{++}, Mg^{++} = Na\ (\tfrac{1}{2}Ca, \tfrac{1}{2}Mg)-Z+H^+$$

$$Ag-Z+HCl=H-Z+AgCl\ (ppt)$$

সিলভার-জিওলাইট

$$Ba-Z_2+H_2SO_4=2H-Z+BaSO_4(ppt)$$

বেরিয়াম জিওলাইট

$$R-SO_3H+Na, \tfrac{1}{2}Ca, \tfrac{1}{2}Mg = R\text{-}SO_3Na\ (\tfrac{1}{2}Ca, \tfrac{1}{2}Mg)+H^+$$

$$R-N\ (alk)_2, (alk)_3OH, (alk)_2HOH+ Cl' \text{ বা } SO_4''$$

$$=R-(alk)_2Cl\ (\text{বা } \tfrac{1}{2}SO_4'')+OH'$$

এই দুটি রেজিন স্তরের মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে
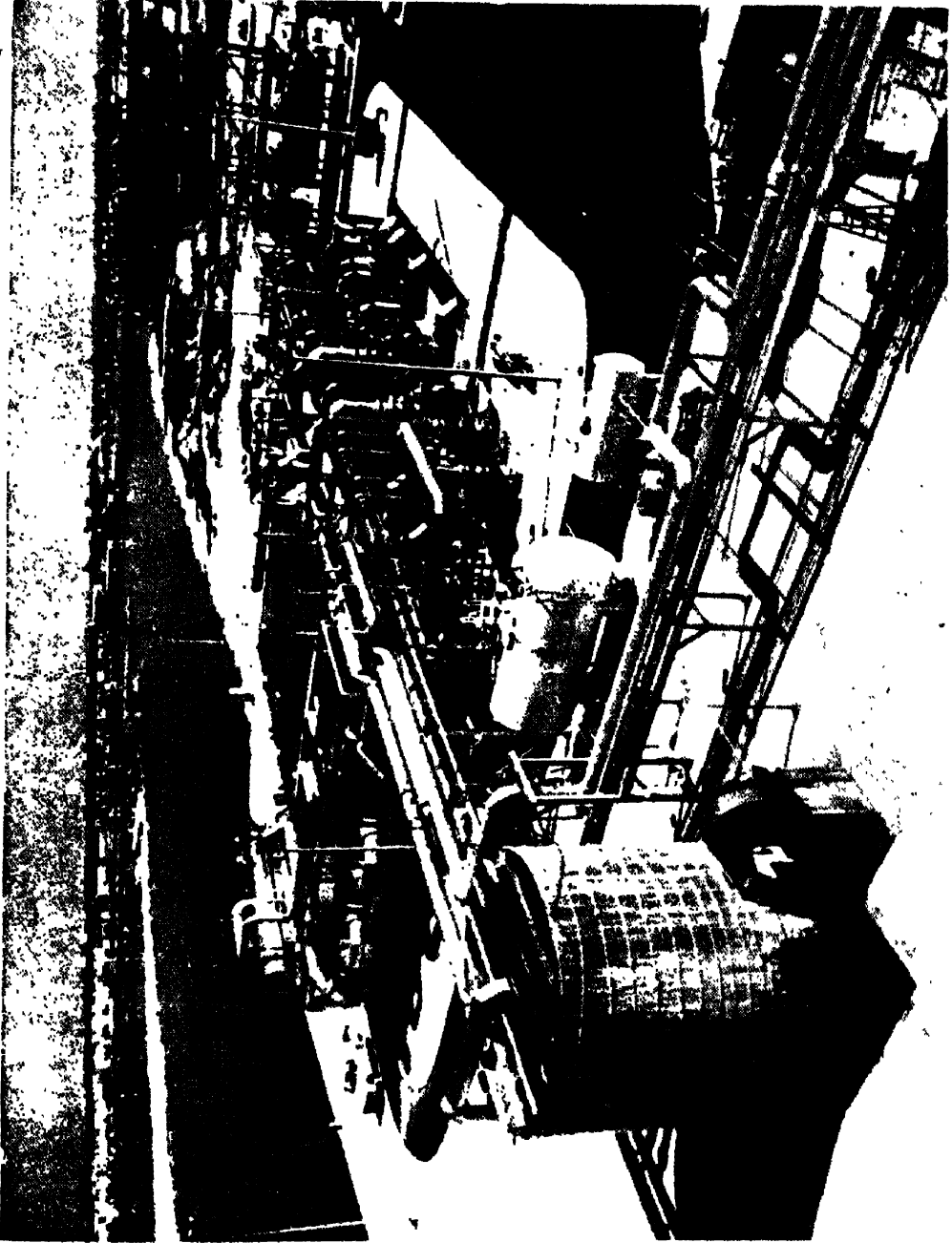
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় সমুদ্র-জল বিশোধন প্রণালীর একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র।

পরিচালিত করলে সমুদ্র-জলের সকল যোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক আয়ন বিদূরিত হয়ে সমপরিমাণ H^+ ও OH' আয়নের উৎপত্তি হয়। ফলে বিশুদ্ধ নির্মল জল পাওয়া যায়।

এই পদ্ধতিতে Na, Ca, Mg, Cl' বা SO_4'' উপজাত পদার্থ হিসাবে সমুদ্র-জল থেকে উদ্ধার করা যায়। অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য বলে এই পদ্ধতিতে বহুল পরিমাণ জল নিয়ে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না।

বৈদ্যুতিক পদ্ধতি (Electrical method)

এই পদ্ধতিতে তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত জলাধারে সমুদ্র-জলের বৈদ্যুতিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। দুটি পর্দার (Membrane) সাহায্যে জলাধারটি তিনটি প্রকোষ্ঠে ভাগ করা হয়ে থাকে। এসব পর্দার বিশেষত্ব হচ্ছে, তাদের ভিতর দিয়ে আয়নগুলি চলাচল করতে পারে, কিন্তু জল চলাচল করতে পারে না। বাইরের দুটি প্রকোষ্ঠে থাকে যোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক বৈদ্যুতিক ফলক (Electrode)। এই দুটি ফলকের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিচালিত করা হয়। তখন এক দিকের বাইরের বিয়োগাত্মক ফলকে যোগাত্মক আয়নগুলি জমতে থাকে এবং অপর দিকের বাইরের প্রকোষ্ঠে বিয়োগাত্মক আয়নগুলি সমবেত হয়। মধ্য প্রকোষ্ঠের জল ক্রমশঃ লবণজাতীয় পদার্থ থেকে বিমুক্ত হয়। এভাবে মধ্য প্রকোষ্ঠ থেকে বিশোধিত সমুদ্র-জল সংগৃহীত হয়।

আয়ন-বিনিময়কারী পদার্থের সাহায্যে এসব পর্দা প্রস্তুত করে তাদের কার্যকরী শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। এর ফলে এই পদ্ধতিতে জল বিশোধনের ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব হয়েছে।

জীবদেহের অনুরূপ পর্দা-পদ্ধতি
(Biological membrane method)

জীবদেহে দুই জাতীয় পর্দার অস্তিত্ব দেখা যায়। একজাতীয় পর্দার ভিতর দিয়ে জল চলাচল করতে পারে, কিন্তু কোন আয়ন যেতে পারে না। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় অস্মোসিস (Osmosis)। অপর জাতীয় পর্দার ভিতর দিয়ে আয়ন চলাচল করতে পারে, কিন্তু জল যেতে পারে না।

এই জাতীয় পর্দার ব্যবহারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমুদ্র-জল বিশোধনের গবেষণা চলছে। শেষোক্ত পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে আংশিক সুফল পাওয়া গেছে। এটি বৈদ্যুতিক পদ্ধতির অনুরূপ বলা চলে।

উপসংহার

আমাদের দেশে সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে বহু মরুপ্রান্তরের অস্তিত্ব দেখা যায়। এসব অনুর্বর মরুপ্রদেশকে বিশোধিত সমুদ্র-জলের সাহায্যে উর্বর ও বাসের উপযোগী করে তোলবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এই বিষয়ে বিজ্ঞানী ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। আমাদের দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিজ্ঞান, শিল্প ও কৃষির উন্নতিকল্পে গবেষণার জন্যে বহু অর্থব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু সমুদ্র-জল বিশোধনের বিষয়ে বিশেষ কোন কাজ হয়েছে কিনা, কিংবা এই সম্পর্কে কোন পরীক্ষা চলেছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। ভবনগরে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় লবণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (Central Salt Research Institute) এই জাতীয় পরীক্ষা পরিচালনা গবেষণার প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। আশা করি, পরিকল্পনা কমিশন এদিকে বিশেষ নজর দেবেন।

বেতারের আদিপর্ব

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

বেতারের ইতিহাসে প্রথমেই যাঁর কথা স্মরণীয়, তাঁর নাম জেম্‌স্ ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল (James Clerk Maxwell)। ইনি ইংল্যাণ্ডের একজন প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ও পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্ ছিলেন। যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের* কথা আজ সকলেই জানেন, তিনিই তা সর্বপ্রথম প্রচার করেন। ইং ১৮৬৫ সনে তিনি গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, যখনই কোনও বৈদ্যুতিক আধান (Charge) ত্বরান্বিত হয়, তখনই বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং এই তরঙ্গের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান। যা কেবল গণিতিক সিদ্ধান্ত মাত্র ছিল—এর তেইশ বছর পরে তা বাস্তবে পরিণত হয়। ১৮৮৮ সনে জার্মান বিজ্ঞানী হাইনরিক হার্ৎস্ (Heinrich Hertz) সত্য সত্যই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করতে সক্ষম হলেন। তাঁর প্রেরক-যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠিয়ে অদূরে এক গ্রাহক-যন্ত্রে এই তরঙ্গের অস্তিত্ব অকাট্যভাবে তিনি প্রমাণ করেন। হার্ৎসের এই যুগান্তকারী গবেষণা থেকেই বেতারের সূচনা।

হার্ৎসের পর বেতারের ইতিহাসে মার্কোনির (Marconi) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি ইতালির একজন বিশিষ্ট রেডিও এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বেতারের ইতিহাসে এঁর নাম আজ সর্বজনবিদিত। নানাভাবে বেতার-বিজ্ঞানকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সনে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বেতার-তরঙ্গ প্রেরণে নানা কার্যকরী নতুন নতুন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করে বেতার-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি করে গিয়েছেন। ১৮৯৭ সনে মার্কোনি যখন Isle of Wight-এর নীডল্‌স্ হোটেল (Needles Hotel) থেকে সোয়ানেজ (Swanage) পর্যন্ত সাড়ে সতেরো মাইল বেতার সংকেত প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখনকার দিনে এ এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! এর দু-বছর আগে রুশ অধ্যাপক পোপফ্ (Popoff) তিন মাইল দূর পর্যন্ত বেতার-সংকেত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের হিউজও (Hughes) এ-বিষয়ে কিছু সফলতা লাভ করেছিলেন। ১৮৯৩ সনে আমেরিকার নিকোলা টেস্‌লার (Nicola Tesla) বেতার-সংকেত প্রেরণের ব্যবস্থা এবং এর কিছু পরে বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী অলিভার লজ্-এর (Oliver Lodge) বেতার প্রেরক-যন্ত্রের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশেও প্রায় একই সময়ে (১৮৯৫-৯৬) আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলিকাতার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বেতার-সংকেত প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এই সময় সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ জগদীশচন্দ্রই সর্বপ্রথম উৎপাদন করেন। তাঁর প্রেরক-যন্ত্র থেকে তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই ৬-৮ মিলিমিটারের বিদ্যুতের ঢেউ উৎপাদন করেছিলেন।

বেতারের আদিপর্বে যে সব বিদ্যুতের ঢেউয়ের সাহায্যে বেতার-সংকেত প্রেরণ করা হতো, সেই সব ঢেউ এক বিশেষ শ্রেণীর

* ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গকে (Electromagnetic wave) এই প্রবন্ধে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বলা হয়েছে।

অন্তর্গত। এদের বিশেষত্ব এই যে, এদের এক একটি ঢেউ উঠেই ক্রমে কম জোর হতে হতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায়। এই শ্রেণীর তরঙ্গকে সে জন্যে বিলীয়মান (Damped) তরঙ্গ বলা হয়। হার্ৎস সর্বপ্রথম যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করেছিলেন, তা এই ধরণেরই। প্রেরক-যন্ত্রে পর-পর কতকগুলি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ (Spark) সৃষ্টি করে এই ধরণের কতকগুলি ছাড়া-ছাড়া তরঙ্গের দল খুব সহজেই উৎপাদন করা যায়।

বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে বিদ্যুতের ঢেউ তুলে বেতার-সংকেত পাঠাবার প্রণালীরই নাম দেওয়া হয়েছে—স্পার্ক-টেলিগ্রাফি (Spark telegraphy)। এই উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রেরক-যন্ত্রের নাম স্পার্ক-ট্র্যান্‌স্‌মিটার (Spark transmitter)। স্পার্ক প্রেরক-যন্ত্র থেকে যে বিচ্ছিন্ন ও বিলীয়মান বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাওয়া যায়, তা দিয়ে কেবল সংকেত পাঠানোই সম্ভব—বেতারে কথাবার্তা বা ব্রডকাস্টিং (Broadcasting) তা দিয়ে চলে না। বেতার টেলিফোনি ও ব্রড্‌কাস্টিং-এর জন্যে প্রয়োজন—অবিচ্ছিন্ন ও সম-বিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। এই উদ্দেশ্যে মার্কোনি এক নতুন ব্যবস্থা করেছিলেন। এর নাম—সময়ানুবর্তী স্পার্ক (Timed spark)। এই ব্যবস্থায় বিলীয়মান তরঙ্গের বিস্তারকে মার্কোনি মোটামুটিভাবে সমান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯০৩ সনে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী পউলসেন (Poulsen) আর্ক্‌ বাতি জ্বালিয়ে অবিচ্ছিন্ন ও সম-বিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করবার এক অভিনব ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে নির্মিত প্রেরক-যন্ত্রকে আর্ক্‌-ট্র্যান্‌স্‌মিটার বলে। পউলসেনের আর্ক্‌-ট্র্যান্‌স্‌মিটার থেকে দ্রুত স্পন্দনাঙ্কের পরিবর্তী বেতার-তরঙ্গ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল। এর দু-বছর আগে ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী ডাডেল (Duddell) আর্ক্‌ জ্বালিয়ে যে ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে খুব কম স্পন্দনাঙ্কের পরিবর্তী বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল। ডাডেলই আর্ক্‌-ট্র্যান্‌স্‌মিটারের সূচনা করেছিলেন—এ কথা বলা যেতে পারে। এই সময় ডায়নামো (Dynamo) যন্ত্রের সাহায্যেও অবিচ্ছিন্ন ও সম-বিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আলেকজাণ্ডারসন (Alexanderson) ও গোল্‌ড্‌স্মিট (Goldschmidt) প্রভৃতি এঞ্জিনিয়ারদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এর পর বেতার প্রেরক-যন্ত্রে থার্মায়নিক ভাল্‌ভের (Thermionic valve) প্রবর্তন হয়। থার্মায়নিক ভাল্‌ভের সাহায্যে বেতার-প্রেরক যন্ত্রে যখন সম-বিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া সম্ভব হলো, তখন থেকেই ভাল্‌ভ ট্র্যান্‌স্‌মিটারের পর্ব। শুধু প্রেরক-কেন্দ্রে নয়, গ্রাহক-যন্ত্রেও বেতারের অন্যান্য অনেক ব্যবস্থায় ভাল্‌ভের সাহায্যে নানা রকমের আশ্চর্য কাজ পাওয়া যায়। সে জন্যে বেতার-জগতে একে এক কালে "আলাদীনের প্রদীপ বলা হতো"। বেতার গ্রাহক-যন্ত্রের সম্পর্কেই বেতার-বিজ্ঞানে ভাল্‌ভের প্রথম প্রয়োগ। ১৯০৪ সনে ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী অ্যামব্রোজ ফ্লেমিং (Ambrose Fleming) সর্বপ্রথম এই ভাল্‌ভ নির্মাণ করেন। ১৮৮৩ সনে আমেরিকার প্রসিদ্ধ শিল্পবিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন (Thomas Alva Edison) বিজলি বাতি নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে এক আশ্চর্য আবিষ্কার করেন—ফ্লেমিং-এর ভাল্‌ভ-নির্মাণ এই আবিষ্কারেরই ফল। মার্কোনি যখন অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বেতার-সংকেত পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, তখন ফ্লেমিং তাঁর সহকর্মী ছিলেন। বিদ্যুতের ঢেউ ধরবার জন্যে যন্ত্র পরিকল্পনা করতে গিয়ে ফ্লেমিং এডিসনের পরীক্ষালব্ধ তথ্যটিকে

কাজে লাগালেন। ফলে গ্রাহক যন্ত্রে দ্বিপদী (Diode) ভাল্‌ভের প্রচলন হলো।

দ্বিপদী ভাল্‌ভের প্রথম পদটি ফিলামেন্ট আর দ্বিতীয় পদটি অ্যানোড (Anode) বা প্লেট (Plate)। ভাল্‌ভের ভিতর থেকে অনেকখানি বাতাস বের করে নেওয়া হয়। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে নির্মিত ভাল্‌ভে বায়ু-চাপের স্বল্পতা বিভিন্ন পরিমাণের হয়। উপযুক্ত কোনও ধাতুর সরু তার দিয়ে ফিলামেন্টটি তৈরি হয়ে থাকে। ফিলামেন্টকে মাঝখানে রেখে উপযুক্ত ধাতু-নির্মিত প্লেটটি চোঙের আকারে বসানো হয়। অন্যান্য ভাল্‌ভে প্লেটের আকার ও সংস্থান অন্য রকমও থাকে। ফিলামেন্টের তারে বিদ্যুৎ চালনা করলে তাথেকে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিদ্যুৎ-কণা নির্গত হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে উত্তপ্ত হয়ে কণাগুলি নির্গত হয় বলে এদের নাম থার্মায়ন (Thermion)। এগুলি যে ঋণাত্মক বিদ্যুতের ক্ষুদ্রতম কণা ইলেকট্রন, তা অনেক দিন হলো প্রমাণিত হয়েছে। কোন কোন ভাল্‌ভে ফিলামেন্ট একটি ধাতুর সরু চোঙের ভিতরে থাকে—চোঙের বাইরের দিকে বিশেষ বস্তুর প্রলেপ দেওয়া থাকে, যাতে ফিলামেন্টে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে চোঙটি যখন উত্তপ্ত হয়, তখন তার বাইরে থেকে বহু সংখ্যক ইলেকট্রন সহজেই বেরিয়ে আসে। ধাতুর এই চোঙটিকে ক্যাথোড (Cathode) বলা হয়। কোন বড় ব্যাটারীর ধন-মেরু যদি ভাল্‌ভের প্লেটে ও তার ঋণ-মেরু ফিলামেন্ট কিংবা ক্যাথোডে যোগ করা হয়, তবে ফিলামেন্ট বা ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রনগুলি প্লেটের দিকে ছুটে যায়, কারণ ইলেকট্রনগুলি ঋণ-বিদ্যুৎসম্পন্ন আর ব্যাটারীর ধন-মেরুর সংযোগে প্লেটটির বৈদ্যুতিক বিভব ধনাত্মক। এই ভাবেই প্লেট এবং ফিলামেন্ট বা ক্যাথোডের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয়।

১৯০৭ সনে এই দ্বিপদী ভাল্‌ভে আমেরিকার লী ডি ফরেস্ট (Lee de Forest) প্লেট ও ফিলামেন্টের মাঝামাঝি জায়গায় একটি তৃতীয় পদ সন্নিবিষ্ট করেন। একেই গ্রিড (Grid) বলে। সাধারণতঃ একটি কুণ্ডলীত বা প্যাঁচানো তার দিয়ে এটি তৈরি। ত্রিপদী ভাল্‌বের সাহায্যে বিদ্যুৎ-স্পন্দনের উৎপাদন, বিদ্যুৎ-প্রবাহ ও বিদ্যুৎ-স্পন্দনের বিবর্ধন ইত্যাদি নানা রকমের কাজ সম্ভব হয়েছে। ত্রিপদী ভাল্‌ভ ছাড়াও চতুষ্পদী, পঞ্চপদী ষট্‌পদী, সপ্তপদী, অষ্টপদী প্রভৃতি বহু পদবিশিষ্ট অনেক রকমের ভাল্‌ভ পরবর্তী কালে নির্মিত হয়েছে।

এবার গ্রাহক-যন্ত্রের ক্রমবিকাশের কথা বলা যাক। হার্ৎসের গ্রাহক-যন্ত্রের ব্যবস্থাটি ছিল অত্যন্ত সহজ ও সরল। চক্রাকারে একটি তামার তারই ছিল তার প্রধান অঙ্গ। বিদ্যুতের ঢেউ এই তারে এসে লাগলেই এতে ক্ষীণভাবে বিদ্যুৎ-চলাচল সুরু হয়। বিদ্যুতের ঢেউ যেমন ওঠে-নামে, তামার তারে যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন হয়, তাও তেমনি এদিক-ওদিক ক্রমান্বয়ে দিক পরিবর্তন করে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ অতি দ্রুত হারে দিক পরিবর্তন করে বলে একে বিদ্যুতের স্পন্দন বলা যেতে পারে। এই স্পন্দন খুব জোরালো করা যেতে পারে, যদি চক্রাকার তামার তারটির গঠন, মাপ ও আকার উপযুক্ত হিসাবমত হয়। তারের বাদ্যযন্ত্রের দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। সেতার বা এস্রাজের কোনও একটি তারে টঙ্কার দিলে তাতে কম্পন বা স্পন্দন হয় এবং এই স্পন্দন পাশের তারগুলিকেও অল্প-স্বল্প কাঁপিয়ে তোলে। যে তারে টঙ্কার দেওয়া হয়, সেই তারের সুরের সঙ্গে যদি পাশের কোনও তার একসুরে বাঁধা হয়, তবে টঙ্কার দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁধা তারটিও দেখা যায় বেশ জোরে কেঁপে ওঠে। এই সুর-সঙ্গতির (Tuning) ফলেই হয় অনুনাদ (Resonance)। হার্ৎসের

তামার তারটিতে যে বিদ্যুতের স্পন্দন হয়, তাতেও এই ধরণের অনুনাদ সম্ভব, যদি প্রেরিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সঙ্গে তামার তারটিকে সুর-সঙ্গত করে নেওয়া হয়। সুর-সঙ্গত করতে হলে তামার তারের গঠন, মাপ ও আকার যথোপযোগী হওয়া দরকার। হার্ৎসের চক্রাকার তারে অল্প একটু ফাঁক রাখা হয়। প্রেরিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সঙ্গে চক্রাকার তামার তারটি যদি সুর-সঙ্গত থাকে—তবে অনুনাদের ফলে ঐ তারে বিদ্যুতের স্পন্দন খুব বেশী জোরালো হয় এবং তারের ফাঁকটিতে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। হার্ৎস তাঁর প্রেরক-যন্ত্র থেকে যে বিদ্যুতের ঢেউ সৃষ্টি করেছিলেন, তার অস্তিত্ব তিনি এই ভাবেই প্রমাণ করেন।

হার্ৎসের এই গ্রাহক-যন্ত্রটি প্রেরক-যন্ত্র থেকে বেশী দূরে কাজ দেয় না। প্রেরক-যন্ত্র থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী দূরে বিদ্যুতের ঢেউ ধরবার জন্যে এর পর এক অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। এর নাম—সংসঞ্জক যন্ত্রিকা (Coherer)। প্যারিসের অধ্যাপক ব্র্যান্‌লি (Branly) এই যন্ত্রিকা প্রথম প্রবর্তন করেন। বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী অলিভার লজ্ ও অন্যান্য বিজ্ঞানী এবং আমাদের দেশের জগদীশচন্দ্র বসু সংসঞ্জক যন্ত্রিকার অনেক উন্নতি সাধন করেছিলেন। দুটি ধাতুদণ্ডের মাঝখানে একটি ফাঁকে রূপা, নিকেল অথবা কোনও বিশেষ ধাতুর চূর্ণ কাচের আবরণের মধ্যে রাখা হয়। ধাতু-দণ্ড দুটি কোনও ব্যাটারীর সঙ্গে যোগ করলে ধাতু-চূর্ণের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ অতি অল্পই হয়—কারণ ধাতু-চূর্ণের মধ্যে অসংখ্য ফাঁক থাকায় এদের তড়িৎ-পরিবাহিতা (Electrical conductivity) অত্যন্ত কম। কিন্তু বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যখন ধাতু-চূর্ণে এসে পড়ে, তখন দেখা যায় যে, এর তড়িৎ-পরিবাহিতা অনেক বেড়ে গেছে। মনে হয় ধাতুর চূর্ণ যেন গায়ে গায়ে জোড়া হয়ে বিদ্যুৎ-চলাচলের পথকে সুগম করে দিয়েছে। কাজেই প্রেরক-যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সংসঞ্জক যন্ত্রিকায় এসে পৌঁছুলেই এর ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ অনেকগুণ বেড়ে যায়। বিদ্যুৎ-প্রবাহ এভাবে বেড়ে গেলে তা যে কোন নির্দেশক যন্ত্রে ধরতে পারা কঠিন নয়। বিদ্যুৎ-তরঙ্গের পৌঁছ-সংবাদ নির্দেশক যন্ত্রে কাঁটা ঘুরিয়ে বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজিয়ে জানা যায়। অন্য রকম ব্যবস্থা করাও সম্ভব। মার্কোনির সংসঞ্জক-গ্রাহক-যন্ত্রে বেতার-বার্তার সংকেত কাগজের সরু ও লম্বা ফিতার উপর কালির আঁচড়ে আপনা থেকেই অঙ্কিত হয়ে যেতো। গ্রাহক-যন্ত্রটিকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সঙ্গে সুর-সঙ্গত করবার ব্যবস্থাও মার্কোনির গ্রাহক-যন্ত্রে ছিল।

মার্কোনির চৌম্বক-গ্রাহক-যন্ত্র (Magnetic detector) এখানে উল্লেখযোগ্য। এই যন্ত্রে একটি লম্বা লোহার ফিতা চক্রাকারে ঘোরাবার ব্যবস্থা থাকে। এরিয়েলের তারে একটি তারের কুণ্ডলী বা কয়েল (Coil) যোগ করা হয় এবং এই কয়েলের ভিতর দিয়ে লোহার ফিতাটি চালনা করা হয়। কয়েলের কাছেই চুম্বকের ব্যবস্থা থাকে। ফিতাটি চলতে চলতে যখন চুম্বকের কাছে আসে, তখন লোহার ফিতাটি চুম্বকের গুণ পায়। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ এরিয়েলে লেগে যখন স্পন্দনের সঞ্চার হয়, লোহার ফিতার চুম্বকত্ব তখন স্পন্দনের জোর অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রায় কমে যায়। এরিয়েলের কয়েলের উপর আর একটি কয়েল জড়ানো থাকে—হেড-ফোন (Head phone) এই কয়েলে লাগানো থাকে। বেতার সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে লোহার ফিতার চুম্বকত্বের পরিবর্তন হওয়ায় হেড-ফোনে সংকেত অনুসারে শব্দ হয়।

১৯০১ সনে সর্বপ্রথম বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে ক্রিস্ট্যালের (Crystal) ব্যবহার সুরু হয়। কার-

বোরাণ্ডাম (Carborundum), গ্যালেনা (Galena), বর্ণাইট (Bornite), জিনকাইট (Zincite), সিলিকন (Silicon) প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ খনিজ কৃষ্টালের টুক্‌রার সঙ্গে ধাতুর পিন লাগিয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে ব্যবহার করলে খুব কাছের রেডিও ষ্টেশন থেকে বেতার-সংকেত, কথা-বার্তা বা গান হেড-ফোনের সাহায্যে শোনা যায়। কৃষ্ট্যাল গ্রাহক-যন্ত্রে কি ভাবে বিভিন্ন রেডিও ষ্টেশন থেকে বেতার-সংকেত, কথা-বার্তা বা গান শোনা যায়, তার আলোচনা ও ব্যাখ্যা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

কৃষ্ট্যাল গ্রাহক-যন্ত্রের পরেই আসে ভাল্‌ভ গ্রাহক-যন্ত্র। গ্রাহক-যন্ত্রে যে এরিয়েল লাগানো হয়, মার্কোনিই সর্বপ্রথম তার প্রবর্তন করেন। এরিয়েলের তারকে দূরের ষ্টেশনের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সঙ্গে সুরসঙ্গত করবার ব্যবস্থা অলিভার লজই সর্বপ্রথম প্রচলন করেছিলেন। আজকাল অবশ্য ট্র্যানজিস্টরের (Transistor) যুগ। বলা বাহুল্য ট্র্যানজিস্টর বেতার-বিজ্ঞানে এক নবযুগের সূচনা করেছে।

"বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলি ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রেও আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"

রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞান ও জ্ঞান

জয়ন্ত বসু

আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি, গত দু' শতাব্দী আগেও বোধকরি তা জ্ঞানের সাধারণ একটা শাখা মাত্র ছিল। কিন্তু তারপর এত দ্রুত এর প্রসার হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে যে, একে আধুনিক সভ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে ধরে নেওয়া হয় বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না। পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে প্রায় দশ লক্ষ বছর কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী কালে বিজ্ঞানের দৌলতে আমাদের জীবনযাত্রা, এমন কি চিন্তাধারাতেও যে হারে পরিবর্তন হচ্ছে, আগে তা কল্পনা করা যেত না। এজন্যে বারট্র্যাণ্ড রাসেল বিজ্ঞানকে 'অবিশ্বাস্যরকম ক্ষমতাসম্পন্ন বৈপ্লবিক শক্তি' বলে বর্ণনা করেছেন।

এই যে বৈপ্লবিক শক্তি, এর আলোয় আমাদের সমস্ত জ্ঞানরাজ্য কি বেশ কিছুটা উদ্ভাসিত হতে পারে না? দর্শন, নীতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলি বিজ্ঞানের কাছ থেকে নিজেদের ব্যাপক ও আধুনিক যুগের উপযোগী করে তোলবার অনেকখানি সুযোগ নিশ্চয় পেতে পারে, তবে দুঃখের কথা এই যে, ঐ বিষয়গুলি খানিকটা কূপমণ্ডুকের মতই আজো নিজেদের পুরণো সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকছে। বিজ্ঞানের বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে আদান-প্রদান চলে, এক ক্ষেত্রের ফলন অন্য ক্ষেত্রকে উর্বর করে দিয়েছে, বিজ্ঞানে এমন দৃষ্টান্ত কম নয়। ইলেকট্রনিক্সের তথ্যাদি আজ জীববিদ্যার কাজে লাগছে, জীববিদ্যার তথ্যাদি লাগছে ইলেকট্রনিক্সের কাজে। এই দু'টির সংমিশ্রণে 'বায়োনিক্স্' (Biology+Electronics) নামে একটি নতুন বিদ্যাই তো আজ গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়েই কেবল নয়, জ্ঞানের অন্যান্য শাখাও যে বিজ্ঞানের কাছ থেকে লাভবান হতে পারে, সেইদিকে সুধিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে আমি এই প্রবন্ধে কেবল দু'একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই।

প্রথমে দর্শনের কথাই ধরা যাক। বিজ্ঞানের যে একটি নিজস্ব দর্শন আছে, বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীমাত্রই তা উপলব্ধি করেন। এই দর্শনের মূল বক্তব্যগুলি এই রকম:—

ভৌত জগতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ মানুষের মনের বাইরে এর অস্তিত্ব রয়েছে। বস্তুতঃ মানুষের মন এই জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র।

প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব। সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী কয়েকটি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ নিয়মগুলিকে কেউই লঙ্ঘন করতে পারে না।

নিয়মগুলি সম্বন্ধে একেবারে কোন চরম জ্ঞান আমাদের নেই বা থাকতেও বোধহয় পারে না। পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের দ্বারা আমাদের জ্ঞান কেবল ক্রমশঃ উন্নীত হতে পারে।

প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সর্বস্থানে ও সর্বকালে প্রযোজ্য।

বিজ্ঞানের এই বক্তব্যগুলির উপর ভিত্তি করে যদি সমগ্র দর্শনশাস্ত্র গড়ে উঠে, তবেই তা আধুনিক যুগের উপযোগী হতে পারে। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, বিজ্ঞানের এক্তিয়ার কেবলমাত্র ভৌত জগতে, মনোজগৎ তার ঠিক এলাকার মধ্যে নয়। কিন্তু যেহেতু বিবর্তনবাদ একটি স্বীকৃত সত্য, সুতরাং পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি

এবং তার মনের বিকাশও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়; অর্থাৎ মানুষের মন একটা প্রাকৃতিক ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু নয়, তবে নিঃসন্দেহে সেটা বেশ জটিল ধরণের। মনো-বিজ্ঞান এই জটিল বিষয়ের বিশ্লেষণে নিযুক্ত আছে। এটা অবশ্য স্বীকার করতে হয় যে, এই বিজ্ঞান এখনো যথেষ্ট উন্নত নয় এবং এখনো অনেকটা অবহেলিত। এইদিকে অচিরেই বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে মনে হয়।

এরপর ধরা যাক নীতিতত্ত্বের কথা। একটু ভাবলেই বোঝা যায়, আমরা যখন কোন কিছুকে ভাল বা মন্দ বলি, তখন আমাদের সেই বিচার সাধারণতঃ আপেক্ষিক। স্থান-কাল-পাত্রভেদে একই ঘটনা কখনো ভাল ও কখনো মন্দ বলে মনে হতে পারে। মানুষ খুন করা নিশ্চয় একটা 'খারাপ' কাজ কিন্তু কয়েকজন নিরীহ মানুষকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হিসাবে যদি কোন দস্যুকে খুন করা হয়, তবে কি সেটাকে আমরা একটা 'ভাল' কাজ বলব না? ভ্যাকুয়াম টিউব আবিষ্কারের পর তার প্রয়োগ ও প্রচলন ছিল একটা 'ভাল' কাজ; কিন্তু এখন ট্রানজিস্টরে যদি তার থেকেও বেশী সুবিধা পাওয়া যায়, তাহলে অন্ধভাবে ভ্যাকুয়াম টিউবকে সমর্থন করা হবে একটা 'খারাপ' কাজ।

কোন ব্যাপার আপেক্ষিক, এটা শুনলেই বিজ্ঞানের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কথা মনে পড়ে যায়। ঐ তত্ত্ব অনুযায়ী সব গতিবেগই আপেক্ষিক, তবে কেবল আলোর গতিবেগ ছাড়া। আলোর গতিবেগ হচ্ছে নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। এখন দেখা যাক, নীতিতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এই রকম এমন কোন ঘটনা আছে কিনা, যাকে আমরা কেবল আপেক্ষিকভাবেই নয়, সর্বস্থানে ও সর্বকালেই ভাল বলে মনে করতে পারি।

বিবর্তনবাদ থেকে জানা যায়, মনুষ্যসভ্যতার ক্রমোন্নতি—যাকে প্রগতি বলা হয়—সেটা হচ্ছে একটি অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চললে তবেই সমাজ-জীবনে সুখ ও শান্তি থাকে। এইজন্যে নীতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রগতিকে আমরা ধ্রুবভাবেই ভাল বলে ধরে নিতে পারি এবং অন্য যে কোন ঘটনা ভাল কি মন্দ, তা ঘটনাটি প্রগতির অনুকূল বা প্রতিকূল, সেই হিসাবে বিচার করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে 'উদ্দেশ্য ও উপায়' সংক্রান্ত আলোচনার কথা মনে আসে। কেউ কেউ বলেন, উদ্দেশ্য যদি ভাল হয়, তবে তার জন্যে যে কোন উপায়ই অবলম্বন করা যেতে পারে। আবার অন্য একদল বলেন, উদ্দেশ্য ভাল হলেই কেবল হবে না, উপায়ও ভাল হওয়া উচিত। এখানে প্রথমেই বুঝতে হবে যে, যাকে আমরা উদ্দেশ্য ও উপায় বলি তাও এক হিসাবে আপেক্ষিক, কারণ পুর্ববর্তী ঘটনার কাছে যা উদ্দেশ্য, পরবর্তী ঘটনার কাছে তা উপায়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক আমরা একটা বাড়ির তেতলায় উঠব। যখন আমরা একতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছি, তখনকার মত দোতলায় পৌঁছানোটাই এই ওঠবার উদ্দেশ্য। আবার এই দোতলায় পৌঁছনোটা তেতলায় ওঠবার উপায়ও বটে। কোন পরাধীন দেশে স্বাধীনতা লাভের জন্য যে আন্দোলন, স্বাধীনতা তার উদ্দেশ্য। আবার স্বাধীনতা লাভের পরে দেশের যে সামগ্রিক উন্নতি হতে পারে, সেই দিক থেকে দেখলে স্বাধীনতা একটা উপায়। মনুষ্য-সভ্যতার ক্ষেত্রে এগিয়ে চলার তো শেষ নেই; সেজন্যে যে কোন উপায়-উদ্দেশ্য ধারাই প্রকৃতপক্ষে অনন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে সাধারণভাবে এটা বলা যায়, কোন পরিস্থিতিতে ঐ ধারার প্রথম ধাপগুলির যে গুরুত্ব পরের ধাপগুলির গুরুত্ব তার থেকে ক্রমশঃ কমে আসে; অঙ্কের ভাষায় বলতে গেলে ধারাটি একটি অভিসারী শ্রেণীর (Converging series) মত। কয়েকটি উপায়-উদ্দেশ্য ধারার মধ্যে কোন্‌টি সবথেকে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ কোন্‌টি প্রগতির সবচেয়ে অনুকূল, তা

নিখুঁতভাবে বিচার করতে হলে সম্পূর্ণ ধারাগুলিকে নিয়েই পর্যালোচনা করতে হবে, তাদের সামান্য অংশবিশেষের উপর ভিত্তি করে বিচার করলে চলবে না। এই বিশদ পর্যালোচনার ব্যাপারে বিজ্ঞানের সাহায্য—বিজ্ঞানের যন্ত্র কম্পিউটারের সাহায্য—একান্তই কাম্য। কয়েকটি সম্ভাব্য পথের মধ্যে কোন্ পথটি মোটের উপর সবচেয়ে উপযোগী, বিজ্ঞান ও শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে এই প্রশ্নের উত্তর কম্পিউটারের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে। কম্পিউটারের সাহায্য নিলে নীতিতত্ত্বের অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

সমাজতত্ত্বেও কম্পিউটারের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। পদার্থবিদ্যায় যে ধরণের সমস্যাকে many-body problem বা বহু-বস্তু সমস্যা বলা হয়—যে ধরণের সমস্যার সমাধান করতে হয় অনেকগুলি বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ধরে—সমাজতত্ত্বের অধিকাংশ সমস্যাই মূলতঃ সেই একই ধরণের। পদার্থবিদ্যার সমস্যার মত সমাজতত্ত্বের এই সমস্যাগুলির সমাধান কম্পিউটারের সাহায্যে সহজে করা যেতে পারে।

অতঃপর রাজনীতিতে বিজ্ঞানের ধারণা কিভাবে সাহায্য করতে পারে, সেই বিষয়ে একটি উদাহরণ দিয়ে আমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করব। সকলেই জানেন, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে বর্তমানে দু'টি বিকল্প কর্মপন্থা দেখা যাচ্ছে। একটিতে বিশ্বশান্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে শান্তি বজায় থাকলে ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে; অন্যটিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বিপ্লবকে, বলা হয়েছে পৃথিবীর সব বা অন্ততঃ অধিকাংশ দেশে বিপ্লব না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ীভাবে শান্তি সম্ভব নয়। দু'টি কর্মপন্থাতেই শান্তি ও বিপ্লবকে সাধারণভাবে সমর্থন করা হয়েছে কিন্তু বিতর্কের কারণ হলো—শান্তি ও বিপ্লবের মধ্যে কোন্‌টিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে? এখন কেউ যদি বিতর্কের সমাধানের জন্যে বলেন, পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থান অনুযায়ী কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই দু'টি রূপই স্বাভাবিক—যেমন পশ্চিম ইওরোপে শান্তির রূপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লবের রূপ—তাহলে অনেক হয়তো প্রশ্ন করবেন, একই কমিউনিস্ট মতবাদের উপর ভিত্তি করে আন্দোলনের দ্বৈতরূপ কি করে হতে পারে?

ফ্রেডরিক এংগেল্‌স্ তাঁর 'Anti-Dühring' গ্রন্থে বিবর্তন ও বিপ্লবকে বোঝাবার জন্যে পদার্থের অবস্থা-পরিবর্তনের কথা বলেছেন। সেইরকম কমিউনিস্ট আন্দোলনের রীতি-নীতি বোঝবার জন্যে আধুনিক বিজ্ঞান থেকে কেউ যদি দৃষ্টান্তের অবতারণা করেন, তাহলে তাও বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় পদার্থ বা শক্তির মৌলিক এককের দ্বৈতরূপ আজ স্বীকৃত—একটি কণারূপ, অন্যটি তরঙ্গরূপ। কখন কোন রূপটিকে দেখা যাবে, তা নির্ভর করে কী পরিস্থিতিতে সেটিকে দেখা হচ্ছে, তার উপর। একই জিনিসের এই দ্বৈতরূপ বিস্ময়জনক মনে হলেও বিজ্ঞানে এটি স্বীকৃত হয়েছে; কারণ এই দ্বৈতরূপের ধারণার দ্বারাই কেবল বাস্তবকে ব্যাখ্যা করা চলে। কণারূপ ও তরঙ্গরূপকে বিজ্ঞানে পরস্পর-বিরোধী না বলে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে মনে করা হয়। অনুরূপভাবে পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বৈতরূপটিকেও হয়তো স্বাভাবিক বলে মনে করা যেতে পারে।

ভারতে র‍্যামির চাষ

বলাইচাঁদ কুণ্ডু

সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ তন্তুর মধ্যে র‍্যামি সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও সুদৃঢ়। ইহা পাট ও মেস্তার মত একপ্রকার গাছের ছাল হইতে উৎপন্ন হয়। এই গাছ বিছুটি জাতীয়, কিন্তু ইহার পাতায় বা কাণ্ডে বিছুটির মত তীক্ষ্ণ শুঁয়া নাই। এই জন্য এই গাছ হাত দিয়া নাড়াচাড়া করা যায় ও গাছের গোড়ায় নিড়ানী প্রভৃতি কাজের সময় কোনও অসুবিধা হয় না। ইহার ল্যাটিন নাম Boehmeria nivea। ভারতে, তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে Boehmeria জাতির (Genus) অনেক প্রজাতি (Species) আছে, কিন্তু কেবল মাত্র Boehmeria nivea হইতেই এই তন্তু পাওয়া যায়।

Boehmeria nivea একপ্রকার বহুবর্ষজীবী ঝোপ জাতীয় গাছ। ইহার মৃত্তিকানিম্নস্থ রাইজোম (Rhizome) হইতে বহু কাণ্ড উৎপন্ন হয়। ইহারা উচ্চতায় ৪ হইতে ৭ ফুট পর্যন্ত হয়। ইহাদের পাতাগুলি বেশ বড় হয়। পাতার উপরের দিক সবুজ, কিন্তু নিম্নপৃষ্ঠ সাদাটে হয়। র‍্যামির একপ্রকার Variety B. nivea var. tenacissima আছে, যাহার পাতার দুই পৃষ্ঠই সবুজ হয়। র‍্যামি গাছের ফুল খুব ছোট ছোট হয় এবং তাহা হইতে খুবই ক্ষুদ্রাকৃতি বাদামী রঙের ফল এবং বীজ উৎপন্ন হয়।

র‍্যামি গাছ সাধারণতঃ উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলসমূহে জন্মায়। কিন্তু পৃথিবীর শীতপ্রধান অঞ্চলেও ইহার চাষ করা সম্ভব হইয়াছে। চীন দেশে এই উদ্ভিদের চাষ বহু শত বৎসর ধরিয়া হইতেছে; এমন কি, তুলা চাষ প্রবর্তনের আগেও ওখানে ইহার চাষ হইত। চীনে এখনও বহুল পরিমাণে র‍্যামির চাষ হয় এবং উহা হইতে উৎপন্ন তন্তু বিভিন্ন কুটীর শিল্পে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এক সময় চীন দেশ হইতে র‍্যামি গাছের শুষ্ক ছাল বা অশোধিত তন্তু, 'China grass' বা 'চীনা ঘাস' নামে পৃথিবীর বহুদেশে রপ্তানী হইত। বর্তমানকালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উৎপন্ন র‍্যামির শুষ্ক ছাল বা অশোধিত তন্তুও চীনা ঘাস বলিয়া বর্ণিত হয়।

আজকাল পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেও, যথা—অষ্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, ফরমোসা, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশ, ইউরোপ মহাদেশের অনেক দেশ যথা—ইটালী, স্পেন, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানেও অল্পাধিক পরিমাণে ইহার চাষ হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে র‍্যামির চাষের প্রথম প্রবর্তন হয় এবং ফ্লোরিডা রাজ্যের বিভিন্ন কৃষি ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্য হওয়ায় অধিক পরিমাণে ইহার চাষের প্রচেষ্টা ওখানে হইয়াছে। ফ্লোরিডা হইতে ব্রেজিল, মেক্সিকো, আরজেনটাইন, পেরু প্রভৃতি, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ইহার চাষের প্রবর্তন হইয়াছে।

ভারতে র‍্যামির চাষ

ভারতবর্ষে র‍্যামি গাছ আসাম, উত্তর বঙ্গ, বিহারের বিভিন্ন স্থান, কাংড়া উপত্যকা ও নীলগিরি পাহাড়ে স্বাভাবিকভাবে জন্মায়। কিন্তু কেবলমাত্র আসাম ও উত্তর বঙ্গে ইহা নিয়মিত-ভাবে চাষ করা হয়। আসামে র‍্যামিকে রিহা

এবং উত্তর বঙ্গে কুরকুণ্ডা বা কুনকুরা বলা হয়। বর্ত্তমানে এখানে র‍্যামি পাট বা মেস্তার মত বহুল পরিমাণে চাষ হয় না। এখানকার ধীবরগণ ও চাষীগণ তাহাদের বাড়ীর আশেপাশে বা গোশালার নিকটবর্তী স্থানে, যেখানে প্রচুর পরিমাণে সার জমা থাকে, সেই সব জায়গাতে র‍্যামির চাষ করে এবং ঐসব গাছের কাণ্ডের ছাল হইতে তন্তু বাহির করিয়া তাহাদের মাছ ধরা জাল ও মাছ ধরিবার সুতা প্রস্তুত করে।

ভারতে যে এককালে র‍্যামি বা রিহার প্রচুর চাষ হইত এবং তাহা হইতে সুতা প্রস্তুত করিয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি নির্মিত হইত, এই বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থসমূহে কিছু কিছু নিদর্শন আছে। রামায়ণ মহাকাব্যে বিছুটি জাতীয় গাছ হইতে উৎপন্ন সূক্ষ্ম ও সুন্দর বস্ত্রের উল্লেখ আছে। ভারতসম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ডা: লোবেল নামক একজন ইংরেজ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ বিছুটি জাতীয় উদ্ভিদের আঁশ হইতে কলিকাতায় প্রস্তুত একপ্রকার খুব সূক্ষ্ম বস্ত্রের বর্ণনা দিয়াছেন এবং এইসব বস্ত্র যে ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে রপ্তানী হইত তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন।

র‍্যামি গাছ। দেখা যাইতেছে মৃত্তিকার নিম্নস্থ রাইজোম হইতে প্রায় ৩০টি কাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। কাণ্ডগুলিতে ফুল ধরিয়াছে। এই সময় ইহাদিগকে কাটিতে হইবে।

তৎকালীন ভারত সরকারের চেষ্টায় ১৮৫৪ সাল হইতে ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর কিছু কিছু চীনাঘাস বা অশোধিত র‍্যামির শুষ্ক ছাল ইংল্যাণ্ডে চালান দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই সময় বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর সার ফ্রেডারিক

হাল্যিডে র‍্যামি চাষের উৎসাহ দিবার জন্ত প্রতি বৎসর অন্ততঃ দশ টন র‍্যামি বিলাতে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিলাতে রপ্তানী হইবার পর র‍্যামি সেখানে যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছিল এবং বিদেশে ইহার চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়াছিল। এইরূপ চেষ্টার জন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে, যথা—বিহার, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ, উত্তর বঙ্গ ও আসামের বহু সম্পন্ন ব্যক্তি ও যৌথ কোম্পানীসমূহ ইহার বিস্তৃত চাষে উত্তোগী হইয়াছিলেন। অবিভক্ত বঙ্গের দিনাজপুর জেলার রাজা শ্যামাশঙ্কর রায় মহাশয় প্রায় ৬০০ একর জমিতে র‍্যামির ব্যাপক চাষের আয়োজন করিয়াছিলেন ও সমগ্র প্রচেষ্টাটি পরিচালনা করিবার জন্ত একজন অভিজ্ঞ ইউরোপীয় তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যথেষ্ট সার ও সেচের ব্যবস্থা থাকায় তাঁহার কৃষিক্ষেত্রের র‍্যামি বেশ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং বৎসরে তিন-হইতে চারবার কাণ্ডগুলি কাটিবার উপযুক্ত হইত ও কাটা (Harvest) সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ছাল ছাড়াইবার, তথা আঁশ প্রস্তুত করিবার পুরাতন পদ্ধতি অবলম্বন করিবার জন্ত শুষ্ক ছাল (চীনা-ঘাস) ও আঁশের দাম অত্যন্ত বেশী হইতে লাগিল। বিদেশের বাজারে তখন চীনদেশ হইতে আমদানীকৃত চীনাঘাসের দাম অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এই কারণে দিনাজপুরে প্রস্তুত আঁশের দাম যথোপযুক্ত না পাওয়ায়—এমন কি, উৎপাদন খরচের অনেক কম পাওয়ায় এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাটি অবশেষে পরিত্যক্ত হইল।

রাজা শ্যামাশঙ্কর রায় ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনেক ইউরোপীয় সংস্থা র‍্যামি চাষে উত্তোগী হইয়াছিলেন। আসামের চা বাগানের অনেক মালিকগণ ও বিহারের নীল চাষীগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাদের জমিতে র‍্যামি চাষের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর তৎকালীন কর্মকর্তা স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনও কলিকাতার নিকটবর্তী কয়েক স্থানে কয়েক বৎসর ধরিয়া সফলতার সহিত র‍্যামির চাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাল ছাড়াইবার প্রণালী অসুবিধাজনক ও ব্যয়বহুল হওয়ায় ও শুষ্ক ছাল (চীনা ঘাস) ও আঁশের দাম উৎপাদন খরচের অপেক্ষা কম হওয়ায় ভারতের অন্তান্ত স্থানের প্রচেষ্টাগুলির মত স্যার ড্যানিয়েলের প্রচেষ্টাও পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

চীন দেশের চাষীগণ কিন্তু তাহাদের নিজস্ব প্রথায় ছাল ছাড়াইয়া ও আঁশ প্রস্তুত করিয়া র‍্যামি চাষ বেশ লাভজনক করে। চীনে প্রস্তুত অশোধিত তন্তু, চীনা ঘাস ভারতের প্রস্তুত একই প্রকার তন্তুর দাম হইতে কম হওয়ায় ইউরোপের বাজারে চীনদেশে প্রস্তুত চীনা ঘাসের বিশেষ চাহিদা সবসময় আছে।

র‍্যামির উৎপাদন

পৃথিবীতে কত র‍্যামি বা চীনাঘাস উৎপন্ন হয়, তাহার সঠিক হিসাব সকল দেশ হইতে পাওয়া যায় না। একমাত্র চীনদেশেই সবচেয়ে বেশী র‍্যামি উৎপন্ন হয়। চীনদেশের বর্তমান উৎপাদনের হিসাব এখন পাওয়া যায় না। তবে ১৯৪০ সালের এক হিসাবমত ১০০,০০০ মেট্রিক টন চীনা ঘাস ঐ দেশে উৎপন্ন হইত। মনে হয় এখনও সেইরূপ আছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসর ১০০০ টনের মত তন্তু উৎপাদিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্তান্ত দেশের উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২৫০০০ টন। Mathews' Textile Fibers নামক পুস্তকের Bast fiber অংশের লেখিকা শ্রীমতী বেরনিস মনট্-গোমেরি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় তন্তুর উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ত কয়েক বৎসর আগে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে লেখকের অন্তান্ত বিষয়ের সঙ্গে র‍্যামির উৎপাদন বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। তিনি মনে

করেন, বর্তমানে চীনদেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশ-সমূহে র‍্যামি অতি অল্প পরিমাণেই চাষ হয়। এই কারণে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১৫,০০০ মেট্রিক টনের বেশী হইবে না।

র‍্যামির চাষ

যে সকল স্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং সেই বৃষ্টিপাত সারা বৎসর সমভাবে বণ্টিত হয় এবং যে সকল জায়গায় জলনিকাশের ভাল ব্যবস্থা আছে এমন সব উঁচু জমিতে র‍্যামি চাষ ভালভাবে করা যাইতে পারে। এঁটেল মাটি বা একেবারে বালুকাময় জমি চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত। উর্বর দোআঁশ জমিতে র‍্যামি চাষ করা উচিত।

র‍্যামি সাধারণতঃ শিকড় অথবা রাইজোমের ছিন্ন খণ্ডসমূহের দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে উৎপাদনের জন্য কাণ্ডের ছিন্ন খণ্ডও ব্যবহৃত হয়। কাণ্ডের ছিন্ন খণ্ড-গুলি হইতে শিকড় গজাইতে অনেক বেশী সময় লাগে এবং কখন কখন ভালভাবে শিকড় না জন্মিবার জন্য চারাগুলি ভালভাবে বাড়িতে পারে না। বীজ হইতেও র‍্যামির চাষ করা সম্ভব, কিন্তু বীজ হইতে চারা গাছ জন্মিবার নানা প্রকার অসুবিধা আছে। চারাগাছগুলি বড় হইতে অনেক সময় লাগে। তাছাড়া বীজ হইতে উৎপন্ন গাছ সব সময় এক রকমের হয় না। এই সব কারণে র‍্যামি চাষের জন্য এক-মাত্র শিকড় এবং রাইজোমের ছিন্ন খণ্ড-সমূহ ব্যবহার করা উচিত।

ছিন্ন খণ্ডগুলি লম্বায় প্রায় ৬" ইঞ্চির মত হওয়া আবশ্যক। উত্তমরূপে প্রস্তুত আগাছা বর্জিত জমিতে তিন বা চার ফুট অন্তর সারিতে দুই ফুট অন্তর অন্তর তিন-চার ইঞ্চি মাটির নীচে খণ্ডগুলিকে লাগাইতে হইবে। এপ্রিল-মে মাস অর্থাৎ বর্ষার ঠিক আগেই খণ্ডগুলি বসাইতে হয়। এই সময় লাগাইলে চারাগাছগুলি বর্ষার জল প্রচুর পরিমাণে পাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠিবে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরেও গাছ লাগান যাইতে পারে। তবে সেই সময় বার বার সেচের ব্যবস্থা না করিলে চারাগুলি ভালভাবে বাড়িতে পারিবে না। উৎকৃষ্ট ফসলের জন্য র‍্যামির জমিতে যথেষ্ট সার দেওয়া আবশ্যক। জমি তৈয়ারী করিবার সময় প্রচুর পরিমাণে গোবর সার, কম্পোষ্ট বা পাতা-পচা সার দেওয়া আবশ্যক। তাহা ছাড়া প্রতিবার কাণ্ডগুলি কাটিবার পরেও যথেষ্ট পরিমাণ জৈব বা অজৈব সার অথবা উভয় প্রকার সার প্রয়োগ করা বিশেষ দরকার। তাহা না করিলে ফলন ভাল হইবে না।

র‍্যামি গাছ বহু-বর্ষজীবী। এই জন্য একবার লাগাইলে কয়েক বৎসর আর লাগাইবার প্রয়োজন হয় না। তবে ৫।৬ বৎসর পর পর পুরাতন গাছ তুলিয়া আবার নূতন গাছ লাগান উচিত।

পাট গাছ মত র‍্যামি গাছের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার সময় অনেক পাতা মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। গাছ কাটিবার সময়ও পাতাগুলি মাটিতে ঝরাইয়া ফেলা হয়। এই পাতাগুলি পচিয়া অনেকাংশে জমির উর্বরতা বজায় রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের বা অন্যান্য উন্নত দেশসমূহে গাছের কাণ্ডগুলি যন্ত্রের সাহায্যে কাটা হয়। সেই সকল স্থানে কাটিবার সুবিধার জন্য হাওয়া-জাহাজ হইতে পেন্টা ক্লোরোফিনলযুক্ত গন্ধময় পেট্রোলিয়াম তৈল মাঠের গাছগুলির উপর ছড়াইয়া দিলে পাতাগুলি ঝরিয়া গিয়া কাণ্ডগুলি পত্রবিহীন হয়।

র‍্যামি কাটিবার সময়

গাছগুলিতে যখন ফুলের কুঁড়ি ধরে ও কাণ্ডের নীচের পাতাগুলি হলদে হইয়া যায়, সেই সময় র‍্যামির কাণ্ডগুলি কাটিতে হয়। এই

সময় কাণ্ডগুলি প্রায় ৪ হইতে ৭ ফুট লম্বা হয়। অবশ্য এই দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ জমির উর্বরতা, সার প্রয়োগ ও উপযুক্ত প্রাকৃতিক অবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। এক একটি গাছের গোড়া হইতে ১০ হইতে ২০, কখন কখন আরও বেশী কাণ্ড জন্মায়। এই সকল কাণ্ডগুলি কাটিবার পর মৃত্তিকা-নিমগ্ন রাইজোম হইতে নূতন নূতন কাণ্ড আবার উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ বৎসরে দুই হইতে তিনবার র‍্যামি কাটা হয়। তবে উপযুক্ত সেচ ও পর্যাপ্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ করিলে চার হইতে ছয় বার র‍্যামি কাটা যাইতে পারে।

আঁশ উৎপাদনের পরিমাণ

সবুজ কাঁচা কাণ্ড হইতে চার শতাংশ অশোধিত তন্তু (চীনাঘাস) পাওয়া যায়। চীনদেশে এক একর জমি হইতে বৎসরে প্রায় ১০০০ পাউণ্ড অশোধিত তন্তু পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে উৎপাদন আরও কম। প্রতি একর জমিতে ৫০০-৭০০ পাউণ্ড অশোধিত তন্তু পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অন্যান্য উন্নত দেশে র‍্যামির চাষ উন্নত প্রথায় হয়। সেই জন্য সে সকল স্থানে উৎপাদনের হার অনেক বেশী। প্রতি একর জমিতে প্রায় ৩০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত অশোধিত তন্তু উৎপন্ন হয়।

র‍্যামির আঁশ ছাড়ানো

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পাট বা মেস্তার মত র‍্যামির আঁশ কাণ্ডের ছালেই থাকে। সাধারণতঃ পাট গাছ কাটিয়া কাণ্ডগুলির আঁটি বাঁধিয়া পুকুর, নালা, ডোবা প্রভৃতির জলে ডুবাইয়া রাখিয়া কিছু দিন পরে ছাল ছাড়াইয়া ও সেই ছাল জলে কাচিয়া আঁশ পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু এইভাবে র‍্যামির আঁশ ছাড়ান সম্ভব নয়। কারণ র‍্যামি গাছের ছালে গঁদ জাতীয় এক প্রকার আঠা অধিক পরিমাণে থাকায় কাণ্ডগুলি জলে ভিজাইলে সেই আঠা গলিয়া গিয়া আঁশগুলির সহিত মিশিয়া যায় এবং সেই জন্য জলে ভিজাইবার পর আঁশগুলি পরিষ্কার হইবার পরিবর্তে ডেলা পাকাইয়া যায়। সেই ডেলাপাকান আঁশ খুব চেষ্টা করিয়াও ভালভাবে পরিষ্কার করা যায় না। এই জন্য সাধারণতঃ কাঁচা সবুজ কাণ্ডগুলি হইতে হাতের সাহায্যে বা যন্ত্রের সাহায্যে প্রথমে ছাল ছাড়াইয়া লইয়া পরে সেই শুষ্ক ছাল হইতে নানাবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিষ্কার বা শোধিত আঁশ বাহির করা হয়। চীন, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য এশীয় দেশসমূহে হাতের সাহায্যেই ছাল ছাড়ান হয়। আসামের চাষীরা বাঁশ পাতলা করিয়া কাটিয়া এক প্রকার ছুরির মত যন্ত্র তৈয়ারী করে। সেই বাঁশের ছুরি অথবা ভোঁতা ছুরিকা দিয়া হাতে করিয়া কাণ্ডগুলি হইতে ছাল ছাড়াইয়া লয়। তাহার পরে সেই ছালগুলি রৌদ্রে শুকায়। কখনও কখনও কাণ্ডগুলি শুকাইয়া তাহারপর তাহা হইতেও ছাল ছাড়ান হয়। শুষ্ক কাণ্ডগুলি নীচের দিকে হাত দিয়া ভাঙ্গিয়া সম্পূর্ণ কাণ্ড হইতে ছাল টানিয়া ছাড়াইয়া লওয়া হয়। এই প্রথায় কাণ্ডের ভিতরে ডাঁটার সঙ্গে কিছু কিছু আঁশ লাগিয়া থাকিতে পারে। তবে অভিজ্ঞ লোকে এমনভাবে ছাল ছাড়ায় যে, কাণ্ড হইতে প্রায় সম্পূর্ণ আঁশ খুলিয়া আসে। কাঁচা ছাল শুকাইয়া লইয়া অথবা শুষ্ক ছালগুলি এক রকম ছোট বাঁশ বা কাঠের মুগুর দিয়া পিটাইয়া আঁশ আলগা করিয়া এক হইতে দুই ঘণ্টা ধরিয়া জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। এইভাবে প্রস্তুত তন্তুগুলিতে কিছু কিছু গঁদজাতীয় আঠা লাগিয়া থাকিতে পারে।

র‍্যামির আঁশ তৈয়ারী করিবার এই প্রথা আমাদের দেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু ইহা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য এবং তজ্জ্য প্রস্তুত বেশ ব্যয়বহুল হয়।

ছাল ছাড়াইবার যন্ত্র (Decorticator)

ছাল ছাড়ান খুব অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য বলিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে র‍্যামির ডাঁটা হইতে ছাল ছাড়াইবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্র উদ্ভাবনের জন্য বহুদিন ধরিয়া বিশেষ চেষ্টা চলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে তদানীন্তন ভারত সরকার র‍্যামি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষ হইতে র‍্যামি রপ্তানী করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এই রপ্তানীর ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে র‍্যামি চাষের জন্য বিভিন্ন সংস্থা উদ্যোগী হন, কিন্তু পরে ব্যাপক ভাবে ছাল ছাড়াইবার অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই সব কারণে ১৮৬৯ সালে ভারত সরকার র‍্যামির কাণ্ড হইতে ছাল ছাড়াইবার ও শুষ্ক ছাল (চীনাঘাস) হইতে পরিশোধিত আঁশ বাহির করিবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্র ও পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য যথাক্রমে ৫০০০ ও ২০০০ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। ৩২ জন প্রতিযোগী এই ব্যাপারে উদ্যোগী হইলেও শেষ পর্যন্ত মাত্র একজন এডিনবরাবাসী মিঃ গ্রেগ ১৮৭২ সালের অগাষ্ট মাসে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া সাহারানপুরে (যেখানে ইতিমধ্যে র‍্যামির চাষ আরম্ভ হইয়াছিল) তাঁহার যন্ত্রের কার্যকারিতা দেখাইয়াছিলেন। দেখা গেল যে, এই যন্ত্র হইতে ছাল ছাড়াইবার খরচ অনেক বেশী পড়ে ও তাঁহার প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম আঁশও তৈয়ারী হয় না। এই যন্ত্র বিবেচিত না হইলেও উদ্ভাবক মিঃ গ্রেগকে তাঁহার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার জন্য ১০০০ পাউণ্ড প্রদত্ত হইয়াছিল

পরের বৎসরই ভারত সরকার আবার এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু এবার ইংল্যাণ্ডেই ইহার ব্যবস্থা হইল। ছাল ছাড়াইবার জন্য আবশ্যকীয় র‍্যামি গাছের কাণ্ড ফ্রান্স হইতে আনা হইয়াছিল। প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী তাহাদের যন্ত্র লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও যন্ত্র উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না। ইতিমধ্যে ইউরোপের বাজারে র‍্যামির (চীনাঘাসের) চাহিদা খুব বাড়িয়া যাওয়ায় ভারত সরকার ১৮৭৭ সালে আবার প্রতিযোগিতায় ব্যবস্থা করেন। ছাল ছাড়াইবার সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র ও শুষ্ক ছাল হইতে সূক্ষ্ম আঁশ বাহির করিবার যন্ত্র বা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করিবার জন্য ৫০,০০০ টাকার পুরস্কারের ব্যবস্থা হইল। সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র না হইলেও অন্ততঃ কাজ চালাইবার উপযোগী যন্ত্র বা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনকারীর জন্য আরও ১০,০০০ টাকার পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল।

১৮৭৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে সাহারানপুরে যন্ত্রসমূহের পরীক্ষা (Trial) হইবার বন্দোবস্ত হইল। ২৪ জন প্রতিযোগী যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও মাত্র ১০ জন তাঁহাদের যন্ত্রাদি লইয়া সাহারানপুরে উপস্থিত হইলেন। ইহাদের মধ্যে আবার ৩ জন শেষ মুহূর্তে তাঁহাদের নাম তুলিয়া লইলেন। অবশিষ্ট ৭ জনের যন্ত্রের পরীক্ষা যথাসময়ে আরম্ভ হইল এবং প্রায় এক মাস ধরিয়া পরীক্ষা চলিতে লাগিল। কিন্তু বিচারকগণের মতে কাহারও যন্ত্র বা প্রক্রিয়া খুব ভাল বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হইল না। যাঁহাদের যন্ত্র কিছু পরিবর্তন করিলে অভীষ্ট কার্যোপযোগী হইবার সম্ভাবনা আছে, এইরূপ দুইজন প্রতিযোগীর প্রত্যেককে উৎসাহ বর্ধনের জন্য ৫০০০ টাকা এবং অপর একজনকে ১০০০ টাকা দেওয়া হইল। শেষোক্ত তিন জনের যন্ত্রের দ্বারা যে আঁশ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা ইংল্যাণ্ডের বাজারে চীনদেশে উৎপন্ন হাতে প্রস্তুত আঁশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় ভারত সরকার আর কোন

প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা না করিয়া ঐ তিন জন প্রতিযোগীকে তাঁহাদের যন্ত্র আরও উন্নত করিবার জন্য অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। ইহার পর বহু কাল অনেক চেষ্টার পরও উপযুক্ত যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভব হয় নাই।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও র‍্যামির ছাল ছাড়াইবার উপযুক্ত যন্ত্র উদ্ভাবনের যে চেষ্টা চলিতেছিল, তাহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মেনী, জাপান ও ইটালীতে বিভিন্ন প্রকারের ভারী ও সহজে বহনীয় Decorticator-এর উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জার্মেনীতে প্রস্তুত—Henschel (Krupp) Corona II এবং Corona IV, যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত—Modified Krupp Corona ও আরও দুই প্রকার যন্ত্র ও জাপানে প্রস্তুত Ramie Automatic Decorticator—যন্ত্রগুলি মোটামুটি কার্যকরী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। লেখক এই ধরণের যন্ত্রের কার্যকারিতা কেন্দ্রীয় পাট গবেষণাগার, নীলগঞ্জস্থ কৃষিক্ষেত্র এবং যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। Florida-র বিশেষজ্ঞদের মতে এই যন্ত্রের আর কিছু কিছু উন্নতি হওয়া আবশ্যক। ভারতেও অনুরূপ যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে।

শোধন (Degumming)

র‍্যামির ছালে ঘন আঠাযুক্ত একপ্রকার পদার্থ থাকায় ছাল জলে ভিজাইয়া পরিষ্কৃত আঁশ পাওয়া যায় না, ইহা আগেই বলিয়াছি। কাণ্ড হইতে ছাল ছাড়াইবার পর শুষ্ক ছালগুলি হইতে বয়নোপযোগী নরম ও মসৃণ তন্তু প্রস্তুত করিতে হইলে ইহাদিগকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শোধিত (Degumming) করিতে হয়। আসাম ও উত্তর বঙ্গে নিম্নলিখিত প্রথায় তন্তু শোধিত হয়। ছালগুলি শুষ্ক হইলে সেগুলি লৌহনির্মিত চিরুণীর মত 'কঙ্কতিকা' দিয়া বারবার আঁচড়াইয়া চুনের জলে, অভাবে সাধারণ জলে ধুইবার পর রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। প্রক্রিয়াটি মোটামুটি এইরূপ হইলেও ইহার কিছু কিছু প্রকারভেদ আছে। কিন্তু যেখানে বহুল পরিমাণে ছাল শোধিত করিতে হয়, সেখানে এইভাবে শোধন করা সম্ভব নহে। জাপান, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শুষ্ক ছালগুলি শোধিত করিয়া নরম, মসৃণ রেশমের মত আঁশ প্রস্তুত করা হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলির মূল তথ্য প্রায় একই। শুষ্ক ছালগুলি কষ্টিক সোডার দ্রবণে ফোটাইয়া লইতে হয়। শোধন করিবার মূল প্রক্রিয়া এক হইলেও বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা তাহাদের কাজের সুবিধার জন্য ও তন্তুর উৎকর্ষের জন্য বিভিন্নভাবে এই প্রণালী পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিয়া থাকেন। সেই প্রণালী সেই সকল সংস্থার ব্যবসায়িক গোপনীয়তা (Trade secret) হিসাবে রক্ষিত হয়।

ক্যাষ্টাগনল এবং ফাম-গিয়া-তু ১৯৫০ সালে 'A study of plants of North China' নামক ইন্দোচায়নার গবেষণা পরিষদের এক বুলেটিনে চীনাঘাস শোধনের এক সহজ ও সরল প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন: (ক) প্রথমে চীনাঘাসগুলিকে চুনের জলে দুই ঘন্টা ধরিয়া পরপর দুই বার সিদ্ধ করা; (খ) ঠাণ্ডাজলে ভাল করিয়া ধোয়া; (গ) পরে অর্ধঘন্টা ১ শতাংশ সোডা কার্বনেটে সিদ্ধ করা; (ঘ) ঠাণ্ডা জলে ধোয়া; (ঙ) তারপর সেগুলি এক শতাংশ ক্লোরিনযুক্ত চুনের জলে ৫ ঘন্টা ভিজান; (চ) ঠাণ্ডা জলে ধোয়া, (ছ) সর্বশেষে বিশোধিত আঁশগুলি শুকাইয়া 'কঙ্কতিকার' দ্বারা আঁচড়াইয়া লইলে কোমল রেশমের মত আঁশ প্রস্তুত হইবে।

জৈব প্রক্রিয়া (Biological process)

পাট যখন জলে পচে, তখন একমাত্র জলের সাহায্যেই আঁশগুলি কাণ্ড হইতে খুলিয়া আসে

না। পাটের ছালে যে আঠাল পদার্থাদি থাকে, তাহা জল ও ব্যাক্টিরিয়ার সাহায্যে সহজে গলিয়া যায় এবং সেই জন্য আঁশ অনায়াসে পরিষ্কার করা সম্ভব হয়। এইরূপ জৈব প্রক্রিয়া কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিয়া র‍্যামির ছাল হইতে আঁশ পরিষ্কৃত করিবার চেষ্টা ও গবেষণা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ ফরাসী দেশে চলিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে বর্তমান লেখক তাঁহার সহকর্মীদের সহিত এই বিষয়ে কয়েক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং আংশিক সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে আরও গবেষণা আবশ্যক। ইহা সফল হইলে র‍্যামির চাষ বহুল পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে।

র‍্যামি-তন্তুর বৈশিষ্ট্য

যথাযথ সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুত র‍্যামির আঁশ ঠিক রেশমের মত সাদা, কোমল ও উজ্জ্বল হয়। শোধিত র‍্যামিতে শতকরা ৯৬-৯৮ ভাগ আলফা সেলুলোজ থাকে। ইহাতে লিগনিনের অংশ খুবই কম থাকে, প্রায় নাই বলিলেও হয়। এই তন্তু আর্দ্রতায় ক্রিয়াশীল হয় না এবং ব্যাক্টিরিয়া ও সকল প্রকার ছত্রাক প্রতিরোধক। ইহাকে সহজে বর্ণহীন ও নানাবিধ রঙে রঞ্জিত করা যাইতে পারে। ইহার প্রসারণ-ক্ষমতা খুবই বেশী—তুলা হইতে আট গুণ, রেশম হইতে সাত গুণ, লিনেন বা ফ্ল্যাক্স-নির্মিত তন্তু হইতে চার গুণ এবং শণ হইতে তিন গুণ বেশী।

র‍্যামির তন্তুর এক একটি স্বতন্ত্র কোষ যে কোন তন্তুর কোষ হইতে অনেক বেশী লম্বা। পাট, মেস্তা, শণ—এমন কি, তুলার আঁশও খুব লম্বা হয় না। কিন্তু র‍্যামির আঁশের একটি স্বতন্ত্র কোষ সাধারণতঃ আধ ইঞ্চি হইতে প্রায় ২০ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয় ও ২০ হইতে ৭৫ মাইক্রন চওড়া হয়। এরূপ অসাধারণ লম্বা হইবার জন্য র‍্যামি হইতে প্রস্তুত সূত্র খুবই মজবুত হয়। এই সকল সূত্র হইতে নানাবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্মিত হয়। র‍্যামির সূত্র হইতে প্রস্তুত পোষাক নাইলন, রেয়ন—এমন কি, টেরিলিন হইতে নির্মিত পোষাক অপেক্ষাও দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং বায়ু চলাচলের সুবিধা থাকায় কৃত্রিম তন্তু-নির্মিত পোষাক অপেক্ষা অনেক বেশী আরামদায়ক হয়। মনুষ্য-নির্মিত এই সব তন্তুর অগ্রগতি ও ব্যাপক চাহিদার কারণ এই যে, পৃথিবীর বিখ্যাত ধনী সংস্থাগুলি ইহার প্রচলন করিয়াছে এবং বহুল ও ব্যাপক প্রচারের সাহায্যে এই সকল তন্তুর ব্যবহার বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। পৃথিবীতে জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই অনুপাতে পশমের উৎপাদন বাড়ে নাই, তাহার ফলে পশমের অভাব আজ পৃথিবীর সর্বত্র। এই কারণেও কৃত্রিম তন্তুগুলির ব্যবহার এত বাড়িয়া চলিয়াছে।

ভারতে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার বিশেষ অভাব আছে। এই জন্য প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে এই জাতীয় তুলার আমদানী করিতে হয়। বিশেষ প্রণালীতে র‍্যামিকে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার মত করা যাইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহা লম্বা আঁশ-যুক্ত তুলার সকল প্রকার প্রয়োজন মিটাইতে পারে। বিশেষ প্রক্রিয়ায় র‍্যামিকে সহজে পশমের

মতও করা যাইতে পারে। তাহা সহজে আসল পশমের সহিত মিশাইয়া পশমের অভাব বহুলাংশে পূরণ করা যায়।

র‍্যামির পাতা

র‍্যামি গাছের পাতায় ২৪ হইতে ২৬ শতাংশ প্রোটিন থাকে। ইহা হইতে মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষী ও গবাদিপশুর খুব ভাল খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লোরিডায় র‍্যামির পাতা শুষ্ক করিয়া বাজারে গবাদি পশু ও গৃহপালিত পক্ষীদের খাদ্য হিসাবে বিক্রীত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও গুয়াটামালা দেশে এই বিষয়ে অনেক গবেষণা হইয়াছে। বর্তমানে র‍্যামির পাতা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা শোধিত করিয়া মানুষের উপযোগী খাদ্য প্রস্তুত করা যায় কিনা, সেই বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে গবেষণা চলিতেছে।

র‍্যামির বিভিন্ন ব্যবহার

কাপড়-চোপড় হিসাবে র‍্যামির ব্যবহার ছাড়া ইহা পাশ্চাত্য দেশে আরও অনেক প্রকারে ব্যবহৃত হইতেছে। অধিকতর স্থিতিস্থাপকতার জন্য র‍্যামি তুলা, রেশম, শণ প্রভৃতি স্বাভাবিক তন্তু ও রেয়ন প্রভৃতি কৃত্রিম তন্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। র‍্যামি হইতে নানাপ্রকার ক্যানভাস, তোয়ালে, শক্ত দড়ি, সেলাই করিবার সুতা, পরিশোধনের বস্ত্র, আগুন নিবাইবার হোস পাইপ, সামুদ্রিক ব্যবহারের জন্য নানাবিধ দ্রব্যাদি, মাছ ধরিবার সুতা, জাল এবং আরও অনেক রকম দরকারী জিনিষ প্রস্তুত হয়। নৌকার পাল, প্যারাসুট, গ্যাস ম্যান্টল, ইলেকট্রিক ইনসুলেশন প্রভৃতির জন্যও র‍্যামি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে ব্যাঙ্ক নোট ও সিগারেটের জন্য উচ্চ গুণসম্পন্ন কাগজও প্রস্তুত হয়।

অল্প কথায় বলিতে গেলে র‍্যামি এমন এক প্রকার তন্তু—যাহাতে তুলার স্বাচ্ছন্দ্য, রেশমের কোমলতা ও পশমের উষ্ণতা একাধারে সবই বর্তমান আছে।

ভারতে র‍্যামির চাষের উন্নয়ন

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এক সময় র‍্যামির চাষ খুবই হইত। এখনও আসাম ও উত্তরবঙ্গে কিছু কিছু চাষ হইতেছে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বাজারে ইহার নানাবিধ গুণের জন্য র‍্যামির চাহিদা বাড়িয়াছে। এই কারণে বর্তমানে, বিশেষতঃ কাণ্ড হইতে ছাল ছাড়াইবার উপযুক্ত যন্ত্র (Decorticator) উদ্ভাবনের ফলে ভারতে ইহার ব্যাপক চাষ ও সর্বতোভাবে উন্নয়ন করা উচিত। পাট কৃষি-গবেষণাগারের অধিকর্তা থাকাকালীন বর্তমান লেখক কয়েক বৎসর আগে এই উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তিনি আসামে কামরূপ জেলার সরভোগে একটি র‍্যামি গবেষণাগার স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। একজন উপযুক্ত কর্মীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করিয়া তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আসামে সেই গবেষণাগারে নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সেই শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীটি

ভারতের উপযোগী উন্নত ধরণের অধিক ফলনের র‌্যামি উন্নয়ন করিবার কার্যে নিযুক্ত আছেন। উন্নত জাতের র‌্যামি ও তন্তু শোধনের প্রকৃষ্ট উপায় নির্ধারণের জন্য এই ছোট গবেষণা কেন্দ্রের সম্প্রসারণ আবশ্যক।

প্রায় দশ বৎসর আগে পশ্চিম বঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় র‌্যামির নানাবিধ গুণের বিষয় অবগত হইয়া পশ্চিম বঙ্গে ইহার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। টালিগঞ্জে কৃষি-গবেষণাগার-সংশ্লিষ্ট একটি ইউনিটে কিছু কাজ সুরু হইয়াছিল। ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর সেই কাজ প্রায় বন্ধ হইবার মত হইয়াছে। উত্তর বঙ্গের কোন স্থানে এই কাজ আবার ভালভাবে চালু করা উচিত।

ভারতবর্ষের মত দেশে র‌্যামির প্রচুর সম্ভাবনা আছে। কৃত্রিম তন্তুসমূহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়াও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহারের জন্য ইহার চাহিদা বিশ্বের বাজারে প্রচুর আছে এবং ক্রমে আরও বাড়িতে থাকিবে। তবে অল্প পরিমাণ জমিতে র‌্যামির চাষ লাভজনক হইবে না। বর্তমান যুগে জন-মজুরের মজুরীর হার যে ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে হাতে ছাল ছাড়াইয়া র‌্যামি লাভজনক করা একেবারে অসম্ভব। এই জন্য কম পক্ষে ৫০ একর জমিতে র‌্যামি চাষের ব্যবস্থা করা উচিত। সহজে বহনীয় ছাল ছাড়াইবার যন্ত্র (Decorticator) একজন চাষীর পক্ষে কেনাও সম্ভব নয়। এই কারণে কয়েকজন চাষী মিলিয়া যৌথ সংস্থা করিয়া র‌্যামি চাষ করিলে সে প্রচেষ্টা লাভজনক হইবার খুবই সম্ভাবনা।

"যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গলা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন ততদিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। এই কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালিরা কেন যে বুঝেন না তাহা বলিতে পারি না।···বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না, বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র

বিশ্বরহস্যের নব অধ্যায়—কোয়াসারস্

মৃণালকুমার দাশগুপ্ত

জ্যোতির্বিদ্যায় আট বছর আগেকার একটি আবিষ্কার বিজ্ঞানীমহলে বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের মূল বক্তব্য—'বিশ্বের দূরতম, উজ্জ্বলতম এবং রহস্যাবৃত জ্যোতিষ্ক—কোয়াসারস্।' তারাও নয়, গ্যালাক্সিও নয়, এরা এই দুয়ের চেয়ে স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ নতুন ধরণের অদৃষ্টপূর্ব এক শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক। ইংরেজীতে এদের নামকরণ হলো—Quasi Stellar Radio Sources (সংক্ষেপে QSRS বলা হয়)—চিহ্নিত অক্ষরগুলি নিয়ে যার সংক্ষিপ্ত আকার Quasars—ধ্বনিগতভাবে তাই বাংলায় লেখা যেতে পারে কোয়াসারস্। আট বছরে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেছে, কয়েক শত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ বেরিয়েছে—এমন কি, কয়েকটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক আলোচনা সভায় বিশেষজ্ঞেরা এদের সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ তথ্যাদির চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণও করেছেন, কিন্তু তত্ত্বীয় কোন ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে রহস্য উন্মোচনে পুরোপুরি সফল হয় নি। বর্তমান প্রবন্ধে বিশ্বরহস্যের নব অধ্যায়—কোয়াসারস্ সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা হবে।

'বিশ্বের দূরতম, উজ্জ্বলতম এবং রহস্যাবৃত জ্যোতিষ্ক—কোয়াসারস্—এই কথাগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই বিশ্বের গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বর্তমানে আমরা কতটা জেনেছি, সেটা ভালভাবে দেখতে হবে। বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পরিচিতি সূর্যকে কেন্দ্র করে। সূর্য মাঝারী ধরণের একটি সাধারণ তারা। রাতের আকাশে আমরা যে অগুণতি তারা দেখতে পাই, সূর্য তাদেরই একজন। সবাই মিলে জোট বেঁধে রয়েছে সুবিশাল ও অপরূপ এক তারার রাজ্যে, যাকে আমরা বলি গ্যালাক্সি। দেখতে অনেকটা ডিম্বাকার, যার লম্বা দিকটা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত—প্রায় একশো হাজার আলোক-বছর এবং খাটো দিকটা বিশ হাজার আলোক-বছর (বিশ্বের আঙিনায় দূরত্বের একক আলোক-বছর। প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিবেগে চলে এক বছরে আলো যতটা পথ যাবে, সেই দূরত্ব হলো এক আলোক-বছর $= ৬ \times ১০^{১২}$ মাইল)। সূর্যের দূরত্ব আট আলোক মিনিট, কারণ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বটুকু আলো আট মিনিটেই পৌঁছে যায়। আমাদের কাছাকাছি যে সব তারা রয়েছে, তাদের ন্যূনতম দূরত্ব প্রায় চার আলোক-বছর। সুবিশাল এই তারার রাজ্যে কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দূরে রয়েছে সূর্য, যার চারপাশে বিভিন্ন কক্ষ পথে ঘুরছে আমাদের পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ। পৃথিবী থেকে আমরা যখন তারার রাজ্যে লম্বা দিকটা বরাবর চেয়ে দেখি তখন অসংখ্য তারা আমাদের দৃষ্টিপথে ধরা দেয় এবং এদের সম্মিলিত আলোয় উদ্ভাসিত দেখি ছায়াপথ। এলোমেলো বিন্যস্ত অসংখ্য তারা এবং ছায়াপথ নিয়ে গঠিত 'আমাদের' গ্যালাক্সি, যাকে 'স্থানীয়' গ্যালাক্সি বলেও অভিহিত করা হয়। 'আমাদের' অথবা 'স্থানীয়' কথার এক্ষেত্রে তাৎপর্য রয়েছে। শক্তিশালী সব দূরবীনের কাছে বহু বহু দূরে এমনি অসংখ্য সব

তারার রাজ্য বা গ্যালাক্সির সন্ধান মিলেছে। আমাদের গ্যালাক্সির কাছাকাছি যেসব গ্যালাক্সি রয়েছে, তাদের ন্যূনতম দূরত্ব দশ-বারো লক্ষ আলোক-বছর। বিশ্বের পরিচয় আলোর মাধ্যমে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে বলা যেতে পারে যে, প্রায় দশ হাজার কোটি ($১০^{১১}$) তারা দিয়ে গড়া একটি গ্যালাক্সি এবং এমনি প্রায় এক হাজার কোটি গ্যালাক্সি দিয়ে গড়া—বিশ্ব। আলোর মাধ্যমে বিশ্বের পরিচয় প্রথম পেয়েছি, তাই বিশ্বের এই কাঠামোকে বলা যেতে পারে আলোক-বিশ্ব। একটু বাদেই আমরা রেডিও বা বেতার-বিশ্বের কথাও বলবো। দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিশ্বের পরিধি বা বিস্তার সম্বন্ধে কি জানা গেছে, সেটা দেখা। এসব আলোচনার পূর্বে আলো সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

আলো এক প্রকার শক্তি। একথা আজ সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে যে, গামা ও এক্স্-রশ্মি, আলট্রাভায়োলেট, আলো, ইনফ্রারেড বা তাপ, রেডিও বা বেতার—সবই শক্তি এবং সবাই বিরাট এক পরিবারের যেন বিভিন্ন সত্য —পরিবারটির নাম বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। উৎস থেকে এরা তরঙ্গ বা ঢেউয়ের আকারে প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতি-বেগে ছড়িয়ে পড়ে। ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য কত বড় বা কত ছোট, তারই উপর নির্ভর করে এদের প্রকৃতি। সবচেয়ে ছোট হলো গামা-রশ্মি এবং সবচেয়ে বড়, রেডিও ঢেউ—দুয়ের মাঝামাঝি হলো আলোর ঢেউ—দৃশ্য বেগুনী থেকে লাল। আলোর ক্ষেত্রে ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য বেগুনীর সবচেয়ে কম এবং লালের সবচেয়ে বেশী।

সূর্য, তারা, গ্যালাক্সি বা যে কোন উৎস থেকে আগত আলোর কি উপাদান অর্থাৎ কোন্ কোন্ রঙের আলো কি পরিমাণে বর্তমান, সেটা আমরা দূরবীন ও স্পেকট্রোগ্রাফ নামক আলো-বিশ্লেষণকারী যন্ত্রের সাহায্যে জানতে পারি। স্পেকট্রোগ্রাফ যন্ত্র থেকে পাই আলোর বর্ণালী, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—সরু ও মোটা, ক্ষীণ ও উজ্জ্বল রং-বেরঙের অসংখ্য রেখা বা লাইনের সমন্বয়। বর্ণালী যেন উৎসের ঠিকুজীর মত। কারণ বর্ণালী পরীক্ষা করে উৎসটি কি কি উপাদানে গঠিত, সেখানকার উষ্ণতা কত, অণু-পরমাণুগুলির প্রকৃতি ও দশা কি ধরণের—ইত্যাদি সব তথ্য প্রায় নির্ভুলভাবে জানা যায়। উপরন্তু বর্ণালী থেকে প্রাপ্ত অপর একটি তথ্য বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের পরি-প্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হলো রেখা-গুলির স্থান-বিচ্যুতি বা অপসারণ। ব্যাপারটি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক। ইতিপূর্বে শব্দ-বিজ্ঞানে 'ডপ্লার এফেক্ট' বিজ্ঞানী-দের জানা ছিল। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যে, বেগে চলমান রেলগাড়ীর হুইসেল বা মোটর গাড়ীর নিরবচ্ছিন্ন হর্নের আওয়াজ এগিয়ে আসবার বেলায় মোটা থেকে মিহি এবং পাশ কেটে দূরে চলে যাবার বেলায় মিহি থেকে মোটা বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে মোটা অর্থে শব্দ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশী, মিহি মানে কম। আলোর বেলায় আসা যাক। অন্যান্য গ্যালাক্সির আলোক-বর্ণালী দেখে বিজ্ঞানীরা প্রথমটায় একটু মুস্কিলে পড়ে গেলেন, কারণ বর্ণালীর বিভিন্ন রঙের রেখাগুলি ঠিক নির্দিষ্ট স্থানে নেই—তাদের যেন কিছুটা বিচ্যুতি ঘটেছে লালের দিকে। বর্ণালীর এই লাল-অপসরণের কারণ 'ডপ্লার এফেক্ট'। এক্ষেত্রে লাল-অপসরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, গ্যালক্সি-গুলি আমাদের কাছ থেকে যেন দূরে সরে যাচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ মার্কিন বিজ্ঞানী এড্উইন হাব্লের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ধরণের বহু গ্যালাক্সির বর্ণালীর লাল-অপসরণ নিখুঁতভাবে মেপে দেখালেন যে, লাল-অপসরণ গ্যালক্সিগুলির দূরত্বের সমানু-

গাতিক অর্থাৎ দূরত্ব যার যত বেশী, লাল-অপসরণও তার বেলায় তত বেশী। বিশ্বে গ্যালাক্সিগুলির দূরত্ব নির্ণয়ের কাজে তাই হাব্‌লের সূত্র এক অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করলো। হাব্‌লের সূত্র যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে এই দাঁড়ায়, যে, বিশ্ব প্রসরণশীল—গ্যালাক্সিগুলির দূরত্ব যার যত বেশী, আপেক্ষিক অপসরণ-গতিবেগও তার তত বেশী। তাহলে এমন একটা দূরত্ব ভাবা যেতে পারে, যেখানে অপসরণ-গতিবেগ বাড়তে বাড়তে ঠিক আলোর গতিবেগের সমান হবে। সেই দূরত্বই হবে আমাদের কাছে দৃশ্য বিশ্বের শেষ সীমানা—হাব্‌লের সূত্রানুযায়ী দূরত্বটা হলো দশ হাজার মিলিয়ন ($১০^{১০}$) আলোক-বছর। এর বেশী দূরত্ব আছে কি নেই, সে খবর আলো আমাদের এনে দিতে সক্ষম হবে না, কারণ সেখানে উৎস আলোর চেয়েও বেশী আপাত গতিবেগে দূরে সরে যাচ্ছে।

ইতিপূর্বে বেতার বা রেডিও-বিশ্বের কথা উল্লেখ করেছি। আলো ছাড়াও বহির্বিশ্ব থেকে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রেডিও-ঢেউ আসছে। এই মূল্যবান তথ্যটি বর্তমান যুগের একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার—১৯৩২ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ইয়ানস্কির অবদান। ইয়ানস্কির সফলতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নব্যবিজ্ঞান বেতার বা রেডিও-জ্যোতির্বিদ্যা। এই নব্যবিজ্ঞানের বিজ্ঞানীরাও বিশ্বকে দেখছেন—আলোর বদলে রেডিও-ঢেউয়ের মারফত। বড় বড় রেডিও-জ্যোতির্বিদ্যা-মানমন্দির গড়ে উঠেছে। প্রকাণ্ড সব রেডিও দূরবীন (আর্ট পেপারে ১নং চিত্র), রেডিও-ব্যতিকরণ যন্ত্রের (ইন্টারফেরোমিটার) সাহায্যে আকাশের বিভিন্ন দিক থেকে আগত ছোট বড় নানা দৈর্ঘ্যের রেডিও-ঢেউকে ধরে নিখুঁত স্বয়ংক্রিয় সব যন্ত্রে দিবারাত্র লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। এগুলি বিশ্লেষণ করে রেডিও-জ্যোতির্বিদেরা জানতে পারছেন রেডিও-সূর্য,—গ্রহ,—তারা এবং—গ্যালাক্সির কথা। এমন সব নতুন তথ্য জানা গেছে, যা আলোর মারফত জানা কোন দিনই সম্ভব হতো না—তাই তাদের দেখা বিশ্বকে আমরা বলছি রেডিও-বিশ্ব। আলোক-বিশ্ব এবং রেডিও-বিশ্ব কিন্তু পৃথক কিছু নয়, শুধুমাত্র বলা যেতে পারে যে, হুবহু মিল খুঁজতে গিয়েই কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা গেছে। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলে রাখছি, বিশ্বের আঙ্গিনায় আলোক—এবং রেডিও-উৎসের পারস্পরিক মিল খোঁজাখুজিই কোয়াসারস্‌ আবিষ্কারের গোড়ার কথা।

১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের রেডিও-জ্যোতির্বিদেরা উন্নত ধরণের রেডিও-দূরবীন এবং ব্যতিকরণ যন্ত্রের সাহায্যে কয়েক হাজার রেডিও-উৎসের সন্ধান পেলেন। আকাশের গায়ে প্রতিটি উৎসের সঠিক স্থান, এদের আপাত আকার এবং গড়ন ইত্যাদি যতটা সম্ভব সঠিকভাবে জানবার বিভিন্ন প্রচেষ্টা চললো। এক্ষেত্রে সঠিকভাবে জানবার একটা প্রধান অন্তরায় আছে। রেডিও-দূরবীনের বিভাজন ক্ষমতা (অর্থাৎ খুব কাছাকছি একের অধিক উৎসগুলিকে পৃথকভাবে দেখতে পারবার ক্ষমতা) আলোক-দূরবীনের তুলনায় খুবই নগণ্য। কারণ, বিভাজন-ক্ষমতা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত কম বিভাজন-ক্ষমতা ততই ভাল। মাউন্ট প্যালোমার মানমন্দিরে দু-শ' ইঞ্চি ব্যাসের আলোক-দূরবীন সর্বাপেক্ষা বড়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, এর সমতুল্য বিভাজন-ক্ষমতার রেডিও-দূরবীন যদি করতে হয়, তবে তার রেডিও-প্রতিফলকের ব্যাস কয়েক-শ' মাইল হতে হবে। রেডিও-উৎসগুলির সঠিক পরিচয় জানবার আরও একটি অসুবিধা আছে। উৎসগুলির দূরত্ব মাপবার কোন উপায় নেই, যেমনটি রয়েছে আলোক-উৎসের বেলায়। কাজেই বিশ্বরহস্যের নানা সমস্যা

বিশ্বরহস্যের নব অধ্যায়—কোয়াসারস্
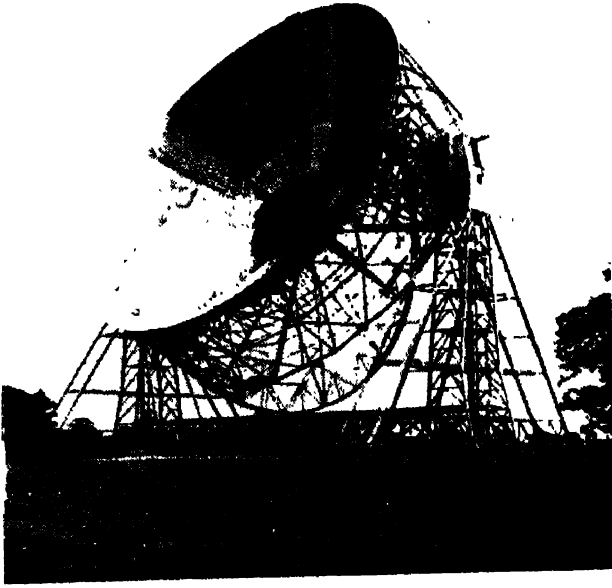
চিত্র— ইংল্যাণ্ডের জড্রেল ব্যাঙ্ক রেডিও জ্যোতির্বিদ্যা মানমন্দিরের অতিকায় রেডিও দূরবীন। বিশ্বের রেডিও-উৎস সন্ধানে পৃথিবীর বৃহত্তম (ব্যাস ২৫০ ফুট) এই রেডিও-দূরবীনটির অনবদ্য ভূমিকার কথা সুবিদিত।

২নং চিত্র—মার্টিন স্মিড্ট কর্তৃক শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে তোলা 3C 273 কোয়াসারসের ছবি। প্রবন্ধে আলোচিত গ্যাসীয় জেটটি (নীচের ডান পাশে কোণাকুণি অবস্থিত)। সিরিল হাজার্ড কর্তৃক পরীক্ষিত যুগ্ম বেতার-উৎসটি এরই জুড়ি।
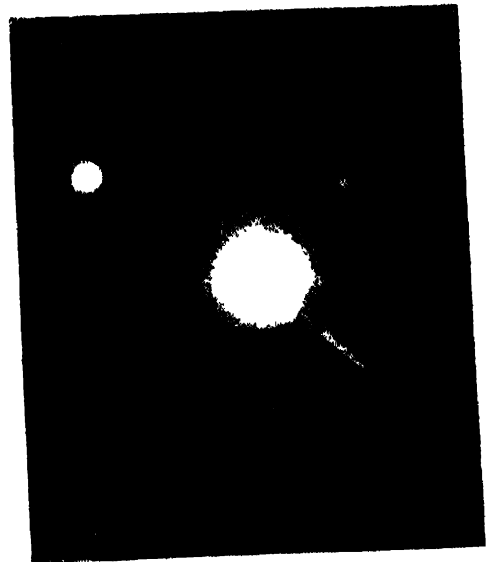
সমাধানের প্রচেষ্টায় আলো—এবং রেডিও-জ্যোতির্বিদেরা যুগ্মভাবে মেতে গেলেন। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনেক রহস্যেরই মীমাংসা হলো—উপরন্তু বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে নব অধ্যায়ের সূচনা হলো—আলোচ্য কোয়াসারস্ তারই একটি।

এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার কথা বলছি। ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বড় বড় সব রেডিও-জ্যোতির্বিদ্যা-মানমন্দিরে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মাপ-জোক করে কয়েক হাজার রেডিও-উৎসের সন্ধান পেলেন—একথা পূর্বেই বলেছি। যতটা সম্ভব সঠিকভাবে এদের স্থান, আপাত আকার ইত্যাদি জানা গেল। পরবর্তী কাজ হলো দৃশ্য বিশ্বের আলোক-উৎসগুলির সঙ্গে এদের মিল খুঁজে দেখা এবং সম্ভবমত প্রত্যেকের জুড়ি খুঁজে বের করা। দেখা গেল—সূর্য, গ্রহ, চাঁদ, স্পন্দনশীল তারা, বিস্ফারিত তারা (সুপারনোভা), আমাদের গ্যালাক্সি এবং অন্যান্য গ্যালাক্সিগুলি—এদের প্রায় সব ক্ষেত্রে জুড়ি মিলছে। সাধারণ তারার মধ্যে সূর্য ছাড়া অন্য কারুর অস্তিত্ব 'আমাদের' রেডিও-গ্যালাক্সিতে নেই। সম্ভবতঃ রেডিও-ঢেউয়ে তাদের বিকিরণশক্তি এতই কম যে, কয়েক আলোক-বছর পথ অতিক্রম করতে খুব ক্ষীণ হয়ে পড়েছে বলেই ধরা যাচ্ছে না। ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার রেডিও-জ্যোতির্বিদেরা এবং মাউণ্ট উইলসন ও মাউণ্ট প্যালোমার মানমন্দিরের আলোক-জ্যোতির্বিদেরা কিন্তু কতকগুলি আপাত ক্ষীণ রেডিও-উৎস নিয়ে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কারণ জুড়ি হিসেবে কোন আলোক-উৎসের হদিস পাওয়া গেল না। এদের আলাদা নাম-করণ হলো রেডিও-গ্যালাক্সি।

১৯৬০ সালের কথা। ম্যাথিউজ, বোলটন, গ্রীনষ্টীন, মাঙ্ক ও স্যাণ্ডেজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রেডিও-উৎস 3C 48-এর স্থানে (ক্যাম্বিজ রেডিও জ্যো. বি. মানমন্দিরে তৃতীয় ক্যাটালগের ৪৮নং উৎস) জুড়ি হিসাবে অতি ক্ষীণ একটি তারার (16th Magnitude) সন্ধান পাওয়া গেল। তারাটির বৈশিষ্ট্য দেখা গেল, আলট্রা-ভায়োলেট আলোতে অপেক্ষাকৃত বেশী উজ্জ্বল এবং বর্ণালীতে এমন কয়েকটি লাইন বা রেখা রয়েছে, যেগুলির স্থান প্রচলিত নিয়মানুসারে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। পরবর্তী দু-বছরে রেডিও-উৎস 3C 196 এবং 3C 286-এর নিকটবর্তী অঞ্চলেও অনুরূপ আপাত ক্ষুদে (18th Magnitude)—আলট্রাভায়োলেট উজ্জ্বল এবং অপরিচিত বর্ণালী রেখাবিশিষ্ট তারার সন্ধান মিললো। বিজ্ঞানীমহলে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল—প্রথমতঃ সাধারণ তারা থেকে ইতিপূর্বে রেডিও-শক্তি ধরা যায় নি, দ্বিতীয়তঃ এরা আলট্রাভায়োলেটে অপেক্ষাকৃত বেশী উজ্জ্বলই বা কেন এবং এদের বর্ণালীই বা কেন নিয়মে বাধা নয়। এই উৎসগুলির নামকরণ হলো কোয়াসারস্; সমস্যাসঙ্কুল নানা প্রশ্ন এসে গেল—এদের সত্যি-কারের পরিচয় কি?

ইতিমধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নীস্থিত রেডিও-জ্যোতির্বিদ্যা-মানমন্দিরে ইংরেজ বিজ্ঞানী সিরিল হাজার্ড বিশেষ প্রক্রিয়ায় 3C 273 রেডিও-উৎসটির সঠিক স্থান নির্ভুলভাবে নির্ণয় করলেন। প্রক্রিয়াটি অভিনব। চাঁদের কক্ষপথ আকাশের গায়ে সব সময়ের জন্যে সঠিকভাবে জানা আছে। রেডিও-উৎসটি চাঁদের গতির জন্যে তারই পিছনে ঠিক কখন ঢাকা পড়বে এবং আবার ঠিক কখন চাঁদ আবরণমুক্ত হয়ে দৃশ্য হবে, সেটা তিনি পরীক্ষা করে সহজেই বের করতে পারলেন। পরীক্ষিত ফলাফল থেকে উৎসটির স্থান বেশ নির্ভুলভাবেই জানা গেল। তিনি আরো দেখতে পেলেন যে, 3C 273 রেডিও-উৎসটি যুগ্ম, যেন দুটি বিভিন্ন উৎস সামান্য ব্যবধানে বিরাজমান। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে

পারে যে, বহির্বিশ্বের রেডিও-উৎসগুলির অধিকাংশই যুগ্ম। প্রথম যুগ্ম রেডিও-উৎস Cygnus A আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৫২-৫৩ সালে ইংল্যাণ্ডের জড্‌রেল ব্যাঙ্ক (রে. জ্যো. বি. মানমন্দিরে রজার জেনিসন এবং বর্তমানে লেখকের গবেষণায়)। হাজার্ডের ফলাফলকে কেন্দ্র করে মার্কিন বিজ্ঞানী মার্টিন স্মিড্‌ট্‌ রেডিও-উৎস 3C 273-এর স্থানে শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে অদ্ভুত একটি জ্যোতিষ্কের সন্ধান পেলেন। (আর্ট পেপারে ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। ক্ষীণকায় একটি তারা (13th Magnitude) এবং তাথেকে বেরিয়ে এসেছে একটি গ্যাসীয় জেট। তারাটির স্থান এবং জেটের অপর প্রান্ত হাজার্ডের উল্লেখিত দুটি উৎসের জুড়ি হিসেবে মিলে গেল। উপরন্তু তিনি এই আলোক-উৎসটির বর্ণালী বিশেষ যত্ন ও ধৈর্যসহকারে নির্ধারণ করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বর্ণালীতে যে সব রেখা পাওয়া গেল, তাদের পরিচিত কোন রেখা বলে চেনা গেল না। অথচ তিনি কিন্তু রেখাগুলির পারস্পরিক ব্যবধানে বেশ একটা শৃঙ্খলার ভাব দেখতে পেলেন, ঠিক যেমনটি থাকে জলন্ত হাইড্রোজেন গ্যাসের 'বামার শ্রেণীর' রেখাগুলির মধ্যে। তিনি অধৈর্য হয়ে ওঠলেন। তাঁরই একটি লেখায় পড়েছিলাম, রাতের পর রাত অনিদ্রায় কেটেছে, বারংবার বর্ণালীর ছবি তোলা হচ্ছে—মাথায় একই চিন্তা রেখাগুলির সত্যিকারের পরিচয় কি? হঠাৎ একদিন একটা যুক্তি খুঁজে পেলেন—'বামার শ্রেণীর' রেখাগুলির শতকরা ষোল ভাগ লালের দিকে বিচ্যুতি ধরে নিলে 3C 273-এর বর্ণালীর কতকগুলি রেখা পর পর বেশ শৃঙ্খলায় মিলে যাচ্ছে। বিচ্যুতি থেকে প্রসারণ-গতিবেগ বের করে তিনি ঘোষণা করলেন যে, 3C 273 উৎসটি হাব্‌লের সূত্রানুযায়ী প্রায় দেড় হাজার মিলিয়ন আলোক-বছর দূরের একটি জ্যোতিষ্ক। তেমনি গ্রীনষ্টীন দেখালেন যে, 3C 48 উৎসের বর্ণালীর বেলায় বিচ্যুতি বা লাল-অপসরণ আরও বেশী—শতকরা প্রায় সাঁইত্রিশ ভাগ এবং হিসেব অনুযায়ী এর দূরত্ব প্রায় চার হাজার মিলিয়ন আলোক-বছর। হাজার্ড, স্মিড্‌ট্‌ এবং গ্রীনষ্টীনের আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোয়াসারসগুলির দূরত্ব জানা গেল। ফলে আপাত আলোক ও রেডিও-দীপ্তি এবং আকার থেকে উৎসগুলির প্রকৃত দীপ্তি এবং আকার নির্ণয় করা সম্ভব হলো। সমস্যাটা এবার বেশ জটিল আকার ধারণ করলো, কারণ তারার মত দেখালেও উৎসগুলির প্রকৃত দীপ্তি বা ঔজ্জ্বল্য অর্থাৎ নির্গত শক্তি বা তেজ প্রচণ্ড—এমন কি, যে কোন গ্যালাক্সির সামগ্রিক শক্তির তুলনায় এক-শ' গুণের চেয়েও বেশী এবং এরা প্রসরণশীল দৃশ্য বিশ্বের প্রান্ত দেশের বাসিন্দা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হাবেলের সূত্রানুযায়ী, প্রসরণশীল বিশ্ব মেনে নিয়ে পরীক্ষিত লাল-অপসরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়েই এমনি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। স্বভাবতঃই বিজ্ঞানীরা লাল-অপসরণের অন্যান্য ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হলেন। চেষ্টা চললো যদি প্রমাণ করা যায় উৎসগুলি অপেক্ষাকৃত কাছের কোন জ্যোতিষ্ক, তাহলে তখন তাদের প্রকৃত দীপ্তি বা ঔজ্জ্বল্য অনেকটা কম হবে এবং তার ব্যাখ্যা বেশ সহজেই করা যাবে। দুটি মতবাদ নিয়ে আলোচনা হলো। প্রথমতঃ মনে করা যাক, কোয়াসারসগুলি অপেক্ষাকৃত কাছের কোন বড় আকারের জ্যোতিষ্ক এবং লাল-অপসরণ তারই অভিকর্ষ-বলপ্রসূত। উৎসটির অভিকর্ষ-বল এড়িয়ে চলে আসতে আলোর কিছু শক্তি হ্রাস হবে। আমরা আইনষ্টাইনের সূত্র থেকে জানি যে, শক্তি এক্ষেত্রে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল, দৈর্ঘ্য যত কম শক্তি তত বেশী। অতএব নির্গত আলোক-শক্তি হ্রাস হয়েছে বলে দৃশ্য আলোর রং আরও লাল ঘেঁষা দেখা যাবে

অর্থাৎ শক্তি হ্রাসের পরিমাণ যত বেশী হবে, আলোর রং ততই বর্ণালীর লালের দিকে এগিয়ে আসবে। উত্তম কথা, কিন্তু কোয়াসারস্‌গুলির বেলায় লাল-অপসরণের মাত্রা এত বেশী যে, তার ব্যাখ্যা যদি অভিকর্ষ-বলপ্রসূত হয়, তাহলে তাদের যে কোন তারার চেয়ে বহু গুণ বড় বলে ভাবতে হবে। মতবাদ নাকচ হয়ে গেল। কারণ প্রথমতঃ কাছাকাছি কোথাও এহেন অতিকায় জ্যোতিষ্কের সন্ধান এতদিনেও শক্তিশালী দূরবীনে ধরা পড়ে নি, উপরন্তু যে কোন গ্যালাক্সিতে এহেন অতিকায় জ্যোতিষ্ক বিরাজমান থাকলে গ্যালাক্সির আভ্যন্তরীণ সুস্থিতি ধসে পড়বে। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে—কোয়াসারস্‌গুলি নিকটবর্তী কোন গ্যালাক্সি-কেন্দ্রে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলস্বরূপ। এই ধরণের বিস্ফোরণের অনেক নজীরও রয়েছে। বিস্ফোরণের ফলে গ্যাসীয় বস্তুপিণ্ড প্রচণ্ড গতিবেগে ছড়িয়ে পড়বে এবং লাল-অপসরণ এক্ষেত্রে প্রকৃত গতিবেগের জন্যেই দেখা যাবে। এই ব্যাখ্যাও সহজ যুক্তিতে নাকচ হয়ে গেল, কারণ এহেন পরিস্থিতিতে প্রায় সমসংখ্যক গ্যাসীয় বস্তুপিণ্ড আমাদের দিকেও ছুট দেবে এবং তারা তাই নীল-অপসরণ দেখাবে। কিন্তু কোন গবেষণাতেই কোন কোয়াসারস্ আজ পর্যন্ত নীল-অপসরণ দেখায় নি। ততঃ কিম্! সমস্যাটা তাহলে জটিলই রয়ে গেল—এখন পর্যন্ত আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে যে, কোয়াসারস্‌গুলি প্রসরণশীল বিশ্বের প্রান্ত দেশে প্রচণ্ড শক্তির আধার-স্বরূপ বিরাজমান উদ্ভট একশ্রেণীর জ্যোতিষ্ক।

প্রচণ্ড শক্তির উৎস কি হতে পারে—তাই নিয়ে বিজ্ঞানীরা জল্পনা-কল্পনা করছেন। আজ পর্যন্ত প্রায় এক-শ' দশটি কোয়াসারস্ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তন্মধ্যে প্রায় চল্লিশটি নিয়ে বিজ্ঞানীরা নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য—

১। সকলেই শক্তিশালী রেডিও-উৎস (বর্তমানযুগে রেডিও-জ্যোতির্বিদ্যার উৎকর্ষেই এদের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে)।

২। প্রত্যেকটিই আলোর উৎস।—আল্ট্রা-ভায়োলেট প্রাধান্যই সর্বাধিক।

৩। শক্তিশালী দূরবীনে অধিকাংশই তারার মত দেখায়। কতকগুলির বেলায় আবার গ্যাসীয় জেটের বিস্তারও দেখা যায়।

৪। রেডিও-দূরবীনে দৃশ্য তারার চেয়ে জুড়ি রেডিও-উৎস অনেকটা বড় দেখায় এবং অনেকেই যুগ্ম রেডিও-উৎস।

৫। দৃশ্য বর্ণালীতে প্রাপ্ত রেখাগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা; লাল-অপসরণ মাত্রাতিরিক্ত। (উৎসের অপসরণ গতিবেগ আলোর গতিবেগের শতকরা পনেরো থেকে আশী ভাগ পর্যন্ত পাওয়া গেছে (৩নং চিত্র) দূরতম কোয়াসারস্ আট হাজার মিলিয়ন আলোক-বছর দূরত্বে রয়েছে) নীল-অপসরণ কোন ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় নি।

৬। আলো এবং রেডিও দীপ্তি প্রত্যেকের বেলাতেই পরিবর্তনশীল দেখা গেছে পরিবর্তনের দোলনকাল কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত হতে পারে। (পরীক্ষিত এই তথ্যটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই দোলনকাল থেকে উৎসগুলির প্রকৃত আকারের ঊর্ধ্ব-সীমার একটা হদিস মেলে। কোন উৎসের বেলায় এই সময়ে আলো যতটা পথ যেতে পারে, উৎসটির প্রকৃত আকার তার চেয়ে বড় নয়। দোলন কাল যদি এক বছর হয় তবে উৎসটির প্রকৃত আকার এক আলোক-বছরের বেশী নয়)।

পরিশেষে দেখা যাক, কোয়াসারস্ প্রসঙ্গে কি কি তত্ত্বীয় ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত প্রয়াসী হয়েছেন। কোন মতবাদ পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত তখনই হবে, যখন সেই মতবাদ উপরে বর্ণিত কোয়াসারস্-বৈশিষ্ট্য-

গুলির উপর যথার্থ আলোক পাত করবে এবং এদের অপরিমিত তেজ বা শক্তির হদিস দিতে সক্ষম হবে। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে যে, কোন কোয়াসারস্ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় $১০^{৪৫}$ আর্গ শক্তি বিকিরণ করে থাকে যত সেকেণ্ড, তাকে বিকিরণ হার—$১০^{৪৫}$ আর্গ/সেকেণ্ড দিয়ে গুণফল)। জানা আছে প্রতি গ্র্যাম হাইড্রোজেন গলন-প্রক্রিয়ায় (ফিউশন) হিলিয়ামে পর্যবসিত হলে ৬×১০^{১৮} আর্গ পরিমাণ শক্তি দিয়ে থাকে। কাজেই কোয়াসারস্-এর

৬নং চিত্র
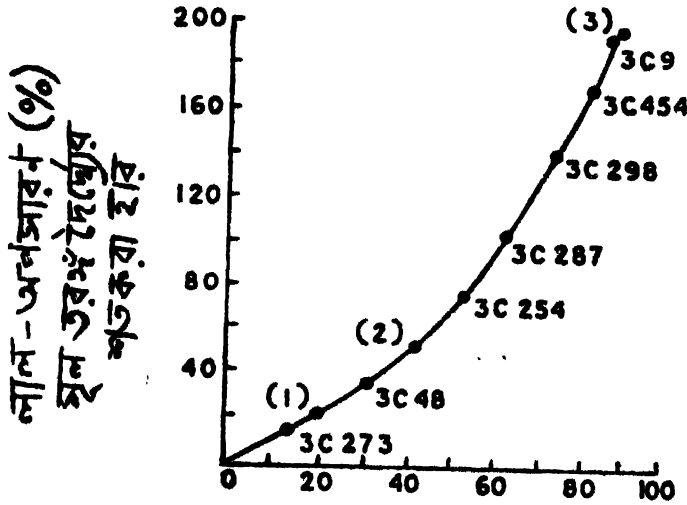
কোয়াসারস্গুলির বর্ণালীতে প্রাপ্ত লাল-অপসরণের মান এবং প্রসারণ গতিবেগের মানের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। 3C চিহ্নিত বিন্দুগুলি কোয়াসারস্জনিত। এছাড়া চিহ্নিত বিন্দু (1) দূরতম গ্যালাক্সি, (2) দূরতম রেডিও-গ্যালাক্সি এবং (3) দূরতম কোয়াসারস্ উৎস 1112+12 (অপর একটি ক্যাটালগ-সংখ্যানুযায়ী) শেষোক্তটিই বিশ্বের দূরতম জ্যোতিষ্ক—দূরত্ব আট হাজার মিলিয়ন আলোক-বছর -৫×১০^{২২} মাইল।

(তুলনামূলকভাবে বলা যেতে পারে যে, এই হার সূর্যের তেজ বিকিরণের হারের চেয়ে ৩×১০^{১১} গুণ বেশী)। আমরা যদি ধরে নেই কোন কোয়াসারস্ $১০^{৬}$ বছর ধরে এই হারে শক্তি বিকিরণ করে আসছে, তাহলে মোট শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে, ৩×১০^{৫৮} আর্গ ($১০^{৬}$ বছরে শক্তি উৎপাদন এই প্রক্রিয়ায় হলে ৫×১০^{৩৯} গ্র্যাম হাইড্রোজেনের (অর্থাৎ $২'৫\times১০^{৬}$ সৌর ভরের সমতুল্য) প্রয়োজন হবে। শক্তির উৎস-সন্ধানে উপস্থাপিত মতবাদগুলি সাধারণভাবে আলোচনা করা যাক।

বার্‌বিজের মতবাদের মূল বক্তব্য হলো এই যে,

কোয়াসারস্-এর শক্তি বহুসংখ্যক তারার ক্রমিক বিস্ফোরণের (Chain of Superova explosion) ফলস্বরূপ। তিনি বলতে চান যে, গ্যালাক্সিগুলির কেন্দ্রীয় অংশে তারার ঘনত্ব খুব বেশী। কোন গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যদি কখনও ওরই মধ্যে একটি তারা হঠাৎ বিস্ফোরিত হয় (Supernova) তাহলে তারই তেজের দাপটে অন্যান্য তারায় ক্রমিক বিস্ফোরণ ঘটতে থাকবে। জানা আছে, একটি তারার বিস্ফোরণে নির্গত শক্তির পরিমাণ প্রায় $১০^{৫০}$ আর্গ। অতএব উল্লিখিত কোয়াসারস্-এর শক্তি জোগাতে কমপক্ষে $১০^{৮}$ তারার বিস্ফোরণ প্রয়োজন।

হয়েল এবং ফাউলারের মতবাদ আরো অভিনব। এঁদের মতে কোয়াসারস্-এর শক্তি $১০^{৮}$ সৌর ভরের সমতুল্য, অতিকায় গ্যাসীয় বস্তুপিণ্ডের স্বীয় প্রচণ্ড অভিকর্ষ বলে ধসে পড়বার ফল স্বরূপ অন্তর্মুখী বিস্ফোরণ-জনিত (Implosion under gravity of a single mass of gas—gravitational collapse)। বিজ্ঞানী-মহলে বাকবিতণ্ডার ঝড় বয়ে গেল! কেমন করে এহেন অতিকায় গ্যাসীয় বস্তুপিণ্ডের সমাবেশ ঘটবে? এর সামগ্রিক সুস্থিতিই বা কি করে রক্ষিত হবে? আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের যাথার্থ্য যে সংশয়াবিষ্ট হবে! সোয়ার্জস্চাইল্ড সীমা (Schwarzschild Limit) বলে কি তাহলে কিছু নেই—ইত্যাদি প্রশ্নের জালে বিব্রত হয়ে পড়লেন হয়েল এবং ফাউলার। (সোয়ার্জস্-চাইল্ড-সীমা—সো. সী—আমরা জানি, প্রত্যেক ঘনসন্নিবিষ্ট বস্তুপিণ্ডের বা জ্যোতিষ্কের কম-বেশী অভিকর্ষ-বল রয়েছে। কাজেই জ্যোতিষ্কের অভিকর্ষ-বলকে এড়িয়ে অর্থাৎ হার মানিয়ে যদি কোন কিছুকে বেরিয়ে আসতে হয়, তবে তার বহির্মুখী শক্তি ঐ অভিকর্ষ-বলের চেয়ে বেশী হতে হবে। ভর যত বেশী হবে অভিকর্ষ-বলও তত বেশী হবে। অতএব এমন ঘন-সন্নিবিষ্ট ভরের কল্পনা করা যেতে পারে, যেখানকার অভিকর্ষ-বলকে হার মানিয়ে চলে আসবার বিপরীত শক্তির জন্যে নির্গমন গতিবেগ—Escape velocity—আলোর গতিবেগের সমতুল্য হবে। এই পরিস্থিতিতে উপনীত জ্যোতিষ্কটির ব্যাসার্ধকে বলা হয় সোয়ার্জস্চাইল্ড সীমা। কারণ, দেখা যাচ্ছে, এই সীমা অতিক্রান্ত হলে সেই জ্যোতিষ্ক থেকে আলোকণা (ফোটন) বেরিয়ে আসতে পারবে না এবং সেটি তাই চিরকাল আমাদের দৃষ্টির অগোচরেই থেকে যাবে। প্রশ্নটা এই দাঁড়ালো—অতিকায় গ্যাসীয় বস্তুপিণ্ড অভিকর্ষ জনিত সঙ্কোচনের ফলে ঘন হতে ঘনতর হবে এবং পুরোপুরি ধসে পড়বার আগেই সোয়ার্জস্চাইল্ড সীমা অতিক্রম করে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কাজেই এহেন পরিকল্পিত ধসের পরিণাম আমরা কখনই কিছু জানতে পারবো না! হয়েল এবং ফাউলার কিন্তু দমে গেলেন না, তাঁরা অন্য ব্যাখ্যা দিলেন। জ্যোতিষ্কটি সো. সীমায় পৌঁছানোর পূর্বেই তার সামগ্রিক সুস্থিতি হারিয়ে ফেলবে, তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে, যার দুটি ভাগ প্রচণ্ড গতিবেগে বিপরীত দিকে ছুট দেবে এবং তৃতীয়টি স্বস্থানে থেকে যাবে এবং সঙ্কুচিত হতে হতে সো. সী. অতিক্রম করে অদৃশ্য হবে। সে দুটি অংশ প্রায় আলোর গতিবেগে বিপরীত-মুখী ছুট দিয়েছে, তাদের ইলেকট্রন ঘনত্ব, চৌম্বক ক্ষেত্র, উষ্ণতা ইত্যাদির যথাযথ সমন্বয়ে কোয়া-সারস্-এর আলো ও রেডিও শক্তি বিকিরণ, যুগ্ম আকার প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

চন্দ্রশেখর, হয়েল এবং ফাউলারের মতবাদ মেনে নিলেন না বটে, কিন্তু তিনি মহাকর্ষ বল-প্রসূত সঙ্কোচনকেও অস্বীকার করেন না। তাঁর মতে $১০^{৮}$ সূর্যের সমতুল্য ভরের অতিকায় গ্যাসীয় পিণ্ড সঙ্কুচিত হতে হতে সোয়ার্জস্-চাইল্ড সীমায় পৌঁছানোর অনেক আগেই (সো. সীমার ৪.৪×১০^{৪} গুণ অর্থাৎ যার
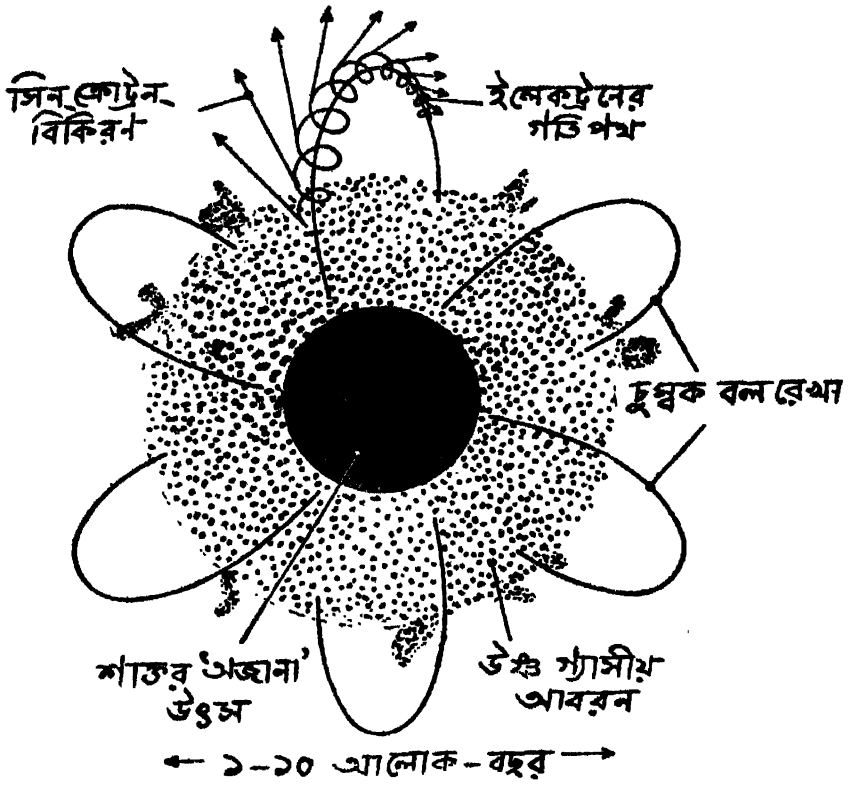
৪নং চিত্র

স্মিড্‌ট্‌ এবং গ্রীনষ্টীন প্রদত্ত কোয়াসারস্‌ মডেল। মধ্যেকার কালো অংশটি প্রবন্ধে আলোচিত প্রচণ্ড শক্তির অজানা উৎস। তারই চতুর্দিকে চিহ্নিত অংশ অতি উষ্ণ (উষ্ণতা ১৫,০০০°K—ঘনত্ব $১০^{৪}$—$১০^{৭}$ কণা প্রতি সি. সি. তে) গ্যাসীয় আবরণ। উৎসটির ব্যাস ১-১০ আলোক-বছর। বাঁকানো রেখাগুলি উৎসের চৌম্বক বলরেখা, যার উপরকার একটিতে 'সিন্‌ক্রোট্রন বিকিরণ' পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। পদ্ধতিটি হলো এই—বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী কোন চৌম্বক ক্ষেত্রে ইলেকট্রনগুলির গতিবিধি বিচিত্র। বল-রেখার চারদিকে স্ক্রুর মত পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলে। এমনি ধারায় চলায় ইলেকট্রনের গতিতে ত্বরণ হয়। এই ত্বরণের ফলস্বরূপ বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের বিকিরণ হয়ে থাকে। ব্যাপারটি সর্বপ্রথমে সিন্‌ক্রোট্রন যন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়েছিল বলেই 'সিন্‌ক্রোট্রন বিকিরণ' নামে প্রচলিত। কোয়াসারস্‌ এবং অধিকাংশ রেডিও-উৎসের রেডিও বিকিরণ এই পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। ইলেকট্রনের পাকানো গতিপথের প্রতিটি বিন্দুতে স্পর্শক রেখাগুলির দ্বারা রেডিও-বিকিরণের ধারা দেখানো হয়েছে।

প্রকৃত ব্যাসার্ধ •'১৬ আলোক-বছর) তার আভ্যন্তরীণ সুস্থিতি হারিয়ে ফেলবে এবং সে ক্ষেত্রে সঙ্কোচনের পরিবর্তে সামগ্রিক স্পন্দন দেখা দেবে। তাঁর মতে 3C 273 কোয়াসারস্-এর প্রকৃত আকার এবং সঙ্কোচন-প্রসারণ রূপ স্পন্দন থেকে সঠিক দোলন কালের ব্যাখ্যা সহজেই করা চলে। পরীক্ষিত অন্যান্য তথ্যের কিন্তু যথাযথ মীমাংসা হলো না।

গোল্ড, উলাম এবং উল্‌ট্‌জার কোয়াসারস্-এর শক্তির উৎস সন্ধানে অন্য আর একটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত করলেন। তাঁরা ঘনসন্নিবিষ্ট কতকগুলি তারা দিয়ে গঠিত একটি তারা-মণ্ডলের কথা ভাবলেন। তাঁদের মতে, এই মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে তারায় তারায় ধাক্কাধাক্কি হবে খুবই এবং মণ্ডলটি এরই প্রভাবে ধসে পড়বে। তাঁদের হিসেবে শুধু মাত্র শক্তির মানই বোঝা গেল, তার বেশী অন্য কিছু নয়। সর্বশেষে আমরা আলোচনা করবো আল্‌ফ্‌ভেন এবং টেলার কর্তৃক বিরচিত মতবাদের। বিভিন্ন মৌলিক কণা এবং তাদের জুড়ি বিপরীত কণা বর্তমানে পরীক্ষিত সত্য। জানা গেছে, কোন মৌলিক কণা তার বিপরীত কণার সংস্পর্শে এসে পদার্থের বিলোপ (Annihilation of matter) ঘটে এবং পুরোপুরি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আল্‌ফ্‌ভেন এবং টেলার বলতে চান, বিশ্বে যেমন বস্তুকণা সমন্বিত গ্যালাক্সি রয়েছে, তেমনি হয়তো অসংখ্য অদৃশ্য অন্য এক ধরণের গ্যালাক্সিও রয়েছে, যারা বিপরীত বস্তুকণার দ্বারা গঠিত। এহেন বিপরীত-ধর্মী দুটি গ্যালাক্সির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটলে পদার্থের বিলোপজনিত শক্তির মান হবে অকল্পনীয়। কোয়াসারস্ কি এই ধরণের অভাবনীয় ঘটনার স্বাক্ষরস্বরূপ হতে পারে না? বিভিন্ন পরীক্ষিত তথ্য এবং বিভিন্ন আলোচনাকে কেন্দ্র করে স্মিড্‌ট্ এবং গ্রীনষ্টীন-কোয়াসারস্-এর একটি মডেলের পরিকল্পনা করেছেন। ৪নং চিত্র এবং তৎসংলগ্ন চিত্র পরিচিতিতে মডেলটি সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহারে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগবে—কোয়াসারস্ প্রসঙ্গে এত সব জল্পনা-কল্পনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেন? বিজ্ঞানীদের মতে, কোয়াসারস-গুলির সত্যিকারের স্বরূপ আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের যাথার্থ্য পরীক্ষিত সত্যের ভিত্তিতে পুনর্বার যাচাই করে নেবে। উপরন্তু কোয়াসারস্-এর সংখ্যা, দূরত্ব, বিশ্বের আঙ্গিনায় সমাবেশের ধারা ইত্যাদি নির্ভুলভাবে জানা গেলে বহুদিনের বিতর্কিত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে হয়তো বেশ একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। দশ হাজার মিলিয়ন বছর পূর্বে জমাট বাঁধা অতিকায় গ্যাসীয় বস্তুপিণ্ড কি সত্যি হঠাৎ একদিন বিস্ফোরণের ফলে প্রসরণশীল বিশ্বের (Expanding Universe) সৃষ্টি করেছিল? অথবা দৃশ্য বিশ্বের কোন আদি বা অন্ত নেই—অনাদি কাল থেকে যেমন ছিল, তেমন আছে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত তেমনি থাকবে। স্থিতিশীল (Steady state) বিশ্বে পদার্থের সৃষ্টি এবং লয়ের খেলা কি সমান তালেই চলছে কিংবা দুয়ের কোনটাই নয়? বিশ্বের প্রসারণ কি একদিন মহাকর্ষের বলে স্তিমিত হয়ে যাবে এবং বিশ্ব-পুনঃসঙ্কোচনশীল হবে অর্থাৎ বিশ্বের সংজ্ঞা হবে—

দোদুল্যমান বিশ্ব (Oscillating Universe)? বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস কোয়াসারস্-রহস্যকে হাতিয়ার করে হয়তো তাঁরা একদিন সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন। পৃথিবীর বহু দেশে আলো ও রেডিও-জ্যোতির্বিদ্যা-মানমন্দিরগুলিতে নিখুঁত ও শক্তিশালী যন্ত্রপাতির সাহায্যে কোয়াসারস্-এর দু-তরফা খোঁজাখুঁজির পালা, মাপজোকের কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। প্রখ্যাত তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীরা পরীক্ষিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে চিন্তার জাল বুনে যাচ্ছেন। গবেষণা-প্রবন্ধে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্মেলনে কবির লড়াইয়ের মত যুক্তির লড়াই চলছে। 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' ধ্বনি তুলে সত্যিকারের মুন্সীয়ানা দেখিয়ে কে কবে অন্য সবাইকে স্তম্ভিত করে দেবেন বলা মুস্কিল। এত কথা বলবার পর যদি কেউ সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন—কোয়াসারস্ কি? আমি কেন, বিশেষজ্ঞেরাও বলতে বাধ্য হবেন যে, সঠিক জানা নেই। কোয়াসারস্ প্রসঙ্গ এখনও কুয়াশাচ্ছন্ন—ঘোর কাটা দূরের কথা, আবরণ যেন আরো ঘনীভূত হচ্ছে।

"Horrid Quasars
Near or far,
This truth to you I must confess
My heart for you is full of hate.
O Super Star,
Imploded gas,
Exploded trash
You glowing speck upon a plate
Of Einstein's world you made a mess!"

J. L. Greenstein

ট্র্যানজিষ্টর

শ্যামসুন্দর দে

ট্র্যানজিষ্টর কথাটার সঙ্গে আমরা আজ সকলেই পরিচিত। পথে-ঘাটে চলতে-ফিরতে বিভিন্ন ধরণের ট্র্যানজিষ্টর রেডিও আমরা দেখতে পাই। ট্র্যানজিষ্টরের জনপ্রিয়তা যেন দিন দিন দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। এই ট্র্যানজিষ্টরের মূলে রয়েছে জার্মেনিয়াম ও সিলিকন নামে দুটি সেমিকণ্ডাক্টর ধাতুর কেলাস। বিশেষ অবস্থায় এই দুটি ধাতুর কেলাস থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণ করা যায়। যে সব কাজ ভ্যাকুয়াম টিউবের সাহায্যে করা হয়—আজকাল তাদের মধ্যে অনেকগুলিই ট্র্যানজিষ্টরের সাহায্যে সহজে ভালভাবে করা যায়। কিভাবে উপরের দুটি ধাতুর কেলাসকে এই ব্যাপারে কাজে লাগানো হয়, সে বিষয়ে এখন আলোচনা করা যাক।

পদার্থ-বিজ্ঞানের জগতে তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থের পরিচয় আমরা পাই। এক শ্রেণীর মধ্য দিয়ে তাপ ও বিদ্যুৎ অবাধে চলাচল করতে পারে—এদের বলা হয় পরিবাহী। আর এক শ্রেণীর পদার্থ আছে, যাদের মধ্য দিয়ে তাপ ও বিদ্যুৎ যাতায়াত করতে পারে না—তাদের বলা হয় অন্তরক বা অপরিবাহী। বাকী যে শ্রেণী রইলো, তাদের প্রকৃতি পরিবাহী ও অন্তরকের মাঝামাঝি। এদের বলা হয় সেমিকণ্ডাক্টর। এই জাতীয় পদার্থ কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় এদের মধ্য দিয়ে তাপ ও বিদ্যুৎ চলাচলে সাহায্য করে।

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি বস্তু গঠনের মূলে আছে পরমাণু। পরমাণুর মাঝখানে আছে কেন্দ্রীন—যা সাধারণতঃ প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে তৈরি। কেন্দ্রীনের চারদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে প্রোটনের সমান সংখ্যক ইলেকট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যায় কেন্দ্রীন থেকে বিভিন্ন দূরত্বে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে থাকে। কেন্দ্রীন থেকে যতই দূরের কক্ষপথে যাওয়া যায়, ততই ইলেকট্রন ও কেন্দ্রীনের মধ্যে বন্ধন-শক্তি কমতে থাকে। একেবারে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলি স্বভাবতঃই আলগাভাবে বাঁধা থাকে। এই ইলেকট্রনগুলিকে বলা হয় যোজ্যতা ইলেকট্রন। বস্তুর রাসায়নিক ধর্ম, বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম এই বহিঃস্তরের ইলেকট্রনের কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে।

পরিবাহী পদার্থে ইলেকট্রনগুলি আলগাভাবে পরমাণুর সঙ্গে বাঁধা থাকে। এছাড়া পরিবাহী পদার্থে কিছু মুক্ত ইলেকট্রনও এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়। বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে মুক্ত ইলেকট্রনগুলি একমুখী হয়ে পরিচালিত হয়, ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। অপরিবাহী পদার্থে ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীনের সঙ্গে শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এই জাতীয় পদার্থে মুক্ত ইলেকট্রনও থাকে না। কাজে কাজেই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগে এদের মধ্যেকার ইলেকট্রনগুলিকে পরিচালনা করা যায় না।

জার্মেনিয়াম বা সিলিকন, পূর্বে বর্ণিত তৃতীয় শ্রেণীর বা সেমিকণ্ডাক্টর পদার্থের মধ্যে পড়ে। ট্র্যানজিষ্টর তৈরির মূলে আছে এই সেমিকণ্ডাক্টর।

উপরের তিন শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্যটা শক্তি-পাড় তত্ত্ব (Energy Band Theory) দিয়ে খুব ভাল করে বোঝা যেতে পারে।

ইলেকট্রনগুলি যে সব কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়, তাদের প্রত্যেকটা কক্ষই একটা নির্দিষ্ট শক্তির মাত্রায় থাকে। বিজ্ঞানী পাউলির পরিবর্জন-নীতি অনুযায়ী কোন পরমাণুতে পরস্পর বিপরীত ঘূর্ণন বিশিষ্ট (Spin) দুটির বেশী ইলেকট্রন একই শক্তিমাত্রা বা শক্তিস্তরে থাকতে পারে না। সাধারণতঃ কেন্দ্রীনের কাছাকাছি শক্তিস্তরগুলি ইলেকট্রনের দ্বারা ভর্তি থাকে এবং দূরের স্তরগুলি খালি থাকে। একই ধরণের কয়েকটা পরমাণু যখন সংলগ্ন হয়, তখন যতগুলি পরমাণু সংলগ্ন হয়েছে, প্রত্যেকটি শক্তিস্তর ঠিক ততগুলি স্তরে ভেঙ্গে যায়। কঠিন পদার্থের মধ্যে অসংখ্য পরমাণু এক সঙ্গে থাকে। তাই অসংখ্য শক্তি-স্তর এক হয়ে শক্তি-পাড় তৈরি করে। কেন্দ্রীনের কাছের শক্তি-পাড়ে ইলেকট্রন ভর্তি থাকে এবং দূরের শক্তি-পাড় ইলেকট্রন-শূন্য থাকে। কোন ইলেকট্রনকে কেন্দ্রীনের নিকটতম কক্ষ থেকে দূরের কক্ষে নিয়ে যেতে শক্তির দরকার হয়। ইলেকট্রন-ভর্তি ও ইলেকট্রন-শূন্য শক্তি-পাড়ের মধ্যে পরস্পর শক্তির পার্থক্যের উপরই পদার্থের শ্রেণী নির্ভর করে এবং ভর্তি থেকে শূন্যে শক্তি-পাড়ে ইলেকট্রনগুলির যাওয়ার উপরেই পদার্থের পরিবাহিতা নির্ভর করে। পরিবাহী পদার্থে ভর্তি ও শূন্য শক্তি-পাড়ের মধ্যে শক্তির পার্থক্য থাকে না। কাজে কাজেই অতি সহজে ইলেকট্রন এক শক্তি-পাড় থেকে অন্য শক্তি-পাড়ে যেতে পারে। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগে ইলেকট্রনগুলি এক দিকে চালিত হয়। অপরিবাহী পদার্থে ভর্তি ও শূন্য শক্তি-পাড়ের মধ্যে শক্তির পার্থক্য খুবই বেশী, যার জন্যে কোন ইলেকট্রন ভর্তি থেকে শূন্য শক্তি-পাড়ে যেতে পারে না। তাই এই শ্রেণীর পদার্থের পরিবহন-ক্ষমতা প্রায় নেই। সেমি-কণ্ডাক্টরে ভর্তি ও শূন্য শক্তি-পাড়ের মধ্যে শক্তির পার্থক্য পরিবাহী পদার্থের তুলনায় কিছুটা বেশী। তাই যে সব ইলেকট্রনের শক্তি বেশী, তারাই কেবল শূন্য পাড়ে লাফ দিতে পারে। যাদের শক্তি কম, তারা লাফিয়ে ভর্তি থেকে শূন্য পাড়ে যেতে পারে না। সেমিকণ্ডাক্টর তাই অল্পপরিবাহী।

সেমিকণ্ডাক্টরের মধ্যে প্রধান হচ্ছে জার্মেনিয়াম। ট্র্যানজিষ্টর প্রধানতঃ এই জার্মেনিয়াম কেলাস দিয়ে তৈরি হয়। পর্যায়-সারণীতে জার্মেনিয়াম চতুর্থ গ্রুপে আছে। এই পরমাণুর বাইরের কক্ষে আছে চারটি ইলেকট্রন—যাদের বলা হয় যোজ্যতা-ইলেকট্রন। আগেই বলা হয়েছে যে, যোজ্যতা ইলেট্রনের উপরেই বিদ্যুৎ পরিবহন, রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রভৃতি নির্ভর করে। এরা একই রকম অন্যান্য পরমাণুর ইলেকট্রনের সঙ্গে যোজ্যতা বন্ধনীতে আবদ্ধ হয় এবং পরে কেলাসের আকার ধারণ করতে পদার্থকে সাহায্য করে। বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামে কেলাসের অণুগুলি পরমাণু দিয়ে একটা সুন্দর বিন্যাসে সজ্জিত থাকে। কেলাসিত অবস্থায় কোন মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না, ফলে কোন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিদ্যুৎ-প্রবাহ তৈরি করতে পারে না। অতএব সাধারণ অবস্থায় কেলাসটি বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়। এই অবস্থায় কোন প্রকার শক্তির দ্বারা কিছু সংখ্যক ইলেকট্রনকে যোজ্যতা বন্ধনী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেই কেলাসটি বিদ্যুৎ-পরিবাহী ধর্ম পেতে পারে। এর জন্যে যা শক্তি লাগে, জার্মেনিয়াম ধাতুর ক্ষেত্রে তার মান ০'৭৫ ইলেকট্রন ভোল্ট। তাপ প্রয়োগ করলে কেলাসের ল্যাটিসের কম্পন বাড়তে থাকে এবং এই অবস্থায় কিছু ইলেকট্রন প্রয়োজনীয় শক্তি গ্রহণ করে যোজ্যতা বন্ধনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেলাসের ল্যাটিসের ভিতরে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করে। তখন বাইরে থেকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে এই সব মুক্ত ইলেকট্রন একদিকে বাহিত হয়। এভাবে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় ইলেকট্রন-বাহিত বিদ্যুৎ-প্রবাহ।

আবার যোজ্যতা-বন্ধনী থেকে মুক্ত হয়ে যে জায়গা থেকে ইলেকট্রন আসে, সেখানে একটা ছিদ্রের (Hole) কল্পনা করা যেতে পারে। অন্য কোন ইলেকট্রন এই ছিদ্রে এসে পড়লে সেই ইলেকট্রনের জায়গায় নতুন ছিদ্রের উৎপত্তি হয়; অর্থাৎ ছিদ্রটি যেন অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হলো। এভাবে সব কেলাসের মধ্যে ইলেকট্রনগুলি এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়। এই ছিদ্রগুলিকে ধনাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন বলে কল্পনা করা যায়। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে ছিদ্রগুলি ধনাত্মক ক্ষেত্রের দিকে বাহিত হয়। এভাবে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়, তাকে ছিদ্র-বাহিত বিদ্যুৎ-প্রবাহ বলা হয়। তাহলে দেখা গেল যে, খাঁটি সেমিকণ্ডাক্টরে বাহিত বিদ্যুৎ-প্রবাহ—দুই হতে পারে। এখানে সব সময়েই ইলেকট্রন-সংখ্যা ও ছিদ্রের সংখ্যা এক থাকে।

একটা খাঁটি সেমিকণ্ডাক্টর কেলাসে অনেক পরমাণুর মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণ (প্রতি দশ লক্ষ সেমিকণ্ডাক্টর পরমাণুর সঙ্গে মাত্র একটা পরমাণু) অন্য কোন ধাতু খাদ হিসেবে মেশালে সেমিকণ্ডাক্টর কেলাস উপরের মত বিন্যস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে; বরং আগের তুলনায় এই অবস্থায় সেমিকণ্ডাক্টরে ছিদ্র ও ইলেকট্রনের ঘনত্ব বেড়ে যায়।

জার্মেনিয়াম বা সিলিকন সেমিকণ্ডাক্টরের পরমাণু চতুর্যোজী। এদের বাইরের কক্ষে চারটি করে যোজ্যতা ইলেকট্রন আছে। জার্মেনিয়াম ও সিলিকন পরমাণুর কাছাকাছি পরমাণুগুলির কেন্দ্রীনের চারদিকে সবচেয়ে বাইরের কক্ষে তিনটি কিংবা পাঁচটি করে যোজ্যতা ইলেকট্রন থাকে। তিনটি যোজ্যতা ইলেকট্রনবিশিষ্ট পরমাণুগুলির মধ্যে আছে গ্যালিয়াম, বোরন, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি পরমাণু এবং পাঁচটি যোজ্যতা ইলেকট্রনবিশিষ্ট পরমাণুগুলির মধ্যে আছে আরসেনিক, অ্যান্টিমনি, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি পরমাণু। এই সকল মৌলিক পদার্থের একটা পরমাণুকে খাঁটি জার্মেনিয়াম সেমিকণ্ডাক্টরের মধ্যে প্রবেশ করালে ঐ পরমাণু একটা জার্মেনিয়াম পরমাণুর জায়গা দখল করে নেয়। বাইরের কক্ষে তিনটি ইলেকট্রনবিশিষ্ট পদার্থ, যেমন বোরনের কথা ধরা যাক, বোরনের একটা পরমাণু জার্মেনিয়াম বা সিলিকনের অসংখ্য পরমাণুর ভিতরে প্রবেশ করালে বোরন পরমাণুর তিনটি যোজ্যতা ইলেকট্রন যোজ্য বন্ধনীতে কেলাসের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু একটা ইলেকট্রনের স্থান শূন্য থাকে। ঐ শূন্য স্থানে একটা ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। বোরন এভাবে একটা বাড়্‌তি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বলে একে গ্রহীতা বলা হয় এবং এই জাতীয় খাদ মেশানো জার্মেনিয়ামকে বলা হয় পি-টাইপ সেমিকণ্ডাক্টর। আগের মত বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে এই জাতীয় কেলাসে ছিদ্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয়। এবার পাঁচটি যোজ্যতা ইলেকট্রনবিশিষ্ট পরমাণু আর্সেনিকের কথা ধরা যাক। যখন আর্সেনিকের একটা পরমাণু সিলিকন বা জার্মেনিয়াম কেলাসে স্থান দখল করে, তখন আর্সেনিকের পাঁচটি যোজ্যতা ইলেকট্রনের মধ্যে চারটি ইলেকট্রন জার্মেনিয়াম বা সিলিকন কেলাসের পরমাণুর ইলেকট্রনের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং ফলে একটা বাড়্‌তি ইলেকট্রন মুক্ত হয়। এখানে আর্সেনিক একটা বাড়্‌তি ইলেকট্রন দিচ্ছে বলে একে বলা হয় দাতা। এক্ষেত্রে জার্মেনিয়াম কেলাস বাড়্‌তি ইলেকট্রন বহন করে বলে একে বলা হয় এন-টাইপ সেমিকণ্ডাক্টর। এই রকম খাদ মেশানো কেলাসে গ্রহীতা পরমাণু থেকে একটা ছিদ্র ভর্তি করতে বা দাতা পরমাণু থেকে একটা ইলেকট্রন ভর্তি করতে প্রায় ০·০১ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি লাগে। অন্যদিকে খাঁটি জার্মেনিয়ামে একটা ইলেকট্রন-ছিদ্র জোড়াতে এক শক্তি-পাড় থেকে

পাশের শক্তি-পাড়ে আনতে ০·৭ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি লাগে। কাজেই খাঁটি জার্মেনিয়ামের তুলনায় খাদযুক্ত জার্মেনিয়ামে পরিবহন-ক্ষমতা যে কতগুণ বেশী, তা বোঝা যাচ্ছে। এই খাদযুক্ত জার্মেনিয়াম বা সিলিকন দিয়েই সাধারণতঃ ট্র্যানজিষ্টর তৈরি করা হয়।

ট্র্যানজিষ্টর সাধারণতঃ দুই রকমের হয় (ক) বিন্দুস্পর্শী ট্র্যানজিষ্টর ও (খ) জাংশন ট্র্যানজিষ্টর। ১৯৪৮ সালে বেল টেলিফোন লেবরেটরীতে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী বারডীন এবং ব্রাডেয়েন প্রথম ট্র্যানজিষ্টরের কথা ঘোষণা করেন। তাঁদের তৈরি ট্র্যানজিষ্টর (ক) শ্রেণীভুক্ত। কিছুকাল পরে ঐ লেবরেটরীতেই বিজ্ঞানী উইলিয়াম শক্‌লি (খ) শ্রেণীর ট্র্যানজিষ্টর তৈরি করেন।

জাংশন ট্র্যানজিষ্টর ডায়োড বা ট্রায়োড ভ্যাকুয়ম টিউবের মত কাজ করতে পারে। পি-টাইপ কেলাসের সঙ্গে একটা এন-টাইপ কেলাস পাশাপাশি রাখলে একটা পি-এন জাংশন পাওয়া যায়। রেডিও বর্তনীতে তা ভাল পরিশোধক হিসেবে কাজে লাগে। পরিশোধকের ভূমিকায় পি. এন. জাংশন বিদ্যুৎ-প্রবাহে আশু বাধা দেয় এবং বিপরীত দিকে প্রবল বাধা দেয়। পি-টাইপ জার্মেনিয়ামে যতটা ফাঁকা জায়গা (ছিদ্র) থাকে, এন-টাইপে ঠিক ততগুলি মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। এই দুই ধরণের সেমিকণ্ডাক্টরকে পাশাপাশি রাখা হলে পি-টাইপের মধ্যে ইলেকট্রন এসে জমা হয়ে সীমানার ধারে সংযোগস্থলে ভীড় করে। সংযোগস্থলে একই আধানযুক্ত কণা থাকবার জন্যে খুব বেশী ইলেকট্রন পি-টাইপে ঢুকতে পারে না। এর ফলে পি-টাইপের সংযোগস্থলে একটা ঋণ বিভবের সৃষ্টি হয়। তেমনি এন-টাইপে অতিরিক্ত ধন আধান জমা হয়ে সংযোগস্থলে একটা ধন বিভব তৈরি করে। এখন যদি কোন পরিবর্তী প্রবাহের দুই প্রান্তকে পি-টাইপ ও এন-টাইপের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তখন পর্যায়ক্রমে পি-টাইপ ও এন-টাইপ জার্মেনিয়াম পরস্পর বিপরীত বিভববিশিষ্ট হয়; অর্থাৎ এই অবস্থায় পি-টাইপ ও এন-টাইপ জার্মেনিয়ামকে পর্যায়ক্রমে বিপরীত আধানের সঙ্গে যুক্ত করা হলো। যে সময় পি-টাইপে ঋণ বিভব ও এন-টাইপে ধনবিভব আপতিত হয় তখন সংযোগস্থলে প্রতিরোধ আরও বেড়ে যাবে। আর যে সময় পি-টাইপে ধন বিভব ও এন-টাইপে ঋণ বিভব আপতিত হয়, তখন সংযোগস্থলে প্রতিরোধ কমে যায়। ফলে ইলেকট্রন সংযোগস্থল দিয়ে ভালভাবে যেতে পারে। এই অবস্থায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এই জাতীয় সেমিকণ্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে মাত্র একদিকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয় এবং অন্য দিকে হয় না বললেই চলে। এই ভাবেই সেমিকণ্ডাক্টরের সাহায্যে পরিবর্তি প্রবাহকে পরিশোধন করা হয়। ভ্যাকুয়াম টিউব ডায়োডের মত উপরে দ্বিপদবিশিষ্ট জার্মেনিয়ামের কার্যকারিতার কথা বলা হলো।

ট্রায়োড ভাল্‌ব যেমন অল্প বিদ্যুৎ-শক্তিকে পরিবর্ধন করতে পারে, ট্র্যানজিষ্টরকেও ঠিক তেমনিভাবে বিদ্যুৎ-পরিবর্ধকের উপযোগী করে তোলা যেতে পারে। এই জাতীয় ট্র্যানজিষ্টরের মধ্য দিয়ে এন অথবা পি কেলাসের ট্র্যানজিষ্টরের দু-পাশে যথাক্রমে দুটি পি অথবা এন কেলাস থাকে। এদের সাধারণতঃ পি-এন-পি অথবা এন-পি-এন ট্র্যানজিষ্টর বলা হয়। পি-এন-পি অথবা এন-পি-এন-এর প্রথম কেলাসকে বলা হয় এমিটার, মাঝেরটাকে বলা হয় বেস এবং শেষেরটাকে বলা হয় কালেক্টর। ট্রায়োড ভাল্‌বের ক্যাথোড, গ্রীড ও অ্যানোডের সঙ্গে এদের কার্যকারিতা তুলনা করা যেতে পারে। একটা এন-পি-এন ট্র্যানজিষ্টরে তড়িৎ-কোষের দুই

প্রান্ত দুই দিকের এন অঞ্চলে যোগ করলে ইলেকট্রন প্রথম এন-কেলাস থেকে পি-কেলাস ভেদ করে দ্বিতীয় এন-কেলাসে চলে যায়। পি-এন-পি ও এন-পি-এন-এর মধ্যে আসলে খুব বেশী তফাৎ নেই। কেবলমাত্র এখানে বাইরের তড়িৎ-বিভব, বিদ্যুৎ-প্রবাহ, ছিদ্র ও ইলেকট্রন বিপরীত হয়ে থাকে।

বিন্দুস্পর্শী ট্র্যানজিষ্টর পি-টাইপ ও এন-টাইপ জার্মেনিয়াম কেলাস দিয়ে তৈরি হয়। এই ট্র্যানজিষ্টরে এন-টাইপ কেলাসের মধ্যে দুটি তার পাশাপাশি প্রবেশ করানো থাকে। তার দুটির ঠিক নীচেই পি-টাইপ কেলাস থাকে। তার দুটির একটিকে বলা হয় এমিটার ও অন্যটিকে বলা হয় কালেক্টর এবং কেলাসটিকে বলা হয় বেস। বিন্দুস্পর্শী ট্র্যানজিষ্টরে এমিটার ও কালেক্টারের সীমারেখায় দুটি পি-এন জাংশন পরিশোধকের সৃষ্টি হয়। বিন্দুস্পর্শী এবং জাংশন ট্র্যানজিষ্টর তৈরি যেমন বিভিন্ন উপায়ে হয়, তেমনি এদের ব্যবহারিক প্রয়োগও বিভিন্ন। বিন্দুস্পর্শী ট্র্যানজিষ্টর সাধারণতঃ উচ্চ কম্পনাঙ্ক-বিশিষ্ট বর্তনীতে ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় ট্র্যানজিষ্টর ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্যুৎ-প্রবাহে ঋণ রোধের সৃষ্টি করে অর্থাৎ বিভব বাড়ালে এর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বাড়বার বদলে কমে যায়। এই বিশেষত্বের জন্যে এটা গণনাকারী যন্ত্র ও স্পন্দন-উৎপাদক বর্তনীতে লাগানো হয়।

সাধারণ একটা ট্র্যানজিষ্টরের মাপ হচ্ছে ·৬"×·৩"×·২" ট্র্যানজিষ্টর ইলেকট্রনিক ভাল্‌বের ন্যায় গুণসম্পন্ন হবার দরুণ এই ছোট আকারের ট্র্যানজিষ্টর দিয়ে ভাল্‌বসমন্বিত ইলেকট্রনিক যন্ত্রের আয়তন খুব সহজেই কমিয়ে ফেলা যায়। কার্যক্ষমতা অব্যাহত রেখে এবং ট্র্যানজিষ্টরের ছোট আকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ, যেমন—কনডেন্সার, ট্র্যান্সফরমার প্রভৃতির আকার খুব ছোট করা সম্ভব হয়েছে। কম্পিউটার বা গণনকারী যন্ত্রে অসংখ্য ভাল্‌ব লাগে। সাধারণ একটা ট্র্যানজিষ্টরের জীবন প্রায় ১০০,০০০ ঘণ্টা—একটা রেডিও ভাল্‌বের জীবন অপেক্ষা তা অনেক বেশী। ভাল্‌বের বদলে ট্র্যানজিষ্টরের ব্যবহার করে গণনকারী যন্ত্রকে একসঙ্গে বেশী দিন চালু রাখা যায় এবং আকারেও ছোট করা যায়। ভাল্‌ব সমন্বিত গণনাকারী যন্ত্রের অসংখ্য ভাল্‌বের ফিলামেন্ট গরম হবার জন্যে শক্তি সরবরাহ করা এবং এগুলি উত্তপ্ত হওয়ার ফলে তাপ বিকিরণের ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য নয়। ট্র্যানজিষ্টর ব্যবহারে এসব অসুবিধা দূর হয়ে গেছে। তবে রেডিও ভাল্‌বের বদলে ট্র্যানজিষ্টর কাজ করলেও রেডিও ভাল্‌বের এমন অনেক প্রয়োগ-ক্ষেত্র আছে, যেখানে ট্র্যানজিষ্টর ব্যবহারের সম্ভাবনা আদৌ নেই। তাই ট্র্যানজিষ্টর থাকা সত্ত্বেও রেডিও ভাল্‌বের সমাদর অব্যাহত না থাকবার কারণ নেই।

ট্র্যানজিষ্টর আবিষ্কারে ইলেকট্রনিক রাজ্যে অনেক কিছুর আবরণ উন্মোচিত হয়েছে। যেখানে বিদ্যুৎ নেই, সেখানে ট্র্যানজিষ্টর তৈরি ইলেক-ট্রনিক যন্ত্র অভাব পূরণ করে। ফুটবল-ক্রিকেট মাঠে, পিকনিক পার্টিতে ট্র্যানজিষ্টরের তৈরি বেতার গ্রাহক-যন্ত্র আজ আমাদের আনন্দ বর্ধন করে। ছোট আকারের বেতার গ্রাহক যন্ত্র,

প্রেরক-যন্ত্র, টেলিভিসন আজ ট্রানজিষ্টর দিয়ে তৈরি হচ্ছে। আজকাল ট্রানজিষ্টর সোলার রেডিও বেরিয়েছে। এই যন্ত্রকে সূর্যের আলোয় কিছুক্ষণ রেখে দিলে প্রায় পাঁচ-শ' ঘণ্টা অন্ধকারে কর্মক্ষম থাকে। তাছাড়া সেমিকণ্ডাক্টরের তৈরি অ্যাটমিক ব্যাটারীও বেরিয়েছে—যা পঁচিশ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ট্রানজিষ্টরের ক্যাপসুল প্রয়োগ আজ বহুদেশেই প্রচলিত হয়েছে। ট্রানজিষ্টরের আবিষ্কার ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে।

"দূরদূরান্ত বহিয়া আকাশের সুর ধ্বনিত হইতেছে। মনে কর, কোন অদৃশ্য অঙ্গুলি বৈদ্যুতিক অর্গ্যানের বিবিধ ষ্টপ আঘাত করিতেছে। বামদিকের ষ্টপে আঘাত করাতে এক সেকেণ্ডে একটি স্পন্দন হইল। অমনি শূন্যমার্গে বিদ্যুতোর্মি ধাবিত হইল। কি প্রকাণ্ড সেই সহস্র ক্রোশব্যাপী ঢেউ। উহা অনায়াসে হিমাচল উল্লঙ্ঘন করিয়া এক সেকেণ্ডে পৃথিবী দশবার প্রদক্ষিণ করিল। এবার অদৃশ্য অঙ্গুলি দ্বিতীয় ষ্টপ আঘাত করিল। এইবার প্রতি সেকেণ্ডে আকাশ দশবার স্পন্দিত হইল। এইরূপে আকাশের সুর ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতরে উঠিবে; স্পন্দনসংখ্যা এক হইতে দশ, শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি গুণ বৃদ্ধি পাইবে। আকাশ-সাগরে নিমজ্জমান রহিয়া আমরা অগণিত ঊর্মি দ্বারা আহত হইব, কিন্তু ইহাতেও কোন ইন্দ্রিয় জাগরিত হইবে না। আকাশ-স্পন্দন আরও ঊর্দ্ধে উঠুক তখন কিয়ৎক্ষণের জন্য তাপ অনুভূত হইবে। তাহার পর চক্ষু উত্তেজিত হইয়া রক্তিম, পীতাদি আলোক দেখিতে পাইবে। এই দৃশ্য আলোক এক সপ্তক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। সুর আরও উচ্চে উঠিলে দৃষ্টিশক্তি পুনরায় পরাস্ত হইবে, অনুভূতি শক্তি আর জাগিবে না, ক্ষণিক আলোকের পরই অভেদ্য অন্ধকার।

তবে ত আমরা এই অসীমের মধ্যে একেবারে দিশাহারা, কতটুকুই বা দেখিতে পাই? একান্তই অকিঞ্চিৎকর! অসীম জ্যোতির মধ্যে অন্ধবৎ ঘুরিতেছি এবং ভগ্ন দিক-শলাকা লইয়া পাহাড় লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হে অনন্ত পথের যাত্রী, কি সম্বল তোমার?

সম্বল কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস; যে বিশ্বাস বলে প্রবাল সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞান-সাম্রাজ্য এইরূপ অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়া আরম্ভ, আঁধারেই শেষ, মাঝে দুই একটি ক্ষীণ আলো-রেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায় বলে ঘন কুয়াসা অপসারিত হইবে এবং একদিন বিশ্বজগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর—১৯৬৮

২১শ বর্ষ : ৯ম-১০ম সংখ্যা

মালয় অঞ্চলের উড়ুক্কু টিকটিকি। এরা গাছের খুব উঁচু ডালে বিচরণ করে। দেহের উভয় দিকের পাতলা চামড়া ডানার মত প্রসারিত করে বাতাসে ভেসে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করে।

করে দেখ

কেমন করে খোলা যায় ?

টপোলজি নামে জ্যামিতির একটি শাখা আছে। নানা রকমের গ্রন্থি ও সংযোজন-পদ্ধতিই এই শাখার আলোচ্য বিষয়। টপোলজির এরূপ একটি সংযোজন বা গ্রন্থি-উন্মোচনের কথাই আজ তোমাদের বলবো। এটি দেখিয়ে বন্ধুদের মধ্যে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করতে পারবে।

একগাছা সরু দড়ির দুই প্রান্ত একজনের দুই হাতের কব্জিতে গেরো দিয়ে বেঁধে দাও। এর দু-হাতে বাঁধা দড়ির ভিতর দিয়ে গলিয়ে আর একগাছা দড়ির দুই প্রান্ত অপর একজনের দুই হাতের কব্জিতে বেঁধে দিতে হবে। এর ফলে দুজনেই দড়ির প্যাঁচে আট্‌কা পড়ে যাবে। কিভাবে দড়ি বাঁধতে হবে, ছবিটি দেখলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

সমস্যাটা হলো—দড়ি না কেটে বা গেরো না খুলে দড়ির প্যাঁচে আট্‌কানো লোক দুটি কেমন করে পরস্পরের সংযোগ থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারবে।
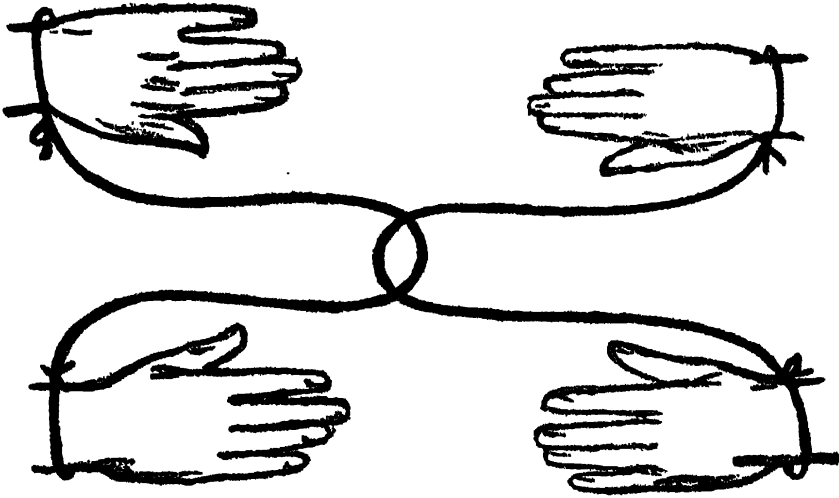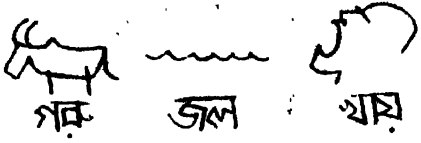
প্রথম দৃষ্টিতে সমস্যাটা জটিল মনে হলেও আসলে কিন্তু এর সমাধানটা খুবই সহজ। একজনের হাতে-বাঁধা দড়ির মধ্যস্থলটা অপর লোকটির কব্জির বাঁধনের নীচ দিয়ে টেনে এনে সেটাকে হাতের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে আবার বাঁধনটার নীচ দিয়ে টেনে আনলেই দেখবে, প্যাঁচ খুলে গেছে। তখন দু-জনেই পরস্পরের কাছ থেকে অনায়াসে আলাদা হয়ে যেতে পারবে।

বাংলা অক্ষরের জন্মকথা

[এই প্রবন্ধের একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। কাফী খাঁ ১৯৬০ সালে নিমন্ত্রিত হয়ে যখন আমেরিকায় যান, তখন সেখানকার একটি ছোট্ট সহরে (হোয়াইটহল, নিউইয়র্ক, ক্যানাডার কাছে) অক্টোবর মাসে তাঁকে একটি ছেলেদের স্কুলে ছোটদের ক্লাসে হেডমাষ্টারের অনুরোধে ছবি আঁকার কথা বলতে হয় এবং সেই উপলক্ষে ছেলেদের বুঝিয়ে দেন, কেমন করে মানুষ প্রথম যুগে ছবি এঁকে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতো—যার ফলে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মী অক্ষর ইউরোপ, এশিয়া সব ঘুরে শেষে ভারতে ক্রমে ক্রমে এখনকার 'অ' এর চেহারা নিয়েছে। কাফী খাঁর বক্তৃতা শেষ হবার পরেই সারা সহরের ছেলেদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়—ভারত থেকে এক ভদ্রলোক এসে ওদের বুঝিয়েছেন, প্রথমে অক্ষর কেমন করে ছবি থেকে পৃথিবীর সর্বত্র এখনকার অক্ষরে রূপান্তরিত হয়েছে। স.]

তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, পৃথিবীর সব অক্ষরই আসলে কতকগুলি ছবি। যেমন, ইংরেজী 'A' বা আমাদের 'অ' হচ্ছে সংস্কৃত অজ শব্দ থেকে, কারণ শুনবে?

ইংরেজী 'A' অক্ষরটাকে দেখো দেখি। দেখবে, ওটা ঠিক উল্টে দেখলে ∀ ছাগলের মুণ্ডুর মত দেখায়।

আচ্ছা, এবার আমাদের বাংলা অক্ষর কেমন করে হলো, সে কথাই তোমাদের বলছি। এই যে অ, আ, ক, খ অক্ষরগুলি এর আদিম চেহারার নাম হচ্ছে ব্রাহ্মী

অক্ষর; অর্থাৎ দেবতা ব্রহ্মা থেকে এর জন্ম হয়েছে। এই ব্রাহ্মী অক্ষরের প্রথম নমুনা কোথায় পাওয়া গেল জান? এর প্রথম নমুনা পাওয়া গেছে সম্রাট অশোকের

শিলালিপি থেকে। যদি চাও, তবে তোমরা দেখে এসো এর কিছু নমুনা Indian museum-এর বারহুত স্তূপের রেলিংয়ের গায়ের খোদাই থেকে।

এবার আমরা বাংলা হরপের কথাই বলবো। এই ছবিতে তোমরা অ, আ থেকে হ পর্যন্ত বাংলা অক্ষরগুলি ও তাদের যুগে যুগে পরিবর্তন দেখতে পাবে। কেমন করে এরা এখনকার অ, আ, ক, খ হয়ে গেছে, জিনিষটা দেখতে কিন্তু ভারী মজা লাগে। এই প্রত্যেকটা অক্ষরের যে চার-পাঁচটা রকম দেখানো হয়েছে, সেগুলি কিন্তু এক-একটা ঐতিহাসিক যুগের অক্ষর। যেমন—প্রথমটা হচ্ছে মৌর্য যুগের সময়কার। অশোকের শিলালিপি এই অক্ষরেই লেখা। তারপরের কলমগুলি হচ্ছে কুষাণ কণিষ্ক রাজার যুগের। তার পরেরটা গুপ্ত বিক্রমাদিত্য, হর্ষবর্ধনের সময়কার। এই রকম করে পাল, সেন, পাঠান, মোগল আমল পর্যন্ত। আজকালকার যে অক্ষর আমরা ব্যবহার করি, সেগুলি ছাপাখানা হবার পর তৈরি হয়েছে।

একটা জিনিষ তোমরা ছবিটা দেখলেই বুঝবে। সেটা হচ্ছে এই যে—হ্রস্ব, দীর্ঘ বা ঙ, ঋ, ঌ, ঐ, ঔ এই সব অক্ষর ব্রাহ্মী আমলে ছিল না। কারণ, মানুষ তখন খুব মাজাঘষা ভাষা ব্যবহার করতো না। এই অক্ষরগুলি পরে হয়েছে।

এবার তোমাদের ব্রাহ্মী অক্ষরে কেমন করে মাত্রা এলো ও আকার, ইকার সংযুক্ত অক্ষর হলো, সে সব দেখিয়ে দিচ্ছি—ছবিতে। এই সব থেকেই তোমরা বেশ সহজেই ব্রাহ্মী অক্ষর দিয়ে তোমাদের নামধাম বইয়েতে লিখতে পারবে। সেটা খুব মজার জিনিষ হবে। কারণ, তোমাদের লেখা নাম তোমাদের বাবা, মা কেউ বুঝতে পারবে না।

তোমরা নিশ্চয়ই পার্ক ষ্ট্রীটে এশিয়াটিক সোসাইটির নতুন বাড়ীটা দেখেছ। সেই বাড়ীর আয়নার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে গেলেই দেখবে, এশিয়াটিক সোসাইটির নামধাম সব ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা।

এবার তোমরা এই ছবি দুটি ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা শেখবার জন্যে কেটে রেখে দিও।

কাকা খাঁ

জেনে রাখ

লবণ পৃথিবীর সাধারণ একটি খনিজ পদার্থ। কিন্তু বহু শতাব্দী যাবৎ লবণের গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। প্রাচীন যুগে অপরাধীকে লবণহীন খাদ্য দেওয়া হতো। এটাও এক ধরণের কঠিন শাস্তি ছিল। ইংরেজী Salary কথাটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ Salarium থেকে। Salarium মানে হলো 'লবণের টাকা'। রোমান সৈন্যদের লবণ কেনবার জন্যে এই ভাতা দেওয়া হতো। ইটালীর একটা রাস্তার নাম হলো Viasalaria, অর্থাৎ লবণের রাস্তা। ঐ রাস্তা দিয়ে প্রচুর লবণ আমদানী-রপ্তানী হতো। মধ্যযুগে ইউরোপে সামাজিক পদমর্যাদা স্থির হতো লবণের মাপকাঠিতে। যিনি সামাজিক মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতেন, তিনিই টেবিলে রক্ষিত লবণের উপরের দিকে বসতেন। প্রাচীন কালে একসঙ্গে বসে লবণ খেয়ে বন্ধুত্ব করা হতো। আমাদের সমাজেও লবণ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে; যেমন—নুন খাই যার গুণ গাই তার; 'নিমকহারাম', 'লবণ জ্ঞান নেই' ইত্যাদি। এথেকে বোঝা যায়, মানবসমাজের সঙ্গে লবণ কিরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাগর, মহাসাগর, হ্রদ এবং খনিতে লবণ পাওয়া যায়। এক সময় লবণের জন্যে যুদ্ধও হয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলে নতুন রাস্তা এবং সহরেরও উৎপত্তি ঘটেছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যে এক সময়ে লবণকে টাকা হিসাবে গণ্য করা হতো।

পৃথিবীর দুই প্রতিবেশী

তোমরা সবাই জান, আমাদের সৌরজগতে নয়টি গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে—তাদের নাম, (সূর্য থেকে) যথাক্রমে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। তাহলে আমাদের পৃথিবী গ্রহের দুই প্রতিবেশী গ্রহ হলো—সূর্যের দিকে শুক্র, আর উল্টো দিকে মঙ্গল।
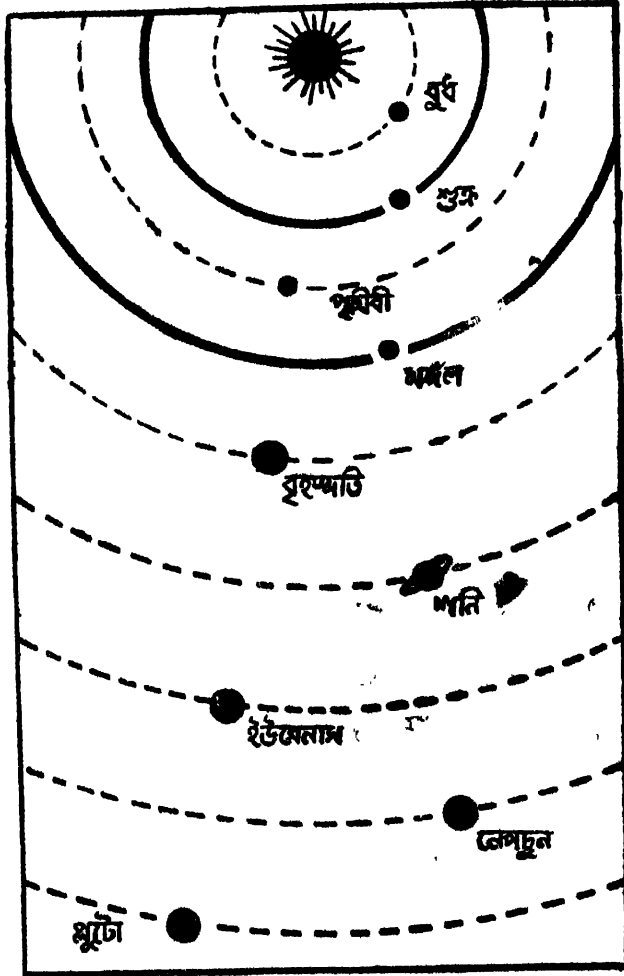
সৌরপরিবারে প্রাণসৃষ্টির উপযোগী অঞ্চল মোটা লাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে।

সূর্য থেকে শুক্রের দূরত্ব (গড়পড়তা হিসাবে) ৬ কোটি মাইল, পৃথিবীর দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ, আর মঙ্গলের ১৪ কোটি মাইল। আমাদের শুক্র ও মঙ্গল সম্পর্কে বিশেষ

করে কৌতূহল—কারণ, সৌরজগতে পৃথিবী ছাড়া আর মাত্র এই দুটি গ্রহেই প্রাণের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

জড় থেকে প্রাণ

মানুষ তার সভ্যতার সুরু থেকেই বোঝবার চেষ্টা করেছে যে, এই পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি কি করে হলো? আধুনিক বিজ্ঞান বুঝতে পেরেছে যে, প্রাণের উপাদানের মূলে রয়েছে কার্বনের সঙ্গে অন্যান্য পদার্থের, বিশেষ করে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের বিভিন্ন ধরণের জোট গঠন। অবশ্য কেবল এটাই সব নয় এবং এটাও ঠিক যে, জড় পদার্থ থেকে প্রাণের উৎপত্তি ধাপে ধাপে কি ভাবে হলো, তার সমস্ত প্রক্রিয়াটা এখনও স্পষ্ট নয়। তাছাড়া সে সম্পর্কে এত জটিল তর্ক ও দুরূহ তথ্য নিয়ে আলোচনা করতে হবে, যা আমাদের এই সাধারণ প্রবন্ধে করা সম্ভবও নয়। কাজেই মোদ্দা কথাটা দেখা যাক।

কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের জোট প্রাণ সৃষ্টির একেবারে মূলে রয়েছে। আচ্ছা, এখন এই জোট ঠিকমত বাঁধবার জন্যে প্রয়োজন একটা সমপরিমাণের উত্তাপের—অত্যধিক গরম বা ঠাণ্ডা, কোনটা হলেই চলবে না।

সৌরজগতে যে নয়টি গ্রহ সূর্য প্রদক্ষিণ করছে, বলা বাহুল্য তাদের সকলেরই তাপ পাবার উৎস একমাত্র সূর্য। সূর্যের উত্তাপ কত? সূর্যকেন্দ্রের উত্তাপ প্রায় দুই কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত। সূর্য অবশ্য আকারেও দারুণ বড়। পৃথিবীর ব্যাস মাত্র ৮,০০০ মাইল, পরিধি ২৫,০০০ মাইল। সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা আকারে ১,৩০,০০০ গুণ বড়। সূর্য এত বড় হলেও তার পরিধিতে এবং যেখান থেকে ছটা বেরোচ্ছে, সেই ছটামণ্ডলে তাপমাত্রা প্রায় ৬,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত।

বুধগ্রহ সূর্যের সবচেয়ে কাছে, মাত্র সাড়ে তিন কোটি মাইল দূরে। সেখানে কাজেই তাপমাত্রা এত বেশী যে, প্রাণের মূল উপাদানের জন্যে যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের জোট বাঁধা দরকার, সেই জোট বাঁধা যাবে না। তাহলে বুধগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব নেই, এটা আমরা ধরে নিতে পারি। অবশ্য এরও কূটতর্ক আছে, যা এখানে উত্থাপন করা সম্ভব নয়। শুক্র থেকে মঙ্গল—সূর্য থেকে দূরত্ব ছয় কোটি থেকে চৌদ্দ কোটি মাইল, মাঝখানে পৃথিবী রয়েছে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইলে। এই অঞ্চলে প্রাণসৃষ্টির উপযোগী সমপরিমাণের তাপ সূর্য থেকে পাওয়া যায়। মঙ্গলের পরে ২৭ কোটি মাইলে বৃহস্পতি—প্রাণসৃষ্টির পক্ষে অত্যধিক ঠাণ্ডা। তারপর যথাক্রমে শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো নিশ্চয়ই আরো ঠাণ্ডা।

শুক্র ও মঙ্গল

শুক্র ও মঙ্গলগ্রহে তাই মানুষের হাতে-গড়া কয়েকটি মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে, যার সাহায্যে আমরা এদের সম্পর্কে কিছু কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছি।

অবশ্য মহাকাশযান পাঠাবার আগেই টেলিস্কোপ, বর্ণালীরেখা বিশ্লেষণের যন্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে আমরা এই গ্রহ দুটির সম্পর্কে কিছু কিছু জানতাম।

পৃথিবী থেকে শুক্রের দূরত্ব গড়পড়তা ২½ কোটি মাইল, মঙ্গলের ৪ কোটি। তথাপি শুক্র অপেক্ষা মঙ্গল সম্পর্কে আমরা অনেক বেশী খবর রাখি। কারণ, শুক্রকে ঘিরে সব সময়ই রয়েছে ঘন মেঘের আবরণ—এত ঘন, যাকে ভেদ করে টেলিস্কোপ বা অন্যান্য যন্ত্রের দৃষ্টি একেবারেই চলে না।

কাজেই শুক্র বড় রহস্যময়ী গ্রহ, তার জমির চেহারা আমরা কখনও দেখি নি, সেখানে সমুদ্র আছে কি না, জানি না এবং প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্যে বিশেষ করে তার তাপমাত্রা জানা দরকার, যেটা এতদিন জানা ছিল না। তাছাড়া শুক্রে দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য কত, তাও এতদিন জানা ছিল না।

১৯৬৩ সালে আমেরিকার ম্যারিনার এবং ১৯৬৫ সালে সোভিয়েটের ভিনাস নামে মহাকাশযানের সাহায্যে শুক্রের অনেক খবর আমরা পেয়েছি। শুক্রে প্রাণের সৃষ্টির জন্যে তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশী, প্রায় ৪০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাছাড়া শুক্রের নিজের চারধারে একবার পুরো পাক খেতে সময় লাগছে প্রায় ২২৭ দিন (এক দিন অর্থে এখানে ২৪ ঘণ্টা বোঝাচ্ছে)। শুক্রের সূর্য-প্রদক্ষিণ করতেও সময় লাগছে ২২৭ দিন, অর্থাৎ শুক্রের একটা পিঠই চিরকাল সূর্যের দিকে ফেরানো। কাজেই একদিকেই কেবল সূর্যের আলো পড়ছে, অন্যদিকে রাত্রির অন্ধকার। বলা বাহুল্য, প্রাণসৃষ্টির পক্ষে এই অবস্থাটাও ভাল নয়।

মঙ্গলের তাপমাত্রা প্রাণসৃষ্টির পক্ষে উপযোগী, কিন্তু তার বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় নি। তথাপি মঙ্গলে উদ্ভিদ জাতীয় নিম্নস্তরের প্রাণ আছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্য আমাদের হাতে নেই, তবে টেলিস্কোপের সাহায্যে আমরা দেখেছি, মঙ্গলের গ্রীষ্মকালে তার মেরুদেশের তুষারাবৃত সাদা বরফের টুপি গলে যায় এবং ক্রমশঃ একটা ধূসর রং তার বিষুবরেখা অঞ্চলকে ছেয়ে ফেলে। আলমা-আটার প্রোফেসার টিকভ্ এই ধূসর রঙের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, পৃথিবীর মেরুদেশের এক ধরণের উদ্ভিদের বর্ণালীরেখার সঙ্গে মিলে যায়। কাজেই মঙ্গলের গ্রীষ্মকালে অন্ততঃ বরফগলা জলে কিছু উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। মঙ্গলে অবশ্য সাধারণভাবে জল নেই এবং প্রাণ থাকলেও প্রাণের শেষ বা পঞ্চম অঙ্ক সেখানে অভিনীত হচ্ছে।

সমগ্র সৌরজগতে তাহলে শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতেই বুদ্ধিমান প্রাণী রয়েছে। আর মঙ্গলে রয়েছে নিম্নস্তরের উদ্ভিদ, তাও প্রায় লুপ্ত। তবে এই বিরাট (সসীম কি অসীম, তা নিয়ে তর্ক আছে) মহাবিশ্বে অন্য নক্ষত্রলোকে অন্য নক্ষত্রের (বা সূর্যের) চারধারে গ্রহরাজির মধ্যে প্রাণ এবং বুদ্ধিমান প্রাণের সৃষ্টিও যে হয়েছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দিলীপ বসু

ধাঁধা

সমস্যা ১. সুলতান তুঘলকের দুর্গ নির্মাণ

দিল্লীর সুলতান মহম্মদ তুঘলক ছিলেন অস্থিরচিত্ত ও খেয়ালী ; লোকে বলতো পাগ্‌লা সুলতান। ভদ্রলোক কিন্তু নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, বিশেষতঃ সামরিক স্থাপত্য বিদ্যায়। দিল্লী থেকে তিনি তাঁর রাজধানী দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন, একথা ইতিহাসে আছে ; কিন্তু সে ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। আমরা কিন্তু সে গোপন কারণটি জানি। ব্যাপারটি এখানে বলি।

তুঘলক মনে করতেন, সামরিক শক্তির বৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্যে দুর্গ নির্মাণ করতে হয় সমাকৃতির এবং সংস্থাপন করতে হয় জ্যামিতিক বিন্যাসে—মৌমাছিরা যেমন
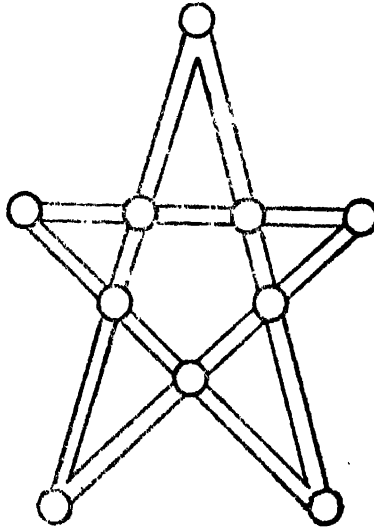
তাদের মধুচক্রের খুপরিগুলি নির্মাণ করে একই ষড়ভুজের আকারে শ্রেণীবদ্ধভাবে। তাই তিনি স্থির করেছিলেন, তাঁর নতুন রাজধানী দেবগিরিতে তাঁর নিজস্ব প্রাসাদ-দুর্গটি সুরক্ষিত করবেন মোট দশটি দুর্গ সুবিন্যস্তভাবে নির্মাণ করে। রাজ-স্থপতি ইদ্রিস মিঞার ডাক পড়লো নক্সা প্রস্তুত করতে—দুর্গ দশটি সংস্থাপিত হবে এমনভাবে যেন সেগুলি থাকে পাঁচটি সারিতে, প্রতি সারিতে চারটি করে দুর্গ ; আর সেগুলি

দুর্ভেদ্য প্রাচীর-বেষ্টিত পাঁচটি সরল পথে পরস্পর সংযুক্ত থাকবে। অনেক ভেবে-চিন্তে ইদ্রিস পূর্ব পৃষ্ঠার নক্সাটি তৈরী করে আনেন।

সুলতান তুঘলক নক্সাটি দেখেই তা নাকচ করে দেন—ঠিক হয় নি, দশটির একটি দুর্গও তো নিরাপদ নয়, বাইরে থেকে এর যে-কোনটি শত্রু কর্তৃক অনায়াসে আক্রান্ত হতে পারে। তিনি নতুন নক্সা করতে আদেশ করলেন, যাতে একাধিক দুর্গে বহিরাক্রমণের সহজ সম্ভাবনা থাকবে না, আক্রমণ করতে হলে দুর্ভেদ্য প্রাচীর অন্ততঃ শত্রুকে ভাঙ্গতে বা উলঙ্ঘন করতে হবে।

রাজস্থপতি দুর্গ দশটির এরূপ বিন্যাস অসম্ভব বলে জানালেন—এরূপ একটি দুর্গও হতে পারে না, যেটিতে সুলতানের প্রস্তাবিত নিরাপত্তা সম্ভব হবে, বিনা বাধায় শত্রু আক্রমণ করতে পারবে না। সুলতান কিন্তু ইদ্রিস মিঞাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—একটি নয়, দুটি দুর্গ ঐরূপ নিরাপদ সংস্থানে নির্মাণ করা যায়।

তোমরা বল দেখি, সুলতান কিরূপ নক্সা করেছিলেন? দুর্গ দশটি ও প্রাচীর পথগুলি কিরূপ বিন্যাসে সংস্থাপিত করে তিনি তাঁর নিরাপত্তা বিধানের প্রস্তাব করেছিলেন? মনে রাখতে হবে, দুর্গ দশটি পাঁচটি সারিতে থাকবে এবং প্রতি সারিতে চারটি করে দুর্গ প্রাচীর-পথের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হবে। নানাভাবে এঁকে দেখ, যাতে সুলতানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

[এখানে বলে রাখি, এই নক্সায় সমস্যার সমাধানে দীর্ঘ দিন কেটে যায়, দেবগিরিতে সুলতানের নিরাপদ রাজদুর্গ আর নির্মিত হয় না। ইতিমধ্যে আমীর-ওমরাহদের বিরোধিতায় রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যায়]

সমস্যা ২. চাষীর জমি বণ্টন

মেদিনীপুরের এক সম্পন্ন চাষী নিধিরাম বেরা তার বিষয়-সম্পত্তি স্ত্রী ও চার ছেলের মধ্যে সমান অংশে বণ্টন করে দিল; বাকী রাখলো বসতবাটীর পৈতৃক ভিটাখানি, যা তার মৃত্যুর পরে বণ্টিত হবে বলে উইল করে গেল। মৃত্যুর পরে উইলে দেখা গেল, বসতবাটীর এক-চতুর্থাংশ সে তার স্ত্রীকে দিয়ে গেছে এবং বাকী অংশ সে তার চার ছেলেকে সমান সুযোগ-সুবিধাসহ সমাংশে ভাগ করে নিতে বলেছে। এখন ঐ ভিটাখানা ছিল বর্গায়তনের জমি, আর তার ঠিক মধ্যস্থলে ছিল একটি সুমিষ্ট জলের পাতকুয়া।

ছেলেরা তাদের মায়ের এক-চতুর্থাংশ সহজেই ভাগ করে দিয়ে ছিল, যা পর পৃষ্ঠার নক্সাটিতে দাগ কেটে দেখানো হয়েছে। বাকী তিন-চতুর্থাংশ আমীন এসে মাপ-জোক করে ক, খ, গ, ঘ চার ভাইয়ের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করে দিল। একটু

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, জ্যামিতিক হিসাবে তিন-চতুর্থাংশের চার ভাগ ঠিকই সমান হয়েছে। পাতকুয়াটি কালো বৃত্তাকারে দেখানো হয়েছে নক্সাটির মধ্যস্থলে।
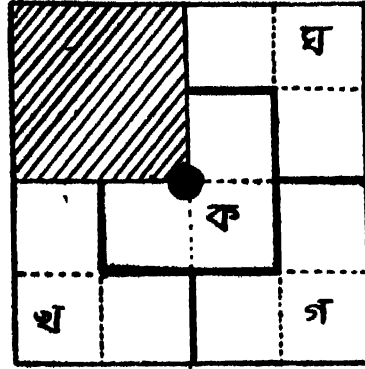
বড় ভাই ক-এর ভাগে পড়েছে পানীয় জলের পাতকুয়াটি; অপর তিন ভাই তাতে রাজী নয়। এমনভাবে ভাগ করতে হবে, যাতে জমির অংশ প্রত্যেকের সমান হবে এবং ঐ পাতকুয়াটিও সকলে ব্যবহার করতে পারবে অপরের জমিতে পা না দিয়ে। আমীন মশাই বিষম বিপদে পড়লেন—সে কি করে হবে? অনেক ভেবে-চিন্তেও তিনি এই সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না। তাঁর পক্ষে এরূপ ভাগ করা সম্ভব হলো না। তোমরা একটু ভেবে দেখ না, ওদের প্রস্তাব অনুযায়ী ভাগ করে দিতে পার কিনা, বেচারারা ঝগড়া-ঝাটি করে মরছে!

সমস্যা ৩. লোকগণনাকারীর বিপদ

সরকারী লোকগণনার সময় কর্মচারী গেল নবীন সামন্ত মশায়ের বাড়ী। ভদ্রলোকের বাড়-বাড়ন্ত সংসার—১৫টি সন্তান ঠিক দেড় বছরের ব্যবধানে জন্মেছে। সবার বড় মেয়ে শ্রীমতি বিন্দুর যথেষ্ট বয়স হয়েছে; কাজেই নিজের মুখে বয়স বলতে লজ্জা পায়, বিয়ে হয় নি। গণনাকারীর প্রশ্নের উত্তরে সে বললো, আমি আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাই বাদলের চেয়ে সাত গুণ জ্যেষ্ঠ, আমাদের পনেরো ভাই-বোনের বয়সের তফাৎ ঠিক দেড় বছর করে, তা তো বাবাই বলেছেন। আমার বয়স তাহলে কত হবে নিজেই হিসাব করে নিন। গণনাকারী বিষম ফাঁপড়ে পড়লো—কত বয়স লিখবে মেয়েটির।

তোমরা বল দেখি, শ্রীমতি বিন্দুর বয়স কত হবে? খুব ভেবে-চিন্তে হিসাব করে বলবে, তাড়াতাড়ি করলে ভুল হয়ে যাবে—হিসাবের খেলা তো!

সমস্যা ৪. দাদুর সাইকেল উপহার

আদরের নাতি মিঠুর বয়স এখন মাত্র ১২ বছর। সে একদিন এসে দাদুকে বললো, 'এবার পূজায় আমাকে একটা সাইকেল দিতে হবে, দাদু; আর কিছু আমি

নেব না কিন্তু।' দাদু বললেন, 'না ভাই, তুমি এখনও এমন কিছু বড় হও নি, যাতে কলকাতার রাস্তার এত ভীড়ে সাইকেল চালাতে পারবে। আরও কিছুদিন সবুর কর, —আমার বয়স যখন তোমার বয়সের তিনগুণ হবে (অর্থাৎ, তোমার বয়স আমার বয়সের তিন ভাগের এক ভাগ হবে) তখন তুমি সাইকেল পাবে।'

দাদুর বয়স এখন ৪৫ বছর। তোমরা হিসাব করে বল দেখি, সাইকেল পেতে মিঠুকে কত বছর অপেক্ষা করতে হবে এবং তখন তার বয়সই বা কত হবে ?

সমস্যার সমাধান

সমাধান ১, সুলতান তুঘলকের দুর্গ নির্মাণ

বিভিন্ন বিন্যাসে দুর্গ দশটি নির্মাণ করা যেতে পারে, যাতে সেগুলি পাঁচটি সারিতে বিন্যস্ত হবে এবং প্রতি সারিতে চারটি করে দুর্গ থাকবে। কিন্তু সমস্যার নির্দেশ অনুসারে দুর্গ দশটি সংস্থাপনের একটি মাত্র নক্সাই সম্ভব, যাতে সর্বাধিক দুটি দুর্গ বিনা বাধায় বাইরে থেকে আক্রান্ত হতে পারবে না। নক্সাটি হলো এরূপ ঃ
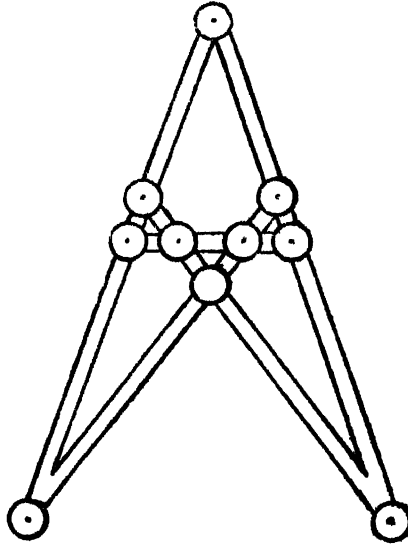
৩নং চিত্র

সুলতান তুঘলক এই নক্সাটিই রাজ-স্থপতি ইদ্রিস মিঞাকে দেখিয়েছিলেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, দুর্গ নির্মাণের সব নির্দেশই এতে পালিত হয়েছে ; অধিকন্তু দুটি দুর্গের সংস্থান এমন রয়েছে, যাতে শত্রু সে দুটিকে আক্রমণ করতে এলে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের বাধা পাবে, সহজে পৌঁছুতে পারবে না। সুলতান তুঘলকের বাসনা ছিল, এই দুটি সুরক্ষিত দুর্গের একটি হবে তাঁর বিবি মহল, অপরটি দরবার। অবশ্য এ সাধ তাঁর অপূর্ণ ছিল ; দেবগিরিতে স্থায়ীভাবে রাজধানী স্থানান্তর করাই হয় নি।

তোমরা নানাভাবে এঁকে দেখতে পার; নির্দেশ অনুযায়ী ঐরূপ সুরক্ষিত দুর্গ মাত্র ছ'টিই হতে পারে, তার বেশি নয়।

সমাধান ২, চাষীর জমি বণ্টন

চার ভাইয়ের বিবাদ মিটবে নীচের নক্সা অনুযায়ী বাস্তু জমিখানা বণ্টন করলে। এই-ই একমাত্র সমাধান, যাতে প্রত্যেক ভাই জমির পরিমাণে ও আকারে সমান অংশ পাবে এবং প্রত্যেকেই পাতকুয়াটি ব্যবহার করতে পারবে, অপরের জমিতে পদার্পণ না করে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই জ্যামিতিক বণ্টন একেবারে নিখুঁত—
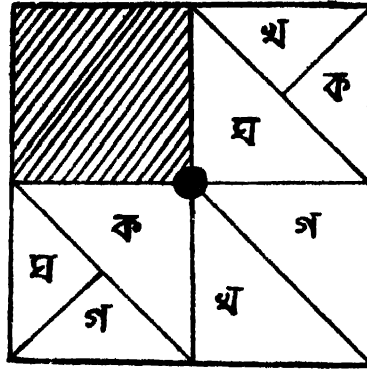
৪নং চিত্র

সকলেরই অংশ ও সুযোগ-সুবিধা সব দিক দিয়েই সমান। পিতা নিধিরামের উইলে এমন কোন শর্ত ছিল না যে, প্রত্যেক ছেলের অংশ একই খণ্ডে হতে হবে। এখানে এরূপ করা হয়েছে যে, মায়ের এক-চতুর্থাংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশের তিনটি বর্গক্ষেত্র জমির কর্ণ টেনে পাশাপাশি চারটি অংশ চার ভাইকে দেওয়া হলো; আর বাকী দুটি অর্ধ-বর্গক্ষেত্রের অর্ধ-কর্ণ রেখা টেনে যে চার ভাগ করা হলো, তার এক-এক অংশ এক-এক জনকে দেওয়া হলো।

সমাধান ৩, লোক গণনাকারীর বিপদ

শ্রীমতি বিন্দুর বয়স হতে হবে ২৪ বছর, আর সর্বকনিষ্ঠ বাদলের বয়স ৩ বছর; ওদের মাঝে রয়েছে ১৩টি ভাই-বোন। বাদল থেকে বিন্দুর জন্ম তারিখের মধ্যে দেড় বছরের ১৪টি ব্যবধান, অর্থাৎ ২১ বছর; এর সঙ্গে বাদলের বয়স ৩ বছর যোগ দিলে বিন্দুর বয়স ২৪ বছর হবে। বিন্দুর উক্তিতে কিছুটা হেঁয়ালী রয়েছে। তার বয়স বাদলের বয়সের সাতগুণ বলে নি; বলেছে, বাদলের চেয়ে সাতগুণ জ্যেষ্ঠ বা বয়স্ক অর্থাৎ তার বয়স বাদলের আটগুণ। এই দুটি উক্তির মধ্যে পার্থক্য অনেকেই ধরতে পারে না। সাধারণ লোক-গণনাকারী কেন, অনেক সেয়ানা লোকও এ-কথায় ভুল করে বসে।

সমাধান ৪, দাছুর সাইকেল উপহার

নাতি মিঠু সাইকেল পাবে সাড়ে চার বছর পরে, যখন তার বয়স হবে ১৬ বছর ৬ মাস ; কারণ সাইকেল চাওয়ার সময় তার বয়স ছিল ১২ বছর। দাছুর বয়স ছিল ৪৫ বছর, কাজেই চার বছর ছয় মাস পরে তাঁর বয়স হবে ৪৯ বছর ৬ মাস। দাছুর ব্যবস্থা অনুসারে নাতির বয়স ১৬½ বছর এবং তার নিজের বয়স তার তিন গুণ অর্থাৎ ৪৯½ বছর হলে নাতিকে সাইকেল উপহার দেবেন দাছু।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মজার যন্ত্র

বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে হরেক রকম মজার যন্ত্র তোমরা হয়তো দেখেছ। তড়িৎ-প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন বর্তনীর সাহায্যে চোর ধরা, মাছ ধরা, প্রতিবেদন শক্তি পরীক্ষা করা, কালো-ফরসার মান বিচার করা ইত্যাদি নানারকমের যন্ত্র আজকাল দর্শকদের আনন্দের খোরাক যোগায়। ঐরকম একটা যন্ত্রের কথা তোমাদের এখন বলবো, যাতে তোমরা নিজেরাই সেই যন্ত্র তৈরি করতে পার।

প্রতিবেদন শক্তি পরীক্ষা করবার যন্ত্র

কোন ঘটনা দেখবার বা শোনবার মুহূর্তেই তার পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করতে একটু সময় লাগে। যেমন, কোন আলো দেখে বা শব্দ শুনেই কাউকে যদি কোন একটা বৈদ্যুতিক বাতি নেভাতে বলা হয়, তাহলে শব্দ কানে শুনে বা আলো চোখে দেখে হাত দিয়ে কাজ করবার শক্তির অনুভূতি আসতে কিছু সময় লাগবেই। এই সময়টা বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন। এই অর্থে যার সময় কম লাগে তার প্রতিবেদন শক্তি বেশী আর যার সময় বেশী লাগে তার প্রতিবেদন শক্তি কম বলা যেতে পারে। সাধারণতঃ মানুষের বেলায় কম সময় বলতে $\frac{1}{7}$ সেঃ এবং বেশী সময় বলতে $\frac{1}{2}$ সেঃ-এর মত বোঝায়। এই সময়ের পার্থক্যটা একটা তড়িৎ-কোষ, একটা বৈদ্যুতিক-রোধক ও একটা কনডেনসার যুক্ত যন্ত্র থেকে মিটারের সাহায্যে মাপা হয় (চিত্র দেখ)। এই জন্যে ৬ ভোল্টের তড়িৎ-কোষ, ০·১ মেগ্-ওহ্ম-এর রোধক ও ৪ মাইক্রোফ্যারাডের কনডেনসার নিলে চলবে। চিত্রের ২নং চাবি সাধারণতঃ বন্ধ থাকে। ১নং চাবি বন্ধ করলেই রোধকের মাধ্যমে কনডেনসারটির দুই প্রান্ত বিপরীত আধানযুক্ত হয়। ফলে ঐ দুই প্রান্তে যে তড়িৎ-বিভব তৈরি হয় তা মিটার দ্বারা মাপা যায়। রোধকের মাধ্যমে কনডেন-

সারটি পুরো আধানযুক্ত হতে সময় লাগে। এই সময়টা রোধক ও কনডেনসারের মানের উপর নির্ভরশীল। ১নং চাবি ও ২নং চাবি বন্ধ করলে একই সঙ্গে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজতে থাকবে এবং কনডেনসারও আধানযুক্ত হতে থাকবে। কনডেন্সার পুরো আধানযুক্ত হওয়ার সময় পর্যন্ত মিটারে ক্রমশঃ মান বেশী দেখাবে। এবার ঘণ্টা বাজবার শব্দ শুনবার মুহূর্তেই কাউকে যদি ২নং চাবি খুলে দেওয়ার কথা বলা
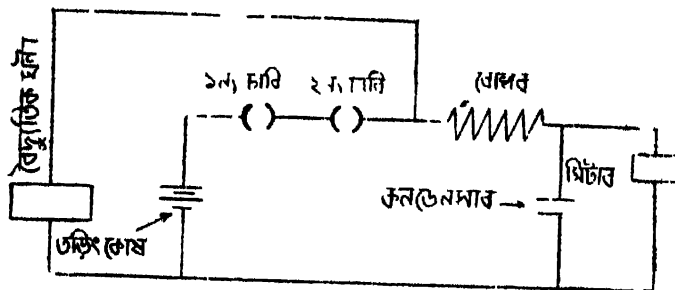
থাকে—সে যত তাড়াতাড়ি ঐ কাজ করতে পারবে, মিটারে তত কম মান দেখাবে। এই রকম ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ঐ একই কাজ করতে দেওয়া হলে মিটারেও বিভিন্ন মান দেখাবে। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিবেদন শক্তি পৃথক বলে মিটারে বিভিন্ন মান দেখায়। এইভাবে মানুষের প্রতিবেদন শক্তি পরীক্ষা করা যায়।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বদলে বৈদ্যুতিক বাতি দিয়েও একই কাজ করা যেতে পারে ৫০।৬০ গজ দূরে এক সঙ্গে বৈদ্যুতিক বাতি ও বৈদ্যুতিক ঘণ্টা রেখে আলাদা আলাদা ভাবে একই ব্যক্তি দিয়ে ঐ পরীক্ষা করালে শব্দের বেলায় আলোর তুলনায় মিটারে মান বেশী দেখা যায়। কেন না শব্দের বেগ আলোর বেগের তুলনায় অনেক কম। তাই শব্দ আসতে বেশী সময় লাগবার জন্যে এই পার্থক্যটা হয়েছে। অতএব এথেকে আলোর বেগ ও শব্দের বেগের মধ্যে যে পার্থক্য আছে—তার সম্বন্ধেও একটা ধারণা করা যেতে পারে।

মহুয়া বিশ্বাস

জানবার কথা

কাগজের কাহিনী

(কথায় ও চিত্রে)

১ (ক) বর্তমান যুগে মানব-সভ্যতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে কাগজ। বাণিজ্যিক সংবাদাদির আদান-প্রদান, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির রেকর্ড এবং চিঠিপত্রের সংযোগ কাগজের মাধ্যমেই করা হয়। এখন অবশ্য লেখবার কাগজ এবং কাগজজাত অন্যান্য বস্তু হাজারো রকমের শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

১ (ক)

১ (খ)

১ (খ) কয়েক জাতের মৌমাছি ও বোল্‌তা বাসা নির্মাণের জন্যে কাগজ তৈরি করে। ১০৫ খৃষ্টাব্দে মৌমাছিদের কাগজ প্রস্তুতের কৌশল লক্ষ্য করে Ts'ai Lun নামক একজন চীনা কাগজ প্রস্তুত-প্রণালী উদ্ভাবন করেন। তিনি তুঁতগাছের ছাল টুক্‌রো টুকরো করে— সেগুলিকে পিটিয়ে মণ্ডে পরিণত করেন এবং তাতে মেশান শণ ও তুলার আঁশ। দ্বাদশ শতাব্দীর মুসলমানগণ চীনাদের কাছ থেকে কাগজ তৈরীর গুপ্ত কৌশল শিক্ষা লাভ করেন। মুসলমানদের কাছ থেকে ইউরোপীয়গণ কাগজ-তৈরির কৌশল শেখেন।

১ (গ) ৫০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ মধ্য আমেরিকার মায়ান ইণ্ডিয়ানরা ডুমুর জাতীয় গাছের ছালের সাহায্যে একপ্রকার কাগজ প্রস্তুত করেন। তারপরে অ্যাজটেক ইণ্ডিয়ানরা কাগজ প্রস্তুতের উন্নততর প্রণালী উদ্ভাবন করেন। এছাড়া অন্য কোন আমেরিকান ইণ্ডিয়ানগণ কাগজ প্রস্তুত-প্রণালী জানতো না।

২ (ক) ইউরোপে ধীরে ধীরে কাগজ শিল্প বিস্তৃত হতে থাকে। সেখানকার ধর্মনিষ্ঠ সম্প্রদায় নথি-পত্র পাত্‌লা চামড়া অথবা পার্চমেন্ট ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করতো। ১৪০০

খৃষ্টাব্দ নাগাদ মুদ্রণ-যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে কাগজের চাহিদা বেড়ে যায়, পার্চমেন্টের চাহিদা কমতে থাকে। এই সময়ে একবারে একটি কাগজের শিট হাতে তৈরি হতো।
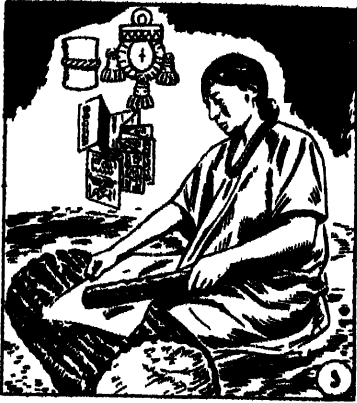
১ (গ)

২ (ক)

২ (খ) ১৬৯০ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় কাগজ আসতো ইংল্যাণ্ড থেকে। আমেরিকায় প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয় ১৬৯০ সালে। অন্যান্য দেশেও কাগজের কল স্থাপিত হয়। প্রথম যুগের কাগজের কলগুলি স্থাপিত হয়েছিল বড় বড় সহরের কাছাকাছি নদীর ধারে। কারণ কাগজ তৈরির সে সময়ের মূল উপাদান ছেঁড়া ন্যাকড়া ইত্যাদি পাওয়া যেত সহর থেকে আর প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যেত নদী থেকে।
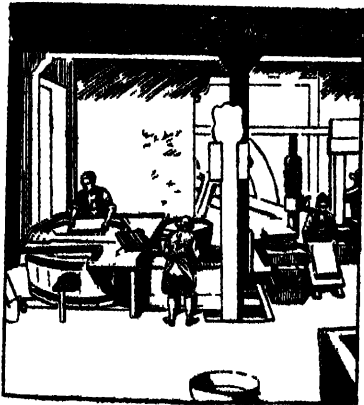
২ (খ)
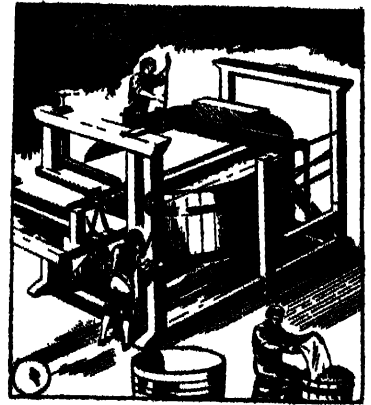
২ (গ)

২ (গ) ১৭৯৯ সালে নিকোলাস লুই রবার্ট এরূপ একটি কাগজ তৈরির কল প্রস্তুত করেন, যাতে একবারে এক শিট কাগজ তৈরির পরিবর্তে অবিচ্ছিন্ন কাগজের রোল প্রস্তুত করা সম্ভব। ইংল্যাণ্ডের ফোরড্রাইনীয়ার ভ্রাতৃবৃন্দ পরে এই যন্ত্রের উন্নতি বিধান করে পেটেন্ট গ্রহণ করেন।

৩ (ক) যদিও প্রথম কাগজ প্রস্তুত হয়েছিল কাঠজাত বস্তু থেকেই, তথাপি যে কোন কারণেই হোক—কাগজ প্রস্তুতের সেই গুপ্ত কৌশল হারিয়ে গিয়েছিল, শত শত বছর যাবৎ কাগজ প্রস্তুত হতো ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে। ফলে কাগজের উৎপাদন

৩ (ক)

৩ (খ)
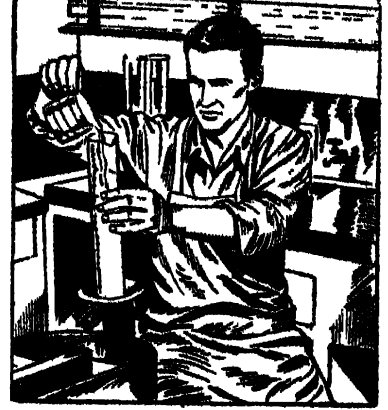
আশানুরূপ হতো না। ১৮৬৭ সালে টিলম্যান নামক একজন আমেরিকান অ্যাসিডের দ্রবণ ব্যবহার করে কাঠের আঁশ পৃথক করতে সক্ষম হন। ফলে কাঠের মণ্ড ক্রমে কাগজ তৈরির মূল উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়।

৩ (খ) সব কাগজই প্রস্তুত হয় উদ্ভিদের আঁশের সেলুলোজ থেকে। কাঠ, তুলা, তিসি বা মসিনা, ধান, শণ ও এস্‌পাবটো ঘাস প্রভৃতি কাগজ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩ (গ)

৩ (গ) কাঠকে লম্বালম্বি কেটে ছাল ছাড়িয়ে যন্ত্রের সাহায্যে টুক্‌রো করে কলে পাঠানো হয়।

৪। কাঠের টুকক্‌রাগুলিকে ডাইজেষ্টার (১) নামক যন্ত্রে দেওয়া হয়। যন্ত্রে সেগুলি চাপে সিদ্ধ হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশে পরিণত হয়। তারপর এগুলিকে পাঠানো

হয় ওয়াশার (২) নামক যন্ত্রে। এখানে আঁশগুলিকে সাদা করা হয় এবং চক্‌চকে হবার উপাদান ও রং মেশানো হয়, এর পর মণ্ডকে পাঠানো জর্ডান (৪) নামক যন্ত্রে, এখানে মণ্ডকে পরিষ্কার করে কাগজ প্রস্তুতের উপযোগী করা হয়। মণ্ডে ঢালা হয় প্রচুর জল, জলীয় মণ্ডকে ফোরড্রাইনীয়ার (৫) নামক যন্ত্রের বিরাট তারের জালের পর্দার উপর দিয়ে

(গ)
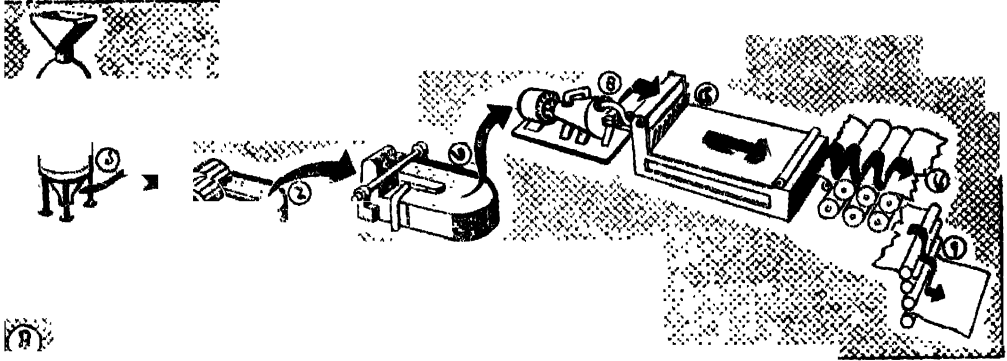
চালনা করা হয়। পর্দাটি সম্মুখদিকে সঞ্চালিত হয় এবং পাশাপাশি অবিরাম স্পন্দিত হতে থাকে, ফলে সেলুলোজ আঁশগুলি পরস্পর সম্মিলিত হয় এবং জল তারের জালের মধ্য দিয়ে নীচের ট্যাঙ্কে পড়ে। মণ্ডের ভেজা শিট পশমের তৈরি কম্বলের বেল্টের মধ্য দিয়ে চালিত হয়ে অনেক জোড়া ভারী রোলারের (৬) মধ্য পড়ে, এখানে অবশিষ্ট জল নির্গত হয়ে যায়। অবশেষে শুক্‌নো কাগজ ক্যালেণ্ডার (৭) নামক যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চালিত হয়ে মসৃণ হয়। এগুলিকে বড় রোলে জড়িয়ে নিয়ে বাজারের চাহিদানুযায়ী মাপে কাটা হয়।

৫ (ক) ১৯০০ সালের আগে পর্যন্ত কাগজ কেবল মুদ্রণ এবং লেখবার কাজেই ব্যবহৃত

৫ (ক)
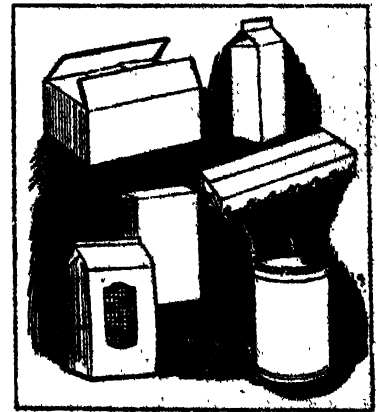
৫ (খ)

হতো। কিন্তু পরবর্তী কালে কাগজের হাজারো রকমের ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়েছে।

৫ (খ) কাচের শিশি, বোতল ইত্যাদি মোড়বার জন্যে এক ধরণের ঢেউ খেলানো কাগজের বোর্ড ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫ (গ)
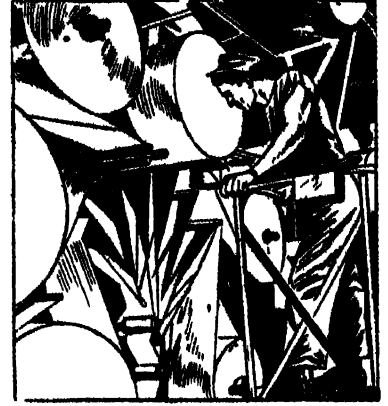
৬ (ক)

৫ (গ) অনেক দেশেই কাগজশিল্পের উন্নতির জন্যে গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে।

৬ (ক) নানা জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে অদাহ্য পালকের মত কোমল এবং পাথরের মত শক্ত, জল-শোষক, জল-প্রতিরোধক, অল্পস্থায়ী নিউজপ্রিন্ট ও দীর্ঘস্থায়ী দামী কাগজ তৈরি হয়েছে।

৬ (খ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অসংখ্য লোক কাগজশিল্প থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। সকলের চাহিদামত নানা ধরণের কাগজ কম এবং বেশী দামে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

৬ (খ)
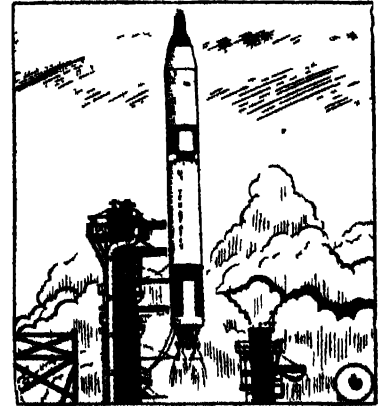
৬ (গ)

৬ (গ) যুক্তরাষ্ট্রে যে বিশাল ক্রেনের সাহায্যে রকেটকে উৎক্ষেপণ মঞ্চে উত্তোলন করা হয় তার বসবার গদীতে কাগজ ব্যবহৃত হয়। মহাকাশ যানের পৃথিবীর আবহমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশের সময় ১০৮০° (সে.) উষ্ণতা প্রতিরোধের জন্যে বিশেষ ধরণের কাগজ ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। ফল কি ভাবে তাজা রাখা হয়?

চন্দনা চৌধুরী, জলপাইগুড়ি।
দীপক দাস, বর্ধমান।

উঃ ১। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফলের সংরক্ষণ একান্তই অপরিহার্য। গাছ থেকে ফল তুলে নেবার পর বিক্রীর উদ্দেশ্যে এই ফল বিভিন্ন বাজারে এমন কি, বিদেশের বাজারে চালান দেওয়া হয়। এক দেশ থেকে অন্য দেশে ফল চালান দেওয়া সময়-সাপেক্ষ। এছাড়াও অন্য দেশের বাজারে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই ফল বিক্রী হয়ে যায় না। এর জন্যেও কমপক্ষে ৩।৪ দিন সময়ের দরকার। এই সব কারণে ফল সংরক্ষণের প্রয়োজন খুবই বেশী।

গাছে যখন ফল থাকে, তখন ফলেরও শ্বাসকার্য চলে। গাছ থেকে তোলবার পরেও ফল বেশ কিছু সময় পর্যন্ত জীবন্ত থাকে এবং ফলের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ স্বাভাবিক-ভাবে চলতে থাকে। ফলের শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় খাদ্য নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইডরূপে বেরিয়ে আসে। এর ফলে ক্রমশঃই ফলের ভিতরে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ফুরিয়ে যায় এবং ফল মরে যায়। কাজেই আমরা দেখছি, ফলের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যত কমানো যাবে ফল ততদিন টাট্‌কা থাকবে।

আশেপাশের বায়ুর তাপমাত্রা বেশী হলে ফলের শ্বাস-প্রশ্বাসের বেগও বেড়ে যায় এবং ফলের আয়ু কমে আসে। এই কারণে ফলকে ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে দিলে শ্বাসক্রিয়ার দ্রুততাও কমে যায় এবং ফল ভাল থাকে। আজকাল জাহাজে ফল চালান দেবার সময় তাপনিয়ন্ত্রিত জাহাজের খোলে ফল রেখে দীর্ঘদিন সজীব রাখা হয়। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দিলে অথবা কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে ফলের শ্বাসক্রিয়ার হার কমে যায় এবং ফলের সজীবতা বৃদ্ধি পায়। পাশ্চাত্য দেশে পাম গাছের পাতা থেকে ও আমাদের দেশে আম গাছের পাতা থেকে একরকম মোম তৈরি করা যায়। এই মোম তাপে গলিয়ে জলের সঙ্গে মেশালে অবদ্রব তৈরি হয়। এই অবদ্রবে ফলকে সামান্য সময় ডুবিয়ে নিলে ফলের গায়ের উপর কতকগুলি ছিদ্র (যেগুলির সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া অব্যাহত থাকে) বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্বাসক্রিয়ার বেগ কমে যায়। এছাড়াও গাছে থাকা অবস্থায় অথবা গাছ থেকে তোলবার পর হর্মোন বা উত্তেজক রস প্রয়োগ করলে ফল অনেক দিন সজীব থাকে।

শ্যামসুন্দর দে

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। সত্যেন্দ্রনাথ বসু
২২, ঈশ্বর মিল লেন,
কলিকাতা-৬

২। গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি
খড়্গপুর, মেদিনীপুর

৩। সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়
(কৃষি বিভাগ)
বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ
৩৫, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৯

৪। রমেশ দাশ
গভর্ণমেন্ট কলেজ অব এডুকেশন
বর্ধমান

৫। পরিমলকান্তি ঘোষ
(গণিত বিভাগ)
বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

৬। রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৫।৪, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা-১৯

৭। সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়
২৮, বিহারী চক্রবর্তী লেন
হাওড়া

৮। পূর্ণেন্দুবিকাশ কর
সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার
ফিজিক্স
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

৯। শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
'স্বস্তিক'
৫০।১, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-২৯

১০। সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

১১। জয়ন্ত বসু
সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

১২। বলাইচাঁদ কুণ্ডু
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

১৩। মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

১৪। দিলীপ বসু
২০০-এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৬

১৫। কাজী খাঁ
২, আহিরীপুকুর রোড
কলিকাতা-১৯

১৬। মহুয়া বিশ্বাস
১৫ বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

১৭। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
কলিকাতা-৯

১৮। শ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ ;
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একবিংশ বর্ষ | নভেম্বর, ১৯৬৮ | একাদশ সংখ্যা

একক জীবকোষ নিয়ে গবেষণা

শ্রীতারকমোহন দাস

জীবকোষ আবিষ্কারের ত্রিশত বার্ষিকী

জীববিজ্ঞানের ভিৎ আজ যে কটি অবিস্মরণীয় আবিষ্কারের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে জীবকোষের আবিষ্কার অন্যতম। শত বর্ষ পূর্বের কোন মহৎ ঘটনার স্মরণে শতবার্ষিকী পালনের প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, সেই হিসাবে জীবকোষ আবিষ্কারের ত্রিশত বার্ষিকী পালনের এটাই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট সময়। আজ থেকে তিন-শ' বছর আগে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক রবার্ট হুক হাতে-গড়া একটি পুরাতন ধরণের কম্পাউণ্ড মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে বোতলের কর্কের একটি পাত্‌লা অংশের মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্ভিদ-কোষের অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণ করেন। তিনিই এগুলির নাম দিয়েছিলেন সেল। তখনকার দিনের ধর্মযাজকদের সারি সারি ছোট চৌকোণা ঘর বা সেলের সঙ্গে এগুলি তুলনীয় ছিল বলে এই নাম। রবার্ট হুকের দেওয়া এই নাম আজও আমরা ব্যবহার করছি।

জীবকোষ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান মোটামুটি তিন-শ' বছরের পুরনো হলেও প্রথম আড়াই-শ' বছরের মধ্যে জীবকোষ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। অবশ্য এই প্রথম আড়াই-শ' বছরের মধ্যেই আমরা জানতে পেরেছিলাম, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের মিলনেই উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ গঠিত এবং কোষের মধ্যে যে স্বচ্ছ সেলগুলির মত প্রোটোপ্লাজম থাকে তা

জীবন্ত, পরিবর্ধনশীল প্রজননক্ষম এবং শ্বাস-প্রশ্বাস, পরিপাক, অঙ্গার-আত্তীকরণ প্রভৃতি প্রায় সকল জৈব ক্রিয়ার আধার ও নিয়ন্ত্রক।

জীবকোষ সম্পর্কে আমরা বর্তমানে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, তার অধিকাংশই সংগৃহীত হয়েছে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। জীবকোষের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম কণিকাগুলির স্বরূপ ও রাসায়নিক ক্রিয়া-কলাপ, ক্রোমোসোমগুলির সূক্ষ্ম গঠন ও জীবের বৈশিষ্ট্য রক্ষায় তাদের জটিল ভূমিকা—এগুলি সবই আমরা জেনেছি বর্তমান শতাব্দীতেই। তবু একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, জীবকোষ সম্পর্কে আমাদের এই জ্ঞান আদৌ যথেষ্ট নয়।

জীবকোষ সম্পর্কে আমরা আজ পর্যন্ত যা জেনেছি, তাথেকে মনে হয়, আমরা আজও যা জানি না, তার পরিমাণই বেশী। বাস্তবিক পক্ষে জীবন সৃষ্টির মূল রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয় নি। একটি কোষ পরিবেশ থেকে খাদ্য ও শক্তি সংগ্রহ করে আয়তনে বাড়ে, সংখ্যায় বাড়ে, জীবিত প্রোটোপ্লাজমের পরিমাণও বাড়ে—কিন্তু কেমনভাবে জীবনহীন বস্তু সজীব কোষের মধ্যে প্রবেশ করে জীবিত বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, সেই পরম রহস্যের চাবিকাঠি আজও আমরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হই নি। অথবা একটি উদ্ভিদ-কোষ পরিবেশ থেকে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে কেমনভাবে শর্করা তৈরি করে, তারও পূর্ণ বিবরণ আমাদের হাতে নেই—যা থাকলে সম্ভবতঃ উদ্ভিদকে উপেক্ষা করেই কার-খানায় ব্যাপক হারে চাল, চিনি, গম ইত্যাদি
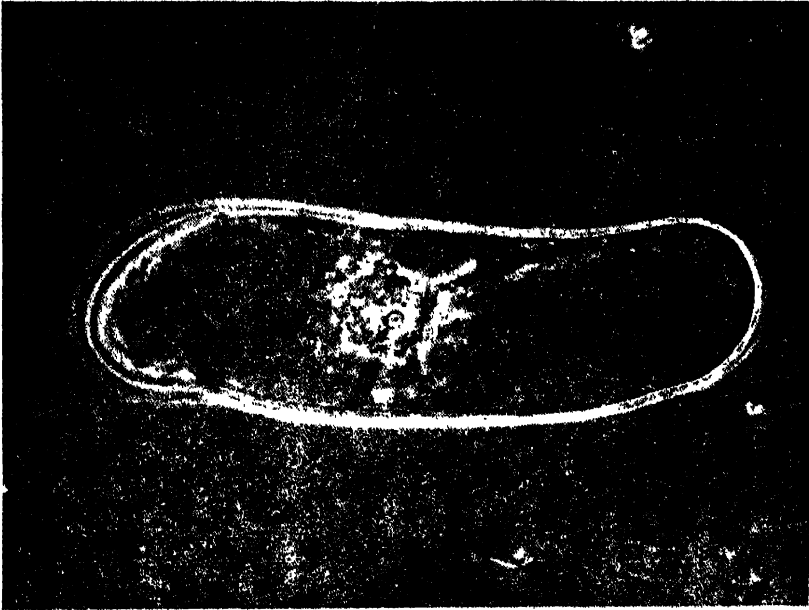
১নং চিত্র

একটি সজীব জীবকোষের ছবি। তামাক গাছের ক্যালাস কালচার (Callus culture) থেকে সংগৃহীত। চারপাশে কোষ-প্রাচীর, মধ্যে সাইটোপ্লাজম রজ্জু (Cytoplasmic strand), নিউক্লিয়াস ও তার মধ্যে বিন্দুর মত নিউক্লিওলাস দেখা যাচ্ছে। ফেজ কন্ট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপে তোলা ছবি।

উৎপন্ন করতে সক্ষম হতাম—পৃথিবীব্যাপী এই খাদ্য-সমস্যা অচিরে দূর করতে সক্ষম হতাম।

একটি জীবকোষ একটি জীবনের প্রতিভূ

জীববিজ্ঞানীরা একটি জীবকোষকে মনে করেন একটি গোটা উদ্ভিদ বা জন্তুর প্রতিভূ। অনুমিত হয়, পৃথিবীতে প্রথম জীবনের সূচনা হয়েছিল রয়েছে এবং তা যুগ যুগ ধরে বংশোৎপাদনের মাধ্যমে আপনার বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে রক্ষা ও রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে। তাছাড়া একটি মাত্র কোষের মধ্যেই বহু প্রাণীর অধিকাংশ জৈব ক্রিয়া ঘটে থাকে, যেমন—বৃদ্ধি, পরিপাক, শ্বাস-কার্য, অঙ্গার-আত্তীকরণ, বার্ধক্য, মৃত্যু ইত্যাদি। সুতরাং জীবনের এই সব মূল বিষয় অনুসন্ধানের
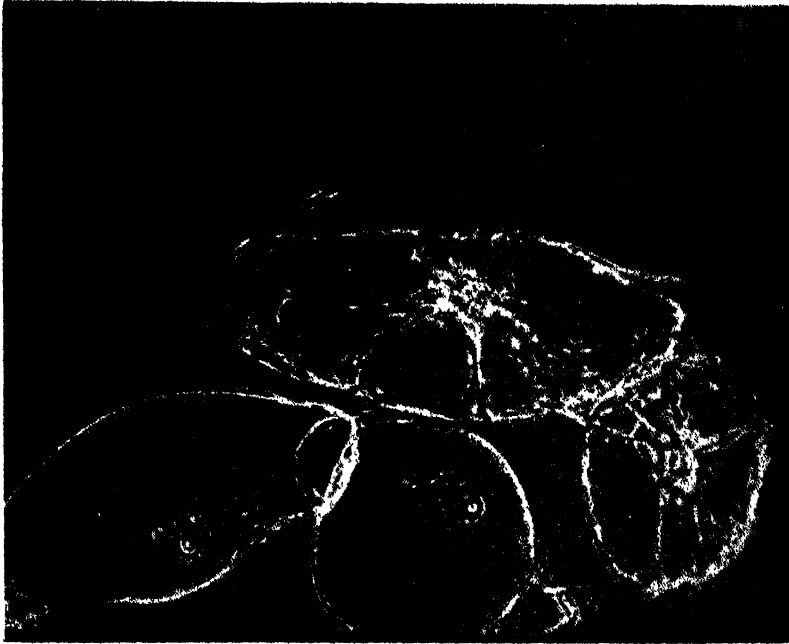
২নং চিত্র

কয়েকটি সজীব জীবকোষ তামাক গাছের ক্যালাস-টিস্যু থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এদের আকার ও আয়তনের বিভিন্নতা দ্রষ্টব্য।

একটি মাত্র জীবকোষ থেকেই এবং কালক্রমে তা থেকেই বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীতে জীবনের বিকাশ ঘটেছিল—আবার এই উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বংশোৎপাদনের সময় যে ভ্রূণ জন্মলাভ করে, তারও প্রথম সূচনা হয় একটি মাত্র মাতৃ-কোষ ও একটি মাত্র পিতৃকোষের মিলনের ফলে। সুতরাং একথা অনায়াসে বলা যায় যে, একটি মাত্র কোষের মধ্যেই জীবনের সকল বৈশিষ্ট্য নিহিত জন্যে একটিমাত্র জীবকোষ নিয়ে গবেষণার তাৎপর্য খুবই গভীর।

একক জীবকোষ নিয়ে গবেষণার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই হলো জীবনের মূল বিষয়গুলির আরও গভীরে প্রবেশ করা এবং এর জন্যে উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহ থেকে একটিমাত্র কোষ সজীব অবস্থায় বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে জীবাণুমুক্ত অবস্থায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পালন করা হয় এবং তার

বৃদ্ধি, বিভাজন ইত্যাদি যাবতীয় জৈব ক্রিয়ার সময় যে সমস্ত আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে, তা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয় ফেজ (Phase) ও ইন্টারফিয়ারেন্স (Interference) মাইক্রোস্কোপ, মুভি ক্যামেরা ও নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

একক জীবকোষের গবেষণায় ফেজ কণ্ট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপ (Phase contrast microscope) ও মুভি ক্যামেরার ব্যবহার

একক জীবকোষ নিয়ে গবেষণার বিষয়টি খুবই আকর্ষণীয়। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক এই ধরণের একটি গবেষণা প্রকল্পের (একক উদ্ভিদ-জীবকোষ পালন) সঙ্গে যুক্ত। এই গবেষণার জন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তা সংক্ষেপে হলো—কোন উদ্ভিদের কাণ্ডের মধ্য থেকে কিছু অংশ জীবাণুমুক্ত অবস্থায় বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কালচার টিউবের মধ্যে চিনি, অ্যাগার, খনিজ লবণ, ভিটামিন, হর্মোন ইত্যাদি নানারকম পুষ্টিকর খাদ্যের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পালন করা হয়। কালচার টিউবের মধ্যে উদ্ভিদের অংশটি বড় হতে থাকলে তাথেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে আর একটি টিউবে স্থানান্তরিত করা হয়। পরিশেষে একটি ফ্লাস্কের মধ্যে তরল খাদ্যের মাধ্যমে রেখে তাকে যান্ত্রিক উপায়ে ধীরে ধীরে নাড়ানো হয়। তার ফলে এই উদ্ভিদের কোষ-সমষ্টি বা টিসু (Tissue) থেকে কিছু কিছু কোষ সজীব অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে—তার মধ্যে কয়েকটি একক কোষও থাকে। তারপর অতি সূক্ষ্ম পিপেটের (Special micro-pipette) সহায়তায় এক বিন্দু তরল খাদ্যের সঙ্গে একটি মাত্র সজীব জীবকোষ বিশেষ পদ্ধতিতে আলাদা করে নেওয়া হয় এবং অবশেষে তাকে একটি বিশেষ ধরণের মাইক্রোস্কোপ স্লাইডের (Micro-chamber) উপর স্থানান্তরিত করা হয়। এই বিশেষ ধরণের স্লাইডের উপর একক জীবকোষটি বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বড় হতে থাকে, বিভাজিত হতে থাকে, নতুন নতুন কোষের জন্ম হতে থাকে। এই সময় কোষের ভিতরকার সূক্ষ্ম কণিকাগুলির (Cell organelles) যা কিছু পরিবর্তন ঘটে, তা বিস্তৃতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় ফেজ কন্‌ট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপ ও মুভি ক্যামেরার সাহায্যে। ফেজ কন্‌ট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে জীবন্ত অবস্থায় কোন রকম রং ব্যবহার না করেই একটি কোষের ভিতরের ক্রমপরিবর্তন দেখা সম্ভব। সাধারণ লাইট মাইক্রোস্কোপে ক্রোমোসোম দেখতে হলে ক্রোমোসোমগুলিকে বিশেষ পদ্ধতিতে রঞ্জিত করা দরকার, যার ফলে কোষটির অনিবার্য মৃত্যু ঘটে; সুতরাং সে ক্ষেত্রে সময়ের মাপকাঠিতে ভিতরের উপাদানগুলির গতি ও ক্রমপরিবর্তনগুলি মাপা সম্ভব নয়, কিন্তু ফেজ কন্‌ট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব।

জীবকোষের মধ্যে এসব পরিবর্তন ঘটতে বহু সময়ক্ষেপ হয়, অনেক সময় সারারাত কেটে যায় একটি কোষের বিভাজন সম্পূর্ণ হতে। এত দীর্ঘ সময় ধরে এই সকল পরিবর্তন নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়, তাতে ভুল হবার সম্ভাবনাও আছে যথেষ্ট। এই জন্যে মাইক্রোস্কোপের আইপিসের উপর মুভি ক্যামেরা স্থাপন করে তা স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক ড্রাইভের সাহায্যে পরিচালনা করা হয়। অনেক সময় ক্যামেরার গতি ইচ্ছামত নির্দিষ্ট মাত্রায় কমিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে যে ঘটনা বা পরিবর্তন বাস্তবে ঘটেছে অতি দীর্ঘ সময় ধরে, ছবির পর্দায় ইচ্ছামত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তা দেখানো সম্ভব হয়। একটি কোষের বিভাজন সম্পূর্ণ হতে যদি সারারাত লাগে, তবে তার ফিল্ম দেখাতে দশ মিনিটের বেশী সময় লাগে না, অথচ প্রয়োজনীয় সব কিছুই তাতে থাকে, কিছুই বাদ পড়ে না। বিশেষ ধরণের ঘরকাটা স্ক্রীনের

(Graph screen) উপর যখন এই ফিল্ম দেখানো হয়, তখন প্রতিটি সূক্ষ্ম কণিকা এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ গুণ পর্যন্ত পরিবর্ধিত আকারে দেখতে পাওয়া যায়; সুতরাং তাদের গতি, আয়তন বা আকারের যত সামান্যই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, তা নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা সম্ভব। বিশেষতঃ একই বিষয় বার বার করে দেখা সম্ভব হয় বলে এই ধরণের বিশ্লেষণ অত্যন্ত ব্যাপক ও নিখুঁত হয়েছে, তার সব কয়টিই ফেজ কন্‌ট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপে তোলা ছবি। সাদা-কালো ফিল্ম এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। টেক্‌নিকলার মুভি ফিল্মেও এই ধরণের ছবি তোলা যেতে পারে, বিশেষতঃ যখন ইন্টারফিয়ারেন্স মাইক্রোস্কোপ ব্যবহৃত হয়। ইন্টারফিয়ারেন্স মাইক্রোস্কোপ এক বিশেষ ধরণের ফেজ কন্‌ট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপ, যেখানে কোন রকম রাসায়নিক রং ব্যবহার না
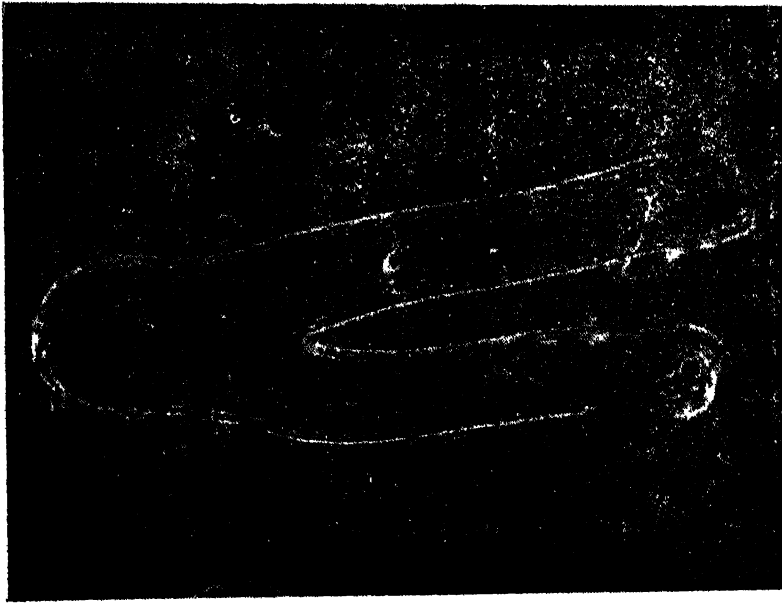
৩নং চিত্র

জীবকোষের আকার বহু বিচিত্র রকমের হয়ে থাকে। টিউনিং ফর্কের মত দু-বাহু-বিশিষ্ট এই বিচিত্র-দর্শন জীবকোষটির মধ্যে একটি নিউক্লিয়াস ও চারপাশে কোষ-প্রাচীর দেখা যাচ্ছে।

হয়। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে দর্শনীয় এই ধরণের ফিল্মের নাম 'টাইম ল্যাপ্‌স্‌ মোশন পিকচার্স' (Time lapse motion pictures)। এই বিশেষ পদ্ধতিটি একক জীবকোষ নিয়ে গবেষণায় প্রভূত সাহায্য করছে।

এই প্রবন্ধে জীবকোষের যে কয়টি ছবি দেখানো করেই জীবন্ত কোষের বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন রঙে দেখা সম্ভব, নিউক্লিয়াস এক রঙের, ক্রোমোসোম অন্য রঙের, সাইটোপ্লাজম আর এক রঙের। তার ফলে তাদের বৈশিষ্ট্য, আয়তন, গতিবেগ আরও ভাল করে বিশ্লেষণ করা যায়

গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা প্রতিটি সূক্ষ্ম কণিকার (Organelles) ধর্ম

একক জীবকোষের মুভি ফিল্ম দেখলে সর্বপ্রথম এই ধারণাটাই স্পষ্ট হবে যে, কোষের ভিতরকার কোন বস্তুই স্থির ও স্থায়ী নয়, সবকিছুই গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা, যা জীবের প্রধান ধর্ম, তা একটি জীবকোষের প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম কণিকারও ধর্ম।

একক জীবকোষ নিয়ে গবেষণায় আমাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল একটি উদ্ভিদ-কোষের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম কণিকাগুলি, যেমন—মাইটোকন্ড্রিয়া, (Mitochondria), নিউক্লিয়াস (Nucleus), প্লাসটিড (Plastid) ইত্যাদির ক্রমপরিবর্তন ও আপেক্ষিক গতিবেগ পরিমাপ করা। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই কণিকাগুলির আকার, আয়তন ও গতিবেগের পরিবর্তন ঘটে। নিম্ন তাপমাত্রায় রাখলে এই পরিবর্তন কি ভাবে ঘটে, হর্মোনজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ, যেমন—অক্সিন (Auxin), কাইনেটিন (Kinetin) ও জিবারিলিনের (Gibberellin) প্রভাবে তাদের অবস্থা কি হয় অথবা ভাইরাস অণু কোষের মধ্যে প্রবেশ করলে কি তার প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাই অনুধাবন করা। আমরা তামাক গাছের একক কোষ নিয়েছিলাম। এটা দেখা গেছে যে, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গোলাকার মাইটোকন্ড্রিয়াগুলি যেন ছোট ছোট লম্বা রডের মত আকার নেয় এবং চেনের মত সারিবদ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে সর্পিল গতিতে নড়াচড়া করতে থাকে। কখন একটি চেন ভেঙ্গে দুটি হয়, আবার এটাও দেখা গেছে যে, এই ধরণের দুটি চেন পিছনে পিছনে জুড়ে একটি হয়ে যায়। এদের গতিবেগ স্বরূপও একক মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে অনেক কম ও অনিয়মিত।

কোন একটি তরুণ কোষকে যদি শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে নিম্ন তাপমাত্রায় রাখা হয় এবং গ্লিসারিন ইত্যাদি প্রয়োগ করে যদি কোষের মধ্যে অথবা বাইরে বরফ সৃষ্টি বন্ধ রাখা যায়, তাহলে ঐ কোষের সকল কণিকাগুলির গতি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু তাদের মৃত্যু ঘটবে না। এই ভাবে নিম্ন তাপমাত্রায় দীর্ঘদিন কোষটিকে সংরক্ষিত করে রাখা সম্ভব। এখানে সব চেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো বয়সের প্রভাবে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এই কণিকাগুলির যে সব পরিবর্তন ঘটতো, নিম্ন তাপমাত্রায় তা অনেকটা বন্ধ থাকে—কণিকাগুলির আয়তনেরও যেমন বিশেষ পরিবর্তন হয় না, তেমনি তাদের আপেক্ষিক গতিবেগও প্রায় সমান থাকে, অর্থাৎ কোষটিকে আবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আনলে তাদের পূর্ব গতিবেগ ফিরে পায়। ঠাণ্ডায় কোষের মধ্যে বা বাইরে বরফ জমলে কোষটির অবশ্য মৃত্যু ঘটে অবধারিত ভাবেই। মৃত্যুর সময় একটি জীবকোষের মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটে তারও মুভি ফিল্ম আমরা তুলেছি।

স্বাভাবিক তাপমাত্রায় অক্সিন প্রয়োগ করলে কোষ-প্রাচীরের কি কি ক্রমপরিবর্তন ঘটে, কাইনেটিন (Kinetin) প্রয়োগে তার বিভাজন বৈশিষ্ট্যের এবং জিবারিলিন (Gibberellin) প্রয়োগে তার আয়তনের কি ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, তাও অনুধাবন করা হয়েছে এই একই পদ্ধতিতে। তামাক শিল্পের অন্যতম শত্রু হলো টোব্যাকো মোজেক ভাইরাস (TMV) রোগ। টেস্ট টিউবের মধ্যে প্রতিপালিত তামাক পাতার কোষগুলিতে এই রোগের সংক্রমণ ঘটানো হয় কৃত্রিম উপায়ে। তারপর কোষের মধ্যে ভাইরাস ক্রিষ্ট্যালগুলি কেমনভাবে বড় হয়ে ওঠে, তাদের প্রভাবে কোষের অন্যান্য উপাদানের কি কি লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে, কোষটির কেমনভাবে মৃত্যু হয় ধীরে ধীরে তারও সুদীর্ঘ রঙীন মুভি

ফিল্ম তুলেছি ইণ্টারফিয়ারেন্স মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে।

একটি নতুন রহস্যের আবিষ্কার

এই গবেষণা চলবার সময় আমাদের নির্দিষ্ট বিষয় বহির্ভূত বহু রহস্যও ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো নিউক্লিওলার ভ্যাকুওলের (Nucleolar vacuole) ক্রিয়া। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে নিউক্লিওলাস, পুনরাবৃত্তি একইভাবে হয়ে থাকে। এই প্রসারণ ও সঙ্কোচনের সময়েও গতিবেগ খুবই নির্দিষ্ট ও নিয়মিত—৬ ঘণ্টাকাল পর্যবেক্ষণ সময়ের মধ্যেও তার কোন তারতম্য ঘটে নি। সকল কোষের নিউক্লিওলাসেই যে এই ভ্যাকুওলের সৃষ্টি হয় তা ঠিক নয়, পরিণত অবস্থায় উপনীত সক্রিয় কোষের মধ্যে এই ক্রিয়া লক্ষ্য করা যেতে পারে। বিষয়টি খুবই কৌতূহলজনক, আমরা দীর্ঘ মুভি ফিল্ম তুলেছি এই বিষয়টির উপর এবং
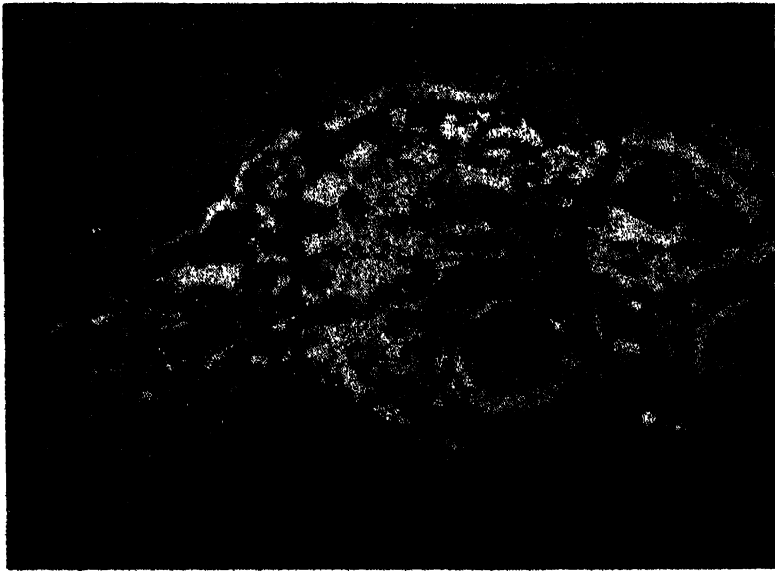
৪নং চিত্র

একটি জীবকোষের নিউক্লিয়াসটিকে বড় করে দেখানো হয়েছে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে আরও ঘন রঙের গোলাকার বস্তুটি নিউক্লিওলাস—যার মধ্যে নিউক্লিওলার ভ্যাকুওলের অবস্থান এবং তার সঙ্কোচন ও প্রসারণ ক্রিয়া মুভি ক্যামেরায় ধরা পড়ছে। ভ্যাকুওলটি এখন বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে।

এই নিউক্লিওলাসের বুকে বিন্দুর মত একটি ক্ষুদ্র গর্ত বা ভ্যাকুওল ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় (ছবি দ্রষ্টব্য)। গর্তটির পরিধি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং ঠিক ১৫ মিনিট পরেই পরিধি সর্বাধিক প্রসারিত হয়ে চরম অবস্থায় উপনীত হয় এবং তারপরেই ১০ সেকেণ্ডের মধ্যে দ্রুত সঙ্কুচিত হয়ে প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বারংবার এই ঘটনাটির বার বার তা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি। তাপমাত্রা হঠাৎ হ্রাস করেও দেখা গেছে, এই প্রসারণ-ক্রিয়া আদৌ বন্ধ হয় না, তবে সঙ্কোচন-ক্রিয়ার যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। নিম্ন তাপমাত্রায় দেখা গেছে, গর্তের মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না, সঙ্কোচন অর্ধেক সম্পন্ন হয় তারপর আবার তা প্রসারিত হতে থাকে। এথেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, গর্তের মুখ বন্ধ করবার জন্যে নিউ-

ক্লিওলাসের ফাইব্রিলগুলির যে প্রসারণ ঘটছিল, তা নিম্ন তাপমাত্রায় যথেষ্ট প্রসারিত হয় না—তাই গর্তের মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না, কিন্তু গর্তের মুখ বড় হবার সময় ফাইব্রিলগুলি বাস্তবিক পক্ষে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। নিম্ন তাপমাত্রায় এই সঙ্কোচনের কোনই অসুবিধা হয় না, তাই প্রসারণ-ক্রিয়ারও কোন তারতম্য ঘটে না।

এই নিউক্লিওলার ভ্যাকুওলের প্রসারণ ও সঙ্কোচন-ক্রিয়ার তাৎপর্য কি? এর সঠিক পদ্ধতির সাহায্যেই ঘটছে, এটাই তার বাস্তব সাক্ষ্য—এই অনুমান হয়তো অন্যায় হবে না। আরও ব্যাপক গবেষণার উপর যে এই রহস্যের পূর্ণ উদ্ঘাটন নির্ভর করছে, তা বলাই বাহুল্য।

এই গবেষণাটি আমেরিকার উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক এ. সি. হিলডেব্রাণ্ডের (A. C. Hildebrandt) সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছিল এবং বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের কৃষি বিভাগে এই কাজ চলছে।

৫নং চিত্র

ঐ আগের ছবির নিউক্লিয়াসের আর একটি অবস্থা। নিউক্লিওলার ভ্যাকুওলটি উন্মুক্ত অবস্থায় এখন রয়েছে।

উত্তর আমাদের জানা নেই, তবে এই ধরণের ক্রিয়ার ফলে নিউক্লিওলাসের অন্তর্গত কোন পদার্থ নিঃসৃত হয়ে সাইটোপ্লাজমের সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে এবং সাইটোপ্লাজম থেকেও কোন বস্তু নিউক্লিওলাসের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। নিউক্লিওলাস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে আর. এন. এ. এক্সচেঞ্জ (R. N. A. Exchange) সম্পর্কে যে দীর্ঘ গবেষণা অনবরত চলছে, তা এই নির্দিষ্ট

[এই সম্পর্কে আরও বিবরণ American Journal of Botany, Vol. 53, No. 3, March, 1966, (Page 253-259) সংখ্যায় লেখক কর্তৃক প্রকাশিত 'Cine-Photomicrography of Low Temperature effects on cytoplasmic streaming, Nucleolar activity and Mitosis in single Tobacco cells in microculture' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।]

রহস্যময় বেতার-নক্ষত্র পালসার

দীপক বসু

বিজ্ঞানের ভাষায় পালস্ কথাটির অর্থ করলে (চিকিৎসা-বিজ্ঞান নয়) তার নিকটতম বাংলা প্রতিশব্দ দাঁড়ায় 'ঝলক'। আমরা জানি, কোন উৎস থেকে শক্তি বিকিরণ দু-রকম ভাবে হতে পারে—(১) সতত বিকিরণ ও (২) ঝলকে বিকিরণ। সম্প্রতি জ্যোতির্বিজ্ঞানীর যন্ত্রে আকাশের বুকে এক নতুন ধরণের বিকিরণকারী উৎস ধরা পড়েছে। এরা দ্বিতীয় উপায়ে অর্থাৎ ঝলকে ঝলকে শক্তি বিকিরণ করে থাকে। তবে এদের বিকিরণ কিন্তু আলোক-তরঙ্গের নয়—বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে; অর্থাৎ আকাশের ঐ সব নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে কিছু সময় পর পর এক-একটি বেতার-তরঙ্গের ঝলক এসে পৃথিবীতে পড়ছে। আলোচ্য উৎসগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'পাল্‌সার'।

১নং চিত্র

(ক) একটি সতত বিকিরণকারী উৎস বেতার-দূরবীক্ষণের দৃষ্টিসীমার মধ্য দিয়ে চলে যাবার সময় লেখনীযন্ত্রে গৃহীত লিপি। (খ) পাল্‌সারের লিপি।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, আলোক ও বেতার-তরঙ্গ মূলতঃ এক শ্রেণীর তরঙ্গেরই অন্তর্গত, যার নাম বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। এদের পরস্পরের মধ্যে তফাৎ শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। আলোক-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের (সাধারণভাবে শুধু দূরবীক্ষণ যন্ত্র বলে পরিচিত) মত বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্যে বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি হয়েছে। এরই ফলে গঠিত হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন শাখা—বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা। তবে মনে রাখতে হবে—আলোক-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মত বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কিন্তু দূরের জিনিষকে চোখে দেখা যায় না। বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র মূলতঃ আমাদের বাড়ীতে ব্যবহৃত রেডিও বা বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের মতই, তবে আরও অনেক উন্নত

কৌশলে গঠিত। এরিয়ালের সাহায্যে দূরাগত বেতার-তরঙ্গ সংগ্রহ করে গ্রাহক-যন্ত্রে তাকে পরিবর্জিত ও সুসংবদ্ধ করবার পর লিখন যন্ত্রে তাকে লিপিবদ্ধ করা হয়। বেতার-দূরবীক্ষণে গৃহীত উপরিউক্ত দুই প্রকার বিকিরণের (সতত ও ঝলক) লিপি ১নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত যত রকম বেতার-তরঙ্গ বিকিরণ-কারী উৎস আমাদের জানা ছিল, তাদের সকলেই প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ সতত বিকিরণকারী। মাত্র কয়েক মাস আগে ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎস আবিষ্কৃত হয়। এই অভিনব আবিষ্কারের গৌরবের অধিকারী হচ্ছেন ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ (এঁদের মধ্যে আছেন হিউইস, বেল, পিলকিংটন, স্কট ও কলিন্স্)। তাঁদের বেতার-দূরবীক্ষণের লেখনীতে কিছু অদ্ভুত ধরণের সঙ্কেত ধরা পড়ে (চিত্র ১ খ)। প্রথমে তাঁরা একে যান্ত্রিক বা স্থানীয় কোন গোলযোগ বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু পর পর কয়েক দিন আকাশের একটি বিশেষ অংশ থেকে একই ধরণের সঙ্কেত আসতে থাকায় তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে, এগুলি নিশ্চয়ই নতুন কোন উৎস থেকে আসছে। এই হলো পাল্সার আবিষ্কারের ইতিহাস। এরপর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে বিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজেদের যন্ত্রের সাহায্যে এই পর্যবেক্ষণকে সমর্থন করেন।

এযাবৎ চারটি মাত্র পাল্সার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানার্থে এদের নাম দেওয়া হয়েছে সি. পি. ১৯১৯, সি. পি. ০৯৫০, সি. পি. ১১৩৩ ও সি. পি. ০৮৩৪ (সি. পি. হচ্ছে কেম্ব্রিজ পাল্সার—C. P.=Cambridge Pulsar)। আরও সন্ধান চলেছে।

পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, পাল্সারগুলি আকারে মোটেই বড় নয়। একদিক থেকে আর এক দিকে এদের বিস্তৃতি ১০,০০০ কিঃ মিঃ-এর কাছাকাছি মাত্র। আমাদের কাছ থেকে এদের দূরত্ব প্রায় ৩০০ আলোক-বর্ষ অর্থাৎ এরা আমাদের ছায়াপথেরই অন্তর্গত।

বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে এই চিত্তাকর্ষক আবিষ্কারের পর স্বভাবতঃই আলোক-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে চুপ করে ছিলেন না। বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদ্বয় রাইল ও বেইলী (উভয়ই অবশ্য আসলে বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানী) শীঘ্রই একটি পাল্সারকে একটি অতি ক্ষীণ নীল রঙের তারার সঙ্গে মেলাতে চাইলেন। কিন্তু তাঁদের এই পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞানী-মহলে স্বীকৃত হয় নি। এঁরা ছাড়া সারা পৃথিবী জুড়ে আকাশের বুকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আলোক-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অন্য কোন পাল্সারের এখনও খোঁজ পান নি।

বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে গৃহীত লিপি থেকে প্রতিভাত হয়েছে যে, বিকিরিত ঝলকগুলি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, প্রতিটির মেয়াদ মাত্র ৩০ মিলি সেকেণ্ডের (১ মিঃ সেঃ =১ সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ) কাছাকাছি। দুটি পর পর ঝলকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান উপরিউক্ত চারটি নক্ষত্রের জন্যে যথাক্রমে ১·৩৩৭৩০১১৩ সেঃ, ০·২৫৩০৬৫১৫ সেঃ, ১·১৮৭৯০৯২৮ সেঃ ও ১·২৭৩৭৬৪২ সেঃ (আধুনিক বিজ্ঞান এক সেকেণ্ডের অত ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাপতে পারে)। সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই সময়ের ব্যবধান অস্বাভাবিকরূপে অপরিবর্তনীয়; অর্থাৎ যে কোন পাল্সারকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে—দুটি পর পর ঝলকের অন্তর্বর্তীকাল সব সময়ই তার নির্দিষ্ট মানে আছে। কিন্তু সময় ঠিক থাকলেও বিকিরিত শক্তি এক-একটি ঝলকে এক-এক রকম হয়ে থাকে।

১ (খ) নং চিত্রে সাধারণভাবে ঝলকগুলিকে যে রকম দেখানো হয়েছে, আসলে তা অতটা

সরল বা সহজ নয়। ২নং চিত্রে একটি ঝলককে বড় করে দেখানো হলো। দেখা যাচ্ছে যে, তিনটি উপঝলক নিয়ে এই ঝলকটি গঠিত। এদের মধ্যে প্রথমটি বৃহত্তম ও সবচেয়ে স্পষ্ট। সম্পূর্ণ ঝলকটির স্থায়িত্ব ৩৭ মিঃ সেঃ এবং বেশ খাড়াভাবে সোজা উপরে উঠে গেছে। সবগুলি পাল্‌সার থেকে আগত ঝলক যে একই রকম, তা নয়। উপঝলকের সংখ্যা ও আকৃতি অন্য রকমও হতে পারে। একটি পাল্‌সারের ক্ষেত্রে (সি. পি. ০৯৫০) প্রধান ঝলকের আরম্ভের প্রায় ১০০ মিঃ সেঃ আগে অপর একটি ক্ষুদ্র ঝলক দেখা গেছে।

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির বিজ্ঞানীরা সবগুলি পাল্‌সারকে ১৩ সেঃ মিঃ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পর্যন্ত ও ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা দুটিকে ১১ সেঃ মিঃ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেছেন। দেখা গেছে—সি. পি. ০৮৩৪ ও সি. পি. ১৯১৯-এর ক্ষেত্রে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তি খুব তাড়াতাড়ি কমে আসে।

উপরের আলোচনা থেকে পাল্‌সারের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা জানা গেল। এর পরেই প্রশ্ন উঠবে—ব্যাপারটা কি? অর্থাৎ এরা মূলতঃ কি ধরণের বস্তু? কি ভাবে এরা ঝলকে ঝলকে
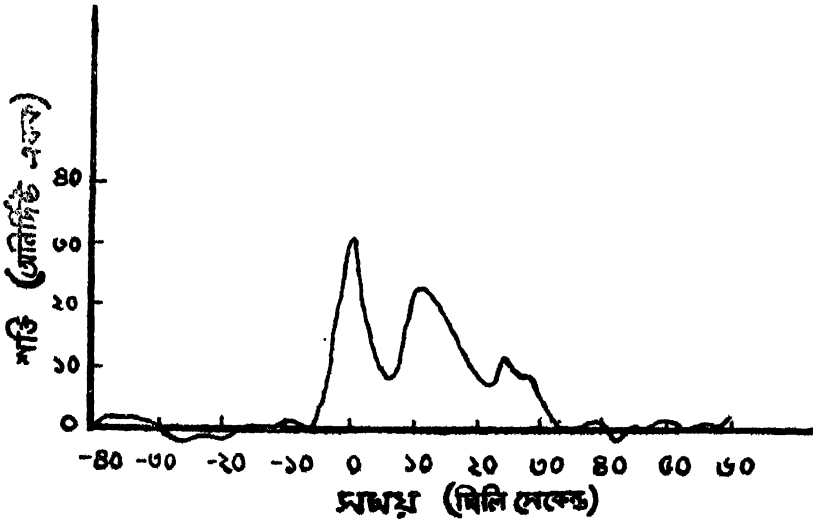
২নং চিত্র
পাল্‌সারের বিকিরিত একটি ঝলকের চেহারা।

শক্তি বিকিরণ করে চলেছে? দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেছেন এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে। ইতিমধ্যে অনেক তত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার কোনটাই পরিলক্ষিত সকল তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারে নি। এখানে এদের কয়েকটা সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

আমরা জানি যে, বিশেষ অবস্থায় বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের কম্পন বহুমুখী থেকে একমুখী হয়ে যেতে পারে। পাল্‌সারের বিকিরিত তরঙ্গমালাও একমুখী বলে পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

এদের বিকিরিত তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক মিটার থেকে কয়েক সেণ্টিমিটার পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বিকিরণের শক্তি কিভাবে পরিবর্তিত হয়, তা দেখবার জন্যে

পাল্‌সারের অন্যতম প্রধান গুণ হলো সময়ের নিয়মানুবর্তিতা। পর পর দুটি ঝলকের অন্তর্বর্তী

কাল এক সেকেণ্ডের কোটি কোটি ভাগের একভাগও পরিবর্তিত হয় না। এথেকে প্রথমে কেউ কেউ ভেবেছিলেন—বিশ্বের কোথাও অন্য কোন বুদ্ধিমান জীবের সন্ধান এতদিনে পাওয়া গেছে। কিন্তু শীঘ্রই এই সন্দেহ অমূলক বলে প্রতিপন্ন হলো। তার প্রথম কারণ—যে সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে সংকেত আসছে, আন্তর্নাক্ষত্রিক যোগাযোগের পক্ষে তা মোটেই সুবিধাজনক নয়। কারণ এই সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে ছায়াপথের স্বাভাবিক বিকিরণ হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানীরা এদের যে দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন, তা যদি সত্য হয়, তবে সেখান থেকে পৃথিবীতে আসতে হলে বেতার-তরঙ্গের যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন হবে, আলোচ্য বুদ্ধিমান সভ্যতা আমাদের চেয়ে যতই বিজ্ঞানে উন্নত হোক না কেন, সে শক্তি নিক্ষেপ করা একেবারেই অসম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

তাহলে ব্যাপারটা কি? কোন কোন নক্ষত্রের জীবনে বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শেষের দিকে এমন একটা পর্যায় আসে, যখন তার অভ্যন্তরের পারমাণবিক জ্বালানী সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। নক্ষত্রটি তখন ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ করে। সঙ্কুচিত হতে হতে তার আকৃতি খুব ছোট হয়ে যায় এবং অভ্যন্তরস্থ বস্তু অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট হয়। এই অবস্থায় তাদের বলা হয় শ্বেতবামন। এর পর এক সময়ে প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণের চাপে সকল বস্তু কেন্দ্রের দিকে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তখন বস্তুর ঘনত্ব আরও বহুগুণ বেড়ে যায়। ইলেকট্রন, প্রোটন আলাদা ভাবে থাকতে পারে না, মিশে গিয়ে নিউট্রনে পরিণত হয়, জটিল পারমাণবিক প্রক্রিয়ায়। এই অবস্থার নাম নিউট্রন নক্ষত্র। শ্বেত বামন ও নিউট্রন নক্ষত্র হচ্ছে নক্ষত্রের জীবনে যথাক্রমে বার্ধক্য ও শেষ অবস্থা।

বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে দেখেছেন যে, উপরিউক্ত উভয় অবস্থাতেই নক্ষত্রের স্পন্দনশীল হওয়া সম্ভব এবং এই স্পন্দনের সময় এরা ঝলকে ঝলকে বেতার-তরঙ্গ বিকিরণ করতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার কারো কারো মতে—স্পন্দন নয়, নিউট্রন নক্ষত্রের আবর্তনই হচ্ছে পরিলক্ষিত বেতার-ঝলকের জন্যে দায়ী। হয়তো নিউট্রন নক্ষত্র একদিকে সতত বিকিরণ করে চলেছে। প্রতি এক সেকেণ্ডের কাছাকাছি সময়ে আপন অক্ষের উপর একবার ঘুরতে ঘুরতে সেই অংশ পৃথিবীর দিকে চলে আসছে এবং পরক্ষণেই অদৃশ্য হচ্ছে। তাহলে পৃথিবীর বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে একটি করে ঝলক পাওয়া যাবে।

আবার এমনও হতে পারে—পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের মত একটি শ্বেত বামন বা নিউট্রন নক্ষত্রের চতুষ্পার্শ্বে অপর একটি শ্বেত বামন বা নিউট্রন নক্ষত্র ঘুরছে ও বিকিরণ করে চলেছে। তাহলেই সেটি যখন পৃথিবীর দিকে আসবে তখন আমরা তাথেকে বিকিরণ পাব এবং পরমুহূর্তেই উল্টোদিকে চলে যাবে, ফলে বিকিরণ ঝলকের আকারে হবে।

এছাড়া আরও অনেক মতবাদ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। তবে আগেই বলা হয়েছে যে, এদের কোনটাই গ্রহণযোগ্য বলে এখনও বিবেচিত হয় নি।

১৬১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারীর এক মনোরম সন্ধ্যায় গ্যালিলিও প্রথম নিজের হাতে তৈরি দূরবীন দিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ সুরু করে করেছিলেন। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আমরা আজ অনেক এগিয়েছি। যত বড় বড় যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে ও তার মাধ্যমে নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, সমস্যাও ততই বাড়ছে। মাত্র কয়েক বছর আগে আবিষ্কৃত কোয়াসারের রহস্য এখনও পরিষ্কার হয় নি। এরই মধ্যে আবার এলো পাল্‌সার। চিন্তার কথা। তবে যেভাবে বিজ্ঞানীরা উঠেপড়ে লেগেছেন, তাতে মনে হয় এরা কেউই দীর্ঘদিন রহস্যের জালে আবৃত থাকতে পারবে না। আমাদেরও তাই কামনা।*

---

* এই প্রবন্ধ লেখবার সময়ের মধ্যে বৃটিশ, আমেরিকান ও অষ্ট্রেলীয় বেতার জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীরা আরও পাঁচটি পাল্‌সার আবিষ্কার করেছেন। ফলে বর্তমানে (১৪ই অগাষ্ট, ১৯৬৮) পাল্‌সারের সংখ্যা মোট নয়টি। —লেখক

কৃত্রিম উপগ্রহগুলির বৈজ্ঞানিক অবদান

শঙ্কর চক্রবর্তী

১৯৬৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর মহাকাশে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুটনিক প্রেরণের একাদশ বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হলো। পৃথিবীর জল, মাটি এবং বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে মহাকাশে বিজ্ঞানের এই যে বিরাট অভিযান সুরু হয়েছিল, গত এগারো বছরে বিজ্ঞান-জগৎকে তা নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রথম স্পুটনিক পাঠানোর কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা। তারপর তাঁরা ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এ-পর্যন্ত প্রায় সাত-শ-এর মত স্পুটনিক মহাকাশে পাঠিয়েছেন। স্পুটনিকরূপী উড়ন্ত গবেষণাগারগুলি পৃথিবীকে পরিক্রমাকালীন অবস্থায় ওদের ভিতরে বসানো স্বয়ংক্রিয় গবেষণার যন্ত্রপাতির কলকাঠি নাড়াচাড়া করে অজস্র বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সংগৃহীত তথ্যকে টেলিমেট্রিক যন্ত্রব্যবস্থার মাধ্যমে বেতার-তরঙ্গে রূপ পাল্টে পৃথিবীতে বিজ্ঞানীদের গবেষণা-কেন্দ্রগুলিতে ফেরৎ পাঠিয়েছে।

পৃথিবীর কাছাকাছি বা দূরবর্তী মহাকাশ অঞ্চলই শুধু নয়, পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ এবং মঙ্গল, শুক্র প্রভৃতি গ্রহগুলি আজ বিজ্ঞানীদের অভিযানের নাগালের মধ্যে ধরা দিয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং আমেরিকার বিজ্ঞানীরা চাঁদের জমির বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় গবেষণাগারকে নামিয়েছেন এবং খোদ চাঁদকেই গুটিকয়েক স্পুটনিক উপহার দিয়েছেন, যারা চাঁদের জমির খুব কাছাকাছি এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে চাঁদকে পরিক্রমা করে চলেছে। এই গবেষণাগারগুলির সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে চাঁদের জমির গঠন-প্রকৃতি, চাঁদের চৌম্বক ক্ষেত্র, চাঁদের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব এবং আরও বহু রহস্যের সমাধান বিজ্ঞানীরা করতে পেরেছেন।

শুক্র এবং মঙ্গল গ্রহের দিকে বিজ্ঞানীরা পাঠিয়েছেন মহাকাশভেদী রকেট, যাদের মধ্যে একটি শুক্র গ্রহের জমিতে অবতরণ করেছে। পৃথিবীর এই দুটি প্রতিবেশী গ্রহ সম্বন্ধে আজ বহু অজানা তথ্য আমাদের আয়ত্তে এসেছে।

মহাকাশ বিজ্ঞানের অভিযানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের স্থচনা হয়েছিল সেদিন, যেদিন পৃথিবীর প্রথম মানুষ মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছিল। সেই মানুষটি হলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের নাগরিক ইউরি গাগারিন। কিছুদিন আগে এক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের একাদশ বার্ষিকীতে তাঁকে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করছি। সেই সঙ্গে স্মরণ করছি তিনজন আমেরিকান মহাকাশযাত্রী গ্রিসম, হোয়াইট এবং চ্যাফে ও রুশ মহাকাশযাত্রী কোমারভকে। মহাকাশ অভিযানের বিভিন্ন দুর্ঘটনায় এঁরা প্রাণ হারিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা এ-পর্যন্ত পঁচিশজন মহাকাশযাত্রীকে মহাকাশে পাঠিয়ে আবার নিরাপদে তাঁদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। মহাকাশে সম্পূর্ণ ওজনবিহীন পরিবেশ ও অন্যান্ত জীববৈজ্ঞানিক সমস্যা এঁরা সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই সাফল্যের ভিত্তিতেই দীর্ঘ সময়ব্যাপী মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনা বিজ্ঞানীরা আজ করতে পারছেন।

অদূর ভবিষ্যতে চাঁদের জমিতে মানুষকে নামানোর পরিকল্পনার কাজে বিজ্ঞানীরা বহুদূর এগিয়ে গেছেন। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, চাঁদের দেশে যেতেই হবে, এমন কি মাথাব্যথার কারণ রয়েছে? এই প্রসঙ্গে অ্যাসট্রোনটিক্স বা মহাকাশ বিজ্ঞানের জনক জিওলকভ্স্কীর একটি কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন—"Earth is the cradle for man but man will not live in that cradle for ever।" বর্তমান কালের অন্যতম বিজ্ঞানীও এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আমরা চাঁদে যাব, তার কারণ চাঁদ বলে একটা বস্তু রয়েছে। অবশ্য চাঁদে অভিযানের পিছনে আরো অনেক বড় বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। এই প্রবন্ধে সে আলোচনায় আমরা যাব না। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুটনিকগুলির বৈজ্ঞানিক অবদান।

গবেষক ও কর্মী স্পুটনিক

বহু অর্থব্যয় ও বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে যে স্পুটনিকগুলি মহাকাশে পাঠানো হয়েছে, তা যে বিজ্ঞানীদের এক খামখেয়ালীপনা, বৈজ্ঞানিক দুরূহ তত্ত্বের সমাধানপ্রাপ্তির আত্মপ্রসাদ শুধু নয়, তা সবাই স্বীকার করবেন। নিছক বৈজ্ঞানিক গবেষণা যেমন মহাকাশ অভিযানের একটি বিশেষ অঙ্গ, তেমনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কল্যাণ-সাধনের কাজেও এ এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে।

এ-পর্যন্ত যত স্পুটনিক মহাকাশে পাঠানো হয়েছে, মোটামুটি দু-ভাগে তাদের ভাগ করা যায়। এক দলের নাম দেওয়া যেতে পারে 'গবেষক' স্পুটনিক, আর একদল হলো 'কর্মী' স্পুটনিক। গবেষক স্পুটনিকেরাও কিছু কিছু কাজ করে থাকে, তবে দু'দল স্পুটনিকের কাজের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গবেষক স্পুটনিকগুলিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই যন্ত্রটিকে কাজে লাগিয়ে আমরা যা জানতে পারছি, তা এর সাহায্য ছাড়া আবিষ্কার করা যেত না। একটি রোগের সংক্রমণ ঘটেছে, সে তথ্যটি হয়তো আমরা এই যন্ত্রটির কাছ থেকে পেলাম, কিন্তু সেই সংক্রমণকে প্রতিরোধ করবার কাজে এই যন্ত্রটি কিছু করতে পারে না। তথ্যকে কিভাবে কাজে লাগানো যাবে, তা নির্ভর করছে, যন্ত্রের ব্যবহার-কর্তা মানুষের উপরে।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর যে স্পুটনিকটি পাঠানো হয়েছিল, সেটি ছিল একটি গবেষক স্পুট্নিক। এর উপরে একটি কাজ ন্যস্ত করা হয়েছিল। সেটি হলো—বায়ুমণ্ডলের একেবারে উপর তলায় বায়ুর বাধার পরিমাণকে পরিমাপ করা।

এর আরও একটি অনুসন্ধানের দায়িত্ব ছিল, তা হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাকাশে কি ধরণের বিকিরণ কতটা পরিমাণে রয়েছে, তা আবিষ্কার করা। স্পুট্‌নিকটি দুটি কাজই সুষ্ঠুভাবে করেছিল।

কর্মী স্পুট্‌নিকগুলি আবার যে সব তথ্য আমাদের সরবরাহ করে, তার সবগুলিই আমাদের জানা রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সব যন্ত্রকে ব্যবহার করি, এদের কাজটা অনেকটা তাদের মত। একটি কোন বিশেষ কাজ করবার জন্যে এদের এক-একটিকে তৈরি করা হয় এবং সে কাজটাও এরা ভালভাবেই করে থাকে।

আমরা প্রথমে গবেষক স্পুট্‌নিকগুলির দু-একটি কাজের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

স্পুট্‌নিক ও বিকিরণ বলয়

১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী আমেরিকার প্রথম স্পুট্‌নিক মহাকাশচারণের সময় দুটি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বলয় আবিষ্কার করে। পৃথিবী থেকে বলয় দুটির সবচেয়ে তেজস্ক্রিয় অংশের দূরত্ব হলো যথাক্রমে ৩২০০ ও ১৬০০০ কিলোমিটার। কাছের বলয়টি পৃথিবীর ৬০০ কিলোমিটার দূর থেকে সুরু হয়েছে। তৃতীয় আর একটি বলয়ের সন্ধানও পাওয়া গেছে। সেটি পৃথিবীর জমি থেকে প্রায় ১০০,০০০ কিলোমিটার দূরে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এবং আন্তর্গ্রহ মহাকাশ অঞ্চলের সীমান্ত বরাবর অবস্থিত।

সোভিয়েট ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা গেছে যে, প্রথম বলয়টি প্রধানতঃ প্রোটন কণিকার দ্বারা গঠিত, যাদের শক্তির পরিমাণ প্রায় ১০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের কাছাকাছি। এর প্রান্তভাগ কখনো কখনো পৃথিবীর ২০০ থেকে ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে নেমে আসে। দ্বিতীয় বলয়টি প্রধানতঃ ইলেকট্রন কণিকার দ্বারা গঠিত, যাদের শক্তির পরিমাণ ১ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের কাছাকাছি।

বলয়গুলির কণিকার উৎস হলো সূর্য। সূর্য থেকে যাত্রা সুরু করে এই কণিকাগুলির কিছু অংশ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের চুম্বকরশ্মির বেড়াজালে বন্দী হয়ে পৃথিবীর চারদিকে বিকিরণ বলয়গুলিকে তৈরি করেছে। সূর্যদেহে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা ও তীব্রতা যখন বেড়ে ওঠে, তখন সূর্য থেকে নিঃসৃত সৌরকণিকা স্রোতের তীব্রতাও বৃদ্ধি পায় এবং স্বভাবতঃই বিকিরণ বলয়গুলির কণিকাগুলির শক্তির মাত্রাও বেড়ে ওঠে।

বিকিরণ বলয়গুলির আবিষ্কার ঘটবার পর বিজ্ঞানীরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এই কারণে যে, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ মহাজাগতিক রকেটের যাত্রীরূপে এই বিকিরণ বলয়গুলির মধ্য দিয়ে যখন চাঁদ বা অন্য গ্রহের দিকে অভিযান করবে, তখন বলয়ের ইলেকট্রন কণিকার সংঘাতে রকেটের ধাতব দেহ থেকে সৃষ্টিলাভ করবে এমন জোরালো জাতের রঞ্জেন রশ্মি, যার প্রভাব আরোহী মানুষের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ও সৌরবায়ু (Solar wind)

স্পুট্‌নিকের মাধ্যমে বিকিরণ বলয়ের গবেষণার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের গঠন-প্রকৃতির রহস্য ও সৌরবায়ু সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা গেছে।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের গঠন যে কয়েকটি ঘটনার প্রভাবে বিকৃতি লাভ করে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ভূমিকা হলো সৌরবায়ুর—সূর্য থেকে নিঃসৃত তড়িতাবিষ্ট কণিকার সমবায়ে যা গঠিত। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে, যার নাম হলো চৌম্বক মণ্ডল (Magnetosphere)। বিভিন্ন স্পুট্‌নিকের অনুসন্ধানে জানা গেছে, পৃথিবীর

জমি থেকে প্রায় ১,৪০০০০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত এই চৌম্বক মণ্ডলের চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির মাত্রার মধ্যে বড় একটা পরিবর্তন ঘটে না। এই শক্তির মাত্রা ২০ গামার মত (এখানে গামা হলো চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির একক এবং এর পরিমাণ এক গসের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ)। চৌম্বক মণ্ডল একটি সদা পরিবর্তনশীল অঞ্চলের দ্বারা আবদ্ধ—যার নাম হলো ম্যাগ্‌নিটোপজ (Magnetopause)। স্পুট্‌নিক চৌম্বক মণ্ডলের এলাকা ছাড়িয়ে যখনই ম্যাগ্‌নিটোপজের এলাকায় মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছে, তখনই তার ম্যাগ্‌নিটোমিটার যন্ত্রের কাঁটায় ধরা পড়ছে যে, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাণ ২০ গামা থেকে হঠাৎ কমে গিয়ে ১০ গামায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকেরও পরিবর্তন ঘটছে।

সৌরবায়ুর প্রভাবে ম্যাগ্‌নিটোপজের চেহারা সদা অস্থির, চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল। সৌরবায়ুর সংঘাতে পৃথিবীর অন্ধকার দিকে চৌম্বক মণ্ডলের মেরু অঞ্চলের চুম্বক-রশ্মিগুলি বেঁকে গিয়ে একটি লম্বা লেজের আকারে প্রায় ৩০০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। চৌম্বক মণ্ডলের সূর্যালোকিত অংশের চেহারাটা মোটামুটি স্থির ও অপরিবর্তনশীল। স্পুট্‌নিকের অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, চৌম্বক মণ্ডলের এই লেজের অংশ সৌরবায়ুর প্রভাবাধীন। এই অনুসন্ধানের কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয় নি।

সৌরবায়ু সম্বন্ধে বিভিন্ন স্পুট্‌নিকের গবেষণায় জানা গেছে যে, পৃথিবীর কাছাকাছি এর বেগ সেকেণ্ডে ৪০০ কিলোমিটারে এসে পৌছায়। এ সূর্য থেকে সোজা বেড়িয়ে আসে—কখনো একটানাভাবে, কখনো ঝলকে ঝলকে। সৌরদেহে সূর্যকলঙ্ক দেখা দিলে এর চেহারাটা আরো ঝড়ো হয়ে দাঁড়ায় এবং গতিও বেড়ে ওঠে। সৌরবায়ুর ঘনত্ব সম্বন্ধে তথ্যের ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের মহাকাশচারী রকেট লুনিক-১ ও লুনিক-২-এর কাছ থেকে জানা গিয়েছিল যে, মহাকাশ অঞ্চলে সৌরবায়ুর প্রবাহের মাপ প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার ক্ষেত্রে ১০০ মিলিয়ন প্রোটনের মত। আমেরিকার এক্সপ্লোরার-এক্স ও মেরিনার-২-এর সংগৃহীত তথ্য হলো এই যে, পৃথিবীর কাছাকাছি অঞ্চলে সৌরবায়ুর গড় ঘনত্ব বেশীর ভাগ সময়ে ১ থেকে ১০টি প্রোটনের মত হতে দেখা যায়।

মহাকাশচারী রকেটগুলির মাধ্যমে সৌরবায়ুর গঠন-প্রকৃতি ও বিভিন্ন পরিমাপ সম্বন্ধে সংগৃহীত নানা তথ্যের মাধ্যমে সূর্য সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উপর খানিকটা আলোকপাত করা সম্ভব হচ্ছে। সেটি হলো, সৌরবায়ু সূর্যের দেহ থেকে কি পরিমাণ ভর ও শক্তি মহাকাশে চালান করে দিচ্ছে। আঙ্কিক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এই পরিমাণ হলো এক সেকেণ্ডে ১০ লক্ষ টনের মত। সূর্যের বিগত ১৫০০ কোটি (আনুমানিক) বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে খোয়া যাওয়া এই ভরের পরিমাণটা হলো সূর্যের মোট ভরের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। তেমনি, সৌরবায়ুর বেগ তৈরির কাজে সূর্যের করোনাকে প্রসারণের জন্যে যে পরিমাণ শক্তি ইতিমধ্যেই খরচা হয়ে বসে আছে, তা সূর্য থেকে নিঃসৃত মোট শক্তির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

স্পুট্‌নিক ও জ্যোতির্বিদ্যা

অসীম মহাকাশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কত ধরণের তরঙ্গ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপর এসে পৌছুচ্ছে। তারকা-জগৎ থেকে আসে আলো ও বেতার-তরঙ্গ, অনেক নক্ষত্র পাঠায় বেগুনী-পারের আলো, রঞ্জেন রশ্মি ও গামা রশ্মি। আবার কিছু নক্ষত্র এবং মহাকাশের নানা অঞ্চল থেকে আসে মহাজাগতিক রশ্মি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

পেরিয়ে প্রবেশের ছাড়পত্র জোটে শুধু আলো এবং বেতার-তরঙ্গের—অন্য সব রশ্মি মাঝ রাস্তায় বন্দী হয়ে পড়ে। সূর্যের বেগুনীপারের আলো এবং সৌরকণিকা-স্রোত বায়ুমণ্ডলের উপর তলায় অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন অণু ও পরমাণুর সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করে আয়নমণ্ডলকে গড়ে তোলে।

অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

১৯৬৭ সালের ১৮ই অক্টোবর সূর্য গবেষণার জন্যে Orbiting Solar Observatory নামে এক নতুন ধরণের স্পুট্‌নিক আমেরিকান বিজ্ঞানীরা পাঠিয়েছিলেন। ঐ স্পুট্‌নিক সূর্যের ৪০০০ ছবি তুলে বেতার সঙ্কেতের মাধ্যমে
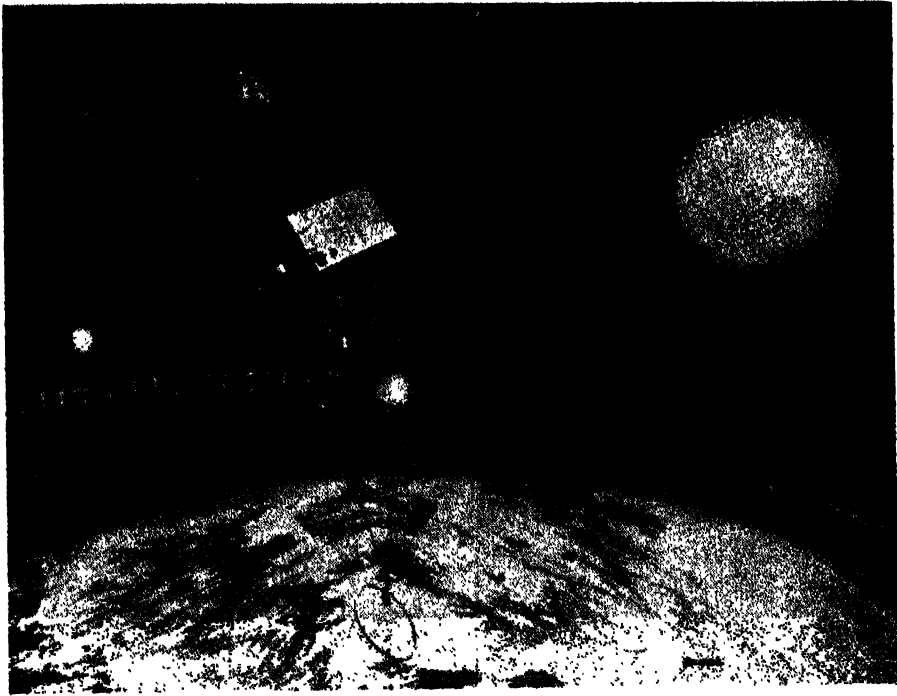
১নং চিত্র

এই স্পুট্‌নিকগুলি যে যন্ত্রপাতি বহন করছে, তাদের দ্বারা সূর্যের দেহে জোরালো ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সময় উর্ধ্বাকাশের ঘনত্ব এবং বিকিরণের ধর্মাবলীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজ চালানো হবে। এছাড়া মহাকাশ থেকে বায়ুমণ্ডলের উপর উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণিকাসমূহের সংঘাত এবং অতি নিম্ন কম্পন সংখ্যার বেতার-তরঙ্গ পরিমাপের যন্ত্রও এদের মধ্যে রয়েছে।

জ্যোতির্বিদদের দীর্ঘকালের আক্ষেপ, এই বায়ুমণ্ডলের বাধার জন্যে তারকা-জগৎ এবং ব্রহ্মাণ্ডের বহু সংবাদ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহগুলি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক

ফেরৎ পাঠিয়েছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে এই প্রথম আলট্রাভায়োলেট আলোতে সূর্যের ছবি তোলা সম্ভব হলো। স্পুট্‌নিকের মধ্যে আলট্রাভায়োলেট স্পেকট্রোমিটাররূপী যে

দূরবীন যন্ত্রটি ছিল, তা অন্য সব আলোকে বাতিল করে সূর্যের করোনার মধ্যে যে পরমাণুগুলি সবচেয়ে বেশী পরিমাণে বিকিরণ ঘটাচ্ছে, তাদের আলোকেই গ্রহণ করছিল। সূর্যের অভ্যন্তরে তাপ-পারমাণবিক প্রক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থগুলি কি পরিমাণে তৈরি হচ্ছে, আলট্রা-ভায়োলেট আলোতে গৃহীত সূর্যের ঐ ছবিগুলির মধ্যে তা সর্বপ্রথম ধরা পড়বে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাধার জন্যে পৃথিবী থেকে ঐ জাতীয় ছবি তোলা কোন দিনই সম্ভব হতো না।

ছবিগুলি এমনই নতুন ও বিচিত্র ধরণের যে, তাদের পুরো বিশ্লেষণের কাজ সম্পূর্ণ হতে বেশ কিছু দিন সময় লাগবে। পৃথিবীতে তাপ-পারমাণবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি হয়তো এরপর বিজ্ঞানীদের করায়ত্ত হতে পারে।

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকান মহাকাশযাত্রী রিচার্ড গর্ডন তাঁর মহাকাশযান থেকে ক্যামেরা যন্ত্রে কিছু তারার আলট্রাভায়োলেট আলোর ছবি তুলেছিলেন। সেই ছবিগুলি বিশ্লেষণের কাজ সম্পূর্ণ হতে দীর্ঘ সতেরো মাস সময় লেগেছিল। সেই ছবিগুলির মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করলো এক বিরাট ধূলিমেঘ, যার ব্যাস হলো ১২০ মিলিয়ন আলোক-বর্ষ। এই ধূলিমেঘ পৃথিবী থেকে ৪০০ মিলিয়ন আলোক-বর্ষ দূরে Orion নক্ষত্রপুঞ্জকে বৃত্তের আকারে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে রয়েছে।

অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলে ধরা পড়লো, মেঘের মধ্যে ধূলার কণিকাগুলি বৃত্তের বাইরে প্রান্তের দিকে জড়ো হয়ে আছে, যেখানে কালক্রমে ওদের একটি নক্ষত্ররূপে গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি বিরাট রহস্য—ধূলোকণারা ক্রমাগত এক জায়গায় জড়ো হয়ে কিভাবে একটি নক্ষত্ররূপে গড়ে ওঠে, সেই পদ্ধতির উৎপত্তির মূল ব্যাপারটা সম্বন্ধে হয়তো ছবিগুলি একদিন আলোকপাত করতে পারবে।

মহাকাশ থেকে নিম্ন কম্পন-সংখ্যার বেশীর ভাগ বেতার-তরঙ্গই পৃথিবীতে কোন দিন এসে পৌঁছুতে পারে না। সূর্য, বৃহস্পতি, Milky way বা ছায়াপথ এবং অন্যান্য তারকা-জগৎ থেকে এই জাতীয় তরঙ্গ এসে পৌঁছুচ্ছে। এই বছর জুলাই মাসে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা এক্সপ্লোরার-৩৮ নামে একটি রেডিও জ্যোতি-বৈজ্ঞানিক স্পুট্‌নিক মহাকাশে পাঠিয়েছেন। পৃথিবী থেকে ৫৯৬৮ কিলোমিটার দূরে একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে যে বস্তুটি পৃথিবীকে পরিক্রমা করে চলেছে। এই স্পুট্‌নিক থেকে পাওয়া সঙ্কেতের সাহায্যে জ্যোতির্বিদেরা ছায়াপথের সর্বপ্রথম নিম্ন কম্পন-সংখ্যার একটি মানচিত্র তৈরি করতে পারবেন।

গবেষক স্পুট্‌নিকগুলির কিছু কিছু কাজের পরিচয় আমরা লাভ করবার চেষ্টা করলাম। এবারে কর্মী স্পুট্‌নিকগুলির কাজের কিছুটা পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

আকাশে আলোকস্তম্ভ

সীমাচিহ্নহীন সাগরের জলে জাহাজের সঠিক অবস্থানকে নির্ণয় করবার কাজ বহুদিন পর্যন্ত এক জটিল সমস্যা ছিল। কোন জায়গার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার সঠিক পরিমাণ ছাড়া এই অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অক্ষাংশ পরিমাপের ব্যাপারে ধ্রুবতারার সাহায্যের প্রয়োজন হতো, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেই সাগরবক্ষে ভাসমান একটি জাহাজ বা আকাশচারী বিমানের পক্ষে তাদের অক্ষাংশ এবং ফলে সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো। বেতার বিজ্ঞানের আবিষ্কার হবার পর এই সমস্যাটা অনেকখানি কমেছে।

আকাশচারী বিমান এবং সাগরবক্ষে ভাসমান

জাহাজ—এরা আজ তাদের সঠিক অবস্থানকে সর্বক্ষণের জন্যে অনেক সহজভাবে নির্ণয়ের কাজে নতুন একটি বন্ধুকে লাভ করেছে। সে হলো মহাকাশচারী স্পুট্‌নিক। স্পুট্‌নিক থেকে যে বেতার-তরঙ্গ এসে পৌঁছুচ্ছে, জাহাজ বা বিমানের ন্যাভিগেটর নিজেদের অবস্থান থেকে একটি ভার্টিক্যাল বা উর্ধ্বরেখা (পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে জাহাজ বা বিমান পর্যন্ত অঙ্কিত রেখা) টেনে, স্পুট্‌নিক সে রেখার সঙ্গে কত ডিগ্রী কোণ রচনা করছে, তা নির্ণয় করবার কাজে ঐ বেতার-তরঙ্গের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই কাজের জন্যে অবশ্য বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। তবে এই ব্যবস্থার সুবিধাটা হলো এই যে, মেঘ বা কুয়াশা, সব রকম প্রাকৃতিক বাধার মধ্যে জাহাজ বা বিমানের সঠিক অবস্থানকে নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

সমুদ্রের বুকে স্পুট্‌নিকের সাহায্যে অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে জাহাজ বা বিমানের ন্যাভিগেটর ডপ্‌লার এফেক্টের উপরেও নির্ভর করেন। একটি শব্দের উৎস যদি শ্রোতার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, তাহলে শব্দের কম্পন-সংখ্যা এবং জোর ক্রমেই বেড়ে উঠছে বলে মনে হবে। আবার শব্দের উৎস যদি শ্রোতার কাছ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যেতে থাকে, তাহলে শব্দের কম্পন-সংখ্যা ও জোর দুই-ই কমে আসছে বলে মনে হবে। ডপ্‌লার বুঝতে পেরেছিলেন, শব্দের মত আলোর ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা যাবে এবং কম্পন-সংখ্যার এই পরিবর্তনকে শব্দ বা আলোর একটি উৎসের এগিয়ে আসা বা পিছিয়ে যাবার বেগ নির্ণয়ের কাজে প্রয়োগ করা যাবে। এই ব্যাপারটিই 'ডপ্‌লার এফেক্ট' নামে পরিচিত।

আলোর মত একটি স্পুট্‌নিক থেকে পাঠানো বেতার-তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যার বাড়া বা কমার পরিমাপের মধ্য দিয়ে জানা যাবে যে, স্পুট্‌নিকটি এগিয়ে আসছে, না দূরে চলে যাচ্ছে। অবশ্য এর জন্যে জাহাজ বা বিমানের ন্যাভিগেটরকে জানতে হবে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে স্পুট্‌নিকটি ঠিক কোথায় রয়েছে, অর্থাৎ স্পুট্‌নিকের গতিপথের একটি মানচিত্র তার হাতে থাকা দরকার।

বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তরগুলির সঙ্গে সংঘাত ঘটলে একটি স্পুট্‌নিকের কক্ষপথের চেহারায় পরিবর্তন ঘটবেই। কিন্তু একটি স্পুট্‌নিককে যদি সম্পূর্ণভাবে বায়ুমণ্ডলের বাইরের কোন কক্ষপথে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে আগামী একমাসব্যাপী এর গতিপথ এবং অবস্থানগুলি কি হবে, তা অনেক আগেই নির্ণয় করে ফেলা সম্ভব হবে।

যদি চারটি স্পুট্‌নিককে পৃথিবী থেকে ৬৪০ কিলোমিটার দূরত্বে একই বৃত্তাকার কক্ষপথে পরস্পরের কাছ থেকে সমান দূরত্বে স্থাপন করা যায়, তাহলে ঐ উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের অতি স্বল্প ঘনত্বের জন্যে সেখানকার গ্যাসীয় বস্তুগুলির সঙ্গে সংঘাতে স্পুট্‌নিকের কক্ষপথের বিচ্যুতি ঘটবার কোন সম্ভাবনা নেই। ঐ দূরত্বে একটি স্পুট্‌নিক পৃথিবী পরিক্রমার জন্যে প্রায় দেড় ঘণ্টার মত সময় নেবে এবং পৃথিবীর যে কোন জায়গায় আকাশ থেকে একটি স্পুট্‌নিকের অন্তর্ধান ঘটবার ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যেই আর একটি স্পুট্‌নিক দিগন্তের কাছে উঁকি মারতে সুরু করবে।

ন্যাভিগেসনের কাজে সাহায্যের জন্যে একটির বেশী স্পুট্‌নিক থাকবার সুবিধা হলো এই যে, শক্তি ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটবার ফলে একটি স্পুট্‌নিক থেকে বেতার-সঙ্কেত পাঠাবার কাজ যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে বাকি তিনটি স্পুট্‌নিক আকাশে আলোকস্তম্ভের মত জাহাজ বা বিমানের ন্যাভিগেটরদের অবস্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে সাহায্য করবে।

আবহাওয়া স্পুট্নিক

বায়ুমণ্ডলের প্রথম স্তরটির নাম ট্রপোস্ফিয়ার। বাতাস, মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি—আবহাওয়া তৈরির গোটা কারখানাটাই হলো এখানে। ট্রপোস্ফিয়ারের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে যে সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে, পৃথিবীর কোন জায়গা থেকে তার একটি টুক্রা ছবিই আমাদের চোখে পড়ে।

একটি আবহাওয়া ষ্টেশন দশ বর্গমাইল পরিমিত একটি জায়গার আবহাওয়ার তথ্য সঠিকভাবে আমাদের জানাতে পারে। পর্যবেক্ষণ বিমানের ক্ষেত্রে এই এলাকার পরিমাণ দাঁড়াবে ৮০ থেকে ৪৮০ বর্গ কিলোমিটারের মত। আবহাওয়া তৈরির সমগ্র অঞ্চলের তুলনায় আমাদের পরীক্ষার নাগালের মধ্যে যে অঞ্চলটুকু পাওয়া যাচ্ছে, তা খুবই ছোট, তাই আবহাওয়া অফিসের পুর্বাভাস প্রায়ই বেঠিক হতে দেখা যায়।

একটি স্পুট্নিকের মধ্যে আবহাওয়া পরিমাপের যন্ত্রপাতি বসিয়ে তাকে পৃথিবী পরিক্রমার কাজে লাগিয়ে দিলে ঐ স্বয়ংক্রিয় সন্ধানী যন্ত্রগুলির নাগালের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় ৮,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ধরা পড়বে। যন্ত্রগুলি যে সব প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছে, কোন গ্রাহক ষ্টেশনের উপর দিয়ে যাবার সময় সেই তথ্যগুলিকে বেতার-তরঙ্গে রূপ পাল্টে তার হাতে তুলে দিচ্ছে। সেই তথ্যগুলি সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষিত হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছে যাচ্ছে।

একটি স্পুট্নিক চব্বিশ ঘণ্টায় সতেরো বার পৃথিবীকে পরিক্রমার মধ্য দিয়ে তার সমগ্র অঞ্চলগুলির উপর পাড়ি জমাচ্ছে। পৃথিবীর জমি, সমুদ্র, মেঘের স্তর প্রত্যেকে কি পরিমাণ তাপ প্রতিফলিত করছে স্পুট্নিকের পরিমাপক যন্ত্রে তা ধরা পড়ে। সঠিকভাবে আবহাওয়ার নির্ণয়ের ব্যাপারে এই তথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এছাড়া পৃথিবীর কোথায় মেঘের দল জটলা করে ঝড়-তুফানের ষড়যন্ত্র আঁটছে, স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা যন্ত্রের সাহায্যে স্পুট্নিক তার ছবিগুলি চটপট তুলে নেয়। এই সব ছবির দৌলতে মেঘের গঠন, আকৃতি ও বিস্তৃতির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নেফ্যানালিসিস নামে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানাবার এক নতুন পদ্ধতিই গড়ে উঠছে।

আজকাল সাগরের বুকে ঝড় দানা বাঁধবার আগেই আবহাওয়া স্পুট্নিক তার ছবি তুলে আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। আরবের মরুভূমির উপর ধূলার ঝড়ের ছবি, মধ্য এশিয়ার উপর দিয়ে পঙ্গপালের উড়ে যাবার ছবি, মেরুঅঞ্চলে হিমবাহ ভেঙ্গে পড়বার ছবি এবং ভারতের দিকে মেঘের দলসমেত মৌসুমী বায়ুর এগিয়ে আসবার ছবিও আবহাওয়া স্পুট্নিকের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি।

স্পুট্নিক ও বেতারবিদ্যা

সূর্যের দেহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাল রেখে আয়নমণ্ডলের গঠন-প্রকৃতির মধ্যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তনের মাত্রা যখন অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তখন আয়নমণ্ডল বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের ক্ষমতা হারিয়ে বসে, বেতার-বার্তার আদান-প্রদান ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বানচাল হয়ে যায়।

বেতার-বিজ্ঞানীরা বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলকরূপে আয়নমণ্ডলের সঙ্গে স্পুট্নিকগুলিকেও কাজে লাগাতে সুরু করেছেন। Passive বা নিষ্ক্রিয় এবং Active বা সক্রিয়— দু-ধরণের স্পুট্নিক এই কাজে নিযুক্ত রয়েছে। Passive স্পুট্নিকগুলির কাজ শুধু বেতার-তরঙ্গকে গ্রহণ করে তাকে প্রতিফলিত করা, কিন্তু Active স্পুট্নিকগুলি প্রতিফলনের সঙ্গে বেতার-তরঙ্গের পরিবর্ধনের কাজও করে থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের পরিমাণ এত বিপুল পরিমাণে বেড়ে চলেছে যে, এই কাজে নিযুক্ত প্রতিটি মাধ্যম তাদের কর্মক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় চালু থেকেও সমগ্র চাহিদাকে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। বিজ্ঞানীরা এই সমস্যা সমাধানের একটিকে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল থেকে মাথার উপর সব সময়ে একই জায়গায় অবস্থান করতে দেখা যাবে। এই জাতীয় স্পুট্‌নিকের নাম দেওয়া হয়েছে Synchronous satellite। এরকম তিনটি স্পুট্‌নিক মিলে সারা পৃথিবী জুড়ে বেতার-বার্তা ও টেলিভিসনের অনুষ্ঠান
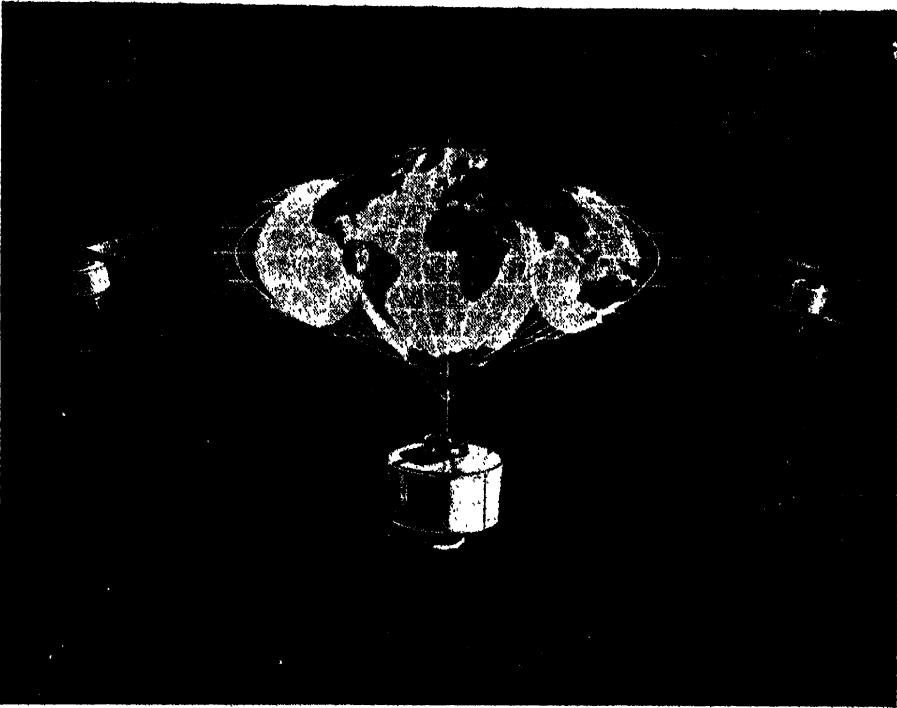
২নং চিত্র

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৩৫,৮০০ কিলোমিটার দূরে পরস্পরের কাছ থেকে সমান দূরত্বে অবস্থিত তিনটি Synchronous স্পুট্‌নিক সারা পৃথিবী জুড়ে চব্বিশ ঘণ্টাই রেডিও এবং টেলিভিসনের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে চালু রাখবে।

জন্যে এক অভিনব উপায়কে কার্যকরী করবার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। তাঁরা জানতেন যে, পৃথিবী থেকে ৩৫,৮০০ কিলোমিটার দূরে পরস্পরের সঙ্গে সমান দূরত্ব বজায় রেখে যদি তিনটি স্পুট্‌নিককে বসানো যায়, তাহলে তাদের কক্ষপথে গতিবেগ পৃথিবীর আপন অক্ষের উপর ঘূর্ণনবেগের সমান হবে এবং এদের এক- চলাচলের কাজ দিব্যি চালু রাখবে। ফলে, প্রাকৃতিক বাধা, বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় এবং পর্বতপ্রমাণ যান্ত্রিক সমস্যা,—সব কিছুর হাত থেকে বেতার-বিজ্ঞানীরা রেহাই পাবেন।

বেতার-বার্তার আদান-প্রদান ব্যবস্থার বিপুল উন্নতি সাধনের জন্যে তিনটি সিনক্রোনাস স্পুট্‌নিক প্রতিষ্ঠার এই যে পরিকল্পনা, তাকে

বাস্তবে রূপ দেবার জন্তে International Telecommunications satellite consortium নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। এই সংস্থার ষাটটি সভ্য দেশের মধ্যে ভারতবর্ষও অন্ততম। এই সংস্থা ইতিমধ্যেই প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের উপর ছুটি সিনক্রোনাস স্পুট্নিককে প্রতিষ্ঠা করেছে; তৃতীয়টিকে আগামী বছরের শেষে ভারত মহাসাগরের উপর প্রতিষ্ঠা করবার কথা।

বেতার-বার্তার আদান-প্রদান ব্যবস্থায় যে নতুন দিগন্ত এভাবে উন্মুক্ত হতে চলেছে, তার সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার জন্তে কর্মপ্রচেষ্টা ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে। পুণার কাছে আরভিতে ২৩০ একর জায়গা জুড়ে একটি বিরাট বেতার ষ্টেশন তৈরি হচ্ছে এবং বম্বের ক্লোরা কাউন্টেনে একটি Satellite communication exchange প্রতিষ্ঠার কাজও চলছে। এই ছুই কেন্দ্র পুরোপুরি চালু হলে ভারতবর্ষের সাগর পারাপারের বেতার-বার্তার যে আদান-প্রদান ব্যবস্থা (Overseas telecommunication traffic), তার উপরে ক্রমবর্ধমান চাপ যেমন লাঘব হবে, তেমনি ভারতবর্ষ থেকে পৃথিবীর যে কোন জায়গার সঙ্গে আগের তুলনায় অনেক ভালভাবে এবং দ্রুতগতিতে যোগাযোগ করাও সম্ভব হবে।

মহাকাশ বিজ্ঞান আজ তার শৈশব পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছে। তার দুর্জয় অভিযানের পথে প্রকৃতির সব বাধা ভেঙ্গে পড়ছে। এই বিজ্ঞানের ভগীরথরূপে স্পুট্নিগুলি পৃথিবীর মানুষের সামগ্রিক জীবনে যে কল্যাণমূলক সম্ভাবনার দিগন্তকে উন্মুক্ত করে চলেছে, তার পরিধি যে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

ভীষণ তর্ক, তর্কের ফাঁকে ফাঁকে বজ্রমুষ্টির উন্মাদ নৃত্য। দৃশ্যটা বেশই উপভোগ্য। জমে গেলাম, সঙ্গে সদানন্দ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি—ঘোর পরাধীন যুগের এম. এস-সি! তর্কের বিষয়—স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি। শ্রীঘোষ বলছেন, এই এক-শ' বছরে যে অগ্রগতি হয়েছে, তার তুলনা হয় না। শ্রীঘোষ বলছেন—অগ্রগতি না ছাই হয়েছে। ছুটিই অতিশয়োক্তি—বললে সদানন্দ। আমাদের সময় সারা দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল কয়টি? আর এখন—এক পশ্চিম বঙ্গেই সাতটি, তাছাড়া ডিগ্রী দেবার ক্ষমতাসম্পন্ন আরো ছুটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান আছে। বিজ্ঞানের গবেষণা এর পাঁচটিতেই চলছে। ১৯২১ সালে সারা ভারতে এম. এস-সি পাশ করেছিল মাত্র ১৪২ জন, আর ১৯৬১ সালে সেখানে এম. এস-সি পাশ করেছে ১৩ হাজার। আজ পাঠশালা থেকেই বিজ্ঞান পড়ানো হয়। উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিতে রীতিমতই বিজ্ঞান পড়ানো হয়। স্কুলেও আজ বি. এস-সি, এম এস-সি শিক্ষকেরা রয়েছেন। আর আমাদের সময়? স্কুলে বি. এস-সি শিক্ষকও ছিলেন না। বিজ্ঞান বিষয়ক একটা কৌতূহল জাগলে যে জিজ্ঞাসা করবো, এমন উপায় ছিল না। সকল শিক্ষকই ছিলেন কলার স্নাতক। কেন্দ্রের

'সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ', 'সার জগদীশ সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ' প্রভৃতি সংস্থাগুলি বিজ্ঞান অনুরাগী ছাত্রদের খুঁজে বের করছে, পড়বার জন্যে বৃত্তি দিচ্ছে। পরাধীন যুগে কি এসব ছিল? আজ ক্ষেত্র কত প্রসারিত—বিজ্ঞানের কত শাখা! এই তো সেদিন গিয়েছিলাম সায়েন্স কলেজে—দেখলাম 'সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স,' আবার রয়েছে 'রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স' 'বায়োফিজিক্স'—আগের সব তো আছেই। রসায়নের তিনটি বিভাগ এবং শারীরবিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, নৃতত্ত্ব—কত কি বিষয়ে ছাত্রেরা ও অধ্যাপকেরা গবেষণা করছেন। আমাদের কল-কাতায় নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এবং 'প্লাজ্‌মা ফিজিক্স' নিয়েও কয়েকজনকে গবেষণা করতে দেখলাম।

প্লাজ্‌মা মানে রক্তের তরল পদার্থ নিয়ে গবেষণা? জিজ্ঞেস করলাম সদানন্দকে। না দাদা এটা হলো পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। কঠিনও নয়, তরলও নয়, বায়বীয়ও নয়—ওটা অন্য একটা অবস্থা। প্লাজ্‌মার মধ্যে মুক্ত বৈদ্যুতিক কণা থাকায় তা হয় বিদ্যুৎ পরিবাহী। কিন্তু তার মধ্যে যতগুলি মুক্ত ঋণাত্মক ইলেকট্রন কণা আছে, ঠিক ততগুলি ধনাত্মক আয়ন কণা আছে। এই জন্যে প্লাজ্‌মা বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ। এর ইলেকট্রন বা আয়নের সংখ্যার তারতম্য ঘটাতে পারলে আর নিরপেক্ষতা থাকবে না, তখন পরমাণু তড়িৎ বিভবযুক্ত হয়ে পড়বে। ঘোষ মশায় বললেন—এই সকল বিজ্ঞান-কর্মীরাই তো স্বাধীন ভারতের গৌরব—স্বাধীন ভারতের ভরসা স্থল।

ক্ষুব্ধ বসু মশায় বললেন, খুব তো এক তরফা বলে যাচ্ছেন। বছরে কয়েক হাজার এম. এস-সি বেরুলে আর কয়েক কুড়ি পি-এস. ডি বেরুলেই কি বুঝতে হবে, বিজ্ঞানে আমাদের অগ্রগতি তুলনাহীন? এক ভেজাল বিদ্যায় আমাদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ছাড়া অন্য কোন্‌টায় অগ্রগতি হয়েছে? স্বাধীন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের খাদ্য-গবেষণাগার থেকে পেয়েছে টোণ্ড মিল্ক—গুঁড়া দুধ, মহিষের দুধ ও জলকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিদ্যুৎ-চালিত চড়কি দিয়ে আলোড়িত করে বোতলবন্দী করে বাজারে ছাড়ছেন। কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে জমিহীন কৃষি-গবেষণা, ক্রমক্ষীয়মান হাঁস-মুরগীর পোলট্রি গবেষণা, নদী থেকে শত শত মাইল দূরে নদী-গবেষণা, ডাঙ্গায় চার তলার উপরে বৈদ্যুতিক পাখার নীচে সমুদ্র-গবেষণা নিশ্চয়ই অভিনব। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—এরা তো নির্বোধ, তাই জাহাজে লেবরেটরী সাজিয়ে বিজ্ঞানীদের পাঠায় সমুদ্র-সমীক্ষায়। অবশ্য আমাদের বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ ঐ জাহাজে ঘুরে এসেছেন।

এটাই কিন্তু স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান-গবেষণার সম্পূর্ণ চিত্র নয়। ঘরের কোণেই যাদবপুর গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট। রেলের সিগ্‌ন্যালিং লাল-নীল কাচ আসতো ৬ কোটি টাকার। এখানকার বিজ্ঞানীদের উপর ভার দেওয়া হলো অবিকল ঐ কাচ তৈরি করবার জন্যে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁরা সফল হলেন। তাঁদের তৈরি সিগ্‌ন্যালিং কাচ তৈরি দেখে এসেছি আরো আট বছর আগে। তখনই দেখেছি, ফোম গ্লাসের তৈরি ইট। সরকার যদি ঐ গবেষণা কাজে না লাগিয়ে থাকেন, তবে সেই দোষ তাঁদের। হালে তাঁরা নানারকম লেন্স তৈরি করেছেন। এখন ক্যামেরা, মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ, এপিডায়োস্কোপ, থিয়োডোলাইট প্রভৃতি সবই দেশে তৈরি হতে পারবে। পৃথিবীতে ছয়-সাতটা মাত্র দেশ এই কাচ তৈরি করতে পারে। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। পরমাণু চূর্ণ করবার যন্ত্র সাইক্লোট্রোন আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানকার বিজ্ঞানীরা একটি

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ স্থাপন করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বরানগর ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা একটা কম্পিউটারের ব্যবস্থা করেছেন। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর-বিজ্ঞান বিভাগে জীবন্ত মস্তিষ্ক-কোষের কার্যকলাপ পাঠ করা হয় ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাফ যন্ত্রে। মাথার খুলির উপর ইলেকট্রোড পরিয়ে দেয়। কোষগুলির সক্রিয় অবস্থায় যে ক্ষীণ বিদ্যুৎ-শক্তির সৃষ্টি হয়, তা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে বাড়িয়ে একটা লেখ নেওয়া হয়। ঐ লেখ দেখে বিশেষজ্ঞেরা বলতে পারেন, কোন অংশ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে কিনা বা মাথায় কোন টিউমার হয়েছে কিনা।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এসব সত্ত্বেও অন্যান্য প্রগতিশীল দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশে কতটা অগ্রগতি হয়েছে, সেটাই বিচার করে দেখতে হবে। রাশিয়া, আমেরিকায় ব্রেন নিয়ে যে সব গবেষণা হচ্ছে, সেই সব গবেষণা থেকে সাইবারনেটিক্সের জন্ম। শারীর-বিজ্ঞানী, পদার্থ-বিজ্ঞানী, গণিত-বিজ্ঞানী এবং রসায়ন-বিজ্ঞানীরা একযোগে কাজ করছেন সেখানে। বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখারও জন্ম হয়েছে, যার নাম বায়োনিক্স—বায়োলজি ও ইলেকট্রনিক্সের মিলিত ফল। আর এই জাতিভেদের দেশে বিজ্ঞানীদের মধ্যেও বিভাগ ভেদ রয়ে গেছে। ডাঃ চাটার্জী রাসায়নিক, ডাঃ দুর্লভচন্দ্রও কেমিষ্ট, তাই কি তাঁদের আবিষ্কার 'মার্সেলিন' ও 'জওহরীন' ভূমিষ্ঠ হয়েই মারা গেল? ডাঃ সান্যালের আবিষ্কৃত কনট্রাসেপটিভ কুইনো-মেটাজলের এন্তেকাল হলো। এখন আসছে বাইরে থেকে গাইনোভ্‌লার-২১ (Gynovler-21)। কেন হয় এরকম? রাসায়নিকদের সঙ্গে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর অসহযোগ, সরকারের স্বদেশের বিজ্ঞানীদের উপর অবিশ্বাস। অধ্যাপক শেষাদ্রি এবং ডাঃ রঙ্গস্বামীর আবিষ্কৃত হার্টের ঔষধ 'পেরুভোসাইডের'ও অকালেই সন্ধ্যা হবে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে সরকার পিছনে ঠেকা দিতে চেষ্টা করবেন।

তবে একটা বিষয়ে গর্ব আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি। বরানগরের ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউট। আচার্য মহলানবিশের শুশ্রূষায় প্রেসিডেন্সির একখানা ঘরে এটা ধুকছিল। আজ এটা এশিয়ার একটি বৃহত্তম গবেষণা প্রতিষ্ঠান—একেবারে কুটির থেকে রাজপ্রাসাদে যাকে বলে। এখান থেকে রাশি-বিজ্ঞানে ডিগ্রী দেওয়া হয়। স্বাধীন ভারতে নিউক্লিয়ার এনার্জি সংক্রান্ত গবেষণাও উল্লেখযোগ্য। ট্রম্বের পারমাণবিক গবেষণা-কেন্দ্রে এখন ১৫৫০ জন বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার এবং ৭ হাজার অন্যান্য কর্মী কাজ করছেন। এখানে বহু রকমের আইসোটোপ তৈরি হচ্ছে। এখানে থোরিয়াম পরিশোধন কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে। কোচিনের কাছে পরমাণু-শক্তি উৎ-পাদনোপযোগী ইউরেনিয়াম উৎপাদনের জন্যে একটি ধাতু শোধনাগার স্থাপিত হয়েছে। জামসেদপুরের কাছে যে ইউরেনিয়ামের কারখানা স্থাপিত হয়েছে, তা তো ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারেরাই করেছেন। তারাপুরে পরমাণুর শক্তির সাহায্যে অল্প খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। রাজস্থানের রাণাপ্রতাপ সাগরেও একটি পার-মাণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপিত হতে যাচ্ছে। তাছাড়া একটি ভারী জল তৈরির কারখানাও হচ্ছে। বোম্বাইয়ের টাটা ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে নভোরশ্মি এবং লেসার (LASER) নিয়েও কাজ হচ্ছে। আজ ভারতে জাতীয় গবেষণাগারের সংখ্যা ৩২-এর উপর। নিঃসন্দেহে এগুলি অগ্রগতি। আমাদের দেশে জাতীয় আয়ের মাত্র অর্ধশতাংশ (·৫%) খরচ হয় বিজ্ঞানে, অর্থাৎ মাথাপিছু দু' টাকা। যুক্তরাষ্ট্রে ব্যয় হয় জাতীয় আয়ের ৩·৫ শতাংশ, রাশিয়ায় আরো বেশী। আর বৃটেনে বিজ্ঞান গবেষণায় মাথাপিছু ব্যয় করে

১৬২ টাকা। যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করে ৪১০ টাকা। আমাদের খরচের আবার মোটা অংশটাই যায় ইমারত তৈরিতে। জাতীয় গবেষণাগার নয় তো একটি বিজ্ঞানের তাজমহল। ঐ তাজ-মহলের মধ্যে ডক্টর যোসেফরা দারিদ্র্যের জ্বালায় আত্মহত্যা করেন। গবেষণাগারের যিনি প্রধান তাঁকেও ফাইল রক্ষা করতে গিয়ে কেরাণীতে পরিণত হতে হয়। যাঁরা পি-এইচ. ডি, ডি. এস্-সি, তাঁরা নিশ্চয়ই প্রতিভাবান ছিলেন। প্রচুর পড়াশুনা করে, গবেষণা করে তবেই ডিগ্রীগুলি পেয়েছেন। যথেষ্ট পরিশ্রম রয়েছে ওর পিছনে। কিন্তু তার পর? চাকুরিতে পাকা হলেই গবেষণা শিকেয় উঠলো। আচার্য রামনের মত কয়জন বিজ্ঞানী অতিবৃদ্ধ কাল পর্যন্ত গবেষণাগারে গবেষণায় লিপ্ত থাকেন? বাতি যত বড়ই হোক. যত ভাল জাতের হোক ও যত শক্তিরই হোক, সে যদি নিবে যায়, তবে একটা ডিবেও জ্বালাতে পারে না। শেষে পদমর্যাদা রক্ষার জন্যে নবীনের গবেষণার ফল অপহরণ সুরু হয়। নইলে একজন লোক কখনো এক বছরে পঞ্চাশটা গবেষণা-পত্র প্রকাশ করতে পারে? এমনিভাবে বাধে নবীন ও প্রবীণে সংঘাত, কাজের ঘটে বিঘ্ন। অথচ প্রবীণের অভিজ্ঞতা, নবীনের উদ্যম ও কর্মশক্তির মিলনেই ফলবে বিজ্ঞানের নব নব ফসল, দেশ হবে সমৃদ্ধ। কিন্তু হচ্ছে কি? এই যে এই বছরে এত বৃষ্টি—এর কারণ জানা গেল কি? থুম্বায় তো আবহাওয়া ষ্টাডি করবার জন্যে খুব রকেট নিক্ষেপ করা হচ্ছে, আলিপুরেও হাওয়া অফিস আছে। এর মধ্যে আছে আবার দলাদলি, প্রাদেশিকতা, সরকারী দাক্ষিণ্যের অসমতা। গুজরাট থেকে মহীশূর পর্যন্ত একটা বেল্ট তৈরি হয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিক্স, রং, বেবী ফুড, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, কৃষি গবেষণা, তৈল শোধনাগার অ্যারোনটিক্স প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের গবেষণা ও প্রয়োগ ক্ষেত্র ঐ বেল্টে সীমাবদ্ধ। অবশ্য এই বেল্টের সঙ্গে যুক্ত রাজস্থান ও পাঞ্জাব। আর তো সব স্থানেই অন্ধকার।

তারপরে অগ্রগতি বলতে কি বুঝবো? গতি মাপতে গেলে কিছুর সঙ্গে তুলনা দরকার। তুলনা করলে তবেই বুঝতে পারবো, আমাদের বিজ্ঞানের গতি ত্বরণযুক্ত হচ্ছে, না, মন্দীভূত হচ্ছে—আমরা এগুচ্ছি না পিছুচ্ছি। ভাবুন তো একবার, শিক্ষকের আসনে সার জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—সামনে ছাত্রের বেঞ্চে উপবিষ্ট সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী প্রভৃতি উজ্জ্বল তারকাসমূহ। স্বাধীন ভারতে এই দৃশ্য দেখা যায় কি?

ভারত অতীতহীন নয়। নব্যবিজ্ঞানের উদ্বোধন হয়েছিল বাংলায়। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ তারকনাথ পালিত, সার রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ মনীষীদের সমস্ত সঞ্চয় নিয়ে গড়ে উঠেছিল কালটিভেশন অব সায়েন্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ, যাদবপুর ইঞ্জি-নিয়ারিং কলেজ। আজ কালটিভেশন অব সায়েন্সে গেলে দেখা যায়, এখানে জল জমে আছে, ওখানে জঞ্জাল জমে আছে। জগদীশচন্দ্র সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে সৃষ্টি করলেন বসু বিজ্ঞান মন্দির। এই সবই স্বাধীনতাপূর্ব যুগের সৃষ্টি। আচার্য রায়ের রাসায়নিক কৃতি, সার জগদীশের তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ও ইলেকট্রো-ফিজিওলজির গবেষণা, আচার্য সি. ভি রামনের আলোক নিয়ে গবেষণা, রামানুজনের গণিতের গবেষণা প্রভৃতিকে এক পাশে রাখুন, আর একদিকে রাখুন স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞানীদের সৃষ্টি। ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, কোন্‌টা উজ্জ্বলতর। অতীতের প্রতি অন্ধ আকর্ষণের কথা নয়, বাস্তব মাপে কোন্‌টা ভারী? স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি কতটুকু,

তা বিচার করতে গেলে ভারত ছাড়িয়ে বাইরেও দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে। ভারতের বাইরে বহু নবীন ও প্রবীণ ভারতীয় বিজ্ঞানী রয়েছেন। তাঁদের অবদানে সেখানে বিজ্ঞান সমৃদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের সেলামি দিচ্ছেন না, দিচ্ছেন কাজের মূল্য। আজ ভারতে দুধের অভাব। ইচ্ছামত পুং-পশু ও স্ত্রী-পশু প্রজননের উপায় আবিষ্কার করলেন স্বাধীন ভারতের নবীন বিজ্ঞানী ডাঃ ভৈরব ভট্টাচার্য। কিন্তু ভারতে তাঁর স্থান হলো না। আজ যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর আবিষ্কারের কৃতিত্বের দাবী নস্যাৎ করবার ষড়যন্ত্র চলছে। তা নিয়ে ডাঃ ভট্টাচার্যের মামলা চলছে। রেলগাড়ীর দুর্ঘটনা নির্দেশক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন তরুণ বিজ্ঞানী অপূর্ব চৌধুরী। ক্ষুদে রেডার যন্ত্র একটি কামরায় স্থাপিত করে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন, কিন্তু শেষ পরীক্ষার জন্যে ৩০ হাজার টাকা মিললো না। সরকার উদাসীন, রেল বিভাগ কৃপণ অথচ এতে রেল বিভাগে বছরে বহু কোটি টাকা বেঁচে যেত। এটি গত বছরের ঘটনা। কলকারখানায়, প্রাইভেট লেবরেটরীতে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে—এমন কি, স্কুলেও আজ বিজ্ঞানের প্রতিভা ছড়িয়ে রয়েছে। সৃষ্টি কোথায় হবে কেউ জানে না। সৃষ্টির সম্ভাবনা যেখানেই দেখা যাবে, সেখানেই সাহায্যের সদয় হাত প্রসারিত করতে হবে। সে ছোট চাকুরে, না, বড় চাকুরে, ডিগ্রী আছে কি ডিগ্রী নেই—এই প্রশ্ন অবান্তর। টবের গাছে বাগান শোভা পায়, অরণ্যের সৃষ্টি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণারগুলিকে উপবাসে রেখে জাতীয় গবেষণাগারের তাজ-মহলে বিজ্ঞানীকে বন্দী করলেই ভারত এগুবে না। আজ ইউরোপ, আমেরিকা বিজ্ঞান গবেষণায় যখন ছুটে চলেছে রকেটে করে, আমরা তখন চলেছি গো-শকটে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অ্যামেচার সায়েন্টিষ্ট ক্লাব, অ্যামেচার রেডিও ম্যানস্ অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি কত কি রয়েছে। সকলের তিল তিল দানে সেখানে বিজ্ঞানের তিলোত্তমা গড়ে উঠছে, আর আমরা বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে আছি। এই তো দেখুন, এই বছরের দ্বিতীয় ধূমকেতু হুইটেকার-টমাসের আবিষ্কর্তার বয়স মাত্র ১৬ বছর। টেক্সাসের এই কিশোর তার বারো ইঞ্চি টেলিস্কোপের সাহায্যে গত ১২ই জুন এই ধূমকেতুটি দেখতে পায়। আমাদের দেশেও ঐ রকম কৌতূহলী কিশোর আছে, কিন্তু তার বারো ইঞ্চি টেলিস্কোপ নেই। কয়টা কলেজে আমাদের দেশে বারো ইঞ্চি টেলিস্কোপ আছে? বিলাতে ও আমেরিকায় কিন্তু 'ইওর ওন টেলিস্কোপ', 'ইওর ওন মাইক্রোস্কোপ', 'ক্যামেরা' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আছে। কৌতূহলীরা তাদের সাহায্য নেন এবং নিজে যন্ত্র তৈরি করেন। যুক্তরাষ্ট্রের হায়ার সেকেণ্ডারীর দশম-একাদশ শ্রেণীর ছাত্র একটি টেলিভিশন সেট সংযুক্ত করতে পারে। আমাদের দেশে কলেজের কয়টা ছেলে পারে? শুধু বক্তৃতা, ভাষণ আর রাজনৈতিক কচকচিতে বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর শ্রীবৃদ্ধি হয় না। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে চাই একটা সর্বভারতীয় বোধ—যার বোধন হয়েছিল জোড়াশাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে গত শতাব্দীতে, তাকে জাগাতে হবে। নবীন-প্রবীণে মিলতে হবে বন্ধুভাবে। জ্ঞানের জগতে বয়সের আধিপত্য নেই। জ্ঞানে প্রবীণ বয়সে নবীনও হতে পারেন। বিজ্ঞান-জগতে প্রাদেশিকতা ও দলাদলি ঢুকলে বিজ্ঞানের শ্বাস-রোধ হবে। ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অভাব নেই, কিন্তু তার স্ফুরণের সুযোগ নেই। তাই ঐ প্রতিভার উদয়াচলেই অস্তগমন হয়।

সঞ্চয়ন

দামোদর প্রকল্প

দামোদর প্রকল্পের সূত্রপাত হয় ১৯৪৮ সালের ৭ই জুলাই। গত কুড়ি বছরে চারটি বাঁধ তৈরি করে দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। তিনটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করে প্রায় সহস্রাধিক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে, আর খরিফ শস্যের জন্যে প্রায় সাত লক্ষ একর ও রবি শস্যের জন্যে প্রায় চল্লিশ হাজার একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

কিন্তু এই পরিসংখ্যান থেকে দামোদর প্রকল্পের গুরুত্বের কথা সম্যক বোঝা যায় না। প্রথমে বন্যারোধ করবার কথাই ধরা যাক। দামোদরের বন্যায় আমাদের যে কত ক্ষতি হয়েছে, তার কোনও সঠিক হিসাব নেই। রিচি কলডর-এর মত বিশিষ্ট বিদেশী লেখকও বলেছেন—যুগ যুগ ধরে দামোদর অশ্রু নদ বলে পরিচিত ছিল। ভারতীয় চিন্তাধারায় দামোদর নদ হলো ভয়াবহ, আর গঙ্গানদী হলো কল্যাণ-দায়িনী। সেই দামোদরের জলে যখন বর্ষার ঢল নামতো, তখন দামোদরের সঙ্গে বরাকর আর কোনারের জল মিশে বিহারের উচ্চভূমি ছাপিয়ে বাংলার নিম্নভূমিকে ডুবিয়ে বিহার থেকে ২৬০ মাইল পথ উজিয়ে আসতো কলকাতা শহরের দরজা পর্যন্ত।

গত এক-শো বছরের মধ্যে দামোদরে জল-স্ফীতি হয়েছে বহু বার। ১৯৪৩ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যার পর থেকেই দামোদরকে শাসন করবার জন্যে সরকার তৎপর হয়ে ওঠেন। ১৯৫০ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ বন্যার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় আট কোটি টাকার মত। দামোদর প্রকল্পের চারটি বাঁধ হয়ে যাবার পর আরও ছয়বার বান এসেছিল। কেবল একবার বাঁধগুলি বন্যা সম্পূর্ণ নিবারণ করতে সক্ষম হয় নি। আরও কারণ আছে। দামোদর প্রকল্পের পরিকল্পনায় আটটি বাঁধ তৈরি করবার কথা ছিল। কিন্তু নির্মিত হলো মাত্র চারটি বাঁধ, বরাকর নদের উপর তিলাইয়া ও মাইথন, কোনার নদের উপর কোনার, আর দামোদর নদের উপর পাঞ্চেত। এই চারটি বাঁধ এপর্যন্ত যা করেছে, তাতে তার দাম তো উঠে গেছেই—বরং শিল্পোন্নয়ন ও কৃষির অগ্রগতিতে এদের ভূমিকা ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেতে একটি করে জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। জলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শিল্প ও কৃষির জন্যে জল সরবরাহ করে দামোদর প্রকল্প নিম্ন উপত্যকায় অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়েছে। অবশ্য কারও কারও মতে সেচের দিক থেকে বিচার করতে গেলে এই প্রকল্পের আরও উন্নতির সুযোগ আছে। দুর্গাপুর ব্যারেজের দুই পাশ দিয়ে দুটি খাল কাটা হয়েছে। একটি খাল বাঁকুড়া জেলা এবং অপরটি বর্ধমান হাওড়া ও হুগলী জেলায় সেচের জল নেয়। কিন্তু এই সব জেলার অধিকাংশ কৃষকই যাতে তাঁদের ক্ষেতে জল পায়, এমন ব্যবস্থা এখনও করা হয় নি। যে সব কৃষক দামোদরের জল পাচ্ছে, তাদের অবস্থা ফিরেছে। তাদের আয়ও বেশ বেড়েছে।

গত ১৯৬৪ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকার দামোদর প্রকল্পের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সেচের ভার গ্রহণ করেছেন।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে দামোদর প্রকল্পের

সাফল্য তর্কাতীত। বোকারো, দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেত জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রায় সহস্রাধিক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা সরবরাহ করা হচ্ছে চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন কারখানায়, ঘাটশীলার তামার খনিতে, জামসেদপুর ও বার্ণপুরের ইস্পাত কারখানায়, রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লার খনিগুলিতে, বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের ইলেক্‌ট্রিসিটি বোর্ডে, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে প্রভৃতি বড় বড় সংস্থায়। এই পরিমাণ বিদ্যুতের সাহায্যে দশ লক্ষাধিক সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে আলো জ্বালা যায়। চন্দ্রপুরা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি তৈরি করবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে যে বছরটি শেষ হয়েছে, সেই বছরে দামোদর প্রকল্পের বিদ্যুৎ বিক্রয় করে পাওয়া গেছে সাড়ে একুশ কোটি টাকা।

বর্তমানে দুর্গাপুরের যে উন্নতি হয়েছে, তার মূলে আছে দামোদর প্রকল্পের বিদ্যুৎ আর জল। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচের জল সরবরাহ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ হলেও দামোদর প্রকল্পের ভূমি সংরক্ষণ প্রয়াস প্রশংসার যোগ্য। ১৯৪৯ সালে এই বিভাগের কাজ সুরু হয়েছে। প্রায় সাত হাজার মাইলব্যাপী উচ্চ অববাহিকার ভূমির অবক্ষয় রোধ করা ও জলাধারগুলিতে পলিমাটি পড়বার পরিমাণ হ্রাস করবার জন্যে এই বিভাগ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছেন। হাজারীবাগের কাছে দেওচাঁদায় এই বিভাগের একটি গবেষণা কেন্দ্র আছে। ভূমি ও জল সংরক্ষণ সম্বন্ধে এখানে পরীক্ষার কাজ চলছে। পানাগড়ে এদের আর একটি গবেষণা কেন্দ্রে সেচের জলের ব্যবহার সম্বন্ধে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এখান থেকে যে সব নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হচ্ছে, তা স্থানীয় কৃষকদের শিখিয়ে দেওয়া হয়। এই বিভাগের উদ্যোগে বহু অবক্ষয় নিরোধক বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে, গাছ বসানো হচ্ছে, চারটি জলাধারের তীরে শস্য উৎপাদন করা হচ্ছে এবং বন সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

দামোদর প্রকল্পের চারটি জলাধার ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি নির্মাণ করবার জন্যে প্রায় বিশ হাজার পরিবার গৃহহারা হয়। তিলাইয়ার কাছে তাদের জন্যে কয়েকটি নতুন গ্রাম তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কেউ কেউ নিয়েছে নগদ টাকা। কেউ কেউ উঠে এসেছেন নতুন গ্রামে। এখানে আরম্ভ হয়েছে তাদের নতুন জীবন।

দামোদর প্রকল্প নতুন জীবনেরই প্রতীক।

পৃথিবীর গভীরে

মধ্য এশিয়ায় ক্যাস্পিয়ান নিম্নাঞ্চলে আরালষ্টর নামক স্থানে এক অতি গভীর কূপ খনন করবার কাজ চলছে। এই খননকার্যে মস্কোর তৈল, রসায়ন ও গ্যাসশিল্প ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরাও অংশগ্রহণ করছেন। কূপের স্তাফ্‌ট্‌ শক্ত করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা বিশেষ সিমেন্ট সলিউশন তৈরি করেছেন। ভূপৃষ্ঠের নীচের তলার বিষয়ে গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় ভূ-পদার্থবিদ্যার নানান যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের অন্যান্য বহু সাজ-সরঞ্জামের ডিজাইনও তাঁরা করেছেন। ইনষ্টিটিউটের প্রোরেক্টর অধ্যাপক ওয়াই. এম. ভ্যাসিলিয়েক এই পরীক্ষার প্রাথমিক ফলাফলের বিষয়ে বলেন—আরালষ্টর কূপ থেকে প্রায় সাত হাজার মিটার গভীর তল-

দেশের শিলার প্রথম নমুনাসহ অত্যন্ত মূল্যবান অনেক তথ্য ও পদার্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এই নমুনা পরীক্ষার ফল ভূপৃষ্ঠে গভীর প্রদেশের গঠন সম্পর্কে অনেক পুরনো ধারণাই বাতিল হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, অত্যন্ত গভীর প্রদেশ এমন অতি ঘন অপ্রবেশ্য শিলার দ্বারা গঠিত যে, সেখানে তৈল বা প্রাকৃতিক গ্যাস সাধারণতঃ সঞ্চিত হতে পারে না বলে মনে করা হতো। কিন্তু ৬০০০ থেকে ৬১০০ মিটার গভীর থেকে অপ্রত্যাশিতভাবেই ভঙ্গুর বেলে পাথর উত্তোলিত হয়েছে। এই শিলার গঠন বিপুল পরিমাণ হাইড্রোকার্বন কাঁচামাল সঞ্চয়ের খুবই অনুকূল। সুতরাং কূপটি নতুন নতুন তৈল ও গ্যাস আবিষ্কারের সম্ভাবনার সুযোগ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু ব্যাপারটি শুধু এতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। কূপটি যে স্থানে খনন করা হচ্ছে, সেই ক্যাস্পিয়ান নিম্নাঞ্চল বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে এমনিতেই অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক। এই অঞ্চলটি প্রকৃতপক্ষে উষ্ণ জলের একটি আর্টিসান বেসিন।

হিসাবপত্র থেকে দেখা যায় যে, বেসিনটির তলা ভূপৃষ্ঠের ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার নীচে অবস্থিত। ১০০০ মিটার গভীরে জলের তাপ হয় ১৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আরও তিন হাজার মিটার নীচে গেলে জলের তাপাঙ্ক পৌঁছায় ২২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। বেসিনের তলদেশের জলের তাপাঙ্ক প্রায় ৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। গভীর অঞ্চলে চাপ ৮০০ থেকে ১২০০ অ্যাটমস্ফিয়ার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

দেখা যায় যে, গোটা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান প্রধান জ্বালানী কয়লা, তৈল, গ্যাস ও কাঠ জ্বালিয়ে যে পরিমাণ তাপ বছরে পাওয়া যায়, ক্যাস্পিয়ান নিম্নাঞ্চলে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ তার ৮৪০ গুণেরও বেশী। এই অঞ্চলে অনেক তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং উত্তপ্ত জলে দ্রবীভূত রাসায়নিক পদার্থসমূহ নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে শিল্পসংস্থাসমূহ স্থাপন করা যেতে পারে।

কিন্তু মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতেই অফুরন্ত খনিজ সম্পদ আহরণের বিষয়টিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে।

মানবজাতি আজ প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের এক কণামাত্র কাজে লাগাতে পারছে—যা পর্বত গঠনের প্রক্রিয়ায় গভীর অঞ্চল থেকে উপরিভাগে উঠে আসছে। কিন্তু পৃথিবীর গভীরেই এই সব প্রয়োজনীয় খনিজের প্রধান অংশ সৃষ্ট হয়। ভূত্বকের কঠিন শিলাস্তরের নীচেই গলন্ত ম্যাগ্‌মায় তা রয়েছে।

ভবিষ্যতে খনিশিল্প ও ধাতুবিদ্যা কি রূপ পরিগ্রহ করবে? ভূগর্ভের যথেষ্ট গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব হলে ভূত্বকের কঠিন স্তরের নীচে অবস্থিত গলন্ত তরল স্তর থেকে জলন্ত তরল ম্যাগ্‌মা উপরে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। মেণ্ডেলিয়েফ তালিকার সমস্ত মৌলিক পদার্থ বোঝাই এই ম্যাগ্‌মা বিশেষ কনভেয়ারে ঠাণ্ডা হবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রথম দানা বাঁধবে রিফ্র্যাক্টরী পদার্থসমূহ—টাংষ্টেন, মলিবডেনাম ইত্যাদি এবং তারপর কোবাল্ট, লৌহ, তাম্র ও দস্তা দানা বাঁধবে। সব শেষে পাওয়া যাবে সীসা, টিন ও অন্যান্য পদার্থসমূহ।

কার্যক্ষেত্রে অবশ্য এই প্রাযুক্তিক পদ্ধতি অনেক বেশী সূক্ষ্ম হবে। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার যে—ভবিষ্যতের ধাতুবিদ্যা বর্তমানের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশী যুক্তিসম্মত হবে, কারণ এখন মোট উৎপাদিত তাপের তিন-চতুর্থাংশই ব্যয় হয় ধাতু গলাবার কাজে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরেও জোর দেওয়া দরকার। এখন পর্যন্ত ভূমিকম্প বিশ্বের বহু অঞ্চলেই বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের গভীরে প্রবেশ করা গেলে ভূ-অভ্যন্তরে সঞ্চিত শক্তি নির্গত হবার পথ পাবে এবং তা মানবের স্বার্থে ব্যবহৃত হবে।

হৃৎপিণ্ড তৈরির কারখানা

ভি. আই. সুমাকোফ এই সম্বন্ধে লিখেছেন—কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরির কাজ এগিয়ে চলছে জীবন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের পাশাপাশি। ঐ কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এক দেহ থেকে অন্য দেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন করা হচ্ছে অসুবিধার মধ্যে, কারণ টিস্যুর বিপ্রতিপত্তি সমস্যার এখনও সমাধান হয় নি। দুর্ভাগ্যের কথা, সংযোজিত প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে দেহের প্রতিরোধ কিভাবে জয় করা যায়, বিজ্ঞানীরা এখনও তা জানতে পারেন নি। কিন্তু যান্ত্রিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে এরূপ অসুবিধার কোন অস্তিত্বই নেই। যেমন ধাতু বা বিভিন্ন প্লাষ্টিকে তৈরি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড ভাল্‌ভ্‌ নিয়ে হাজার হাজার নরনারী বেঁচে রয়েছেন। জীবদেহ বহু বছর ধরে ধাতু বা প্লাষ্টিক সহ্য করতে সক্ষম।

অধিকন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রয়োগ না করে জীবন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন করা যায় না। যেমন—কিড্‌নি সংযোজনে একটা বিপদ থাকে যে, সংযোজিত কিড্‌নির কাজ পুনরায় সুরু করতে কিছু সময় লেগে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীর দেহের সঙ্গে কিছু সময়ের জন্যে কৃত্রিম কিড্‌নি ইউনিট যুক্ত করে রাখা অপরিহার্য। হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।

করোনারি থ্রম্বোসিসের ফলে প্রায়ই হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর একটা ছোট এলাকাই মাত্র আক্রান্ত হয়। এলাকাটুকু ছোট হলেও তীব্র আঘাতের অবস্থা দেখা দিতে পারে, যার ফলে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। বহু ক্ষেত্রে, যেখানে ঔষধ কার্যকরী হয় না, সেখানে কৃত্রিম রক্তচালকস্থলী সমস্যাটির সমাধান করতেও পারে। এরূপ কৃত্রিম রক্তচালকস্থলীর ডিজাইন প্রণয়নে আমরা বর্তমানে নিযুক্ত রয়েছি। সময়মত এটির সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হলে খাস হৃৎপিণ্ডে ও সমগ্রভাবে দেহে রক্ত চলাচলের উন্নতি ঘটবে। ভারমুক্ত হয়ে ব্যাধিগ্রস্ত হৃৎপিণ্ড ক্রমে ক্রমে তার কর্মক্ষমতা ফিরে পাবে। ভবিষ্যতে মাত্র কয়েক দিন কৃত্রিম রক্তচালকস্থলী ও পীড়িত হৃৎপিণ্ড একযোগে কাজ করলেই যথেষ্ট হবে। হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কাজকর্ম পুনরায় চালু করে দেওয়া গেলেই কৃত্রিম রক্তচালকস্থলীটি অপসারিত করা হবে। আমেরিকার বিশেষজ্ঞেরা হিসাব করে দেখেছেন যে, একটি কৃত্রিম সহায়ক হৃৎপিণ্ডের (যদি তা পাওয়া যায়) দ্বারা তাঁরা শুধু তাঁদের দেশেই বছরে এক লক্ষ থেকে তিন লক্ষ জীবন বাঁচাতে পারবেন।

বলা দরকার যে, আমাদের হৃৎপিণ্ডের কাজে বোঝার বেশীর ভাগই বহন করে বাম রক্তচালকস্থলী। সে জন্যে প্রায়ই রোগের আক্রমণ এটির উপরই হয়। কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড ও সহায়ক যন্ত্রাদি সম্পর্কে গবেষণা চালাতে গিয়ে সব প্রয়াস সংহত করা হয়েছে বাম রক্তচালকস্থলীর বৈকল্য শল্যচিকিৎসার সাহায্যে পূরণের উপর।

একটা সম্পূর্ণ কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড নির্মাণ অনেক বেশী জটিল সমস্যা। এই হৃৎপিণ্ডকে কয়েক বছর কাজ করতে হবে, কয়েক ঘণ্টা বা দিন

নয়। কৃত্রিম এই অঙ্গটি আবিষ্কার করা ও এর জন্যে মালমশলা বাছাই করবার সময় এটি আলোচনার বিষয়ীভূত হবে।

সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারদের সম্মিলিত চেষ্টায় টিস্যুগুলিতে রক্ত জোগাবার জটিল ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট করে একটি মডেল তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কৃত্রিম রক্তচালকস্থলী, যা পুরাপুরি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরি ও ব্যবহার করবার বাধা সৃষ্টি করে যে গুরুতর অসুবিধা হতে পারে, তা হলো রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া। হৃৎপিণ্ডের কৃত্রিম সহায়কটি যখন কাজ চালায়, তখন এতে ক্রমে ক্রমে জমাটবাঁধা রক্ত দেখা দেয়। এই জমাট-বাঁধা রক্ত কৃত্রিম নালীর গাত্র থেকে ধুয়ে গিয়ে রক্তস্রোতের সঙ্গে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্তনালীতে ঢুকে পড়ে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এরূপ জমাটবাঁধা রক্তের আবির্ভাবের সবগুলি কারণ অমরা জানি না এবং সব সময় এই রক্ত জমাটবাঁধা নিবারণও করতে পারি না। এমন মালমশলার সন্ধান করা হচ্ছে, যেগুলির গায়ে কোন রক্তকণিকা স্থিতি লাভ করতে পারে না। এরূপ মালমশলা ইতিমধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে ও লেবরেটরীতে এগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে।

রক্ত জমাটবাঁধা ঠেকাবার আরও একটি রাস্তা আছে। গবেষকেরা এরূপ মালমশলা প্রয়োগ করবার চেষ্টা করছেন, যেগুলি তাদের গায়ে রক্ষক আচ্ছাদন সৃষ্টি করতে সক্ষম, যে আচ্ছাদন কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গায়ের সঙ্গে রক্তের সংযোগ-স্থাপন নিবারণ করবে এবং এভাবে রক্ত জমাট-বাঁধবার বিপদ হ্রাস করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এরূপ সাংশ্লেষিক মালমশলা আমরা প্রয়োগ করেছি। যাহোক বর্তমানে রক্তের জমাটবাঁধা ঠেকাবার এখনো পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত ব্যবস্থাপত্র দেওয়া যায় না।

স্বভাবতঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের মিলিত চেষ্টার মাধ্যমেই শুধু কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের সমস্যার সমাধানে পৌঁছানো যাবে। এই ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তি-বিদ্‌দেরও এগিয়ে আসতে হবে। তাঁদের কাজ হবে, কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় মালমশলাও কৃত্রিম প্রক্রিয়াদি সৃষ্টি করা। চিকিৎসক ও শারীর-বিজ্ঞানীদের অনুশীলন করতে হবে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজের নিয়ন্ত্রক নিয়মসমূহ, কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজের সঙ্গে যুক্ত রক্ত চলাচলের নিয়মসমূহ।

জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ে নতুন পদ্ধতি

জরায়ুর ক্যান্সার প্রতিরোধের কাজ স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জামের দ্বারা হতে পারে।

সম্প্রতি লণ্ডনে ভাইকারস্‌ লিমিটেড একটি সরঞ্জাম প্রদর্শন করেন। এই সরঞ্জাম স্বয়ংক্রিয়-ভাবে পর্দার উপর সেল স্যাম্পলের ছবি ফেলে এবং তাদের মধ্য থেকে ক্যান্সার-পূর্ব পর্যায়ে পড়ে,

এমন নমুনাগুলি আলাদা করে বেছে ফেলতে পারে। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসকেরা বুঝতে পারেন, কোন্ ক্ষেত্রে আরও নিবিড় পরীক্ষার প্রয়োজন।

জরায়ুর ক্যান্সার সকল স্ত্রীলোকের পক্ষেই বিপজ্জনক। কিন্তু ক্যান্সার-পূব পর্যায়ে যদি এই রোগ ধরা পড়ে, তাহলে এই রোগ নিরাময় করা সম্ভব। বার্মিংহামের কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালের অধ্যাপক এইচ. ম্যাকলারেন বলেন— এই ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। কালে টিকা গ্রহণের মতই জরায়ুর ক্যান্সার পরীক্ষা করাবার ব্যাপারটা সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

বিশ্বে এই ধরণের সরঞ্জামের আবিষ্কার এই প্রথম। অধ্যাপক ম্যাকলারেন পরীক্ষামূলকভাবে সরঞ্জামটি হাসপাতালে ব্যবহার করছেন।

জরায়ুর মুখ থেকে নমুনা সেলগুলি তুলে নিয়ে এই সরঞ্জাম প্রথমে তাকে আরও ঘন বা গাঢ় করে নেয়। কলমের আকারের একটি যন্ত্রমুখ তা শুষে নিয়ে প্লাষ্টিকের ফিতার উপর রেখার আকারে সেলগুলি সাজিয়ে যায়। তারপর সেলগুলিকে রং করে মাউন্ট করবার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে যে সব সেলে ক্যানসার-পূর্ব লক্ষণ থাকে, সেগুলির নিউক্লিয়াস বড় হয়ে ফুটে ওঠে এবং একই সঙ্গে সরঞ্জাম থেকে এই সম্পর্কে ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। সন্দেহজনক সেলগুলির ক্ষেত্রে ফিতাটিকে ঐ যন্ত্র পাঞ্চ করেও দেয়। তাছাড়া ঐ যন্ত্র ফিরতি পথে প্রত্যেকটি সন্দেহজনক সেলের সামনে একবার করে থামে, যাতে চিকিৎসকের তা নজরে আসে ও তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারেন।

সাইটোলজি স্ক্রিনিং অ্যাপারেটাস নামে অভিহিত এই সরঞ্জাম একাই ছ'জন কুশলীর কাজ করতে পারে। ভাইকারস্ লিমিটেডের মতে, এরকম ৪০০টি সরঞ্জাম ২০ বছরের উর্ধ্বের বৃটেনের সকল মহিলাকে বছরে একবার করে পরীক্ষা করবার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রজনন-বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

প্রজনন-বিজ্ঞানকে আমরা সাধারণতঃ বংশধারার তত্ত্ব হিসাবে বুঝে থাকি। পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তান-সন্ততির বৈশিষ্ট্যের মিল ও অমিল সম্পর্কিত তথ্য ও তত্ত্ব যে বিজ্ঞানের সাহায্যে জানা যায়, তাকে প্রজনন-বিজ্ঞান বলে। প্রজনন-বিজ্ঞান বিজ্ঞানের কোন্ শাখার অন্তর্ভুক্ত, তা যেমন বলা শক্ত, তেমনই এই বিজ্ঞানের উন্নতিতে বিজ্ঞানের কোন্ শাখার অবদান বেশী এবং কোন্‌টার কম, তা নির্ধারণ করাও শক্ত। তবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আনুকূল্যে প্রজনন-বিজ্ঞান আজ যে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান প্রবন্ধে প্রজনন-বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্য বিজ্ঞানের সম্পর্কের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

কৃষি-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক

কৃষি-বিজ্ঞান হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম বিজ্ঞান। প্রজনন-বিজ্ঞানের জন্মের আগে থেকেই মানুষ তার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার বলে সংমিশ্রণ (Hybridisation) ও নির্বাচন (Selection) পদ্ধতির সাহায্যে উন্নত জাতের গাছপালা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। গ্রেগর মেণ্ডেলের যুগান্তকারী বংশধারা-তত্ত্ব আবিষ্কারের পর থেকে কৃষি-বিজ্ঞানে প্রজনন-বিজ্ঞানের প্রয়োগ সুরু হয়েছে। বংশানুক্রম-প্রক্রিয়া জানবার ফলে মানুষ আজ সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উন্নত জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করতে পারে। সংমিশ্রণ-পদ্ধতির সাহায্যে বর্তমানে কৃষি-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জাতের মধ্যে ভাল ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি একটি জাতের মধ্যে সন্নিবেশ করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক মুলার রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে ড্রসোফিলা মাছির বংশগত বৈশিষ্ট্যের পাকাপাকিভাবে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তিনি দেখেছিলেন যে, পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী পর্যায়ে সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে থাকে। সংমিশ্রণের সাহায্যে কোন নতুন বৈশিষ্ট্যের আমদানী না করে পাকাপাকিভাবে বংশগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনকে পরিব্যক্তি (Mutation) বলা হয়। বর্তমানে উদ্ভিদ ও কৃষি-বিজ্ঞানীরা রঞ্জেন রশ্মি, আইসোটোপ ও নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে গাছপালায় অনিষ্টকর বংশগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তির জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। এই বিষয়ে সুইডেনের গুষ্টাভ্‌সন পথপ্রদর্শক। তিনি রঞ্জেন রশ্মি প্রয়োগ করে এমন কয়েকটি ঘন সন্নিবিষ্ট শীষযুক্ত বার্লি সৃষ্টি করেছেন, যেগুলি মূল জাতীয় বার্লি অপেক্ষা বেশী ফলন দিয়ে থাকে।

গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে ভারতবর্ষে খাদ্য-উৎপাদনে যে নীরব বিপ্লব সুরু হয়েছে, তা বিস্ময়কর বললেও অত্যুক্তি হয় না। তার বহিঃপ্রকাশ ইদানীং দেখা যাচ্ছে। এককালে এক একর জমিতে ৩০ মণ গম বা ধান উৎপাদন করা হতো, কিন্তু বর্তমানে তা খুব সাধারণ ব্যাপার বলে গণ্য করা হয়। পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় এই বছরে এত গম উৎপন্ন হয়েছে যে, সেখানে সরকারের নির্ধারিত মূল্যের নীচে গম বিক্রয় হয়েছে। ভারতবর্ষ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার পথে এগিয়ে চলেছে। এর পিছনে কৃষি-

ও প্রজনন-বিজ্ঞানীর যে অদৃশ্য হস্ত রয়েছে, তার খবর খুব কম লোকেই রাখে। মেক্সিকো থেকে আনা লার্মা রোজো (Lerma Rojo), সোনারা-৬৪ (Sonara-64) জাতের গম এবং ফিলিপাইন থেকে আনা তাইচুং নেটিভ-১ এবং আই-আর-৮ জাতের ধান আমাদের খাদ্য উৎপাদনে বিপ্লব ঘটাতে সুরু করেছে। জাপানের নরিন নামে একটি বেঁটে জাতের গমের সঙ্গে মেক্সিকোর স্থানীয় জাতের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে লেমা রোজো, সোনারা-৬৪ প্রভৃতি উন্নত ধরণের বেঁটে জাতের গম সৃষ্টি করা হয়েছে। কয়েক বছর আগে চাউ-উ-জিন (Chau-wu-gin) নামে একটি বেঁটে জাতের ধান গাছ তাইওয়ানে আবিষ্কৃত হয়েছিল। পরে এর সঙ্গে সাই-ইয়ান-চুং (Tsai-yuan-chung) নামে আর একটি লম্বা জাতের ধান গাছের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাইচুং নেটিভ-১-এর সৃষ্টি হয়েছে। সংমিশ্রণের সাহায্যে আই-আর-৮-এরও উদ্ভব হয়েছে। গম ও ধানের এই সব উন্নত জাতগুলি আমাদের নতুন আশার আলো। তারা খর্বাকৃতি হবার ফলে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার গ্রহণ করতে পারে এবং সহজে হেলে পড়ে না—ফলে ফলনও অত্যধিক হয়। ভারতীয় কৃষি-গবেষণাগার আবার সোনারা-৬৪ গম গাছে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে উন্নততর জাতের গম সৃষ্টি করেছেন। এই জাতের নাম দিয়েছেন সরবতী সোনারা। এই নতুন জাতে প্রোটিনের অংশ শতকরা কুড়ি ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দানার লাল রং পাল্টে হল্‌দে হয়ে গেছে। আমেরিকার বিখ্যাত সঙ্কর ভুট্টার ন্যায় আমাদের দেশেও আজ সঙ্কর ভুট্টা, সঙ্কর জোয়ার ও সঙ্কর বাজরা উৎপন্ন হচ্ছে এবং তারা উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে তুলেছে। এসবই কৃষি-বিজ্ঞানে প্রজনন-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোষ-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক

প্রজনন-বিজ্ঞানের উন্নতি আজ যা দেখা যাচ্ছে, তা কখনও সম্ভব হতো না, যদি তার পিছনে কোষ-বিজ্ঞানীদের (Cytologists) নিরলস গবেষণা না থাকতো। কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী, কি মানুষ—সবই অসংখ্য কোষের সমষ্টি। পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের শারীরিক সম্বন্ধ দুটি জননকোষ (Gamete) ছাড়া যে আর কিছুই নয়, সে সম্বন্ধে বিশদভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং এই কোষের মধ্যে এমন কিছু পদার্থ আছে, যার ফলে সন্তানদের মধ্যে পিতামাতার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বিজ্ঞানীরা কোষের (Cell) গবেষণায় নিযুক্ত হলেন। এই গবেষণার ফলে বিজ্ঞানে যে নতুন শাখার জন্ম নিল—নাম হলো তার কোষতত্ত্ব বা সাইটোলজি (Cytology)। কোষতত্ত্বকে প্রজনন-তত্ত্বের একটি প্রধান স্তম্ভ বললে অত্যুক্তি হয় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একটি কোষকে যখন বড় আকারে দেখা যায়, তখন তার মধ্যে একটি বিরাট জগৎ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। বিভাজনের সময় কোষের কেন্দ্রে অবস্থিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃমির আকারে পরিণত হয়—এগুলিকে ক্রোমোসোম বলে। ফিউলজেন (Feulgen) নামে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে কোষকে যখন রঞ্জিত করা হয়, তখন তাদের পরিষ্কার চেহারা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, ক্রোমোসোমের মধ্যে এমন কিছু বংশকণিকা আছে, যারা গাছপালা, পশুপক্ষী ও মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই বংশকণিকা বর্তমানে জিন (Gene) নামে আমাদের কাছে পরিচিত। একটি জিন একটি বৈশিষ্ট্য অথবা অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে, আবার এক সঙ্গে অনেকগুলি জিন একটি মাত্রিক বৈশিষ্ট্যকে (Quantitative

character) রূপায়িত করে। জিনগুলি ক্রোমোসোমের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে। যে সব জিন একই ক্রোমোসোমে অবস্থান করে, তারা সাধারণতঃ একই ক্রোমোসোমে সংশ্লিষ্ট হয়ে বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। কোন একটি নির্দিষ্ট জিন নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট কক্ষে (Locus) থাকে। কোন্ জিন কোন্ ক্রোমোসোমে অবস্থান করে, তা সহজে নির্ণয় করা যায় না। সংমিশ্রণের (Crossing) সাহায্যে জিন কোন্ ক্রোমোসোমে এবং ক্রোমোসোমের কোন্ কক্ষে থাকে, জানতে পারা যায়। জিনগুলি এতই সূক্ষ্ম যে, শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তাদের দেখা যায় না।

প্রজাতিবিশেষে ক্রোমোসোম-সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। ক্রোমোসোম-সংখ্যার উনিশ-বিশ হলে অথবা তাদের আয়তনে ঈষৎ ভাঙাচোরা ঘটলে বহিঃপ্রকৃতিতে (Phenotypically) তার প্রতিফলন দেখা যায়। গত দশ বছরে ক্রোমোসোম বিশৃঙ্খলা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। মানুষের দেহকোষে সাধারণতঃ ৪৬টি ক্রোমোসোম থাকে। কোন সন্তানের দেহকোষে যদি একটি ক্রোমোসোম বেশী থাকে, তাহলে তার মধ্যে হাবাগোবার ভাব লক্ষ্য করা যায়। যে সব পুত্র-সন্তানের দেহকোষে লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোম জোড়া XY-এর পরিবর্তে XXY থাকে, তার মধ্যে কন্যা-সন্তানের বৈশিষ্ট্য পরবর্তী কালে ফুটে ওঠে। এক্স-রে ছবির ন্যায় অদূর ভবিষ্যতে মানুষের বংশগত ব্যাধির নির্ণয় ও নিরাময়ের জন্যে ক্রোমোসোমের ছবি দেখবার যে প্রয়োজন হবে না, তা কে বলতে পারে? সুতরাং প্রজনন-তত্ত্বের উন্নতির মূলে কোষতত্ত্বের যে বিশেষ ভূমিকা আছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

জৈব-রসায়নের সঙ্গে সম্পর্ক

জৈব-রসায়নবিদেরা আজ নিজের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে প্রজনন-বিজ্ঞানের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছেন। তাঁরা নিজের কার্যকলাপ ও রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধে আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছেন। গত কয়েক বছরে জৈব-রসায়ন বিজ্ঞানে যা আবিষ্কার হয়েছে, তা মহাকাশে মানুষ পাঠাবার চেয়ে কম বিস্ময়কর নয়।

জিনের কার্যপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের পক্ষে ব্যাক্টিরিয়া ও ছত্রাককে আদর্শ উপকরণ হিসাবে গণ্য করা হয়। এদের পর্যায়কাল (Generation time) খুব সংক্ষিপ্ত এবং এরা প্রচুর সংখ্যক সন্তান (Offspring) উৎপাদন করে। তাছাড়া এদের ক্রোমোসোমগুলি এককভাবে কোষের মধ্যে থাকে। জোড়ায় জোড়ায় থাকে না। ফলে প্রকট বা প্রচ্ছন্ন জিনের কোন প্রশ্ন ওঠে না, ক্রোমোসোমে অবস্থিত কোন জিনের কিছু পরিবর্তন ঘটলে সহজেই ধরা পড়ে। জিনের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্যে আমেরিকায় দু-জন বিজ্ঞানী—জর্জ ডাব্লিউ. বিড্‌ল্ এবং এডওয়ার্ড এল. ট্যাটাম নিউরোস্পোরা ক্রাসা (Neurospora crassa) নামে গোলাপী রঙের এক ছত্রাক ব্যবহার করেছিলেন। এই ছত্রাকটি তার জীবন-চক্রের এক বিশেষ সময়ে আটটি স্পোর (Spore) সৃষ্টি করে। প্রতি স্পোরে সাতটি ক্রোমোসোম থাকে। বংশগত গুণাগুণের বিচারে স্পোরগুলির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকে না। বিড্‌ল ও ট্যাটাম রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে স্পোরের পরিব্যক্তি (Mutation) সৃষ্টি করে দেখলেন যে, যে সব স্পোরে জিন পরিব্যক্তি ঘটেছে, তারা শর্করা ও বায়োটিন (Biotine) যুক্ত সাধারণ খাদ্যবস্তু (Minimal medium) থেকে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপন্ন করতে অক্ষম। এই কারণে তারা সাধারণ খাদ্যে বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু খাদ্যবস্তুতে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড, যেমন—আরজিনিন, অরনিথিন, সাইট্রুলিন যোগ করলে পরিব্যক্ত স্পোরের বংশবৃদ্ধি

ঘটে। বিজ্ঞানীদ্বয় লক্ষ্য করলেন যে, পরিব্যক্ত জিনের শ্রেণীবদ্ধ রাসায়নিক বিক্রিয়ার সঙ্গে এনজাইমের শ্রেণীবদ্ধ বিপাকের তুলনা করা চলে। এথেকে তাঁদের ধারণা জন্মে, বিশেষ জিন বিশেষ এনজাইমের সহায়তায় নতুন রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি করে। বিড্‌ল্‌ ও ট্যাটামের গবেষণা থেকেই 'One gene—one enzyme' ধারণার সৃষ্টি হয় এবং তাঁরাই বায়োকেমিক্যাল জেনেটিক্স নামে বিজ্ঞানের এই নতুন শাখার পত্তন করেন।

নিউরোস্পোরার ন্যায় মানুষের বংশগত ফেনিলকেটোনুরিয়া রোগে জিন-এনজাইমের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। মানুষের যকৃতে ফেনিল অ্যালেনিন হাইড্রোক্সিলেজ নামে এক এনজাইমের অভাবে ফেনিল অ্যালেনিন অ্যামিনো অ্যাসিড টাইরোসিন অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হতে পারে না, ফলে রক্তে ফেনিল অ্যালেনিনের আধিক্য ঘটে। রক্তে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সন্তানের বুদ্ধিহীনতা ও মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়।

মানুষের শরীরে জিনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর এ. ভি. ইনগ্রামের গবেষণার বিষয় উল্লেখ না করে পারা যায় না। অনেকেই হয়তো বংশগত সিক্‌ল্‌ সেল অ্যানিমিয়া (Sickle-cell anemia) রোগের নাম শুনেছেন। যাদের রক্তে অস্বাভাবিক আকৃতির হিমোগ্লোবিন থাকে, তাদের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়। হিমোগ্লোবিনের রাসায়নিক উপাদান হচ্ছে প্রোটিন। একটি হিমোগ্লোবিন অণু দুটি অংশে গঠিত এবং প্রতিটি অংশে উনিশ প্রকারের প্রায় ৩০০টি অ্যামিনো অ্যাসিড পর পর সংযুক্ত থাকে। ডক্টর ইনগ্রাম দেখিয়েছেন যে, অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমিক সজ্জায় একস্থানের গ্লুটামিক অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিবর্তে যদি ভ্যালিন অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, তাহলে রক্তে গোলাকৃতি হিমোগ্লোবিনের পরিবর্তে বাঁকাচোরা লম্বা আকৃতির অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের অস্তিত্ব দেখা যায় এবং তার ফলে বংশগত রক্তশূন্যতা রোগের আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একটি জিন তিন শত অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমিক সজ্জায় একটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে পরিবর্তন করে সমস্ত প্রোটিনের ধর্মকে পাল্টে দিতে পারে।

জৈব-রসায়নের উন্নতিতে বিজ্ঞানীরা আজ জিনের রাসায়নিক উপাদান নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন। ক্রোমোসোমের মধ্যে যে রাসায়নিক পদার্থ থাকে, তা ডি. এন. এ. ছাড়া আর কিছুই নয়। ডি. এন. এ. যে বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রবাহিত হয়, তা নিসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। প্রজাতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের মূলে আছে ডি. এন. এ.। সুতরাং ডি. এন. এ. বংশগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারে। ডি. এন. এ-কে জীবনের সারবস্তু বলা হয়। চার প্রকার নিউক্লিওটাইড অণুর ক্রমিক সজ্জায় গড়ে ওঠে ডি. এন. এ-র একটি জটিল ও অতিকায় অণু। প্রতিটি নিউক্লিওটাইড অণুতে থাকে শর্করা, ফস্‌ফেট জাতীয় লবণ এবং অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন—এই চার প্রকার জৈব ক্ষারের যে কোন একটি। জৈব ক্ষারের প্রকারভেদে নিউক্লিওটাইডের প্রকারভেদ হয়। ডি. এন. এ. অণুতে নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা বেশী হলে চারটি নিউক্লিওটাইডের মধ্যে অসংখ্য গঠন-বিন্যাস হতে পারে। ডি. এন. এ. অণুর বৈশিষ্ট্যের তারতম্যে অসংখ্য প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

ডি. এন. এ অণুর ক্ষুদ্র অংশকে জিন বলে। ডি. এন. এ. অণুর বিভিন্ন অংশে নিউক্লিওটাইডের

সজ্জাক্রম বিভিন্ন। এই কারণে ডি. এন. এ. অণুর কোন একটি অংশ জৈব-রসায়নের দিক দিয়ে অপর একটি অংশ থেকে পৃথক। সুতরাং বিশেষ জিন ডি. এন. এ. অণুর বিশেষ অংশকে নির্দিষ্ট করে। জিন বা ডি. এন. এ. কিভাবে প্রোটিনকে সংশ্লেষিত করে, সে প্রক্রিয়া জৈব-রসায়নবিদের নিকট আজ আর অজ্ঞাত নয়। জিনের রহস্যভেদে জৈব-রসায়নবিদ্‌দের দান অতুলনীয়।

নৃ-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক

নৃ-বিজ্ঞানে প্রজনন-বিজ্ঞানের প্রয়োগের ইতিহাস বেশী দিনের নয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কার্ল ল্যাণ্ডস্টিনার প্রথম যখন লক্ষ্য করলেন যে, সব মানুষের রক্ত যে কোন মানুষের শরীরে সঞ্চারিত করা যায় না, তখন তিনি এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখলেন যে, গ্রহীতার রক্তে যদি বিপরীত-ধর্মী অ্যান্টিবডি থাকে, তাহলে দুই রক্তের সংমিশ্রণে গ্রহীতার রক্ত জমাট বেঁধে যায় এবং সে তখন মরণাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়। ল্যাণ্ডস্টিনার মানুষের রক্তে A ও B দু-রকম অ্যান্টিজেনের সন্ধান পেয়েছিলেন। যাদের রক্তে শুধুমাত্র একটি অ্যান্টিজেন থাকে, তাদের A অথবা B শ্রেণী, যাদের দুটি এক সঙ্গে থাকে, তাদের AB শ্রেণী এবং যাদের দুটি অ্যান্টিজেনের কোনটাই থাকে না, তাদের O শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মানুষের রক্ত-শ্রেণী পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে বংশানুক্রমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পিতামাতার রক্ত-শ্রেণী নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অধ্যাপক হার্সফিল্ড ও তাঁর পত্নী বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত সৈন্যদের রক্ত-শ্রেণী পরীক্ষা করে দেখলেন যে, চার-প্রকার রক্ত-শ্রেণীর অনুপাত বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন। এরপর থেকে নৃতত্ত্ববিদেরা রক্ত-শ্রেণীর অনুপাতের বৈশিষ্ট্যকে জাতির শ্রেণীবিভাগে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন। নৃতত্ত্বের সঙ্গে প্রজনন-তত্ত্বের তখন প্রথম সংযোগ ঘটলো। বর্তমানে ABO ছাড়া MN, Rh, Kell Duffy, Lewis প্রভৃতি রক্ত-শ্রেণী ও রক্তে বিভিন্ন প্রকার অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন আবিষ্কৃত হওয়ায় জাতির শ্রেণী-বিভাগ, সংমিশ্রণ ও গতিবিধি সংক্রান্ত গবেষণা করবার অনেক সুবিধা হয়েছে। ভারতবর্ষে শতকরা ৩৬ থেকে ৫০ জন M রক্ত-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু চীনদেশে ঐ রক্ত-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের শতকরা হার ২৬ থেকে ৪০। বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের আলাদা সম্প্রদায় বলে গণ্য করা হলেও O, A, B ও AB রক্ত শ্রেণী অনুপাতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

নৃতত্ত্ববিদের নিকট জাতীয় শ্রেণীবিভাগ একটা দুরূহ সমস্যা। বর্তমানে তাঁরা রক্ত-শ্রেণীর সাহায্যে জাতির শ্রেণীবিভাগ করে থাকেন। যেমন প্রজনন-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে নৃ-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটেছে, তেমনই নৃ-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে প্রজনন-বিজ্ঞানের পরিধিও যে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

পরিসংখ্যানের সঙ্গে সম্পর্ক

প্রজনন-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিসংখ্যানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পরিসংখ্যানের প্রয়োগে যে কোন দুটি জিন একই ক্রোমোসোমে যুক্ত হয়ে থাকে, না ভিন্ন ক্রোমোসোমে অবস্থান করে, তা যেমন জানতে পারা যায়, তেমনি এই বিজ্ঞানের সাহায্যে একই ক্রোমোসোমে অবস্থিত বিভিন্ন জিনের পারস্পরিক বা আপেক্ষিক দূরত্ব নির্ণয় করাও সম্ভব হয়। বিভিন্ন জিনের দূরত্বের পরিমাণ থেকে ক্রোমোসোমের মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং প্রজনন-বিজ্ঞানের

উন্নতিতে পরিসংখ্যানের অবদানকে কোনমতেই অবহেলা করা যায় না।

এক কালে মেণ্ডেলের অনুগামীরা গাছপালা ও পশুপক্ষীর সব কিছু বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার সূত্র বংশকণিকা দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করতেন। অপর পক্ষে গ্যালটন, পিয়ারসন প্রভৃতি সংখ্যা-তত্ত্ববিদেরা বুঝাতে চাইলেন যে, মেণ্ডেলের উত্তরাধিকার সূত্র শুধুমাত্র গুণাত্মক বৈশিষ্ট্যে (Qualitative character) প্রযোজ্য, মাত্রিক বৈশিষ্ট্যে (Quantitative character) নয়। তাঁদের মতে, পিতা-মাতার দৈহিক উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি মাত্রিক বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততির মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় প্রকাশ পায়। এরূপ ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তান-সন্ততির মাত্রিক বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধ বুঝাতে হলে সংখ্যা-তত্ত্বের Covariation বা Correlation-এর সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু মেণ্ডেলের অনুগামীরা সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌দের মতকে কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না, ফলে দুই দলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এই সময় রোনাল্ড আব্রাহাম ফিসার নামে এক ঝানু গণিতজ্ঞের আবির্ভাবে দুই দলের মত-বিরোধের অবসান ঘটে। তিনি প্রথম সংখ্যাতত্ত্ব ও প্রজনন-তত্ত্বের সংযোগ ঘটিয়ে বায়োমেট্রিক্যাল জেনেটিক্স (Biometrical genetics) নামে প্রজনন-বিজ্ঞানের এক নতুন শাখার পত্তন করেন। যাঁরা গাছের ফলন, দুগ্ধ উৎপাদন প্রভৃতির উত্তরাধিকার সূত্র নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা এই বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন।

মেণ্ডেল, মরগ্যান প্রভৃতি যে বংশধারা-সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন, তারই ভিত্তিতে 'পপুলেশান জেনেটিক্স' (Population Genetics) নামে আরও একটি শাখার জন্ম হয়েছিল। প্রজনন-বিজ্ঞানের যে সব শাখা সম্প্রতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে পপুলেশন জেনেটিক্স অন্যতম। কোন বংশগত বৈশিষ্ট্য বা রোগের উত্তরাধিকার-সূত্র নির্ণয় করা পপুলেশন জেনেটিক্সের উদ্দেশ্য নয়। জনসাধারণের মধ্যে কোন বংশগত বৈশিষ্ট্যের অনুপাত এবং পর্যায়ক্রমে অনুপাতের তারতম্য লক্ষ্য করাই প্রজনন-বিজ্ঞানের এই শাখার একমাত্র উদ্দেশ্য। জনসাধারণের মধ্যে কোন বংশগত বৈশিষ্ট্যের অনুপাত কি ভাবে নির্বাচন (Selection), পরিব্যক্তি (Mutation), শ্রেণীগত বিবাহ (Assortive mating), সগোত্র বিবাহ (Inter marriage) ও গোষ্ঠীর প্রভাবের (Effect of isolates) উপর নির্ভর করে, তাতে পপুলেশন জেনেটিক্সের সাহায্যে আলোকপাত করা সম্ভব। রক্ত-শ্রেণীর অনুপাতের সাহায্যে বিভিন্ন জাতির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আগে যা বলা হয়েছে, তা পপুলেশন জেনেটিক্সের প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। হলডেন, ফিসার, রাইট, প্রভৃতি প্রতি-ভাবান গণিতবিদেরা প্রজনন-বিজ্ঞানের এই শাখার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন। তাঁদের কাজের জন্যে গবেষণা-ক্ষেত্র (Experimental field), অণুবীক্ষণ যন্ত্র, ড্রসোফিলা মাছির বোতল বা ইঁদুরের খাঁচার প্রয়োজন হয় নি, তাঁরা শুধু কাগজ-কলমের সাহায্যে পপুলেশন জেনেটিক্সের নতুন নতুন ফরমুলা আবিষ্কার করে প্রজনন-বিজ্ঞানের মান অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।

সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক

আজ প্রজনন-বিজ্ঞানের সাহায্যে মানব জাতিকে উন্নত করা যায় কি না, সে সম্বন্ধে সমাজ-বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। জন-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যে হারে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তাতে চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। দুর্বলের রক্ষণা-বেক্ষণ করাই মানুষের কর্তব্য এবং সেই কর্তব্য পালনই মানবিকতার পরিচয়। কিন্তু দেশে

দুর্বল, অক্ষম ও অকর্মণ্যদের সংখ্যা যদি বেড়ে যায়, তাহলে তারা দেশের সম্পদ ও খাদ্যের ভাগ বসিয়ে সবল, সক্ষম ও কর্মঠদের সুখ-সুবিধাকে যে বঞ্চিত করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দুর্বলের প্রতি সবলের যত্ন ও দয়ায় যারা মানব সভ্যতার কিছু উন্নতি ঘটেছে, তা অনেকে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন—সেবা, সহানুভূতির আধিক্যে অবাঞ্ছিত ও অকর্মণ্যদের সংখ্যা বেড়ে উঠে সভ্যতার সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

চিকিৎসার সাহায্যে বংশগত রোগগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ ও বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিরা সুস্থ হয়ে দীর্ঘায়ু হোন, তাতে কারও আপত্তি থাকা উচিত নয়, কিন্তু তারা যদি সুস্থ ও নীরোগ ব্যক্তিদের ন্যায় অবাধে সন্তান উৎপাদন করেন, তাহলে আশঙ্কার কারণ থাকে। কারণ, তারা পুত্র-কন্যার মাধ্যমে অনিষ্টকর জিনের সঞ্চার করে ভবিষ্যৎ পর্যায়ের সন্তান-সন্ততির মধ্যে অনিষ্টকর জিনের বোঝার ভার বৃদ্ধি করেন।

পরিবার-পরিকল্পনার সাহায্যে বংশগত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা যদি নীরোগ ও সুস্থ ব্যক্তিদের অপেক্ষা কম সন্তান উৎপাদন করেন, তাহলে অনিষ্টকর বংশগত বৈশিষ্ট্যের অনুপাত প্রতি পর্যায়ে কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে। পরিবার-পরিকল্পনার সাহায্যে শুধু জন-সংখ্যার বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব নয়, এর সুষ্ঠু প্রয়োগে ভবিষ্যৎ মানব সমাজে বংশগত রোগগ্রস্ত সন্তানের আবির্ভাবকেও কিছু পরিমাণে রোধ করা যেতে পারে।

গরু, ঘোড়া, ছাগলের দৃষ্টান্ত থেকে লক্ষ্য করা গেছে যে, অতি নিকট সম্পর্কের স্ত্রী ও পুরুষ পশুর মিলনের ফলে দুর্বল ও ক্ষীণজীবী সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই কারণে সমাজ-বিজ্ঞানীরা অন্ত-র্বিবাহের কুফল সম্বন্ধে সচেতন। যে সব বংশগত রোগ পরিবারে ও সমাজে অশান্তির কারণ ঘটায়—সেই সব রোগের আবির্ভাব রোধ করবার জন্যে তাঁরা আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিবাহ অপেক্ষা অনাত্মীয়দের সঙ্গে বিবাহের উপদেশ দিয়ে থাকেন। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই যদি কোন বংশগত রোগের 'বাহক' হিসাবে ধরা পড়েন, সে ক্ষেত্রে তাদের বিবাহ এমন পুরুষ ও স্ত্রীর সঙ্গে হওয়া কাম্য, যারা ঐ বংশগত রোগের জিন বহন করেন না। প্রয়োজন হলে পাত্র-পাত্রীর বংশতালিকা ও রক্ত পরীক্ষা করে প্রজনন-তাত্ত্বিক পরামর্শ (Genetic counseling) দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

উন্নত মানব-সমাজ সৃষ্টি করতে হলে যেমন অনিষ্টকর জিনের বিলোপ সাধনের প্রয়োজন, তেমনি সুস্থ ও প্রয়োজনীয় জিনের প্রসারও একান্ত আবশ্যক। মানব জাতিকে উন্নত করবার জন্যে স্যার জুলিয়ান হাক্সলি ও অধ্যাপক মুলার 'স্পার্ম ব্যাঙ্ক' স্থাপন করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক দিক দিয়ে যারা উপযুক্ত, তাদের নিকট থেকে স্পার্ম সংগ্রহ করে নারীদেহে প্রবেশ করিয়ে প্রয়োজনীয় গুণসম্পন্ন সন্তান সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। তাদের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে যে বহু সমাজ-ধর্ম ও আইনগত বাধার সম্মুখীন হতে হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

উপরিউক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ না করে মনুষ্য জাতিকে উন্নত করবার জন্যে অন্য পন্থা অবলম্বনের কথা অনেক সমাজ-বিজ্ঞানী চিন্তা করেন। আধুনিক সমাজে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক কারণে শিক্ষিত যুবকেরা দারপরিগ্রহ করতে অগ্রসর হন না এবং বিবাহ করলেও তাঁরা কম সংখ্যক সন্তান উৎপন্ন করেন। ফলে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে সন্তানোৎপাদনের হার কম দেখা যায়, অন্যদিকে দরিদ্র ও অশিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রচুর সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করে থাকেন। সুতরাং সুস্থ ও বুদ্ধিমান জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা অপরিহার্য। যদি

বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা, সন্তানদের অবৈতনিক শিক্ষা ও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে অনেক শিক্ষিত যুবক-যুবতী বিবাহ করতে উৎসাহিত বোধ করবেন এবং উন্নত জাতি সৃষ্টি করতে সহায়তা করবেন। সর্বোপরি এমন সমাজ-ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই সর্বপ্রকার কাজ গ্রহণ করবার সমান সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

আজ জনসংখ্যা যে হারে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে প্রজনন-বিজ্ঞানের প্রভাব সমাজ-বিজ্ঞানে এসে পড়বে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক

গ্রেগর মেণ্ডেলের বংশধারা-সূত্রের আবিষ্কারের পর থেকে মানুষের অনেক বংশগত রোগের উৎপত্তির কারণ ও উত্তরাধিকার সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বংশগত রোগের মূল বা জিনকে উৎপাটন করা সম্ভব না হলেও তার বহিঃপ্রকাশকে আজ অনেক ক্ষেত্রে রোধ করা সম্ভব।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও প্রজনন-বিজ্ঞানের সংমিশ্রণে মেডিক্যাল জেনেটিক্স নামে এক নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে। এই শাখার উন্নতি সুরু হয় ডক্টর এ. ই. গ্যারোডের আমল থেকে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে গ্যারোড প্রথম বংশগত অ্যালকাপটোম্বুরিয়া রোগের কথা উল্লেখ করেন। বিপাক-বিশৃঙ্খলার ফলে এই রোগটির সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমরা যে সব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি, তা এনজাইমের সংস্পর্শে পরিপুক্ত হয়। আমাদের শরীরে যদি কোন একটি বিশেষ এনজাইমের অভাব থাকে, তাহলে শ্রেণীবদ্ধ বিপাক-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ফলে নানারকম ব্যাধির উৎপত্তি ঘটে এবং তাদের লক্ষণ বংশানুক্রমিকভাবে সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রকাশ পায়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এনজাইমগুলি জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বর্তমানে এনজাইমঘটিত অনেক বংশগত রোগ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে ফেনিলকেটোম্বুরিয়া ও গ্যালাক্টোসেমিয়া উল্লেখযোগ্য। সময়মত এই সব রোগ ধরা পড়লে, রোগের উপশম করা যেতে পারে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতিতে বর্তমানে অনেক বংশগত রোগের প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। শরীরে ইনসুলিনের অভাবে বংশগত ডায়াবেটিস রোগীরা এককালে বেশী দিন বাঁচতো না। বর্তমানে তারা ইনসুলিন ইঞ্জেকসন গ্রহণ করে দীর্ঘজীবন লাভ করে। এই সঙ্গে বংশগত হিমোফিলিয়া রোগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হিমোফিলিয়া রোগীর রক্ত বাতাসের সংস্পর্শে এসে সহজে জমাট বাঁধে না। শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে এই রোগের রোগীরা অবিশ্রান্ত রক্তক্ষরণের ফলে মারা যায়। এককালে হিমোফিলিয়া রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করা সমস্যার বিষয় ছিল, কেন না—রক্ত জমাট বাঁধাবার পন্থা তখন জানা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে রক্তরস থেকে অ্যান্টি-হিমোফিলিক ফ্যাক্টর নামে এক পদার্থ বের করা হয়েছে। এই পদার্থ রোগীর শিরায় প্রবেশ করিয়ে হিমোফিলিয়া রোগকে বশে আনবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা গেছে।

অনেকেই জানে যে, ABO রক্ত-শ্রেণীর অসামঞ্জস্যের ফলে রক্ত দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট বাধা-বিপত্তি ঘটে। কিন্তু এই রক্ত-শ্রেণীর সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রক্ত সঞ্চারণের কুফল লক্ষ্য করা গেছে। এর মূলে আছে Rh রক্ত-শ্রেণীর অসামঞ্জস্যতা। যে সব মানুষের রক্তে Rh-অ্যান্টিজেন থাকে, তাদের Rh-পজিটিভ এবং যাদের রক্তে তা থাকে না, তাদের Rh-নেগেটিভ বলা হয়। দেখা গেছে যে, শতকরা ৮০ থেকে ৮৫ জন Rh-পজিটিভ এবং শতকরা ১৫ থেকে ২০ জন Rh-নেগেটিভ শ্রেণীভুক্ত।

যদি কোন Rh-পজিটিভ ব্যক্তির রক্ত Rh-নেগেটিভ ব্যক্তির দেহে সঞ্চারিত করা হয়, তাহলে গ্রহীতার প্রথম অবস্থায় কিছু ক্ষতি হয় না, কিন্তু তার রক্তে মাঝে মাঝে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়ে থাকে। রক্তে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হবার ফলে গ্রহীতা পুনরায় Rh-পজিটিভ ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করতে পারে না, গ্রহণ করলে পরিণাম মারাত্মক হয়। অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডির সংস্পর্শে গ্রহীতার জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আবার যদি কোন Rh-নেগেটিভ স্ত্রীলোক একজন Rh-পজিটিভ পুরুষকে বিবাহ করে, তাহলে তার বেশীর ভাগ সন্তান Rh-পজিটিভ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তানের Rh-অ্যান্টিজেন মাতার শরীরে ঢুকে রক্তে অ্যান্টিবডির সৃষ্টি করে। এখন ঐ স্ত্রীলোকের প্রসবকালে যদি রক্তক্ষরণ হয় এবং তার স্বামীর অথবা অন্য কোন Rh-পজিটিভ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে যদি তাকে রক্ত দেওয়া হয়, তাহলে তার জীবন সংশয়াপন্ন হয়ে ওঠে। তাছাড়া ঐ স্ত্রীলোকের রক্তে অ্যান্টিবডি থাকবার ফলে তার পরবর্তী গর্ভস্থ সন্তানের রক্তে মিশে রক্ত কণিকাগুলিকে নষ্ট করে দেয় এবং মৃত সন্তান অথবা রক্তশূন্য সন্তানের জন্ম হয়ে থাকে। বর্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতিতে Rh-রক্তশ্রেণীর অসামঞ্জস্যপ্রসূত সন্তানের রক্তশূন্যতা রোগকে বহুল পরিমাণে রোধ করা সম্ভব।

মানুষের রক্ত-শ্রেণীর সঙ্গে অন্য কোন রোগের সম্পর্ক আছে কি না, সে সম্বন্ধে বর্তমানে জোর গবেষণা চলছে। ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী ফ্রেসার রবার্টস দেখিয়েছেন যে, O রক্ত-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ডুয়োডেনাল আলসার হবার প্রবণতা অন্য রক্ত-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের অপেক্ষা বেশী।

ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসবার ফলে চিকিৎসকেরা নানারকম বংশগত রোগের বংশলতিকা প্রস্তুত করে, তাদের উত্তরাধিকার-সূত্র সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এই সব তথ্য আজ মানব-কল্যাণে প্রয়োগ করা হচ্ছে। চিকিৎসকদের বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে মানব-বংশধারা তত্ত্বের অনেক রহস্যের উদ্ঘাটন করা আজ সম্ভব হয়েছে। সুতরাং প্রজনন-বিজ্ঞানের উন্নতিতে বিশেষতঃ মানব-বংশধারা তত্ত্বের উন্নতিতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের অবদান অপরিসীম।

মন্তব্য ও উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে প্রজনন-বিজ্ঞানের প্রয়োগবিধি ও তার সীমারেখা (Limitation) সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কৃষি-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, কৃত্রিম পরিব্যক্তির ফলে ভাল জাত অপেক্ষা খারাপ জাত সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বেশী। ধানের বীজে রঞ্জেন রশ্মি, আইসোটোপ প্রভৃতি প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, অনেক বীজ অঙ্কুরিত হয় না, অঙ্কুরিত হলেও ক্লোরোফিলশূন্য সাদা গাছ হয় অথবা দানাগুলি এত অপুষ্ট হয় যে, সেগুলিকে কখনও উন্নত জাত বলে উল্লেখ করা যায় না। কৃত্রিম পরিব্যক্তি রচনা করবার মুখ্য উদ্দেশ্য, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতের সৃষ্টি করা এবং তার মধ্য থেকে উন্নত ও উপযুক্ত জাত নির্বাচন করা। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অসংখ্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতের অস্তিত্ব দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে সেগুলিকে ভালভাবে পরীক্ষা না করে নতুন করে আরও জাতের সংখ্যা বাড়ানো উচিত কি না, তা বিবেচনাযোগ্য।

জৈব রসায়নবিদেরা বলেন, জীবনের রহস্য ডি-এন-এ অণুর মধ্যে লুক্কায়িত আছে। জীবন বলতে তাঁরা ডি-এন-এ-কেই শুধু বোঝেন। কিন্তু জীবনের অর্থ ডি-এন-এ-র চেয়ে আরও গূঢ়, আরও ব্যাপক। আজকাল অণু প্রজনন-তত্ত্বের (Molecular genetics) যুগ। বিজ্ঞানের

বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞেরা যদি এই অণু-তত্ত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েন, তাহলে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে গবেষণা করবার প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়ে গেছে? আগামী কালের প্রজনন-বিজ্ঞানের গবেষণা কি শুধু সূক্ষ্ম অণুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে? মানুষ তো একটি অণু নয়! তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার-সূত্র সম্বন্ধে গবেষণা করতে আমরা কি বিরত থাকবো?

নৃতত্ত্ববিদেরা মানুষের দৈহিক উচ্চতা, মাথার আকৃতি, নাকের গড়ন, চুলের গঠন, গায়ের রং, চোখের মণির রং প্রভৃতির দ্বারা জাতির শ্রেণী-বিভাগ করে থাকেন। কিন্তু এই সব বৈশিষ্ট্য পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত নয় এবং এদের সঠিক বংশধারা আমাদের কাছে এখনও অজ্ঞাত। বর্তমানে বিভিন্ন রক্ত-শ্রেণীর অনুপাতের সাহায্যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এই রক্ত-শ্রেণী পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয় এবং এদের উত্তরাধিকার-সূত্রও আমাদের জানা আছে। কোন জাতি কোন বিশেষ রক্ত-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তা যদি হতো, তাহলে পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হতো। রক্তের উপাদানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না। কোন নৃতত্ত্ববিদ্ রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে বলতে পারেন না—রক্তদাতা কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু রক্তটা কোন্ শ্রেণীর—সেটা তিনি বলতে পারেন।

এটা খুবই দুর্ভাগ্য যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে জীব-বিজ্ঞানের পাঠ্যতালিকায় অঙ্ক বা পরিসংখ্যানের কোন স্থান নেই। প্রখ্যাত শারীর-তত্ত্ববিদ্ ডক্টর এ. ভি. হিল বলতেন, বাড়ীর ভিত্তিকে শক্ত করতে হলে গোড়াতেই যেমন স্টীলের ফ্রেম করবার প্রয়োজন, তেমনি যে সব ছাত্র পরবর্তী জীবনে জীব-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করবে, তাদের শক্ত ও মজবুত করতে হলে গোড়া থেকেই অঙ্কশাস্ত্রে ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পারদর্শী করা প্রয়োজন।

ইদানীং বায়োমেট্রিক্যাল জেনেটিক্স ও পপুলেশন জেনেটিক্স-এর এত উন্নতি হয়েছে যে, অঙ্ক বা পরিসংখ্যানে ভাল জ্ঞান না থাকলে বিজ্ঞানের এই দুই শাখার উন্নতির গতির সঙ্গে তাল রেখে চলা খুবই কঠিন। বর্তমান যুগে পরিসংখ্যান হচ্ছে বিজ্ঞানীদের প্রধান হাতিয়ার। যিনি এই বিজ্ঞানকে বোঝেন, তিনি তাঁর গবেষণায় এই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করেন। আর যিনি বোঝেন না, তিনি এই বিজ্ঞানকে বিভীষিকা বলে মনে করেন। অঙ্কশাস্ত্রের যে শাখা জীব-বিজ্ঞানের কাছে সবচেয়ে বেশী ঋণী, সেটি হচ্ছে পরিসংখ্যান। কোয়েটিলেট (Quetelet) প্রথম দেখিয়েছিলেন যে, Normal বা Gaussian distribution মানুষের উচ্চতা ও জীবের বিভিন্ন পরিমাপে অনুসৃত হয়ে থাকে। কার্ল পিয়ারসন বংশগতি সম্বন্ধে গবেষণা করতে Correlation-এর ফরমুলা আবিষ্কার করেছিলেন। জীব-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে পরিসংখ্যান যেমন উন্নতি লাভ করেছে, আবার পরিসংখ্যানের সংস্পর্শে জীব-বিজ্ঞানের মানও তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাকে এক ধরণের সিমবায়োসিস (Symbiosis) বলা যেতে পারে। এই সঙ্গে গণিতজ্ঞ ও প্রজনন-তত্ত্ববিদ্ জোহান্সনের বিখ্যাত উক্তির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলতেন—"Biology must be handled with mathematics but not as mathematics".

বংশগত রোগের আবির্ভাব রোধ করতে হলে আমাদের শ্লোগান হওয়া উচিত—Don't marry relative অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনকে বিয়ে করো না। আমাদের দেশে বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে সগোত্র বিবাহ অধিক প্রচলিত। সগোত্র বিবাহের ফলে অনিষ্টকর

প্রচ্ছন্ন জিনের বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরিস্ফুট হবার সম্ভাবনা বেশী। আমাদের দেশের প্রজনন-বিজ্ঞানী ডক্টর দ্রোনাম রাজু দেখিয়েছেন যে, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে শতকরা ৩০টি বিবাহ সগোত্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে মামা-ভাগ্নী বিবাহের হার শতকরা ৮টি। তিনি তথ্যের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, অনাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ অপেক্ষা আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিবাহে যে সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করে, তাদের মধ্যে পালমোনারী টিউবারকিউলোসিস রোগের প্রবণতা বেশী। সম্প্রতি আমেরিকার দু'জন চিকিৎসক মাদ্রাজে ভেলোর অঞ্চলে গবেষণা করে আন্তর্বিবাহের কুফল সম্পর্কে নানারকম তথ্য পরিবেশন করেছেন। আন্তর্বিবাহের কুফল সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে, আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে শত শত বছর বিবাহ চলতে চলতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, এখন ধরতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ হচ্ছে, তাতে সন্তানদের শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং তারা নানাবিধ রোগ নিয়ে জন্মাচ্ছে। রোগের বীজকে প্রতিহত করবার জন্যে বিবাহের দ্বারা নতুন রক্ত আমদানী করবার কথা তিনি উল্লেখ করতেন।

মানুষের যে সব বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তার সামাজিক গুরুত্ব খুবই কম থাকতো, যদি না গায়ের রং, চোখের মণির রং, নাকের গড়ন, কোঁকড়া চুল প্রভৃতির উপর আমাদের ক্যাজী না থাকতো। বংশানুক্রম ও পরিবেশের সমন্বয়ে মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। পরিবেশবিহীন কোন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি বংশানুক্রম ছাড়া কোন বৈশিষ্ট্যও সৃষ্টি হয় না। স্বাস্থ্য, শক্তি ও কর্মক্ষমতা প্রভৃতি যে সব বৈশিষ্ট্য সমাজে বেশী প্রয়োজন, তা পরিবেশের উপর যে অনেকটা নির্ভরশীল, তা অস্বীকার করা যায় না। পরিবেশের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি নির্ভর করে। জাতির মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যে কোন আধুনিক রাষ্ট্রের কর্তব্য।

একথা অনস্বীকার্য যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতিতে অনেক বংশগত রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করা সম্ভব হয়েছে। বংশগত রোগ আরোগ্য করবার অর্থ এই নয় যে, অনিষ্টকর জিনকে উৎপাটন করা। কোন বংশগত রোগী ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলেন না, ডাক্তার বাবু আমার জিনকে তুলে দিন। জিনের অনিষ্টকর বহিঃপ্রকাশ থেকে মুক্ত হতে সে শুধু ইচ্ছা পোষণ করে। ডাক্তার কখনই জিনকে উৎপাটন করতে পারেন না, তিনি শুধু এমন ব্যবস্থা করতে পারেন, যাতে জিনের অনিষ্টকর বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে প্রকাশ না পায়। তিনি ইনসুলিন ইনজেকসন দিয়ে বংশগত ডায়াবেটিস রোগীকে সুস্থ করেন এবং অ্যান্টি-হিমোফিলিক ফ্যাক্টর প্রয়োগ করে বংশগত হিমোফিলিয়া রোগীকে আরোগ্য করেন। মেডিক্যাল জেনেটিক্সের শৈশবাবস্থা এখনও কাটে নি, তথাপি এটা আশা করা যায় যে, এই বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

পৃথিবীতে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাদের শতকরা দু-জনের মধ্যে বংশগত রোগ বা বিকৃতি দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি এই সব শিশুগুলিকে পৃথিবীতে আসতে না দেওয়া হয়, তাহলে সমাজ ও দেশের পক্ষে অশেষ মঙ্গল সাধন করা হয়। দেশের অর্থ-নৈতিক ও মানবতার দিক দিয়ে বিচার করলে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ও বিকৃত-মস্তিষ্ক শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া রোধ করবার প্রয়োজনীয়তা যে আছে, তা

কেউ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা কতদূর অগ্রসর হতে পারি, তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

মেণ্ডেলের ঐতিহাসিক বংশধারা-সূত্রের আবিষ্কারের পর থেকে অনেকে আশা করেছিলেন যে, প্রজনন-বিজ্ঞানের জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সমস্ত বংশগত রোগ ও অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিরতরে উৎপাটন করা সম্ভব হবে, কিন্তু প্রজনন-বিজ্ঞানের উন্নতিতে সে আশা অনেক কমে গেছে। যে সব বৈশিষ্ট্য প্রকট জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই জিনকে এক পর্যায়ে নির্মূল করা সম্ভব। কিন্তু দেখা গেছে যে, Huntington's chorea-র মত মারাত্মক মানসিক রোগ মধ্য বয়সের আগে সনাক্ত করা যায় না; অর্থাৎ যে সব বংশগত ব্যাধি বা অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্য সন্তানোৎপাদনের বয়সের (Reproductive age) পূর্বে অপ্রকাশিত থাকে, সে সব ক্ষেত্রে নির্বীজকরণে বংশগত বৈশিষ্ট্যকে এক পর্যায়ে নির্মূল করা যায় না।

মানুষের বেশীর ভাগ বংশগত রোগ প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমগোত্রীয় দুটি প্রচ্ছন্ন জিনের একত্র সমাবেশ ঘটলে সন্তানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন জিনের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। কিন্তু যারা মাত্র একটি প্রচ্ছন্ন জিন বহন করে, বহিঃ-প্রকৃতিতে (Phenotypically) তাদের সহজে সনাক্ত করা যায় না। কাজেই এসব ক্ষেত্রে প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শ দেওয়া কঠিন। তা-ছাড়া দেখা গেছে যে, বংশগত রোগের বাহকেরা সুস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা প্রাকৃতিক নির্বাচনে অনেক সুবিধা পেয়ে থাকে। যারা সিক্‌ল্ সেল অ্যানিমিয়ার জিন প্রচ্ছন্নভাবে বহন করে, তারা ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে বাস করেও ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয় না, অথচ যারা বাহক নয়, তারা এই রোগে আক্রান্ত হয়। অধ্যাপক হলডেন আবার দেখিয়েছেন যে, কৃত্রিম নির্বাচনে প্রচ্ছন্ন জিনের অনুপাত কমানো যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা যায় না, পরিব্যক্তির ফলে ঐ জিনের পুনরায় আবির্ভাব ঘটে।

সুস্থ ও প্রয়োজনীয় জিনের প্রসারের পথেও অনেক অসুবিধা আছে। গরু, ঘোড়া ও ছাগলের যেমন কৃত্রিম প্রজনন, নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রিত মিলনের দ্বারা উন্নত জাত সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা কি করে সম্ভব হবে? আমাদের লক্ষ্য কি হবে? অর্থাৎ কি ধরণের মানুষ আমরা চাই? উন্নত জাতের মানুষের কি লক্ষণ হবে? সেই লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি কি বংশগত? কে নির্বাচন করবে? তিনি যে পক্ষপাতিত্ব দোষে ভুগবেন না, তার কি নিশ্চয়তা আছে? এই সব প্রশ্ন প্রজনন-বিজ্ঞানীদের সম্মুখে ভিড় করে।

যাহোক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার যে সব কর্মী প্রজনন-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসেছেন, তারা সকলেই এই বিজ্ঞানের জালে আট্‌কে পড়েছেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জেগে ওঠে, প্রজনন-বিজ্ঞানের কি আকর্ষণী শক্তি আছে, যা সকল বিজ্ঞানীকে মুগ্ধ করে? এটা কি শুধু নিছক কৌতূহল, না নিজের উৎপত্তি ও পরিসমাপ্তি জানবার অনুসন্ধিৎসা? অতি প্রাচীন কাল থেকে গ্রীক দার্শনিকেরা প্রচার করতেন, সব জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে, "Know thyself"। আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরাও বলতেন, "আত্মানং বিদ্ধি"। আমার মনে হয়, প্রজনন-বিজ্ঞানের গবেষণায় বিজ্ঞানীরা দিন দিন ঐ লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

রক্ত-প্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন

জীবন্ত প্রাণীর রক্ত-প্রবাহের সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের একটি অভিনব পদ্ধতি সম্প্রতি আমেরিকায় উদ্ভাবিত হয়েছে।

এই পর্যন্ত এই গবেষণা কেবলমাত্র গবেষণাগারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মানবদেহ থেকেও এই ভাবেই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। মানুষের দেহাভ্যন্তরে রোগ চিকিৎসার ও তথ্য সংগ্রহের জন্যে যে সামান্য বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে, তা রক্ত-প্রবাহ থেকে উৎপাদন করা যেতে পারে।

যেমন—রোগের জন্যে যাদের হৃদ্‌যন্ত্র ঠিকমত কাজ করে না, তাদের হৃদ্‌কম্প নিয়মিত করবার জন্যে অর্থাৎ অনিয়মিত কম্পনকে নিয়মিত বা নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে পেস-মেকার নামে একটি ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রটি শল্যচিকিৎসকগণ রোগীর দেহের অভ্যন্তরে শল্যচিকিৎসার সাহায্যে বসিয়ে দেন। এটি বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত হয়। এর ব্যাটারী শেষ হয়ে গেলে আবার শল্যচিকিৎসার সাহায্যে রোগীর দেহে নতুন যন্ত্র বসাতে হয়। বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের যে নতুন প্রক্রিয়াটি উদ্ভাবিত হয়েছে, তাতে বার বার শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হবে না। রোগী যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন ঐ পেস-মেকারে ঐ পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা যাবে।

একদল বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকের গবেষণার ফলে ওয়াশিংটনের নিকটস্থ মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের ডাঃ আর. আডাম কাউলী এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের ডাঃ মোস্তাফা ই. তালাতের নির্দেশে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ায় দেখা গেছে যে, তড়িদ্বার বা ইলেকট্রোড দুটি হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ঠিক ঠিক বসানো হলে ইলেকট্রোড দুটি যে তারের দ্বারা সংযুক্ত থাকে, তার মধ্যে অবিরাম গতিতে বিদ্যুৎ-শক্তি প্রবাহিত হয়। কুকুর এবং খরগোসের উপর সাফল্যের সঙ্গে এই গবেষণা চালানো হয়েছে। তড়িদ্বার ঐ সকল জন্তুর হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করে বিদ্যুৎ-শক্তির পরিমাণ সম্পর্কে পরীক্ষা করা হয়েছে। পেস-মেকার যন্ত্রটি চালু রাখবার জন্যে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হয়, তার দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ বিদ্যুৎ-শক্তি এইভাবে পাওয়া যায়।

জীবজন্তুর দেহ থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা আমেরিকায় বহুবার হয়েছে। জীবাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করে আলো জ্বালানো হয়েছে। তাছাড়া ইঁদুর এবং বৃহৎ জন্তুর দেহ থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে ছোটখাটো যন্ত্রও চালানো হয়েছে।

তবে অতীতের এই সকল গবেষণায় সক্রিয় ইলেকট্রোড ব্যবহৃত হয়েছে। সক্রিয় অর্থে তড়িত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ঐ সকল ইলেকট্রোড ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তার ফলেই বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে।

কিন্তু নতুন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় প্ল্যাটিনাম ইলেকট্রোড। এই সকল ইলেকট্রোড অবিকৃত থাকে বলে অনির্দিষ্ট কাল ধরে এদের ব্যবহার করা যাবে। ইউ. এস. ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব জেনারেল মেডিসিনের অর্থসাহায্যে তিন

বছরের গবেষণার ফলে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের এই অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। মানুষের রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগে কিছুটা বিলম্ব হতে পারে। এর কতকগুলি বিষয়ে কার্যকারিতা সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় হবার পরেই মানুষের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে।

নতুন শিক্ষাযন্ত্র—টাচ টিউটর

একটি বৃটিশ ফার্ম এমন একটি শিক্ষাযন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, যা পিছিয়ে-পড়া শিশুদের শিক্ষা-সমস্যার সমাধানস্বরূপ এবং যার সাহায্যে স্বাভাবিক শিশুদের অনেক কম বয়স থেকেই লেখাপড়া শেখানো যাবে।

টাচ টিউটর নামের এই যন্ত্রটি অনেকটা টেলিভিশন সেটের মত দেখতে। এই যন্ত্রে পিছন দিক থেকে ছবি ফেলা হয়। পর্দাটি দু-ভাগে বিভক্ত। উপরের ভাগে থাকে একটি শব্দের বানান, নীচের ভাগে থাকে তিনটি বস্তুর ছবি। ছাত্রকে উপরের বানান দেখে নীচের ঠিক বস্তুটিকে স্পর্শ করতে হয়। উত্তর ঠিক হলে যন্ত্রটি তা জানিয়ে দেয়। ঠিক না হলে সে অন্য একটি বস্তু স্পর্শ করে। এই ভাবে ছাত্র নিজেই জানতে পারে কোন্‌টি কি বস্তু, তার ঠিক বানান কি। যন্ত্রটির সঙ্গে যুক্ত একটি মিটার থেকে ছাত্রটির অগ্রগতির খবর জানা যায়।

এই যন্ত্রটি ইতিমধ্যেই বৃটেনের দুটি হাসপাতাল স্কুল ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

নির্মাতা ফার্মের অন্যতম ডিরেক্টর এবং নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিষয়ের লেক্‌চারার মিঃ অ্যালান ক্লিয়ারি বলেছেন—যন্ত্রটির সবচেয়ে সুবিধার দিক হলো, এতে ছাত্রদের পক্ষে সাড়া দেওয়া সহজ। এতে শিশুদের কিছুই লিখে জানাতে হয় না—শুধু হাতে ছবি স্পর্শ করলেই চলে।

তিনি বলেন—এই যন্ত্রের সাহায্যে স্বাভাবিক সাড়ে তিন বছরের শিশু বই পড়তে শিখতে পারবে। তবে বর্তমানে এই যন্ত্রের সাহায্যে শুধু পিছিয়ে-পড়া শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং যন্ত্রটি খুবই সফল হয়েছে।

অতি শক্তিশালী কম্পিউটর

বৃটেনের ইন্টারন্যাশন্যাল কম্পিউটরস্‌ লিমিটেড একটি নতুন ১,৫০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের কম্পিউটরের কথা ঘোষণা করেছেন। কম্পিউটরটি বিশ্বের অতি শক্তিশালী কম্পিউটরগুলির অন্যতম বলে জানা যায়।

এটির সরকারী নাম '১৯০৮-এ', ১৯০০ সিরিজের কম্পিউটরগুলির সর্বশেষ সংস্করণ হলো এই কম্পিউটরটি। কতকগুলি মডেল ইউনিট নিয়ে এখন পরীক্ষামূলকভাবে কাজ সুরু হয়েছে। কম্পিউটরটির নির্মাণকার্য এরপর সুরু হবে এবং আশা করা যায়, ১৯৭২ সালের মধ্যে এটির সরবরাহ সুরু হতে পারবে।

শারীরতত্ত্ব ও ভেষজ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

এই বছর (১৯৬৮) শারীরতত্ত্ব ও ভেষজ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে তিনজন বিজ্ঞানীকে যৌথভাবে। তাঁদের একজন হলেন ভারত-সম্ভূত, বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা এবং অপর দুজন হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর রবার্ট হোলি এবং ন্যাশনাল হার্ট ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক ডক্টর মার্শাল নীরেনবার্গ। তাঁদের নোবেল পুরস্কার প্রদানের অভিজ্ঞান পত্রে বলা হয়েছে, জেনেটিক কোড নির্ধারণ এবং প্রোটিন সংশ্লেষণে তার ভূমিকা সম্পর্কিত গবেষণায় বিশিষ্ট অবদানের জন্যে তাঁদের তিনজনকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করলেও একই সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করেছে।

ডাঃ রবার্ট হোলি ডাঃ মার্শাল নীরেনবার্গ ডাঃ হরগোবিন্দ খোরানা

ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা

ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও জন্মসূত্রে তিনি ভারতীয়। সেই হিসাবে বলা যায়, দীর্ঘ ৩৭ বছর আগে ১৯৩০ সালে অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভের পর দ্বিতীয় ভারতীয় বিজ্ঞানী এবার নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। ১৯২২ সালে ভারতের রায়পুরে হরগোবিন্দ খোরানার জন্ম। ১৯৪৩ সালে তিনি অবিভক্ত পাঞ্জাবের লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক এবং ১৯৪৫ সালে

স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি ভারতের পাঞ্জাব অংশে চলে আসেন। ১৯৪৮ সালে ইংল্যাণ্ডের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে ফেডারেল ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজিতে পোষ্ট ডক্টরেট ফেলো হিসাবে গবেষণা করেন। ১৯৫০-৫২ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাফিল্ড ফেলোরূপে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী ডক্টর আলেকজেণ্ডার টড এর অধীনে জৈব রসায়নে গবেষণা করেন। ডক্টর টড তখন জেনেটিক্স সম্পর্কিত গবেষণায় নিরত ছিলেন এবং খোরানাকে সে বিষয়ে আকৃষ্ট করেন। ১৯৫২ সালের পর খোরানা বৃটিশ কমনওয়েলথ রিসার্চ কাউন্সিল-এ জৈব রসায়ন বিভাগের প্রধানরূপে যোগদান করেন এবং ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। ১৯৬০ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইস্‌কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার অধ্যাপক-পদে বৃত হয়ে চলে আসেন এবং বর্তমানে সেই পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। একই সঙ্গে তিনি মিডওয়েষ্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এনজাইম রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সহ-অধিকর্তাও। ১৯৫৯ সালে ক্যানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত থাকা কালে ডক্টর খোরানা সর্বপ্রথম নিউক্লিওটাইড সম্পূর্ণরূপে সংশ্লেষণ করেন। নিউক্লিওটাইডগুলি হচ্ছে বংশগতির উপাদানের অংশবিশেষ, যা শৃঙ্খল-পরম্পরায় ডি. এন. এ. অণু গঠন করে। ডক্টর খোরানার গবেষণার বৈশিষ্ট্য হলো, মানবদেহের অনুরূপ তাপমাত্রাতেই তিনি এই নিউক্লিওটাইড সংশ্লেষণ করেছেন।

ডক্টর খোরানা একজন সুইস মহিলাকে বিবাহ করেছেন এবং তাঁদের দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে আছে। দু-বছর আগে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন।

ডক্টর মার্শাল ডাবলিউ নীরেনবার্গ

মার্শাল নীরেনবার্গ বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের সন্নিকটে ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব হেলথ-এর বায়োকেমিক্যাল জেনেটিক্স গবেষণাগারের অধিকর্তা। তাঁর বর্তমান বয়স ৪১ বছর। ডক্টর নীরেনবার্গের অবদান হচ্ছে, বংশগতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ সম্পর্কিত মূল সমস্যার সমাধান। ১৯৬১ সালে তিনি তাঁর গবেষণার দ্বারা দেখান, অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা, তার শ্রেণী-বিশেষ এবং গঠন-শৈলীর দ্বারা কিভাবে প্রোটিন অণুগুলি নির্ধারিত হয়।

ডক্টর রবার্ট হোলি

রবার্ট ডাবলিউ হোলির বর্তমান বয়স ৪৭ বছর। ১৯৪২ সালে তিনি ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে স্নাতক ডিগ্রী এবং ১৯৪৭ সালে করনেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জৈব-রসায়নে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি নিউইয়র্ক ষ্টেট এগ্রিকালচারাল এক্সপেরিমেন্ট ষ্টেশনে জৈব রসায়নের সহকারী অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণ-রসায়নের অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ডক্টর হোলি যে আজ বিজ্ঞান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, তা হচ্ছে তাঁর দীর্ঘ ১০ বছরব্যাপী নিরলস গবেষণার ফল। 'ট্রান্সফার' আর. এন. এ. সম্পর্কিত গবেষণায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আর. এন. এ.-র গঠন-বৈচিত্র্য তিনি আবিষ্কার ও নির্ধারণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রোটিন সৃষ্টির জন্যে ডি. এন. এ-র কাছ থেকে রাসায়নিক নির্দেশ বহন করে নিয়ে যায় আর. এন. এ।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর—১৯৬৮

২১শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

পশ্চিম জার্মেনীর বন-এর একজন মহিলা গ্র্যাফিক শিল্পীর গিরগিটি ও গোসাপ পোষবার অদ্ভুত সখ।

করে দেখ

৯ সংখ্যার কৌতুক

তোমার বন্ধুদের কাউকে কোন একটি সংখ্যা মনে করতে বল। বন্ধুর মনে-করা সংখ্যাটি না জেনেও কেমন করে বলে দেওয়া যায়, তার একটা কৌশলের কথা বলছি। বন্ধুর মনে-করা সংখ্যাটিকে ৯ দিয়ে গুণ করতে বল। এই গুণফলের সঙ্গে মনে-করা সংখ্যাটিকে যোগ করে যোগফলটা তোমায় জানিয়ে দিতে বল। যোগফলের শেষের রাশিটিকে বাদ দিলেই বন্ধুর মনে করা সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

ধরা যাক—বন্ধুর মনে-করা সংখ্যাটি ৬৫। ৬৫-কে ৯ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে ৫৮৫। ৫৮৫-এর সঙ্গে মনে-করা সংখ্যা ৬৫ যোগ দিলে ফল হবে ৬৫০। এই যোগফলের শেষের রাশিটি অর্থাৎ শূন্য বাদ দিলেই বন্ধুর মনে করা সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

এবার আর একটি বৃহত্তর সংখ্যার কৌতুকপূর্ণ গুণফলের কথা বলছি—

৮ সংখ্যাটি বাদ দিয়ে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলিকে পাশাপাশি লিখে তাকে ৯ অথবা ৯-এর গুণিতক ১৮, ২৭, ৩৬, ৪৫ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে গুণ করে দেখ—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গুণফলে একটি রাশিরই পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব ঘটবে ; যেমন—

১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ = ১১১,১১১,১১১

১২৩৪৫৬৭৯ × ১৮ — ২২২,২২২,২২২

১২৩৪৫৬৭৯ × ২৭ = ৩৩৩,৩৩৩,৩৩৩

১২৩৪৫৬৭৯ × ৩৬ = ৪৪৪,৪৪৪,৪৪৪

১২৩৪৫৬৭৯ × ৪৫ = ৫৫৫,৫৫৫,৫৫৫

—প—

গৌর বা ভারতীয় বাইসন

যে প্রাণীটির কথা বলছি, তাকে দেখতে কতকটা মোষের মত। আলকাতরার মত ঘন কালো গায়ের রং। দেহে লোম নেই বললেই চলে। বেশ মোটাসোটা গড়ন, চওড়া কাঁধ। গলার নীচে গলকম্বল। মাথায় অর্ধচন্দ্রাকার এক জোড়া শিং, কপাল ফ্যাকাশে সাদা। পায়ের নীচের দিকটা ফ্যাকাশে বাদামী রঙের।

একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ গৌরের চেহারা এমনি। ওজন প্রায় পঁচিশ মণ। পূর্ণবয়স্ক গৌর প্রায় সাড়ে নয় ফুট লম্বা ও ছয় ফুট উঁচু হয়। লেজটি সাধারণতঃ জানু পর্যন্ত ঝুলে থাকে। স্ত্রী-গৌর পুরুষদের তুলনায় আয়তনে ছোট, সাধারণতঃ পাঁচ ফুট আন্দাজ উঁচু হয়ে থাকে।
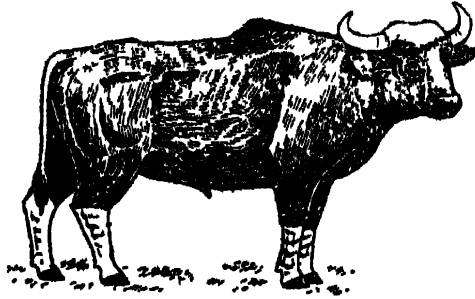
গৌর বা ভারতীয় বাইসন

স্ত্রী ও পুরুষ—উভয় গৌরেরই মাথায় এক জোড়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি শিং থাকে। এক-একটি শিং কুড়ি থেকে চব্বিশ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। শিং মসৃণ, তার ডগাটি সূঁচালো এবং ভিতর ফাঁপা। শিঙের অগ্রভাগ কালো এবং বাকী অংশ ঈষৎ হলুদ রঙের। দেহের তুলনায় গৌরের পা ও ক্ষুরগুলি ছোট। কাঁধ ও পিঠের প্রথমার্ধ বেশ উন্নত।

জন্মাবার অল্প পরেই গৌরের বাচ্চা হাঁটতে পারে এবং ঘণ্টাখানেক পরেই ছুটতে পারে। সদ্যোজাত বাচ্চার রং সাধারণতঃ ফিকে হলুদ, মেরুদণ্ডের উপর কালো রঙের ডোরাকাটা। অল্পদিন বাদেই বাচ্চার গায়ের রং বদ্‌লে হাল্‌কা পিঙ্গলবর্ণ হয়।

গৌর বিরাট আকৃতির শক্তিশালী প্রাণী বটে, তবে বেশ নিরীহ। মানুষ দেখলে ভয় পায়, কিন্তু আক্রান্ত হলে আক্রমণ করতেও ছাড়ে না—শত্রুর দেহ শিং দিয়ে গুঁতিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তাই বাঘ ও সিংহ ওদের চট্‌ করে আক্রমণ করতে সাহস

পায় না। এদের ঘ্রাণ ও শ্রবণ-শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। দূর থেকে মানুষের একটু সাড়া পেলেই পালাতে সুরু করে।

আমাদের দেশে বিন্ধ্যপর্বত থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ ভারতের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গৌরের বাস। মহীশূর, নীলগিরি ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গভীর বনেও এদের দেখা যায়। আর দেখা যায় তরাই অঞ্চলে ও ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলে।

গৌরেরা দলবেঁধে বাস করে এবং দলবেঁধে বিচরণ করে। দলে পাঁচ-ছয়টি পশু এক সঙ্গে থাকে। বয়স্ক পুরুষ-গৌর অনেক সময় দল ছাড়া হয়ে একাকী বিচরণ করে। দলে একজন করে দলপতি থাকে।

খুব ভোরে সূর্য ওঠবার আগে ও সন্ধ্যাবেলায় এরা বনের মধ্যে চরে বেড়ায়। দুপুরে রোদের তেজ বেশী হলে বেশ কয়েক ঘণ্টা গাছের ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম করে নেয়। বন ছেড়ে বাইরের কৃষিক্ষেত্রে এরা সাধারণতঃ আসে না। সমতল ভূমিতেও সচরাচর আসে না—পর্বতময় স্থানই বেশী পছন্দ করে। পাহাড়ে উঠতে এরা বেশ পটু।

গৌরের প্রধান খাদ্য তৃণ ও বাঁশের পাতার কুঁড়ি। অন্যান্য গাছের পাতাও খায়, তবে বাঁশের পাতার কুঁড়িই বেশী পছন্দ করে। জলাশয়ে দলবেঁধেই ওরা জলপান করতে যায়। নোনা জলই ওদের বেশী পছন্দ। দলের পুরুষদের মধ্যে মাঝে মাঝে শক্তির লড়াই হয়, তবে স্ত্রীদের মধ্যে ওটি নেই। স্ত্রী-গৌরের মধ্যে প্রীতির ভাব দেখা যায়।

নানান কারণে আমাদের দেশে গৌরের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তাই এদেশের কতকগুলি বনে গৌর শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অমরনাথ রায়

অনাদৃত খাদ্য

তোমরা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছ, বর্ষার শেষে শীতের প্রারম্ভে গাছের গুঁড়িতে, খড়ের গাদায় বা অনেক সময় মাটিতে ছাতার মত এক রকম জিনিষ জন্মায়। এগুলি হলো ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ—সাধারণতঃ ব্যাঙের ছাতা নামে পরিচিত। আসলে কিন্তু ব্যাঙের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্কই নেই। আবর্জনা বা অপরিচ্ছন্ন স্থানে জন্মায় বলেই বোধ হয় ঐরূপ নাম দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় অনেক রকমের ছত্রাক দেখা যায়। তার মধ্যে কয়েক রকমের ছত্রাক মানুষের খাদ্যের উপযোগী। খাদ্যোপযোগী ছত্রাককে ইংরেজীতে বলা হয় মাস্‌রুম (Mushroom)। বাংলা দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাস্‌রুম বিভিন্ন নামে পরিচিত। পূর্ববঙ্গে এগুলিকে ব্যাঙের ছাতা, ভুঁইফোড়, ওল ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। ২৪ পরগণায়—কোড়ক, মেদিনীপুরে ছাতু ইত্যাদি নাম প্রচলিত। এই অবহেলিত ও অনাদৃত ছত্রাকগুলি যে মানুষের খাদ্যোপযোগী একথা অনেকেরই জানা নেই। প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে এগুলিকে বলা হতো "ভগবানের পুত্র"—কারণ অন্যান্য উদ্ভিদের মত এদের কোন বীজ চোখে দেখা যায় না। বিভিন্ন জাতীয় ছত্রাকের (Fungus) মধ্যে অনেকগুলিই খাদ্যের অনুপযোগী এবং কতকগুলি বিষাক্ত। যে সব ছত্রাকের গুঁড়ি বেশ মোটা, লম্বা এবং শক্ত আঁশযুক্ত, সেগুলি সাধারণতঃ বিষাক্ত নয়। কিন্তু কতকগুলি খুব পিচ্ছিল এবং একটু চাপ দিলেই হাতে নরম কাঁইয়ের মত মনে হয়, সেগুলিই বিষাক্ত। এই সমস্ত পিচ্ছিল বিষাক্ত ছত্রাক মাটিতেই বেশী জন্মায়। তবে এটাও সব সময় সত্য নয়। কতকগুলি নিয়মমাফিক পরীক্ষা করে বোঝা যায়, কোন্‌গুলি বিষাক্ত আর কোন্‌গুলি বিষাক্ত নয়।

খাদ্যের উপযুক্ত ছত্রাকের একটা বিশিষ্ট রকমের গন্ধ আছে। আমেরিকা ও ইউরোপ এবং জাপান প্রভৃতি দেশে এই ছত্রাকের প্রচলন খুব বেশী। ফরাসীরা এই জিনিষটাকে এত বেশী পছন্দ করে যে, এর নামই দিয়েছে তারা Champignons —অর্থাৎ ভাল খাদ্য। প্রথম শ্রেণীর খাবার তালিকার মধ্যে এদের স্থান। একটা পরিসংখ্যান দেখলেই বেশ বোঝা যাবে যে, এগুলির চাহিদা আমেরিকায় কি হারে বেড়ে যাচ্ছে। তাইওয়ান ১৯৬০ সালে আমেরিকায় অতি সামান্য পরিমাণে এই জাতীয় ছত্রাক পাঠিয়েছিল এবং সেটা ১৯৬৪ সালে এসে দাঁড়ায় ১৪ মিলিয়ন পাউণ্ডে। মাস্‌রুম রপ্তানীর ব্যাপারে তাইওয়ান সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী। কৃষকেরা, যারা গ্রীষ্মে ও বসন্তে ধান উৎপাদন করে, তারাই বাঁশের ছোট ছোট গুঁড়ির উপর বা পচা ধানের উপর শীতকালে (ডিসেম্বর-মার্চ) এই মাস্‌রুমের চাষ করে। আমেরিকার বহু জায়গায় এসব ছত্রাকের চাষ হয়ে থাকে। সেখানে এর উৎপাদনের হার ১৯৪০

সালে ৪৪ মিলিয়ন পাউণ্ড থেকে ১৯৬৪ সালে ১৭০ মিলিয়ন পাউণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জাতীয় মাস্‌রুমের বৈজ্ঞানিক নাম হলো Agaricus campestris বা Agaricus biporus। সাধারণতঃ এই ছত্রাক বদ্ধপাত্রে নুন-জলের দ্রবণে সিক্ত অবস্থায় বিদেশের বাজারে রপ্তানী করা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এই ছত্রাককে বাতাসে বা যান্ত্রিক উপায়ে শুষ্ক করে বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে ছোট ছোট সেলোফেন কাগজের প্যাকেটে করেও বাজারে বিক্রয় করা হয়। এক-একটি প্যাকেটে ¼ আউন্স বা ½ আউন্স পরিমাণ ছত্রাক থাকে এবং প্রতি প্যাকেট আউন্স প্রতি ১ ডলার হিসাবে বিক্রীত হয়ে থাকে। এরূপ বিভিন্ন মাস্‌রুম মিশ্রণের নাম মাস্‌রুম ওমলেট, মাস্‌রুম গ্রেভি মিক্স, মাস্‌রুম সুপ মিক্স ইত্যাদি।

সংগ্রহকারীরা প্রথমে মাস্‌রুমকে পরিষ্কার করে ½ ইঞ্চি পরিমাপে কেটে ছোট ছোট তারের জালের ট্রে-এর উপর ছড়িয়ে দেয়। ঐ ট্রে-কে দিনের বেলায় রৌদ্রে ও রাত্রিবেলায় কাঠের অঙ্গারের আগুনে রেখে জলীয় ভাগ বিতাড়ন করা হয়। ২।৩ দিন পরে এগুলিকে কাপড়ের থলিতে ভর্তি করে ঘরের সিলিংয়ে টাঙ্গিয়ে রেখে দেওয়া হয়। ২।৩ সপ্তাহের মধ্যেই জলীয় ভাগের পরিমাণ প্রায় শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত নেমে আসে। তখন একে বদ্ধ কাচের পাত্রে সংরক্ষিত করে রাখা হয়। ১২ থেকে ১৫ পাউণ্ড টাট্‌কা মাস্‌রুম থেকে প্রায় ১ পাউণ্ড পরিমাণ শুষ্ক মাস্‌রুম পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় আবার ছত্রাকগুলিকে সুতা দিয়ে গেঁথে নেকলেসের মত করে রৌদ্রে অথবা আধা রৌদ্রে টাঙ্গিয়ে রেখে দেয়। নিউইয়র্ক সিটির পূর্বদিকের শহরতলীর প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর জানালায় এই মাস্‌রুম নেকলেস টাঙ্গানো অবস্থায় দেখা যায়। জাপানে এক জাতীয় মাস্‌রুম পাওয়া যায়, যেটা শীটেক (Shiitake) নামে পরিচিত এবং যার বৈজ্ঞানিক নাম হলো Lentinus edodes। আমেরিকায় যে কোন চৈনিক রেস্তোরাঁর খাবার তালিকায় এর স্থান প্রথম দিকে। প্রায় ৮ মিলিয়ন পাউণ্ড শুষ্ক শীটেক প্রতি বছর জাপানে উৎপাদন করা হয়। এই শীটেকে ফাইভ প্রাইম রাইবোনিউক্লিয়োটাইড প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং এটা থাকবার ফলে এর গন্ধও খুব ভাল হয়। এই জাতীয় ছত্রাক উৎপাদন পৃথিবীর অনেক দেশেই অন্যান্য শস্য উৎপাদনের মত অপরিহার্য হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। চেকোস্লোভাকিয়া, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশও এই জাতীয় ছত্রাক উৎপাদনে বিশেষ আগ্রহী।

এখন দেখা যাক, এই মাস্‌রুমের খাদ্যমূল্য (প্রোটিন, ভিটামিন প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে) কি? শুষ্ক মাস্‌রুমে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ প্রোটিন থাকে। কিন্তু টাট্‌কা আহৃত মাস্‌রুমে জলীয় ভাগ বেশী থাকায় এর প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ, অর্থাৎ শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রোটিনের পরিমাণ অন্যান্য

সাধারণ টাট্কা শাকসব্জির প্রায় সমান। এতে প্রায় সব 'বি' ভিটামিন এবং প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড বর্তমান, যদিও ট্রিপ্টোফেনের পরিমাণ খুব কম। মাস্রুমের রাসায়নিক গঠন (শুষ্ক ওজনের ভিত্তিতে) নিম্নোক্ত রূপ—

প্রোটিন—৩৫'৫%, চর্বি—৩'৩%, শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় পদার্থ—৪৮'৮%, আঁশ—৬'৯২%, ছাই—৪'৫৯%, ক্যালসিয়াম—০'১২%, ফস্ফরাস—১'২৮%, লৌহ—সামান্য।

মাস্রুম, ঈষ্ট ও গমে কি পরিমাণ 'বি' ভিটামিন বর্তমান, তুলনামূলকভাবে বিচার করবার জন্যে নিম্নোক্ত তালিকাটি তুলে ধরা যেতে পারে (মিলিগ্র্যাম প্রতি ১০০ গ্র্যাম শুষ্ক ওজনের ভিত্তিতে)।

ভিটামিন	মাস্রুম্	ঈষ্ট	গম
থিয়ামিন (বি-১)	১'২	০'৭-৪'২	০'৫৮
রাইবোফ্ল্যাভিন (বি-২)	৫'২	২'৪-৪'৭	০'১৬
নিয়াসিন	৫৮'০	৩৭'০-৬৯'০	৪'৮
পেন্টোথেনিক অ্যাসিড	২৩'০	১০'০-১৮'০	—

উপরিউক্ত তালিকা থেকে এটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, খাদ্যমূল্যের ভিত্তিতে মাস্রুমের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করেই বিদেশে এর অধিক উৎপাদনের জন্যে ছোট ছোট শিল্প-কারখানার সৃষ্টি হয়েছে; অর্থাৎ মাঠের ফসলকে পরীক্ষাগারে উৎপাদন করবার দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। ফল ও শাক্সব্জির অপ্রয়োজনীয় অংশকে খাদ্য হিসাবে দিয়ে এই জাতীয় ছত্রাকের বংশবৃদ্ধি করবার অর্থ হচ্ছে, একটি সুষম খাদ্যের সৃষ্টি করা। সুতরাং এখন যদি বলা যায় যে, এই জাতীয় ছত্রাকের খাদ্য হিসাবে বহুল প্রচলন আমাদের দেশেও করা উচিত, তবে এখন হয়তো অনেকেরই তাতে আপত্তি হবে না। খাদ্যোপযোগী মাস্রুমকে যদি মুখরোচক করে পরিবেশন করা হয়, তবে মাংসের ঝোলের সঙ্গে এর তফাৎ করাও বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলে মনে হবে।

সতীন্দ্রকিশোর গোস্বামী

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উৎস সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

দীপ্তি গঙ্গোপাধ্যায়, আসানসোল।

দীপক চাটার্জী, শ্রীরামপুর।

প্রঃ ২। জৈব আলো কি?

মণিকা দত্ত, আদিত্য মস্তিদার, কালনা।

শ্যামলী চক্রবর্তী, কলিকাতা-২৯।

উঃ ১। আপেল ফল গাছ থেকে কেন নীচের দিকে পড়ে? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে নিউটন আবিষ্কার করেন—প্রত্যেকটি পদার্থই কেবলমাত্র পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয় না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পদার্থই একে অপরকে আকর্ষণ করছে। পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকের আকর্ষণকে বলা হয় অভিকর্ষ (Gravity) আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পদার্থের পারস্পরিক আকর্ষণকে বলা হয় মহাকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) মহাকর্ষ কেবলমাত্র অভিকর্ষ শব্দটার চেয়ে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করা হয়।

নিউটন মহাকর্ষ আবিষ্কার করেছিলেন বটে, কিন্তু পদার্থের পারস্পরিক আকর্ষণের রহস্য সম্বন্ধে তিনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন নি। কেন না, মহাকর্ষ কি ভাবে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন, তা অনেকাংশেই কল্পনাপ্রসূত। পরবর্তী কালে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাহায্যে মহাকর্ষের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো। কিন্তু মহাকর্ষের কারণ সম্বন্ধে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে নি। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী—যে পদার্থের বেগ ক্রমশঃ বেড়েই চলে, সেই পদার্থ থেকে এক রকম অদৃশ্য তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, যাকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ (Gravitational wave) বলা হয়। পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্যান্য তরঙ্গ থেকে এই তরঙ্গ একেবারে আলাদা রকমের। এই তরঙ্গের শক্তি থাকে, কিন্তু শক্তির পরিমাণ খুবই কম। তবুও কোন পদার্থ থেকে এই জাতীয় তরঙ্গ প্রবাহিত হলে সেই পদার্থের ভর কমে যায়।

বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মত মহাকর্ষেরও ক্ষেত্র আছে। আইনষ্টাইন মনে করেন যে, এই দুই ক্ষেত্র পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দ্বারা তা বোঝা যায় না।

আজকাল কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন—আলোর মধ্যে যেমন কণিকার কল্পনা করা হয়, তেমনি মহাকর্ষের ক্ষেত্রেও গ্র্যাভিটন নামক কণিকার কল্পনা করা যেতে

পারে। বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়ার সময় যেমন ফোটন কণিকা শোষিত বা বিকিরিত হয়, তেমনি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়ায় গ্র্যাভিটন কণিকাও একই রকম সম্পর্কযুক্ত। বস্তু থেকে কি পরিমাণ শক্তি বিকিরিত বা শোষিত হয়, তার উপর তাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার শক্তি নির্ভর করে; যেমন—একটা ফোটন বিকিরিত হতে প্রায় $১০^{-১২}$ সেকেণ্ড সময় লাগে, আবার নিউট্রনের বিটা ক্ষয় হতে সময় লাগে প্রায় ১২ মিনিট অর্থাৎ আগের তুলনায় প্রায় $১৪^{+১৪}$ গুণ বেশী। দেখা গেছে যে, একটা কেন্দ্রীন থেকে একটা গ্র্যাভিটন কণিকা বেরোতে প্রায় $১০^{৬০}$ সেকেণ্ড বা ১০৫৩ বছর সময় লাগে। কাজেই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া কত আস্তে হয়, তা আন্দাজ করা যেতে পারে। গ্র্যাভিটন মতবাদ অনুযায়ী গ্র্যাভিটনই পদার্থের ভারের জন্যে দায়ী; অর্থাৎ যে বস্তুর গ্র্যাভিটন আছে, তার উপরেই মহাকর্ষ বা অভিকর্ষের প্রভাব থাকে। গ্র্যাভিটনযুক্ত পদার্থ থেকেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। আধুনিক এক সোভিয়েট বিজ্ঞানীর মতে, দুটি গ্র্যাভিটন পরস্পর পরস্পরকে ধাক্কা দিলে একটা ইলেকট্রন ও একটা পজিট্রন জন্মাতে পারে। আবার ইলেকট্রন ও পজিট্রন দুটি নিজেদের মধ্যে ক্রিয়া করে আরো কিছু গ্র্যাভিটনের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু এটি ঘটাতে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি লাগবে, তা পৃথিবীতে বসে এখনও করা সম্ভব হয় নি।

এই গ্র্যাভিটন মতবাদ এখনও বিতর্কাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কাজে কাজেই মহাকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণের উৎস এখনও রহস্যাবৃতই আছে।

উঃ ২। জোনাকীর আলো আমাদের সকলেরই পরিচিত। অন্ধকার দূর করবার জন্যে আমরা বৈদ্যুতিক আলো মোমের আলো, মাটির প্রদীপের আলো প্রভৃতি ব্যবহার করি। কিন্তু এই সমস্ত আলোর উৎস জড় পদার্থ। কিন্তু আরও এক ধরণের আলো আছে, যা জীবদেহ থেকে নির্গত হয়। জীবদেহ থেকে যে আলো নির্গত হয়, তাকে আমরা জৈব আলো বলি। এই জৈব আলো আবার দু-রকমের—উদ্ভিদ-দেহ থেকে নির্গত আলো আর প্রাণী-দেহ থেকে নির্গত আলো। জড় পদার্থ থেকে নির্গত আলো একই সঙ্গে তাপ ও আলো বিকিরণ করে, কিন্তু জৈব আলোর শুধুমাত্র আলো আছে, তাপ নেই। এই জৈব আলো সবুজ ও নীলাভ সবুজ বা ঈষৎ রক্তিমাভ রঙের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কয়েক জাতীয় জীবাণু ও কীট-পতঙ্গ এবং কতকগুলি বিভিন্ন জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীই এই জৈব আলোর উৎস। লুসিফেরেজ নামক এনজাইম, লুসিফেরিন নামক আলোক-উৎপাদনকারী পদার্থে জারণ ক্রিয়া ঘটাবার ফলেই জৈব আলোর উৎপত্তি হয়।

এই পদ্ধতিতে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়, তাকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়:—$LH_2 + E + \frac{1}{2}O = L + E + H_2O +$ আলো। L → জারিত লুসিফেরিন, E → লুসিফেরেজ, LH_2 → লুসিফেরিন। কোন কোন জীবদেহে এই আলোককে

ক্ষণস্থায়ী আবার কোন কোন জীবদেহে এই আলোককে স্থায়ীভাবে জ্বলতে দেখা যায়। রাসায়নিক বিক্রিয়াটি জীবদেহের কোষের বাইরে বা ভিতরে হয়ে থাকে।

দেখা গেছে, চিংড়ি জাতীয় (Cypridinea) সামুদ্রিক প্রাণীর দেহ থেকে ভিজা অবস্থায় আলো নির্গত হয়। জল থেকে তুলে রেখে প্রায় ২০ বছর পরে আবার জলে ডুবিয়ে দিয়ে ঐ মৃত প্রাণীর দেহ থেকে আলো নির্গত হতে দেখা গেছে।

আদি প্রাণীর অন্তর্গত ফ্লাজেলেটা বিভাগে কতকগুলি সামুদ্রিক প্রাণী আছে, যাদের দেহের প্রোটোপ্লাজমের অনুপ্রভা বা Phosphorescence-এর জন্যেই জীবদেহে আলোর বিকাশ ঘটে; অর্থাৎ অনুপ্রভ পদার্থগুলি উত্তেজিত হয়ে আলো বিকিরণ করে। কতকগুলি সামুদ্রিক মাছ আছে, যারা জলের গভীরতম স্থানে বাস করে, যেখানে সূর্যের আলো মোটেই পৌঁছুতে পারে না। এই ভীষণ অন্ধকার জায়গায় এদের দেহ থেকে নির্গত আলোই এদের পথ দেখায়। ইন্দোনেশিয়ার সামুদ্রিক অঞ্চলে একরকম মাছ দেখা যায়, যারা শরীরাভ্যন্তরে আলো-বিকিরণকারী ব্যাক্টিরিয়া পোষণ করে। ব্যাক্টিরিয়াগুলি মাছের শরীর থেকে খাদ্য গ্রহণ করে ও তার পরিবর্তে আলো বিকিরণ করে মাছকে খাদ্য সংগ্রহ এবং পথ প্রদর্শনের কাজে সাহায্য করে। উদ্ভিদ-জগতেও কিছু ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ থেকে আলো নির্গত হয়ে থাকে।

শ্রীশ্যামসুন্দর দে

বিবিধ

আন্তর্জাতিক ক্রোমোসোম সম্মেলন

বিগত ১১ই হইতে ১৩ই অগাষ্ট (১৯৬৮) রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারে (গোল পার্ক) তিন দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক ক্রোমোসোম সম্মেলন (International seminer on chromosome—its structure and function) অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন। অতিথিদের স্বাগত জানান ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্তী। বিভিন্ন অধিবেশনের সভাপতি ও বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন ডাঃ অরুণ কুমার শর্মা।

আহ্বায়ক অরুণকুমার শর্মা এই সম্মেলনের আয়োজন করিয়া জীবন-বিজ্ঞানের তরুণ গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রবীণ বিজ্ঞানীদের মিলন ক্ষেত্রের সূচনা করেন। জীবকোষের ক্রোমোসোম সম্পর্কিত তথ্যাদি নতুন না হইলেও আমাদের দেশে এরূপ একটি ক্রোমোসোম সম্মেলনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ বিষয়টি যেমন আকর্ষণীয়, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষতঃ ক্রোমোসোমের ভূমিকার নূতন মূল্যায়ন হওয়া দরকার এবং তাহা উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ প্রভৃতি প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য।

তিন দিন ব্যাপী এই সম্মেলনের মোট নয়টি অধিবেশনে কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশটি প্রবন্ধ পঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক ক্রোমোসোম সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দিতেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন

বেলজিয়াম, আমেরিকা, ইটালী, জার্মেনী, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, প্যারিস, উইস্‌কনসিন, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা এই সম্মেলনে ক্রোমোসোম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। নয়টি অধিবেশন ছাড়া তিনটি আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান হয়। সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে প্রোফেঃ পি. এন. ভাদুড়ী (বর্ধমান), প্রোফেঃ এস. পি. রায়চৌধুরী (বারাণসী) ও প্রোফেঃ কে. প্যাটউলি (উইস্‌কনসিন)

উদ্যোক্তারা সন্ধ্যায় প্রমোদ-ভ্রমণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। ১৩ই অগাষ্ট নৃত্যানুষ্ঠান এবং সর্বশেষে নৈশ ভোজের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

মহাকাশ অভিযানে অ্যাপোলো-৭

আমেরিকার 'অ্যাপেলো-৭' মহাকাশযান ১১ই অক্টোবর মহাকাশের দিকে যায়। একটি স্যাটার্ন-১বি রকেট মহাকাশযানটিকে এগারো দিনের পরিক্রমার জন্যে পৃথিবীর কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করে। অ্যাপেলো-৭ চন্দ্র-অভিযানের পূর্ব-প্রস্তুতির পথে সাফল্যজনক পরিক্রমা করেছে। অ্যাপোলো-৭-এর আরোহী ছিলেন ওয়ালটার শিরা, ডন আইসলে এবং ওয়ালটার কানিংহাম।

চাঁদে মানুষের পদার্পণের পূর্ব মহড়া হিসাবেই এটাকে গ্রহণ করা হচ্ছে। মহাকাশযান আবার পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরে এসেছে।

মহাকাশ অভিযানে জণ্ড-৫

রুশ মহাকাশযান জণ্ড-৫ চাঁদের আকাশ-পথে বেড়িয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে এবং নির্বিঘ্নে ভারত মহাসাগরের নির্দিষ্ট স্থানে নেমে পড়েছে।

মহাকাশযানকে অক্ষত অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনায় এই সাফল্যের ফলে মানুষের চন্দ্রাভিযানের প্রয়াসে রাশিয়া অনেকটা এগিয়ে গেল।

আবহ রকেটের ব্যাপারে ভারত স্বয়ম্ভর হবে

নয়া দিল্লী থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—আবহ রকেটের ক্ষেত্রে ভারত দ্রুত স্বয়ম্ভরতার দিকে এগিয়ে চলেছে। থুম্বাতে সম্প্রতি 'মেনকা' রকেট নিয়ে পরীক্ষা চলছে। শীঘ্রই বিদেশী রকেটের বদলে মেনকা ব্যবহৃত হবে। এই রকেটগুলি ভারতীয় বিজ্ঞানী ও কারিগরদের দ্বারা এবং দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত। পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত উর্ধ্বের আবহ-বার্তা এই রকেটগুলির সাহায্যে জানা যাবে। যে কোন জায়গা থেকে দু-তিনজন কর্মী এই রকেট উৎক্ষেপণ করতে পারবেন।

১৯৬৮ সালে পদার্থ ও রসায়ন-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

১৯৬৮ সালে রসায়নশাস্ত্রের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লারস অনসেজারকে এবং পদার্থ-বিজ্ঞানে দেওয়া হয়েছে ক্যালি-ফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুই আলভেরেজকে। মৌলিক কণা সম্পর্কে যুগান্তকারী গবেষণার জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

অধ্যাপক অনসেজার নরওয়েজিয়ান বংশোদ্ভূত —বয়স ৬৫ বছর। নরওয়েজিয়ান টেক্‌নিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক অনসেজার ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই বছরেই ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। 'Irreversible Thermodynamics' সম্পর্কে

গবেষণার জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

পরলোকে অধ্যাপিকা লিজে মাইটনার

কেম্ব্রিজ থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরমাণু-বিজ্ঞানী অধ্যাপিকা লিজে মাইটনার (৮৯) ২৭শে অক্টোবর পরলোক গমন করেছেন।

মাইটনারের জন্ম অষ্ট্রিয়ায় এবং তিনি জাতিতে ইহুদি। যে সব বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের ফলে পারমাণবিক বোমার উদ্ভাবন ত্বরান্বিত হয়েছিল, তিনি তাঁদেরই একজন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

বিংশ-বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন ১৯৬৮

বিজ্ঞান কলেজ,
শারীরবৃত্ত বিভাগের বক্তৃতা-কক্ষ

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮
শুক্রবার, অপরাহ্ণ ৫-৩০টা

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই বিংশতি বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট ৩৪ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্র-নাথ বসু এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে সভার কার্যাদি পরিচালনা করেন। অধিবেশনের নিয়মিত কাজ আরম্ভ করিয়া সভাপতি মহাশয় আলোচ্য বৎসরে পরিষদের কাজকর্ম সম্পর্কে বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিবার জন্ম কর্মসচিব মহাশয়কে আহ্বান জানান।

১। কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী:

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীজয়ন্ত বসু মহাশয় সভায় উপস্থিত সভ্যগণকে স্বাগত জানাইয়া গত ১৯৬৭-'৬৮ সালের জন্ম পরিষদের কাজকর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে তাঁহার লিখিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তিনি বলেন যে, গত মে '৬৮ মাসে পরিষদের বিংশতি বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানের সভায় পঠিত ও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত বার্ষিক বিবরণীতে আলোচ্য বৎসরে পরিষদের বিভিন্ন বিষয় ও বিবরণাদি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছিল এবং তাহাকেই মোটা-মুটিভাবে ১৯৬৭-৬৮ সালের বার্ষিক বিবরণী হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। সেই জন্ম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের এই সভায় তিনি পরিষদের কাজকর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দান করেন।

এই বিবরণী প্রসঙ্গে কর্মসচিব মহাশয় পরিষদের আদর্শানুযায়ী মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের

প্রচার ও প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা, জনপ্রিয় পুস্তক ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ, বক্তৃতা দান, আলোচনা সভার আয়োজন, পাঠাগার পরিচালনা প্রভৃতি পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার উল্লেখ করেন। অতঃপর পরিষদের নবনির্মিত গৃহে পরিষদের কার্যালয় ও কর্মকেন্দ্র স্থানান্তর অচিরেই সম্ভব হইবে এবং আগামী জানুয়ারী মাসে আনুষ্ঠানিক-ভাবে গৃহ প্রবেশের আয়োজন করা যাইতে পারে বলিয়া তিনি অভিমত জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে পরিষদের অধিকতর কর্মপ্রসার ও অগ্রগতির জন্য সভ্যগণের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতা তিনি একান্তভাবে কামনা করেন।

২। হিসাববিবরণী ও ব্যয়বরাদ্দ

পরিষদের গত বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নির্বাচিত হিসাব-পরীক্ষক (অডিটর) প্রতিষ্ঠান মেসার্স মুখার্জী গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক পরিষদের গত ১৯৬৭-৬৮ সালের পরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও বার্ষিক উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স সিট) সভার অনুমোদনের জন্য কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুশীলরঞ্জন মৈত্র মহাশয় উপস্থাপিত করেন। পরিষদের নিয়মতান্ত্রিক বিধান অনুসারে সভ্যগণের জ্ঞাতার্থে ও বিবেচনার জন্যে বিভিন্ন তহবিলের উক্ত পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র মুদ্রিতাকারে ইতিপূর্বেই তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। যাহা হউক, আলোচনা ও বিবেচনার পরে হিসাব বিবরণীগুলি উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতি-ক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

অতঃপর পরিষদের বিদায়ী কার্যকরী সমিতি কর্তৃক রচিত ও অনুমোদিত ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের ব্যয়-বরাদ্দ বা বাজেট-পত্র কোষাধ্যক্ষ মহাশয় সভ্যগণের অনু-মোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণীর সঙ্গে এই ব্যয়বরাদ্দ পত্রও সভ্যগণের বিবেচনার জন্য মুদ্রিতাকারে পূর্বেই তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। যথোচিত আলোচনার পরে উক্ত ব্যয়বরাদ্দ পত্রগুলিও উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনু-মোদিত ও গৃহীত হয়।

৩। কর্মাধ্যক্ষ-মণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠন

বর্তমান ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য পরিষদের নূতন কর্মাধ্যক্ষ-মণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যপদে মনোনয়নের জন্য সভ্যগণের নিকট যে মনোনয়নপত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার মাধ্যমে প্রেরিত সভ্যগণের মনোনীত নামগুলি ও বিদায়ী কার্যকরী সমিতির এতদ্বিষয়ক সুপারিশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত নূতন কার্যকরী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ-মণ্ডলী ও সাধারণ সভ্যগণের নামের চূড়ান্ত তালিকা কর্মসচিব মহাশয় সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন। এই তালিকা মুদ্রিতা-কারে অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি-পত্রের সঙ্গে ইতিপূর্বেই সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় উপস্থিত সভ্যগণ উক্ত তালিকা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন এবং ১৯৬৮-'৬৯ সালের জন্য পরিষদের কার্যকরী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ-মণ্ডলীর বিভিন্ন পদে ও সাধারণ সদস্যরূপে উক্ত তালিকা

অনুযায়ী সদস্যগণের নিম্নলিখিত নাম সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইল বলিয়া সভায় ঘোষিত হয়:

কার্যকরী সমিতি

কর্মাধ্যক্ষ-মণ্ডলী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু—সভাপতি
শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়—সহঃ সভাপতি
„ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ „ „
„ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল „ „
„ বলাইচাঁদ কুণ্ডু „ „
„ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী „ „
„ সতীশরঞ্জন খাস্তগীর „ „
„ সুশীলরঞ্জন মৈত্র „ „
শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ কোষাধ্যক্ষ
শ্রীজয়ন্ত বসু কর্মসচিব
শ্রীপঙ্কজনারায়ণ রায়—সহযোগী কর্মসচিব
শ্রীশুভেন্দু কুমার দত্ত „ „

সাধারণ সদস্য

১। শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
২। „ দিলীপকুমার ঘোষ
৩। „ সূর্যেন্দুবিকাশ কর
৪। „ মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
৫। „ দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী
৬। „ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। „ অনাদিনাথ দাঁ
৮। „ আশুতোষ গুহঠাকুরতা
৯। „ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
১০। „ দিলীপকুমার বসু
১১। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
১২। „ ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত
১৩। „ রমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
১৪। „ শঙ্কর চক্রবর্তী
১৫। „ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র

৪। সারস্বত সঙ্ঘের সঙ্ঘ-সচিব নির্বাচন

পরিষদের সারস্বত সঙ্ঘের বিদায়ী সঙ্ঘ-সচিব শ্রীপঙ্কজনারায়ণ রায় মহাশয়ের গত ১৯৬৭-৬৮ সালের কাজকর্ম সম্পর্কে সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। অতঃপর কর্মসচিব মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে বর্তমান ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্ঘ-সচিব পদে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। এই নবনির্বাচিত সঙ্ঘ-সচিব যথাসময়ে নিয়মতন্ত্রের বিধান অনুসারে নূতন সারস্বত সঙ্ঘ গঠন করিবেন এবং সারস্বত কর্তব্যাদি সম্পাদনের ব্যবস্থা করিবেন।

৫। হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন

পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবার জন্য ১৯৬৮-৬৯ সালের হিসাব-পরীক্ষক (অডিটর) নির্বাচন বিষয়ে যথোচিত আলোচনার পরে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এইরূপ স্থির হয় যে, পরিষদের পূর্বতন হিসাব-পরীক্ষক প্রতিষ্ঠান মেসার্স মুখার্জী গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং গত কয়েক বৎসর যাবৎ যথোচিত দক্ষতার সহিত পরিষদের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়াছেন। অতএব উক্ত চার্টার্ড অডিটার প্রতিষ্ঠানেরই বর্তমান বর্ষের জন্যও পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক পদে নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে অতঃপর উক্ত মেসার্স মুখার্জী গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং বর্তমান ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্ত পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক পদে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

৬। অনুমোদক মণ্ডলী নির্বাচন

পরিষদের নিয়মতন্ত্রের বিধান অনুসারে এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্ত নিম্নলিখিত সদস্তগণ অনুমোদক হিসাবে উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন:

১। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
২। শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
৩। শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ
৪। শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
৫। শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিয়মানুসারে অধিবেশনের সভাপতি ও পরিষদের কর্মসচিবসহ উপরিউক্ত নির্বাচিত পাঁচজন অনুমোদকের দ্বারা এই অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইলে তাহা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। সভাপতির ভাষণ

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের এই সভায় পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মাতৃভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। বর্তমান বিজ্ঞান-প্রগতির যুগে দেশের জনগণকে বিজ্ঞানের মূল তথ্যাদির সঙ্গে পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করিয়া সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণ শেষ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি,
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জয়ন্ত বসু
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অনুমোদক-মণ্ডলীর স্বাক্ষর

স্বাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য   স্বাঃ শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ
স্বাঃ শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়   স্বাঃ শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
স্বাঃ শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। শ্রীতারকমোহন দাস
(কৃষি বিভাগ)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ
৩৫, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৯

২। দীপক বসু
Radio Astronomy Section
Radio Electrical Engineering
Division, National Research
Council
OTTAWA-7
Canada

৩। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী
৬৪।বি, প্রতাপাদিত্য রোড
কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
১।৬৮, আজাদগড়
কলিকাতা-৪০

৫। অরুণকুমার রায় চৌধুরী
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

৬। শ্রীঅমরনাথ রায়
NB/T-99 Unit-A.
New Traffic Settlement
P. O, Kharagpur
Midnapur

৭। শ্রীসতীন্দ্রকিশোর গোস্বামী
ফুড টেকনোলজি এবং বায়োকেমিক্যাল
ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৩২

৮। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ ;
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

একবিংশ বর্ষ ডিসেম্বর, ১৯৬৮ দ্বাদশ সংখ্যা

বংশ-প্রবাহক সঙ্কেতের রহস্য উদ্‌ঘাটনে এবারের নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী তিনজন

জগৎজীবন ঘোষ ও দেবব্রত নাগ

আধুনিক জীববিদ্যার যে সব নজির দেখা যায়, তার মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিডের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এবং নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিনের পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনার উপর আলোকপাত করে এই বছর (১৯৬৮) শারীরতত্ত্ব ও ভেষজ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা এবং আরও দু-জন, যাঁরা হলেন ডক্টর মারশাল নিরেনবার্গ এবং ডক্টর রবার্ট ডাবলিউ হোলি। "ইণ্টারপ্রিটেশন অব দি জেনেটিক কোড অ্যাণ্ড ইট্‌স্ ফাংশন ইন প্রোটিন সিন্থেসিস" অর্থাৎ বংশ-প্রবাহক সঙ্কেত (Genetic code) সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা এবং প্রোটিন সংশ্লেষণে তার বিশেষ ভূমিকার (Function) উপর কাজ করে এই তিন জন নোবেল পুরস্কার পেলেন।

আজ থেকে প্রায় এক-শ' বছর আগে, মেণ্ডেলের সময় থেকে সুরু করে, অর্থাৎ ১৮৬৫-১৯৪০ পর্যন্ত একথাই বলা হচ্ছিল যে, জিন, (Gene) হলো জীবের বংশানুক্রমের মূলাধার। জিনের রাসায়নিক পরিচয় কিন্তু সে সময় দেখানো সম্ভবপর হয় নি। ১৯৪০-'৪৪ সালটি হলো বিজ্ঞানের ইতিহাসে খুবই উল্লেখযোগ্য। কারণ এই সময়ে অ্যাভেরি, ম্যাক্লিওড, ম্যাক্কার্টি

প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা সর্বপ্রথম দেখাতে সক্ষম হলেন যে, ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে DNA—এই হলো জিনের রাসায়নিক পরিচয়।

কতকগুলি নিউক্লিয়োটাইড (নিউক্লিয়োটাইডে থাকে ফস্ফরিক অ্যাসিড, রিবোস (Ribose), অ্যাডেনিন (Adenine=A), গুয়েনিন (Guanine=G), সাইটোসিন (Cytosine=C), থাইমিন (Thymine=T), ইউরাসিল (Uracil =U) ইত্যাদির পর্যায়ক্রমের ফলে তৈরি হয় DNA বা ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড এবং RNA বা রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড। আণবিক প্রাণিতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, এই DNA-তেই আমাদের জীবনের সমস্ত বর্ণমালা লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং তাই একে বলা হয় বংশ-প্রবাহক সঙ্কেত (Genetic code)। বিভিন্ন জীবজন্তু, গাছপালার বংশগত ধর্ম DNA এবং RNA-এর উপর নির্ভর করে। DNA থাকে প্রধানতঃ কোষের কেন্দ্রস্থলে (Nucleus) এবং RNA থাকে কিছু কোষের কেন্দ্রস্থলে এবং অধিকাংশ থাকে কোষের সাইটোপ্লাজম অংশটিতে। এই DNA বা বংশ-প্রবাহক সঙ্কেত নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে, জৈব অনুঘটকগুলি (Enzymes) তৈরি হয় এবং আবার একটি নতুন কোষ জন্মলাভ করে। একটি কোষ হলো প্রাণের ক্ষুদ্রতম সত্তা। জীবমাত্রেই কতকগুলি কোষের সমন্বয়ে গঠিত এবং জীবের বৃদ্ধি এই কোষ বিভাজনের ফলে। এই কোষ বিভাজনের মূলে আছে DNA।

এই ঘটনা-প্রবাহের জটিলতা উদ্ঘাটন করা খুব সহজ কাজ নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, একটি DNA-সদৃশ RNA, যাকে বলা হয় messenger RNA বা বার্তাবহ RNA বা সংক্ষেপে m-RNA, তৈরি হয় DNA-এর ছাঁচের উপর এই বার্তাবহ RNA তাই DNA-এর সঙ্কেত বাহকরূপে কোষের কেন্দ্রস্থল থেকে সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত রিবোসোমের সঙ্গে নিজেকে আবদ্ধ করে। বার্তাবহ RNA এবার নিজেই কোষের নির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষণে নির্দেশনা করে। এই অবস্থায় transfer RNA বা পরিবাহক RNA বা সংক্ষেপে t-RNA সাইটোপ্লাজম থেকে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবহন করে রিবোসোমের উপর m-RNA-এর নির্দেশানুযায়ী সঠিক স্থানে বসিয়ে দেয়। এই ভাবে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে সারিবদ্ধ হয় এবং পরে ঐ অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পরস্পর যুক্ত হলে একটি প্রোটিন অণু তৈরি হয়। প্রোটিন অণুটি তৈরি হয়ে গেলে ওটি m-RNA-রিবোসোম থেকে সরে আসে।

মনে রাখতে হবে যে, একটি নির্দিষ্ট t-RNA একটি নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে জুড়তে পারে এবং অ্যামিনো অ্যাসিডযুক্ত t-RNA, m-RNA-এর যে অংশটির পূরক (Complementary). কেবলমাত্র সেখানেই যুক্ত হবে। তাই প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের পর্যায়ক্রম m-RNA-এর নির্দিষ্ট গঠন-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

এক কথায় বলা যায় একটি দীর্ঘ DNA অণুর প্রতিপূরক বা পূরক (Complementary) রূপে যে DNA সদৃশ m-RNA তৈরি হয়, একটি প্রোটিন তৈরি হয় ঐ m-RNA-এর গঠন-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

এই বছর যাঁরা শারীরতত্ত্ব এবং ভেষজ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন, তাঁরা বিভিন্ন স্তরে জিন বা DNA থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণের জটিল এই সুদীর্ঘ প্রণালীটিকে সঠিক মাপকাঠিতে বিচার করলেন। তাঁরা দেখালেন যে, শব্দ সঙ্কেতগুলি (Code words) m-RNA-তে ছাঁচের ন্যায় সাজানো আছে। বিভিন্ন শব্দ সঙ্কেত হলো এক-

একটি অনাচ্ছাদিত (Non-overlapping) ত্রিপদী সঙ্কেত (Code triplet), যাকে বলা হয় কোডন (Codon)। সঙ্কেত প্রেরক অণুটিতে প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্যায় নির্দেশনার জন্যে অন্ততপক্ষে ২২টি কোডন থাকা প্রয়োজন (একটি ত্রিপদী সঙ্কেত (Code triplet) কেবল মাত্র একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। ত্রিপদীর একটি পদ হলো একটি নিউক্লিয়োটাইড)। অ্যাডেনিন, গুয়েনিন, ইউরাসিল এবং সাইটোসিন—এই চারটি অণু ব্যবহার করে মোট ৬৪টি ত্রিপদী নিউক্লিওটাইড কোডন পাওয়া সম্ভব। আসলে একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রতীকরূপে একেরও অধিক কোডন থাকতে পারে। নিম্নে কোন্ কোন্ অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্যে কোন্ কোন্ কোডন ব্যবহৃত হয়, তার একটি অভিধান দেওয়া হলো।

দ্বিতীয় অক্ষর

প্রথম অক্ষর	U	C	A	G	তৃতীয় অক্ষর
U	UUU Phe UUC Leu UUA Leu UUG	UCU UCC Ser UCA UCG	UAU Tyr UAC UAA CT UAG CT	UGU Cys UGC UGA CL UGG Tryp	U C A G
C	CUU CUC Leu CUA CUG	CCU CCC Pro CCA CCG	CAU His CAC CAA GluN CAG	CGU CGC Arg CGA CGG	U C A G
A	AUU AUC Iso-Leu AUA AUG Met (C.I)	ACU ACC Thr ACA ACG	AAU AspN AAG AAA Lys AAG	AGU Ser AGC AGA Arg AGG	U C A G
G	GUU GUC Val GUA GUG Val (C.I)	GCU GCC Ala GCA GCG	GAU Asp GAC GAA Glu GAG	GGU GGC Gly GGA GGG	U C A G

CI CHAIN INITIATION
CT CHAIN TERMINATION

বংশপ্রবাহের সাংকেতিক অভিধান (১৯৬৭)

১৯৬১ সালে নিরেনবার্গ দেখালেন যে, বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিনিউক্লিয়ো-টাইড ইউ (Polynucleotide U) বা সংক্ষেপে পলি ইউ (Poly U) কেবলমাত্র একটি ফিনাইল অ্যালানিনের পলিনিউক্লিয়োটাইড প্রস্তুতিতে ছাঁচরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। তিনি আরও দেখালেন যে, একটি ট্রাই নিউক্লিয়োটাইড সঙ্কেত UUU সাধারণ অবস্থায় প্রোটিনে কেবলমাত্র ফিনাইল অ্যালানিনকে জুড়ে দেয়। এই ভাবে একে একে m-RNA-তে অবস্থিত বিভিন্ন বর্ণ-মালার পর্যায়ক্রম তিনি নির্ধারণ করলেন। এই প্রাথমিক আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অফ হেলথ (National Institute of Health) এই কাজের পরিবর্ধনের জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করবার ভার গ্রহণ করলেন। এই সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষাগারে নিরেনবার্গের কাজের পদ্ধতি নিয়ে আরো দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে যেতে থাকে। জৈব অনুঘটকের সাহায্যে বিভিন্ন RNA প্রস্তুত হলো এবং প্রোটিনে তাদের অ্যামিনো অ্যাসিড জুড়ে দেবার ক্ষমতা সম্পর্কে আরও বিশদ পরীক্ষা চলতে লাগলো। এই ভাবে দেখা গেল যে, বিভিন্ন ক্রমপর্যায়ে সজ্জিত RNA-তে অবস্থিত নিউক্লিয়োটাইডগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড-কে প্রোটিনে জুড়তে পারে। এই ভাবে নিরেনবার্গের কাজের যথেষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যেতে লাগলো।

ইতিমধ্যে ডক্টর খোরানা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি দেখালেন যে, প্রতিটি ত্রিপদী সঙ্কেত (Code triplet) m-RNA-এর উপর পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবহৃত হয়। তিনটি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত একটি ত্রিপদী সঙ্কেতের একটি নিউক্লিয়োটাইড অপর তিনটি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত ত্রিপদি সঙ্কেতের কোনটির উপরই আচ্ছাদিত (overlap) হয় না। তিনি আরও দেখালেন যে, সঙ্কেতগুলির পাঠ সুরু হয় একটি নির্দিষ্ট ক্রমপর্যায়ে।

ফিলাইন অ্যালানিন্‌-পরিবাহক-RNA-এর লবঙ্গ পাতার (CLOVER LEAF) ন্যায় গঠন।

চিত্র-১

ঐ সময় ডক্টর হোলির কাজ হলো t-RNA বা পরিবাহক RNA-কে প্রথম মাধ্যম (Medium) থেকে স্বতন্ত্র করা (Isolate), তারপর শোধন (Purification) করা এবং পরিশেষে t-RNA-এর গঠন-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করে দেখা। যে t-RNA-টি অ্যালানিনকে
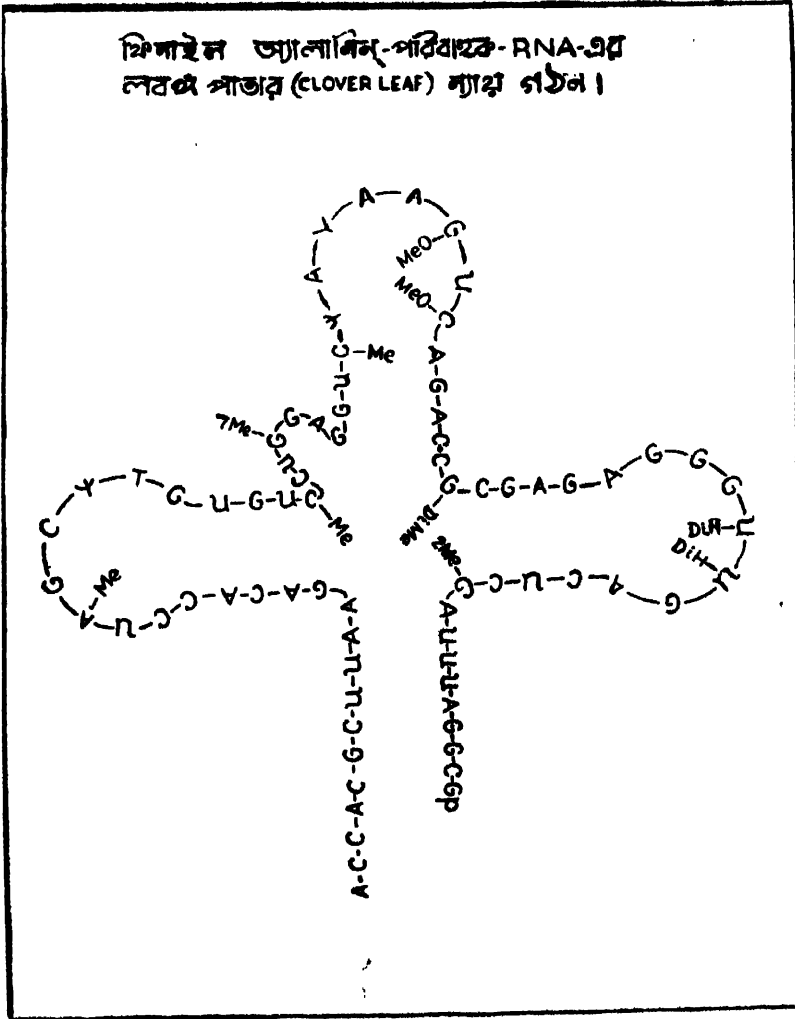
প্রোটিনে জুড়ে দেয়, তিনি তার গঠন-প্রকৃতি সর্বপ্রথম নির্ধারণ করলেন। তিনি দেখালেন এই t-RNA লবঙ্গ পাতার (Clover leaf) আকারে অবস্থান করে। বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া t-RNA-রও

বহুদিন যাবৎ DNA-তে অবস্থিত নিউক্লিয়োটাইডগুলির পর্যায়ক্রম জানা সম্ভব হয় নি। এর ফলে বংশ-প্রবাহক সঙ্কেতের নিউক্লিয়োটাইড পর্যায়ক্রম এবং প্রোটিনে অ্যামিনো
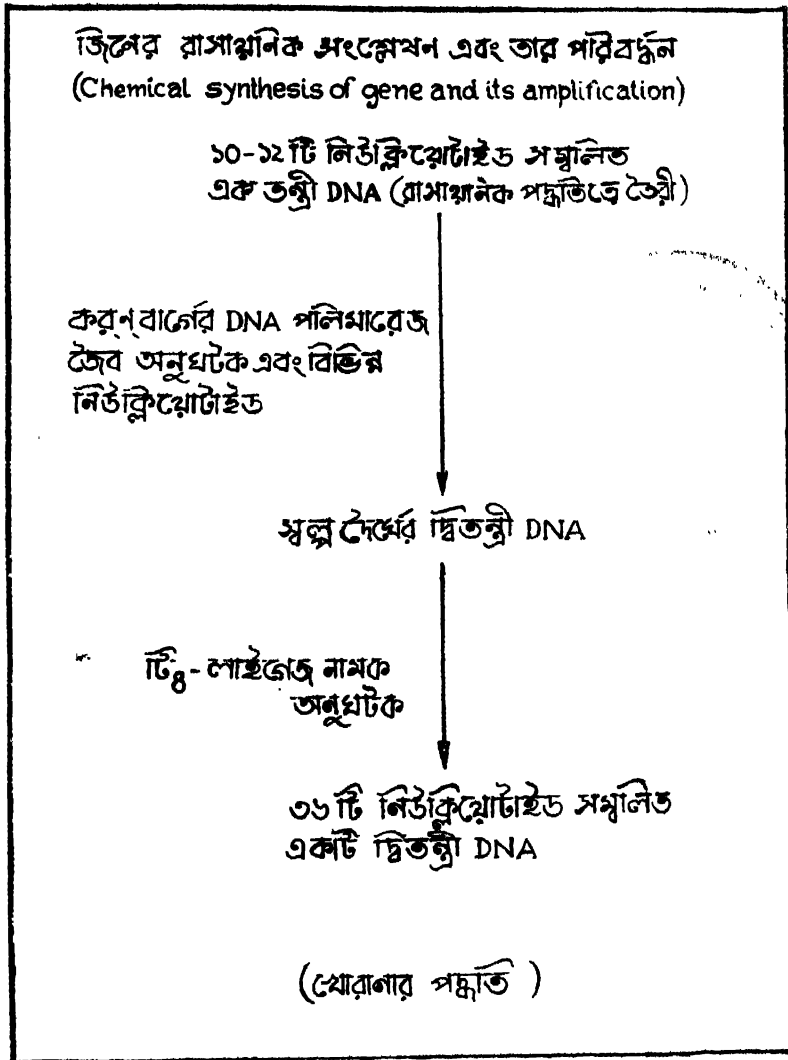
চিত্র-২

প্রায় ঐ একই রকম চেহারা আছে বলে বহু বিজ্ঞানী দেখালেন। ঐ সময় ডক্টর খোরানাও ফিনাইল অ্যালানিন-t-RNA-র গঠন-প্রকৃতি নির্ধারণ করেছিলেন। (চিত্র-১)।

অ্যাসিডের পর্যায়ক্রমের তুলনামূলক সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি। যদিও ১৯৬১ সাল পর্যন্ত কতকগুলি পরোক্ষ পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন DNA-তে নিউক্লিয়োটাইডগুলির পর্যায়ক্রম

অনুমান করা হচ্ছিল। কিন্তু সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

এই কিছু দিন হলো খোরানা এবং তাঁর সহকর্মীরা দেখিয়েছেন যে, রাসায়নিক প্রথায় অনুঘটক ব্যবহার করে খোরানা ঐ একতন্ত্রী DNA থেকে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের দ্বিতন্ত্রী (Double stranded) DNA তৈরি করলেন। এবার টি-৪ লাইগেজ (T_4 ligase) নামক জৈব
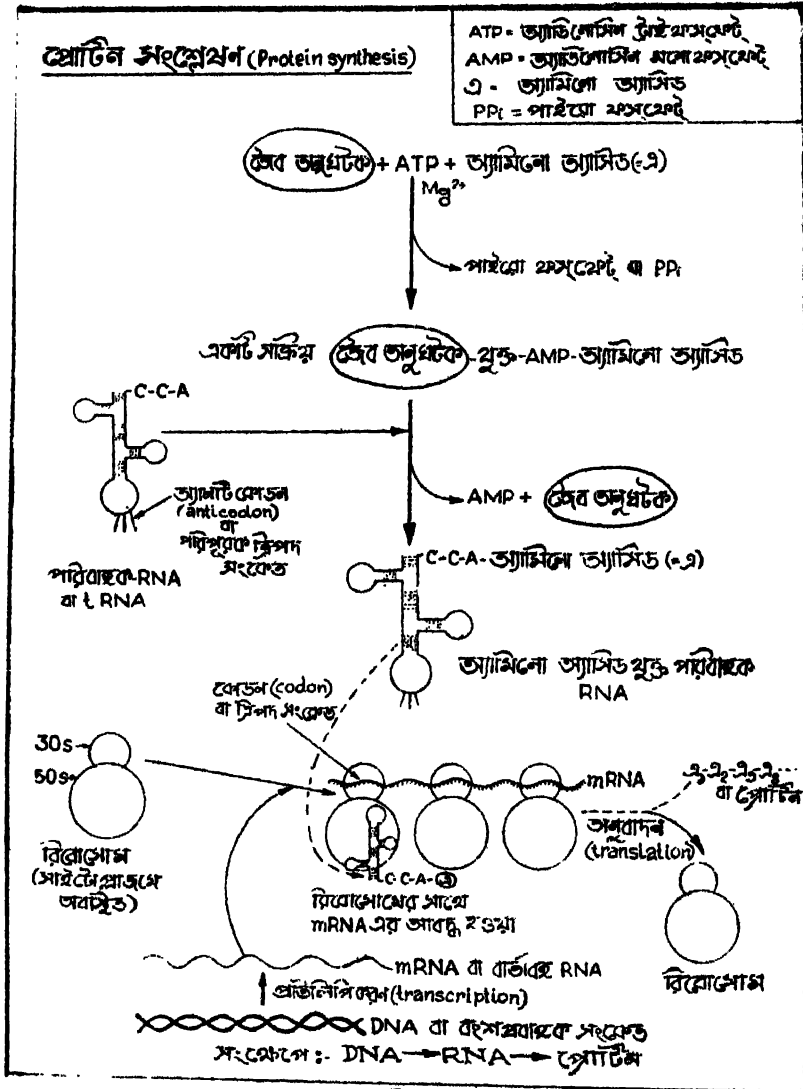
চিত্র-৩

সদ্য প্রস্তুত DNAগুলি হচ্ছে একতন্ত্রী (Single stranded), দৈর্ঘ্যে ছোট এবং আণবিক ওজন কম। কর্নবার্গ (Kornberg)-এর আবিষ্কৃত DNA পলিমারেজ (DNA polymerase) নামক জৈব অনুঘটক ব্যবহার করে বিভিন্ন স্বল্প দৈর্ঘ্যের দ্বিতন্ত্রী DNA-কে জুড়ে একটি দীর্ঘ দ্বিতন্ত্রী DNA তৈরি করতে সক্ষম হলেন (চিত্র-২)। এভাবে খোরানাই প্রথম রাসায়নিক ও জৈব

রাসায়নিক সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে এমন একটি DNA তৈরি করলেন, যার পর্যায়ক্রম জানা আছে অর্থাৎ কিনা যার সাংকেতিক পর্যায়ক্রমও জানা হয়ে আছে। তাই খোরানাই প্রথম DNA থেকে RNA এবং RNA থেকে প্রোটিন, সংক্ষেপে

DNA———→RNA———→প্রোটিন
প্রতিলিপিকরণ (Transcription)　অনুবাদন (Translation)

এই ঘটনা-প্রবাহ, যা পরোক্ষ পরীক্ষার উপর ভিত্তি করেছিল তা প্রত্যক্ষভাবে টেষ্ট টিউবে দেখাতে সক্ষম হলেন। জীবদেহে যে ঘটনা অপরিহার্য তা টেষ্ট টিউবে দেখানো হলো এই প্রথম। জিন ও প্রোটিনের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রমবিকাশ কিভাবে গড়ে উঠেছে, তা দেওয়া গেল—

জিন ও প্রোটিনের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রমবিকাশ

জিন = বংশ-সঙ্কেত প্রবাহক বস্তু — মেণ্ডেল (১৮৬০)

জিন = DNA — অ্যাভেরি, ম্যাকলিওড (১৯৪০-'৪৪) ও ম্যাক্‌কারটি

জিন (বা DNA······→ ? ······→প্রোটিন — বিডল্, টেটাম (১৯৪০)

বার্তাবহ RNA———→প্রোটিন
বা m-RNA　অনুবাদন (Translation) — নিরেনবার্গ, (১৯৬০-'৬১)

পরিবাহক RNA বা t-RNA, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং প্রোটিনের পারস্পরিক সম্পর্ক — হোলি (১৯৬৪-'৬৬)

রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত নিউ ক্লিয়োটাইডের পর্যায়ক্রমে জানা জিন বা DNA ——প্রতিলিপিকরণ (Transcription)——→ নিউক্লিয়োটাইডের পর্যায়ক্রম জানা বার্তাবহ-RNA বা m-RNA এবং পরিবাহক RNA t-RNA — খোরানা, (১৯৬৫-'৬৮)

↓ অনুবাদন (Translation)

অ্যামিনো অ্যাসিডের পর্যায়ক্রম জানা প্রোটিন।

এ-পর্যন্ত প্রোটিন সংশ্লেষণ সম্পর্কে যা জানা গেছে তা চিত্র নং ৩-এ দেখানো গেল।

তিনজন বৈজ্ঞানিকের একই উদ্দেশ্য বংশ-প্রবাহক সঙ্কেত সম্পর্কে এমন কিছু জানা, যা ছিল প্রাণ এবং প্রাণীর সৃষ্টির মূলে। জীবন কি? জীবনের উৎসই বা কোথায়? কবে এই জীবন সুরু হয়েছিল? জীবন থেকেই কি জীবনের সৃষ্টি, না জড় থেকে জীবনের সৃষ্টি —এই দুই মতবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং এদের সত্যতা যাচাই করা—ইত্যাদি বহু সমস্যার সমাধান হবে একমাত্র যখন বংশ-প্রবাহক সঙ্কেত সম্পর্কে আরও বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখা হবে। এসব ছাড়াও বংশগত কোন ত্রুটি (Genetic defect), যা একটি মানুষের জীবনকে পঙ্গু করে দেয়, যেমন—নাকি কারও বুদ্ধির চরম অভাব, কারও রক্তে বংশগত দোষ ইত্যাদি বহু সম্ভাবনার সমাধান করা হয়তো শক্ত হবে না।

মানুষ সত্যের পূজারী, তাই এই বক্র কুটিল জীবন সৃষ্টির সত্যতার উৎস কোথায়, কেনই বা এই জীবনের সৃষ্টি—ইত্যাদির জন্যে যুগ যুগ ধরে সাধনা করে যাবে যতদিন না সৃষ্টির বেড়াজাল অতিক্রম করে স্পর্শমণি খুঁজে পাবে।

ধস্

সুবিমল সিংহরায়

দার্জিলিং, কালিম্পং এবং আশেপাশের পাহাড়ী অঞ্চলে অক্টোবর, ১৯৬৮-এর গোড়ার দিকে ধসের যে তাণ্ডব হয়ে গেল, তার নজীর ভারতে কেন সমস্ত পৃথিবীতে বিরল। যদিও সাম্প্রতিক দুর্যোগ অভূতপূর্ব এবং তার ফলে এই অঞ্চলে যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, তার পরিমাণের কোন সীমা-পরিসীমা নেই, তথাপি ধস্ কিন্তু পাহাড়ী মানুষদের অচেনা নয়। প্রতি বর্ষায় কোথাও না কোথাও ধসের প্রকোপে কিছু জীবন এবং সম্পত্তি নষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে ধস্ পাহাড়ে একটি মারাত্মক বিভীষিকা, প্রলয়ের নামান্তর। সুতরাং এই মর্মান্তিক ঘটনার ফলে স্বভাবতঃই ধস্ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল অনেকটা বেড়ে গেছে। ধসের কারণ এবং কি উপায়ে এই সর্বগ্রাসী বিপর্যয় থেকে বাঁচা যায়, সে সম্বন্ধে কিছু জানা খুবই সময়োপযোগী হবে।

ধসের শ্রেণীবিভাগ

পাহাড়ের ঢাল থেকে পাথরের চাঁই, মাটি, বালি অথবা একসঙ্গে সবগুলিই মাধ্যাকর্ষণের টানে নীচে গড়িয়ে পড়লে আমরা বলি ধস্ নামছে। সুইজারল্যাণ্ডের আল্‌স্‌ পাহাড়ে কাজ করবার পর প্রোফেসর হাইম ধসের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। সেগুলি হলো—১। ভূমি-স্খলন (Soil slip), ২। ভূমি-ধস্ (Soil slide), ৩। শিলা-স্খলন (Rock slip), ৪। শিলা-প্রপাত (Rock fall) এবং ৫। মিশ্র ধস (Compound slide)। এই মূল শ্রেণীবিভাগ সমস্ত পাহাড়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

যে কোন শৈল সহরে কিছু কিছু লাইট-পোষ্ট অথবা টেলিগ্রাফ পোষ্ট অনেক সময়েই একদিকে হেলে পড়ে, কিন্তু আশেপাশে কোন বড় রকমের ধসের চিহ্ন দেখা যায় না। তার

কারণ হচ্ছে সকলের অগোচরে পাহাড়ের তলের মাটি ভূমি-স্খলনের ফলে ধীরে ধীরে নীচে নেমে যায়। যদিও এই ধরণের ধস্ ঠিক এই অবস্থায় খুব বিপজ্জনক নয়, অত্যধিক বৃষ্টির ফলে মাটির স্থিরতা বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গেলে পাহাড়ের কোল থেকে মাটি খসে পড়ে ভূমি-ধসের সৃষ্টি করে। এই মাটি জলের সঙ্গে মিশে তরল লাভার মত ছোট ছোট নালা দিয়ে উপত্যকার দিকে ছুটে যায়, ছড়িয়ে পড়ে আর সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যায় রাস্তা-ঘাট, জনবসতি। দার্জিলিং-এর পাহাড়ে মূলতঃ এই ধরণের ধসের জন্যেই ক্ষতি বেশী হয়েছে। হিলকার্ট রোড অনেক জায়গায় ঢেকে গেছে অথবা ভেঙ্গে গেছে। রেল লাইনের নীচ থেকে মাটি সরে গেছে।
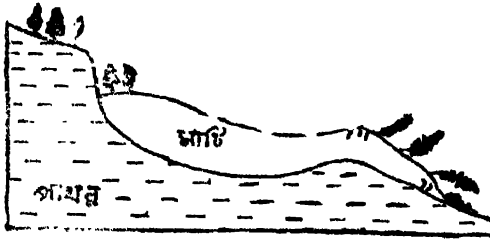
১নং চিত্র
মাটির ধীর সঞ্চলনের ফলে ধস্

পাহাড়ের ঢালে মাটির বদলে যদি স্তরে স্তরে পাথর সাজানো থাকে, তাহলে কোন শিথিল তল দিয়ে হঠাৎ এক স্তর পাথর খসে পড়লে যে ধসের সৃষ্টি হয়, তাকে শিলা-স্খলন বলে। দুর্বল তল দিয়ে প্রথমে ধীরে ধীরে সঞ্চলন সুরু হয়, পরে এক সময়ে পাথরের ভিতরকার বাধা কেটে গেলে দুর্বার গতিতে ধস্ নামে। কোন কোন সময় ফাটলের প্রাচুর্যের জন্যে পাথর আগে থেকেই ভাঙাচোরা অবস্থায় থাকে, ধসের সময় বিভিন্ন আকার এবং আয়তনের চাঁই চাঁই পাথর অনায়াসেই গড়িয়ে পড়ে। এই ধরণের ধস্‌কে তাই শিলা-প্রপাত বলে। যেহেতু এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর ধসের কারণগুলি একই সময়ে পাহাড়ের একই জায়গায় কার্যকরী হতে পারে, সেহেতু বেশীর ভাগ ধস্‌ই মিশ্র ধরণের হয়ে থাকে।

ধসের কারণ

ধসের মূল কারণগুলি নির্ভর করে পাহাড়ের প্রকৃতি, পাথরের ধরণ ও তার বিন্যাসের উপর। ছোট-বড় নদী-নালা পাহাড় কেটে কেটে গভীর উপত্যকা ও ঢাল তৈরি করে। পাহাড়ের শিরদাঁড়া (Ridge) এঁকেবেঁকে ঘুরে যায়। এই সব শিরদাঁড়ার মাথার মাটি ও পাথর অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল, তাই ধসের আশঙ্কাও সেখানে কম। কিন্তু শৈল সহরে জনবসতি শুধুমাত্র এই সকল অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে না, ঢাল দিয়ে নীচে নেমে যায়। পাহাড়ের ঢালই হচ্ছে
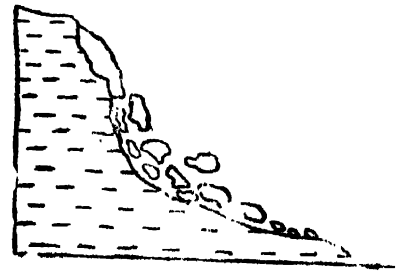
২নং চিত্র
শিলাপ্রপাত

ধসের আক্রমণের পক্ষে উপযুক্ত জায়গা। ঢালের খাড়াইয়ের মাত্রার উপর ধসের সম্ভবনা নির্ভর করে। যদি তা ৩৫ ডিগ্রীর বেশী হয়, তাহলে সেই অঞ্চলে মারাত্মক ধস্ নামবার সম্ভাবনা থাকে আর অন্য সব দিক বিচার না করেও একথা বলা যায় যে, যদি কোন ঢালের খাড়াই ২৫ ডিগ্রীর কম হয়, তাহলে তা সাধারণতঃ

ধস্ থেকে নিরাপদ। তবে শুধু ঢালের খাড়াই থেকেই ধসের সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলে চলে না, পাহাড়ের গায়ে পাথরের দিকেও নজর দিতে হবে। পাথর যখন নরম হয়, যেমন— শেল (Shale) অথবা শ্লেট (Slate) জাতীয়, তখন ঢালের খাড়াই ৩৭ ডিগ্রীর বেশী কখনই হয় না। অপর পক্ষে শক্ত, নীরেট চুনাপাথর (Lime stone), ডলোমাইট (Dolomite) অথবা কোন আগ্নেয়শিলার ক্ষেত্রে খাড়াই ৪৫ ডিগ্রী পর্যন্ত হয়। এই ক্ষেত্রে ঢালের খাড়াই বেশী হলেও তা অন্যান্য কারণে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল— কেন না, এই সব পাথর মূল বিন্যাসের দিক থেকে বিশেষ দুর্বল নয়, তাই ধসের সম্ভাবনাও এক্ষেত্রে কম।

পাহাড়ের গায়ে সাধারণতঃ দু-রকম ভাবে পাথর সাজানো থাকে। পাথরের স্তর অথবা
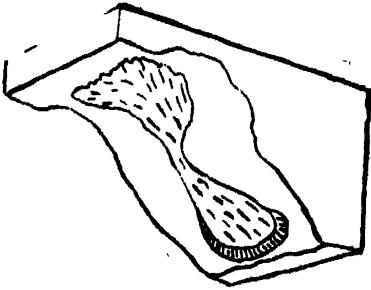
৩নং চিত্র
পাথরের ঢাল দিয়ে ভূমি-ধস্

সহজে ভেঙ্গে যায় এমন তলগুলি—হয় ঢালের দিকে ঝুঁকে থাকে, না হয় সেগুলি পাহাড়ের ভিতরে ঢুকে যায়। প্রথম ধরণের বিন্যাসই ধসের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কোন কারণে যখন পাথরের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়, তখন অনায়াসেই সেই পাথর মাধ্যাকর্ষণের টানে ঢাল দিয়ে ধসে পড়ে। পাহাড়ের স্থায়িত্ব নষ্ট হয় প্রধানতঃ জলের জন্যে। শক্ত পাথরের খাঁজে যদি জলে সম্পৃক্ত হবার মত উপযুক্ত শেল অথবা শ্লেট-জাতীয় পাথর থাকে, তাহলে অত্যধিক বৃষ্টির পরে যদিও বেশীর ভাগ জল ঢাল বয়ে নদী-নালায় গিয়ে পড়ে, তথাপি কিছুটা পরিমাণ জল ফাটল দিয়ে ঢুকে ঐ পাথরকে নরম কাদার মত করে দেয়। এই অবস্থায় ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় উপরের দিকে পাথরের স্তূপ আর পাহাড় আঁকড়ে থাকতে পারে না, গড়িয়ে পড়ে। যেখানে জলে সম্পৃক্ত হবার মত পাথর থাকে না, সেখানে অনেক সময়েই পাথরের অগণিত ফাটলে জল জমে। এই জলের পরিমাণ একটি বিশেষ সীমা অতিক্রম করলে পাথরে অত্যন্ত চাপ পড়ে, ফলে পাথরের চাঁই আল্‌গা হয়ে যায়।

পাহাড়ে রাস্তা অথবা বাড়ী-ঘর বানাবার সময় ঢাল কেটে কিছুটা জায়গা সমতল করতে হয়। এর ফলে ঢালের স্থায়িত্ব বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়। তখন ঢালের নতুন ধরণের খাড়াইয়ে পাথর অথবা মাটি খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, সহজেই ধসে যেতে পারে। অত্যধিক বৃষ্টির ফলে ঢাল থেকে মাটি ধুয়ে গিয়েও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

ভিন্নমুখী ধসের কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে দার্জিলিং-কালিম্পং পাহাড়ের শিলাস্তাস সম্পর্কে কিছু জানলেই বোঝা যাবে, কেন এই পাহাড়ে ধসের ধ্বংসলীলা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই শৈল সহরগুলি হিমালয়ের প্রস্তরীভূত তরঙ্গের কোলে অবস্থিত। সুদূর অতীতে গভীর সমুদ্র থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে হিমালয় আজকের উচ্চতায় এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে স্তূপীকৃত পলি থেকে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন ধরণের পাথর, যেগুলি পাহাড় তৈরির সময় প্রচণ্ড আলোড়ন আর চাপে পাথরের অসংখ্য ভাঁজ ও চ্যুতি হয়েছে এবং কোথাও কোথাও পরিবর্তিত শিলায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই পাহাড়ে যে সব পাথর

পাওয়া যায়, সেগুলি হচ্ছে, পাদদেশে শিবালিক শ্রেণীর বালিপাথর, তারপর শেল ও কয়লা মেশানো গণ্ডোয়ানা শ্রেণীর বালিপাথর, যেগুলি জলে সম্পৃক্ত হবার পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত। পাহাড়ের আরও অভ্যন্তরে পাওয়া যায় পরিবর্তিত শিলা, ফিলাইট (Phyllite), সিস্ট (Schist) ও নাইস (Gneiss)। এই সব পাথরের বিন্যাস খুব দুর্বল এবং এতে ফাটলের সংখ্যাও বেশী, তাই ধসের পক্ষে উপযুক্ত। তিস্তা নদীর অববাহিকার বেশীর ভাগ অঞ্চল এবং উৎসের পাহাড়শ্রেণী এই ধরণের পাথরে তৈরি। সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই দুর্বল, অসংলগ্ন পাথর বড় রকমের ধসের ফলে নদীর উৎস-মুখে, না হয় অববাহিকার কোন অজ্ঞাত স্থানে নেমে আসতে পারে। তখন নদীর গতিপথ সাময়িকভাবে আটকে যায় এবং একটি কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয়। প্রবল বৃষ্টিতে সেই হ্রদের জল বাড়লে জলের চাপে হ্রদের মুখ খুলে যায় আর উত্তাল জলরাশি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নদীর অববাহিকায় প্লাবন নিয়ে আসে। এই কারণেই অক্টোবরের প্রবল বর্ষণের পর তিস্তার জল তিস্তাবাজারের কাছে ৫০ থেকে ৬০ ফুট উঁচু হয়ে ওঠে এবং সুদৃঢ় অ্যাণ্ডারসন ব্রীজ ভাসিয়ে জলপাইগুড়িতে মারাত্মক বন্যা নিয়ে আসে।

মোট কথা, পাহাড়ের রাজ্যে হিমালয় খুবই নবীন, তার ভূসংস্থানে এখনো পুরাতনের স্থিরতা ও কঠিন বুনানি আসে নি। প্রকৃতির হাতিয়ার তাই এখনো নির্মমভাবে আঘাত হেনে চলেছে। ফলে ধস্ নামে, বন্যা আসে।

ধস্ নিরোধের উপায়

ধস্ যদিও একটি অতর্কিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে কোন বড় রকমের ধস্ই একদিনে নেমে আসে না, তার প্রস্তুতিপর্ব চলে বহুদিন ধরে। তাই ধস্ নিরোধের প্রথম ধাপই হবে, এই প্রস্তুতির চিহ্নগুলি খুঁজে বের করা এবং সময়মত প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই বিষয় যখন জানা আছে যে, ধসের মূল কারণগুলি নির্ভর করে জলের পরিমাণ, পাথর ও মাটির প্রকৃতি এবং পাহাড়ের ঢালের উপর, তখন এগুলি নিয়ন্ত্রণাধীনে আনলেই ধসের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এর মধ্যে পাথর ও মাটির উপর মানুষের কোন হাত নেই, হাত নেই বৃষ্টির উপরও।

ধস্ নিরোধ করতে হলে তাই জলের সুষ্ঠু
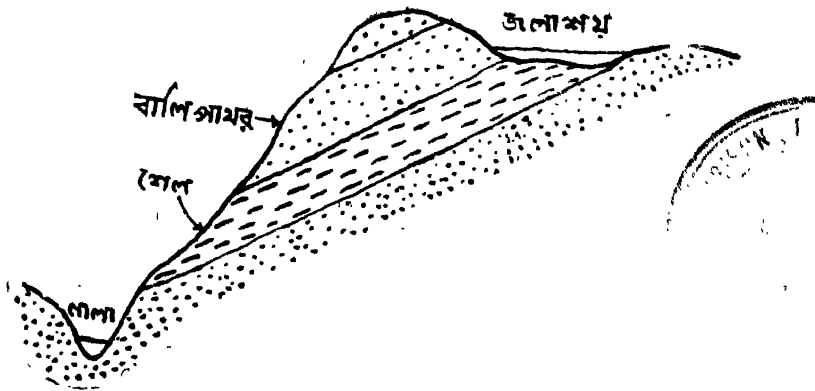
৪নং চিত্র
জলাশয় থেকে জল ঢুকে শেলস্তরকে সম্পৃক্ত করে, ফলে উপরের বালিপাথরের স্তর ঢাল দিয়ে ধসে যেতে পারে

নিষ্কাশন এবং পাহাড়ের ঢালে স্থায়িত্ব আনা প্রয়োজন। সে জন্যে কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া চলে।

১। বৃষ্টির জল যাতে পাথরের খাঁজে ঢুকে না পড়ে, সে জন্যে উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী থাকা দরকার। অতি বৃষ্টিজনিত অদরকারী ও বিপজ্জনক জল পাহাড়ের ঢাল ও শিরদাঁড়া (Ridge) থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে।

৪। মাটির অবক্ষয় রোধ এবং মাটি সংরক্ষণের উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করে মন্থরগতি মাটির ধস্ বন্ধ করতে হবে। তা না হলে এই ধরণের স্খলন থেকে পরে বড় রকমের ধসের বিপর্যয় আসতে পারে।

৫। গাছের শিকড় মাটি এবং কিছু পরিমাণ পাথর কামড়ে পাহাড়ের গায়ে ধরে রাখে। তাই বন সংরক্ষণ এবং নতুন বন তৈরির ব্যাপক
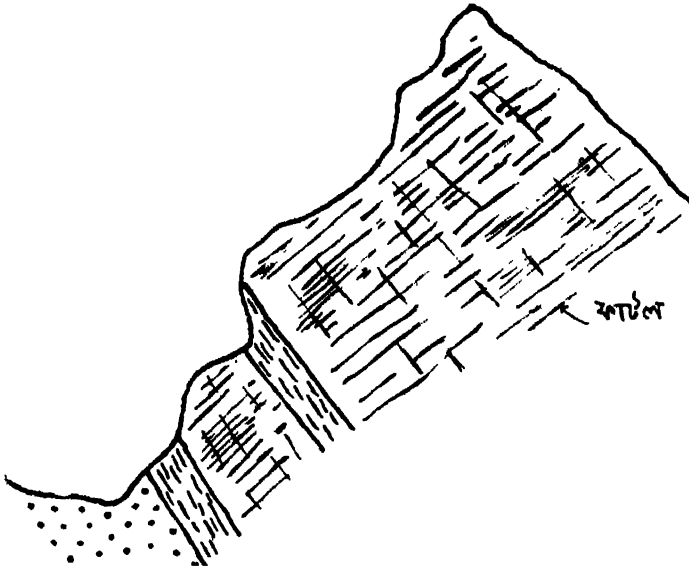
৫নং চিত্র
পাথরের স্তর ঢালের ভিতরে ঢুকে গেছে, কিন্তু অসংখ্য ফাটলে জল জমে পাথরকে আলগা করে দেয়, যার ফলে ধস্ হতে পারে

২। এই সতর্কতা নেওয়া সত্ত্বেও কিছু জল পাথর ও মাটির ভিতরে ঢুকবেই। এই জলই যেহেতু পরে ধসের কারণ হতে পারে, সেহেতু ছোট ছোট সুড়ঙ্গের মত গর্ত খুঁড়ে সেই জল বের করে দিতে হবে।

৩। ঢালের স্থায়িত্ব বজায় রাখবার জন্যে বিভিন্ন জায়গায় কংক্রিটের বাঁধ দিতে হবে। অথবা পাথরের চাঁই বসিয়ে বা তারের জাল ছড়িয়ে মাটির স্খলন রোধ করতে হবে।

পরিকল্পনা দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করতে হবে।

এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেও অনেক সময় ধস্ এড়ানো যায় না। তাই ধস্ থেকে জীবননাশের সংখ্যা কমাতে হলে কতকগুলি সতর্কীকরণ-ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হয়। ধস্ হতে পারে, এমন জায়গায় এবং ঘন বসতির অঞ্চলে কংক্রিটের স্তম্ভ বসাতে হবে এবং সেগুলি সময় সময় পরীক্ষা করে দেখতে হবে, বিশেষ করে বর্ষায়। যদি দেখা যায় যে, কোন অংশের স্তম্ভ ঢালের

দিকে হেলে পড়েছে তাহলে বুঝতে হবে, মাটির সঞ্চলন সুরু হয়ে গেছে। এই অবস্থায় ভাল ভাবে মাটি পরীক্ষা করলে ছোট ছোট চন্দ্রাকৃতির ফাটল দেখা যাবে। বৃষ্টির জল সেখান দিয়ে ঢুকে ধসের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে। সুতরাং তখনই নিকটবর্তী জনপদকে আসন্ন ধস্ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতে হবে।

জনবহুল পাহাড়ী অঞ্চলে যখন এই সব প্রতিরোধ ও সতর্কীকরণ-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা হবে, পাহাড়ের মানুষ শুধু তখনই ধসের বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার কথা ভাবতে পারবে।

ভারতের আদিবাসীদের খাদ্য

জিতেন্দ্রকুমার রায়

যুগে যুগে ভারতে বিভিন্ন জাতি, উপজাতির আগমন হয়েছে। বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর শাখা-উপশাখা এদেশ আক্রমণ করেছে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে, এই দেশের মাটিতে ঘর বেঁধেছে, ভারতবর্ষের জনস্রোতে মিশে গিয়ে ভারতবাসীই হয়ে গেছে।

ভারতের জনগণের এই মূল প্রবাহ থেকে ভারতবাসীর যে সব শাখা-উপশাখা স্মরণাতীত কাল থেকে মোটামুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে অথবা কিছু দিন আগেও মোটামুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল, সে সব শাখা-উপশাখার মানুষদেরই আমরা ভারতের আদিবাসী বলে থাকি। আদিবাসী কথার ভিতরেই তাদের অন্তর্নিহিত পরিচয় রয়েছে। এই সব শাখা-উপশাখার মানুষদের ভারতের আদিম অধিবাসী বলে ধরা হয়; অর্থাৎ বর্তমান ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে ভারতবাসী হিসাবে তাদের পরিচয়ই সবচেয়ে পুরাতন বলে মনে করা হয়। আদিবাসীদেরই অনেক সময়ে উপজাতি বলে অভিহিত করা হয়। আদিবাসীদের মোট সংখ্যা আড়াই কোটির মত। ভারতবর্ষের পূর্ব, উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ ইত্যাদি ভূভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে পার্বত্য ও অন্যান্য অঞ্চলে এরা ছড়িয়ে আছে। বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর আবাসস্থলের ভিতর রয়েছে দূরত্বের ব্যবধান এবং ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশের ব্যবধান। তার উপরে রয়েছে আদিবাসীদের জীবনযাত্রার উপর অন্যান্য আঞ্চলিক মানুষের প্রভাবের ব্যবধান। তাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি, ভাষা, দেহগঠন ইত্যাদির বিস্তর পার্থক্য। জাতিগতভাবে বিচার করলে ভারতের আদি-বাসীদের এক সূত্রে বাঁধা যায় না। ভারতের প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ স্বর্গতঃ ডাঃ বি. এস. গুহ মহাশয়ের মতে, আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভারতের আদিবাসীদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) ভারতের উত্তর, উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী

সুবনসিড়ি নদীর পশ্চিম পাড়ে বালিপাড়া, অ্যাবোর ও মিশমী পাহাড়ে অবস্থানকারী আকা, ডাফলা, মিরি, অ্যাবোর উপজাতি, ডিহং নদীর অধিত্যকাবাসী গ্যালং, মিনিকং, পাশি, পাজি প্রভৃতি উপজাতি, ডিহং ও লোহিত নদীর মধ্যবর্তী শৈল অঞ্চলের মিশমী উপজাতি, বিভিন্ন শাখা-

উপশাখার নাগা উপজাতি, কুকী, লুসাই, লাখার, সিকিমের লেপ্‌চা উপজাতিগুলিকে এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

(২) মধ্য ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠী

এরা প্রধানতঃ নর্মদা ও গোদাবরী নদীর মধ্যস্থিত বিস্তীর্ণ শৈল ভূভাগ, যা দক্ষিণ ভারতকে উত্তর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সেই ভূভাগের অধিবাসী। সংখ্যার দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতের অধিকাংশ আদিবাসী এই অঞ্চলের অধিবাসী। সাঁওতাল, পূর্বঘাট ও উড়িষ্যার শৈলদেশের খোন্দ, ছোটনাগপুরের মুণ্ডা, ওরাং, হো, বিরহোর, বিন্ধ্যের পার্বত্য অঞ্চলের কোল, ভিল, মধ্যপ্রদেশের গন্দ, বাইগা, মুরিয়া প্রভৃতি উপজাতিকে মধ্য ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা যায়। এদের মধ্যে সাঁওতাল ও গন্দদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী।

(৩) দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠী

পশ্চিমঘাট পর্বতের সর্বদক্ষিণ ভূভাগেই (ওয়েনাড থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত) প্রধানতঃ এই অঞ্চলের আবাসস্থল। নানা কারণে এই অঞ্চলের আদিবাসীদের ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী বলে মনে করা হয়। দক্ষিণ কানাড়ার কোরগ, কুর্গ শৈলশ্রেণীর সানুদেশ নিবাসী ইয়েরুভাস, কেরালার পার্বত্য ও বনাঞ্চলের কানিক্কর, মালা, পান্নম, পানিয়া, ইরুলা, নীলগিরির টোডা, কোটা, বাডাগা, অন্ধ্রের চেঞ্চু ইত্যাদি উপজাতিকে এই আদিবাসী গোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে মনে করা যেতে পারে।

ভারতের মূল বিভাগের তিনটি প্রধান আদিবাসী গোষ্ঠী ছাড়াও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের নিয়ে আর একটি ক্ষুদ্র আদিবাসী গোষ্ঠীর কথা মনে করা যেতে পারে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও ছোট বড় মিলে প্রায় দু-শ'টি দ্বীপ রয়েছে। দু-শ'টি দ্বীপের অনেকগুলিই জনবসতিশূন্য ছুটি দ্বীপপুঞ্জের মোট অধিবাসীর সংখ্যা চৌদ্দ-পনেরো হাজারের বেশী নয়। বেশীর ভাগই নিকোবরী বা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী। নিকোবরী ছাড়া নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে (গ্রেট নিকোবরে) শোম্পেন নামে আর একটি উপজাতি রয়েছে। ওঙ্গে, আন্দামানিস, জারওয়া, সেন্টিনালিস প্রভৃতি হচ্ছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী।

গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সাধারণ অধিবাসীদের অর্থাৎ যারা উপজাতির পর্যায়ে পড়ে, এমন অধিবাসীদের নিয়ে অল্পবিস্তর খাদ্য ও তৎসম্বন্ধীয় সমীক্ষার কাজ পরিচালিত হয়েছে। এই সমস্ত সমীক্ষার ফলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস,বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর পুষ্টি-মূল্য, পুষ্টির বিচারে খাদ্যের (Diet) উপযোগিতা এবং তৎসম্পর্কিত ব্যবহারিক পুষ্টি-বিজ্ঞানের উপর বহু মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের খাদ্যের পুষ্টিমান উন্নয়নের পরিকল্পনার কাজে এই সমস্ত সমীক্ষামূলক কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতের নৃতত্ত্ব সমীক্ষা কর্তৃক কাজ সুরু হবার আগে, বলতে গেলে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে খাদ্য ও পুষ্টির বিষয়ে কোন কাজ হয় নি। আগেই বলা হয়েছে যে, ভারতের আদি-বাসীদের মোট সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি। এই বৃহৎ সংখ্যার ভারতীয় অধিবাসীদের বাদ দিয়ে সমগ্র ভারতের খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টির চিত্র অঙ্কিত করতে গেলে তা হবে অসমাপ্ত ও অসম্পূর্ণ। শুধু ভারতীয় জনগণের একটি বৃহৎ অংশের খাদ্য ও পুষ্টির উপরে তথ্য সংগ্রহের জন্যেই যে আদিবাসী অঞ্চলে খাদ্য সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, তা নয়। বাইরের

জগতের সঙ্গে আদান-প্রদান বা যোগাযোগের বন্দোবস্ত না থাকলে মানুষের খাদ্য সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় খাদ্যবস্তুর (উৎপাদিত বা সংগৃহীত) উপর নির্ভর করে। আবার খাদ্যবস্তুর উৎপাদন নির্ভর করে ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ও পরিবেশের উপর। তাই বলা যায়, এই অবস্থায় মানুষের খাদ্য, খাদ্যাভ্যাস এবং খাদ্যের উপর নির্ভরশীল পুষ্টি ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ও স্থানীয় পরিবেশের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। ভারতের আদিবাসীরা সাধারণতঃ পার্বত্য ও অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চল বা মহাসাগরের দ্বারা বেষ্টিত দ্বীপের (আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ) অধিবাসী বলে তারা বাইরের জগৎ থেকে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন। সমভূমির অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগের বন্দোবস্ত অনেক স্থলেই সীমিত অবস্থায় রয়েছে। বিশাল ভারতের পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চলের এবং সাগরবেষ্টিত জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপমালার প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল সমভূমির প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল থেকে পৃথক। বহুলাংশে স্বতন্ত্র পরিবেশে বসবাসকারী ভারতের আদিবাসীদের খাদ্য ও খাদ্যের (Diet) পুষ্টিমূল্য কি ভারতের সমভূমিবাসী সাধারণ অধিবাসীদের খাদ্য ও খাদ্যের পুষ্টিমূল্য থেকে বিভিন্ন? প্রচলিত বিশ্বাস: আদিবাসীরা প্রকৃতির কোলে মানুষ। প্রকৃতি তাদের জন্যে বনজ ফলমূল ও শিকার করে আহার করবার মত বন্য পশু-পাখীর অঢেল বন্দোবস্ত করে রেখেছে। এই সব প্রকৃতিদত্ত খাদ্যে তাদের দেহ হয়েছে সবল ও সুঠাম। এই বিশ্বাসের মূলে কতটা সত্য আছে?

আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে খাদ্য ও পুষ্টির উপর সমীক্ষা পরিচালনার আরও দু-একটি দিক আছে। সাধারণভাবে সমভূমির মানুষদের আবাসস্থলের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল বিভিন্ন হলেও আদিবাসীদের সমস্ত শাখা-উপশাখার আবাসস্থলের পরিমণ্ডল একসূত্রে বাঁধা নয়। অ্যাবোর শৈলমালার অধিবাসী অ্যাবোর উপজাতির প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল আর গ্রেট নিকোবরের উপকূলবাসী নিকোবরীদের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল এক নয়। দক্ষিণ ভারতের নীলগিরির তৃণাবৃত বিস্তীর্ণ মালভূমির অধিবাসী টোডা উপজাতির আবাসস্থলের পরিমণ্ডল অ্যাবোর বা নিকোবর উপজাতির আবাসস্থলের পরিমণ্ডল থেকে স্বতন্ত্র। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলবাসী বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির পার্থক্য কতটা? খাদ্য ও পুষ্টির এই বিভিন্নতা বিভিন্ন উপজাতির দেহ গঠনের পার্থক্যকে কতটা প্রভাবিত করেছে? সম্পূর্ণরূপে খাদ্য সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল দু-চারটি উপজাতি ভারতীয় গণতন্ত্রে এখনও রয়েছে, যাদের খাদ্য ব্যবস্থায় আদিম যুগের ধারাটি অব্যাহত রয়েছে। তাদের খাদ্য ও পুষ্টির উপর গবেষণামূলক কাজের বিশেষ আবেদন ও আকর্ষণ আছে।

ভারতের নৃতত্ত্ব সমীক্ষা এপর্যন্ত প্রায় বাইশটি উপজাতির উপর খাদ্য সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করেছে। মোট আদি উপজাতির সংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যা খুব প্রচুর নয়, তবে পূর্ববর্ণিত প্রতিটি আদিবাসী অঞ্চলেই এই সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। যে সমস্ত উপজাতি নিয়ে এই সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করা হয়েছে, তাদের নাম নীচে দেওয়া হলো:

উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতে

অ্যাবোর শৈলশ্রেণীর পাদাম অ্যাবোর, মিলিকং অ্যাবোর ও গ্যালং উপজাতি; নকটে নাগা, ত্রিপুরার রাংখেল, ত্রিপুরা ও বাম্বং উপজাতি।

মধ্য ভারতে

বাইগা, গন্দ ও মুরিয়া উপজাতি।

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে

নীলগিরি অঞ্চলের টোডা, কোটা, ইরুলা,

পানিয়া, উবালি এবং মুল্লা কুরুম্বা উপজাতি। কেরালার উরালি, কানিক্কর, মালাপানটরম, মুথুভান এবং উল্লাটন।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে

গ্রেট নিকোবরের উপজাতি, গ্রেট নিকোবরের শোম্পেন ও লিটল্ আন্দামানের ওঙ্গে উপজাতির খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

ফলে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তার ভিত্তিতে ভারতের আদিবাসীদের খাদ্য ও তার পুষ্টিমূল্যের একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। বর্তমান নিবন্ধে সে আলোচনাই করা হবে।

খাদ্যোৎপাদন ও উপজীবিকার ভিত্তি

কোন না কোন আবাদ বা কৃষিকাজই হচ্ছে অধিকাংশ উপজাতির জীবিকার ভিত্তি। স্থায়ী

মোষচারণ-নির্ভর টোডা উপজাতির দুগ্ধজাত খাদ্য প্রস্তুত করবার ঘর। এই ঘরকে মন্দিরের মত পবিত্র বলে মনে করা হয়। এখানে কিছু কিছু পূজা ও তৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদিও সম্পাদিত হয়।

খাদ্য সমীক্ষা সম্বন্ধীয় অন্যান্য অনুসন্ধানের কাজ যে পূর্বালোচিত প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকেই করা হয়েছে, তা নয়। কিন্তু গত পনেরো-বিশ বছরে খাদ্য সমীক্ষা ও আনুষঙ্গিক অনুসন্ধানের

চাষের যেমন প্রচলন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অস্থায়ী আবাদের (Shifting cultivation) প্রচলন। অস্থায়ী আবাদের জন্যে আদিবাসীরা দলবদ্ধ হয়ে কুঠারের সাহায্যে পাহাড়ের ঢালু

বা অনুরূপ জায়গার জঙ্গল পরিষ্কার করে নেয়। বৃষ্টিহীন ঋতুর প্রখর তাপে ভূমিচ্যুত গাছপালা শুকিয়ে গেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর লাঙলের দ্বারা চাষ না করেই ভস্মাচ্ছাদিত জমিতে ধান বপন করা হয়। বীজ বপনের প্রয়োজনে মাটি খোঁড়বার জন্যে শুধু একটা বিশেষ দণ্ড (Digging stick) বা ঐ রকম জিনিষ ব্যবহার করা হয়। এভাবে তৈরি জমিতে কিন্তু জন্মিয়ে থাকে। মধ্য ভারতের বাইগা উপজাতি বেওয়ার করে জন্মায় বিভিন্ন রকমের মিলেট। উপরিউক্ত উপজাতিরা নীচু জমিতে অল্পবিস্তর সাধারণ চাষও করে থাকে। সাধারণ চাষে প্রধানতঃ ধান উৎপাদন করা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের উপজাতীয় অঞ্চলে সাধারণ চাষেরই প্রচলন রয়েছে। উৎপন্ন ফসল হচ্ছে—বিভিন্ন মিলেট ও ট্যাপিওকা। এই অঞ্চলের

বাস্তারের মুরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলের একটি ছবি। সারসের দেহ আগুনে ঝলসানো হচ্ছে।

বছর তিনেকের বেশী ফসল ফলানো চলে না। জমি বন্ধ্যা হয়ে এলে আবাদকারীরা নতুন করে জমি তৈরির জন্যে জঙ্গলের অন্যত্র চলে যায়। অস্থায়ী আবাদের আঞ্চলিক নাম ঝুম, সোদো, বেওয়ার ইত্যাদি। উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব সীমান্তের উপজাতিরা ঝুম আবাদ করে ধান, বিভিন্ন মিলেট এবং আরারুট নামে এক রকম শস্য উৎপাদন করে। ত্রিপুরার উপজাতিরা এবং নকটে নাগারা ঝুম চাষ করে কন্দজাতীয় খাদ্যও কয়েকটি উপজাতির প্রধান উপজীবিকা হচ্ছে শ্রমিকের কাজ। তারা বনবিভাগে বা চা ও কফির বাগানে শ্রমিকের কাজ করে, যদিও তাদের মধ্যে কৃষিকাজেরও কিছু কিছু প্রচলন রয়েছে। তবে নীলগিরির টোডা উপজাতির উপজীবিকার ভিত্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। টোডাদের উপজীবিকা গোচারণ। নীলগিরির তৃণাবৃত বিস্তৃত মালভূমি এক জাতীয় মোষ বিচারণের পক্ষে প্রশস্ত। শুধু মোষচারণের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী

ভারতে বোধ হয় আর নেই। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্ববৃহৎ দ্বীপ গ্রেট নিকোবরের উপকূলবাসী নিকোবরীদের উপজীবিকার ভিত্তি হচ্ছে নারকেল, প্যাণ্ডানাস ফল, পেঁপে, কলা, কন্দ ইত্যাদি জন্মানো এবং উপকূলীয় সমুদ্র থেকে খাদ্যোপযোগী বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণী সংগ্রহ। ঘন বসতিপূর্ণ নিকোবর দ্বীপের অধিবাসীদের উপজীবিকাও তাই। গ্রেট নিকোবরের অভ্যন্তর ভাগের অধিবাসী শোম্পেন উপজাতি এবং লিট্‌ল্ আন্দামানের ওঙ্গে উপজাতির জীবিকা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই সংগ্রহভিত্তিক। এরা কোন রকম খাদ্য উৎপাদন করে না বলেই ধরা যায়। বনে বনে ঘুরে পশু (প্রধানতঃ শূকর) ও পাখী শিকার করা, প্যাণ্ডেনাস ফল, পেঁপে, কন্দ ও মধু সংগ্রহ করা এদের কাজ। ওঙ্গেরা সামুদ্রিক মাছ, কচ্ছপ, ডুগং ইত্যাদি শিকার করে থাকে। গ্রেট নিকোবরের শোম্পেনরা দ্বীপটির অন্তর্ভাগের নদী-নালা থেকে প্রচুর মাছ ধরে থাকে।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের (ত্রিপুরা) উপজাতিসমূহের, বাস্তারের মুরিয়াদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে চাল। যদিও বিভিন্ন ধরণের মিলেটও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে যথেষ্ট খাওয়া হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের নিকটে নাগারা কন্দ ও কচুজাতীয় খাদ্যের উপর খানিকটা নির্ভর করে। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের মুণ্ডান উপজাতি এবং মধ্য প্রদেশের ভূমিয়া বাইগারা প্রধান খাদ্যের জন্যে প্রধানতঃ নির্ভর করে মিলেট জাতীয় শস্যের উপর। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের ইরুলী এবং কোটা উপজাতির প্রধান খাদ্য চাল ও মিলেটজাতীয় শস্য। কেরালার কয়েকটি উপজাতির প্রধান খাদ্য হচ্ছে ট্যাপিওকা বা ক্যাসেভার মূল।

ঘোষচারণ-নির্ভর নীলগিরির টোডা উপজাতির প্রধান খাদ্য চাল ও দুগ্ধজাত দ্রব্য (ঘোল ও মাখন)। মনে হয় দুগ্ধজাত খাদ্যই এককালে টোডাদের প্রধান খাদ্য ছিল। নীলগিরির তৃণাবৃত মালভূমি উর্বর ও চাষের (বিশেষ করে আলু, কফি ও চা) উপযোগী হওয়ায় চারণভূমির জমির পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে। ফলে তৃণভূমির উপর নির্ভরশীল টোডাদের প্রতিপালিত মোষের সংখ্যাও কমে আসছে। কাজেই টোডাদের খাদ্য আর অতীতের মত অতটা দুগ্ধজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল নয়। তবুও বলা যায়, টোডারা যে পরিমাণ দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য খেয়ে থাকে, ভারতের কোন জনগোষ্ঠীই ততটা দুধ খায় না।

গ্রেট নিকোবরের নিকোবরীদের প্রধান খাদ্য প্যাণ্ডেনাস ফলের শাঁস, নারকেল, অক্টোপাস ও বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ। ওজনে প্যাণ্ডেনাস দশ-বার থেকে পঁচিশ-ত্রিশ কে. জি পর্যন্ত হয়ে থাকে। আসলে প্যাণ্ডেনাস হচ্ছে ছিব্‌ড়াবহুল গুচ্ছফল। ফল পাকবার পরে তা সংগ্রহ করে কুঠারের সাহায্যে গুচ্ছফল থেকে এক-একটি করে কোয়া বা ফল বের করে নিয়ে আসা হয়। শাঁস, বীজ ও ছিব্‌ড়াসহ এক-একটি কোয়ার ওজন ৪০০-৫০০ গ্র্যাম হয়ে থাকে। একটি বড় পাত্রে সামান্য জল দিয়ে কোয়াগুলি তার উপরে সাজিয়ে দিয়ে পাত্রের মুখটা বিশেষ এক জাতীয় বড় বড় পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তারপর পাত্রটিকে আগুনের উপরে বসিয়ে কোয়াগুলিকে ৬-৭ ঘন্টা ধরে বাষ্প-নিষিক্ত করা হয়। বাষ্প-নিষিক্ত করবার পরে বন্ধুর ও ধারালো তলবিশিষ্ট পাথরের সাহায্যে কোষগুলিকে আঁচড়ে নরম শাঁস বের করা হয়। আঁচড়ানো শাঁস একত্র করে একটা বড় গোলাকৃতির ডেলা তৈরি করা হয়, যার ওজন দুই, তিন-চার কে. জির মত হয়ে থাকে। ডেলার শাঁসের মধ্যে বড় বড় ঝিহি আঁশ

থাকে। ডেলা না ভেঙে ঐ শাঁশগুলি সুকৌশলে বের করে নিয়ে আসা হয়। এভাবে তৈরি করবার পর প্যাণ্ডেনাসের শাঁস খাবার উপযোগী হয়। অনেক সময়ে সঙ্গে সঙ্গে না খেয়ে প্যাণ্ডেনাসের ডেলা ভবিষ্যতের খাদ্য হিসাবে পাতা দিয়ে ভাল করে ঢেকে রান্না ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই অবস্থায় প্যাণ্ডেনাসের শাঁস প্রায় একমাস পর্যন্ত খাদ্যো-

মধ্য, ভারতের মুরিয়া ও গন্দদের ভিতর ডাল খাওয়ার প্রচলন থাকলেও অন্যান্য আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ডাল হয় খাওয়া হয় না বা অতি সীমিত পরিমাণে খাওয়া হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতস্থ কেরালার কয়েকটি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল ছাড়া ভারতের মূল ভূভাগের অন্যান্য আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সাধারণতঃ তরিতরকারী অল্পবিস্তর খাওয়া হয়।

কয়েকজন শোম্পেন পুরুষ। শোম্পেনরা গ্রেট নিকোবরের অভ্যন্তরভাগের অধিবাসী।

পযোগী থাকে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপেও প্যাণ্ডেনাসের শাঁস ও নারকেল প্রধান খাদ্য। লিট্‌ল্ আন্দামানের ওঙ্গে উপজাতির প্রধান খাদ্য প্যাণ্ডেনাসের শাঁস ও শূকরের মাংস। ঋতুবিশেষে এরা প্রচুর মধু খেয়ে থাকে। গ্রেট নিকোবরের অভ্যন্তরের অধিবাসী শোম্পেন-দের খাদ্যও অনেকটা নিকোবরীদের মতই। তবে অভ্যন্তর ভাগে নারকেল গাছের অভাবের জন্যে এদের খাদ্যে নারকেলের পরিমাণ অনেক কম থাকে।

তরিতরকারীর ভিতর শাকপাতা জাতীয় তরি-তরকারীই বেশী খাওলা হয়। সারা বছর শাকপাতা পাওয়া যায় না, তাই মধ্য ভারতের বহু আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ভবিষ্যতের খাদ্য হিসাবে শাকপাতা রোদে শুকিয়ে ভাণ্ডারে জমা করে রাখা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের এবং ত্রিপুরার বহু উপজাতি খাবার জন্যে বাঁশের কোঁড়ল এবং বিভিন্ন জাতীয় ছত্রাক সংগ্রহ করে থাকে।

মধ্য ভারত ও উড়িষ্যার বহু উপজাতীয় অঞ্চলে

প্রচুর মহুয়া গাছ দেখা যায়। বসন্ত ঋতুতে এই সমস্ত গাছ মহুয়া ফুলে ঢেকে যায়। এই ফুল খুব মিষ্টি। আদিবাসীরা মহুয়া ফুল প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে সেগুলি রোদে শুকিয়ে রেখে দেয়। শুষ্ক মহুয়া ফুল সাধারণতঃ মহুয়া মদের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা

মাংস সরবরাহের অন্যতম প্রধান উৎস না হলেও মুরগী প্রায় সর্বত্রই প্রতিপালিত হয়। অ্যাবোর শৈলাঞ্চলের উপজাতিরা মাংসের জন্যে এলো নামে একপ্রকার অর্ধ-গৃহপালিত জন্তুর উপর নির্ভর করে। এই জন্তুর দেহের আকার ও রং অনেকটা মেষের মত, কিন্তু গঠন গরুর মত।

একটি নিকোবরী স্ত্রীলোক প্যাণ্ডেনাস ফল খাদ্যোপযোগী করছে। একপাশে গোটাকয়েক প্যাণ্ডেনাস ফল। এই ফল নিকোবরীদের একটি প্রধান খাদ্য।

হয়। কিন্তু বহু এলাকায় এই শুষ্ক ফুল খাদ্য হিসাবেও গ্রহণ করা হয়। দেখা গেছে যে, জলহীন শুষ্ক মহুয়া ফুলে শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগ চিনি থাকে। সম্পূর্ণ শুষ্ক অবস্থায় মহুয়া ফুলের ক্যালরী ও প্রোটিনের মান চালের সমান।

টোডাদের কথা ছেড়ে দিলে সমস্ত উপজাতির কাছেই মাংস একটি প্রিয় খাদ্য। মাংসের জন্যে উপজাতিরা প্রধানতঃ গৃহপালিত জন্তুর উপরেই নির্ভর করে। বহু অঞ্চলেই গৃহপালিত শূকরই মাংসের প্রধান উৎস। লিট্‌ল্ আন্দামানে বন্য বরাহও শিকার করা হয়।

ত্রিপুরার উপজাতিরা বিশেষ অনুষ্ঠানে মেষ উৎসর্গ করে মেষের মাংস খায়। টোডারাও পারলৌকিক কাজকর্ম করবার প্রয়োজনে বেশ কয়েকটা মেষ হত্যা করে, কিন্তু মেষ বা কোন জন্তুর মাংস তারা কখনও খায় না। বাস্তারের মুরিয়া উপজাতির লোকদের মধ্যে কিছুদিন আগেও গোমাংস খাওয়ার রীতি ছিল, কিন্তু হিন্দুদের প্রভাবে সে অভ্যাস তারা পরিত্যাগ করতে বসেছে।

অরণ্য ও শৈলমালা আকীর্ণ বহু অঞ্চলের উপজাতিরা মাংসের জন্যে জীবজন্তু শিকার

করে। পাখী, গোসাপ (গিরগিটি), হরিণ, শুকর ইত্যাদি হচ্ছে শিকার করবার জীবজন্তু। পূর্বেই বলা হয়েছে লিটল্ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা কচ্ছপ, ডুগং, অক্টোপাস ইত্যাদি বিবিধ সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করে। শোম্পেনরা মাংসের জন্তে কুমীরও শিকার করে। মধ্যভারতের উপজাতি মেঠো ইঁদুরের মাংস খায়। মুরিয়াদের কাছে ব্যাঙের মাংস অভোজ্য নয়।

পৃথিবীর বহু দেশের মত ভারতেও অনেক উপজাতি এক বিশেষ ধরণের পতঙ্গের রোষ্ট খেয়ে থাকে। মুরিয়ারা খেজুর গাছের গুঁড়ি থেকে এক জাতীয় পতঙ্গের ফিকে হলুদ রঙের নরম শূককীট সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ও ভেজে খায়। গ্রেট নিকোবরের অধিবাসীরা জঙ্গলের এক বিশেষ ধরণের গাছে এক জাতীয় পতঙ্গের শূককীটের চাষ করে থাকে। কুঠার বা দায়ের সাহায্যে গাছের গুঁড়ি ঘিরে একটা চক্রাকারের গভীর নালী খোড়া হয়, যার জন্তে গাছটা ধীরে ধীরে মরে যায়। গাছটি মরে যাওয়ার দু তিন মাসের মধ্যেই এক জাতীয় পতঙ্গ মরা কাণ্ডে অসংখ্য গর্ত করে বাসা বাঁধে এবং কালক্রমে ডিম পাড়ে। এই ডিম থেকে যথাসময়ে শূককীট কৌশলে গর্ত থেকে বের করে কাঁচাই খাওয়া হয়।

উপরের বর্ণনা থেকে যেন এমন ধারণা না হয় যে, আদিবাসীরা প্রচুর মাংস এবং মাংস জাতীয় খাদ্য খেতে পায়। মাংস ভোজনের পরিমাণ খুবই কম। মাংস প্রদায়ী গৃহপালিত জন্তুর সংখ্যা এমন নয় যে, তারা মাংসের জন্তে ঘন ঘন গৃহপালিত জন্তু হত্যা করতে পারে। সমস্ত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলেই ঘন বন দেখা যায় না আর ঘন বন থাকলেও সেখানে যখন তখন শিকার মিলে না।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে মাছ খুবই কম খাওয়া হয়—অধিকাংশ অঞ্চলে এক রকম খাওয়াই হয় না। নীলগিরির শৈল অঞ্চল, ত্রিপুরা এবং কেরালার কিছু কিছু উপজাতি শুঁটকী মাছ খায়। সাধারণতঃ এই মাছ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ না করে তরিতরকারী রান্নার মসলা হিসাবেই গ্রহণ করা হয়। লিটল্ আন্দামানের ওঙ্গে এবং গ্রেট নিকোবরের নিকোবরীরা প্রচুর সামুদ্রিক মাছ, বর্মমাছ (শেলফিশ, কাঁকড়া ও চিংড়ি জাতীয় মাছ) খেয়ে থাকে। শোম্পেনরা গ্রেট নিকোবরের অভ্যন্তরের নদী-নালা থেকে প্রচুর মৎস্য আহরণ করে থাকে।

নীলগিরির টোডারা যে প্রচুর দুগ্ধজাত দ্রব্য খায়, সে কথা আমরা বলেছি। অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে কেরালার মুথুভানরা কিছু দুধ খায়। অন্যান্য উপজাতির লোকেরা দুধ এক রকম খায়ই না। আবার শৈলাঞ্চলের এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যে দুধ খাওয়ার প্রচলন একেবারেই নেই।

মদ্যজাতীয় পানীয়

মদ্যজাতীয় পদার্থ প্রাণীর দেহে কিছুটা খাদ্যের কাজ করে। তাই উপজাতিদের খাদ্যের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে তাদের খাদ্যের কথা কিছু বলতে হয়।

প্রায় সমস্ত উপজাতীয় অঞ্চলে কোন না কোন সুরাজাতীয় পানীয় পান করা হয়। এই পানীয় গ্রহণে সামাজিক সম্মতি রয়েছে। উৎসব-আনন্দে এবং নানাবিধ অনুষ্ঠানে তো বটেই, সাধারণ জীবনেও এই সমস্ত পানীয় যথেষ্ট পান করা হয়। অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়কে সাধারণভাবে দু-ভাগে ভাগ করা যায়:—পাতিত সুরা এবং বিয়ারজাতীয় অপাতিত সুরা। বিয়ারজাতীয় অপাতিত সুরাই অধিকাংশ অঞ্চলে পান করা হয়। এই অপাতিত সুরা সাধারণতঃ

মিলেট জাতীয় শস্য এবং চাল থেকে তৈরি করা হয়। চাল বা মিলেট জাতীয় শস্য রান্না করে উপযুক্ত পরিবেশ ও ব্যবস্থায় গাঁজিয়ে ছেঁকে নিলেই এই বিয়ারজাতীয় মদ্য তৈরি হয়। চাল ও মিলেট্ থেকে তৈরি অপাতিত সুরা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে (যথা—অপাং, পোকা, খাম, চুয়াক, পাখোল, হাড়িয়া, লাওা, হাণ্ডিয়া, ডিয়াং ইত্যাদি) পরিচিত। নেফার নকটেরা অপাতিত সুরা তৈরির জন্যে কাঁচা মাল হিসাবে দু-এক রকম কন্দও ব্যবহার করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ও পূর্ব ভারতের আদিবাসীর অঞ্চলে প্রধানতঃ অপাতিত সুরা পান করা হয়। তালজাতীয় গাছের মিষ্টি রস গাঁজিয়ে যে তাড়ি হয়, তাও অপাতিত সুরা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। মধ্য প্রদেশ এবং উড়িষ্যার কয়েকটি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে শাল্পী বা সাগু পামের গাঁজানো রস পান করা হয়। গ্রেট নিকোবর এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আরও দু-একটি দ্বীপের আদিবাসীরা নারকেল গাছের তাড়ি প্রচুর পরিমাণে পান করে থাকে। পাতিত সুরার মধ্যে মহুয়ার সুরাই প্রধান। শর্করাবহুল সুমিষ্ট ও শুষ্ক মহুয়া ফুল জলে ভিজিয়ে গাঁজাবার পর পাতন পদ্ধতির প্রয়োগে এই মদ্য প্রস্তুত করা হয়। মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যার বিস্তৃত উপজাতীয় অঞ্চলে মহুয়ার সুরা পান করা হয়। ভাত থেকে যে হাঁড়িয়াজাতীয় অপাতিত সুরা তৈরি হয়, তাথেকেও পাতন পদ্ধতির সাহায্যে পাতিত সুরা তৈরি করা হয়। অনেক সময়ে এইভাবে প্রস্তুত পাতিত সুরাকে দ্বিতীয়বার পাতন ক্রিয়ার প্রয়োগে সবিশেষ উগ্র সুরায় পরিণত করা হয়।

অপাতিত সুরাতে অ্যালকোহলের পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা ২ থেকে ৬ ভাগ থাকে। আর পাতিত সুরাতে থাকে ২০।২৫ ভাগ। দু-বার পাতন পদ্ধতি প্রয়োগ করে যে উগ্র মদ্য প্রস্তুত হয়, তাতে অ্যালকোহলের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ৫০।৫৫ ভাগের মত। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে দেহ ও মনে যে কুফল দেখা যায়, তার জন্যে দায়ী হচ্ছে মদ্যের অ্যালকোহল। কাজেই বলা যায় অপাতিত সুরার চেয়ে পাতিত সুরার দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি করবার ক্ষমতা অনেক বেশী। অপাতিত সুরা থেকে ক্যালরী, প্রোটিন, খনিজ লবণ, ভিটামিন ইত্যাদি পুষ্টি উপাদানগুলি কিছু কিছু পাওয়া যায়। তবে সুরা প্রস্তুত করবার জন্যে যে খাদ্যশস্য ব্যবহার করা হয়, পুষ্টি উপাদানগুলি মূলতঃ সেই খাদ্যশস্য থেকেই আসে। সুরা প্রস্তুতের পদ্ধতিতে ব্যবহৃত খাদ্যশস্যের কোন পুষ্টিমূল্য বাড়ে না, বরং সুরা প্রস্তুতের পদ্ধতিতে খাদ্যশস্যের অপচয় হয়। কারণ গাঁজানো শস্যবস্তু নিষ্কাশন করবার পর যা পড়ে থাকে তা আর খাওয়া হয় না। পাতিত সুরাতে ক্যালরী ছাড়া আর কোন পুষ্টি উপাদান নেই। পাতিত সুরার অ্যালকোহলই ক্যালরী বা শক্তি সরবরাহ করে থাকে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপে প্রচুর নারকেল উৎপন্ন হওয়ায় সেখানকার অধিবাসীরা প্রচুর পরিমাণে টাট্কা ডাব ও নারকেলের জল খেয়ে থাকে।

খাদ্যের পুষ্টিগুণ

ক্যালরী, প্রোটিন, বিভিন্ন খনিজ লবণ (প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম ও লৌহঘটিত খনিজ লবণ) ও ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি, (থায়ামিন), ভিটামিন-বি (রাইবোফ্লেবিন), নিয়াসিন, ভিটামিন-সি ইত্যাদি পুষ্টি উপাদানগুলি আমরা দৈনিক খাদ্য থেকে কতটা পাই, তার উপরেই দৈনিক খাদ্যের পুষ্টিগুণ নির্ভর করে। প্রোটিনের ক্ষেত্রে অবশ্য গুণগত উৎকর্ষের প্রশ্নও রয়েছে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের চেয়ে যে প্রাণিজ

দৈনিক প্রতি পূর্ণবয়স্ক পুরুষের পুষ্টি উপাদানগুলির গ্রহণের গড় মান

বিভিন্ন উপজাতি	ক্যালোরী	মোট প্রোটিন (গ্র্যাম)	প্রাণিজ প্রোটিন (গ্র্যাম)	ক্যালসিয়াম (গ্র্যাম)	লৌহ (মিলিগ্র্যাম)	ভিটামিন-এ (ইউনিট) (ক্যারোটিন)	ভিটামিন বি১ (মিলিগ্র্যাম)	ভিটামিন বি২ (মিলিগ্র্যাম)	নিয়াসিন (মিলি-গ্র্যাম)	ভিটামিন-সি (মিলিগ্র্যাম)
পাযে আবোর	২৯৬০	৮০	৭	১·০	৬১	৩০০০	১·৫	০·৩	৩৫	৬৫
মিনিয়াং আবোর	২৬৫০	৬৮	৩	০·৬	২০	১৬০০	১·৮	০·২	৩০	১৬
গ্যালং আবোর	২৯৫০	৭০	৩	০·৭	২১	১৯০০	২·৪	০·২	৩৮	১৭
নকটে	১৯৫০	৪৪	নামমাত্র	০·৩	১৯	২৮৪০	১·৯	০·২	২৩	২৭
ত্রিপুরা	২৬০০	৫৩	১২	০·২	১৬	১৮০	২·০	০·৩	২৮	১২
রিয়াং	৩১৫০	৭৫	৯	০·৪	১৭	৩৪০	২·৭	০·৩	৩৭	২৭
বাইগা	২৬০০	৭৫	২	০·৬	৮০	৪০০০	১·১	×	১৭	৫৯
মুরিয়া	২৭৬০	৮০	১	০·৪	৩৯	৭৮০	১·৩	০·৯	২১	১৮
উরালি	২৪১০	২৮	৬	০·৩	১২	২৬০	১·৬	০·৬	১৫	৪৬
কানিক্কর	২২০০	১৩	২	০·৪	৮	১০০	০·৬	০·৫	৫	৫
মালীপানথরম	১৮৫০	১৩	নামমাত্র	০·৩	৮	৯০	০·৬	০·২	৬	১৬
মুথুভান	২৬৪০	৪৪	×	×	২২	৯৭০	২·৩	০·২	১১	৩
উল্লাটন	২৪৫০	৩০	১	০·৪	১১	৮০	২·০	০·৫	১২	৩
পানিয়া	১৯৭৫	৫৩	৩	০·৩	২১	৩১০০	১·৫	০·৯	২১	৪৪
মুল্লা কুরুম্বা	২৭৩০	৫৬	২	০·৩	২৪	৬০০	১·৯	০·৭	৩০	৪৯
উরালি কুরুম্বা	২৩০০	৬১	৬	০·৪	২৪	১৭০০	১·৯	×	২৪	৩৩
টোডা	৩১০০	৭৫	২৯	১·৬	১৭	১৫০০	১·৯	১·১	২৪	৩৫
কোটা	৩০৬০	৮৯	২	০·৬	৬৮	৫৯০	২·৮	১·০	২৫	৩৬
ইরুলা	১৮৬০	৫০	৯	×	৩১	১৭৬০	২·০	×	১৩	৫২
নিকোবরী (গ্রেট নিকোবর)	৩০৫০	১৩০	১০৩	১·৪	৬৯	১২,০০০	১·৬	২·৩	২২	৬৩৫
মাঝামাঝি পরিশ্রমী পূর্ণবয়স্ক পুরুষের প্রয়োজনীয়তা	২৬০০ থেকে ২৮০০	৫৫	×	০·৮	২০ থেকে ৩০ মিলি-গ্র্যাম	৩০০০ থেকে ৪০০০ ইউ-নিট	১·৫ মিলি-গ্র্যাম	১·৫ মিলি-গ্র্যাম	১৫ থেকে ২৩ মিলি-গ্র্যাম	৫০ মিলি-গ্র্যাম

প্রোটিনের পুষ্টিমূল্য বেশী, সে কথা অনেকেই জানেন। বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানগুলি দৈনিক একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের কতকটা প্রয়োজন, তা বিভিন্ন দেশের পুষ্টি-বিজ্ঞানীদের সংস্থা মোটামোটি ঠিক করেছে। পুষ্টি উপাদানগুলির প্রয়োজনীয়তার নির্দিষ্ট মানের তুলনায় বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীরা তাদের খাদ্য থেকে বিভিন্ন পুষ্টিউপাদানগুলি কতটা পায়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বিচার করা হয়। বিভিন্ন উপজাতি তাদের খাদ্য থেকে পুষ্টি উপাদানগুলি (দৈনিক পূর্ণবয়স্ক পুরুষ প্রতি) কতটা পায়, তার একটা হিসাব পরিবেশিত তালিকায় দেওয়া হলো। নিম্নের আলোচনা পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে করা হলো। গন্দ ও বায়ং উপজাতি বাদে সমীক্ষিত সমস্ত উপজাতির বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানগুলি গ্রহণের গড় মান তালিকাতে দেওয়া হয়েছে।

ক্যালরী

ক্যালরীর প্রয়োজনীয়তা দৈহিক ওজন, দৈহিক শ্রমের পরিমাণ, জলবায়ু ইত্যাদি অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। কাজেই কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের ক্যালরীর প্রয়োজনীয়তা কত, তা জানতে হলে যে সব বিষয় ক্যালরীর প্রয়োজনীয়তার উপর প্রভাব বিস্তার করে, যেমন পূর্ব কথিত দৈহিক ওজন, দৈহিক শ্রমের পরিমাণ ইত্যাদি), সে সব বিষয়ের উপর পূর্বে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। উপজাতীয় অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির বিস্তৃত তথ্য সংগৃহীত হয় নি। তবুও মোটামোটি বলা চলে যে, আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ প্রতি ক্যালরীর প্রয়োজনীয়তা ২৬০০ থেকে ২৮০০ ক্যালরী। ক্যালরীর প্রয়োজনীয়তার এই মান অনুযায়ী নকটে নাগারা ছাড়া উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব ভারতের সমস্ত উপজাতিই দেহের প্রয়োজনীয় ক্যালরী পেয়ে থাকে। মধ্য ভারতের উপজাতিরাও (বাইগা, গন্দ, মুরিয়া) দেহের প্রয়োজনীয় ক্যালরী পেয়ে থাকে। অঞ্চল হিসাবে ক্যালোরীর অভাব দেখা যায় দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের উপজাতিদের ভিতর। এগারটি উপজাতির মধ্যে মাত্র চারটি উপজাতি প্রয়োজনীয় ক্যালরী পেয়ে থাকে। এই চারটি ছাড়া এই অঞ্চলের অন্যান্য উপজাতির ক্যালরী গ্রহণের পরিমাণ ১৮৫০ থেকে ২৪৫০। গ্রেট নিকোবরের নিকোবরীরা তাদের খাদ্য থেকে দেহের প্রয়োজনীয় ক্যালরী পায়।

প্রোটিন

পুষ্টি-বিজ্ঞানীদের মতে, পূর্ণবয়স্কদের প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে দেহের প্রতি কিলোগ্র্যাম ওজন প্রতি ১ গ্র্যাম। একজন পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় পুরুষের আদর্শ ওজন গড়ে ৫৫ কেজি বলে ধরা হয়ে থাকে। এই হিসাবে পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় পুরুষের প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে ৫৫ গ্র্যাম। যে বাইশটি উপজাতির খাদ্য নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে, তাদের প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণের ভিতর বিপুল অসাম্য দেখা যায় (দৈনিক পূর্ণবয়স্ক প্রতি ১৩ গ্র্যাম থেকে ১৩০ গ্র্যাম)। সাতটি উপজাতি তাদের দৈনিক খাদ্য থেকে যে প্রোটিন পায়, তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এই সমস্ত উপজাতি প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত, বিশেষ করে কেরালার অধিবাসী। উত্তর-পশ্চিম ভারতের উপজাতির খাদ্যেও প্রোটিনের বিশেষ ঘাটতি রয়েছে। প্রধান খাদ্য হিসাবে কন্দ জাতীয় (ট্যাপিওকা ও কচুজাতীয়) খাদ্যের উপর নির্ভর করবার জন্যেই এই সমস্ত উপজাতির খাদ্যে প্রোটিনের ঘাটতি দেখা যায়। শস্যজাতীয় খাদ্যের তুলনায় মূল বা কন্দজাতীয় খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কম থাকে। ১০০ ক্যালরী শক্তি পাওয়া যায়, এমন পরিমাণ

ট্যাপিওকা, চাল, বাগি এবং আটা থেকে যথাক্রমে ০'৪ গ্র্যাম, ১০৯ গ্র্যাম, ২'০ গ্র্যাম ও ৩'৪ গ্র্যাম প্রোটিন পাওয়া যায়। এই কন্দ বা মূলজাতীয় খাদ্যও তারা পেট ভরে খেতে পায় না। পেট ভরে খেলে কন্দজাতীয় খাদ্য থেকেই যে পরিমাণ প্রোটিন তারা পেত, পেট ভরে না খাওয়ার দরুণ তাও তারা পায় না। ট্যাপিওকার প্রোটিনের গুণগত উৎকর্ষও সাধারণ শস্যজাতীয় খাদ্যের প্রোটিনের গুণগত উৎকর্ষের চেয়ে কম। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে যে, ট্যাপিওকা বা ঐ রকম কন্দজাতীয় খাদ্য পৃথিবীর বহু অঞ্চলের আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রধান খাদ্য। ঐ কন্দজাতীয় খাদ্য বহুল পরিমাণে গ্রহণ করবার দরুণ ঐ সমস্ত দেশের অধিবাসীদের খাদ্যে বহুল পরিমাণে প্রোটিনের অভাব দেখা যায়।

সাধারণভাবে বলা যায়, আদিবাসীদের খাদ্যে প্রাণিজ প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কম থাকে—পূর্ণবয়স্ক পুরুষ প্রতি ১ থেকে ১০ গ্র্যাম, গড়ে মোট প্রোটিনের শতকরা ৭/৮ ভাগের মত। বনে-জঙ্গলে বাস করলেও আদিবাসীরা বন্য পশুপাখীর মাংস যে খুব একটা খেতে পায় না, তা এই তথ্য থেকেই বোঝা যায়। তবে বিশেষ দুটি উপজাতির প্রাণিজ প্রোটিন খাওয়ার পরিমাণ বেশী। এই দুটি উপজাতি হচ্ছে টোডা ও গ্রেট নিকোবরী। পূর্ণবয়স্ক প্রতিটি পুরুষ টোডার প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণ ৭৫ গ্র্যামের মত। এই প্রোটিনের শতকরা ৪০ ভাগ দুধ থেকে পেয়ে থাকে। গ্রেট নিকোবরের নিকোবরীরা দৈনিক প্রতিটি পুরুষ গড়ে ১৩০ গ্র্যাম প্রোটিন পেয়ে থাকে এবং এই প্রোটিনের শতকরা ৮০ ভাগই বা প্রায় ১০৩ গ্র্যাম প্রাণিজ প্রোটিন। ভারতের কোন জনগোষ্ঠী তো নয়ই, শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত ও ঐশ্বর্যশালী পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও সচরাচর এতটা প্রাণিজ প্রোটিন খাওয়া হয় না। নিকোবরীরা প্রাণিজ প্রোটিনের অধিকাংশই পায় সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর মাংস থেকে। গ্রেট নিকোবরের একজন পূর্ণবয়স্ক নিকোবরী পুরুষ দৈনিক প্রায় এক কেজি করে মাছ-মাংস খেয়ে থাকে।

ক্যালসিয়াম

দৈনিক পূর্ণবয়স্ক প্রতিটি পুরুষের ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা ০'৮ গ্র্যাম বলে ধরা যায়। উপরিউক্ত বাইশটি উপজাতির মধ্যে মাত্র তিনটি উপজাতি তাদের খাদ্য থেকে দেহের প্রয়োজনীয় ক্যালোরি পেয়ে থাকে। এরা হচ্ছে নীলগিরির টোডা, গ্রেট নিকোবরের নিকোবরী, অ্যাবোর শৈলশ্রেণীর অ্যাবোর উপজাতি। অধিকাংশ উপজাতির দৈনিক ক্যালসিয়াম গ্রহণের পরিমাণ ০'৫ গ্র্যামের বেশী নয়। শস্য, বিশেষ করে চালে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কম থাকে। আদিবাসীরা তাদের খাদ্য থেকে যে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করে, তা প্রধানতঃ শাকসব্জী থেকেই আসে। যে অঞ্চলে শাকসব্জী বেশী মিলে না, সেই অঞ্চলের আদিবাসীদের খাদ্যে ক্যালসিয়ামের অভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। শাকসব্জী খুব একটা না খেলেও দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে খাওয়ার জন্যে টোডাদের খাদ্যে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা যায় না। নিকো-বরীদের খাদ্যেও শাকসব্জী এক রকম নেই। তারা মাছ-মাংস এবং প্যাণ্ডেনাস থেকেই দেহের প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম নিয়ে থাকে।

লৌহ

পূর্ণবয়স্ক লোকের দৈনিক ২০ থেকে ৩০ মিলি-গ্র্যাম লৌহের প্রয়োজন বলে ধরা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কয়েকটি উপজাতির খাদ্যে লৌহের কিছু ঘাটতি দেখা যায়। অন্যান্য অঞ্চলের উপজাতিদের খাদ্যে লৌহের ঘাটতি তেমন একটা দেখা যায় না।

ভিটামিন-এ

ভিটামিন-এ'র প্রধান উৎস মাখন, বিশেষ করে গোদুগ্ধের মাখন, ডিম, মাছ ও যকৃৎ। উপজাতি-অধ্যুষিত প্রায় প্রতি অঞ্চলেই এই খাদ্যবস্তুগুলি দুষ্প্রাপ্য। সৌভাগ্যের বিষয় ভিটামিন-এ'র সঙ্গে রাসায়নিক সম্পর্কযুক্ত ক্যারোটিন নামে এক জাতীয় দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে খেলেও ভিটামিন-এ'র চাহিদা মিটানো যায়। দেহে ক্যারোটিন ভিটামিন-'এ-তে রূপান্তরিত হয়। ক্যারোটিনের প্রধান উৎস শাকসব্জী। এমন অনেক শাকসব্জী (যেমন নটেশাক) আছে, ভিটামিন-এ-র পুষ্টিমান অনুযায়ী যে সবের পুষ্টিমূল্য গোদুগ্ধের চেয়েও অনেক বেশী। সে সব শাকসব্জীর উপরেই আদিবাসীরা (ভারতের সাধারণ অধিবাসীরাও) তাদের দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিনের জন্যে নির্ভরশীল। তবুও আলোচিত বিভিন্ন উপজাতিদের মোট সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন-এ পায় না। বেশীর ভাগ উপজাতিই শাকসব্জী প্রচুর পরিমাণে খেতে পায় না বা খায় না। খাদ্যে ভিটামিন-এ'র অভাব সবচেয়ে বেশী দেখা যায় দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের উপজাতিদের মধ্যে।

ভিটামিন-বি$_1$ (থিয়ামিন) ও ভিটামিন-বি$_2$ (রাইবোফ্লেবিন)

সিদ্ধ চাল বা শস্যজাতীয় বস্তু যাদের প্রধান খাদ্য, তারা যদি পেট ভরে খেতে পায় অর্থাৎ তাদের খাদ্যে যদি ক্যালোরীর ঘাট্‌তি না থাকে, তবে তাদের খাদ্যে সাধারণতঃ ভিটামিন-বি$_1$-এর ঘাট্‌তি হয় না। দক্ষিণ ভারতের তিনটি উপজাতি ছাড়া অন্যান্য উপজাতির খাদ্যে ভিটামিন-বি$_1$-এর অভাব এক রকম নেই।

রাইবোফ্লেবিন বেশী পরিমাণে রয়েছে দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাদ্যে। তুলনায় শস্যজাতীয় খাদ্যে এই ভিটামিনের পরিমাণ কম থাকে। টোডা এবং গ্রেট নিকোবরের নিকোবরীদের খাদ্য ছাড়া আর সমস্ত উপজাতিদের মধ্যেই রাইবোফ্লেবিনের অভাব খুব বেশী দেখা যায়। টোডারা প্রধানতঃ দুধ থেকে আর নিকোবরীরা সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর মাংস থেকে তাদের দেহের প্রয়োজনীয় রাইবোফ্লেবিন পেয়ে থাকে।

নিকোটিনিক অ্যাসিড বা নিয়াসিন

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কয়েকটি উপজাতি ছাড়া উপজাতিদের খাদ্যে নিয়াসিনের অভাব দেখা যায় না। চাল ও শস্যজাতীয় খাদ্য থেকেই প্রধানতঃ নিয়াসিন পাওয়া যায়।

ভিটামিন-সি

ভিটামিন-সি-এর প্রধান উৎস শাকসব্জী ও ফল। অধিকাংশ আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলে শাকসব্জী পর্যাপ্ত না খাওয়াতে এবং ফল এক রকম না খাওয়াতে তাদের খাদ্যে সাধারণতঃ ভিটামিন-সি-এর অভাব দেখা যায়। মাত্র সাতটি উপজাতি তাদের খাদ্য থেকে দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন-সি পেয়ে থাকে।

ভারতের আদিবাসী ও সাধারণ অধিবাসীদের খাদ্যের পুষ্টিমানের তুলনা

আদিবাসীদের খাদ্যের পুষ্টিমূল্য সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করেছি, তার মূল কথা হচ্ছে, গ্রেট নিকোবরের নিকোবরী ছাড়া সমীক্ষিত উপজাতিগুলির মধ্যে এমন একটি উপজাতিও নেই, যে উপজাতির লোকেরা তাদের খাদ্য থেকে সমস্ত পুষ্টিউপাদানগুলি উপযুক্ত পরিমাণে পেয়ে থাকে। এমন একটি উপজাতিও নেই, যাদের খাদ্য পুষ্টিমূল্যের দিক্‌ থেকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলা চলে। যদিও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পাদাম, অ্যাবোর

এবং নীলগিরির টোডাদের খাদ্য নিকোবরী ছাড়া অন্যান্য উপজাতিদের খাদ্য থেকে উৎকৃষ্টতর। সাধারণভাবে বলা চলে, আদিবাসীদের খাদ্যে প্রাণিজ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-বি$_2$, ভিটামিন-সি এবং ভিটামিন-এ-র অভাব বহুল পরিমাণেই রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের, বিশেষ করে কেরালার অধিকাংশ উপজাতির খাদ্যে মূল পুষ্টি-উপাদান ক্যালোরী ও প্রোটিনের বহুল অভাব রয়েছে। এই অঞ্চলের অধিকাংশই উপজাতিই পেটভরে খেতে পায় না।

গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীদের খাদ্য সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করে তাদের খাদ্যের পুষ্টিমূল্যের যে ছবি পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, আদিবাসীদের খাদ্যের মত ভারতের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীদের খাদ্যেরও প্রাণিজ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন বি$_2$-এর বহুল অভাব রয়েছে। ভিটামিন-সি এবং ভিটামিন-এ'র অভাবও বহু রাজ্যের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়েই রয়েছে। কয়েকটি রাজ্যে, বিশেষ করে কেরালা ও মাদ্রাজের সাধারণ অধিবাসীদের খাদ্যে ক্যালোরীর অভাবও রয়েছে। আমরা দেখেছি, এই অঞ্চলের অধিকাংশ উপজাতির খাদ্যে ক্যালোরীর অভাব রয়েছে। উপজাতিদের খাদ্যে ক্যালোরীর অভাব আরও বেশী।

উপসংহার

গ্রেট নিকোবরের নিকোবরী, নীলগিরির টোডা ও অ্যাবোর শৈলমালার অ্যাবোর উপজাতির কথা বাদ দিলে একথা বলা চলে যে, পুষ্টিমূল্যের বিচারে ভারতের আদিবাসীদের খাদ্য কোনক্রমেই ভারতের সাধারণ অধিবাসীদের খাদ্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর নয়। বরং বলা চলে যে, ভারতের সাধারণ অধিবাসীদের খাদ্যের মত আদিবাসীদের খাদ্যও খুবই নিম্ন মানের। প্রকৃতির সন্তান হয়ে প্রকৃতির কোলে বিচরণ করলেও তারা খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে জর্জরিত ভারতবাসীদের একটি অংশমাত্র। ভারতের সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টির যে বিরাট সমস্যা রয়েছে, সে সমস্যা ভারতের আদিবাসীদের মধ্যেও রয়েছে। যাদের জীবনে খাদ্য ও পুষ্টির বিরাট সমস্যা রয়েছে, তাদের জীবন হাসি, নাচ ও গানে ভরে থাকতে পারে না—আদিবাসীদের জীবনও তাতে ভরে নেই। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সাধারণভাবে তাদের দেহ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও অঙ্গসৌষ্ঠব নয়নাভিরাম নয়—যাদের খাদ্যের পুষ্টিমূল্য অতি নিম্ন মানের, তাদের দেহের গঠন ঐ রকম হতে পারে না। আদিবাসীদের দেহগঠনের উপর বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা করবার মত কিছু কিছু উপাদান রয়েছে, কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে সে আলোচনা করবার অবকাশ নেই।

গ্রেট নিকোবরের নিকোবরীদের খাদ্যের পুষ্টিমূল্য সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করে এই নিবন্ধ শেষ করা হবে। আমরা দেখেছি, প্রতিটি পুষ্টি-উপাদানই গ্রেট নিকোবরীদের খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। পুষ্টির দিক থেকে এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর খাদ্য ভারতের উপজাতির অন্তর্গত কোন জনগোষ্ঠীরই নেই। পুষ্টির নিরীখে নিকোবরীদের খাদ্য পাশ্চাত্য দেশের সমৃদ্ধিশালী দেশগুলির অধিবাসীদের খাদ্যের সঙ্গে তুলনীয়।

সঞ্চয়ন

পৃথিবী থেকে বসন্ত রোগ উচ্ছেদের উদ্যোগ

প্রতি বছরেই ভারতের কোন না কোন অঞ্চলে বসন্ত রোগ দেখা দেয়, আর হাজার হাজার লোক মরে। সারা পৃথিবীতে যত লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়, তার তিন-চতুর্থাংশই হচ্ছে ভারতীয়, ইন্দোনেশীয় ও পাকিস্তানী। এই তিনটি রাষ্ট্রেই এই রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী। ভারতে ১৯৬৫ সালে ৩০ হাজার আর '৬৭ সালে ৫০ হাজার লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

অতীত ইতিহাসে দেখা যায়, এই ভীষণ মারাত্মক ও সংক্রামক ব্যাধিতে বহু দেশ উচ্ছন্ন হয়ে গেছে, গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়ে গেছে। এমন কি, কোন কোন রাজ্যের পতনও ঘটেছে এই ব্যাধিতে। অনেকেই মনে করেন খৃষ্টের জন্মের ৩১২ বছর আগে রোমে যে বসন্ত রোগ মারীরূপে দেখা দিয়েছিল, তাই রচনা করেছিল সেই বিরাট সাম্রাজ্যের পতনের প্রশস্ত পথ। এই মারাত্মক ব্যাধি ঐ রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে সম্পূর্ণ অচল করে দিয়েছিল। কত হাজার লোকের যে এই রোগে মৃত্যু ঘটেছিল, তার হিসাব নেই। তারপর স্পেনের অধিবাসীরা সহজেই যে তাদের বিজয় রথ মেক্সিকোর উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার কারণও এই ভীষণ ব্যাধি। ঐ রোগে ঐ দেশের ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। তাই সেই বিজয় অভিযান আর বাধা পায় নি।

এই রোগ বহুকালের। মিশরের সম্রাট পঞ্চম র‍্যামেসিসের মৃতদেহটি ৩০০০ বছরের প্রাচীন। তার ঐ মামী বা মৃতদেহের মুখে ও ঘাড়ে ঐ রোগের চিহ্ন বর্তমান। তারপর পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই রোগের প্রকোপ দেখা গেছে এবং ১৭৯৬ সালে এই রোগের টিকা আবিষ্কৃত হবার পূর্ব পর্যন্ত নানা দেশেই রাজা, মহারাজাসহ বহু লোকের মৃত্যু ঘটেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের নানা দেশের প্রায় ৬ কোটি লোকের এই রোগে মৃত্যু ঘটে। অষ্ট্রিয়ার রাজবংশের ১১ জনেরই মৃত্যু ঘটেছিল এই রোগে। আর ইংল্যাণ্ডের রাণী দ্বিতীয় মেরীও এই রোগেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। ১৭০৭ সালে আইসল্যাণ্ডে দেখা যায়, ঐ দেশের শতকরা ৪০ জনেরই এই রোগে মৃত্যু ঘটেছে। ঐ বছরে প্যারিসে মৃত্যু হয়েছিল ১৪ হাজার ফরাসীর। ভারতে এই রোগে মৃত্যুর হার যে খুবই বেশী, তা আগেই বলা হয়েছে। তবে পূর্বের তুলনায় কম। ১৭৭০ সালে ভারতে ৩০ লক্ষ লোক এই রোগে প্রাণ হারিয়েছিল।

এই সংক্রামক ব্যাধি যখন মহামারীরূপে দেখা দিত, তখন চিকিৎসকদের কোন উপায় ফলবতী হতো না। যে কেউ এই রোগে আক্রান্ত হতো, তার মৃত্যু প্রায় অবধারিতই ছিল। এই রোগের কারণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় বের করলেন বৃটিশ চিকিৎসক এডোয়ার্ড জেনার। ১৭৯৬ সালে এই রোগের টিকা আবিষ্কার করে তিনি বাঁচবার পথের সন্ধান দেন।

দু-শতাব্দী হয় এই টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে এই রোগের মৃত্যুর হার হ্রাস পেলেও প্রতি বছর এই রোগে ৬০,০০০ ব্যক্তি আক্রান্ত হয় এবং তাতে ২৫ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী। ইউরোপ, উত্তর ও মধ্য আমেরিকা, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এলাকার রাষ্ট্রসমূহে এই রোগ দেখা যায় না। তবে সারাওয়াকে ৪০ বছর পরে ৭ ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

এই রোগের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হবার ১২ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ—জ্বর, কোমর ব্যথা, বমি করবার ইচ্ছা প্রভৃতি দেখা দেয়। তারপর দেহে গুটি দেখা দেয়। কিন্তু রোগের লক্ষণ দেখা দেবার পূর্ব থেকে রোগী শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে রোগ-বীজাণু ছড়াতে থাকে। এই রোগে প্রায় তিন সপ্তাহ ভুগতে হয়। যারা বেঁচে থাকে, তাদের দেহে এমন দাগ হয় যে, সারা জীবনে ওঠে না। অনেকের চোখ নষ্ট হয়ে যায়, সারা জীবনের জন্যে তারা অন্ধ হয়ে থাকে।

এই মারাত্মক ব্যাধির এখন পর্যন্ত বিশেষ কোন চিকিৎসা-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় নি। এক টিকা ছাড়া এই রোগ প্রতিরোধ করবার আর কোন উপায় নেই। তবে টিকা দেবার নতুন যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টায় এক হাজার লোককে টিকা দেওয়া যায়। এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হওয়ায় আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহে এই রোগ উচ্ছেদ করবার পথ অনেকখানি প্রশস্ত হয়েছে। ১৯৬৭ সালে আফ্রিকার ২০টি দেশের ২ কোটি ৫০ লক্ষ ব্যক্তিকে এই পদ্ধতিতে টিকা দেওয়া হয়েছে।

১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ১১ কোটি আফ্রিকাবাসীদের টিকা দেবার পরিকল্পনা মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা গ্রহণ করেছেন। এর ব্যয়ভার তারাই বহন করছেন। এই ব্যবস্থায় টিকা দেবার যন্ত্রটিকে বাম বাহুর মাংসল স্থানে বসিয়ে টিপে দেওয়া মাত্র টিকার বীজ চামড়া ভেদ করে ঐ ব্যক্তির রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এতে কোন ব্যথা-বেদনা হয় না, কোন জ্বালা-যন্ত্রণাও নেই। খরচও খুবই কম।

রাষ্ট্র সংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই রোগ নির্মূল করা সম্পর্কে বলেছেন যে, সমগ্র বিশ্বেই এই রোগ উচ্ছেদ করবার জন্যে উদ্যোগী হতে হবে, সর্বদাই সজাগ থাকতে হবে এবং এক দিনের জন্যেও বসে থাকলে চলবে না।

বর্তমানে বিমানে চলাচল করবার যুগে পৃথিবীর একপ্রান্তে এই রোগ দেখা দিলে যাত্রীদের মাধ্যমে এই রোগের বীজাণু অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা রয়েছে।

সুতরাং পৃথিবীর কোন প্রান্তে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে অন্যান্য স্থানের লোকেরাও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এই রোগ সংক্রামক ব্যাধিরূপে দেখা দেবার পূর্বেই টিকা দেবার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য।

১৯৭৬ সালের মধ্যে এই রোগ উচ্ছেদ করবার যে পরিকল্পনা করা করা হয়েছে, তা পুরাপুরি কার্যকরী করা হলে সমগ্র আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সীমিত ক্ষেত্রে যে কতখানি ফলপ্রসূ হতে পারে, তাও প্রমাণিত হবে।

হোভারক্র্যাফ্‌টে চড়ে অজানার সন্ধানে

দক্ষিণ আমেরিকার এক অভূতপূর্ব অভিযানে পৃথিবীর সর্বাধুনিক যান হোভারক্র্যাফ্‌ট ব্যবহৃত হয়েছে।

বৃটেনে উদ্ভাবিত হোভারক্র্যাফ্‌টের চাকার প্রয়োজন হয় না, এয়ার কুশনের উপর ভর দিয়ে এটি চলে। সে জন্যে নদী বা নৌকা

যেখানে অচল, সেখানে হোভারক্র্যাফট্‌ই একমাত্র যান। ১৮ জন লোকের একটি দল এই অত্যাশ্চর্য যানে চড়ে নেগ্রো নদী ও অরিনকো নদী অভিযান করেন।

এই অঞ্চলের বন্ধুর নদীখাত ও জলা ইত্যাদির জন্যে যে কোন যানের পক্ষে অভিযান চালানো খুবই বিপজ্জনক হতো এবং সময় লাগতো কয়েক মাস। হোভারক্র্যাফ্‌ট খাদ, পাহাড় ও যে কোন ধরণের জমির পার দিয়ে চলাচল করতে পারে। এই অভিযানে হোভারক্র্যাফ্‌টের সময় লেগেছে এক মাসের কিছু বেশী।

হোভারক্র্যাফ্‌টে করে এটাই প্রথম অভিযান। অভিযাত্রী দলে ছিলেন লেখক, ক্যামেরাম্যান, বিজ্ঞানী ইত্যাদি। তাঁরা এমন সব জায়গা নিজেদের চোখে দেখেন, যে সব জায়গা ইতিপূর্বে মানুষ দেখে নি। জঙ্গলের মধ্যে তাঁরা এমন সব অজানা গাছ লক্ষ্য করেন, যা ভেষজবিজ্ঞানে কাজে লাগবে। যে সব ফল, ফুল, গাছপালা আমরা প্রতিদিন আমাদের চারদিকে দেখে থাকি, তার অনেকগুলিই তো অতীতে পরিচালিত কোন না কোন অভিযানের ফসল।

মাত্র ১০-১৫ বছর হলো হোভারক্র্যাফ্‌ট বৃটেনে উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু এই আমাজন অভিযান প্রমাণ করলো—এর পর থেকে হোভারক্র্যাফ্‌টই হবে অভিযাত্রীদের একমাত্র বাহন। আমাজনের এই বিপদ সঙ্কুল পথে পূর্ববর্তী অভিযানগুলিতে ৩০ জনেরও বেশী অভিযাত্রী মারা যান।

ছোটখাটো সমুদ্রযাত্রায় হোভারক্র্যাফ্‌ট ব্যবহৃত হচ্ছে। দক্ষিণ আমেরিকা, ইংলিশ চ্যানেল, ক্যানাডা এবং ভূমধ্যসাগরে এই যান চলছে। প্রহরী নৌকা হিসাবে ব্যবহার করবার উদ্দেশ্যে হোভারক্র্যাফ্‌টের অর্ডার দিয়ে বৃটিশ সরকার হোভারক্র্যাফ্‌টের নির্ভরযোগ্যতায় আস্থা প্রকাশ করেছেন।

হোভারক্র্যাফটের পরবর্তী পদক্ষেপ হোভারট্রেন, যা বিশেষ ধরণের ট্র্যাকের উপর দিয়ে চলবে এবং অতি উচ্চগতিসম্পন্ন হবে।

ভিজা শস্য সংরক্ষণের নতুন পদ্ধতি

সম্প্রতি উত্তর ইউরোপের উপর দিয়ে যে প্রবল ঝঞ্ঝা বয়ে গেল, তার দুর্ভোগের যথাযথ অংশ বৃটেনকেও নিতে হয়েছে। ফলে এদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকেরা তাঁদের বিপুল ফসল পেয়েছেন এক অবাঞ্ছিত অবস্থায়। এটা প্রায় নিশ্চিত যে, এবারে সুষ্ঠুভাবে শস্য সংগ্রহ করা সহজ হবে না এবং সংগৃহীত শস্যও সমমাত্রায় পাকা এবং শুষ্ক অবস্থায় পাওয়া যাবে না।

তবে ভিজা শস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের নতুন উপায়ও বের হয়েছে।

ভিজা শস্যকে না শুকিয়েই সংরক্ষিত করবার কয়েকটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই শস্যকে রেফ্রিজারেটরে রাখা চলতে পারে অথবা বায়ুহীন সিলোতে রাখলেও জীবাণুদুষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না।

বর্তমানে ভিজা শস্য সংরক্ষণের একটি বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়েছে। এটি যে কোন ধরণের সংরক্ষণাগারে ব্যবহার করা চলবে বলে দাবী করা হয়েছে।

এই রাসায়নিক দ্রব্যটি হলো প্রোপ্রিয়নিক (Proprionic) অ্যাসিড, এটি রোমন্থনকারী পশুর পাকস্থলীতে পাওয়া যায় এবং অন্যান্য পশুর পক্ষেও নিরাপদ। বর্তমানে এটি প্রচুর পরিমাণে তৈরি হচ্ছে।

ভিজা শস্য এই অ্যাসিড শুষে নেয় এবং তা দীর্ঘ দিনের জন্যে জীবাণু, রোগ ও পোকা-মুক্ত থাকে। যে কোন মাত্রায় ভিজা শস্য মেঝের উপর ঢেলে রাখা যেতে পারে। অ্যাসিড-মিশ্রিত শস্য গুদাম থেকে বের করে নেবার পরও জীবাণুমুক্ত থাকে।

শস্যের জলের পরিমাণ হিসাব করে ০'৫ ১'০ শতাংশ (ওজনে) অ্যাসিড প্রয়োগ করতে হয়। অ্যাসিড ও শস্য ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হয়। এজন্যে সরঞ্জাম ও যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে।

বিভিন্ন কৃষকের প্রয়োজন মেটাতে চারটি স্প্রেইং মেসিন ইতিমধ্যেই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। একটি বিন থেকে যখন শস্যের স্রোত ঝরতে থাকে, তখন এই মেশিন থেকে অ্যাসিড স্প্রে করে তা এমনভাবে ঘোরানো হয়, যাতে অ্যাসিড ও শস্য ভালভাবে মেশে।

এই অ্যাসিডের উৎপাদক বি-পি কেমিক্যাল্‌স্‌ (ইউ-কে) লিমিটেড দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এই পদ্ধতি পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হবে।

তাদের পরীক্ষায় দেখা যায়, এভাবে অ্যাসিড-মিশ্রিত শস্য সকল রকমের পশু—গরু, ঘোষ, শূকর, মুরগীর পক্ষে উপযোগী। এভাবে পাওয়া শস্যবীজ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে না, কারণ এই পদ্ধতিতে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ব্যাহত হয়।

এই শস্য যাতে মানুষের পক্ষেও উপযোগী করে তোলা যায়, তার জন্যে চেষ্টা চলছে। বর্তমানে অবশ্য এই অ্যাসিড-মিশ্রিত শস্য শুধু পশুদের জন্যে সুপারিশ করা হয়েছে।

পঙ্গপালের আক্রমণ প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা

দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব আফ্রিকায় কৃষি ফসলের পক্ষে বিপজ্জনক পঙ্গপালের আক্রমণ রোধ করবার জন্যে বিশ্বের সর্বত্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচেষ্টা চলছে।

মে মাসে একবার জরুরী পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। ঐ সময় ইথিওপিয়ায় অবস্থিত মার্কিন মিশন ২০ ঝাঁক পঙ্গপাল প্রত্যক্ষ করেছে বলে সংবাদ দেয়।

জুন মাসের প্রথম দিকে সোমালি সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ প্রায় ৬০ ঝাঁক পঙ্গপাল দেখেছেন বলে জানান।

১১ই জুন শস্যখাদক পঙ্গপাল পশ্চিম ও মধ্য আরবের উপত্যকা ও পার্বত্য অঞ্চলের উপর দিয়ে যায়। এই অঞ্চলে এরূপ বিপুল সংখ্যক পঙ্গপাল বহু বছরের মধ্যে দেখা যায় নি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন অফিসার মামুদ আল তাজি বলেন, পঙ্গপাল শস্যের পক্ষে গুরুতর বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইরান, মরিতানিয়া, মালি, নাইগার এবং মরক্কো, আলজিরিয়া সীমান্তের উভয় দিকেও পঙ্গপালের ঝাঁক দেখা গেছে।

প্রতি বছরেই কোন না কোন স্থানে পঙ্গপালের আক্রমণ আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এই বছর একই সঙ্গে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে এবং অতিরিক্ত গরম আবহাওয়ার দরুণ পঙ্গপালের জন্মের পক্ষে আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং পঙ্গপালের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেনেগাল থেকে পূর্ব পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত পঙ্গপাল বলয়ে যে সব কৃষি অঞ্চল রয়েছে, সেগুলি পঙ্গপালের আক্রমণ আশঙ্কায় সব সময়েই বিপন্ন বোধ করে।

মার্কিন কৃষি দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত করেন

এগ্রিকালচার পত্রিকার ২৪শে জুন সংখ্যায় বলা হয়েছে: পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রিত না হলে বহু দেশের শস্য বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ঐ পত্রিকাটিতেই বলা হয়েছে, বর্তমানে যে সব পঙ্গপাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলি ভারত, পাকিস্তান, ইরান, সুদান, সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র, ইয়েমেন, দক্ষিণ ইয়েমেন, ইথিওপিয়া ও আরও অনেক দেশের শস্যের ক্ষতি করতে পারে।

ভারত গত বছরের দুর্ভিক্ষ থেকে সবে সামলে উঠছে। এই বছর জুলাই মাসে পঙ্গপালের আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় ভারতে কৃষি-শস্য রক্ষার প্রস্তুতি চলছে। পঙ্গপালের এই আক্রমণ ভারতের পক্ষে খুবই একটা সঙ্কটজনক সময়ে দেখা দিয়েছে। কারণ ১৯৭১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার জন্যে এবং বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করবার জন্যে ভারত চেষ্টা করছে।

অবশ্য জরুরী অবস্থা এখনও বিপর্যয়ের পর্যায়ে এসে পৌঁছয় নি ঠিকই, তবে বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতি খুব শীঘ্রই দেখা দেবার সম্ভাবনা আছে।

পঙ্গপাল প্রতিরোধ ব্যবস্থার পুরোভাগে রয়েছেন বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও বিমানের পাইলটেরা। এঁরা পূর্ব আফ্রিকার মরুভূমিতে পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ সংস্থার (ডেজার্ট লোকাষ্ট কন্ট্রোল অরগ্যানাইজেসন) পক্ষে কাজ করেন। ইথিওপিয়ার আসমারায় এই সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত। ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, কেনিয়া, উগাণ্ডা, তানজানিয়া এবং পূর্বতন ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের সদস্য-প্রতিনিধিদের দ্বারা এই সংস্থা গঠিত।

ছয়টি আন্তর্জাতিক সংস্থাও পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টায় যোগ দিয়েছে। পঙ্গপালের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযান সুরু হয়েছে অন্ততঃ দু'হাজার বছর আগে। অধিকতর শক্তিশালী কীটঘ্ন ওষুধের উপর ক্রমেই বেশী করে জোর দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে যে সকল নতুন কীটঘ্ন ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে প্রতি গ্যালনে ৩০ লক্ষ পঙ্গপাল ধ্বংস করা যায়।

পঙ্গপাল বিধ্বস্ত করবার কাজে নতুন নতুন প্রক্রিয়াও অবলম্বন করা হচ্ছে। সাম্প্রতিকতম পদ্ধতিটি হলো বিমান থেকে খুব নীচে নেমে স্প্রে করা। এই পদ্ধতিতে কীটঘ্ন ওষুধের সলিউশন অতি সূক্ষ্ম কণায় পরিণত করা হয়।

আলোর চেয়ে দ্রুতগামী কণিকার সন্ধানে

কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

সবচেয়ে দ্রুতগামী কণিকা কি? আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদ অনুযায়ী আলোর গতিবেগই সবচেয়ে বেশী। কোন বস্তু কণিকাই আলোর গতিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু কিছুদিন হলো তত্ত্বীয় পদার্থ-বৈজ্ঞানিক মহলে শোনা যাচ্ছে যে, আলোর চেয়ে দ্রুতগামী কণিকার অস্তিত্ব নাকি তাঁরা প্রমাণ করেছেন। সত্যি ব্যাপারটা একটু সাড়া-জাগানো। এই ধরণের সম্ভাবনার কথা আইনষ্টাইনের যুগে লোকে মজা করবার জন্যেই চিন্তা করতো। যেমন—এক কবি মজা করে লিখেছেন—

"There was a young girl named miss Bright
Who could travel faster than light.
She departed one day,
In an Einsteinian way,
And came back on the previous night"

মিস ব্রাইটের যাত্রা কবির অলস কল্পনা। কিন্তু একালের বৈজ্ঞানিকের সাধনা যদি সফল হয়, তবে সত্যি আমরা কালকের ঘটনা আজকে প্রত্যক্ষ করতে পারবো। এসব কথা চিন্তা করতে আনন্দ লাগে, আরও আনন্দ লাগে এই ভাবতে যে, এক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ই. সি. জি. সুদর্শন (বর্তমানে আমেরিকায় গবেষণারত) এই বিষয়ে অক্লান্ত কাজ করে চলেছেন।

আলোর চেয়ে দ্রুতগামী কণিকা বা Superphotic particle সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদের দু-চারটি কথা বলে নিলে ভাল হয়।

আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মূল সিদ্ধান্তটি হলো—কোন বস্তুর গতি কখনো অপর-নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়—সব রকম গতিই আপেক্ষিক। কোন একটি বস্তুর গতি যদি A-র তুলনায় v এবং B-এর তুলনায় v' হয়, তাহলে বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী—

$$v' = \frac{v - u}{1 - \frac{vu}{c^2}}$$

u → A এবং B-এর আপেক্ষিক গতিবেগ।

c → আলোর গতিবেগ।

উপরের সমীকরণটিতে যদি v = c লিখি তাহলে

$$v' = \frac{c - u}{1 - \frac{cu}{c^2}} = c,$$

অর্থাৎ আলোর গতিবেগ ধ্রুব। যে কোন 'Frame of reference' থেকেই মাপি না কেন, তা একই থাকবে।

আমাদের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী বস্তুর ভর বা massও একটি ধ্রুবরাশি। কিন্তু বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদ বলে যে, বস্তুর ভর তার গতিবেগের সঙ্গে বেড়ে যায়। কোন বস্তুর ভর m এবং তার গতিবেগ v হলে বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদ অনুযায়ী—

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \text{.........} (১)$$

m_0 হচ্ছে rest mass (স্থিতিভর)। কোন বস্তুর আপেক্ষিক গতি যদি শূন্য হয় অর্থাৎ কোন বিশেষ 'Frame of reference' অনুযায়ী যদি বস্তুটি স্থির হয়, তবে তার তখনকার ভরকেই

আমরা স্থিতিভর বলি। সাধারণ বস্তুর গতি আলোর গতি অপেক্ষা খুবই কম; সুতরাং $\frac{v^2}{c^2}$-এর মানও খুবই তুচ্ছ এবং একে আমরা শূন্য বলে ধরতে পারি। ১নং সমীকরণে দেখি $\frac{v^2}{c^2}$ তুচ্ছ হলে $m = m_0$ হয়। সুতরাং ভর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সাধারণ বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু যে সব বস্তুর গতিবেগকে আলোর গতিবেগের সঙ্গে তুলনা করা যায় (যেমন—মৌলিক কণিকা (Elementary particle) তাদের জন্যে $\frac{v^2}{c^2}$-এর মান একের চেয়ে কম, কিন্তু শূন্য নয়। কাজেই ১নং সমীকরণ এবং বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদ এদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

এবার এই যুগের প্রসিদ্ধ সমীকরণ $E = mc^2$-এ আসা যাক। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে বস্তুর ভর (m) এবং শক্তি (E) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং ওদের মধ্যে সম্বন্ধটি হচ্ছে উপরের ছোট্ট সমীকরণটি। এতে m-এর জায়গায় ১নং সমীকরণটি বসিয়ে দিলে আমরা পাই—

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \cdots\cdots\cdots (২)$$

আগেই বলেছি যে, যে কোন বস্তুকণিকার গতিবেগই আলোর গতিবেগ অপেক্ষা কম। ২নং সমীকরণ থেকে এই ব্যাপারটা সুন্দরভাবে বোঝা যায়। v-এর মান যত বাড়বে, হর তত কমবে এবং শক্তির মান বাড়বে। কিন্তু যখন $v = c$ E তখন অসীম (Infinite)। কিন্তু বস্তুর শক্তি কখনই অসীম হতে পারে না। সুতরাং $v \neq c$; অর্থাৎ কোন মৌলিক কণিকার গতিবেগই আলোর গতিবেগের সমান হবে না।

যাহোক, কোন কণিকার স্থিতিভর যদি শূন্য হয়, তবে সে কণিকার গতিবেগ আলোর সমান হতে পারে। কেন না, সে ক্ষেত্রে শক্তির অসীম হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আশ্চর্যের কথা—এই ধরণের কণিকার খোঁজ পাওয়া গেছে এবং এর নাম Photon বা Light quanta। এই ফোটন বা লাইট কোয়াণ্টাগুলি অন্য সব মৌলিক কণিকা থেকে পৃথক। এরা যখনই যেখানে থাকবে, এদের গতিবেগ c অর্থাৎ আলোর গতিবেগের সমান। এই গতিবেগ ছাড়া এদের অবস্থান সম্ভব নয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখি যে, দুই ধরণের মৌলিক কণিকা আছে—(১) যাদের গতিবেগ আলোর গতিবেগ অপেক্ষা কম; (২) আলোর গতিবেগসম্পন্ন। এছাড়াও আমরা প্রমাণ করেছি যে, শূন্য স্থিতিভরের মৌলিক কণিকাও থাকা সম্ভব।

স্বভাবতঃই আমাদের মনে এখন এই প্রশ্ন জাগে যে, 'নেগেটিভ রেষ্ট মাস' কি কোন মৌলিক কণিকার থাকতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর ডিরাক তাঁর 'হোল থিওরি'তে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, একটি ইলেকট্রন যেমন 'পজিটিভ এনার্জি ষ্টেটে' থাকে, তেমনি 'নেগেটিভ এনার্জি ষ্টেটে'ও থাকতে পারে এবং নেগেটিভ এনার্জি ষ্টেটে যে ইলেকট্রনটি আছে, তার স্থিতিভরও নেগেটিভ হবে। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। আমাদের শুধু এইটুকু জানলেই চলবে যে, ডিরাকের থিওরি অনুযায়ী নেগেটিভ স্থিতিভরের মৌলিক কণিকার অবস্থান সম্ভব।

আজকের বৈজ্ঞানিকের প্রশ্ন হলো এই যে, যদি এত রকমের মৌলিক কণিকার অবস্থান সম্ভব হয়, তাহলে আর এক ধরণের মৌলিক কণিকার (যার গতিবেগ আলোর চেয়ে বেশী) অবস্থানই বা সম্ভব নয় কেন? যদি এই ধরণের মৌলিক কণিকা থাকে, তবে তার স্থিতিভর কি হবে? আমরা এটুকু বুঝি যে, এর স্থিতিভর

শূন্য বা ঋণাত্মক বা অন্য কোন Real number হবে না।

যাহোক তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে তাঁরা এখন এই রকম কণিকার অবস্থান খুব সহজেই প্রমাণ করতে পারেন। এই কাজের জন্যে তাঁদের আইনষ্টাইনের শক্তির সমীকরণটিকে একটু অন্য ভাবে লেখবার প্রয়োজন হয়। ২নং সমীকরণটিকে i (= $\sqrt{-1}$) দিয়ে গুণ করলে—

$$E = \frac{im_oc^2}{i\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$= \frac{im_oc^2}{\sqrt{\frac{v^2}{c^2}-1}}$$

উপরের সমীকরণটির বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সুপারফোটিক কণিকার অবস্থান এথেকে বোঝা যায়। সুপারফোটিক কণিকা বলতে বুঝি—যে কণিকার গতিবেগ আলোর চেয়ে বেশী। যদি v-এর মান c-এর চেয়ে বেশী হয়, তবে উপরের সমীকরণটিতে হরের মান Real থাকবে; সুতরাং শক্তির মান কাল্পনিক হবে, কিন্তু শক্তির মানকে Real বা স্বাভাবিক রাখা যায়, যদি m_o-এর মান Imaginary বা কাল্পনিক হয়। কাজেই আমরা বুঝতে পারি যে, আলোর চেয়ে দ্রুতগামী কণিকার অবস্থান অসম্ভব নয়, কিন্তু তার স্থিতিভর কাল্পনিক হবে। কাল্পনিক স্থিতিভরের ব্যাপারটা কিন্তু কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না—কেন না, যদি শূন্য এবং ঋণাত্মক স্থিতিভর সম্ভব হয়, তবে কাল্পনিক স্থিতিভরও নয় কেন? তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এই কাল্পনিক স্থিতিভর মাপা যাবে না। যেমন আলোর কণিকা (ফোটন) পাওয়া যায় আলোর গতিবেগেই, নইলে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, তেমনি এসব কাল্পনিক স্থিতিভরের কণিকাগুলি পাওয়া যাবে, যখন এর গতিবেগ আলোর চেয়ে বেশী হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তিন রকমের বস্তু-কণিকার সন্ধান পাওয়া গেল।

১। আলোর চেয়ে কম গতিবেগসম্পন্ন কণিকা; যেমন—ইলেকট্রন, প্রোটন এবং আরো অনেক।

২। আলোর গতিসম্পন্ন কণিকা—ফোটন।

৩। আলোর অধিক গতিসম্পন্ন—সুপার-ফোটিক বা অতি দ্রুতগামী কণিকা।

৩নং কণিকাগুলির সন্ধান এখনও গবেষণাগারে পাওয়া যায় নি। মানুষের স্বভাব হলো এই যে, যতক্ষণ চোখের সামনে কোন জিনিষকে তুলে ধরা না যায়, ততক্ষণ সে কোন কিছুই বিশ্বাস করতে নারাজ। একথা আরো বেশী প্রযোজ্য যখন আইনষ্টাইনের প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে নতুন কিছু মতবাদের সূচনা করা হয়।

তবে যাঁরা এই নতুন কণিকার সন্ধান করবেন, তাঁদের একথা মনে রাখতে হবে যে, গতিহীন অবস্থায় এর সন্ধান পাওয়া যাবে না। যদি এর অস্তিত্ব থাকে, তা থাকবে যখন এর বেগ আলোর চেয়ে বেশী হবে এবং যতক্ষণ এর বেগ আলোর চেয়ে বেশী থাকবে, ততক্ষণই এর পরমায়ু থাকবে। আরও মনে রাখতে হবে যে, এই কণিকাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক কণিকা হবে না। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে, এই কণিকাগুলির গতি আলোর চেয়ে বেশী এবং গতিবেগের কোন সীমা নেই, অর্থাৎ স্থানান্তরে যেতে এদের কোন সময়ই লাগবে না। কাজেই এদের গঠন অনেকটা লম্বা শলাকৃতির বস্তুর মত। আমরা যদি একটি দণ্ড নেই এবং তার এক মাথায় একটু ধাক্কা দেই, তবে অন্য মাথায় ধাক্কাটা তক্ষুণি পৌঁছে যাবে। এথেকে আমরা আরও বুঝতে পারি যে, এই কণিকাগুলি রিলেটিভিটির Causality principle মেনে চলে না। Causality principle অনুযায়ী কোন বস্তু

একটি জায়গায় পৌঁছুবার আগে সে জায়গা ছেড়ে যেতে পারে না। কিন্তু এই অতি দ্রুতগামী কণিকার পক্ষে রওনা হওয়ার আগেই গন্তব্য স্থলে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব; অর্থাৎ এরা সময়ের উল্টো দিকে চলতে পারে। এ যেন নাটকের শেষ থেকে সুরু।

এই মতবাদ দেশে দেশে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। বিভিন্ন গবেষণাগারে একে হাতে-কলমে ধরবার চেষ্টা হচ্ছে। ষ্টকহোলমের নোবেল ইনষ্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকেরা তেজ-বিকিরণের উৎস বা Radio-active source থেকে এই ধরণের কণিকা পেতে চেষ্টা করছেন। Princeton University-র বৈজ্ঞানিকেরা চেরেনকভ (Cerenkov) প্রিন্সিপলের উপর নির্ভর করছেন। বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের সফলতা আসতে হয়তো এখনও দেরী আছে। কাজটা সত্যিই কঠিন। অতি দ্রুতগামী কণিকার 'লাইফ টাইম' অত্যন্ত কম; অর্থাৎ তারা ভীষণ অল্প সময়ের মধ্যেই Disintegrate করবে বা মৌলিক অংশসমূহে বিভক্ত হয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, এই কণিকাগুলির প্রয়োজনীয়তা কি? এসম্বন্ধে সঠিক কিছু এখনই বলা মুস্কিল। কিন্তু কয়েকটা বিষয় সহজেই অনুমান করা যায়। এর দৌলতে হয়তো হাজার হাজার বছরের পুরনো ইতিহাস সহজেই জানা যাবে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাতায়াতেরও অনেক সুবিধা হবে। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা আজ এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষ একা নয়। আমাদের চেয়ে আরো উন্নত সভ্যতা হয়তো অন্য কোন জগতে আছে। তাই আজ দেশে দেশে বৈজ্ঞানিকেরা ২৪ ঘণ্টা পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন যে সভ্যতাসম্পন্ন নতুন পৃথিবীর সন্ধান পাওয়া যায় কি না? কিন্তু এই কাজের মস্ত অন্তরায় হলো যোগাযোগ স্থাপন করা। নানা রকম পরীক্ষা করে জানা গেছে, এই সকল গ্রহ কমের পক্ষেও দশ থেকে বারো আলোক-বর্ষ দূরে। কাজেই এখান থেকে কোন সঙ্কেত সেখানে পাঠিয়ে তাথেকে উত্তর পেতে বিশ বছর লেগে যাবে। তাই মনে হয় যে, সুপার ফোটিক কণিকা পাওয়া গেলে একটা মস্তবড় অসুবিধা দূর হবে। আমাদের গ্রহান্তরের প্রতিবেশীর কাছ থেকে নিমেষেই উত্তর পাওয়া যাবে। এই কণিকাগুলির সম্ভাবনা প্রচুর এবং আমাদের অবাক হবার দিনও চলে যাবে, যখন দেখবো মিস ব্রাইটের বিদেশ-ভ্রমণ সত্যি সম্ভব হয়েছিল।

র‍্যণ্টগেন-রশ্মির গবেষণায় বিজ্ঞানাচার্য সি. জি. বার্ক্‌লা

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার পাল

প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী র‍্যণ্টগেনের (Röntgen) এক্স-রে আবিষ্কার বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিয়ে এসেছিল এক নবযুগ। একদা নিতান্ত আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিতভাবেই ধরা দিয়েছিল ডক্টর র‍্যণ্টগেনের হাতে এই অজ্ঞাত দুর্লভ রশ্মি। সে ১৮৯৫ সালের কথা। মাত্র কিছুকাল আগে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী জে. জে. টমসনের গবেষণায় ড্যাল্টনের চরম অবিভাজ্য পরমাণুর বিভাজন সম্ভব হয়েছে, আর তারই ভিতর থেকে নিষ্কাশিত হয়েছে ইলেকট্রন নামক এক বিচিত্র কণিকা—সাধারণ বস্তুকণিকা নয়, ক্ষুদ্রতম ঋণাত্মক তড়িৎ-কণিকা। এতে পরমাণুর চরমত্ব বা পরমত্ব আর কিছুই রইলো না। ইলেকট্রনের উপর বিস্তারিত পরীক্ষা করতে গিয়েই র‍্যণ্টগেন পেয়েছিলেন এই রশ্মির সাক্ষাৎ, আর সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল বিজ্ঞান-জগতের এক নতুন দিগন্ত। অদৃশ্য, অপরিচিত এবং অজ্ঞাত কুলশীল বলেই আবিষ্কর্তা তার নাম দিয়েছিলেন এক্স-রে বা অচিন-রশ্মি। তখনকার সেই অচিন-রশ্মি আজ কিন্তু অচিন বা রহস্যময় নয়—আলো, হাওয়া, জলের মতই সুপরিচিত এবং নিত্য ব্যবহৃত প্রকৃতির এক মহৎ দান। এই এক্স-রশ্মি সর্বত্রই আজ র‍্যণ্টগেন-রশ্মি নামে অভিহিত। র‍্যণ্টগেনের আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানী-মহলে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। বিশ্বের যে যেখানে বিজ্ঞানী ছিলেন, সবাই জানালেন তাঁকে সুস্বাগত। বড় বড় গবেষণাগারে আরম্ভ হলো এই রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এ হেন পটভূমিতে ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত এক নিভৃত অঞ্চলে অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত এক যুবক ধীরে অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলছিল এক পরম প্রস্তুতির দিকে; তৈরি হচ্ছিল অনাবৃত রহস্য এই অচিন-রশ্মিকে তাঁর আজীবন সাধনার সামগ্রীরূপে বরণ করে নিতে। কে জানতো তখন যে, এই যুবক কালক্রমে নবাগত রশ্মির সঙ্গে বিশ্বের এক ঘনিষ্ঠ, নিবিড় পরিচয় ঘটিয়ে অমর কীর্তির অধিকারী হবে? সভ্যতার উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে যতদিন এই রশ্মির কাছে মানুষের কোন প্রত্যাশা থাকবে, ততদিন এই যুবকের নামও হয়ে থাকবে স্মরণীয়, বরণীয়। যুবকটির নাম ছিল চার্লস্‌ গ্লোভার বার্ক্‌লা (Charles Glover Barkla)। ইনি জাতিতে ইংরেজ।

অধ্যাপক বার্ক্‌লা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে, ল্যাঙ্কাসায়ারে উইডনেস (Widnes) নামে এক অখ্যাত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের লেখাপড়া সাঙ্গ করে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানে প্রাক্‌-স্নাতক অধ্যয়ন সুরু করেন এবং যথাসময়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে স্নাতক পর্যায়ে উন্নীত হন। পরে কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮৫১ সালে প্রদর্শনী-বৃত্তি পেয়ে চলে যান কেম্ব্রিজে। সেখানে অধ্যাপক জে. জে. টমসনের অধীনে ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে তিন বছর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। প্রথম দু'বছর গবেষণার বিষয় ছিল, তারের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-তরঙ্গের গতিবেগ নির্ধারণ। তৃতীয় বছরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান—গ্যাসের উপর র‍্যণ্টগেন-রশ্মি পড়লে যে গৌণ (Secondary) বিকিরণ উদ্ভূত হয়, সেই সম্বন্ধে।

অসামান্য উদ্যোগ ও মেধার পরিচয় দিয়ে এই কাজগুলি সম্পন্ন করেছিলেন বলে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বি. এ. গবেষণা-ডিগ্রী অর্পণ করে সম্মানিত করেছিল।

১৯০২ সালে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন পদার্থ-বিদ্যায় 'অলিভার লজ্ ফেলো' হিসাবে। তখন যদিও তাঁকে সেখানে কিছু কিছু অধ্যাপনাও করতে হতো, তবু তাঁর অধিকাংশ সময়ই কাটতো র‍্যাণ্টগেন রশ্মি সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানে। এভাবে তিনি এই রশ্মি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে ১৯০৪ সালে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি. ডিগ্রীতে ভূষিত হন। তার পরেও এখান থেকেই আরো গবেষণা চালিয়ে যান ক্রমাগত ১৯০৯ সাল পর্যন্ত এবং তার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে সর্বসমেত ২৩ খানা মৌলিক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। এই বছরেই লণ্ডনের কিংস্ কলেজ থেকে অধ্যাপক হিসাবে তাঁকে আহ্বান করা হয় এবং লিভার-পুলের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। সেখানে তিনি পদার্থবিদ্যায় হুইটষ্টোন (Wheatstone) অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯১২ সালে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। এর অব্যবহিত পরেই এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণে আমন্ত্রণ জানায়। তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৪৪ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এডিবরায় অবস্থানকালে ১৯১৭ সালে পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীর প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ সম্মান—নোবেল পুরস্কার তাঁকে প্রদত্ত হয়েছিল।

লিভারপুলের গবেষণা

লিভারপুলে অবস্থানকালে ১৯০৩ সালে যখন বার্ক্লা র‍্যাণ্টগেন-রশ্মির কাজে হাত দেন, তখন সে সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বেশী দূর এগোয় নি—মাত্র আট বছরের সীমিত পরিচিতি। আর এই অল্প সময়ের মধ্যে কতটুকুই বা আশা করা যায়? তবু এটুকু জানা গিয়েছিল যে, এই রশ্মি শক্তির বাহক এবং সরল রেখাতেই ধাবিত হয়; বায়ুকে আয়নিত করতে পারে অর্থাৎ তার অণু, পরমাণুকে ভেঙে তাদের ভিতর থেকে ইলেকট্রন বের করতে পারে; অধিকন্তু পদার্থকে ভেদ করে যাবার ক্ষমতা রাখে অসাধারণ, বিশেষতঃ সে-পদার্থ হাল্কা পরমাণুতে তৈরি হলে। এর মানে এই যে, প্রায় সকল বস্তুই এর কাছে অল্পবিস্তর স্বচ্ছ। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও সে রশ্মির প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং বিক্ষেপণ প্রভৃতি তরঙ্গধর্মের অনুকূলে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ তখনও মেলে নি। কাজেই বলতে গেলে, রশ্মির ভেদন এবং আয়নী-করণের ক্ষমতাই তখনকার দিনে বিজ্ঞানীদের বিশেষ উপজীব্য এবং অবলম্বন ছিল। ভেদন-ক্ষমতা নির্ভর করে রশ্মি-উৎপাদক উচ্চ ভোল্ট বৈদ্যুতিক চাপের উপর। চাপ যত বেশী হবে, ভেদন-ক্ষমতা হবে ততই বেশী, অর্থাৎ রশ্মি হবে ততই তীক্ষ্ণ। তীক্ষ্ণ রশ্মিকে সে যুগে বলা হতো শক্ত (Hard) এবং এর বিপরীত-ধর্মী রশ্মিকে বলা হতো নরম (Soft)। তীক্ষ্ণতা নির্দেশক এই বিশেষণ-গুলি র‍্যাণ্টগেন-রশ্মি সম্পর্কে আজও প্রচলিত আছে, যদিও এর আরো বিজ্ঞানসম্মত এবং সমার্থবাচক অন্যান্য প্রকাশভঙ্গীরও এখন অভাব নেই। দেখা গেছে, একই রশ্মির জন্যে সমান পুরু বিভিন্ন পদার্থ-ফলকের ভেদ্যতা হয় বিভিন্ন। পদার্থের পরমাণু যত হাল্কা হবে, ভেদ্যতা তত বেশী হবে। পদার্থের ভেদ্যতা এবং রশ্মির ভেদন-ক্ষমতা জানতে হলে তাদের শোষণ-ক্ষমতা বা শোষিতব্যতা (Absorbability) জানতে হয়। শোষণ-ক্ষমতা বা শোষিতব্যতা পরিমাপের পদ্ধতি হলো: ঐ ফলকের উপর রশ্মিটি এসে পড়বার আগে এবং তাথেকে নিষ্ক্রমণের পরে তার কোন

গ্যাস-আয়নীকরণের ক্ষমতা পরীক্ষা করা—যা স্বর্ণপত্র-ইলেক্ট্রোস্কোপের (Gold leaf electroscope) সাহায্যে করা সম্ভব। এতে করে ভর-শোষণাঙ্ক (Mass absorption coefficient) বলে একটি রাশি পাওয়া যায়, যাকে ঐ শোষণ-ক্ষমতা অথবা শোষিতব্যতার সূচক বলে ধরা যায়।

বার্ক্‌লা লক্ষ্য করেছিলেন যে, গ্যাসের উপর রন্টগেন-রশ্মি পড়লে ঐ গ্যাস থেকে অন্যান্য রশ্মি চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত (Scattered) হয়, অর্থাৎ ঠিক্‌রে পড়ে। এদের বলা হয় গৌণ (Secondary) বিকিরণ। এসম্বন্ধে সার জে. জে. টমসন একটি তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন। সে তত্ত্ব প্রাচীনপন্থী, অর্থাৎ ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বানুসারী ছিল। টমসন-তত্ত্বে এই বিচ্ছুরিত গৌণ বিকিরণ উৎপত্তির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে। তাথেকে আরো জানা যায় যে, এর ভেদন-ক্ষমতা হবে মূল রশ্মিরই অনুরূপ। শুধু বায়ু নয়, যাবতীয় গ্যাসের উপর পরীক্ষা করে বার্ক্‌লা টমসন-তত্ত্বের সমর্থন পান। এ-ও তিনি নিরীক্ষণ করেছিলেন যে, একই চাপ এবং তাপমাত্রার অধীনে একই মূল-রশ্মিসঞ্জাত বিচ্ছুরণের তীব্রতা সংশ্লিষ্ট গ্যাসের ঘনত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক। প্রত্যেক গ্যাসের জন্যে তিনি তার বিচ্ছুরণাঙ্কও (Scattering coefficient) নির্ধারণ করেছিলেন।

রন্টগেন-রশ্মির নল থেকে সরাসরি বেরিয়ে আসা মূল রশ্মির ভেদন-ক্ষমতা নির্ণয় করতে গিয়ে বার্ক্‌লা তার ভর-শোষণাঙ্ক বের করে দেখতে পেয়েছিলেন যে, ঐ রাশিটি শোষণ-ফলকের বেধ-নির্ভর। এর একমাত্র হেতু এই হতে পারে যে, মূল রশ্মি সুষম নয়, বিভিন্ন ভেদন-ক্ষমতাবিশিষ্ট বহু রশ্মির ওতপ্রোত সংমিশ্রণ। এই কারণে নল-নির্গত মূল রশ্মিকে বিষম (Heterogeneous) বিকিরণ বলা যেতে পারে।

গ্যাসের পরীক্ষায় উৎসাহজনক ফল লাভের পর তিনি কঠিন পদার্থের উপর রন্টগেন-রশ্মিপাতের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করতে এগিয়ে গেলেন। লক্ষ্য করলেন, ভারী পরমাণুর উপর রন্টগেন-রশ্মি পড়লে তাথেকেও গৌণ বিকিরণ নিঃসৃত হয়ে আসে, কিন্তু তাতে থাকে সাধারণতঃ তিন রকমের উপাদান, যথা :—বিচ্ছুরিত (Scattered) রশ্মি, (২) ঐ পদার্থের চারিত্রিক বা প্রকৃতিগত (Characteristic) রশ্মি এবং (৩) এক প্রকার কণিকা-প্রবাহ (Corpuscular rays)। শেষোক্তটি পদার্থ থেকে নির্গত ইলেকট্রন-স্রোত বলে প্রমাণিত হলো।

চারিত্রিক রশ্মির ভেদন-ক্ষমতা নির্ধারণের জন্যে বার্ক্‌লা সুকৌশলে তাকে পৃথক করে তার ভর-শোষণাঙ্ক পরিমাপ করে দেখতে পেলেন যে, তা শোষক ফলকের বেধের উপর নির্ভর করে না। এতে বুঝা গেল, এই রশ্মি মোটামুটি সুষম (Homogeneous), অর্থাৎ নির্ভেজাল এবং সর্বত্র সমধর্মী। কিন্তু এর ভর-শোষণাঙ্ক নির্ভর করবে বিকিরকের (Radiator) উপর। এই চারিত্রিক রশ্মির ভর-শোষণাঙ্ক মেপে অজ্ঞাত বিকিরক পদার্থকে সনাক্ত করা সম্ভব। 'চারিত্রিক' এই বিশেষণের সার্থকতা এখানেই—এখানেই তার গুরুত্ব। এই সম্পর্কে আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে : উৎপন্ন রশ্মির চেয়ে উৎপাদক রশ্মির ভেদন-ক্ষমতা কিছু না কিছু বেশী হওয়া প্রয়োজন। সে জন্যে কেবল মাত্র ভারী পরমাণুর পদার্থের চারিত্রিক রশ্মি দিয়েই হাল্কা পরমাণুর পদার্থের চারিত্রিক রশ্মি বের করা যেতে পারে। উৎপাদক রশ্মির চেয়ে সর্বদাই নরম বলে চারিত্রিক রশ্মিকে বার্ক্‌লা, বিজ্ঞানী ষ্টোক্‌স্‌-এর (Stokes) অনুকরণ করে ফ্লুরোসেন্ট (Fluorescent) অথবা প্রতি-প্রভ বিকিরণও বলতেন। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে তরুণ বিজ্ঞানী মোজ্‌লে (Moseley) দেখিয়েছিলেন যে, রন্টগেন-রশ্মির নলের ভিতরেই ইলেক্ট্রনাহত ধাতু-ফলক থেকে তার চারিত্রিক রশ্মিকে সরাসরি উৎসারিত করা

যায়, যদি ইলেকট্রন-স্রোতের গতিবেগ যথেষ্ট হয়।

সমসাময়িক কালে রসায়নবিদ্‌গণ নিকেল (Nickel) ধাতুর যে পারমাণবিক ওজন (Atomic weight) ৫৭·৭ নির্ণয় করেছিলেন, তাতে তাঁদের মনে কিছু সন্দেহের অবকাশ ছিল। এই ব্যাপারের মীমাংসা করবার জন্যে বার্কলা নিকেলের চারিত্রিক রশ্মির শরণাপন্ন হন। তার ভর-শোষণাঙ্ক মেপে পরমাণুর ওজনের যে মূল্যায়ন তিনি করেছিলেন, তা ছিল প্রায় ৬২। বলা বাহুল্য, এই মূল্যায়ন একেবারে নির্ভুল নয় এবং তার নানা কারণও রয়েছে। তবু এই ঐতিহাসিক পন্থার অনুসারী হয়েই মোজ্‌লে পরে নিকেল-পরমাণুর প্রকৃত ওজন স্থির করেছিলেন ৫৮·৭। সে যাই হোক, বার্কলা-আবিষ্কৃত চারিত্রিক রশ্মির সাহায্যে যে পরমাণুর ওজন এবং তার পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic mumber) সঠিক নিরূপণ করা সম্ভব, সেটাই হলো এখানে বড় কথা। মেণ্ডেলিফের (Mendeleeff) পর্যায়-সারণীতে দেখা যায়, রাসায়নিক গুণানুযায়ী বসানো পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পারমাণবিক ওজনও বাড়তে থাকে। কিন্তু কয়েকগুলি পদার্থে এই নিয়মের ব্যতিক্রম রসায়নবিদ্‌দের তখনকার মত বিচলিত করে তুলেছিল। সেগুলি হলো: (১) আর্গন (Argon)—পারমাণবিক সংখ্যা ১৮, (২) পটাসিয়াম (Potassium)—পারমাণবিক সংখ্যা ১৯, (৩) কোবাল্ট (Cobalt)—পারমাণবিক সংখ্যা ২৭, (৪) নিকেল—পারমাণবিক সংখ্যা ২৮, (৫) টেলুরিয়াম (Tellurium)—পারমাণবিক সংখ্যা ৫২ এবং (৬) আয়োডিন (Iodine)—পারমাণবিক সংখ্যা ৫৩। পারমাণবিক সংখ্যানুযায়ী আর্গনের স্থান পটাসিয়ামের অব্যবহিত পূর্বে, কিন্তু আর্গনের পারমাণবিক ওজন ৩৯·৯, যা পটাসিয়াম পরমাণুর ওজন ৩৯·১ থেকে বেশী। এইরূপ পর্যায়-সারণীতে কোবাল্ট আছে নিকেলের পূর্বে, অথচ কোবাল্টের পারমাণবিক ওজন ৫৮·৯৭ যা নিকেলের পারমাণবিক ওজন ৫৮·৭ থেকে বেশী। টেলুরিয়াম ও আয়োডিনের বেলায়ও তাই; তাদের পারমাণবিক ওজন যথাক্রমে ১২৭·৫ ও ১২৭। মোজ্‌লে এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করে দিয়েছিলেন এবং তা ঐ পদার্থগুলির চারিত্রিক রশ্মি অনুধাবন করেই করতে পেরেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, রাসায়নিক গুণাগুণ বিচারের ব্যাপারে নির্ধারিত পারমাণবিক সংখ্যাই হচ্ছে অধিকতর মৌলিক এবং কার্যকরী—পারমাণবিক ওজন তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। এতে করে রসায়নবিদ্‌দের বহুদিনের সঞ্চিত এক ধারণার মূলে ছেদ পড়লো। অধিকন্তু চারিত্রিক রশ্মি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পারমাণবিক সংখ্যাটাই সর্বেসর্বা বলে প্রমাণিত হলো। এই সংখ্যাটির তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী—কেন না, তা পরমাণুর কেন্দ্রীনের ভিতরে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যা নির্দেশ করে। পরবর্তী কালে রাদারফোর্ডের আলফা-কণা বিচ্ছুরণ সংক্রান্ত সমীক্ষাও এই কথারই সমর্থন করেছিল। কাজেই দেখতে পাই, বার্কলার অনবদ্য আবিষ্কার—চারিত্রিক রশ্মি—কেমন করে বিজ্ঞানীর সন্ধানী দৃষ্টিকে পৌঁছে দিয়েছে একেবারে পদার্থ-পরমাণুর গভীরে, তার মর্মমূলে।

সেকালে কেউ কেউ র‍্যাণ্টগেন-রশ্মিকে তরঙ্গধর্মী বলে অনুমান করে থাকলেও তখন পর্যন্ত সে অনুমান প্রমাণিত সত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। তরঙ্গ তো দুই রকমের হতে পারে, যেমন—(১) শব্দ তরঙ্গ, যার সংশ্লিষ্ট কম্পন তরঙ্গ-প্রবাহের সঙ্গে সমান্তরাল এবং (২) আলোক-তরঙ্গ, যার সংশ্লিষ্ট স্পন্দন তরঙ্গ-প্রবাহের সঙ্গে লম্বভাবে সংস্থিত। বিজ্ঞানী র‍্যাণ্টগেন ব্যক্তিগতভাবে মনে করতেন যে, তাঁর আবিষ্কৃত রশ্মি শব্দ-তরঙ্গ জাতীয়। এই প্রশ্নের সুমীমাংসার জন্যে বার্কলা এক অভিনব পরীক্ষার পরিকল্পনা করেন।

তিনি নল-নির্গত মূল রশ্মির পথে একখানা কার্বন বিকিরক (Radiator) স্থাপন করে প্রথমতঃ ইলেকট্রন-স্রোতের সমান্তরাল এক ফালি বিচ্ছুরিত রশ্মির পরিমাপ করলেন স্বর্ণ-পত্র ইলেকট্রোস্কোপ দিয়ে। তার পরে ইলেকট্রন-স্রোতসহ নলকে এক সমকোণে ঘুরিয়ে দিয়ে এবং ইলেকট্রোস্কোপকে যথাস্থানে রেখে ঐ পরিমাপের পুনরাবৃত্তি করে দেখতে পেলেন যে, তা ঠিক আগের মত নয়; এতে বেশ কিছু গরমিল আছে। এর একমাত্র ব্যাখ্যা হলো—রঞ্জনগেন রশ্মি অবশ্যই তরঙ্গ-ধর্মী এবং তার স্পন্দন প্রবাহ-পথের আড়াআড়িভাবে সংঘটিত। এতে করে একথাটাই দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, রঞ্জনগেন-রশ্মি এবং আলো সমগোত্রীয়। বলা বাহুল্য, উত্তর কালের বহু গবেষণাই এই প্রতিষ্ঠিত সত্য থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এই সত্যের অনুসরণ করেই অধ্যাপক লাওয়ে (Laue), সপুত্র অধ্যাপক ব্র্যাগ (Bragg) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা রঞ্জনগেন-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের পরিকল্পনা এবং আয়োজন করেছিলেন আর তাতে বিরাট সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। আড়াআড়ি স্পন্দনের কত শতাংশ একই সমতলে অবস্থিত, তাও বার্ক্‌লা স্থির করেছিলেন। দেখেছিলেন যে, এই সংখ্যা নির্ভর করে রশ্মির শক্তি এবং নলের ভিতর ইলেকট্রন-গ্রাহী ফলকের প্রকৃতির উপর।

লণ্ডনের গবেষণা

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বার্ক্‌লা চারিত্রিক রশ্মি সম্পর্কে আরও কিছু কাজ সুরু করেন। এবারে সূক্ষ্মতর পরীক্ষায় তিনি আবিষ্কার করেন যে, চারিত্রিক রশ্মিও নিখুঁতভাবে সুষম বা অবিমিশ্র নয়। ভারী পরমাণুর ক্ষেত্রে সে রশ্মিতে দুটি উপাদানের সংমিশ্রণ রয়েছে—একটি অন্যটির চেয়ে বেশ খানিকটা নরম। প্রথমতঃ তিনি অপেক্ষাকৃত শক্তটিকে A এবং নরমটিকে B নামে অভিহিত করেন। কিন্তু পরে আরো শক্ত অথবা আরো নরম উপাদান থাকতে পারে বিবেচনা করে ঐ নাম দুটি পরিবর্তন করে যথাক্রমে তাদের K এবং L নাম দেন। এই অক্ষর যুগল মনোনয়নের পশ্চাতে আর একটা প্রচ্ছন্ন ইতিহাস আছে। কেউ কেউ বলেন যে, এই আবিষ্কৃতির সঙ্গে তাঁর নাম অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত থাকুক, এই ইচ্ছাতেই বার্ক্‌লা তাঁর নামের মধ্যবর্তী এবং সন্নিহিত K এবং L অক্ষর দুটি বেছে নিয়েছিলেন। এতে সব দিকই রক্ষা হয়েছিল। সে যাই হোক, বার্ক্‌লার অনুমান যে সত্য, সুইডিস বিজ্ঞানী সিগবানের (Siegbahn) লেবরেটরীতে সে কথা প্রতিপন্ন হয়। সিগ্‌বান ভারী পরমাণু-সঞ্জাত অতি নরম M এবং N-রশ্মিরও সন্ধান পেয়েছিলেন। রশ্মি দুটি এতই নরম যে, এরা সাধারণতঃ পথিমধ্যে বায়ুতেই পরিশোষিত হয়ে যায়; তখন এদের আর ধরা যায় না। এদের ধরবার জন্যে সিগ্‌বানকে এক বিশেষ ধরণের বায়ুহীন বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করতে হয়েছিল। এদিকে ব্র্যাগও তাঁর উদ্ভাবিত কৃষ্ট্যাল-বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে K এবং L-রশ্মির মধ্যে আরো কয়েকটি মিশ্রণের সাক্ষাৎ পান।

লণ্ডনে থাকতে থাকতেই বার্ক্‌লা বিচ্ছুরিত রশ্মির উপর আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। মূল রশ্মির কত ভগ্নাংশ চতুর্দিকে ঠিক্‌রে পড়ে, এটাই তাঁর তখনকার অধীতব্য বিষয় ছিল। কার্বনের বিচ্ছুরণকে সুকৌশলে মেপেজুখে এবং অঙ্ক কষে তিনি দেখিয়ে দিলেন, কার্বন পরমাণুতে ছয়টি মাত্র ইলেকট্রনের বাস। কার্বনের পারমাণবিক ওজন ১২। অতএব ব্যাপার দাঁড়ালো এই যে, পরমাণুর ভিতরে ইলেক্ট্রনের সংখ্যা পারমাণবিক ওজনের অর্ধেক। শুধু কার্বনই নয়, অন্যান্য হাল্‌কা পরমাণুর বেলায়ও যে এই নিয়মটি প্রযোজ্য, সে কথাও তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। এই

সিদ্ধান্তে আসার পথে বিজ্ঞানী জে. জে. টমসনের বিচ্ছুরণ-তত্ত্ব খুবই সহায়ক হয়েছিল। রাদারফোর্ড, বোর এবং মোজ্লের পরীক্ষাগুলি থেকেও বার্ক্লার সিদ্ধান্তের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়।

টমসন-তত্ত্ব অনুসারে বিচ্ছুরিত শক্তির কৌণিক বিন্যাসের ধারা ও সূত্র জানা যায়। বার্ক্লা তাঁর জয়যাত্রায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এখন এগিয়ে চললেন, পরীক্ষার কষ্টিপাথরে টমসন-সূত্র যাচাই করবার জন্যে। শিষ্য এয়ার্সকে (Ayres) নিয়ে তিনি অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। নিরীক্ষিত ফল সাধারণভাবে টমসন-সূত্রের অনুকূলেই গেল। কিছু ব্যতিক্রমও দেখা গেল, তবে সে শুধু ক্ষুদ্র কোণের বেলায়। প্রসঙ্গতঃ বলতে হয়, এডিনবরায় বার্ক্লার লেবরেটরীতে এসম্পর্কে পরে আরো অনেক কাজ হয়েছে এবং তাথেকে জ্ঞানলাভও হয়েছে বিস্তর। বর্তমান প্রবন্ধ লেখকেরও এতে উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে।

১৯১০ সালে বার্ক্লা রাণ্টগেন-রশ্মির দ্বারা গ্যাসের আয়নীভবন বিষয়ক গবেষণা পুনরায় আরম্ভ করেন। এবারে লোহা থেকে অ্যান্টিমনি (Antmony) পর্যন্ত বারোটি মৌলিক পদার্থের চারিত্রিক রশ্মি দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডে, নাইট্রিকঅক্সাইড. মিথাইল ব্রোমাইড প্রভৃতি গ্যাসকে আয়নিত করে দেখতে পেলেন যে, একই রশ্মি বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা সম্পূর্ণ পরিশোষিত হলে তাদের মধ্য থেকে সমসংখ্যক ইলেক্ট্রন বের হয়।

জার্মান বিজ্ঞানী লাওয়ের নির্দেশক্রমে কাজ চালিয়ে ১৯১২ সালে ফ্রীড্রিখ (Friedrich) ও নীপ্পিং (Knipping) জিঙ্ক সালফাইড কৃষ্ট্যালের সাহায্যে রাণ্টগেন-রশ্মি বিক্ষেপণের ব্যাপারে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছিলেন, একথা সুবিদিত। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না যে, অল্পকাল পরেই, ১৯১৩ সালে বার্ক্লাও সৈন্ধব লবণের (Rock salt) কৃষ্ট্যাল থেকে রাণ্টগেন-রশ্মি বিক্ষেপণের একটা নমুনা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাহলেও যে কারণেই হোক, এ নিয়ে তিনি আর বেশী দূর অগ্রসর হন নি।

এডিনবরায় গবেষণা

১৯১৩ সালেই বার্ক্লা লণ্ডন ছেড়ে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রূপে। এখানে শীয়ারার (Shearer) নামক ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে রাণ্টগেন-রশ্মি নিষ্কাশিত ইলেক্ট্রনের গতিবেগ নির্ধারণে হাত দেন। এই পরীক্ষা থেকে জানা গেল, ঐ ইলেক্ট্রনের সম্ভাব্য বৃহত্তম গতিবেগ উৎস-পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। এখানে আসবার পর বার্ক্লা রয়েল সোসাইটির আহ্বানে তাঁর ঐতিহাসিক 'বেকেরিয়ান বক্তৃতা' (Bakerian lecture) দেন। সেই বক্তৃতায় তিনি তাঁর যাবতীয় গবেষণামূলক কাজের বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন, বিশেষ ভাবে K এবং L রশ্মি সম্বন্ধে। বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, ইলেকট্রন দিয়ে পদার্থের প্রতিপ্রভ বিকিরণ উৎপাদন সম্ভব নয়, যেমনটি সম্ভব রাণ্টগেন-রশ্মি দিয়ে। আর নিষ্কাশিত ইলেকট্রন-সংখ্যা হবে—অন্ততঃ মোটামুটি ভাবেও—আনুষাঙ্গিক প্রতিপ্রভ K-বিধিরণের প্রাখর্যের সঙ্গে সমানুপাতিক। অধিকন্তু নিষ্কাশিত প্রতিটি ইলেকট্রন বের করতে লাগে এক 'কোয়ান্টাম' (Quantum) শক্তি। বিকিরণের পদ্ধতি সম্বন্ধে বার্ক্লার অনুধ্যান অনুযায়ী K-বিকিরণের এক কোয়ান্টাম শক্তি হলো সেই পরিমাণ শক্তি, যা প্রয়োজন হয় কোন ইলেকট্রনকে K-ইলেকট্রনের অবস্থা এবং অবস্থান থেকে কম ঘূর্ণাঙ্কবিশিষ্ট L-ইলেকট্রনের অবস্থা এবং অবস্থানে উন্নীত করতে।' J, K, L, M প্রভৃতি নামধারী ইলেকট্রনগুলি উক্ত ক্রমানুসারেই ব্যবস্থিত থাকে, কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে। অতএব দেখা যাচ্ছে, আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে বার্ক্লার এই ধারণার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

এরপর ১৯১৭ সালে, হাল্‌কা পদার্থের বিচ্ছুরণ সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধিৎসা জাগে। বিচ্ছুরিত রশ্মির শোষণ-লেখতে তিনি একটি 'অবচ্ছেদ' (Dscontinuity) বা ফাঁক আবিষ্কার করেন, অর্থাৎ শোষণ-লেখ অবিচ্ছিন্ন না হয়ে, মধ্যে একটি ফাঁক সহ দুটি পৃথক রেখায় বিভক্ত। এতে তাঁর প্রথমতঃ অনুমান হলো যে, এই অবচ্ছেদ K-বিকিরণ থেকে শক্ত কোন J-বিকিরণের ইঙ্গিতই বহন করছে। সেই ১৯১৭ সালেই K এবং L রশ্মির আবিষ্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে নোবেল-পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। পুরস্কার আনতে গিয়ে ষ্টকহোমে তাঁর র‍্যাণ্টগেন-রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা সম্পর্কে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে বলেছিলেন—ডুয়েন (Duane) এবং অন্যান্যেরা ক্যাথোড রশ্মির ঘাতে অ্যালুমিনিয়াম থেকে J-বিকিরণের কোন সন্ধান যে পান নি, তার হেতু এই হতে পারে যে, ঐ বিকিরণ খুব ক্ষীণ ছিল, যে কারণে তা যন্ত্রে ধরা সম্ভব ছিল না; অথবা বোর-কল্পিত পরমাণুতে এর জন্যে কোন ব্যবস্থা না থাকলেও বিকল্প কোন ব্যবস্থাপনায়, যথা—কেন্দ্রীনের বাইরে না হয়ে তার ভিতরেই এর উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানীর—এমন কি, তাঁর নিজেরও পরবর্তী পরীক্ষায় J-বিকিরণ সত্যি সত্যি আছে বলে প্রমাণ মেলে নি। এই সব কারণে তিনি তাঁর পূর্বোক্ত অনুমান প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

J-বিকিরণের কল্পনা বর্জন করলেও তাঁর গবেষণাগারে বিষম (Heterogeneous) র‍্যাণ্টগেন-রশ্মি সংক্রান্ত এমন সব অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর তথ্য নিত্য জমা হচ্ছিল যে, তখনকার সাধারণ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এদের কোন যুক্তিসঙ্গত এবং সর্বসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সুবিদিত কম্পটন (Compton) তত্ত্বের কোন সুস্পষ্ট প্রকাশ আপাতদৃষ্টিতে বার্ক্‌লার নিরীক্ষাবলীতে দেখা গেল না। ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বার্ক্‌লা এই জাতীয় তথ্যসমূহের নাম রেখেছিলেন J-ফেনোমেনন (Phenomenon)। ইতিপূর্বে যে 'অবচ্ছেদের' কথা উল্লিখিত হয়েছে, এটাই হলো J-ফেনোমেননের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এসম্বন্ধে যে কথাটা অতিশয় দুর্বোধ্য ছিল তা এই যে, J-অবচ্ছেদ,—কখনো এক, কখনো বা একাধিক—নিত্য লভ্য বা স্থায়ী নাও হতে পারে। দৃশ্যতঃ একই পরিস্থিতিতে বা অবস্থায় দেখা দেয় অথবা দেয় না। আবার একই পরিস্থিতিতে একবার দেখা দিয়েও পরে অন্তর্হিত হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বার্ক্‌লাকে কোন কোন অঞ্চলে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু এই সব সমালোচনার উপযুক্ত জবাবও দিয়েছিলেন তিনি। যাঁদের পরীক্ষায় J-অবচ্ছেদের সন্ধান পাওয়া যায় নি, তাঁদের মন্তব্যের উত্তরে বার্কলা 'Nature' পত্রিকার ১৯৩৩ সালের কোন এক সংখ্যায় লিখেছিলেন—এই নেতিবাচক অর্থাৎ J-অবচ্ছেদবিহীন ফলাফল J-অবচ্ছেদদর্শী ফলাফলের চেয়ে বেশী নির্ভুল নয়, কম নির্ভুলও নয়; বেশী বাস্তব নয়, কম বাস্তবও নয়। এক রকমের ফলাফল পদার্থবিদ্‌দের অধুনা-পরিচিত নিয়মকানুন মেনে চলে; অন্যেরা এমন সব নিয়ম-কানুনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা এখনো সাধারণভাবে উপলব্ধিগত নয়। জ্ঞানের অগ্রগতির জন্যে সেখানেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, যেখানে সুবিদিত নিয়মকানুন আপাতদৃষ্টিতে লঙ্ঘিত হচ্ছে—পরীক্ষিত তথ্য যেখানে খুব যথাযথ এবং বিশেষ ধরণের অবস্থার মধ্যে আরো সত্য বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে, সেখানে নয়।

J-অবচ্ছেদের ব্যাখ্যায় বার্ক্‌লার নিজস্ব ধারণা ছিল। র‍্যাণ্টগেন-রশ্মির সক্রিয়তার (শোষিতব্যতা) দুই বা ততোধিক স্তর আছে; শোষিতব্যতা আকস্মিকভাবে এবং হঠাৎ স্তর থেকে স্তরান্তরে ওঠা-নামা করতে পারে। এই রকম পরিবর্তনকে তিনি J-রূপান্তর (Transformation) নাম দিয়েছিলেন এবং এই পথেই কম্পটন এফেক্ট

অর্থাৎ র‍্যাণ্টগেন-রশ্মির বিচ্ছুরণজনিত স্পন্দনাঙ্ক হ্রাসের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা খুঁজেছিলেন। কিন্তু বার্ক্‌লার এই স্তরের কল্পনাকেও মেনে নিতে অনেকের আপত্তি ছিল।

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিষম, বিমিশ্র র‍্যাণ্টগেন-রশ্মি সম্পর্কে বার্ক্‌লা যে অভিমত পোষণ করতেন তা এই যে, রশ্মির ধর্ম এবং গুণাগুণ তার সংগঠক ঐকবর্ণিক ব্যষ্টি-সাপেক্ষ নয়, তা নির্ভর করে এক সঙ্কলিত ও সমষ্টিগত চরিত্রের উপর। উত্তাপের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা যেমন একটা সমাহারগত বা গড়পড়তা ব্যাপার, বিষম র‍্যাণ্টগেন-রশ্মির ক্ষেত্রে তার আচরণও তাই। রশ্মির গড় ভর-শোষণাঙ্ক ঐ সমষ্টিগত আচরণের দ্যোতক বা নিয়ামক বলে অনেকটাই গণ্য হতে পারে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার যান্ত্রিক উন্নয়নের অনেক সিঁড়িই পেরিয়ে এসে আজ ভাবতেও অবাক লাগে, কেমন করে সে যুগে বার্ক্‌লা তাঁর সহজ, সরল, অনাড়ম্বর পরীক্ষা পদ্ধতি দিয়ে এমন মৌলিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ ফল লাভ করতে পেরেছিলেন। যন্ত্রপাতি অতি সাধারণ এবং সেকেলে ধরণের হলেও প্রলব্ধ ফলের গুরুত্ব ছিল অসাধারণ এবং অনবদ্য। এরা যে তত্ত্বানুধ্যানের যাত্রাপথকেও সুগম, সুন্দর করে তুলেছিল দিশারীর মত, সে কথাও আজ অনস্বীকার্য।

বৈজ্ঞানিক জীবনের শেষ অধ্যায়ে তপস্বী বার্ক্‌লার যত উদ্যম ও সাধনা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল রহস্য-ঘন সেই J-phenomenon-এর উপর। সুদীর্ঘ দুই যুগ ধরে তাঁর মনোলোক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ঐ একই ভাবনা। তিমিরাবৃত অজানার অন্তরালে কি জ্ঞান-সম্ভার লুকিয়ে আছে, তারই এষণায় দিনের পর দিন এক দুর্নিবার আকুতি নিয়ে তিনি ছুটে চলেছিলেন। এতে না ছিল ক্লান্তি, না ছিল বিরাম। একাদিক্রমে প্রকাশিত দশখানা মৌলিক প্রবন্ধ-পত্রে তিনি এই সমস্যার বিশদ আলোচনা করেছেন এবং তাঁর মন্তব্য রেখেছেন। যদিও তাঁর জীবদ্দশাতে এর সন্তোষজনক সমাধান দেখে যেতে পারেন নি তিনি, তবু আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে, শুধু র‍্যাণ্টগেন-রশ্মির গবেষণায় নয়, পরমাণুর অন্তর্লোকের সন্ধানে তিনি অসামান্য আলোক সম্পাত করে গেছেন। বিজ্ঞান-জগতের শীর্ষ স্তরেই তাঁর আসন সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

পত্নী-পুত্র-কন্যা পরিবৃত নির্ঝঞ্ঝাট সংসারে তিনি সুখে ও শান্তিতে জীবনযাপন করে গেছেন। কিন্তু শেষ জীবনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এনে দিয়েছিল তাঁর জীবনে এক মর্মান্তিক বেদনার কালো ছায়া। যুদ্ধের কাজে দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যু হলো একটি পুত্রের। নিদারুণ বিচ্ছেদের এই আঘাত তাঁর কাছে দুঃসহ, দুর্জয় হয়ে উঠেছিল। হয়তো সেই নিষ্ঠুর আঘাতেই ১৯৪৪ সালের এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ৬৭ বছর বয়সে আচার্য বার্ক্‌লা, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, চিরনিদ্রায় সমাহিত হলেন। আর তারই সঙ্গে সমাপ্ত হলো অক্ষয় কীর্তি-বিমণ্ডিত এক মহিমান্বিত ইতিহাস।

উপসংহারে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যাঁরা একদা বিজ্ঞানাচার্য বার্ক্‌লার শিষ্যত্ব লাভের গৌরব এবং সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন চার জন ভারতীয় ছাত্র। এঁরা হলেন যথাক্রমে (১) ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর (১৯২২-২৩), (২) ডক্টর মোহিতমোহন সেনগুপ্ত (১৯২৭-২৯), (৩) ডক্টর শ্যাম ঘনশ্যামদাস খুবচান্দানি (১৯৩৩-৩৫), ও (৪) বর্তমান প্রবন্ধ লেখক (১৯৩৫-৩৭)।

বিজ্ঞান-সংবাদ

শুক্রগ্রহ সম্পর্কে মানচিত্র রচনা

মার্কিন বিজ্ঞানীরা বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে শুক্রগ্রহের মানচিত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। শুক্রগ্রহ মেঘে আচ্ছন্ন থাকবার দরুণ পৃথিবী থেকে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও এই গ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয় নি। ৫ কোটি ১৬ লক্ষ কিলোমিটার দূরবর্তী এই গ্রহটির অভিমুখে রেডারের সাহায্যে বেতার-তরঙ্গ ঐ গ্রহে প্রেরণ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, শুক্রগ্রহের উপরিভাগ খুবই বন্ধুর, হয়তো পাহাড়-পর্বতে ভরা। প্রতি ১৮ মাস অন্তর ঐ গ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কারণ তখন ঐ গ্রহটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে, ঐ সময়ে ঐ গ্রহ ও পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধান থাকে ৪ কোটি ১৬ লক্ষ মাইলের।

প্লাস্টিকের তৈরি আঙুলের অস্থি-সংযোজন

স্পেয়ার পার্টস্ সার্জারিতে এখন নতুন কথা হলো, প্লাস্টিকের তৈরি আঙুলের অস্থি-সংযোজন করা।

লণ্ডনের হ্যামারস্মিথ হাসপাতালের গবেষক দল উদ্ভাবিত এই অস্থি-সংযোগগুলির মধ্যে বিশেষ জটিলতা নেই, দামও মাত্র দু-শিলিং করে। একটিতে সারা জীবন কেটে যাবে বলে দাবী করা হয়েছে।

অসুস্থ অস্থিসংযোগ ছিল, এমন ১৫ জন রোগীকে ইতিমধ্যেই প্লাস্টিকের অস্থিসংযোগ দেওয়া হয়েছে।

আর্থ্রাইটিস্ অ্যাণ্ড রিউম্যাটিজম কাউনসিলের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় এই নতুন ধরণের অস্থি-সংযোজনর কথা প্রকাশ করা হয়েছে।

নতুন ধরণের পেন্সিল

অতি মসৃণ পদার্থের উপর লেখা যায় এবং কখনই 'শীষ' কাটতে হয় না, এমন এক নতুন ধরণের পেন্সিল উদ্ভাবন করেছেন লণ্ডনের একটি কোম্পানী। কোম্পানী দাবী করেছেন এই ধরণের পেন্সিল পৃথিবীতে এই প্রথম।

এই পেন্সিলে যখন নতুন করে শীষ বার করবার প্রয়োজন হয় তখন লিনেন-এর একটি সুতা ধরে সামান্য টান দিলেই আবরণ খানিকটা খসে পড়ে এবং নতুন শীষ বের হয়।

রেইমডেল মার্কার এই পেন্সিল আটটি রঙের পাওয়া যায়। কাচ, ধাতু, রবার বা প্লাস্টিকের উপর এই পেন্সিলে লেখা চলে এবং মুছে ফেলবার প্রয়োজন হলে নরম কাপড় দিয়ে ঘষলেই তা করা যায়।

লিজে মাইটনার স্মরণে

গত ২৭শে অক্টোবরে (১৯৬৮) কেম্ব্রিজের এক হাসপাতালে প্রখ্যাত মহিলা-বিজ্ঞানী লিজে মাইটনার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে দু-জন মহিলা বিজ্ঞানীর নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, তাঁদের মধ্যে একজন মাদাম কুরী, অপরজন লিজে মাইটনার। তাঁদের দু-জনের

লিজে মাইটনার
(জার্মান নিউজ উইক্‌লির সৌজন্যে)

অবদানের ফলে পদার্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। বর্তমানে আমরা যে পরমাণু-শক্তির বিকাশ দেখছি, তার পথ উন্মুক্ত হয়েছিল তাঁদের দু-জনের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার দ্বারা। তাই তাঁদের ভূমিকার কথা কোন দিন বিস্মৃত হবার নয়।

১৮৭৮ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় এক ইহুদী পরিবারে লিজে মাইটনারের জন্ম। মাইটনারের ভাই-বোন মিলে ছিলেন সাতজন। তাঁদের পিতা ছিলেন আইনজীবী। মাইটনার ভিয়েনাতেই স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করেন। পাঠ্য জীবনে তিনি তেজস্ক্রিয়তা এবং মাদাম কুরীর রেডিয়াম আবিষ্কার সম্পর্কিত গবেষণার বিষয় গভীর আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেন এবং পরবর্তী কালে মাদাম কুরীই হন তাঁর জীবনের আদর্শ নারী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক বোলৎমানের কাছে তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণের সৌভাগ্য মাইটনারের হয়। অদৃশ্য ক্ষুদ্র কণিকার দ্বারা বস্তু গঠিত, এই তত্ত্ব সে সময় বহু পদার্থ-বিজ্ঞানী স্বীকার করতেন না। কিন্তু অধ্যাপক বোলৎমান সেই তত্ত্ব সমর্থন করতেন। তিনি মনে করতেন, তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারের দ্বারা পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতর কণিকার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। মাইটনারের ছাত্রাবস্থাতেই তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের ফলে পরমাণুর অভ্যন্তরে কমপক্ষে তিনটি কণিকার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

মাইটনারের জীবনে পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিচিতি লাভের প্রথম সুযোগ ঘটে ১৯০৭ সালে বার্লিন গমনে। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী ছিলেন। কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রবক্তা ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তখন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। মাইটনার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্ল্যাঙ্কের অধীনে তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞান গবেষণা সুরু করেন। প্ল্যাঙ্ক অচিরে এই তীক্ষ্ণধী তরুণীটির মধ্যে প্রতিভার সন্ধান পান। ইতিপূর্বে মাইটনার ভিয়েনায় থাকাকালে তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কিছু গবেষণা করেন। সে কারণে এই বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করতে মাইটনার বেশী আগ্রহী ছিলেন। প্ল্যাঙ্ক তাঁকে এমিল ফিশার ইনষ্টিটিউটে তরুণ গবেষক অটো হানের সঙ্গে গবেষণা করবার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু সে সময় কোন গবেষণাগারে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের একযোগে কাজ করবার রীতি ছিল না। তাই ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ এমিল ফিশার মাইটনারকে হানের সঙ্গে গবেষণা করতে দিতে প্রথমে আপত্তি জানান। পরে একটি সর্তে তিনি মাইটনারকে কাজ করবার অনুমতি দিলেন যে, মাইটনার নীচের তলায় একটি ঘরে আলাদাভাবে কাজ করবেন।

গবেষণাগারের সাহায্য না পাওয়ায় মাইনার প্রথমে কয়েক বছর তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত রশ্মি পরিমাপ ও তাদের ভৌত ধর্ম পর্যালোচনা করলেন। শেষকালে হান ইনষ্টিটিউটের দোতলায় মাইটনারের জন্যে একটি গবেষণাগারের ব্যবস্থা করে দিতে সক্ষম হলেন।

১৯১২ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসাবে কাইজার উইলিয়াম ইনষ্টিটিউট ফর কেমিষ্ট্রী প্রতিষ্ঠিত হলো এবং হান সেখানে ভারপ্রাপ্ত হলেন। মাইটনার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটে প্ল্যাঙ্কের সঙ্গে গবেষণায় সহযোগিতা করছেন। পাঁচ বছর পরে মাইটনারকে ইনষ্টিটিউট ফর কেমিষ্ট্রীতে পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি নতুন বিভাগ সংগঠনের ভার দেওয়া হলো মাইটনার এবার পরমাণু পদার্থ-বিজ্ঞানের নতুনতম অগ্রগতি সম্পর্কে পরিচিত হবার সুযোগ পেলেন। হানের সঙ্গে গবেষণায় মাইটনার ১৯১৭ সালে প্রোটো-অ্যাক্টিনিয়াম নামে একটি নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল আবিষ্কার করেন।

বিকিরণ সম্পর্কে তাঁর নিজের কাজও চলতে লাগলো। পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁর গবেষণার জন্যে ১৯২০ সালের মধ্যে বিজ্ঞানীমহলে মাইটনারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৪ সালে বার্লিন অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স তাঁকে লিবনিজ পদক এবং অষ্ট্রিয়ার অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স তাঁকে লিবার পুরস্কার প্রদান করেন। পরের বছর তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদে বৃত হন। হিটলারের ইহুদীদলন নীতির ফলে ১৯৩৮ সালে জার্মেনী ত্যাগ করবার আগে পর্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এর পরের কথা—পরমাণু-শক্তি বিকাশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৩০ সালে ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীনকে (Nucleus) ঘিরে যে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল, তা পরিণতি লাভ করে হান, ষ্ট্রাসমান এবং মাইটনারের ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনের বিভাজন (Fission) সংক্রান্ত গবেষণায়। ১৯৩৮ সালে হান, ষ্ট্রাসমান এবং মাইটনার ২৩৮ ভরের ইউ-রেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনকে ধীরগতি নিউট্রনের দ্বারা অভিঘাতের গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময় হিটলারের ইহুদীবিরোধী নীতির ফলে মাইটনার জার্মেনী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। হান এবং ষ্ট্রাসমান তাঁদের গবেষণা চালিয়ে যান। ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনকে অভিঘাতের ফলে ১৪০ ও ৯০ পারমাণবিক ভরের দুটি আইসোটোপ পেয়েছেন বলে তাঁরা দাবী করলেন, কিন্তু আসল ব্যাপার কি ঘটেছে তার যথাযথ ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারলেন না। তাঁরা ষ্টকহোমে মাইটনারকে ব্যাপারটা লিখে জানালেন। মাইটনার তাঁদের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, তাতে এক নতুন ইতিহাস রচিত হলো। বিজ্ঞান-লেখক

উইলিয়াম লরেন্সের ভাষায় বলতে গেলে 'She was experiencing sensations that must have been akin to those of Columbus' (কলাম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের মত উত্তেজনা তিনি অনুভব করলেন)। মাইট-নার বললেন, ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রীন ভেঙে দুটি অপর মৌলের কেন্দ্রীন (বেরিয়াম এবং ক্রিপটন) সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই সঙ্গে প্রায় ২ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্টের সমান পরমাণু-শক্তি বিমুক্ত হয়েছে। ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন প্রদত্ত শক্তি-ভরের সূত্র অনুযায়ী ভরের কিছু অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে মাইটনার 'নেচার' পত্রিকায় ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনের বিভাজন (Fission) সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা প্রকাশ করলেন। এরপর ১৯৪৫ সালে সুইডেনে থাকতে তিনি পরমাণু-বোমা আবিষ্কারের কথা শুনলেন। পরমাণুর অভ্যন্তরে যে বিপুল শক্তি বিকাশের সন্ধান তাঁরা দিয়েছিলেন, তা এভাবে প্রলয়ঙ্কর মারণাস্ত্র নির্মাণে প্রযুক্ত হওয়ায় তিনি গভীর মনোবেদনা অনুভব করেছিলেন। সেদিন বেদনার্ত কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, 'Women have a great responsibility and they are obliged to try, so far as they can, to prevent another war. I hope that the constiuction of the atom bomb not only will help to finish this awful war, but that we shall be able too, to use this great energy that has been released for peaceful work' (নারীজাতির একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে এবং আর একটি যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্যে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা তাঁরা কর্তব্য বলে মনে করবে। আমি আশা করি, পরমাণু-বোমার আবিষ্কার কেবল এই ভয়াবহ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাবে না, সেই সঙ্গে এই বিপুল শক্তিকে শান্তির কাজে আমরা সদ্ব্যবহার করতে সমর্থ হবো)।

মানবতার প্রতি এই গভীর দরদের জন্যে লিজে মাইটনারকে ১৯৬৬ সালে অটো হান এবং ফ্রেডারিক ষ্ট্রাসমানের সঙ্গে যৌথভাবে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের এনরিকো ফের্মি 'শান্তির জন্যে পরমাণু' পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই বিশেষ সম্মান ছাড়াও মাইটনার পরমাণু-বিজ্ঞানে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের জন্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদগ্ধ সমাজের নানা সম্মাননা লাভ করেন।

সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স এপর্যন্ত দু-জনমাত্র মহিলা-বিজ্ঞানীকে বিদেশী সদস্যরূপে সম্মানিত করেছেন। তাঁদের একজন মাদাম কুরী এবং অপর জন লিজে মাইটনার।

মাইটনার ছিলেন চির-কুমারী। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞানের সেবা এবং মানুষের কল্যাণ চিন্তা করে গেছেন। মানব-দরদী এই মহীয়সী বিজ্ঞানীর স্মৃতির প্রতি আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর—১৯৬৮

২১শ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা
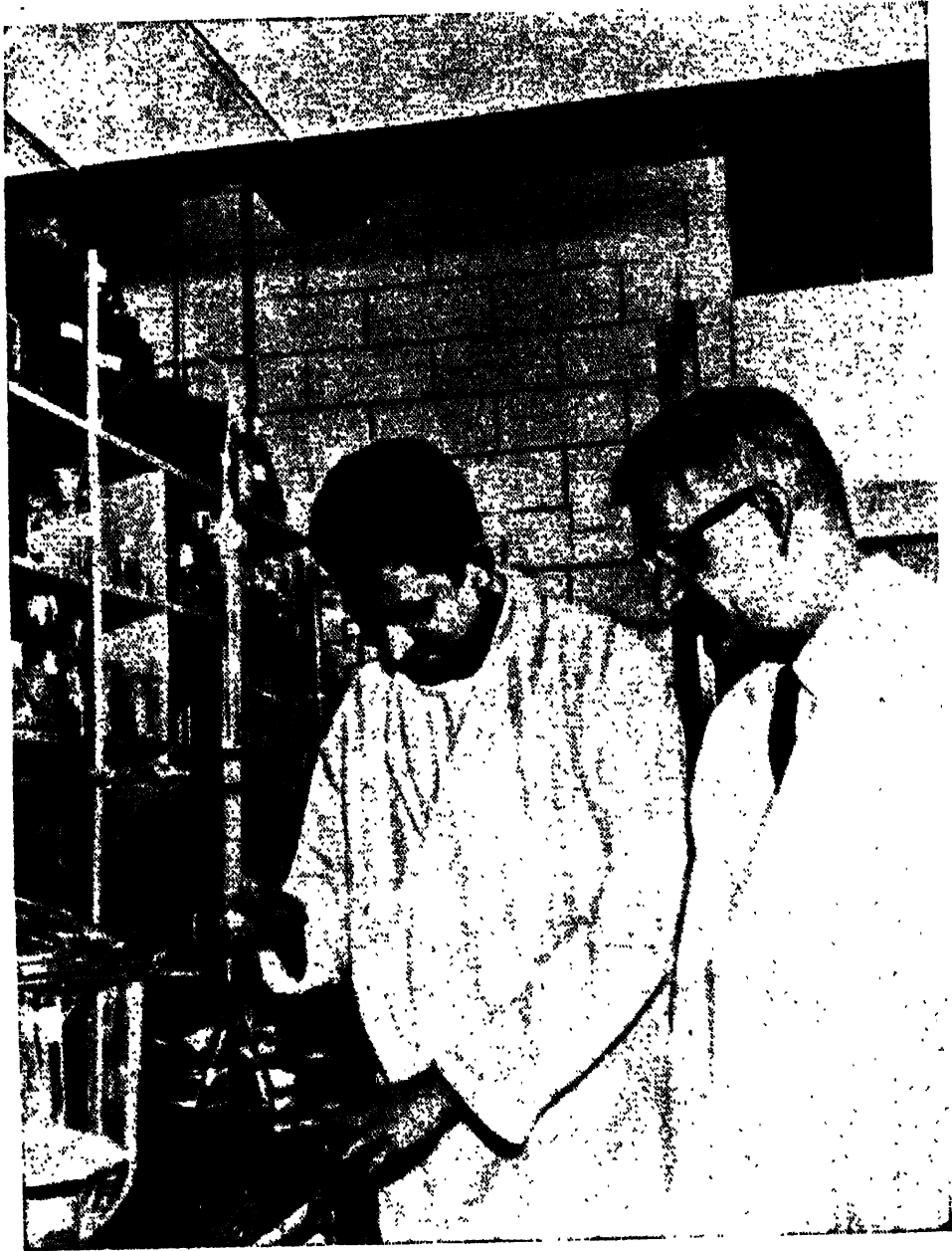
উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-বিজ্ঞান গবেষণাগারে ডক্টর খোরানা ও একজন সহকর্মী।

করে দেখ

আবহাওয়া-ঘর

আবহাওয়ার অবস্থা জানবার জন্যে আজ তোমাদের কাছে একটি চিত্তাকর্ষক খেলনা তৈরির কথা বলছি। খুব সহজেই তোমরা খেলনাটি তৈরি করতে পারবে। এটি তৈরি করতে লাগবে—প্রায় বারো ইঞ্চি লম্বা কয়েক গাছা মানুষের চুল অথবা ঐ মাপের একখণ্ড সরু ক্যাটগাট, কিছুটা শিরিষের আঠা, খানিকটা কার্ডবোর্ড আর ছোট্ট দুটি
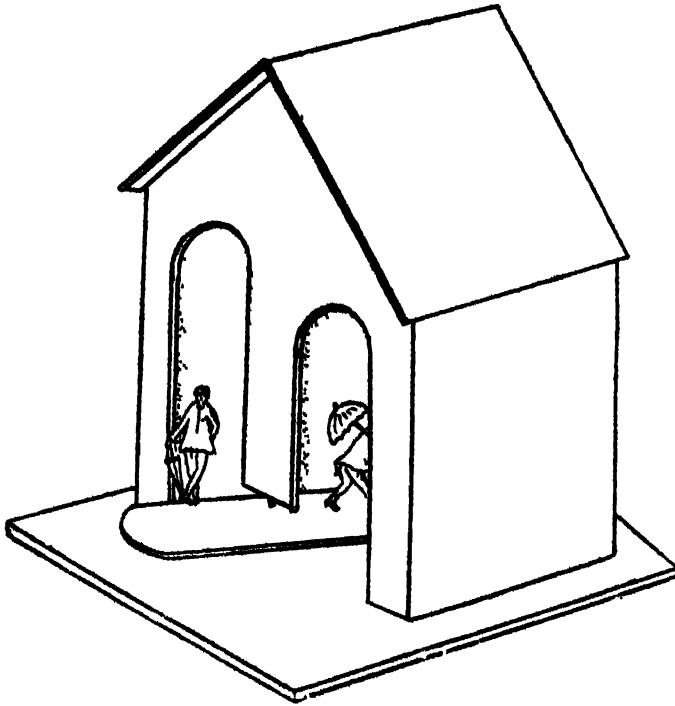
প্লাস্টিকের পুতুল—তাদের একটির হাতে থাকবে একটি বন্ধ-করা ছাতা, অপরটির মাথায় থাকবে খোলা ছাতা। চুল ব্যবহার করলে সেগুলিকে কষ্টিক সোডার হাল্কা দ্রবণের সাহায্যে পরিষ্কার করে নিতে হবে। কিন্তু ক্যাটগাট ব্যবহার করলে কিছু করবার দরকার নেই।

জিনিষগুলি সংগ্রহ করবার পর কার্ডবোর্ড কেটে শিরিষের আঠায় জুড়ে ছবির মত একটি ঘর তৈরি কর। দরজা ছুটির পাশাপাশি দৈর্ঘ্যের চেয়ে কিছুটা ছোট এক ফালি কার্ডবোর্ডের ছুই দিকে প্লাষ্টিকের পুতুল ছুটি আঠার সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দাও। চুল ক'গাছা মোচড় দিয়ে এক প্রস্থ সূতার মত করে নাও। এবার চুল অথবা ক্যাটগাটের এক প্রান্ত পুতুল বসানো কার্ডবোর্ডের ঠিক মধ্যস্থলে এমনভাবে এঁটে দাও, যাতে কার্ডবোর্ডের ফালিটা অনুভূমিকভাবে ঝুলে থাকতে পারে। চুল অথবা ক্যাটগাটের অপর প্রান্ত ঘরের ভিতরের দিকে উপরের চালের সংযোগ-কোণের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। চুল এবং ক্যাটগাট উভয়েই জলাকর্ষী পদার্থ। কাজেই বাতাসে জলীয় বাষ্পের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী চুল বা ক্যাটগাটের মোচড়ের তারতম্য ঘটবে এবং তার সঙ্গে ঝুলানো কার্ডবোর্ডের ফালিটিও ঘুরে যাবে। ফলে একটি পুতুল ঘরের ভিতরে ঢুকে যাবে এবং অপরটি বেরিয়ে আসবে। ছু-এক বার দেখে নিয়ে ক্যাটগাটটি ঠিকমত আটকে দিতে পারবে। ছাতা-বন্ধ পুতুলটি বাইরে থাকলে পরিষ্কার দিন, আর ছাতা মাথায় পুতুলটি বাইরে এলেই বাদলা আবহাওয়ার সঙ্কেত বুঝা যাবে।

—গ—

ট্যালক্

ট্যালকম্ পাউডার নিশ্চই তোমরা সকলেই ব্যবহার করেছ। কিন্তু কি করে এই পাউডার তৈরি হয়, তা বোধহয় অনেকেই জান না। শুনলে অবাক হবে, ট্যালক্ (Talc) বা ষ্টিয়াটাইট (Steatite) নামে খনিজ পদার্থকে (Mineral) যন্ত্রের সাহায্যে ময়দার মত গুঁড়া করে তার সঙ্গে নানা গন্ধের সেন্ট মিশিয়েই তৈরি হয় সুগন্ধী ট্যালকম্ পাউডার (Talcum powder)। তারপর যখন সুদৃশ্য কৌটায় এই পাউডার বাজারে বিক্রয় হয়, তখন কি আর সেই প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থের কথা কারও মনে পড়ে? তোমরা হয়তো ভাবতে পার, পৃথিবীতে এত বিভিন্ন ধরণের পাথর থাকতে হঠাৎ ট্যালক্ পাথর গুঁড়িয়েই বা পাউডার তৈরি করা হয় কেন? তোমাদের মনের এই জিজ্ঞাসা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু এরও উত্তর আছে। কারণ আর কিছুই নয়, ট্যালক্ হচ্ছে পৃথিবীর তাবৎ খনিজ পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে নরম আর মোলায়েম, অথচ শরীরের কোন ক্ষতি করে না। সাবানের মত মোলায়েম একটা ভাব থাকায় ট্যালক্‌কে অনেক সময় সোপষ্টোন (Soap stone) বলা হয়। তোমরা জেনে আরও অবাক হবে যে, লেখবার শ্লেট-পেন্সিল এই ষ্টিয়াটাইট থেকেই তৈরি হয়।

সবচেয়ে নরম হলে কি হবে, খুব কম খনিজ পদার্থেরই এর মত তাপ সহ্য করবার ক্ষমতা রয়েছে। একটি গ্রীক শব্দ থেকে ট্যালক্ নামটার উৎপত্তি, যার অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী। সম্ভবতঃ ট্যালকের প্রচণ্ড আগুন সহ্য করবার অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করেই এই নাম দেওয়া হয়েছে। রসায়নবিদের ভাষায় ট্যালক্‌কে বলা হয় জলকণাবাহী সিলিকেট অব ম্যাগ্নেসিয়া। অর্থাৎ এর মধ্যে রয়েছে জল, সিলিকন (Silicon), ম্যাগ্নেসিয়াম (Magnesium) ও অক্সিজেন (Oxygen)। ট্যাল্‌ক যখন গনগনে আগুনের তাপে পোড়ানো হয়, তখন এর মধ্য থেকে বাষ্প হয়ে উবে যায় জল আর তৈরি হয় Clinoen-statite নামে আর একটি খনিজ পদার্থ ও সিলিকন ধাতু। এই দুটি পদার্থকেই সাধারণ আগুনের তাপে, গলানো প্রায় অসাধ্য।

ট্যালক্ বা ষ্টিয়াটাইটের এই অসাধারণ গুণগুলি প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরও অজানা ছিল না। মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করে আমরা জানতে পারি যে, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেও মানুষ এই খনিজ পদার্থগুলির গুণাগুণ ও ব্যবহার জানতো। ষ্টিয়াটাইট খোদাই করে সে যুগের সৃজনকারী শিল্পী গড়ে তুলতো সুদৃশ্য পট, কারুকার্যময় পাত্র ও ছোট-বড় নানা ধরণের মূর্তি। তারপর সেগুলিকে পুড়িয়ে লোহার মত শক্ত করে ফেলা হতো। সেগুলি এত শক্ত যে, হাজার হাজার বছর পরেও শিল্পকর্মগুলি অক্ষয় হয়ে আছে। মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে উড়িষ্যা ও মহীশূরের বহু মন্দিরের কারুকার্য ও দেবমূর্তি এই পাথর খোদাই করেই তৈরি করা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর এই কর্মচঞ্চল পৃথিবীতে শিল্প সৃষ্টি ছাড়াও ট্যালক্ বা ষ্টিয়াটাইট আজকাল নানাভাবে ইণ্ডাষ্ট্রির কাজে লাগছে। অতিরিক্ত তাপ সহ্য করবার ক্ষমতার জন্যে বিভিন্ন ধরণের চুল্লীর ইট বানাবার কাজে এগুলি এখন অবাধে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন বিরোধী বলে এগুলি আজকাল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ-রোধী (Insulator) হিসাবে ব্যবহার করা অত্যন্ত সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে।

ট্যাল্‌ক-ষ্টিয়াটাইটের জন্ম ইতিহাস বিশদভাবে আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়, তাই স্বল্প পরিসরের মধ্যে সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করছি। ভূপ্রকৃতিতে দেখা যায়, ট্যালক্ ষ্টিয়াটাইট সাধারণতঃ রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic rocks), বিশেষ করে ডলোমাইট (Dolomite), সিষ্ট (Schist) বা নাইসের (Gneiss) মধ্যে দেখা যায়। অন্য দিকে আবার এক ধরণের কালো বা ঘন সবুজ আগ্নেয়শিলা (Igneous rocks) থেকে রূপান্তরিত হয়ে ট্যালক্ সৃষ্টি হতে পারে। ট্যালক্ সাধারণতঃ ম্যাগ্নেসিয়াম-ঘটিত খনিজ পদার্থ থেকে রূপান্তরের ফলেই গঠিত হয়ে থকে। এই রূপান্তরের কাজে সাহায্য করে ভূগর্ভ-নিঃসৃত কার্বন ডাইঅক্সাইডবাহী খনিজ জল আর ভূস্তরের চাপ। ট্যালক্ সাধারণতঃ ট্রেমোলাইট (Tremolite), অ্যাক্টিনোলাইট (Actinolite),

ওলিভিন (Olivine), পাইরক্সিন (Pyroxene) বা অ্যামফিবোল (Amphibole) ইত্যাদি খনিজ পদার্থ থেকে রূপান্তরের ফলে উদ্ভূত হয়। ভারতে যদিও রূপান্তরিত শিলা প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে ভাল জাতের ট্যাল্‌কের পরিমাণ অতি সামান্য। উৎকৃষ্ট জাতের ট্যালক্ পাওয়া যায় রাজস্থানের মেবার ও জয়পুর অঞ্চলে। জব্বলপুরের (মধ্যপ্রদেশ) মার্বেল পাহাড়ে ও অন্ধ্র প্রদেশের তদপত্রীর মুটমুকোটা অঞ্চলে। একটু নিকৃষ্ট মানের ট্যালক্ বা সোপষ্টোন বিহারের সিংভূম ও বাংলা দেশের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার দালমা পাহাড়ের জায়গায় জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা এগুলি দিয়ে নানারকম বাসনপত্র ইত্যাদি বানিয়ে থাকে।

যদিও ভাল জাতের ট্যালক্-ষ্টিয়াটাইট ভারতে যথেষ্টই পাওয়া যায়, তবু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, উৎপাদনের দিক থেকে পৃথিবীর দরবারে ভারত অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৪৫ ভাগ উৎপাদন করে আমেরিকা বিশ্বের বাজারে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তারপরেই চীন, ফ্রান্স ও ইটালীর নাম। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ব্যাপারে আরও ব্যাপকভাবে আত্মনিয়োগ করেছে। তাই আমরা সঙ্গত কারণেই এমন এক ভবিষ্যতের কল্পনা করতে পারি, যেদিন ভারতবাসী বর্তমানের বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে বিশ্বের দরবারে যোগ্য আসনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। চতুর্মাত্রিক জ্যামিতি সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান।
হরিহর কোলে, বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজ।
ললিতা বসু, কলিকাতা-৯।

উঃ ১। জ্যামিতির ভাষায় আমাদের বিশ্ব ত্রিমাত্রিক। ত্রিমাত্রিক বিশ্বের ধর্ম অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অন্য কোন বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করার জন্যে তিনটি সংখ্যার প্রয়োজন হয়। ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে এই তিনটি সংখ্যা—যা বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করে—তাদের বলা হয় স্থানাঙ্ক। দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্র বা সমতলের বেলায় দুটি সংখ্যা দিয়ে স্থানাঙ্ক হয় এবং একমাত্রিক ক্ষেত্রে একটি সংখ্যার প্রয়োজন হয়।

সরল রেখার দৈর্ঘ্য আছে, উচ্চতা বা প্রস্থ নেই। সরল রেখা একমাত্রিক। সমতল ক্ষেত্রের বিস্তৃতি দ্বিমাত্রিক। সাধারণভাবে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা—এই তিনটি দিক নেই—এমন বস্তু আমরা ভাবতে পারি না। আমাদের চেতনাটাই মোটামুটিভাবে ত্রিমাত্রিক।

জ্যামিতি হচ্ছে গাণিতিক যুক্তি-বিজ্ঞান। এর মধ্যে প্রাকৃতিক সত্য ইত্যাদি ব্যাপারের বালাই নেই। কতকগুলি মৌলিক প্রস্তাবকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে তার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে একটা কাঠামো তৈরি করে তাকে জ্যামিতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মৌলিক স্বতঃসিদ্ধান্ত যুক্তির গলদ না রেখে ইচ্ছামত নেওয়া যায়। সরল রেখা, তল, বৃত্ত, ত্রিভুজ—এগুলি জ্যামিতিক কল্পনামাত্র। এদের নিয়েই তৈরি হয়েছে সনাতনী ইউক্লিডীয় জ্যামিতি। এর প্রয়োগ অমরা হামেশাই দেখতে পাচ্ছি।

তিন মাত্রার বেশী অর্থাৎ চার বা আরও অধিক মাত্রার জ্যামিতির অস্তিত্ব অসম্ভব বলে মনে হয়। যে কোন বিন্দু দিয়ে তিনটি সরল রেখা পরস্পরের উপর লম্ব করে টানা যায়। কিন্তু আমাদের জগতের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনটির বেশী সরল রেখা একই বিন্দুতে পরস্পরের উপর লম্ব করে টানা যায় না। জগতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে না হলেও তিন মাত্রার বেশী জ্যামিতি নানা রকম প্রয়োগের সম্ভাবনায় পূর্ণ। তাই তিন মাত্রার সীমায় জ্যামিতিকে বেঁধে না রেখে বিজ্ঞানীরা স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে কোন বিন্দু দিয়ে অসংখ্য সরল রেখা পরস্পরের উপর লম্ব করে টানা যায় বলে ধরে নিলেন। রিমান প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রথম এ-কাজে নামেন। দুই ও তিন মাত্রার জ্যামিতির সাহায্যে তাঁরা যুক্তির সাহায্যে একের পর এক উপপাদ্য রচনা করে একটা সম্পূর্ণ নূতন জ্যামিতির উদ্ভাবন করেন। বহুমাত্রার জ্যামিতির নিছক যৌক্তিক মূল্য ছাড়া আর কোন আকর্ষণ নেই। কিন্তু চতুর্মাত্রিক জগৎ আমাদের নাগালেরই মধ্যে এবং তা ধারণা করা একেবারে অসম্ভব নয়। একটা সমতলকে বোঝাতে কমপক্ষে তিনটি সরল রেখা লাগে এবং একটা ঘনক্ষেত্রকে আবদ্ধ করতে কমপক্ষে চারটি তলের দরকার হয়। ঠিক তেমনি চার মাত্রার কোন জ্যামিতিক চিত্রকে বোঝাতে কমপক্ষে পাঁচটি তিন মাত্রার সমতল ঘনক্ষেত্রের দরকার হয়। একই দৈর্ঘ্যের রেখা (a) দিয়ে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হয় a^2 এবং কিউবের ঘনফল হয় a^3। চতুর্মাত্রিকের বেলায় তার ঘনফল হবে a^4। সরলরেখা, বর্গ এবং কিউব আঁকবার পদ্ধতি অনুযায়ী এক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে, এটা এমন একটা বস্তু হবে যার মোট ৮টি কিউব, ২৪টি তল, ৩২টি কিনারা এবং ১৬টি কোণ থাকবে। একে বলা হয় কিউবয়েড (Cuboid)।

এই চতুর্থ মাত্রার অস্তিত্ব আছে কি নেই, তা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে চতুর্থ মাত্রার অস্তিত্ব থাকা সম্বন্ধেও সন্দেহ করবার কারণ যথেষ্ট আছে। কেন না, পদার্থবিদ্যার বিশেষ কতকগুলি সমস্যা কেবলমাত্র চতুর্থ মাত্রার অস্তিত্ব মেনে নিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। আধুনিক পদার্থবিদ্যায় ইউক্লিডীয় দেশ বা তিন-মাত্রার বিশ্বের বদলে আইনষ্টাইনের চারমাত্রার বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে আগে যে চতুর্থ মাত্রার আলোচনা করা হয়েছে তা স্থানগত। কিন্তু আইনষ্টাইনের বিশ্বের চতুর্থ মাত্রাটি কালগত। এই মতানুযায়ী আমাদের বিশ্ব হচ্ছে একটি চতুর্মাত্রিক গোলক, যার মাত্রা চারটি হচ্ছে—দৈর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতা এবং কাল।

শ্রীশ্যামসুন্দর দে

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। জগৎজীবন ঘোষ
ও
দেবব্রত নাগ
(জৈবরসায়ন বিভাগ)
বিজ্ঞান কলেজ
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

২। সুবিমল সিংহরায়
২, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৩৪

৩। জিতেন্দ্রকুমার রায়
অ্যানথ্রোপোলোজিক্যাল সার্ভে,
ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম হাউস
কলিকাতা-১৩

৪। কৃষ্ণা সেনগুপ্ত
পদার্থবিদ্যা বিভাগ
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী

৫। শ্রীহীরেন্দ্রকুমার পাল
A-91, H. B. Town
P. O. Sodepur
24 Parganas

৬। প্রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্যালকাটা কেমিক্যাল
৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড
কলিকাতা-২৯

৭। দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
B/C. I. T. Building
Calcutta-7

৮। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স; বিজ্ঞান কলেজ
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত